ধর্ম্মের তত্ত্ব ও সাধন

বেদান্তবাগীশোপাধিক

অধ্যাপক শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

বিদ্যাভূষণ তত্ত্ববারিধি, এম, এ

প্রণীত

মূল্য কাগজে বাঁধাই দুই টাকা, কাপড়ে বাঁধাই ~~তিন~~ আড়াই টাকা

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে,
শ্রী ত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা মুদ্রিত
ও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক পাবনা হইতে প্রকাশিত।

অর্পণ

পরমপূজনীয়—

স্বর্গীয় খুল্লতাত শ্রেষ্ঠিরত্ন উপেন্দ্রমোহন চৌধুরী

শ্রীশ্রীচরণকমলে

খুড়া মহাশয়,

জীবনের এক সন্ধিক্ষণে আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং আপনিও আশ্রয়দানে আমাকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি নিজে অনুভব করিয়াছি, আমার কৃতিত্বে আপনার হৃদয়ে কতটা আহ্লাদের সঞ্চার হইত। আমার প্রতি আপনার অপরিসীম স্নেহেরও পরিচয় পাইয়াছি। যে অবাধ্যতায় পিতামাতাও সন্তানের উপর বিরূপ হন, আপনি আমার সেরূপ অবাধ্যতাও সহ্য করিয়াছেন। তাই, আজ সাহস করিয়া এই ক্ষুদ্র উপহার লইয়া আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। ইহা ঋণ-পরিশোধ নহে, ঋণ-স্বীকার মাত্র। আপনার ঋণ পরিশোধ করিবার স্পর্দ্ধা আমার হইতেই পারে না—সে ঋণ অপরিশোধ্য।

১৩৩৪ সন

সেবক—শ্রীরেন্দ্র

ভূমিকা

সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা। যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের (Theological Institution) একটী পরীক্ষার জন্য অধ্যক্ষ কেয়ার্ড প্রণীত ধর্ম্ম-বিজ্ঞান-প্রবেশ (*An Introduction to the Philosophy of Religion*) গ্রন্থ পাঠ করি, তখনই মনে হইয়াছিল যে এইরূপ একখানা বই বাংলা ভাষায় রচিত হওয়া প্রয়োজন। যদিও পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ-প্রণীত **ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা** এক দিকে বিস্তৃতভাবেই সে অভাব পূরণ করিয়াছে, তবুও সকল দিক্ দেখিয়া আমার ঐরূপ গ্রন্থ রচনার আকাঙ্ক্ষা হইল! সে আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুযোগও উপস্থিত হইয়াছিল। স্বর্গীয় অগ্রজ যশোদালাল চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত ও পণ্ডিত তত্ত্বভূষণ সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্র **ব্রহ্মতত্ত্বে** এ গ্রন্থের সূচনা হয়। কিন্তু অকালে প্রতিষ্ঠাতার ইহলোক হইতে তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মতত্ত্বও অন্তর্হিত হইল। সুতরাং এ দিক্কার লেখাও বন্ধ হইল। স্বর্গীয় পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত **অঙ্কুর** নামক মাসিকে আবার আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু এ কাগজখানিও বহুদিন টেঁকে নাই। কিন্তু আমার ইচ্ছাটা বিনষ্ট হয় নাই। এই উদ্দেশ্য লক্ষ্যস্থানে রাখিয়া নানা পত্রিকায়, অন্যান্য নানা বিষয়ের সঙ্গে, এ বিষয়েও বহু সন্দর্ভ প্রকাশ করিয়াছি। এই পুস্তকের প্রথম স্কন্ধ সেই উদ্যমেরই ফল। কিন্তু সমগ্র গ্রন্থখানি, আমার আদিম ইচ্ছাকে অতিক্রম করিয়া, অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। সময়ের ব্যবধান যদি লক্ষ্য করা যায়, তবে এরূপ না গেলেই অস্বাভাবিক হইত। অনেক দিন ধরিয়া লিখিত বলিয়া স্থানে স্থানে পুনরুক্তি দোষ ঘটিয়াছে। কিন্তু বহুদিন যে কথাটা আমার মনে ঘুরিয়া ফিরিয়া যাতায়াত করিয়াছে, আমার কাছে তাহার যে একটা বিশেষ মূল্য আছে তা' বলা নিষ্প্রয়োজন। এ দোষটা পরিহার করিবার চেষ্টা না করাটার ইচ্ছাই গ্রন্থকারের ওজুহাত। যাহা হউক, পণ্ডিত তত্ত্বভূষণ ও আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথের পরেই আমার উপর কেয়ার্ড-ভ্রাতৃদ্বয় ও অয়কেন্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীগণের প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। তাঁহাদের অনেক কথাই এ পুস্তকে আছে। নাম অবশ্য সব জায়গায় করা যায় নাই, তাহা সম্ভবও নহে। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের ঋণ অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়াও একথা বলিতে বাধ্য, যে, বেদান্তের প্রস্থানত্রয় ও বেদান্তানুভাবিত আচার্য্যগণ প্রাণে যে তৃপ্তি প্রদান করেন, তাহা আর কোথায়ও পাই না। তাহার কারণ বোধ হয়, যে, এদেশের আচার্য্যগণ

সাধন বাদ দিয়া কেবল তত্ত্ব লইয়া কখনও মাতেন না। বলা বাহুল্য, আমি নিজেকে বেদান্তের একজন অতি নগণ্য অনুচর মনে করি বলিয়া সকল কথাই বেদান্তের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছে। যদি না হইত, তবে আমার অন্তরাত্মা তৃপ্তও হইত না, আমি প্রাণ খুলিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিতেও পারিতাম না। এ কথা সত্য, বেদান্তের বহু শাখা প্রশাখা। আমি যদি প্রচলিত কোন শাখার অন্তর্গত না হইতেও পারি তবুও **বেদান্তই** আমার ভরসা। বেদান্তই বলেন—**পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।** **এই** গ্রন্থের মধ্যে যদি কোথায়ও ঘুণাক্ষরেও সেই **অক্ষর** পুরুষকে জানাইয়া দিবার মত কিছু থাকে, তবে বেদান্তই আমাকে **বেদান্তী** বলিয়া স্বীকার করিবেন, সুতরাং আর কাহারও অস্বীকার করিবার পথ থাকিবে না। প্রত্যেক মানুষ যিনিই ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধনের বিষয়ে জাগ্রত হইয়াছেন তাঁহারই কোন না কোন রকমের একটি—এই দেশের ভাষায় যাহাকে বলি—বেদান্ত (Philosophy) তাহা থাকিবেই। জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারে হউক, ঐ বেদান্তই তাঁহাকে ধর্ম্মপথে পরিচালিত করে। দেশ-প্রচলিত বেদান্তের সঙ্গে স্থূল স্থূল বিষয়ে একটা ঐক্য থাকেই। কিন্তু পূর্ণ ঐক্য অসম্ভব। মানুষে মানুষে বিভিন্নতা অবশ্যম্ভাবী—সুতরাং শিষ্য গুরুর প্রতিবিম্ব হইতে পারেন না—অজ্ঞাতসারেই পার্থক্য উৎপন্ন হয়। আমাকে পূর্ব্ববর্ত্তীর মতে পূর্ণ সায় দিতে হইলে প্রোক্রাষ্টিয়ান শয্যায় (Procrustean bed) শয়নকারীর দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইবে। এতগুলি কথা বলিলাম এই জন্য, যে বহু বিভিন্নতাসত্ত্বেও যেমন দশ জনই বেদান্তী থাকিতে পারেন, তেমনই কালপ্রবাহে বেদান্তও বিবর্ত্তিত হইতে পারে। বেদান্তের শেষ কথা বলা হইয়া গিয়াছে, তাহা আমি বিশ্বাস করি না। ব্রাহ্মসমাজও যে বেদান্তী তাহা ইতিপূর্ব্বেই **সংস্কার ও সংরক্ষণ** এবং **মহাপুরুষ প্রসঙ্গে** বলিয়াছিলাম।

গ্রন্থ যত বড় হইবে ভাবিয়াছিলাম, হইয়া গিয়াছে তাহার দ্বিগুণ। সুতরাং যাঁহারা এই গ্রন্থ প্রকাশে শ্রম ও আমার সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমার কৃতজ্ঞতার ঋণও দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছে। তবে আমার সহধর্ম্মিণীর কথা উল্লেখ না করিলে কর্ত্তব্যের ত্রুটী হয়। পাণ্ডুলিপি লেখন হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ প্রুফ্-সংশোধন পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই তিনি আমার পার্শ্বচারিণী রহিয়াছেন, শ্রম তিনি আমা অপেক্ষা কম করেন নাই। সূচীপত্রটি সম্পূর্ণই তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন। সুতরাং ব্যাকরণের 'মার প্যাঁচে' নহে, কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই তিনি আমার এ মানস-সন্তানের জননী।

সূচীপত্র

প্রথম স্কন্ধ

সাধ্য নির্ণয়

বিষয় পত্রাঙ্ক

দ্বিতীয় স্কন্ধ

সাধন প্রসঙ্গ

তৃতীয় স্কন্ধ

কর্ম্ম-জীবন

ধর্ম্মের তত্ত্ব ও সাধন

প্রথম স্কন্ধ

সাধ্য নির্ণয়

বদন্তি তত্ত্বং তত্ত্ববিদো যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ভাগবত।

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি।
তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্।
অবতু বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ১।১

বর্ত্তমান সময়ে যে ব্রহ্মসাধন পুনরাবির্ভূত হইয়াছে, তাহা এক বিশেষ প্রকৃতি লইয়াই আসিয়াছে। প্রচারই এই বিশেষ প্রকৃতি। এখন আর ব্রাহ্মধর্ম্ম অরণ্য-মধ্যে সাধিত হইয়া অরণ্য-গর্ভে লুক্কায়িত থাকিবার বস্তু নয়। রাজর্ষি রামমোহন ইহাকে এই বিশেষ আকার দিয়াই প্রচার করিয়াছিলেন, যে ইহা লোকালয়ে সাধিত হইয়া জনসমাজকে প্রভাবিত করিবে। সেই জন্যই যিনি এই নবালোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই ইহা অন্যের নিকটে লইয়া যাইতে বাধ্য। সুতরাং যিনিই এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধনের ভার লইয়াছেন তাঁহারই ঘাড়ে এক গুরুতর দায়িত্বের ভার পতিত হইয়াছে। কেন না, প্রচারের জন্য সকলে

দায়ী হইলেও সকলেই কি প্রচার-কার্য্যের জন্য উপযুক্ততা লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন ? সে উপযুক্ততা লাভ করা বড় একটা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। সর্ব্ব প্রথম দেখিতে হইবে, আমরা যাহা প্রচার করিব তাহাতে আমাদের অটল, স্থায়ী বিশ্বাস জন্মিয়াছে কি না। আমরা যাহা বলি তাহাতে যদি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিয়া থাকে এবং আমরা যাহা বিশ্বাস করি, তাহা যদি কার্য্যে পরিণত করিতে সাহস না পাই, তবে আমাদের প্রচারে সুফল না ফলিয়া অনিষ্ট হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। ইহা সত্য ঘটনা যে যাঁহারা এক সময়ে খুব উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চশিক্ষা ও সাধন পরিত্যাগ করিয়া কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার গভীর গর্ত্তে পতিত হইয়াছেন। ইহাতে এই বুঝা যায়, যে তাঁহারা প্রচারব্রত গ্রহণ করিলেও প্রকৃত বিশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন না। ভাবের স্রোতে ভাসিয়া, শুনা কথা লইয়া লোকের দ্বারে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু মানুষ যদি শুনা কথার উপর নির্ভর না করিয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মানুভূতিজনিত বিশ্বাসের উপর দণ্ডায়মান হয়, তবে কখনও এরূপ বিপদ উপস্থিত হয় না। বাস্তবিক অনেক সময় আমরা যাহা বিশ্বাস বলিয়া মনে করি তাহা প্রকৃত বিশ্বাস নহে। তাহা সর্ব্বসাধারণের গৃহীত মত বলিয়া আমাদের মনে স্থান পাইয়াছে মাত্র, তাহাতে বিশ্বাসের দৃঢ়তা অণুমাত্রও নাই। একটী দৃষ্টান্ত লইলেই কথাটা পরিষ্কার হইবে। আমরা সকলেই মনে করি, যে আমরা ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস করি। কিন্তু তাহা যদি সত্য হইত তাহা হইলে যে কাজ একজন মানুষের সমক্ষে করিতে সঙ্কুচিত হই তাহা গোপনে করিতে কোনই সঙ্কোচ অনুভব করি না কেন? ঈশ্বরকে "ধর্ম্মাবহ পাপনুদ" বলিয়া বিশ্বাস করিলে আমাদের পক্ষে পাপচিন্তাও অসম্ভব হইত। মানুষের কাছে যে কোনও অন্যায় কাজ করিতে সঙ্কুচিত হই তাহার কারণ এই, যে মানুষের অস্তিত্বে আমাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের সেরূপ দৃঢ় ধারণা নাই। তাই আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করি না। ঈশ্বর সত্যস্বরূপ, সত্যসংকল্প, এ বিষয়ে যদি আমাদের অটল বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে সত্যাচরণ হইতে কখনও মুহূর্ত্তের জন্য পশ্চাৎপদ হইতাম না। আকাশে ইষ্টকখণ্ড নিক্ষেপ করিলে তাহার পক্ষে ভূপতিত হওয়া যেমন অবশ্যম্ভাবী, ঈশ্বর

বিশ্বাস ধর্ম্ম-জীবনের ভিত্তি

সত্যসংকল্প হইলে সত্যের জয়ও তেমনই অনিবার্য্য। কিন্তু মুখে আমরা ঈশ্বরকে সত্যসংকল্প, সত্যস্বরূপ বলিলেও সত্যের জয় সম্বন্ধে সেরূপ দৃঢ় আশা পোষণ করিতে পারি না। তাহাতেই বুঝা যায়, যে আমরা শুনা কথা বলি, প্রকৃত বিশ্বাসের ভূমি পাই নাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে একটী সামান্য কাজ করিয়া একটা লালপাগ্ড়ী দেখিলে আমাদের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়, আর সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপাচরণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে খেলিয়া বেড়াই! ইহাতেই বুঝা যায়, যে ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাসের গভীরতা কত! সত্যের রক্ষক ভগবানের নামে একটী সত্য প্রচার করিতে যাইয়া আমরা মানুষের ভয়ে কতই না সঙ্কুচিত হইয়া পড়ি! বিশ্বাসের ক্ষীণতাই এই সঙ্কোচের কারণ। "বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি" মুখে বলিলে হইবে না, সাধন-বলে প্রকৃত বিশ্বাস লাভ করিতে হইবে। যাঁহারা প্রকৃত বিশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা জগতে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন, যে বিশ্বাসীর রক্ষক স্বয়ং ভগবান্। যেখানে প্রকৃত বিশ্বাস সেইখানেই ভগবানের শক্তি। যে হৃদয়ে প্রকৃত বিশ্বাস আছে, সে হৃদয়ের তেজ দুর্দ্দমনীয়। হিন্দু, খৃষ্টীয় ও মুসলমান ধর্ম্মরূপ ত্রিস্রোতের সঙ্গমস্থলে স্রোতের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াও রাজর্ষি রাম মোহন তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া যান নাই কেন? যে বল তাঁহাকে স্বস্থানে স্থির রাখিয়াছিল তাহা কোন্ বল? তাহা কি কোন পার্থিব শক্তি? কখনই নহে। কেননা, অন্যান্য সংস্কারকদের ন্যায় তিনি কোনও বিশেষ দেশ-খণ্ডের সংস্কারের জন্য দণ্ডায়মান হন নাই, যে এক দলের বিপক্ষে অন্য দল তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইবে! রাজা সমুদয় পৃথিবীর সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সমগ্র পৃথিবীই তাঁহার বিপক্ষে, সুতরাং তাঁহার পার্থিব শক্তি কিছুই ছিল না। তথাপিও তিনি অটল গিরির ন্যায় দণ্ডায়মান ছিলেন ক্ষণকালের জন্যও বিচলিত হন নাই। যিনি গাহিয়াছিলেন "যে তোমার আত্মারূপে প্রকাশ সেই ব্যাপ্ত চরাচরে" তিনি কখনও শক্তিহীন হইতে পারেন না। সমস্ত শক্তির উৎস তিনি আত্মার ভিতরে দেখিয়াছিলেন। তিনি শুনা কথা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। কেন না, তিনি আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস প্রত্যক্ষ উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই সকল অবস্থাতেই তিনি অটল ছিলেন।

আত্ম-সাক্ষাৎকার বিশ্বাসের ভিত্তি

আমরা যদি এই স্থির অটল বিশ্বাস পাইতে চাই, তবে আমাদিগকে এই আত্ম-সাক্ষাৎকারের ভূমি খুঁজিয়া লইতে হইবে। প্রকৃত বিশ্বাস লাভ করিবার অন্য উপায় নাই। আত্মানুসন্ধান ব্যতীত এ স্থান লাভ হয় না। আমাকে এমন একটা কিছু খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, যাহার সম্বন্ধে সন্দেহ একেবারে অসম্ভব। শাস্ত্রবাক্যই হউক আর গুরূপদেশই হউক, কিছুই আমাকে সন্দেহের অতীত স্থানে লইয়া যাইতে পারে না। শাস্ত্র বা গুরু, সাধকের পক্ষে যতই কেন প্রয়োজনীয় হউন না এবং ইহা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন, যে সাধনপথে পূর্ব্ববর্ত্তী সাধকগণের অভিজ্ঞতার সাহায্য অপরিহার্য্য, তথাপি এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, যে ঐ অভিজ্ঞতা কখনও অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসী করিতে পারে না। তবে কে আমাকে সন্দেহের অতীত স্থানে লইয়া যাইবে? প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ব্যতীত সে স্থান লাভ হয় না। সুতরাং আমাদিগকে দেখিতে হইবে, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কাহাকে বলে। চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা যে সকল জ্ঞান লাভ করি, তাহা কি প্রত্যক্ষ? কখনই না। কেন না, আমি ও আমার জ্ঞানের মধ্যে ঐ দ্বারগুলির ব্যবধান, সুতরাং প্রত্যক্ষ নহে। আমি চক্ষে ধাঁধা দেখিতে পারি, কর্ণ অনেক সময়ে আমাকে প্রতারণা করে। আজ আমি যে রূপ দেখিয়াছি, যে শব্দ শুনিয়াছি, কাল সে সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ আসিতে পারে। সুতরাং ইহাদের সাহায্যে আমি সন্দেহের অতীত ভূমিতে পৌছিতে পারি না। আবার, অন্তরেন্দ্রিয়-সাহায্যে আমি যে সকল জ্ঞান লাভ করি, তাহার উপরেও কি আমি নির্ভর করিতে পারি? এই জ্ঞানও যে আমাকে নিশ্চিন্ত করিতে পারে, তাহাও তো মনে হয় না। দুই বৎসর পূর্ব্বে যাহা সত্য বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করতঃ বিশ্বাস করিয়াছিলাম, আজ তাহা মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। দুই বৎসর পরে যে আমার এই বর্ত্তমান মত স্থির থাকিবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? দশ বৎসর পূর্ব্বে পৌত্তলিকতায় দৃঢ় আস্থা ছিল, আজ ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেছি। বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্বন্ধে তো এ দু'য়ে কোনই পার্থক্য নাই। তবে আমি ব্রাহ্মধর্ম্মে আমার বিশ্বাসের স্থায়িত্বে নিঃসন্দেহ হইতে পারি কিরূপে? সুতরাং অন্তরেন্দ্রিয়ও আমাকে অটল ভূমি দিতে সমর্থ নহে। তবে উপায় কি? উপায় আত্মানুসন্ধান! উপায় আত্ম-সাক্ষাৎকার! আমার মধ্যে এমন কিছু আছে কিনা যাহা স্থায়ী, অটল। যাহা লাভ করিয়া আমি

মনে করিতে পারি, যে আমি অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছি। যদি থাকে, তবে আত্মানুসন্ধানের দ্বারা সেই বস্তু খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইবে। সকল অনিত্যের মধ্যে সেই নিত্যবস্তু কি? আমার আত্মবস্তু যাহা তাহাই ঐ নিত্যবস্তু। সকল অনিত্যের মধ্যে উহাই একমাত্র নিত্যবস্তু। বাল্য যৌবন জরা সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে উহাই একমাত্র অপরিবর্ত্তনীয় ধ্রুব সত্য। ইহার অপরিবর্ত্তনীয়তা ব্যতীত কোন পরিবর্ত্তনই সম্ভব নহে। সকল পরিবর্ত্তনের অস্তিত্ব উহারই উপর নির্ভর করিতেছে। যখন পৌত্তলিক তখনও যে আত্মবস্তু, যখন ব্রাহ্ম তখনও সেই আত্মবস্তু। পৌত্তলিকতার স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়াছে, পৌত্তলিকতা ব্রাহ্মধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই; হইলে অন্য পরিবর্ত্তন সম্ভব হইত না। যাহার সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন তাহার অপরিবর্ত্তনীয়তা ব্যতীত পরিবর্ত্তনের কোন অর্থই নাই, এবং ইহার অস্তিত্বে কখনও সন্দেহ আসিতে পারে না। ইহার সম্বন্ধে লক্ষ বিষয়ের আবির্ভাব তিরোভাব কল্পনা করিতে পারি, ইহার সম্বন্ধে লক্ষ বিষয়ের অস্তিত্ব অনস্তিত্ব ভাবিতে পারি, কিন্তু ইহার, এই আত্ম-বস্তুর আবির্ভাব তিরোভাব নাই, ইহার অনস্তিত্ব কল্পনাও করা যাইতে পারে না। কল্পনা করিলেও ঐ কল্পনারই মূলে ইহার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত। ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের কোনই সম্ভাবনা নাই। ইহাই একমাত্র সন্দেহাতীত বস্তু। আর দ্বিতীয় বস্তু নাই, যাহার সম্বন্ধে সন্দেহের একান্তাভাব। সুতরাং এই আত্মবস্তুকে যতক্ষণ না উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতেছে, ততক্ষণ বিশ্বাস যতই কেন দৃঢ় বলিয়া মনে হউক না, ভাব-ভক্তির উচ্ছ্বাস যতই কেন প্রবল হউক না, কখনও নিরাপদ ভূমি লাভ হয় নাই। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম", "যে তোমার আত্মারূপে প্রকাশ সেই ব্যাপ্ত চরাচরে," ইহাই উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণের একমাত্র সুদৃঢ় ভিত্তি। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" এদেশের বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদীদিগের কথা এই, যে যতদিন না মানুষ স্বীয় আত্মবস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারে, ততদিন সে কখনও ঈশ্বরাস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহের অতীত হয় না। কেন না, আর কোন বিষয়ের অপরোক্ষানুভূতি নাই। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও বলিতেছেন—"এখন আমি আছি কি না, এ বিষয়ে পাঁচ জনের সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর-বিশ্বাসে সন্দেহ হইতে পারে না। আমার সঙ্গে ঈশ্বর এখন একত্র গাঁথা রহিয়াছেন। ঈশ্বরকে দেখ নাই? আর প্রমাণ

দিতে হবে না। আমাকে দেখিলেই হইবে। এক পদার্থে দুইটী পদার্থ মিলিয়াছে।" (জীবনবেদ)

জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ অজ্ঞানতা-প্রসূত

অন্যদিকে, ধর্ম্মজগতে জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ চিরপ্রসিদ্ধ। ভক্তি ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়াই এই বিরোধ। কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে এই বিরোধের কোনও মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভগবদ্গীতায় এই বিরোধ এক অতি সহজ উপায়ে ভঞ্জন করা হইয়াছে। মনোযোগ সহকারে গীতা পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে অনেক সময় জ্ঞান ও ভক্তি এই দুই নামে একই বস্তুকে বর্ণনা করা হইতেছে এবং উভয়ের প্রাপ্য স্থান একই নির্দ্দেশ করা হইতেছে। সুতরাং "What's in a name, the rose in another name will smell as sweet" এই সিদ্ধান্তানুসারে সকল বিবাদ মিটিয়া যাইতেছে। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞান ও ভক্তিকে এক বস্তু মনে করেন না, তাঁহারাও বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন, যে বিবাদটা নিতান্তই মনগড়া। জ্ঞান ও ভক্তি এক অর্থে আর কিছুই নহে, ধর্ম্ম-বৃক্ষের পুষ্প ও ফল মাত্র। পুষ্পকে উপেক্ষা করিয়া ফল জন্মাইতে পারা যায় না, আর ফলের আশা না করিলে পুষ্পের জন্মই বৃথা। যিনি জ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া ভক্তির পশ্চাতে ছুটিয়াছেন, তিনি আলেয়ার পশ্চাতে ধাবমান, আকাশে গৃহনির্ম্মাণে উদ্যত। আবার যিনি ভক্তিকে উপেক্ষা করিয়া জ্ঞানেই সন্তুষ্ট, তিনি মধ্য মাসে সংক্রান্তি করিতেছেন, তিনি মাঝগঙ্গায় নৌকা ডুবাইতেছেন, তিনি অকাল মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। আত্মার যেখানে যাওয়া উচিত ছিল, তাহাকে সেখানে যাইতে না দিয়া মধ্যপথে তাহাকে গলা টিপিয়া হত্যা করা হইতেছে। তাই দেখি ভক্তি-উপেক্ষাকারী জ্ঞানবৃক্ষ, ভক্তির সরস মৃত্তিকা হইতে বঞ্চিত হইয়া, দাম্ভিকতার তীব্র হলাহল উৎপাদন করিতেছে, আবার জ্ঞান-উপেক্ষাকারী ভক্তিভেলা জ্ঞানের অটল ভূমি না পাইয়া ভাবুকতার বাতাসে কুসংস্কারের গভীর জলে ডুবিয়া যাইতেছে। এমন কি, সময়ে সময়ে দেখা যায়, পরীক্ষা ও প্রলোভনের তাড়নায় একেবারে নাস্তিকতার গভীর 'কালাপাণি'তে নিমজ্জিত হইয়া যাইতেছে। যাঁহারা জ্ঞানের পথ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহাদের জীবন অত্যন্ত সঙ্কট-পূর্ণ। তাঁহারা বিশ্বাসেরই অটল ভিত্তি প্রাপ্ত হন নাই, প্রকৃত ভক্তি কোথায় পাইবেন? তাঁহারা ভাবুকতায় মুগ্ধ হইয়া দুই দিনের জন্য আপনাদিগকে

কৃতার্থ মনে করিতে পারেন, কিন্তু এমন দিন নিশ্চয়ই আসিবে, যে দিন তাঁহাদের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে। যাঁহারা বিশ্বাসের প্রত্যেক বস্তুটিকে সন্দেহের ভূমিকম্পের দ্বারা নাড়িয়া না দেখিয়াছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস অটল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। অর্থাৎ যাঁহারা ধর্ম্মবিজ্ঞানের পথ ধরিয়া ঈশ্বর বিশ্বাসে উপনীত হন নাই, তাঁহাদের ধর্ম্মজীবন যতই কেন উন্নত বলিয়া প্রতিভাত হউক না, সে জীবন-প্রাসাদ যত কেন সৌন্দর্য্যের আকর হউক না, উহার ভিত্তি কাঁচা জমির উপর, উহা যে কোন সময়ে ধূলিসাৎ হইয়া যাইতে পারে। অনুকুল অবস্থায় এ জীবনে সে ঝড় না উঠিতে পারে, কিন্তু একদিন সে ঝড় উঠিবে; তাহা, সহস্র বৎসর পরেই হউক আর লক্ষ বৎসর পরেই হউক, ভিত্তিহীন গৃহকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। যখন দেখি ক্রুশকাষ্ঠে লম্বমান সন্দেহে আকুলিত যীশুর মুখে দেওয়া হইয়াছে, "My God, my God, why hast Thou forsaken me" "হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিলে"? যখন জীবনের শেষ দিনেও চৈতন্য সম্বন্ধে লিখিত হইতেছে—

"যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন, তারে কৈল উদাসীন,
এই মোর অভাগ্য প্রবল ॥
এই মত গৌর রায়, বিষাদে করে হায় হায়,
হা কৃষ্ণ তুমি গেলে কতি।" অ, লী, ১৯ পরি,

—তখন কি করিয়া বলিব যে ব্রহ্মবিজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া, দর্শনের পথ উপেক্ষা করিয়া, "জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার" প্রচার করিয়া মানুষ ধর্ম্মজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে? ভক্তিলাভ ত দূরের কথা! এই বিরহ কি? ভক্তিপন্থিগণ যাহাকে বিচ্ছেদ বা বিরহ বলেন, জ্ঞানমার্গাবলম্বিগণ তাহাকেই সন্দেহ নামে অভিহিত করেন। বস্তু একই, কেবল নাম বিভিন্ন। তাহা কেবল অবস্থার বিভিন্নতার ফল। শুষ্ক জ্ঞানান্বেষণকারীর কথা বলিতে পারি না, কিন্তু যিনি একবার ঈশ্বরোপাসনায় অভ্যস্ত হইয়াছেন, তিনি যদি মধ্য পথে ঈশ্বরকে হারাইয়া ফেলেন, অর্থাৎ তাহার যদি ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও সংশয় উপস্থিত হয় (জ্ঞানের পথে চলিলে যাহা অনিবার্য্য), তাহা হইলে মনের কি অবস্থা হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। মনের সেই সময়কার অবস্থার সঙ্গে, চৈতন্যের বিরহের যে সব বর্ণনা আছে তাহা মিলাইয়া

দেখিলে নিশ্চয়ই প্রতীত হইবে, যে অবস্থা দু'টী এক, কেবল নামের পার্থক্য। উপাসনায় বসিয়া অর্দ্ধ পথে উপাসনা থামিয়া গেল, কাজ করিতে করিতে মনে পড়িল—আমার মধ্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে সংশয় আছে, অমনি শত বৃশ্চিক-দংশনে যেন হৃদয় দষ্ট হইল, সমস্ত পৃথিবী পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এই অবস্থায় হৃদয়ের অন্তস্থল ভেদ করিয়া প্রার্থনা উঠিল, 'হে প্রভো, সংশয়ের বিষাক্ত বাণ হইতে আমায় রক্ষা কর'। ইহা প্রত্যক্ষ ঘটনা—জ্ঞানের ভাষায়, সন্দেহ—ভক্তির ভাষায়, বিরহ। প্রকৃত বিশ্বাস ইহার পরে, জ্ঞানালোকে প্রাপ্তব্য। এই অবস্থায় মন যখন মীমাংসার জন্য ব্যাকুল হয়, তখন ব্রহ্মবিজ্ঞানের শরণাপন্ন না হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। যখন বিজ্ঞান সংশয়িত প্রত্যেক বিষয়ের উপযুক্ত মীমাংসা প্রদান করে, তখন ঝটিকাবিতাড়িত অর্ণবপোত যেমন বন্দরে পৌছিয়া নির্ব্বিঘ্ন হয়, ব্যাধ-বিতাড়িত বিহঙ্গম যেমন কোটরে প্রবেশ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, সংশয়-বিলোড়িত আত্মাও তেমনি বিশ্বাসের অটল ভূমি পাইয়া আশ্বস্ত হয়।

প্রকৃত বিশ্বাস লাভ করিবার দ্বিতীয় পথ নাই, ইহাই একমাত্র পন্থা। যাঁহারা দূর হইতে জ্ঞানকে নমস্কার করিয়াই আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, তাঁহা-দিগকে এই অনুরোধ, যে তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখুন, সাক্ষাৎভাবে জ্ঞানের শরণ না লইলে ধর্ম্ম হয় কি না। এখন আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই—যাঁহারা নবযুগে নবধর্ম্মের আলোক লইয়া লোকের দ্বারে উপনীত হইতেছেন, তাঁহারা যেন "বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি" বলিয়া ক্ষান্ত না হন, অনু-বর্ত্তীদের জন্য বিশ্বাসের অটল ভিত্তি প্রদর্শন করেন। নতুবা আর দশটা ধর্ম্মের যে দশা হইয়াছে, সেই দশায় পতিত হওয়া অনিবার্য্য! দেখা গিয়াছে, ধর্ম্ম-সাধনে দর্শন-বিজ্ঞানকে অগ্রাহ্য করায়, ধর্ম্মভাবের স্রোতে ভাটা পড়িলে সকল ধর্ম্মই বুজরুকিকে (Psycho-physical tricks) ধর্ম্মের আসনে বসাইয়া ও কর্ম্ম-কাণ্ডের আশ্রয় লইয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নামে নাসিকা কুঞ্চন করিলে বা দূর হইতে দর্শনশাস্ত্রকে প্রণাম করিয়াই অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিলে ব্রাহ্মসমাজেও বুজরুকের আবির্ভাব হইবে না, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে না। কত লোক বুজরুকির মোহে ব্রহ্ম-সাধন ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে এই বিপদের সম্ভাবনা ষোল আনাই আছে বলিয়া মনে হয়।

এখন, প্রাকৃত জন হয় তো বলিবেন,—যে সকল বস্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের

দ্বারা দেখি ও গ্রহণ করি, তাহারই স্থির ধারণা আমার আছে। আমার 'আমি'কেও আমি এক রকম জানি। কিন্তু আমার আমি-জ্ঞান আমার এতই অস্পষ্ট, যে যখনই আমি ইহাকে আমার শরীর হইতে পৃথক্ অথচ পৃথক্ নয় বলিয়া জানিতে যাই, তখনই যেন উহা আমার হাত ছাড়া হইয়া যাইতে চায়। তার পর, যখন আমি আমাকে ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সকল যাহা দ্বারা আমি আবেষ্টিত, তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া আর কিছুর ধারণা করিতে চেষ্টা করি—যাহা আমিও নই, এই সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ও নয়, অথচ কোন রকমে হয়তো এই উভয়েরই আদি অন্ত উহারই মধ্যে—তখন যেন মনে হয়, আমি আমার জ্ঞান-বিশ্বাসের বাস্তব ভিত্তি ছাড়িয়া স্বপ্নরাজ্যের দিকে পা বাড়াইতেছি।

কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া দিবেন, আমি যে সকল বাহ্য বিষয়ের দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছি, তাহাদের সম্বন্ধে আমার ভ্রান্তি উৎপন্ন হইতে পারে এবং সতত তাহা হইতেছেও। তাহাদের সম্বন্ধে বড় জোর এই কথা বলিতে পারা যায়, যে তাহারা এই আছে, এই নাই। কিন্তু আমার আত্মা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান ও ধারণা স্থিরতর ও উজ্জ্বলতর। কেন না, আমার যাহা কিছুর জ্ঞান আছে বা অনুভূতি আছে, সে সকলই ইহার সঙ্গে অনুস্যূত। আবার, আমার যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শকে আমি দেশ কালের অতীত না ভাবিয়া থাকিতে পারি না, তাহাও এই আত্মার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। অথচ যখন আমি আমার চিন্তা ও ভাব-পরম্পরার সহজ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করি এবং আমার দৈহিক জীবনের সসীমতার কথা ভাবি, তখন এই আত্মাও যেন আমার হাত ছাড়া হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই বস্তুর নিত্যতা ও চিরবিদ্যমানতা সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত আছি, যাঁহার মধ্যে আন্তর ও বাহ্য সকল পরিবর্ত্তন একীভূত হইয়া চির-আশ্রয় লাভ করিয়াছে। তিনিই সকল বিষয় ও বিষয়ীর প্রতিষ্ঠা-ভূমি—"প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী।" "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।" আর সব আমার হস্তচ্যুত হইতে পারে, ঈশ্বর সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত—"নাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাম্।"

ভগবদ্বাণী শুনুন—"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।

আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্তো একভক্তির্বিশিষ্যতে।" গীতা, ৭।১৬-১৭,

"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥" ঐ, ৯।৩১

ভক্তি ব্রহ্মজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। তাহা না হইলে ভক্তি হয় ভাবুকতার নামান্তর, সুতরাং তাহা মানুষকে বিপথে লইয়া যায়। আমরা প্রকৃত ভক্তির দিঙ্‌নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব। যদি এই গ্রন্থ এক জনেরও পথে ব্রহ্মজ্ঞানের বর্ত্তিকা লইয়া দাঁড়াইতে পারে, এক জনেরও সাধনপথের সহায় হইতে পারে, তবে সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করা যাইবে।

সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ২।২

দ্বিতীয় অধ্যায়।

উপক্রম

তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। কঠ, ২।৩।১

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা মানব অন্তরে কতকাল হইল কোন্ সময়ে এবং মানবজ্ঞানের কোন্ অবস্থায় আবির্ভূত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মানবজাতি যখন পশুত্ব অতিক্রম করতঃ মনুষ্যত্বের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া অনুভবপরম্পরা হইতে স্বীয় আত্মাকে পৃথক্‌রূপে জানিতে পারিয়াছিল, বিষয় হইতে বিষয়ীকে বিভিন্ন করিয়া বুঝিয়াছিল, তখন মানবাত্মার বিকাশের পক্ষে এক মহাদিন হইলেও তখনও যে তাহার মনে কোনও জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না। জিজ্ঞাসা সন্দেহাত্মিকা। স্বীয় জ্ঞানের সীমাদর্শন ব্যতীত সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না। যতক্ষণ সন্দেহ নাই, ততক্ষণ জিজ্ঞাসাও আসে না। সেই জন্য আদিম অবস্থায়, যখন তাহার দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল ছিল, গতি ও কার্য্যশীল বস্তুমাত্রই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীব বলিয়া তাহার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল, প্রত্যেক বস্তুই কর্ত্তৃত্বশক্তিসম্পন্ন বলিয়া বোধ হইয়াছিল—কার্য্যের কারণ সম্মুখেই বর্ত্তমান ছিল—তখন জ্ঞান প্রতিহত হয় নাই, কারণানুসন্ধানেরও প্রয়োজন ছিল না—সুতরাং জিজ্ঞাসাও উপস্থিত হয় নাই। বায়ু, অগ্নি সকলেই

দেহাত্মবুদ্ধি

জীবন্ত ও স্ব-ইচ্ছায় পরিচালিত! দেহই এখন জীবন্ত, দেহই এখন আত্মা। এখনও দেহ ও আত্মার পার্থক্য জ্ঞান হয় নাই। এ পার্থক্যজ্ঞান সহজে আসে না, দেহ পরিচালনায় যখন ইচ্ছা প্রতিহত হয়, তখনই এ জ্ঞান উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু দেহাত্মবুদ্ধির সম্পূর্ণ বিনাশ হইতে অনেক যুগ কাটিয়া যায়। ব্যক্তিবিশেষ বা জাতিবিশেষ বা সমগ্র মানবজাতি—সকলের পক্ষেই একই কথা, সকলকেই এই একই নিয়মের মধ্য দিয়া আসিতে হয়। মানবের যখন দেহাত্ম-বুদ্ধির ধ্বংশ হইল, মানব যখন আত্মাকে দেহাতিরিক্ত কিন্তু দেহযুক্ত বলিয়া বুঝিল, তখন জল স্থল শূন্য দেহাভিমানী দেবতায় পূর্ণ হইয়া গেল। আত্মা পরিচালক, দেহ তখন পরিচালিত। অগ্নিতে, বায়ুতে বিভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বীকৃত হইল। অগ্নি এখন দেহ-যন্ত্র, দেবতা ভিতরে, তিনি যন্ত্রী, চালক। আপনার ভিতরে পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বহির্জ্জগতে এই মহা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। ইহা যে কোনও স্পষ্ট যুক্তিপরম্পরার ফল, তাহা নহে। শিশু যেমন সকল বস্তুই স্বীয় ভাবে অনুরঞ্জিত করিয়া দেখে, সকল বস্তুকে আপনারই মত গুণবিশিষ্ট বলিয়া মনে করে—স্বভাবতঃ এবং সহজেই সে এরূপ করে, শৈশবে মানবজাতিও তাহাই করিয়াছিল, নিঃসঙ্কোচে স্বীয় ভাব জগতে আরোপ করিয়াছিল. তাহার মনে কোনও যুক্তিতর্ক উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং এখানেও কোন্ সন্দেহ নাই। দৃশ্যের অন্তরালে অদৃশ্যকে খুঁজিবার কোনও ভাব নাই, সে আপনাতে আপনি পরিতৃপ্ত, প্রত্যক্ষ লইয়াই সন্তুষ্ট—উহাতেই তাঁহার জ্ঞান ও চিন্তা পর্য্যবসিত। অতিরিক্ত কিছুর আকাঙ্ক্ষা তাহার জন্মে নাই বা জন্মিবার অবসর পায় নাই।

কিন্তু যখন জড়বস্তুর জ্ঞান পরিস্ফুট হইল, যখন মানব দেখিল সকলই আত্মশক্তিসম্পন্ন বা ইচ্ছাশালী নহে, সকল দেহই আত্মাসম্পন্ন নহে, তখন তাহার পূর্ব্বসংস্কার পদে পদে বাধা পাইতে লাগিল। বাহ্য জগতে সকল কার্য্যের সম্যক্ মীমাংসা না পাইয়া মানব সৃষ্টির অন্তরালে মীমাংসা খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইল।

মানবচিন্তা গতিশীল

আবার স্বীয় অন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া সে যখন দেখিল, যে তাহার নিজের মধ্যেই সকল কার্য্য স্বীয় ইচ্ছানুসারে সম্পন্ন হইতেছে না, আরও বুঝিল যে তাহার শক্তি সকল কাজ করিতে পারে না, বা তাহার জ্ঞান সকল মীমাংসায় সমর্থ নহে, তখনই তাহার প্রথম জিজ্ঞাসার আবির্ভাব-কাল বলিয়া মনে হয়। মানব তখন জ্ঞাত রাজ্যকে অতিক্রম করিয়া অজ্ঞাত

রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই যে দৃশ্যকে পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্যের অনুসন্ধান, এই যে কার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া কারণের পশ্চাদ্ধাবন, ইহাকেই আমি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নামে অভিহিত করিতেছি। অন্ততঃ এই খানেই জিজ্ঞাসার সূত্রপাত। ইহা যত কেন স্থূল হউক না, ইহাই মানবের পরিণত ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথম সোপান। এই কারণানুসন্ধানই ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তি এবং এই অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তিতেই মানবের মানবত্ব। ব্রহ্মজ্ঞান এই অনুসন্ধানেরই ফল। কিন্তু ব্রহ্মপরিচয়েই, ব্রহ্মদর্শনেই মানবজ্ঞান শান্ত হয় নাই। ব্রহ্ম অনন্ত ও অপার, মানবজ্ঞান তাঁহাকে কখনও শেষ করিয়া ফেলিতে পারে না। মানব যতই অগ্রসর হয়, ততই সে রহস্য হইতে গভীরতর রহস্যপূর্ণ রাজ্যে প্রবেশ করে। কেহ এক দিক্ দেখে, কেহ অন্যদিক্ দেখে, কেহ বা কোনও বিশেষ তত্ত্বে এমন ভাবে মজিয়া যায়, যে সব দিক্ দেখিবার শক্তি তৎকালের জন্য হারাইয়া ফেলে এবং অন্ধগণের হস্তিদর্শনের ন্যায় পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং মানব যখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিল, তাহার চিন্তা তখনও বিশ্রাম লাভ করিল না। মানব-চিন্তা বিভিন্ন দিক্ অবলম্বন করিয়া নানা স্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল, নব নব তত্ত্ব তাহার নিকট উদ্ঘাটিত হইতে লাগিল। চিন্তার স্বভাবই এই, যে সে কখনও এক স্থানে বসিয়া থাকে না, সর্ব্বদাই অগ্রসর হইতেছে ও পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতেছে। যে জাতি বা ব্যক্তির চিন্তাস্রোত থামিয়াছে সে জাতি বা ব্যক্তিকে জীবিত বলা যাইতে পারে না। যেখানে নব ভাবের বিকাশ থামিল, সেখানে মানব মনের ক্রিয়াও থামিল। চিন্তারাজ্য জলস্রোতের ন্যায় তরঙ্গায়িত। এই স্রোত অবশ্যম্ভাবী রূপে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এমন কি, একই সময়ে দুইটি প্রবাহ ঠিক বিপরীত পন্থা অবলম্বন করিয়া একেবারে বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে ভারতের সাঙ্খ্য ও বেদান্ত প্রবাহের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।" কত মুনি কত সময়ে ভীষণ আবর্ত্ত তুলিয়া এই চিন্তা-জলধিকে আকুলিত করিয়াছেন। ইহাই মানবমনের জীবনের লক্ষণ। যিনি নূতন তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন প্রাচীন ভারত তাঁহাকেই "মুনি" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যখনই কোনও জাতি জীবনের এই লক্ষণ ভুলিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া পড়িয়াছে, তখনই তাহার জীবনের অবসান হইয়াছে। অতীতের দিকে দৃষ্টিপাতে জীবন নয়, কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হওয়াতে, নূতন তত্ত্বের

আবিষ্কারেই জীবন। জীবনের এই লক্ষণ। ভুলিলে আধ্যাত্মিক মৃত্যু অনিবার্য্য।

মানব আদিম অবস্থায় সকলই আত্মানুরূপ করিয়া কল্পনা করিয়াছিল। প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাসে দেখিতে পাই, সেখানে কোন কোন পণ্ডিত বস্তুর আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের কারণরূপে বস্তু সকলের রাগ ও দ্বেষকে নির্দ্দেশ করিতেছেন। তাঁহাদের নিকট জড়ের কার্য্যশীলতা নাই। আমাদের দেশেও দেখিতে পাই, ঋষিগণ কি জড়, কি চেতন সকলেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করিতেছেন, নতুবা জড়জগতের কার্য্য ব্যাখ্যাত হয় না। আত্মা ছাড়া কাহারও কার্য্যশক্তি তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। বর্ত্তমান যুগের চিন্তা কোন কোন স্থানে কিন্তু ঠিক বিপরীত মার্গগামী। এখন এক শ্রেণীর পণ্ডিত জড় হইতে চেতনের উৎপত্তির প্রণালী আবিষ্কারে মনোনিবিষ্ট। সে যাহাই হউক, চিন্তা বিভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হইয়া মানবাত্মার নিকট শত শত সিদ্ধান্ত আনিয়া উপনীত করিল। মানব হৃদয় তখন নানা সন্দেহে আন্দোলিত হইতে লাগিল। এই আলোড়নে পতিত হইয়াই হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে প্রশ্ন উত্থিত হইল :—

আত্মবস্তুই কারণ

"কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্॥
কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্?"

শ্বেতাশ্বতর, ১।১-২

ব্রহ্ম কি কারণ? আমরা কোথা হইতে জন্মিয়াছি? কি হেতু জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হইতেছি? কোথায় থাকি? হে ব্রহ্মবিদ্গণ, কি হেতুতে আমরা সুখ দুঃখ বিষয়ে ব্যবস্থাকরতঃ বর্ত্তমান থাকি? কাল, পদার্থসমূহের স্বভাব, নিয়তি, আকস্মিক ঘটনা, ভূতসমূহ অথবা পুরুষ কি কারণরূপে চিন্তনীয়?

এই প্রশ্নধারায়, চিন্তারাজ্য যে কত জটিল, মানবমনের গতি যে কত বিশাল তাহার বেশ আভাস পাইতেছি। এখানে বহু মতের অবতারণা হইয়াছে। এই মতদ্বন্দ্বে আত্মা যখন নিপীড়িত, তখন ঋষি মীমাংসা করিলেন ;—

সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মাভাবাদাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ॥
তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥

শ্বেতাশ্বতরঃ, ১।২-৩

ইহাদের সংযোগও কারণ নহে, কেননা, সংযোগ আত্ম-সাপেক্ষ এবং জীবাত্মাও সুখদুঃখের অধীন বলিয়া সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে অসমর্থ।

ধ্যানযোগপরায়ণ ঋষিগণ স্বগুণসমূহ দ্বারা প্রচ্ছন্ন দেবাত্মশক্তি দর্শন করিয়াছেন। সেই অদ্বিতীয় দেবতা কাল ও আত্মা সম্বলিত স্বভাব প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত সমুদায় (গৌণ) কারণ সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন।

এই মীমাংসায় ঋষির গভীর আত্মদৃষ্টির ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তির যে পরিচয় পাওয়া গেল, তাহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। কিন্তু সকলের মীমাংসা এক হইল না, যেহেতু সকলের আত্মদৃষ্টি সমান নয়। কেহ কেহ কাল ও স্বভাব প্রভৃতিকেই কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ"র ধ্বনি উত্থিত হইল। কিন্তু এ ধ্বনি অনেকক্ষণ স্থায়ী হইল না। অনতিক্রমণীয় ব্রহ্মজ্ঞান আবার আসিয়া উপনীত হইল—তদু নাত্যেতি কশ্চন। ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কিন্তু ইতিহাস অনুসরণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। অধ্যাত্মবিদ্যার সাহায্যে ঈশ্বরবিশ্বাসের অনতিক্রমণীয়তা প্রতিপন্ন করাই আমাদের অভিপ্রায়। সেই উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে সর্ব্বপ্রধান বিঘ্ন বর্ত্তমান অজ্ঞেয়-বাদ। কেন না, স্পষ্ট নাস্তিক্যবাদ এখন দর্শন জগতে বিদ্যমান নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সুতরাং প্রথমে এই মতের নিরসন করিয়া, আমরা আমাদের পথ পরিষ্কার করিব।

তৃতীয় অধ্যায়

অজ্ঞেয়বাদ-তত্ত্ব

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। কেন, ৷৫

মানবচিন্তা এক স্থানে বসিয়া থাকে না। প্রাচীন কালের ঋষিগণ যে স্থানে কেবল একমাত্র আত্মাই দেখিয়াছিলেন, বর্ত্তমান পণ্ডিতগণের কেহ কেহ সেখানে জড় ও জড়ীয় নিয়ম ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। তাঁহারা জড়ের আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণেও আত্মা দেখিয়াছিলেন, ইঁহারা আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও জড়শক্তি দেখিতেছেন। চিন্তাস্রোতের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! কিন্তু এই পরিবর্ত্তনেও আবর্ত্তন আসিয়াছে। জড়বাদ ও আত্মবাদের সামঞ্জস্যের চেষ্টা হইতেছে। মানবচিন্তা এখন এই সম্মিলন-ভূমির দিকে ধাবিত। এই সম্মিলন-ভূমিই ব্রহ্ম। কিন্তু ইহার স্বরূপ ও জ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ রহিয়াছে। অজ্ঞেয়বাদ

জ্ঞানের প্রকৃতি

ও ব্রহ্মবাদের প্রভেদ, ইঁহার সত্তা ও স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়াই ঘটিয়াছে। যাঁহারা বলেন ব্রহ্ম জ্ঞেয়, তাঁহারা ব্রহ্মবাদী। আর যাঁহারা বলেন অজ্ঞেয়, তাঁহারা অজ্ঞেয়বাদী। এই শেষোক্তদিগের মধ্যেও মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, কেবলমাত্র তাঁহার সত্তাই জ্ঞেয়, স্বরূপ অজ্ঞেয়; কেহ বলেন তাঁহার সত্তাও আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের গোচর নহে, আমাদের জ্ঞানের নিকট তাঁহার সত্তাও শূন্যমাত্র।

আমরা এখন ইঁহাদের যুক্তিপ্রণালীর অনুসরণ করিয়া দেখি এই মতের মধ্যে কিছু সত্য আছে কিনা? ইঁহাদের ভ্রান্তি নিরসনের দ্বারাই আমাদের গন্তব্য পথ পরিষ্কৃত হইবে। কিন্তু অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই, ঘর হইতে পা বাড়াইতে না বাড়াইতেই প্রশ্ন উপস্থিত—তুমি যে অগ্রসর হইতে পার, ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা করিবার শক্তি যে তোমার আছে, তাহার প্রমাণ কি? তাহা প্রমাণ না করিয়া তুমি যদি আলোচনায় প্রবৃত্ত হও, তোমার অধিকার নিরূপণ না করিয়া তুমি যদি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, তবে তাহা যে সম্পূর্ণরূপে অনধিকারচর্চ্চা হইবে না, তাহা কে বলিল? ব্রহ্মের স্বরূপ জানা যায় কিনা তাহা নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে মানবজ্ঞান কতদূর যাইতে সক্ষম, তাহার অধিকার কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহাই নির্দ্ধারণ কর। আগে দেখাও ব্রহ্মতত্ত্ব মানবজ্ঞানের অতীত বস্তু নহে, তাহার পর ব্রহ্ম বিষয়ে কোন স্থির মীমাংসায় উপনীত হইবার প্রয়াস করিবে। নতুবা সব চেষ্টা, সব পরিশ্রম, ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় বিফল হইয়া যাইবে।

ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনার অধিকার

হঠাৎ প্রশ্নটি শুনিলে একটু থতমত খাইয়া যাইতে হয়। মনে হয়, প্রশ্নটির বুঝি কিছু সারবত্তা আছে; মনে হয়, ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনার পথে বুঝি একটা প্রকাণ্ড বিঘ্ন মস্তকোত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহাকে অতিক্রম না করিলে বুঝি আর অগ্রসর হইবার উপায় নাই, এবং ইহাকে অতিক্রম করাটা বুঝি একটা সহজসাধ্য ব্যাপারও নহে। কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, যে বিষয়টি যত গুরুতর বলিয়া মনে হইয়াছিল, বস্তুতঃ তাহা নহে। ইহা একটা ধোঁকা মাত্র।

এ প্রশ্নের উত্তরে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই,—মানবজ্ঞানের শক্তি কি, ইহার অধিকার কতদূর, তাহা কে নির্ণয় করিবে? যাহার শক্তি ও অধিকারকে খর্ব্ব করিতে চাহিতেছ, সেই মানবজ্ঞানই কি নির্ণয়কর্ত্তা নহে? যদি কোন

আপ্ত বাক্যের দোহাই দিয়া বল, যে ব্রহ্মতত্ত্ব-নির্ণয়ে জ্ঞান অক্ষম, তবেও জ্ঞানই এই দাবীর বলাবল পরীক্ষা করিবে; আর, যদি অক্ষমতার কোনও কারণ প্রদর্শন কর, তবে জ্ঞানই সে কারণ সমূহের সত্যাসত্য বিচার করিবে। সুতরাং প্রশ্ন উঠিবে, এই শেষোক্ত বিচারেও জ্ঞানের অধিকার আছে কি না? তাহা হইলেই এই দাঁড়াইল, যে যদি জ্ঞানের শক্তি ও অধিকার নির্ণয় করিতে চাও, তবে তাহার যে আত্মশক্তি পরিমাণ করিবার সামর্থ্য আছে তাহা স্বীকার কর। তবেই সব বিবাদ চুকিয়া গেল। জ্ঞানকে তাহার বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কখনও বিচার করা সম্ভব নহে। যদি জ্ঞানকে তাহার আত্ম-শক্তি নিরূপণের ক্ষমতা দাও, তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, যে সে স্বীয় বিষয় সমূহের বিচারে, সে যে কোন বিষয়ের খবর রাখে তৎসমুদায়েরই আলোচনায় সমর্থ। কেন না, সে বিষয়ের বিচার না করিয়া আত্মবিচারে অক্ষম। যদি তাহাকে কোনও একটী বিশেষ বিষয়ের বিচার হইতে বঞ্চিত করিতে চাও তবে সেই বিষয়ের বিচারের পরেই তাহা করিতে পার (যদি এরূপ করা অসঙ্গতি-দোষ-দুষ্ট না হয়)। সুতরাং জ্ঞানের শক্তি নির্ণয় করিতে গেলে জ্ঞানের বিষয় সমূহেরই বিচারে সর্ব্বাগ্রে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কাজেই ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানের অবিষয় হইতে পারে না। ব্রহ্মতত্ত্ব আমাদের আলোচ্য ও বিচার্য্য—"অথ নু মীমাংস্যমেব তে।" কেন, ৩।২।১

সসীম ও অসীম।

ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ে আলোচনা করিয়া যাঁহারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, যে মানবের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব নহে, তাঁহাদের যুক্তিপ্রণালী সাধারণতঃ এই:—মানবমনের গঠনই এইরূপ, যে ইহাকে কিছু জানিতে হইলে এ আপনার জ্ঞানের বিষয়কে সীমাবদ্ধ ও অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে সম্বদ্ধ বলিয়া জানিবে। ইহার পক্ষে চিন্তা করা ও চিন্তার বিষয়কে সীমাবদ্ধ করা একই। কেন না, একটী বিষয়কে জানিতে হইলেই ইহাকে অন্য বিষয়সমূহ হইতে পৃথক করিয়া জানিতে হইবে। এই ভেদজ্ঞান, এই পার্থক্যবোধ ব্যতীত জ্ঞান সম্ভব নহে। সুতরাং মানব মন যাহা জানে, যে সকল বিষয় মানবজ্ঞানের নিকট উপনীত হয়, তৎসমুদায়ই পরস্পরের সম্বন্ধে সীমাবদ্ধ হইয়া যায়,—সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া পড়ে। আর কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ তো থাকিবেই, এ সম্বন্ধকে পরিহার করিবার যখন উপায় নাই, তখন জ্ঞানের বিষয়ের পক্ষে সসীম ও সম্বদ্ধ হওয়া অনিবার্য্য। বস্তু গুণযুক্ত না হইলে

যখন তাহাকে অন্য বস্তু হইতে পৃথক্ করা যায় না, তখন মানবজ্ঞানের বিষয় সগুণ ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। পাখী যে আকাশে উড়ে, সেই আকাশকে অতিক্রম করিয়া বিচরণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব; সে যত উর্দ্ধেই কেন উঠিয়া যাউক না, সে যেমন আকাশের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য, সেইরূপ মানব মনের বিষয় যত কেন সূক্ষ্ম হউক না, সে আপনার জ্ঞানের সীমারেখাকে অতিক্রম করিয়া কিছুই জানিতে পারে না। জ্ঞানের প্রক্রিয়ার ভিতরেই এই বন্ধন রহিয়াছে, জ্ঞান হইতে হইলেই এই বন্ধন আসিয়া পড়িবে। মানুষের পক্ষে তাহার ছায়াকে লঙ্ঘন করা যেমন অসম্ভব, জ্ঞানের পক্ষে এই বদ্ধভাবকে পরিহার করাও তেমনি অসম্ভব। সুতরাং মানবের পক্ষে সান্ত, সসীম ও সগুণের জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই সম্ভব নহে। মানবজ্ঞানের নিকট অনন্ত, অসীম ও নির্গুণ কিছুই নহে, শূন্য মাত্র। বস্তুর অভাব-প্রকাশক শব্দমাত্র। ইহারা কোনও বস্তুর জ্ঞান প্রকাশ করে না, কেবল অভাব জ্ঞাপন করে মাত্র। এই যে 'সসীম' ও 'অসীম' প্রভৃতি বিপরীতার্থ-বোধক যুগ্ম শব্দ সকল দেখা যাইতেছে, ইহারা উভয়েই বস্তু নহে; ইহাদের একটী বস্তু, অন্যটী অবস্তু, অভাব মাত্র। জ্ঞানের পক্ষে অসীম, অনন্ত ও নির্গুণের কোনও সত্তাই নাই। ব্রহ্ম যখন অসীম, অনন্ত ও নির্গুণ তখন মানবজ্ঞানের সঙ্গে তাঁহার কোনই সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। মানব জ্ঞান কেবল সগুণকে (Phenomenon) লইয়াই কার্য্য করিতে পারে. নির্গুণ (Noumenon) তাহার জ্ঞানের সীমার সম্পূর্ণ বহির্দ্দেশে অবস্থিত। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান মানবের পক্ষে অসম্ভব। তাহার জ্ঞানের প্রকৃতিই তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে বঞ্চিত করিতেছে।

আমরা এখন দেখিব, পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে কি সারবত্তা আছে। এই যে 'সসীম' 'অসীম' প্রভৃতি বিপরীতার্থ-বোধক যুগ্ম শব্দ সকলের একটীকে অবস্তু বলা হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত অযৌক্তিক। সব স্থলে উহা সত্য নহে। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক্। "সমান" ও "অসমান" ইহারা ঐরূপ যুগ্ম শব্দ। কিন্তু তাই বলিয়া কি 'অসমান' অবস্তু? সমতার অভাব বটে, কিন্তু অবস্তু নহে। 'এই দুইটি সরল রেখা অসমান' এ কথা বলিলে কি আমাদের মনে কোন বস্তুর ধারণা থাকে না? রেখা দুটি "অসমান" বলিলে যদি উহাদিগকে অবস্তু করিয়া দেওয়া হয়, তবে উহাদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইবে। রেখা দু'টি "সমান" বলিলেও সত্তা-জ্ঞান যেমন প্রবল থাকে, "অসমান" বলিলেও

তেমনি থাকে, কোনই ন্যূনাতিরেক হয় না। বিশেষতঃ বিপরীতার্থ-বোধক ভাব সকল কেবল পরস্পরের সম্বন্ধেই জ্ঞাত হইতে পারে। পরস্পরের তুলনা না করিয়া একটিকেও জানিতে পারি না। সুতরাং যদি অসীম নির্গুণ আমাদের নিকট শূন্য মাত্রই হয়, তবে সসীম সগুণও শূন্যমাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে, অসীমকে উড়াইতে যাইয়া বাধ্য হইয়া সসীমকেও উড়াইয়া দিতে হইবে। জ্ঞানমাত্রই অসম্ভব হইবে। এখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে জ্ঞান হইতে হইলেই "সসীম" ও 'অসীম" দুইএরই জ্ঞান অপরিহার্য্য। একটিকে ছাড়িয়া অন্যটি সম্ভব হয় না। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল 'আমাদের জ্ঞান-প্রক্রিয়া অসীমের জ্ঞানকে পরিহার করিতেছে,' এই যে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। বরং ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইতেছে, যে অসীমের জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞানই সম্ভব নহে। আমাদের জ্ঞানের প্রকৃতিই এই, যে, সে অসীমকে জানিবে।

এখানে হঠাৎ একটা খট্‌কা লাগিতে পারে। আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান তো সসীম। সুতরাং অসীম সে জ্ঞানের বিষয় হইবেন কিরূপে? এ কথার বিস্তৃত উত্তর এস্থানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। এখানে এই মাত্র বলিয়া রাখি, যে, যে জ্ঞানে আমরা বিষয়-জগৎকে জানি, তাহা কোনও সান্ত সসীম বস্তু নহে। আমাদের জ্ঞান সেই অসীম জ্ঞানেরই প্রকাশ, সেই নিত্য জ্ঞান-বস্তু স্বয়ং যাঁহার মধ্যে জগৎ চির দিন বিধৃত রহিয়াছে। নতুবা অসীম আমাদের জ্ঞানের বিষয়ই হইতে পারিতেন না। আমরা যখন ব্রহ্মজ্ঞানের পথে যে সকল কণ্টক আছে তাহা বিদূরিত করিয়া প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশ করিব এবং ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা করিব, সেই সময়ে সেই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। এখন আবার প্রকৃত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

আমরা দেখিয়াছি, অসীমকে ছাড়িয়া সসীমের জ্ঞান সম্ভব নহে। অসীমকে ছাড়িয়া দিলে সসীমকেও ছাড়িয়া দিতে হয়, জ্ঞানমাত্রই বিলুপ্ত হয়। এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য স্পেন্সার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ "সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে" এইরূপ একটী উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। স্পেন্সার বলেন, অসীম আমাদের নিকট কেবল শূন্যমাত্র হইতে পারেন না, কেন না, তাহা হইলে চিন্তার মূল ভিত্তিই উৎপাটিত হইবে, জ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। অসীমের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট জ্ঞান থাকা চাই। জগদতীত এক মহাশক্তি

বিদ্যমান রহিয়াছেন, এই জগৎ তাঁহার প্রকাশ। ইহার সত্তার জ্ঞান আমাদের মধ্যে উজ্জ্বলরূপে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু এই সত্তা পর্য্যন্তই আমাদের জ্ঞানের গতি। আমরা তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার সত্তাতিরিক্ত আর কিছু বলিতে পারি না। তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের কোনরূপ স্পষ্ট ধারণা হইতে পারে না। তাঁহার স্বরূপ অজ্ঞেয়। কেন না, তাঁহাকে জানিতে গেলেই, তিনি সীমাবদ্ধ ও বস্তু-জগতের অন্তর্গত হইয়া পড়িবেন, কিন্তু তাহা অসম্ভব! পণ্ডিতপ্রবর এখানে "ধরি মাছ, না ছুঁই পানি" এই লৌকিক ন্যায়ের অনুসরণ করিয়াছেন। স্পেন্‌সার এক মুখে দুই কথাই বলিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, মানবজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে সসীমেই আবদ্ধ, এই বন্ধন হইতে সে মুক্ত হইতে পারে না! আবার বলিতেছেন, যে অসীমের সত্তাজ্ঞান তাহার মধ্যে উজ্জ্বলরূপে বর্ত্তমান। এই দুই মত কখনও একত্রিত হইতে পারে না। যাহার কোন সামঞ্জস্য নাই তাহা তিনি একত্রিত করিলেন কেন? স্পেন্‌সার দায়ে পড়িয়া এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এক দিকে যেমন তিনি জ্ঞানের প্রকৃতি ও প্রক্রিয়া আলোচনা করিয়া দেখিতে পাইয়াছেন, অসীমকে ছাড়িয়া সসীমের জ্ঞান হয় না; 'মানবজ্ঞান সসীমেই আবদ্ধ' এই কথার কোনই অর্থ থাকে না, যদি আমার মধ্যে একটী অসীম বস্তু বর্ত্তমান না থাকে যাহার তুলনায় আমি সীমাকে সীমা বলিয়া বুঝিতে সক্ষম হইতেছি, যে আলোক সীমাকে সীমা বলিয়া দেখাইয়া দিতেছে। তোমার জ্ঞান যদি কেবল সগুণেই আবদ্ধ থাকিত, তাহাকে অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিয়া নির্গুণকে জানা যদি একেবারে অসম্ভব হইত, তাহা হইলে সগুণকেও সগুণ বলিয়া বুঝিতে পারিতে না। তাহা হইলে কখনই বলিতে পারিতে না, যে আমি সগুণ ছাড়া আর কিছু জানি না। নির্গুণ তোমার জ্ঞানের নিকট প্রকাশিত না থাকিলে তুমি সগুণকেও জানিতে পারিতে না। তাই তিনি অসীম অনন্ত জগদতীত সত্তাজ্ঞানকে জ্ঞানের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অন্য দিকে আবার তিনি "মানবজ্ঞান কেবলমাত্র সসীমেই আবদ্ধ" এই মতও পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। স্পেন্‌সার সত্তাজ্ঞানকে জ্ঞান (Knowledge) বলিতে অসম্মত। তাই তাঁহার মত-সঙ্কট ঘটিয়া গিয়াছে। তিনি 'মানবজ্ঞান সসীমে আবদ্ধ' এই মতের অনুরোধে অসীমের জ্ঞানকে অস্বীকার করিতেছেন, আবার তেমনই ঐ সীমাজ্ঞানকে সম্ভব করিবার জন্য অজ্ঞেয় অসীমকে কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞেয় রাজ্যের ভিতরে

স্পেন্‌সারের অসঙ্গতি

টানিয়া আনিয়াছেন। যাহার জ্ঞান নাই সে কখনও বুঝিতে পারে না যে সে অজ্ঞান। জ্ঞানালোক সাহায্যেই অজ্ঞানতা বুঝা যাইতে পারে। পাগল কখনও বুঝিতে পারে না যে সে পাগল। পশুরা অজ্ঞ। শুধু তাহাই নহে; তাহারা আপনাদের অজ্ঞতা বিষয়েও অজ্ঞ। জ্ঞানবান্ জীব মানুষই বুঝিতে পারে যে পশুরা অজ্ঞ। সুতরাং আমাদের জ্ঞান যদি কেবলমাত্র সসীমেই আবদ্ধ হইত, তাহা হইলে আমরা আমাদের জ্ঞানের এই সীমা কখনও জানিতে পারিতাম না। ইহা জানিতে উচ্চতর জ্ঞানের প্রয়োজন হইত। সম্পূর্ণরূপে সীমায় আবদ্ধ হওয়া এবং সেই সীমা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হওয়া একই জ্ঞানের পক্ষে সম্ভব নহে। যে জ্ঞানে সীমা-জ্ঞান রহিয়াছে, সে জ্ঞান কখনও সম্পূর্ণরূপে সীমায় আবদ্ধ নহে। সীমাজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সে সীমাকে অতিক্রম করিতেছে। যদি স্পেন্সারের মত গ্রহণ করিতে হয়, তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, যে মানবজ্ঞান যে কেবল সসীমে আবদ্ধ, তাহা নহে; কিন্তু উহা যে ঐরূপে সীমাবদ্ধ সে জ্ঞানও তাহার নাই। স্পেন্সার অবশ্য উহা স্বীকার করিবেন না, কেননা, উহা প্রতিপাদন করিবার জন্য তিনি এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে, যে মানবজ্ঞান কেবলমাত্র সসীমে আবদ্ধ নহে। তাহার মধ্যে অসীমের জ্ঞানও রহিয়াছে।

আসল কথা এই, হয় ব্রহ্মজ্ঞান পূর্ণরূপে স্বীকার কর, না হয় "মানবজ্ঞান সসীমের উপরে উঠিতে পারে না" বলিয়া একেবারে তাঁহার সহিত সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ কর। শ্যাম ও কুল দুই রাখিবার চেষ্টা বৃথা। ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই। মাঝামাঝি কোন পথ নাই। মধ্যমাসে কখনও সংক্রান্তি হয় না। বস্তুতঃ স্পেন্সারের মত অনুসরণ করিলে "অসীম আছেন কিন্তু তাঁহাকে জানা যায় না" এই সিদ্ধান্তে না পৌছিয়া "অসীম বলিয়া কিছু নাই" এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হইবে। যদিও শেষোক্ত উক্তিটিও স্ববিরোধ-দোষ-বর্জ্জিত নহে। সসীমে আবদ্ধ থাকা যদি মানবজ্ঞানের একটা অপরিহার্য্য নিয়ম হয়, তবে অস্তিত্বের বেলায়ও সে নিয়ম পূর্ণমাত্রায়ই খাটিবে। অস্তিত্ব-জ্ঞানও জ্ঞান; সুতরাং জ্ঞানের সব নিয়ম এখানেও প্রয়োগ করিতে হইবে। যদি অসীমের কোন জ্ঞানই মানব মনে প্রবেশ করিতে না পারে, তবে তাহার অস্তিত্বজ্ঞানও প্রবেশ করিতে পারিবে না। অসীমকে জ্ঞানে প্রবেশ করিতে হইলেই যদি তাহাকে সসীম হইতে হয়, তবে অসীমে যে অস্তিত্ব আরোপ

সসীম ও অসীমের জ্ঞান একসূত্রে গ্রথিত

করিতেছ তাহা অসীমের অস্তিত্ব নহে, তোমার মনের কল্পনা মাত্র, সুতরাং সসীম। কেন না, তুমি তোমার মনের বাহিরে যাইয়া অস্তিত্ব চিন্তা করিতে পার না। ফল দাঁড়াইতেছে, যে অসীমের অস্তিত্বও সম্ভব হইতেছে না। সকল ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত করিয়া ব্রহ্মের যে কেবল অস্তিত্ব রাখা হইয়াছিল, তাহাও উড়িয়া গেল। স্পেন্সারের এত সাধের "অসীম" যাঁহাকে ছাড়িয়া তাঁহার জ্ঞেয়, সসীম জগতের অস্তিত্ব সম্ভব নয়, দেখিতে দেখিতে তিনি শূন্যে মিলাইয়া গেলেন। সুতরাং হ্যামিল্টন্ ও ম্যান্সেলের প্রতিবাদ করিতে যাইয়া স্পেন্সার যে বলিয়াছেন, "অসীমের অস্তিত্ব আমাদের মনে শূন্যমাত্রে নহে কিন্তু বস্তুরূপে অবস্থিতি করিতেছে" তাহা কিন্তু টিঁকিতেছে না। এ কথা ঠিক এবং আমরা ইহা স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়াছি, যে অসীমের জ্ঞান ছাড়া সসীমের জ্ঞান সম্ভব নহে। কিন্তু স্পেন্সার এই অসীমের জ্ঞানকে দূরে পরিহার করিতেছেন; সুতরাং তাঁহার মত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। তাঁহার মতকে ঠিক বলিয়া ধরিলে এখন এই দাঁড়াইবে, যে আমাদের সসীমের জ্ঞান অসীমের জ্ঞান-নিরপেক্ষ। ইহা স্পেন্সারের নিজেরই মতে ঠিক নয়। সুতরাং তাঁহার মতের দুই অঙ্গে সংঘর্ষণ উপস্থিত হইতেছে, অতএব উহা নিঃসংশয়রূপে ভ্রান্ত। যদি অসীমের জ্ঞানকে ছাড়িয়া সসীমের জ্ঞান সম্ভব না হয়, যদি অসীমের জ্ঞান সসীমের জ্ঞানের অপরিহার্য্য আশ্রয় হয়, তবে উভয়কে সমান পরিমাণ বাস্তব সত্তা লইয়া আমাদের জ্ঞানে অবস্থিতি করিতে হইবে, উভয়ের জ্ঞান সমান পরিমাণে বাস্তব হওয়া প্রয়োজনীয়। একটীর জ্ঞান যখন অপরটীর পক্ষে অপরিহার্য্য, তখন দুইটীরই প্রকৃত ও গুণগত সমান জ্ঞান চাই। অসীমের একটা অস্পষ্ট ধারণা লইয়া সন্তুষ্ট হইলে চলিবে না। সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বস্তুদ্বয়ের (Correlatives) জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে সমপ্রকৃতি-বিশিষ্ট হওয়া অনিবার্য্য। ঋষিও তাহাই বলেন—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। মুণ্ডক, ৩।১।১

জ্ঞানের ভিতর ও বাহির

এখন দেখা যাক্, অজ্ঞেয়বাদী পণ্ডিতগণ যে এই মহা ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়াছেন, তাহার মূল কারণ কি? "অনন্ত অসীম পরব্রহ্মকে জানা যায় না"—তাঁহাদের এই ভ্রান্ত মতের নিদান অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে ইঁহারা মানব চিন্তার অতীত, জ্ঞানের সহিত সম্পর্করহিত এবং জীব ও জগতের সঙ্গে সকল প্রকার সম্বন্ধবর্জ্জিত এক দেবতা মনে মনে গঠন করিয়া তাঁহাকে ধারণ

করিবার জন্য অগ্রসর হন, এবং বিফলপ্রযত্ন হইয়া উপদেশ দেন, যে তাঁহাকে জানা যায় না, সুতরাং তাঁহাকে বর্জ্জন কর। ইঁহারা আসল বস্তুটিকে ধরিতে চেষ্টা না করিয়া, কল্পনার পশ্চাতে ছুটিয়াছেন, কাজেই বিফলমনোরথ হইতেছেন। যাহা হয় না তাহার জন্য যত্ন বৃথা। জ্ঞানের বাহিরে থাকাই যাহার প্রকৃতি, জ্ঞান তাহাকে ধরিতে পারে না। ইহাতে জ্ঞানের কোনই অক্ষমতা প্রকাশ পাইতেছে না। আমি আমার কোন বন্ধুর একাকিত্ব বিনষ্ট না করিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিতে পারি না, ইহাতে আমার কোন রূপ শারীরিক বা মানসিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইতেছে না, কেন না, বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার অর্থই তাহার একাকিত্ব বিনাশ করা। জ্ঞানের অবিষয় হইয়া থাকাই যাহার প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ, তাহাকে জ্ঞানের বিষয় করিতে চাহিলে যে তাহার অস্তিত্বই বিনাশ করা হয় এবং এরূপ চেষ্টা যে পণ্ডশ্রমমাত্র, তাহা কে অস্বীকার করিবে? যাহাকে জ্ঞানের অবিষয় বলিয়া কল্পনা করিতেছ, সে যে জ্ঞানের বিষয়রূপে গৃহীত হইতে পারে না, ইহা তো স্বতঃসিদ্ধ। ইঁহাদের ধারণা এই, যে এমন একটা বস্তু আছে যাহা জ্ঞানের বাহিরে থাকে, কিন্তু জ্ঞানের মধ্যে পরিবর্ত্তন উৎপাদন করে। জ্ঞান তাহাকে ধরিলেই সে স্বীয় প্রকৃতিবিচ্যুত হয়, সুতরাং আমাদের জ্ঞানে আমরা আর প্রকৃত বস্তুটীকে পাই না। এখন প্রশ্ন এই, জ্ঞানের বাহিরে থাকাতেই যাহার অস্তিত্ব সে জ্ঞানের ভিতরে কার্য্য করে কিরূপে? তাহাকে জ্ঞানের ভিতরে পরিবর্ত্তন উৎপাদন করিতে হইলে, আগে তাহাকে জ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হইতে হইবে। যদি বল, জ্ঞানের সংসর্গে আসিয়া ইহা যে একটা বিকৃত আকার প্রাপ্ত হয় তাহাই এই পরিবর্ত্তন পদবাচ্য, তবে জিজ্ঞাস্য এই, যে দুইটী স্বতন্ত্র বস্তু (যাহারা পরস্পরের বাহিরে থাকে) যখন একত্রিত হয়, তখন এমন একটী তৃতীয় বস্তু চাই যে উহাদের সম্মিলন-ভূমি, যাহা এ উভয়েরই অতীত, কিন্তু উভয়কেই ধারণ করিয়া রহিয়াছে। সেই তৃতীয় বস্তুটী কি? ইহার অস্তিত্ব যদি স্বীকার কর তবে তোমার অসীম আর অসীম রহিলেন না। আর যদি স্বীকার না কর, তবে তোমার অসীম কখনও জ্ঞানের মধ্যে পরিবর্ত্তন উৎপাদন করেন না। সুতরাং যে বহির্জ্জগতের কার্য্য দেখিয়া তাহার কারণরূপী, তাহার আশ্রয়রূপী এই অসীমকে কল্পনা করিতে গিয়াছিলে যিনি জ্ঞানের সীমার বাহিরে থাকেন, তিনি কিন্তু কারণত্বের দাবী করিতে পারিতেছেন না। আরও একটী কথা—জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয়ের মধ্যে

কোনও সম্বন্ধই স্থাপিত হইতে পারে না। স্পেন্সার বলেন, এই সসীম জ্ঞেয় জগৎ অসীম অজ্ঞেয় ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই জ্ঞেয় এবং জ্ঞাত জগৎরূপ কার্য্যের কারণ ঐ অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত ব্রহ্ম। যিনি অজ্ঞেয়, তিনি যে কারণ তাহার প্রমাণ কি? এই যে কার্য্যকারণসম্বন্ধ, ইহার কার্য্য এক দিক্, কারণ অন্য দিক্। উভয় দিকই সমান পরিমাণে অপরিহার্য্য। এই সম্বন্ধটী জ্ঞানের ভিতরকার সম্বন্ধ, জ্ঞানের বাহিরে এ সম্বন্ধ কল্পিত হইতে পারে না। সুতরাং এ সম্বন্ধের এক অঙ্গ জ্ঞানরাজ্যের বাহিরে থাকিতে পারে না। উভয়কেই জ্ঞানের ভিতরে অবস্থিত হইতে হইবে। ইহা কেবল আমাদের কথা নহে, স্পেন্সার নিজেই, যদিও অতর্কিতভাবে, স্বীয় Biology গ্রন্থে এ কথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন—"A relation of which one term is absent—an impossible relation!" সুতরাং সসীমের কারণ অসীম, জগতের কারণ ব্রহ্ম অজ্ঞেয় হইবেন কিরূপে? অজ্ঞেয় হইলে তিনি আর কারণ নহেন, কারণ হইলে তিনি আর অজ্ঞেয় নহেন। স্পেন্সার ব্রহ্মকে কারণ বলিয়াছেন, সুতরাং তিনি অজ্ঞেয় নহেন। "দু নৌকায় পা দেওয়া" একটা ভ্রান্তি। ইঁহাদের ভ্রমের কারণ আমরা ইতিপূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। ব্রহ্ম যদি আমাদের জ্ঞানের অবিষয় হইতেন, তবে তাঁহার সম্বন্ধে 'হাঁ বা না' কিছুই বলা সম্ভব হইত না; তাঁহার অস্তিত্বেরই খবর আমরা পাইতাম না। ইঁহারা এমন একটা কাল্পনিক বস্তু লইয়া নাড়া চাড়া করিতেছেন, যাহা বাস্তবিকই জ্ঞানের অবিষয়, যাহার কোনই অস্তিত্ব নাই। জ্ঞান ইহাকে জানিতে পারে না বলিয়া এই পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, জ্ঞানের এমন একটা প্রকৃতিগত অক্ষমতা আছে যে সে ব্রহ্মকে জানিতে পারে না—তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত নিতান্তই হাস্যকর! সেই ব্রহ্ম-বস্তুই বা কি যাহা জ্ঞানের বাহিরে থাকে? এমন কোন বস্তু কি আছে যাহা জ্ঞান গ্রহণ করিতে পারে না? যদি থাকে, তাহার সংবাদ কে দিল? আমরা কি এমন কিছু জানিতে পারি যাহা আমাদের জ্ঞানের বিষয় নহে? দুইটী ব্রহ্ম কল্পনা করা যাইতে পারে না, যাহার একটী জ্ঞানের অতীত বস্তু, অপরটী তাহার বিকৃতরূপ—জ্ঞানেরই বিষয়। ঐ যে জ্ঞানের অতীত বস্তু কল্পনা করিতেছ উহাও জ্ঞানের বিষয়। জ্ঞাতা নিজের অতীত হইয়া কিছু জানিতে পারে না। জ্ঞেয় কখনও জ্ঞাতা হইতে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করে না। বস্তুর পক্ষে থাকা আর জ্ঞাত হওয়া একই। আমরা এমন কোন জ্ঞাতা কল্পনা করিতে পারি না, যে এমন কোন বস্তু জানিতেছে যাহা

তাহার জ্ঞানের বিষয় নহে। আমরা যাহা কিছু কল্পনা করি না কেন, তাহারই মধ্যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুই দিক্ থাকিবেই। ইহারা পরস্পর অচ্ছেদ্য যোগে আবদ্ধ। আমরা কল্পনাবলে ইহাদিগকে বিভিন্ন করিয়া দেখিতে পারি। কিন্তু ইহাদিগকে পৃথক্ অস্তিত্ব প্রদান করিতে পারি না। আমরা একটী বৃত্তের কেন্দ্র হইতে পরিধিকে বিভিন্ন করিয়া দেখিতে পারি, কিন্তু এমন কোনও বৃত্ত কল্পনা করিতে পারি না যাহার পরিধি আছে কিন্তু কেন্দ্র নাই, অথবা কেবল কেন্দ্র আছে কিন্তু পরিধি নাই। এক পাতার কেবল এক পৃষ্ঠা কল্পনা করাও যাহা, জ্ঞাতাকে ছাড়িয়া কেবল জ্ঞেয়ের কল্পনাও তাহাই। সুতরাং জ্ঞানের বাহিরে অবস্থিত কোনও বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করিবার প্রয়াসটা অতিরিক্ত মাত্রায় কাল্পনিক। এরূপ কল্পনায় বিফলপ্রযত্ন হইলে জ্ঞানের অক্ষমতা প্রকাশ পায় না, কিন্তু ইহাই প্রকাশ পায়, যে, যাহা কল্পনা করিতে যাওয়া গিয়াছিল তাহা কোন অজ্ঞেয় বস্তু নহে কিন্তু শূন্য মাত্র, কিছুই নয়। সকল বস্তুর পক্ষে যাহা, ব্রহ্মের পক্ষেও তাহাই। তিনিও জ্ঞাতৃজ্ঞেয়-রূপ সম্বন্ধের অতীত হইয়া জ্ঞানরাজ্যের বাহিরে অবস্থিতি করেন না। অবশ্য, তিনি এই দুইটীর কোন একটী নহেন। অদ্বয় জ্ঞানবস্তু ব্রহ্মের জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় দুই দিক্। তিনি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় দুই-ই। অথবা তিনি এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় দুইএরই অতীত, এই দুইএর সংযোগরজ্জু জ্ঞান-বস্তুই তিনি। তাঁহাকে সর্ব্বসমন্বিত সূত্রাত্মা নামে অভিহিত করা যায়। তিনি আপনিই আপনার জ্ঞানের বিষয়। তিনি অন্য কোনও ক্ষুদ্র জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন না, "ন তস্যাস্তি বেত্তা।" আমরা যখন তাঁহাকে জানি, তখন ঐ জ্ঞানের সাহায্যেই জানি। ব্রহ্মজ্ঞানই আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি। এ সকল কথা বিশেষভাবে পরে আলোচ্য।

"জ্ঞানের বাহিরেও সত্তা আছে" এই ভ্রান্ত ধারণার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে ইহার মধ্যে একটু সত্যের আভাস আছে। আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানরেখার বাহিরে অনেক বস্তু রহিয়াছে। সুতরাং, সহজেই আমাদের মনে হয়, যে জ্ঞানের বাহিরেও বস্তু আছে। কেননা, যাঁহারা তেমন চিন্তাশীল নহেন তাঁহাদের পক্ষে ব্যক্তিগত জ্ঞানের বাহির এবং সম্পূর্ণরূপেই জ্ঞানের বাহির এ দুইএ কোনও বিভিন্নতা নাই। কিন্তু নিত্যজ্ঞান ও ব্যক্তিগতজীবনে তাহার প্রকাশ, বিষয়ের দিক্ হইতে এ দুই কখনও এক নহে। যত কিছু বস্তু, যাহা কিছু বিষয়, সমস্তই নিত্যজ্ঞানে অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে এই বিষয়সমূহের প্রকাশে একটা ক্রম আছে, কালের

প্রভাব আছে। সুতরাং আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের বাহিরে বস্তু আছে, আমাদের ব্যক্তিগত জীবন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেও বস্তু ছিল, একথা বলিলে ইহাই প্রমাণিত হয়, যে আমাদের জীবন কালের অধীন ও আমাদের জ্ঞানের বিষয় সীমাবদ্ধ। কিন্তু যে নিত্য জ্ঞান-বস্তু প্রকাশিত হইয়া আমাদের জীবন সম্ভব করিতেছে, ইহা দ্বারা তাঁহার উপর কালের প্রভাব বা জ্ঞানের সীমা কল্পিত হইতেছে না। সুতরাং ব্যক্তিগত জ্ঞানের বাহিরে থাকিলেও নিত্যজ্ঞানের বাহিরে বস্তু থাকা প্রমাণিত হয় না। নিত্যজ্ঞানের বাহিরে বস্তু কল্পনা করিলে জ্ঞাতার বাহিরে জ্ঞেয় কল্পিত হয়, বিষয়কে বিষয়ীর অতীত করা হয়। তাহাতে যে কেবল চিন্তারাজ্যের মূলভিত্তিই উৎপাটিত হয় তাহা নহে, কিন্তু জ্ঞানেরও মূলতত্ত্ব অস্বীকার করা হয়। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানকেই জগতের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা মনে করা হয় বলিয়াই এই মহাভ্রান্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু যখন জ্ঞানের এই বিষয়ের দিক্ পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ীর দিক্, অথবা বিষয়-বিষয়ীর সংযোগস্থল নিত্য জ্ঞানবস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন এই জ্ঞানের বাহিরে সত্তা কল্পনার ভ্রান্তি বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। তখন দেখি, আমি যাহাকে আমার জ্ঞান বলিতেছিলাম তাহা কালে উৎপন্ন বা দেশে আবদ্ধ নহে। আমি যাহাকে আমার ব্যক্তিগত জীবন বলি, তাহা এই জ্ঞানের প্রকাশেই সম্ভব হইতেছে। এই জ্ঞানের সাহায্যেই বুঝি, যে আমার ব্যক্তিগত জীবনের একটা আরম্ভ আছে। এই জ্ঞান যদি আমার ব্যক্তিগত জীবনের অতীত না হইত তবে আমি ইহার আরম্ভ জানিতে পারিতাম না। সুতরাং এ জ্ঞান কালে আবদ্ধ নহে। এই জ্ঞানের দিকে যখন তাকাই, তখন বুঝিতে পারি যে ইহার বাহিরে বস্তু নাই। আমি যখন মনে করি, যে আমার জ্ঞানের বাহিরে বস্তু আছে, তখনও ঐ বস্তুসকলকে আমার জ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়াই ভাবি, নতুবা এরূপ মনে করা সম্ভব হইত না। সুতরাং দেশ ও কাল আমারই জ্ঞানের অন্তর্গত হইয়া পড়িতেছে। অতএব নিত্যজ্ঞান ও ব্যক্তিগত জ্ঞান এই দুই-এ প্রভেদ আনয়ন করায় "জ্ঞানের বাহিরে বস্তু আছে" এই ভ্রম উৎপন্ন হইবার যে সুবিধা হইয়াছিল, তাহা এই সূক্ষ্ম দর্শনে তিরোহিত হইল। নিত্যজ্ঞান ও ব্যক্তিগতজ্ঞানে মূলে কোনও বিভিন্নতাই নাই। সেই নিত্য পূর্ণজ্ঞানই আংশিকভাবে আপনাকে প্রকাশিত করিয়া আমাদের এই ব্যক্তিগত জীবনলীলা রচনা করিতেছেন।

আমরা যে জ্ঞানের সাহায্যে জানি, জগতেও সেই জ্ঞান বর্ত্তমান; জগৎ সেই

জ্ঞানেরই কার্য্য, এ দুইএতে একই জ্ঞান বর্ত্তমান ; এই ধারণা সত্য না হইলে বিজ্ঞান অসম্ভব হইত। জগৎ জ্ঞানের কার্য্য বলিয়া এবং আমাদের জ্ঞান সে জ্ঞানের সঙ্গে এক বলিয়াই বিজ্ঞান জগতের নিয়মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। মানব-জ্ঞান যখন জগত্তত্ত্ব আলোচনা করে, তখন সে ভিতরেই থাকে, বাহিরে যায় না। ঐ যে জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত আপনার গৃহে আবদ্ধ থাকিয়াই স্বীয় জ্ঞানের নিয়মানুসারে স্থির করিলেন, যে আকাশের কোনও বিশেষ স্থানে একটী জ্যোতিষ্পিণ্ডকে থাকিতেই হইবে এবং দূরবীক্ষণ সাহায্যে দেখিলেন যে ঠিক সেই স্থানে তাঁহার গণনানুযায়ী একটী পিণ্ড রহিয়াছে ; দেখিয়াই ভক্তি ও বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"O God, I think Thy thoughts after Thee"! ইহাতে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই, যে জ্ঞান মানবের জ্ঞানরূপে প্রকাশিত, সেই জ্ঞানেই এই জগৎ ধৃত ও পরিচালিত। সেই জন্যই রাজর্ষি গাহিয়াছিলেন, "যে তোমার আত্মারূপে প্রকাশ, সেই ব্যাপ্ত চরাচরে"। এই জগৎ-লীলা এক অসীম নিত্যজ্ঞানের ক্রীড়ামাত্র। এই অনন্ত, অসীম, পূর্ণ, নিত্য-জ্ঞান যে সসীমের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া আপনাকে কোন প্রকারে হীন করিতেছেন তাহা নহে, কিন্তু আমরা পরে দেখিতে পাইব, যে এইরূপ করাই তাঁহার প্রকৃতি—ইহা তাঁহার নিত্যলীলার অংশ। এই বিচিত্রতাপূর্ণ জগৎ তাঁহারই মধ্যে রহিয়াছে, এ জগৎ তাঁহারই অঙ্গীভূত। তিনি এই জগৎকে পরিত্যাগ করিয়া কোনও অজ্ঞেয় রাজ্যের গিরিগুহায় লুক্কায়িত নহেন। তিনি এই জগৎকে আপনা হইতে উৎপন্ন করিয়া আপনারই দিকে লইয়া চলিয়াছেন। ইহার উৎপত্তি-স্থানও তিনি, গম্য স্থানও তিনি। যাঁহারা মনে করিতেছেন, যে ব্রহ্ম বিষয়জগতের সহিত সম্বদ্ধ হইলে আপনার প্রকৃতি-বিচ্যুত হইবেন, আমরা দেখিতেছি, তাঁহারা ভ্রান্তিতন্তু দ্বারা জাল নির্ম্মাণ করিয়া নিজেদের জালে নিজেরাই আবদ্ধ হইয়াছেন, এবং ভিতর হইতে অজ্ঞাতসারে জালের মুখ এমন শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন, যে মনে করিতেছেন, বাহির হইবার আর পথ নাই। ভিতর হইতে জালের মুখ বন্ধ থাকায় এই লাভ হইয়াছে, যে আর কেহ সে জালে আবদ্ধ হইবে না। আমরা কিন্তু বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছি,—

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ ব্রহ্ম পশ্চাৎ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্॥ মুণ্ডক, ২।২।১১।

ইতিপূর্ব্বে আমরা সাধারণভাবে স্পেন্‌সারের মতের সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছি, যে তাঁহার দর্শনের ভিত্তি অত্যন্ত কাঁচা জমির উপর স্থাপিত। এখন আমরা তাঁহার দুই চারিটি বিশেষ বিশেষ মত পরীক্ষা করিয়া দেখাইব, এই ভূমির উপর স্থাপিত তাঁহার দর্শনমন্দির কত ক্ষণভঙ্গুর।

স্পেন্‌সার যে ডালে বসিয়াছেন সেই ডালই কাটিয়াছেন

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্পেন্‌সার জগদতীত এক মহাশক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু এই শক্তিকে তিনি কোনও রূপেই জ্ঞানের বিষয় বলিতে প্রস্তুত নহেন। এই মধ্যপথ অবলম্বন করাতে তাঁহার যে কিরূপ গুরুতর ভ্রান্তি-সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহার নিজের লেখা হইতেই তৎসম্বন্ধে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। তিনি এক জায়গায় বলিতেছেন : "There is an infinite and eternal energy from which everything proceeds". কেহ কি স্পেন্‌সারের মুখে তদ্‌বর্ণিত মহাশক্তির এই পরিচয় পাইয়া আর তাঁহাকে অজ্ঞেয়বাদী বলিয়া মনে করিতে পারেন? একজন বিশ্বাসী ভক্ত কি এক নিশ্বাসে তাঁহার ইষ্টদেবতার উপর ইহা অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্য আরোপ করেন? তিনি অনাদি ও অনন্ত, তিনি শক্তিস্বরূপ, তাঁহা হইতেই সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে। আর বেশী কিছু চাই না। স্পেন্‌সারের অজ্ঞেয়বাদ বিনাশে ও তাঁহাকে জ্ঞেয়বাদী প্রমাণ করিতে ইহাই প্রচুর। ঋষিও ব্রহ্মসত্তা সম্বন্ধে ঐ কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন সংস্কৃতে—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে", "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্", আর স্পেন্‌সার বলেন ইংরাজিতে—"There is an infinite and eternal energy from which everything proceeds!", এই যা তফাৎ, নতুবা অন্য কোনই বিভিন্নতা নাই। বরং আমাদের ভয় হয়, এইরূপ সাদৃশ্য দেখিয়া কোন্ Orientalist কোন্ দিন বলিয়া ফেলিবেন, যে স্পেন্‌সারের নিকট হইতে উপনিষদের ঋষি ঐ ভাব গ্রহণ করিয়াছেন! কেননা, ঋষির "প্রাণ" স্পেন্‌সারের "Energy"র অনুবাদ ছাড়া আর কি? এবং ঋষির "নিঃসৃতম্" স্পেন্‌সারের "proceed" ছাড়া আর কিছুই নহে!! অজ্ঞেয়বাদী স্পেন্‌সারের শক্তির জ্ঞান এইখানেই শেষ হয় নাই। তিনি আরও বলিতেছেন, "The power manifested throughout the Universe distinguished as material, is the same power which in ourselves wells up under the form of consciousness."

জানিনা, অজ্ঞেয়বাদ এই উক্তির কোন্ স্থানে বাস করে। তিনিই আমাদের মধ্যে জ্ঞানরূপে আবির্ভূত হইতেছেন! "প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী" উপনিষদের ঋষিও এই কথাই বলিতেছেন। তাঁহার মুখে যদি আমরা না শুনিতাম যে তিনি অজ্ঞেয়বাদী; "ব্রহ্মকে জানা যায় না" একথা যদি স্থানান্তরে তাঁহার মুখ দিয়া না বাহির হইত, তবে আমরা স্পেন্সারকে কখনই অজ্ঞেয়বাদী বলিতে পারিতাম না। স্পেন্সারের এ উক্তিগুলি আমাদের নিকট অন্ধের হাতে আলোর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। যে চক্ষু খুলিবে না তাহার আলোর কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। তাহার আলোতে অন্যেরা পথ দেখিবে বটে, কিন্তু অন্ধ যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইবে। স্পেন্সার এ তিমির আশ্রয় করিলেন কেন? আমরা তাঁহার মতের যতদূর সমালোচনা করিয়াছি, তাহাতে স্পষ্টই বোধগম্য হইতেছে, তিনি যদি "ব্রহ্মকে জানা যায় না" এই চিরপোষিত ভ্রান্তিটা পরিত্যাগ করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হন, তবে ব্রহ্মবাদী হইয়া যান। কিন্তু তিনি এতদূর আসিয়াও ব্রহ্মজ্ঞানের শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না কেন? সাকারবাদী হিন্দু যেমন "নিরাকারের ধ্যান হয় না" এই ভ্রান্তির বশবর্ত্তিতাবশতঃ পৈত্রিক সম্পদ্ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অমৃতরস হইতে বঞ্চিত হইয়া পৌত্তলিকতাতে নিমজ্জিত হইয়াছেন, স্পেন্সারও তেমনি "অসীমের জ্ঞান সম্ভব নয়" এই দার্শনিক কুসংস্কারের প্ররোচনায় ব্রহ্মজ্ঞানের উচ্চ অধিকার হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। সুতরাং দর্শনালোচনা করিতে যাইয়া তিনি যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় পণ্ডশ্রমে পরিণত হইয়াছে। এই পণ্ডশ্রম দেখিয়া মনে বড় ক্ষোভ হয়, তাই ঋষির কথার পুনরুক্তি করিতে ইচ্ছা হয়—

"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।"

বৃহ, ৩৮।১০।

যাহা হউক, এই যে মহাশক্তি, যাহা হইতে সমস্ত জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে এবং যিনি আমাদের জ্ঞানরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, সেই মহাশক্তির জ্ঞান আমরা কিরূপে লাভ করিলাম? স্পেন্সার এখানেও বৈদান্তিক ঋষির সঙ্গে একমত হইয়া বলিতেছেন, আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তি—"যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ"। শ্বেত, ২।১৫। তিনি বলেন—"We are disabled from conceiving mechanical force in itself under

a form different from mechanical force as ordinarily presented to consciousness. The axiom—"Action and reaction are equal and opposite," applied as it is not only to the actions of objects on one another, but to our actions on them, implies a conception of the two forces as equivalent, both in quantity and nature; seeing that we can not conceive a relation of equality between magnitudes that are not connatural...... .....why, then, can we not represent to ourselves the force with which a body resists an effort to move it, as a something quite unlike the feeling of muscular tension which constitutes the effort? There are all-sufficient reasons...........There exists no alternative mode of representing this force to consciousness—no other experience, or combination of experiences, by which we can figure it to our minds.........To frame a conception of force in the non-ego different from the conception we have of force in the ego is utterly beyond our power."

এইস্থানে পণ্ডিতপ্রবরকে একটি প্রশ্ন করিতেছি—আমরা জগতের সংস্পর্শে আসিয়া যে মহাশক্তির পরিচয় পাই তাহা চিৎশক্তি, না (যদি জড়শক্তি বলিয়া কিছু থাকে) জড়শক্তি? আমরা আত্মার (ego) মধ্যে যে শক্তির পরিচয় পাই, তাহা তো আত্মশক্তি, ইচ্ছাশক্তি। আমরা আত্মায় যে শক্তির পরিচয় পাই, তদতিরিক্ত অন্য কোনও শক্তির ধারণা যদি আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়, তবে জগতে যে মহাশক্তি আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, তিনি, তাঁহারই মতে, চিৎশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারেন না। কিন্তু আদি-কারণ জ্ঞানরূপ কি না, এই মহাশক্তি জ্ঞানময়ী কি না, সে সম্বন্ধে স্পেন্সার স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলিতেছেন না। তিনি স্পষ্ট স্বীকার করুন আর নাই করুন—"To frame a conception of force in the non-ego different from the conception we have of the force in the ego is utterly beyond our power." এই স্বীকারোক্তিতে তিনি

নিজ হস্তেই স্বীয় অজ্ঞেয়বাদ-বৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন। এখন আর আদিকারণে শক্তি আরোপ করিয়া, জ্ঞান আরোপ না করিলে চলিবে না। আমরা আমাদের মধ্যে যে শক্তির পরিচয় পাই, তাহা আত্মাতিরিক্ত কোনও বস্তু নহে। সুতরাং কোনও বস্তুতে এতদনুরূপ শক্তি আরোপ করিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে আত্মবস্তু বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে, নতুবা উপরোক্ত উক্তির কোনই সার্থকতা থাকিবে না। আত্মজ্ঞানই যে সকল জ্ঞানের ভিত্তি, স্পেন্সার তাহা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াও একটী দার্শনিক কুসংস্কারের প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্ব বশতঃ ইহার পরিণতি ও শুভফল লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। অজ্ঞেয়বাদী পণ্ডিতদিগের ভ্রান্তির সর্ব্ব প্রধান কারণ এই, যে তাঁহারা কথার কাটাকাটির উপর যতটা মনোযোগ দেন, আসল বস্তুটীর (reality) উপর তত মনোযোগ দেন না। এক নৈয়ায়িক পণ্ডিত রাত্রিকালে খট্টার উপর শুইয়া "তৈলাধার ভাণ্ড কি ভাণ্ডাধার তৈল" এই জাতীয় কোনও গুরুতর মীমাংসায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন। এমন সময়ে ঘরে মানুষের পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন "ঘরে কে?" পণ্ডিতের প্রকৃতি-বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ চোর উত্তর করিল, "আজ্ঞে, ঠাকুর, কেউ না, আপনি ঘুমান।" তখন পণ্ডিত মহাশয়, "তাই তো, ঘরে কেউ নাই, তবুও আমি পদশব্দ শুনিবার ভুল করিলাম কেন" এই কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। অজ্ঞেয়বাদী পণ্ডিতদিগের চিন্তার প্রণালী কতকটা এই শ্রেণীর। কেন না, যখন জ্ঞেয়বাদ খণ্ডনের চিন্তাটা তাঁহা-দের মনের উপর খাড়া না থাকে—যখন শব্দ অপেক্ষা বস্তুর দিকে দৃষ্টি বেশী থাকে তখন তাঁহারা এমন অনেক কথা বলেন যাহা অজ্ঞেয়বাদের সঙ্গে মিলে না। আমরা এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত স্পেন্সার হইতে দিয়াছি। আরও একটী দিতেছি। পণ্ডিতপ্রবর তাঁহার Biologyতে বলিয়াছেন—"Whatever amount of power an organism expresses in any shape is the correlate and equivalent of a power that was taken into it from without". তাই যদি হয়, তবে জগৎ-কারণে জ্ঞান না থাকিলে জগতে জ্ঞান আসিল কোথা হইতে? বাস্তবিক স্পেন্সার যখন জ্ঞেয় জগতের কথা বলেন তখন তিনি এক জন অতি উপাদেয় গুরু, কিন্তু অজ্ঞেয় জগতের বিষয় বলিতে যাইয়াই তিনি সব 'গুলিয়ে' ফেলেন।

আমরা যতটুকু আলোচনা করিলাম, তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে,

যে অতি অল্পায়াসেই স্পেন্‌সারের মতকে ব্রহ্মবাদে পরিণত করা যাইতে পারে। সে মতকে আমরা কিরূপে অজ্ঞেয়বাদ বলিব যে মত স্বীকার করে, যে আদিকারণ শক্তিস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ, অনাদি ও অনন্ত, তাঁহা হইতেই সমস্ত বিশ্ব উৎপন্ন হইতেছে এবং তিনিই আমাদের জ্ঞানরূপে প্রকাশ পাইতেছেন? ব্রহ্মবাদিগণ ব্রহ্মের দার্শনিক স্বরূপ সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত আর বেশী কিছুই নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই।

স্পেন্‌সার-দর্শনের অসঙ্গতি-দোষ এইখানেই শেষ হয় নাই, শ্রাদ্ধ আরও অনেকদূর পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে। স্পেন্‌সার এই অজ্ঞেয়শক্তির প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা অর্পণের ব্যবস্থা করিয়া মনে করিয়াছেন, যে ইহাতে তাঁহার অজ্ঞেয়-বাদ এবং মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা—এই দুই কুলই রক্ষা পাইতেছে!

এই অজ্ঞেয় শক্তি উপাস্যও বটে।

কিন্তু সে চেষ্টা নিষ্ফল। কোনও অজ্ঞেয় বস্তুর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা সম্ভব নহে। অবশ্য, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য উপাস্য বস্তুকে কিয়ৎপরিমাণে অন্ধকারাবৃত থাকিতে হয়, কিন্তু তাঁহার পক্ষে একান্ত অজ্ঞেয় হইলে চলিবে না। আমার বর্ত্তমান জ্ঞান তাঁহাকে আয়ত্ত করিতেছে না, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু তাঁহাকে আমার জ্ঞানের সঙ্গে সমভাবাপন্ন (allied) হইতে হইবে। নতুবা অনায়ত্ত বলিয়া এই দুরধিগম্য সত্তার যে বিস্ময় ও সম্ভ্রম উৎপন্ন করিবার কথা, তাহাও আমার মধ্যে কোন ধর্ম্মভাব জন্মাইতে সক্ষম হইবে না। সুতরাং মানবের যে ধর্ম্মভাব উপাস্য বস্তুতে প্রযুজ্য, তাহা কোনও অজ্ঞেয় বস্তুতে অর্পিত হইতে পারে না। যিনি আমা অপেক্ষা উচ্চ, যিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহারই অনুধ্যানে আমার মধ্যে শ্রদ্ধা-ভক্তি, ভয় ও বিস্ময়ের উদ্রেক হইতে পারে। যিনি অজ্ঞেয়, তিনি আমা অপেক্ষা উচ্চ কি নীচ, শ্রেষ্ঠ কি নিকৃষ্ট, তাহাই জানা হয় নাই, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে কোন ভাবই সম্ভব নহে, ধর্ম্মভাব তো দূরের কথা। বস্তুদ্বয়ের মধ্যে উচ্চ নীচ, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইলে, উভয়কে সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট (connatural) হইতে হইবে, নতুবা উভয়ের মধ্যে কোনও সম্বন্ধই স্থিরীকৃত হইতে পারে না। এক হাত ও এক মণের মধ্যে এরূপ কোন সম্বন্ধই নাই, কিন্তু এক মণ ও লক্ষ মণের মধ্যে তাহা আছে। যদি অজ্ঞেয় বস্তুর ধ্যানে ভক্তি-শ্রদ্ধার উদ্রেক করিতে চাও, তবে ধ্যাতা ও ধ্যেয়ের মধ্যে উচ্চ-নীচের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ

কর, এবং তাহা করিতে গেলেই যখন উভয়কে সমভাবাপন্ন হইতে হইবে, তখন উপাস্য আর অজ্ঞেয় থাকিতে পারেন না। সুতরাং স্পেন্‌সারের অজ্ঞেয় উপাস্য "কাঁঠালের আমসত্ত্ব" বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। বিশেষতঃ, যে মানবের সমগ্র জীবনটা জ্ঞানের বিকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে, সেই মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু ধর্ম্মভাবকে অজ্ঞানতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে যাওয়ার ন্যায় অসঙ্গত ব্যাপার আর কি হইতে পারে?

ক্রমবিকাশ ও অধ্যাত্মবাদ

যাহা হউক, স্পেন্‌সারের দর্শন আলোচনা করিয়া দেখিতে পাইলাম, তাঁহার অজ্ঞেয়বাদের অজ্ঞেয় বস্তু অনাদি, অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী; শক্তিস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহা হইতেই সমস্ত জগৎ উদ্ভূত হইতেছে এবং তিনিই আমাদের মধ্যে জ্ঞানরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। আমরা আরও দেখিতে পাইতেছি এই যে শক্তি, তাহা আমাদের আত্মশক্তি হইতে ভিন্ন-প্রকৃতি-সম্পন্ন হইতে পারেন না। সুতরাং স্পেন্‌সার দর্শনের পরিণতি অধ্যাত্মবাদের (idealism) উপর প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবাদে। কিন্তু তিনি অধ্যাত্মবাদ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার মনে একটা ভয় আছে, যে তাহা হইলে ক্রমবিকাশবাদ (evolution theory) টিকিতে পারে না। তিনি বলিতেছেন—"Should the idealist be right, the doctrine of Evolution is a dream." আমি যখন স্পেন্‌সারের এই উক্তিটী প্রথম পাঠ করি, তখন একটু মুস্কিলেই পতিত হইয়াছিলাম। তখনও আমি অধ্যাত্মবাদ ও ক্রমবিকাশবাদ দুইই বিশ্বাস করিতাম। মনে করিতাম, দুইটি মতে কোনও অসামঞ্জস্য নাই, অথবা এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই মনে উদয় হয় নাই। কিন্তু স্পেন্‌সার বলিয়া দিলেন, একটা সত্য হইলে, অন্যটা নিশ্চয়ই কল্পনা মাত্র। তখন মনে একটা বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল। কিন্তু শীঘ্রই একজন মহাজ্ঞানী আমাকে এই মানসিক অশান্তি হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন, ইনি স্বর্গীয় দার্শনিক T. H. Green. তাঁহার উপদেশে বুঝিলাম স্পেন্‌সার এক মহাভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন। প্রকৃত অধ্যাত্ম-বাদের (idealism) সঙ্গে ক্রমবিকাশবাদের (evolution) কোনই বিরোধ নাই। স্পেন্‌সারের অধ্যাত্মবাদের দৌড় (Berkeley) বার্কলি, (Hume) হিউম্ এবং (Kant) ক্যাণ্টের Transcendental Æsthetic পর্য্যন্ত। তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যায়, সে গুলিও তিনি বিশেষভাবে

তুলাইয়া আলোচনা করেন নাই। সুতরাং সাধারণের মধ্যে অধ্যাত্ম-বাদ (idealism) সম্বন্ধে যে ভ্রান্তি দেখা যায়, তাঁহার মনেও সেই ভ্রান্তি সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই, তিনি অধ্যাত্মবাদের (idealism) নামে ভয় পাইয়াছেন। তিনি অধ্যাত্মবাদের ঘাড়ে "জগৎটা আমাদের ব্যক্তিগত মনের ক্রিয়া"—এই ভ্রান্ত মত আরোপ করিয়া ক্রম-বিকাশবাদ-সংরক্ষণে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। "কাণ নিলে চিলে" শুনিয়া চিলের পশ্চাতেই ছুটিয়াছেন, কাণে হাত দিয়া দেখা হয় নাই, বাস্তবিক চিলে কাণ নিয়াছে কি না? বস্তুতঃ, প্রকৃত অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে ক্রম-বিকাশবাদের কোনই অসামঞ্জস্য নাই; বরং স্পেন্সার-ব্যাখ্যাত ক্রম-বিকাশবাদের সঙ্গে ইহার বিশেষ মিলই রহিয়াছে। স্পেন্সার ক্রম-বিকাশবাদের ব্যাখ্যায় বলেন, মানবের মধ্যে যে সমস্ত উচ্চ আধ্যাত্মিক বৃত্তি বিকশিত হইয়াছে তাহা ক্রমবিকাশের ফল। ধীরে ধীরে বংশপরম্পরায় তাহা বিকশিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই,—আমার মনোবৃত্তি ধীরে ধীরে আমারই মনে বিকশিত হইতে পারে, বংশপরম্পরায় বিকশিত হইবে কি রূপে? স্পেন্সার উত্তর দিবেন, শরীরের মধ্য দিয়া। শরীর তো বহিরাবরণ মাত্র। শরীরের উন্নতির ব্যাখ্যায় মনোবৃত্তির উন্নতি ব্যাখ্যাত হয় না। শরীরের ক্রমোন্নতি আত্ম-প্রকাশের ক্রমকে নির্দ্দেশ করে মাত্র। আমার ব্যক্তিগত (individual) মনোবৃত্তির উন্নতি কখনই আমার মনের বাহিরে হওয়া সম্ভব নহে। অন্য এক জনের মানসিক উন্নতি আমার উন্নতির পূর্ব্বভাগ হইবে কি রূপে? এখানে আত্মার একত্বের ব্যাখ্যার উপর সকল মীমাংসা নির্ভর করিতেছে। যদি আমার কোন মনোবৃত্তি বংশ-পরম্পরায় উন্নত হইয়া থাকে, তবে আমাকে বংশপরম্পরার সঙ্গে সংযুক্ত করিবার জন্য এক পরমাত্মা স্বীকার করিতে হইবে, যিনি আমার ও পূর্ব্ববর্ত্তী সকলের আত্মারূপে প্রকাশ পাইতেছেন; নতুবা বংশপরম্পরায় আমার মনোবৃত্তির বিকাশের কোনই সম্ভাবনা নাই। প্রকৃত অধ্যাত্মবাদ এই পরমাত্মাকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। সুতরাং অধ্যাত্মবাদ ব্যতীত ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যাই হইতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে, ক্রম-বিকাশবাদের সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের কোনই বিরোধ নাই; বরং তাহারা গভীর বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ। এখন স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে, স্পেন্সার যে বলিয়াছেন,—"Should the idealist be right, the doctrine of Evolution is a dream."

তাহা যথার্থ নহে, বরং এই কথাই ঠিক, "The doctrine of Evolution is true because the idealist is right." আমাদের আলোচনায় এই কথাই দৃঢ়ীভূত হইল যে স্পেন্সারের মতকে বিশেষভাবে নিংড়াইয়া সার বাহির করিলে, উহা অধ্যাত্মবাদে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবাদে পরিণত হয়। ব্রহ্মবাদের পথে এই আমাদের যাত্রার আরম্ভ, মনে রাখিতে হইবে—সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। ঐতরেয়, ৩৷৩

চতুর্থ অধ্যায়

সহজ-জ্ঞান-বাদ

তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ। মুণ্ডক, ২৷২৷৭

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি, যাঁহারা বলেন, "ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব নহে" তাঁহাদের মতের কোনই সারবত্তা নাই। তাঁহাদের যুক্তিপ্রণালী অত্যন্ত ভ্রান্ত এবং নানাপ্রকার স্ববিরোধিতা দোষে দুষ্ট। কিন্তু ইহাতেও আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হইতেছে না। ইহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের পথ নিষ্কণ্টক হইল বটে, কিন্তু আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার পক্ষে সকল বিঘ্ন নিরাকৃত হইল না। এমন এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা মনে করেন, যে মানবের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব, কিন্তু সে জ্ঞান প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, তাহা বিচার-শক্তির অধিগম্য নহে। ব্রহ্ম মানবের অধিগম্য হইলেও মানবজ্ঞান তৎসম্বন্ধীয় কোন বিচারে সমর্থ নহে। মানবকে যদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হয় তবে জ্ঞানের অতীত কোন চিত্ত-বৃত্তির (organ) সাহায্যেই তাহা লাভ করিতে হইবে। জ্ঞানের-মীমাংসা সে স্থানে পৌঁছিতে পারে না। মানব বুদ্ধির (reason or rational thought) সাহায্যে ব্রহ্মকে ধারণা করিতে পারে না, কিন্তু সহজজ্ঞান (intuition) বা বিশ্বাসের (faith) সাহায্যেই তাহাকে লাভ করিতে পারে। অজ্ঞেয়-

বাদিগণ বলিতেছেন, সসীম মানবের এমন কোন ইন্দ্রিয়ই নাই যাহা দ্বারা সে অসীম ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে ; কেননা, জ্ঞান (reason) ব্যতীত মানবের জানিবার অন্য কোন শক্তিই (faculty) নাই এবং জ্ঞানের (reason) দ্বারা জানার অর্থ অসীমকে সসীম করা।* সহজ-জ্ঞানবাদীরা বলিতেছেন, জ্ঞান ব্রহ্মকে ধারণা করিতে অসমর্থ হইলেও অন্য দ্বারে ব্রহ্ম মানব অন্তরে প্রকাশিত হন। ইঁহাদের মতে ব্রহ্মজ্ঞান (knowledge of God) সম্ভব, কিন্তু ব্রহ্মবিজ্ঞান (theology or the scientific treatment of religion) সম্ভব নহে।

ব্রহ্মোপলব্ধিতে ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের স্থান

যেহেতু, মানব বুদ্ধি (rational thought) ব্রহ্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। এই মত পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞেয়বাদের প্রতিবাদ-স্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কেন না, "ব্রহ্মকে জানা যায় না" অজ্ঞেয়-বাদের ধর্ম্ম-বিনাশকারী এই মত ধর্ম্ম-বিশ্বাসীর মনে কখনও স্থান পাইতে পারে না। তাই কুতার্কিকের কূট তর্কজাল ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া স্বায় স্বীয় ধর্ম্মবিশ্বাসকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার মানসে বিশ্বাসিগণ জ্ঞানকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া ধর্ম্মরাজ্যের বাহিরে বিদায় করিয়া দিলেন। বলিলেন, ধর্ম্ম-জীবনের অভিজ্ঞতায় যাহা পাওয়া যায়, জ্ঞান তাহার শতাংশও প্রদান করে না, বরং যাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নিশ্চিত সত্য তাহারই সম্বন্ধে নানা সন্দেহ ও অপূর্ণতা আনিয়া দেয়। সুতরাং ধর্ম্ম-জগতে কোন মীমাংসার জন্য জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করা সূর্য্যালোক পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকার গৃহে দীপালোকের সাহায্যে বস্তু নির্ণয়ের চেষ্টার ন্যায় হাস্যজনক। উপাসনাকালে সাক্ষাৎযোগে ব্রহ্মবস্তুকে প্রত্যক্ষভাবে লাভ করা যায়। এই সময়কার ব্রহ্মসত্তার অনুভূতি আত্মানুভূতির ন্যায় উজ্জ্বল। সাধারণ জ্ঞানে বহির্জ্জগতের সত্তা যেমন সকল সন্দেহের অতীত, উপাসনাকালে ব্রহ্মসত্তার জ্ঞানও তেমনই অবিসম্বাদী। এই সময়ে যে ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি হয় তাহা কোনও প্রমাণ-সাপেক্ষ নহে, তাহা ব্রহ্মের সাক্ষাৎ আবির্ভাবের ফল ; সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। ইতিপূর্ব্বে যে সকল প্রশ্নের মীমাংসা করা হইয়াছে—কিরূপে সসীম জ্ঞান অসীমকে জানে ? কিরূপেই বা সসীম স্বীয় সীমাকে অতিক্রম করতঃ ব্রহ্ম বস্তুকে জানিতে সক্ষম হয় ?—এই সকল প্রশ্নের কোন অস্তিত্বই সেখানে নাই।

* এই যুক্তির ভ্রান্তি আমরা ইতি পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি।

ব্রহ্মবস্তু সাক্ষাৎ দেখিতেছি এবং ইহার অস্তিত্বজ্ঞান এমন সুস্পষ্ট যে তাহা প্রমাণ করিবার কোন প্রয়োজনীয়তাই অনুভূত হয় না। সুতরাং বিশ্বাসী মনে করেন, যে সন্দেহের অতীত এই উচ্চভূমি পরিত্যাগ করিয়া সন্দেহের ভূমিতে অবতরণ করতঃ সন্দেহ নিরাকরণ দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা একটা মহাভ্রান্তি ও পণ্ডশ্রম মাত্র। কেন না, সহজজ্ঞান (intuition) বা বিশ্বাস (faith) সাহায্যে আমরা ব্রহ্মবিষয়ক যে বিদ্যা লাভ করি, জ্ঞান (reason) গুণে (qualitatively) বা পরিমাণে (quantitatively) তাহার শতাংশের এক অংশও প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানের বিচারে আমরা ঈশ্বরকে পাই না, তাঁহার সম্বন্ধে কেবল কতকগুলি শুষ্ক মীমাংসা (abstract ideas) মাত্র লাভ করি। সুতরাং সে গুলির দ্বারা মনে কোনও রূপ শান্তি উৎপন্ন হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। কাজেই ধর্ম্মপ্রবণ হৃদয়ে সে গুলি কখনও স্থান পায় না। চাই খাদ্য, পাথর লইয়া কি করিব? তারপর, সহজজ্ঞানে বা বিশ্বাসে বস্তু সম্বন্ধে যে একত্ব ও সমষ্টির ধারণা হয়, জ্ঞান তাহা কখনও দিতে পারে না। জ্ঞান বরং সেই একত্বকে নানা খণ্ডে বিভক্ত করে, সেই সমষ্টিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অংশে বিভক্ত করতঃ তাহার সমষ্টিত্ব বিনষ্ট করিয়া দেয়। যদিও জ্ঞান পরে আবার ঐ একত্ব ও সমষ্টিত্ব প্রদান করিতে চেষ্টা করে কিন্তু কিছুতেই সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ মানব জ্ঞান যত কেন উন্নত হউক না, সে সসীম। সুতরাং অসীমের মধ্যে যাহা কিছু আছে সকলই সে গ্রহণ করিতে সক্ষম নহে। কাজেই, সে যখন সমষ্টি করিতে যায়, তখন সেই পূর্ণ অসীম বস্তুটী দিতে পারে না। কেন না, যখন সে বিশ্লেষণ করিয়াছিল, সে সময়ে যখন সমগ্র বস্তুটীর সকল অংশ পায় নাই, তখন তাহার সমষ্টি কিরূপে সমগ্র বস্তুতে পরিণত হইবে? সুতরাং সহজজ্ঞান বা বিশ্বাস আমাদিগকে যে বস্তুটী প্রদান করে বিজ্ঞান (scientific knowledge) যত কেন উন্নত হউক না, সে কখনও তাহা দিতে পারে না। জড়-বিজ্ঞান এক সময়ে সসীম জগতের একটা পূর্ণ জ্ঞান মানবাত্মার সম্মুখে উপস্থিত করিলেও করিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ক পূর্ণ জ্ঞান কখনও বিজ্ঞানের নিকট আশা করা যায় না। জড়বিজ্ঞান সম্ভব হইলেই ব্রহ্মবিজ্ঞান সম্ভব হইবে না। বিশেষতঃ, বিজ্ঞান সাহায্যে ব্রহ্মকে ধারণা করিতে যাওয়াতে ইহাই প্রমাণ হয়, যে ব্রহ্ম অপেক্ষাও উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে। অসীম সসীমের নিকট আত্ম-প্রকাশ করিতে

পারেন, কিন্তু জীব স্বীয় জ্ঞানবলে ব্রহ্মবস্তুকে ধারণা করিবে ইহা অতি অসম্ভব কথা। কেন না, মানবের সসীম জ্ঞানে যদি অসীম ব্রহ্মের অস্তিত্ব ও স্বরূপের প্রমাণ বর্ত্তমান থাকে, তবে ইহাই বলা হয়, যে সসীম অসীম অপেক্ষাও বড়। সুতরাং যে ব্রহ্মকে জ্ঞান প্রমাণ করিতে সমর্থ তাহা কখনই ব্রহ্ম নহে। উহা ক্ষুদ্র সসীম মানবজ্ঞান অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। এই আলোচনা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে, যে ব্রহ্মলাভের পক্ষে দার্শনিক জ্ঞান নহে, কিন্তু সহজজ্ঞান বা বিশ্বাসই একমাত্র উপায়।

এখন দেখা যাক্, ব্রহ্মবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে তাহাদের যুক্তিযুক্ততা কতদূর।

জ্ঞান ও বিশ্বাস

সর্ব্বপ্রথম ইহা বলা যাইতে পারে, যে এই আপত্তিগুলির প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, আপত্তিকারিগণ ধর্ম্মবিষয়ে জ্ঞানের কার্য্য (function) বুঝিতে ভুল করিয়াছেন। উপাসনা-কালের অভিজ্ঞতা. আত্ম-প্রত্যয় বা সহজজ্ঞান এবং বিশ্বাস ও জ্ঞান (reason), ইহাদের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। ইহারা ধর্ম্মজীবনের বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত। বিশ্বাসই ধর্ম্ম। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসে উপনীত হইতে হইলে যে জ্ঞান চাই তাহা পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যোগে অবস্থিত হইয়া বিশ্বাসী যে ভাব উপলব্ধি করেন, ধর্ম্মবিজ্ঞান কখনও মানুষকে সে ভাব দিতে পারে না। কিন্তু এই ধর্ম্ম বিজ্ঞান ব্যতীত মানবাত্মার নিকট ঐ যোগের পথ কখনও প্রকাশিত হয় না। সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞান যেমন বস্তুকে সুন্দর করে না, নীতিবিজ্ঞান যেমন মানুষকে নৈতিক জীবনসম্পন্ন করে না, সেইরূপ ধর্ম্মবিজ্ঞানও মানুষকে ধার্ম্মিক করে না। ধর্ম্মবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য তাহা নহে। ইহার উদ্দেশ্য পথ প্রদর্শন করা। বিশ্বাস ধর্ম্মজীবন-রূপ মহাবৃক্ষের অমৃতময় ফল। কিন্তু কি প্রণালীতে পূর্ব্বে এই ফল ফলিয়াছে ও পরেও ফলিতে পারে এবং আমরা যদি আমাদের জীবনে সেই ফল লাভ করিতে চাই তবে আমাদিগকে কি প্রণালী ও কি উপায় সকল অবলম্বন করিতে হইবে, ধর্ম্মবিজ্ঞান তাহাই নির্দ্দেশ করে। সুতরাং আত্মপ্রত্যয় বা সহজজ্ঞানই বল, প্রত্যক্ষ ব্রহ্মানুভূতিই বল বা বিশ্বাসই বল, কাহারও সঙ্গে জ্ঞান বা ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের কোনও বিরোধ নাই। ইহাদের কার্য্যক্ষেত্র স্বতন্ত্র। সুতরাং ইহাদিগকে তুলনায় সমালোচনা করিয়া একটীকে অন্যটী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট বলা সঙ্গত নহে।

আবার যে বলা হইয়াছে, আত্মপ্রত্যয়, সহজজ্ঞান বা বিশ্বাসের ভূমি

হইতে নামিয়া আসিয়া জ্ঞান যে ব্রহ্মবিষয়ক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তাহাতে আমরা ব্রহ্মবস্তুকে হারাইয়া তৎসম্বন্ধে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন অসংলগ্ন মীমাংসা প্রাপ্ত হই, এবং সহজ চক্ষে যাহা এক ও সমগ্র বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল তাহা বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে. এই আপত্তিও যুক্তিযুক্ত নহে। কেন না, বিজ্ঞান যে একত্ব সম্পাদন করিতে চায় তাহা সহজজ্ঞানে প্রতিভাত একত্ব অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্থানে অবস্থিত। সহজজ্ঞানে প্রতিভাত একত্বে আপাত-বিরুদ্ধ এবং পরস্পর হইতে বিভিন্ন ভাবগুলির কোনও যুক্তিসঙ্গত মিলনভূমি প্রদর্শিত হয় না। সকল গুলিকেই একত্র গ্রহণ করা হয় বটে, কিন্তু তাহারা কি রূপে একত্রিত হইতে পারে তাহাব কোন কারণ নির্দ্দেশ করা হয় না। এই একত্ব প্রকৃত একত্ব নহে। উহা সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিম। উহা একত্বের ছায়া মাত্র। কিন্তু এই বাহ্য (superficial) একত্বকে অতিক্রম করিয়া বিজ্ঞান এক উন্নততর একত্বের দিকে ধাবিত। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিজ্ঞান এই বাহ্যিক একত্বকে বিনষ্ট করতঃ উহাকে বহু খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলে এবং দেখাইয়া দেয়, যে যাহা সহজজ্ঞানের নিকট একত্ব বলিয়া মনে হইতেছিল তাহা প্রকৃত একত্ব নহে। কিন্তু এই বহুত্বের মধ্যে একত্ব যে কোথায় সহজজ্ঞান তাহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ, তাই বিজ্ঞানের বহুত্ব-প্রদর্শনকারী এই প্রাথমিক কার্য্য সহজজ্ঞানের নিকট বড়ই অপ্রীতিকর। কিন্তু উচ্চ লক্ষ্য-সাধনের জন্য বিজ্ঞান যাহা ভাঙ্গিয়াছে, বিজ্ঞানই তাহা গড়িবে। বিজ্ঞান এই বাহিরের একত্বকে বিনাশ করে বটে, কিন্তু অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া সূক্ষ্মদৃষ্টিবলে ইহা এমন এক যোগসূত্র আবিষ্কার করে যাহাতে "সূত্রে মণি-গণা ইব" সমস্ত বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে। সহজজ্ঞানের চক্ষে বহুত্বপূর্ণ এই দৃষ্ট জগতের একটী কৃত্রিম একত্ব প্রতিফলিত হয়, কিন্তু বিজ্ঞানাবিষ্কৃত এই যোগ-সূত্রের দ্বারা দৃষ্ট অদৃষ্ট, এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড স্বীয় বহুত্ব রক্ষা করিয়াও এক হইয়া যায়। সুতরাং বিজ্ঞানের প্রথম কার্য্য একত্ববিরোধী বলিয়া মনে হইলেও, একটী মহত্তর একত্বের পথ উন্মুক্ত করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। বিজ্ঞানের এই কার্য্য ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের স্থলেই আপত্তিকর বলিয়া মনে করা হয়, জড়বিজ্ঞানের স্থলে সে সম্বন্ধে কোনও আপত্তিই উত্থাপিত হয় না। শারীর-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত ছুরিকা-হস্তে দেহকে খণ্ড বিখণ্ড করতঃ যখন তাহার বাহ্য একত্বকে বিনাশ করিয়া আভ্যন্তরীণ একত্ব নির্ণয় করেন, তখন তাহা কাহারও নিকটে আপত্তিজনক বলিয়া মনে হয় না। সহজজ্ঞানের নিকট একটী শব্দ কেমন

মধুর, একটী রূপ কেমন সুন্দর। কিন্তু আলোক-তত্ত্ববিদ্ বা শব্দ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ঐ রূপ বা শব্দকে বিশ্লেষণ করিয়া তত্তৎ স্থানে আলো বা শব্দের উৎপত্তি বা লয়ের কতকগুলি নিয়ম প্রদান করেন। কিন্তু বাহ্য একত্বের অনুরোধে কি মানুষ বিজ্ঞানবিদের মীমাংসাগুলিকে পরিহার করে? কখনই না। যেহেতু, ঐ বাহ্য একত্বের স্থানে বিজ্ঞানবিদ্ যে একত্বের জ্ঞান প্রদান করেন, তাহা ঐ বাহ্য একত্ব অপেক্ষা লক্ষ গুণে অধিক লোভনীয়। আর, বিজ্ঞানের কার্য্য আংশিক বলিয়া তাহা কখনও পরিত্যক্ত হয় না।

বিজ্ঞান অপরিহার্য্য

এ কথা ঠিক, সহজজ্ঞানের নিকট যে স্থূল একত্ব ও জগতের সমগ্রত্ব প্রকাশিত হয় এবং বিজ্ঞানের হাতে যাহা বিনষ্ট হয়, তাহা কখনও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় না। বিজ্ঞানের নানা বিভাগের ফল একত্রিত করিলে একটা সমগ্র জগৎ পাই না। তাই বলিয়া কি বিজ্ঞান পরিত্যাগ করিতে হইবে? কখনই নহে। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড গ্রন্থের উপরিভাগটা দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকা অপেক্ষা ইহার একটী পৃষ্ঠার তত্ত্ব সবিশেষ অবগত হওয়া কি সহস্র গুণে বাঞ্ছনীয় নহে? যিনি প্রত্যহ ঐ প্রকাণ্ড মহাভারত গ্রন্থখানিকে নাড়িয়া চাড়িয়া উহার বাহিরটী দেখিয়া অত্যন্ত যত্নের সহিত ফুলচন্দন উপহার দিয়া, তসরের কাপড় দিয়া বান্ধিয়া রাখেন, কিন্তু উহার মধ্যে কি তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে তাহা জানিবার কোনই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন না, তাহা অপেক্ষা যিনি মহাভারতের বাহ্য একত্বকে বিনাশ করতঃ প্রত্যহ এক এক অধ্যায় পাঠ করিয়া আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করেন, তিনিই কি মহাভারতের প্রকৃত সদ্ব্যবহার করেন না? এই পন্থা অবলম্বনেই, আমরা আশা করিতে পারি, যে এক দিন মানবাত্মা সৃষ্টির মধ্যে যে জ্ঞান নিহিত রহিয়াছে তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিবে এবং তখনই প্রকৃত একত্ব আবিষ্কৃত হইবে। এই জন্যই বিজ্ঞান আদরণীয়। বিজ্ঞানের সকল বিভাগেরই কার্য্য-প্রণালী যখন ঐরূপ, তখন স্থূল বাহ্য একত্ব-বিনাশকারী আপাত-বিরক্তিকর ঐ কার্য্য দেখিয়া শুধু কেবল ধর্ম্মবিজ্ঞানকেই কেন পরিহার করিতে হইবে? পরিহার করা কখনও যুক্তিসঙ্গত নহে। আবার যে বলা হইয়াছে, বিজ্ঞান ব্রহ্মসম্বন্ধে কেবল কতক গুলি অসম্পূর্ণ মীমাংসা মাত্র প্রদান করে, তাহাও যথার্থ নহে। কেন না, স্বরূপের দিক্ হইতে ব্রহ্ম বিন্দুতেও পূর্ণ, সিন্ধুতেও পূর্ণ। সুতরাং তাঁহার স্বরূপ-বিষয়ক মীমাংসা আংশিক হইতে পারে না, স্বরূপ সর্ব্বত্রই সমান। আমরা যখন তাঁহার কোনও স্বরূপের সম্মুখীন হই, তখন পূর্ণ-ব্রহ্মেরই

সম্মুখীন হই। আর, তাহার স্বরূপগুলি এক অখণ্ড বস্তুর বিভিন্ন দিক্‌মাত্র, খণ্ড পদার্থ নহে—অদ্বয় চিদ্বস্তু। সুতরাং স্বরূপের দিক্ দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে, এক অখণ্ড পূর্ণ বস্তুই আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হন। তবে রূপের সম্বন্ধে এ কথা কখনও খাটে না। কেননা, রূপ দেশে ও কালে প্রকাশিত; দেশ কালে পূর্ণত্ব ও সমগ্রত্ব (totality) নাই। সুতরাং আমাদের কাছে রূপের পূর্ণ জ্ঞান অসম্ভব। তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। পিন্ সূঁচ হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় জাহাজ বাড়ী পর্য্যন্ত লৌহের দ্বারা কি কি জিনিষ প্রস্তুত হয় তাহা না জানিয়াও, "লৌহ জল অপেক্ষা এগার গুণ ভারী" উহার এই আপেক্ষিক গুরুত্ব, উহাকে টানিয়া কত সরু তার করা যায়, উহা দ্বারা কত সূক্ষ্ম পাত প্রস্তুত হয়, এই গুলি জানা থাকিলেই উহা দ্বারা কি কি বস্তু প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা তাহা পূর্ণরূপে জানা হয়; কেন না, রূপ স্বরূপের উপরেই নির্ভর করে। পক্ষান্তরে, সহজজ্ঞান যে-প্রকার সমগ্রত্ব দিতে চায় তাহা যে প্রকৃত সমগ্রত্ব ও একত্বের ছায়ামাত্র, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। যাহা হউক, জ্ঞান যে ব্রহ্মজ্ঞান গঠন করিতে প্রয়াসী হয় তাহার একটা কারণ আছে। কারণ এই, যে জ্ঞানপ্রধান-জীবন মানবের চিন্তা-প্রবাহের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় ধর্ম্মও জ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। তাহা না হইলে জ্ঞান কখনও ধর্ম্ম লইয়া আলোচনা করিতে যাইত না। সুতরাং মানবচিন্তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ ধর্ম্ম-বিষয়ক আলোচনা হইতে জ্ঞানকে রুদ্ধহস্ত করিলে, জ্ঞানপ্রধান-জীবন মানবকে তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। তাহাতে কুফল ব্যতীত কোনই সুফলের আশা নাই। বিজ্ঞানের সাহায্যে যেমন মানবচিন্তার অন্যান্য বিভাগ পরিপুষ্ট হইয়া বিশেষভাবে উন্নত হইতেছে, ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের সাহায্যে ধর্ম্মেরও সেইরূপ উন্নতি আশা করা যাইতে পারে। অথবা এই কথাই ঠিক, যে ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত ধর্ম্ম কখনও প্রকৃত পথে চলিতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্মের প্রকৃত উন্নতি ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের সাহায্য-সাপেক্ষ—জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ। মুণ্ডক, ৩।১।৮

পঞ্চম অধ্যায়

আপ্তবাক্য-তত্ত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

অপৌরুষেয়বাণী-বাদ

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

মানব-জ্ঞানে ঈশ্বর-বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা কোথায়? জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি? যাঁহারা বলিবেন কোন সম্বন্ধ নাই, তাঁহারা নানা দিক্ হইতে ইহার বিচার করিতে পারেন। প্রথম,—জ্ঞান-বিজ্ঞানের কাছে তো ঈশ্বর-বিশ্বাস কুসংস্কার মাত্র। সুতরাং, মানব যে পরিমাণে প্রকৃত জ্ঞানের সাক্ষাৎকার লাভ করিবে, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, ধর্ম্মও মানুষকে পরিত্যাগ করিবে। অন্ততঃ, ঈশ্বর-বিশ্বাস দূরে পলায়ন করিবে। ঈশ্বর-বিশ্বাস ছাড়া যদি কোন ধর্ম্ম থাকে, তবে তাহা থাকিতে পারে। প্রত্যুত্তরে বলা যায়, এই মতটি নিজেই একটী মস্ত কুসংস্কার। কিছুদিন পূর্ব্বে, এরূপ নাস্তিক্যবাদ থাকিলেও থাকিতে পারিত এবং কোন কোন স্থলে ছিলও। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তারে হুবহু নাস্তিক্যবাদ আর নাই। উহা কুসংস্কার বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং এ মতের বিচার নিষ্প্রয়োজন।

বিচারবুদ্ধি ও ব্রহ্মজ্ঞান

দ্বিতীয় উত্তর পূর্ব্ব দুই অধ্যায়ে আলোচিত ও খণ্ডিত হইয়াছে—মানব-জ্ঞান, মানবের বিচারবুদ্ধি, ধর্ম্মের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে না। মানবের এমন কোন মনোবৃত্তি নাই যাহার সাহায্যে সে ব্রহ্ম-তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ। তৃতীয়তঃ, ব্রহ্মতত্ত্ব তাহার নিকট উপর হইতে আসে। সে তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য। সে তত্ত্ব তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতীত; তাহার বিচারবুদ্ধি তাহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ। সে যদি তাহা লইয়া বিচার করিতে বসে, তবে অনর্থই ঘটাইবে। তাহা পাইলে নির্ব্বিচারে মস্তক পাতিয়া গ্রহণ কর—ইহাই ধর্ম্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে মানবের জ্ঞান-বুদ্ধির প্রকৃত মীমাংসা। অবশ্য, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, যে, তত্ত্ব উপর হইতেই মানুষের নিকট উপস্থিত হয়। ব্রহ্ম মানুষের নিকট নিজেকে প্রকাশিত করেন। ইহাই ধর্ম্মের ও ধর্ম্ম-জীবনের মূল ভিত্তি।

যাহাতে ব্রহ্ম-বাণীর স্থান নাই, তাহা ধর্ম্ম নামেরই যোগ্য নহে। বাস্তবিক, ধর্ম্ম-তত্ত্ব মানবের নিকট ব্রহ্মের প্রকাশ। এ কথা স্বীকার করিতে কোন ধর্ম্ম-বিজ্ঞানবিদ্ কুণ্ঠিত হইবেন না, যে, ব্রহ্মের প্রকাশ—বাণী (revelation) রূপেই ব্রহ্মের প্রকাশ, ছাড়া ধর্ম্ম হয় না। ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মবাণী-শ্রবণ ব্যতীত মানবের ধর্ম্ম-পিপাসা কখনও পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। জীব-আত্মার সঙ্গে পরম-আত্মার যোগ, জীবাত্মার পরমাত্মার সাক্ষাৎ লীলাই ধর্ম্ম। শুধু বুদ্ধি-বিচারের মীমাংসায় ধর্ম্ম হয় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। কিন্তু ইহা স্বীকার করিয়াও বলিতে হইবে, যে মানবের জ্ঞান ও তাহার বুদ্ধি-বিচারের সঙ্গে এই বাণী-তত্ত্বের যে সম্বন্ধ কেহ কেহ স্থাপন করিয়াছেন তাহা কখনও গ্রাহ্য হইতে পারে না। বুদ্ধি-জীবী মানুষের বুদ্ধি তাহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান পরিণতির সঙ্গে মিশ্ খায় না, এই মত কখনও স্বীকার করা যায় না। যে প্রকাশে, ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব ও মানুষের সর্ব্বপ্রধান গৌরব, তাহা তাহার জ্ঞানের বিরোধী বা তাহার জ্ঞানের অতীত, ইহা অতীব অসঙ্গত কথা। একটু তলাইয়া দেখিলেই ইহার ভ্রান্তি ধরা পড়িবে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কোন কোন মতে, বিচার-বুদ্ধির কাছে, ধর্ম্ম-কুসংস্কার বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এ মতে ধর্ম্ম অবশ্য বুদ্ধির গ্রাহ্য। ধর্ম্ম-তত্ত্বের আলোচনায় জ্ঞানের অধিকার আছে। অন্য মত বলিবে, ধর্ম্ম-তত্ত্ব বুদ্ধি-গ্রাহ্য নহে। মানব মন লৌকিক বিষয়েরই কেবল ধারণা করিতে পারে, আলোচনা করিতে পারে। পরমার্থ তত্ত্ব লৌকিক জ্ঞানের অতীত। হয়, সে তত্ত্ব মানবের জ্ঞান-বিচারের সম্পূর্ণ অতীত ; না হয়, তাহার সিদ্ধান্তের বিরোধী। অর্থাৎ, যাহা বিচারের কাছে অসম্ভব, তাহাই পরমার্থ-তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই মত কিন্তু ধর্ম্মকে জ্ঞানের অনধিগম্য বলিতেছে না। যাহা বুদ্ধির সিদ্ধান্তের বিরোধী, তাহাই সত্য—মানব-জ্ঞানের এই প্রতিজ্ঞার উপর পরমার্থ-তত্ত্ব-নির্ণয় নির্ভর করিতেছে। সুতরাং, সে তত্ত্ব বিচারের বাহিরে পড়িতেছে না! যদিও ধর্ম্মতত্ত্ব-নির্ণয় নিতান্তই একটা বুজ্‌রুকির ব্যাপার দাঁড়াইতেছে। জ্ঞান ও ধর্ম্ম যদি পরস্পর বিরোধী হয়, তবে কোন্‌টা গ্রহণীয় তাহার বিচার-ভার উভয়ের অতীত কিছুর উপর পড়িবে। সে কিছু কি? জ্ঞান ছাড়া আর তো কিছুই নাই। পারমার্থিক সত্য, অপৌরুষেয় বাণী যে গ্রহণ করিতেই হইবে, তাহা কাহার সিদ্ধান্ত? জ্ঞানের

সিদ্ধান্ত নয় কি? জ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়া লইলাম, যে বাণী গ্রহণ করিতে হইবে; অথচ জ্ঞানকে বলা হইতেছে, যে, যাহা তোমার মীমাংসার বিরোধী তাহাই গ্রহণ কর। ইহা যদি বুজ্‌রুকি না হয়, তবে বুজ্‌রুকি কি তাহা জানি না। সুতরাং জ্ঞান (reason)ও বাণী (revelation) একান্ত বিরোধী কল্পনা। অর্থাৎ বিশ্বাস যাহা গ্রহণ করিবে, জ্ঞান তাহা বর্জ্জন করিবে। তাহা হইলে ফল হইবে ঘোরতর অবিশ্বাস; না হয়, গায়ের জোরে সন্দেহ চাপিয়া রাখা। মানব-প্রকৃতি বিষয়ে যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহারা জানেন, এই চাপ চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে না। তাই সর্ব্বদেশে, বিশেষভাবে খৃষ্টীয় জগতে ইহার পরিণাম হইয়াছে জ্ঞানালোচনা-কারীদের পক্ষে অবিশ্বাস ও নাস্তিকতা। হয় জ্ঞানের সঙ্গে বাণীর বা আপ্তবাক্যের সামঞ্জস্য দেখাইতে হইবে; না হয়, জ্ঞান আপ্তবাক্য সম্বন্ধে হাঁ বা না কোন কথাই বলিবে না। অর্থাৎ আপ্তবাক্য জ্ঞান বিরোধী নয়, জ্ঞানের অতীত। আমাদের কাছে তাহা অবোধ্য হইতে পারে, অবোধ্য বলিয়া পরিত্যাগ করা চলিবে না, যদি প্রমাণ করা যায় যে ইহা আপ্তবাক্য বা অপৌরুষেয় বাণী। তাহা হইলে এখন প্রশ্ন হইতেছে, কি উপায়ে জ্ঞানের সাক্ষ্য অতিক্রম করিয়া, আপ্তবাক্যের আপ্ত-বাক্যত্ব প্রমাণ করা যায়।

আপ্তবাক্য ও মানবজ্ঞান

আপ্তবাক্য কি? ভগবান্ লোক-শিক্ষার জন্য অবতীর্ণ হইয়া যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, বা সময়ে সময়ে তিনি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদিগকে—যেমন আমাদের দেশে বিশ্বাস, ঋষিদিগকে—অনুপ্রাণনা দিয়াছেন এবং অনুপ্রাণিত অবস্থায় তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন বা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই আপ্ত-বাক্য। এখন দেখা যাক্, আমরা এখানে আমাদের জ্ঞানকে কতটা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইতেছি। ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া উপদেশ দিয়াছিলেন—এখানে দেখা যাইতেছে, আপ্ত-বাক্য উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই আমাকে আরও অনেক ধর্ম্মতত্ত্ব মানিয়া লইতে হইবে, যে গুলি আপ্তবাক্য হইতে পারে না। অর্থাৎ, ভগবান্ আছেন, তিনি অবতীর্ণ হন, তিনি উপদেশ দেন। এ উপদেশগুলি আবার সাধারণ তত্ত্ব হইতে বিভিন্ন হওয়া চাই, নতুবা ইহাদের কোনও প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না। সুতরাং লৌকিক ও পারমার্থিক তত্ত্বের পার্থক্য বিচার আমাকেই করিতে হইবে। কাজেই, ধর্ম্মতত্ত্ব আমার জ্ঞানের অতীত, এ কথার কোন সার্থকতাই থাকিতেছে না। কতকগুলি

তত্ত্ব আমার আয়ত্ত, আর কতকগুলি নয়—এ কথা বলিলেও ঐ বিপদ। কোন্ গুলি আয়ত্ত, আর কোন্ গুলি নয়, তাহাও আমারই বিচারাধীন। তারপর, এই উপদেশ গুলি যে আপ্তবাক্য, আপ্তবাক্যের জ্ঞান আমার আগে হইতে না থাকিলে, তাহা বুঝিব কিরূপে? যার কাঞ্চনের জ্ঞান নাই, কাঞ্চন তার কাছে উপস্থিত করিয়া কি লাভ? সুতরাং যাহা বাহির হইতে আনিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা যে আগে হইতে অন্তরেই রহিয়াছে। না থাকিলে, আপ্তবাক্য ও লৌকিক কথার কোন পার্থক্য আমার কাছে থাকিবে না। সুতরাং দাঁড়াইয়াছে—আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।

নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

—নারদপঞ্চরাত্র।

যদি বলা যায়, আপ্তবাক্যের মধ্যে এমন কিছু আছে, যে তাহা দেখ্‌লেই বুঝা যাবে উহা আপ্তবাক্য, ভিতরের কিছুর প্রয়োজন হইবে না, তাহা হইলে আমরা বলিতে বাধ্য এই দাবী নিতান্ত ভিত্তিহীন। শাস্ত্রাদি তো দূরের কথা; অবতারদিগের মুখ হইতে যাঁহারা উপদেশ শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই সে গুলি আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। যদি বলা যায়, বুঝিতে সময় লাগিবে, আত্মাকে প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহা হইলেও তো ভিতরের কিছুর প্রয়োজন হইতেছে। লৌকিক কথায় বলে—

আপ্তবাক্য ও তত্ত্বব্যাখ্যা

ঘুরে শোও ফিরে শোও, পৈথানেতে পা; ঘুরে ফিরে জ্ঞানেরই দ্বারস্থ হইতে হইতেছে। যে জ্ঞানকে বাদ দিয়া ধর্ম্মের সৌধ নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব, নেড় চেড়ে দেখা যায় সেই জ্ঞানরূপ ভিত্তির উপরই তাহা প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় কথা, তিনি যে অবতার তার প্রমাণ কি? শিষ্যেরাই তো অবতার গড়িয়াছে। তাহারা যে ভুল বুঝে নাই, তাহার মীমাংসা কে করে? প্রত্যক্ষ-দ্রষ্টা বা প্রত্যক্ষ-শ্রোতাদের মধ্যেই তো অনেক সময় মতভেদ উপস্থিত হয়। সুতরাং অবতার যে কি উপদেশ দিয়াছিলেন, খাঁটি খবর আমি পাব কোথায়? খালি ভগবানকে অবতীর্ণ হইয়া উপদেশ দিলে হইবে না। টীকাকারকেও অবতারই হইতে হইবে। তাতেও নিস্তার নাই—আমি যদি টীকাকারকে বুঝ্‌তে ভুল করি। সুতরাং আমাকেও অবতার,—নিদেন পক্ষে, অনুপ্রাণিত—হইতে হইবে। তাই যদি হয়, তবে ভগবান্ তো আমার অন্তর্য্যামিরূপে রয়েছিলেনই—তবে তাঁকে দু হাজার পাঁচ হাজার বৎসর আগেকার জুড়িয়া বৃন্দাবন হইতে

শাস্ত্রের রশি দিয়া টেনে আন্‌তে হবে কেন? যতই তলাইয়া দেখা যায়, দেখা যাইবে ধর্ম্মতত্ত্বের আদি অন্ত মধ্যে জ্ঞানের জালই জড়িত রহিয়াছে। "ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে"। আর যদি অবতার বলিয়া থাকেন, যে তিনি স্বয়ং ভগবান্, তা'হলেই কি সেটা বিনা বিচারে গ্রহণ করিতে হইবে? যে কেউ ভগবানত্বের দাবী করিলেই যদি তাহাকে ভগবান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে এ বিশ্বে ভগবানের ঠাঁই হইবে না। সংসারে বাতুলের সংখ্যা কম নয়। মৃগী হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি আপদে পড়িয়া মানুষ অনেক সময় অনেক অনর্থ ঘটাইয়া থাকে। সুতরাং এখানেও বাছিয়া লইতে হইবে এবং সাচ্চা ঝুটা বাছিয়া লইবার ভার আমরই। অন্যদিকে, অনুপ্রাণিত হইয়া উপদেশ দিবার বা লিপিবদ্ধ করিবারও বিপদ কম নয়। কোন্ টুকু অনুপ্রাণন, কোন্ টুকু মানুষ নিজের নিম্নভূমির কথা যোগ করিতেছে, তাহা বুঝিব কি রূপে? যাঁহারা প্রেততত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা মধ্যবর্ত্তীকে অজ্ঞান করিয়াও নিস্তার পান না। প্রেত মধ্যবর্ত্তীর মধ্যদিয়া কিছু প্রেরণ করিল; মধ্যবর্ত্তীর সুপ্ত আত্মা (subliminal self) তাহার মধ্যে কিছু যোগ করিয়া দিল—সে অজ্ঞাত সারেই করিল, ইচ্ছা করিয়া করিল না। সুতরাং আমরা প্রেতলোকের খাটি খবর পাইলাম না। এখানেও তুঁষ হইতে শষ্য বাছিয়া লইবার ভার জ্ঞানের; নান্যঃ পন্থা। বাস্তবিক, যখন কিছু দেখিয়া বা শুনিয়া বলি,—আহা! কি স্বর্গীয়!—মনে রাখিতে হইবে, স্বর্গটা ভিতরে; বাহিরে নয়। কেহ হয় তো বলিতে পারেন, অবতার বা অনুপ্রাণিত ব্যক্তি যখন অতিপ্রাকৃতিক বা অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা আপনার ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, তখন তাঁহার উপদেশ বিচার-বিতর্কের অতীত; সুতরাং অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে! এখানেও ধরিয়া লওয়া হইতেছে, লৌকিক অলৌকিক সকল জ্ঞানই আমার মধ্যে আছে এবং কোন্‌টা লৌকিক কোন্‌টা অলৌকিক তাহার বিচারকর্ত্তাও আমি। জ্ঞানের সীমানা সঙ্কুচিত হওয়া দূরে থাকুক, অনেকটা বেশী বিস্তৃত হইয়া পড়িল। যখন কোন ঘটনাকে বলিব, ইহা নৈসর্গিক নয়, তখন সকল নৈসগিক জ্ঞান তো আমার মধ্যে থাকা চাই-ই এবং ঐ জ্ঞান-ভাণ্ডার অতিক্রম না করিলে, কোন কিছুকে নৈসর্গিক নয় বলিবারও অধিকার থাকিবে না। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ না হইলেও, আমাকে তাঁহার কাছাকাছি পৌছিতে হইবে। আমার অজ্ঞানতা দেখাইতে যাইয়া, আমার ঘাড়ে ত্রিকালের জ্ঞানের বোঝা চাপান হইল! রহস্য মন্দ নয়। তারপর,

মানুষ যখন সর্ব্বজ্ঞ নয়, তার জ্ঞান যখন ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইতেছে, তখন আজ যাহা অবোধ্য, কাল যে তাহা বোধগম্য হইবে না, তাহার প্রমাণ কি? দুই হাজার বৎসরে একটা কথার মীমাংসা হয় নাই বলিয়া চিরদিনই তাহা অমীমাংসিত থাকিবে, তাহার কোন অর্থ নাই। বরং দেখিতেছি, যাহা এক দিন মহা মহা পণ্ডিতের কাছে অনৈসর্গিক বলিয়া মনে হইয়াছিল, স্কুলের বালকের কাছেও আজ তাহা অতি স্বাভাবিক। আজ এই মুহূর্ত্তে বৈজ্ঞানিকের কাছে যাহা নিতান্ত সহজবোধ্য স্বাভাবিক, সাধারণ নিরক্ষর ব্যক্তি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তাহাকে অতি-প্রাকৃতিকের সম্মান প্রদর্শন করিতেছে। সুতরাং চৈতন্যদেব ষড়্ভুজ-রূপ দেখাইয়াছিলেন, এই হেতুতে যে একজন বৈষ্ণব আমাকে তাঁহার ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিতে বলিয়াছিলেন, আমি নানা কারণেই সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। প্রথমতঃ, উহা যে অতি-প্রাকৃতিক তাহার প্রমাণ নাই। দ্বিতীয়তঃ, উহা ভেল্কীও হইতে পারে। বাজীকরেরা তো অনেক ঘটনায় এমনই তাক্ লাগাইয়া দেয়। আমি ভেল্কীবাজীর অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যাহার অর্থ তখনও বুঝি নাই, এখনও বুঝি না। সুতরাং কি স্বীকার করিব, যে আমাদের গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে অনেক ঈশ্বর ছদ্মবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। যদি বলা যায়, তাঁহার অন্যান্য কার্য্যের আলোকে তাঁহার অবতারত্ব স্বীকার করিতে হইবে; তাহা হইলে ঈশ্বরত্বের প্রমাণ আমার বুকের মধ্য হইতে টানিয়া বাহির করিতে হইবে, বাহির হইতে আমার উপর চাপাইলে চলিবে না। তৃতীয়তঃ, উহা যে সত্য ঘটনা, তাহা আমি হঠাৎ কেমন করিয়া স্বীকার করিব। ইতিপূর্ব্বে কত ঘটনা অনৈতিহাসিক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, যাহা বহুদিন ঐতিহাসিক বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত। এই তো সে দিনের কথা; এখনও লোকের মনে সন্দেহ রহিয়াছে, যে আসল নেপোলিয়নকেই সেণ্ট্ হেলেনায় পাঠান হইয়াছিল কি না। ইতিহাস-পুরাণে এমন কত কথা আছে যাহা বস্তুতঃ সত্য নহে। যদি বলা যায়, যাঁহারা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা ভাল লোক, অনুপ্রাণিত, মিথ্যা লিখিতে পারেন না। তাহা হইলে, অনুপ্রাণিত হইয়া লিখিলেও কি বিপত্তি ঘটিতে পারে, সে সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এখানেও স্মরণ করিতে হইবে। তার পর, যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রকার বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ কেহ কেহ স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য

জ্ঞান অনতিক্রমণীয়

সত্যের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকেন নাই, ঐতিহাসিকগণ চোখে আঙ্গুল দিয়া তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। যাহারা ধরা পড়িয়াছেন, তা ছাড়া সে দলে আর কেহ নাই, তাহা বুঝিব কি রূপে? এবং তাহা যদি বুঝিতে হয়, তবে তাহা বুঝিবার ভারও আমারই জ্ঞানের। মানুষ আপনার ছায়ার ন্যায় আপনার জ্ঞানকে অতিক্রম করিতে অসমর্থ। বাস্তবিক যাঁহারা জ্ঞানের বিচার পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে চাহেন তাঁহাদের কথা এইরূপ আগাগোড়া চক্রক হেত্বাভাসে (*petitio principii*এ) পরিপূর্ণ।

ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, কোন মত জ্ঞান-বিরুদ্ধ হইলে, তাহা স্ব-বিরোধিতা দোষে দুষ্ট হয়। সেই জন্য ধর্ম্মবিষয়ক তত্ত্ব সকল জ্ঞানাতীত বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জ্ঞানাতীত বলিলেও কি দোষ ঘটে তাহাও আমরা দেখিয়াছি। বাস্তবিক, এই দুই মতে পার্থক্য অতি কম; নাই বলিলেই হয়। আমাদের দেশের মায়াবাদীরা বলেন, যে সংসারটা মায়া-বিজড়িত। এখানকার যা কিছু সব অজ্ঞানতা-প্রসূত। সত্য বা পার-মাথিক তত্ত্ব এখানে পাওয়া যাইবে না। এখানে যা কিছু করিবে, সবই তত্ত্ব-বিরোধী। প্রকৃত তত্ত্ব হ'ল, ব্রহ্মতত্ত্ব। তাহা সংসারের অতীত। সে তত্ত্ব না পাইলে, সংসারের অতীত হইতে পারিবে না। যতক্ষণ সংসারে আছ, সে তত্ত্ব পাইবে না। অর্থাৎ, যার ব্রহ্মজ্ঞান আছে, তার সংসার নাই; যার সংসার আছে, তার ব্রহ্মজ্ঞান নাই। এই সংসারে বেড়াইতে বেড়াইতে, যদি কেহ ঠিক্‌রাইয়া ব্রহ্মজ্ঞানে যাইয়া পড়ে, তবেই তার ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে; কিন্তু সে পথও রুদ্ধ। কেন না, ব্রহ্মজ্ঞান সংসারের অতীত, লৌকিক জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেটা যে কি, তাহাও না পাওয়া পর্য্যন্ত বুঝিবার সাধ্য নাই। পাইলে আবার সংসার জ্ঞান লুপ্ত হয়; তুলনার অবসর থাকে না। সুতরাং, আমরা যখন আমাদের জ্ঞান ছাড়া অন্য কোন জ্ঞানের খবর রাখি না, রাখিতে পারিও না, তখন যা কিছু আমাদের এই জ্ঞানের সঙ্গে সুসমঞ্জস নহে, তাহাও অসঙ্গত বা স্ববিরোধী বলিয়াই আমাদের মনে হইবে। জ্ঞানবিরুদ্ধ ও জ্ঞানাতীত তখন এক কথাই দাঁড়াইবে। যা এখন বুঝি না, পরে বুঝিতে পারি, তার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু আমার জ্ঞানের দ্বারা কোন কালেই যার ব্যাখ্যা হইবে না, তার সঙ্গে সুতরাং কোন কালে আমার কোন সম্বন্ধের কল্পনা, নিতান্তই কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নহে।

জ্ঞানের ক্রমোন্নতি

তবে, এ কথা সত্য, আত্মায় পরমাত্মার প্রকাশে মানুষ যে সকল ভাব প্রাপ্ত হয়, তার সকলই যে সে তৎক্ষণাৎ বুদ্ধির বিচারে আয়ত্ত করে বা ভাষায় সম্যক্ ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়, তাহা নহে। কিন্তু যা কিছু প্রকাশিত হয়, তাহা তাহার জ্ঞানবিরুদ্ধ বা জ্ঞানের অতীত হইতে পারে না। অধ্যাত্ম বিষয় তো দূরের কথা, মানুষ তো ব্যাবহারিক তত্ত্বই ভাষায় প্রকাশ করিতে যাইয়া হয়রান হইয়া পড়ে। মানুষের ভাষার দুর্ব্বলতা তো পদে পদেই প্রত্যক্ষ করা যায়। এমন যে প্রচলিত কথা—'খাওয়া', তা লইয়াই না মানুষ কত বিব্রত। সে ভাত খায়, তা তো সকলেই জানে। কিন্তু কাণমলা, খাবি ও ডিগ্‌বাজী খাইতেও কসুর করে না। কলা, ঘোল ও মাটি একাধিক রকমে খায়। কখন কোন্ রকমে খায়, তা ভাষা নির্ণয় করিতে অসমর্থ, মনের ভাবের সাহায্য লইতে হইবে। নতুবা হিতে বিপরীত ঘটিবে। স্পষ্ট নিরাকারবাদী, আকার ইঙ্গিতে নহে, কিন্তু স্পষ্টভাবেই যখন স্বীয় ইষ্টদেবতাতে মুখ, চরণ, হাত আরোপ করে, তখন কথাটা বুঝিতে ভাষাকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে হয়। ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না বলিয়া কথাটা বুঝি নাই, তা নয়। মানুষ মনের ভাব ব্যক্ত করিতে যাইয়া সর্ব্বদাই রূপক ও উপমার (analogyর) সাহায্য লয়। উপমার ব্যবহার সম্ভব হয়, জ্ঞানের কাছে উপমা ও উপমেয়ের মধ্যে কোন জাতিগত পার্থক্য নাই বলিয়া। যাহাকে উপমা দ্বারা বুঝাইতে যাই, তাহার উক্ত বিষয়ে সম্যক্ ধারণা না থাকিলে, উপমা খুঁজিতে যাওয়া অনর্থক হইত। ভাষার দৈন্য, ভাবের ঘরের শূন্যতা সূচনা করে না। মানুষের অভিজ্ঞতা দার্শনিক তত্ত্বে পরিণত হইতে সময় লাগিতে পারে, কিন্তু তাহা জ্ঞানের বাহিরে থাকিতে পারে না। জ্ঞান বলিতে যদি মানুষের সমগ্র প্রকৃতির সাক্ষ্য ("Human powers of insight in their complete scope"—Howison) বুঝি, তাহা হইলে জ্ঞানাতীত কথাটাই অর্থশূন্য হইয়া যাইবে।

শেষকথা। আমাদের দেশে অপৌরুষেয় বাণী বা আপ্তবাক্য-বাদ বোধ হয় বৈদেশিক শাস্ত্রবাদের প্রভাবে প্রাচীন ঋষিদের নির্দ্দিষ্ট পন্থা হইতে কিছু সরিয়া পড়িয়াছে। সে তত্ত্বের বিচার পরে আসিতেছে। ঋষিদের শাস্ত্রবাদ—"তত্রাপরা" মন্ত্রের মধ্য দিয়া জ্ঞানের বিষয় সমূহের মধ্যে উচ্চ নীচের ভেদ স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু জ্ঞান এক। জ্ঞানের যে অংশ ব্রহ্মমুখী, তাহাই শ্রেষ্ঠ। গ্রন্থ-বিশেষকে আপ্তবাক্যের আধার বলা চলে না। যাহা দ্বারা

ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ এবং আমার জ্ঞানই তাহা নির্ণয় করিবার একমাত্র-বর্ত্তিকা। কেন না, বেদাদি যদি তাহা নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হয়, তবে তাহাও অগ্রাহ্য।

ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ। জ্ঞানের আলোকে যাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহাই শাস্ত্র। সত্যং শাস্ত্রম্—তাহাই সে কেবল অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে বাধ্য। সুতরাং অপৌরুষেয় বাণী পুরুষের অনধিগম্য তো নহে-ই, বরং সে সর্ব্ব প্রযত্নে শ্রদ্ধানতচিত্তে স্বীয় জ্ঞানের আলোকে ভগবত্তত্ত্বের আলোচনা ও অনুসন্ধান করিয়া কৃতার্থ হইবে। এই খানেই তাহার বুদ্ধিবৃত্তির চরম সার্থকতা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শাস্ত্রবাদ—প্রাচীন ও নবীন

যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যত্তৃণবদগ্রাহ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥

জগতে নানা শাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছে। সকল ধর্ম্মই শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। সকলেই একখানি গ্রন্থ বা কতিপয় গ্রন্থকে শাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই গ্রন্থ-সকলের উক্তিকে তাঁহারা অভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন। এই শ্রেণীর শাস্ত্রবাদ বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বপ্রধান আবিষ্কারের বিরোধী। শাস্ত্র নামে পরিচিত গ্রন্থগুলি যদি কেবল ধর্ম্মের দুই একটী মূল তত্ত্বের কথা বলিয়াই নিরস্ত হইতেন, তবুও বা ইহার একটা অর্থ বুঝিতে পারিতাম; কিন্তু তাঁহারা যখন এমন কোন তত্ত্ব নাই যাহার সম্বন্ধে কথা বলেন নাই, তখন তাঁহাদের সম্বন্ধে এই দাবী বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। পুরাকালে কোন এক দিন ব্যক্তি-বিশেষ বা কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে সকল তত্ত্ব আবির্ভূত হইয়াছিল, ইহা ক্রমবিকাশবাদ (Evolution Theory) স্বীকার করিবে না। মানবের ধর্ম্মও যখন ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়াছে, তখন যে মত বলে শাস্ত্র গ্রন্থে নিবদ্ধ তাহা আর গৃহীত হইতে পারে না। তাই বর্ত্তমান যুগে এক নূতন শাস্ত্রবাদ প্রচারিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রবাদ একটী মাত্র সূত্রে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে—"সত্যং

শাস্ত্রমনশ্বরম্"। গ্রন্থনিবদ্ধ শাস্ত্রবাদের সঙ্গে ইহার বিভিন্নতা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এখন প্রশ্ন এই. ইহা কি সম্পূর্ণ একটী নূতন মত, না ইহার পশ্চাতে ইতিহাস বর্ত্তমান রহিয়াছে। হিন্দুর দেশে ইহার জন্ম এবং সংস্কৃত ভাষাতে ইহার আবির্ভাব; সুতরাং হিন্দুর শাস্ত্রবাদের অভিব্যক্তি পর্য্যালোচনা করিলেই আমরা এই প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিব।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দু শাস্ত্রকারগণ শাস্ত্রকে গ্রন্থের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিবার বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। যাঁহারা মনে করেন বেদই হিন্দুর প্রামাণ্য শাস্ত্র, তাঁহারা বেদেরই মধ্যে ইহার প্রতিবাদ শুনিয়া কি মনে করিবেন, জানি না। প্রাচীন উপনিষদ্ মুণ্ডক (১।১।৫) বলিতেছেন, 'তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥" ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ—এ সকলই অপরা বিদ্যা। কিন্তু যাহা দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষ ব্রহ্মকে জানা যায়, কেবল মাত্র তাহাই পরা বিদ্যা। গ্রন্থনিবদ্ধ-শাস্ত্র সম্বন্ধে যদি বলা যায়, যে ইহার এক অংশ অন্য অংশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা হইলে যে তাহার শাস্ত্রত্বই বিনষ্ট হয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। এখানে তাহাই হইয়াছে। শাস্ত্র বলিতে সাধারণতঃ লোকে গ্রন্থই বুঝে, কিন্তু ঋষি আমাদের মনে তদতিরিক্ত কিছু পাইবার আশা জাগাইয়া তুলিতেছেন। যে দিন "তত্রাপরা" এই উপনিষদ্রূপ বেদমন্ত্র রচিত হইয়াছিল, সে দিন হিন্দুর শাস্ত্রবাদ যে জগতের ভবিষ্যৎ অন্যান্য সকল শাস্ত্রবাদ হইতে বিভিন্ন হইবে, তাহারই সূচনা হইয়াছিল। যে দেশে বেদ বেদান্ত গীতা পুরাণ তন্ত্র—এবং সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া হাজার হস্তের রচিত সকল গ্রন্থই শাস্ত্র বলিয়া পূজিত, সে দেশের শাস্ত্রবাদ পুস্তকের মধ্যে নিবদ্ধ হইতে পারে না।

এখানে একটী কথা বিশেষভাবে প্রণিধান করিয়া দেখিতে হইবে। উক্ত মন্ত্রে বেদই কি বলিতেছেন না, যে বেদ শাস্ত্র নহেন! যদ্দারা ব্রহ্মজ্ঞান হয় তাহাই শাস্ত্র। তাহা বেদ নামক গ্রন্থাবলিতেও থাকিতে পারে এবং অন্যত্রও থাকিতে পারে। সে সময়ে তন্ত্র পুরাণ ছিল না, তাই উল্লেখ নাই। এখন আমাদের কাছে বাইবেল্ কোরাণ উপস্থিত। ঐ মন্ত্রের বলে কেন বলিব না, যে ইহাদের মধ্যে মোক্ষ-প্রতিপাদক কিছু থাকিলে তাহাও শাস্ত্র। কেবল তন্ত্র পুরাণ কোরাণ বাইবেল্

কেন, আমি এই মুহূর্ত্তে যাহা বলিতেছি তাহার মধ্যে সেই "অক্ষর"কে জানাইয়া দিবার মত যদি কিছু থাকে তবে হিন্দু শাস্ত্রবাদে তাহাও সকলে ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। কেননা, উহা বেদের বাণী। হিন্দুর এই প্রকৃত শাস্ত্রব্যাখ্যা-প্রণালী অবলম্বন করাতেই রাজর্ষি রামমোহন শাস্ত্রবিচারে দিগ্বিজয়ী হইয়াছিলেন। যাহা হউক, বেদই বলিয়াছেন বেদ শাস্ত্র নয়। কথাটা তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে, যে ইহা একটী আত্মজ্ঞানের কথা। নিজের সম্বন্ধে যখন কেহ কিছু বলে তখনই তাহাতে আত্মজ্ঞান প্রকাশ পায়। আত্মজ্ঞান পাইতে হইলে নিজেকে অতিক্রম করা চাই—নিজেকে অতিক্রম করিয়া উপরে উঠা চাই। কুকুর জানে না যে সে কুকুর। মানুষেরই আত্মজ্ঞান হয়। কেন না, তাহার মধ্যে তাহা অপেক্ষা উচ্চ কিছু, জ্ঞাতসারে হউক অজ্ঞাতসারে হউক, আত্মপ্রকাশ করিয়া রহিয়াছে। একটা উপরের কিছু আত্মস্থ না করিলে আত্মজ্ঞান হয় না, নিজের দীনতা হীনতা উপলব্ধি করা যায় না। যাঁহার কর্ম্মের তালিকা দেখিয়া এক শতাব্দী পরেও আজিকার মানুষও বিস্ময়ে তাকায়, তিনি নিজেকে কিন্তু নিতান্তই "অকিঞ্চন' মনে করিতেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ছেলেদের সঙ্গে গুলি খেল্‌তে গিয়াছিলেন। খেলাটা মনঃপূত না হওয়ায় এক বালক বলিয়া উঠিল, "দাদামশায়, তুমি কোন কর্ম্মের নও"। শাস্ত্রীমহাশয় বালকের এই মন্তব্যই স্বীয় কর্ম্মময় জীবনের যথাযথ নির্দ্ধারণ বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। যাঁহারা জগতের কাছে কর্ম্মিশ্রেষ্ঠ তাঁহারা নিজের কাছে অকর্ম্মা এইজন্য যে তাঁহারা একটা মস্ত আদর্শ আত্মস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অপরোক্ষানুভূতিতে যে আদর্শ ধরিয়াছিলেন, বাহ্যতঃ সে আদর্শের যতটা প্রত্যক্ষ-গোচর, আপনারা তাহা অতিক্রম করিয়া অনেক উচ্চে অবস্থিতি করিতেন। তাই নিজের প্রতি তাঁহাদের হতাদর, শত অশ্রদ্ধা। কতকগুলি কথা গ্রন্থবদ্ধ হইয়া বেদ হয় না। বেদ একটী আদর্শ—বেদ আলোকবর্ত্তিকা যাহা দিয়া শাস্ত্র দেখিয়া লইতে হইবে, সত্য নির্ণয় করিতে হইবে। লৌকিক বেদকে অতিক্রম করিয়াই এই আদর্শ—এই অপৌরুষেয়—বেদ। এই অপৌরুষেয় বেদই ঋষির নিকট "তত্রাপরা" মন্ত্ররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। বেদকে গ্রন্থে নিবদ্ধ করিবার পথ এই শ্রুতিটি চিরদিনের তরে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে, যেমন "বৃষ্ণীণাং বাসুদেবোঽস্মি" শ্লোক অবতারবাদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। পুরুষ

যেমন অপৌরুষেয় হইয়া, আপনাকে অতিক্রম করিয়াই আত্মজ্ঞান লাভ করে, তেমনই এই অপৌরুষেয় বেদবাক্যেই বেদের আত্ম-পরিচয়। যাঁহারা বেদকে কোরাণ বাইবেলের নিম্নস্তরে নামাইয়া আনিয়াছিলেন তাঁহারা দেখুন, হিন্দুর শাস্ত্রবাদকে এই অনর্থ হইতে রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সর্ব্ব বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও ব্রাহ্মসমাজ খাঁটি হিন্দুত্বের উত্তরাধিকারী। সত্য হইল বস্তু, আর জগতে যাহা শাস্ত্র বলিয়া খ্যাত তাহা বাক্য-সমষ্টি। কাজ ও কথায় যে পার্থক্য, ব্রাহ্মসমাজের শাস্ত্রবাদের সঙ্গে প্রচলিত শাস্ত্রবাদ-সমূহের সেই পার্থক্য।

কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে তুলনা করতঃ শেষোক্তকে প্রাধান্য দিয়া হিন্দুর শাস্ত্রবাদের যে গতি আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। শাস্ত্র-নামক বিশাল জঙ্গলে কোন্‌টি গাছ, কোন্‌টা আগাছা তাহা নির্ণয় করিবার জন্য শাস্ত্রকারগণ একটী বর্ত্তিকার অন্বেষণে বাহির হইলেন। তাঁহারা বলিলেন,

অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসঃ যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্‌॥

শাস্ত্র অনন্ত, জানিবার বিষয়ও বহু; (তাহাতে আবার) কাল অত্যল্প এবং বিঘ্নও অনেক। (তবে কি করা যায়?) হংস যেমন জলমিশ্র দুধের দুধটুকুই টানিয়া লয়, তেমনই যাহা সার তাহারই উপাসনা করিবে। অর্থাৎ সারং শাস্ত্রং। যাহা সার তাহাই শাস্ত্র। কিন্তু কি সার আর কি অসার তাহাই বা বুঝাইয়া দেয় কে? তাহা না বুঝিতে পারিলে এ বাক্যেরও কোন সারবত্তা থাকে না। তাই মীমাংসা হইল—"মোক্ষ-প্রতিপাদকং শাস্ত্রম্‌।" কেহ চাহেন ধন, কেহ চাহেন জন, কেহ চাহেন স্বর্গ; ঋষি বলিলেন, ঐ-সব পথ যাহাতে বর্ণিত আছে তাহা শাস্ত্রনামবাচ্য নহে। যাহা দ্বারা মোক্ষ প্রতিপাদিত হয় তাহাই কেবল শাস্ত্র। মোক্ষ হয় কিসে? "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"। অন্ধকারের পরপারের সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে জানিলেই কেবল মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে, মোক্ষলাভের অন্য পথ নাই। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক যাহা, তাহাই শাস্ত্র। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, সুতরাং সত্যকে জানিলেই ব্রহ্মকে জানা হয়, তাই "সত্যং শাস্ত্রং অনশ্বরম্‌।" আমরা উপনিষদে যে গতি লাভ করিয়াছিলাম, তাহাই আমাদিগকে ব্রাহ্মসমাজে

আনিয়া উপনীত করিয়াছে। "সতং শাস্ত্রমনশ্বরম্" আর কিছুই নহে, "মোক্ষ প্রতিপাদকং শাস্ত্রম্" হিন্দুর এই শাস্ত্রবাদের যুগোপযোগী সংস্করণ মাত্র। ব্রাহ্মসমাজের শাস্ত্রবাদই বর্ত্তমান যুগের শাস্ত্রবাদ। ইহা এক দিকে যেমন হিন্দুর শাস্ত্রবাদের মূল তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, অন্যদিকে আবার উহা বর্ত্তমান যুগের জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সাধনার বিরোধী নহে। সাধারণ শাস্ত্রবাদীকে বর্ত্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের আঘাত সাম্‌লাইতে যাইয়া কত কূট ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইতেছে, কত ইতিহাসবিরুদ্ধ তত্ত্বের অবতারণা করিতে হইতেছে। এই যুগোপযোগী বিজ্ঞানসম্মত শাস্ত্রবাদ কোনও বিশেষ গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়া ইহা এই সমস্ত বিচার বিতর্কের অতীত। ইহা একখানা গ্রন্থ নহে, কিন্তু একটী আদর্শ, একটী ভাব। হিন্দু শাস্ত্রকারও শাস্ত্র নামে একখানা গ্রন্থ বা কতিপয় গ্রন্থ আমাদিগকে প্রদান করেন নাই, দিয়াছেন একটি আদর্শ। গ্রন্থ নাই তাহা নহে, অনেক আছে। কিন্তু এই সকলের মধ্য হইতে এই আদর্শের আলোকে শাস্ত্র উদ্ধার করিয়া লইতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজও ঠিক এই কথাই বলিতেছেন। যাঁহারা হিন্দুর শাস্ত্রবাদকে অজ্ঞানতা বশতঃ তথাকথিত কোনও অভ্রান্ত গ্রন্থের মধ্যে আবদ্ধ করিতে চাহিতেছেন তাঁহারা আপনাদের অজ্ঞাতসারেই হয় তো ইহাকে ইহার গৌরবান্বিত স্বাতন্ত্র্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়া খৃষ্টীয় বা মহম্মদীয় শাস্ত্রবাদের নিম্ন ভূমিতে নামাইয়া দিতেছেন। ব্রাহ্ম-সমাজই হিন্দুর এই প্রতিদ্বন্দ্বিরহিত শাস্ত্রবাদকে নিম্নতর শাস্ত্রবাদসকলের অনুকরণকারিগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। যে হিন্দু বলেন, ব্রাহ্মগণ শাস্ত্র মানেন না, তিনি হয় নিজের শাস্ত্র কি তাহা জানেন না, না হয়, ব্রাহ্মের শাস্ত্রবাদ কি তাহা বুঝেন না; অথবা উভয় সম্বন্ধেই অনভিজ্ঞ। হিন্দুর যে উচ্চ শাস্ত্রবাদ জগৎ ভুলিয়া যাইতেছিল ব্রাহ্মসমাজ তাহারই পুনঃসংস্থাপন ও সম্প্রসারণ করতঃ নবযুগের শাস্ত্ররূপে সকলের সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন। ইহাকে এমন আকার দেওয়া হইয়াছে, যে ইহার অভ্যর্থনায় ও অভিনন্দনে কাহারও আপত্তি হইবে না। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান—সকলেই ইহার বিশাল ছায়াতলে আশ্রয় লইবার জন্য আহূত। এখানে সকলেরই স্থান রহিয়াছে। যে শাস্ত্রবাদ এইরূপ উদার ও সার্ব্বভৌমিক নহে, তাহা বর্ত্তমান যুগের শাস্ত্রপদবাচ্য হইবার যোগ্য নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

-✱ঃ✱ঃ✱-

অবতীর্ণব্রহ্ম-বাদ

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। গীতা

-ঃ✱ঃ-

প্রথম পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণতত্ত্ব

ক। আখ্যান-ভাগ

অদিতেরপি পুত্ত্রত্বমেত্য যাদবনন্দন।
ত্বং বিষ্ণুরিতি বিখ্যাত ইন্দ্রাদবরজো বিভুঃ ॥ ২৫
শিশুর্ভূত্বা দিবং খঞ্চ পৃথিবীঞ্চ পরন্তপ।
ত্রিভির্বিক্রমণৈঃ কৃষ্ণ ক্রান্তবানসি তেজসা ॥ ২৬
সম্প্রাপ্য দিবমাকাশমাদিত্যস্যন্দনে স্থিতঃ।
অত্যরোহশ্চ ভূতাত্মন্ ভাস্করং স্বেন তেজসা ॥ ২৭

বনপর্ব্ব, ১২শ অধ্যায়।

নূতন কথা শুনিলে মানুষ চম্‌কে উঠে। এ ভাব যে অশিক্ষিতের মধ্যেই আবদ্ধ, তাহা নহে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে তাঁহার নূতন মত বৈজ্ঞানিক সমাজকে লওয়াইতে যে বেগ পাইতে হইয়াছে, তাহাতেই প্রমাণ হয়, মানুষের পুরাতন ছাড়িয়া নূতন লইতে একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা আছে। কোপার্ণিকাসের জ্যোতিষ-তত্ত্ব গ্রহণ করিতে পণ্ডিত সমাজেরই দেড় শত বৎসর লাগিয়াছিল। নূতন ভূতত্ত্বের মত সহজে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ডারুইন্ ও তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যদিগকে ক্রমবিকাশবাদ লইয়া কি হয়রাণই না হইতে হইয়া ছিল? এখনও যে কেহ কেহ মাঝে মাঝে হুঙ্কার দিয়া না উঠেন, তাহা নহে। কিন্তু Church of Englandএর পাণ্ডারাও এখন মাথা অবনত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যদিও আমেরিকা নূতন করিয়া Red Indianদের দলভুক্ত হইবার জন্য কোমর কাঁচিয়াছে।* দুঃখের বিষয়, সত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রথম ধর্ম্মের নামেই হইয়া থাকে। এমন যে সহজ কথা, অস্ত্রোপ্রচারের পূর্ব্বে অস্ত্রখানা ভাল করিয়া ধুইয়া লইতে হইবে, ইহা লইয়াও

ডাক্তার লিষ্টারকে কি নাকালই না হইতে হইয়াছিল? যদি এরূপ করিলে মানুষের উপকারই হইবে তবে আমাদের বাপ পিতামহ ইহা আবিষ্কার করেন নাই কেন? ইহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিলেই উপাধি লাভ হইবে কালাপাহাড়। মানুষ সহজে এত উপাধির বোঝা ঘাড়ে লইতে রাজি হয় না। তবুও সত্য কথা বলিতেই হইবে।

কৃষ্ণতত্ত্বের আদি বেদে

ঋগ্বেদে যে-কৃষ্ণের প্রশংসাসূচক মন্ত্র আছে, সে কৃষ্ণ বর্ণে কৃষ্ণ। কৃষ্ণকায় ব্যক্তিবিশেষের বীরত্বের রসাস্বাদন করিয়া আর্য্যগণ তাঁহার গুণগান করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। ইহা তাঁহাদের প্রশংসারই কথা। অথবা ইন্দ্র যেমন আর্য্যের, ইনি তেমনই অনার্য্যদের ঈশ্বর ছিলেন। তবে সে কৃষ্ণের সঙ্গে কৃষ্ণত্বের কোন সম্বন্ধ নাই। একেবারে নাই তাহাও বলা যায় না। পুরাণে যে স্থানে স্থানে কৃষ্ণকে বীর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার আদি এইখানে হইলেও হইতে পারে। বিশেষত্ব এই, বেদের কৃষ্ণ ইন্দ্রের নিকট পরাজিত। পুরাণের কৃষ্ণ অবতার, সুতরাং তাঁহার পরাজয় চলে না। বৈদিক 'কাল' কৃষ্ণের দশহাজার সৈন্য যাহা ইন্দ্র জগতের কল্যাণের জন্য বিনাশ করেন, তাহাই কি মহাভারতের 'নারায়ণী সেনা' নহে? মহাভারতকার ইহাদিগকে ইন্দ্রের অবতার অর্জ্জুনকে দিয়া সংহার করাইয়া বেদের মর্য্যাদাইরক্ষা করিয়াছেন। যদিও সে কথা খুলিয়া বলেন নাই। বলিলেই বা কে বিশ্বাস করিবে? ইন্দ্রের এক নাম যে অর্জ্জুন তাহাও স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য। প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রে এক অসুর-কৃষ্ণের কথাও বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদে আরও কৃষ্ণের উল্লেখ আছে (১।১১৬।২৩ এবং ১।১১৭।৭)। ইনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উপাসক। কুমারদ্বয় তাঁহার মৃত বা মৃতপ্রায় পৌত্রকে প্রত্যর্পণ করেন। পুরাণকার অবশ্য কৃষ্ণকে কাহারও নিকট ঋণী করিতে পারেন না, আবার এ কথাটা ভুলিতেও পারেন না। তাই কৃষ্ণকে দিয়াই গুরুর পুত্রকে প্রত্যর্পণ করাইয়াছেন এবং উত্তরার মৃত পুত্রকে বাঁচাইয়াছেন। আবার সূক্ত-রচনাকারী কৃষ্ণও আছেন। পুরাণকারের হস্তে তিনিই কি গীতা রচনা করিয়াছেন? কৃষ্ণকে যে ধর্ম্মোপদেষ্টারূপে দেখিতে পাই তাহার আদি বোধ হয় ছান্দোগ্যোপনিষদে, (৩।১৭।৬) যেখানে কথিত হইয়াছে, ঘোর ঋষির শিষ্য দেবকীনন্দন কৃষ্ণ গুরুর নিকট হইতে এমন এক তত্ত্ব লাভ করিলেন যাহাতে তাঁহার আর কিছু শিখিবার তৃষ্ণা রহিল না। যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা লাভ করিলেন, তিনি তাহা

প্রচার না করিবেন কেন, এবং ইহা প্রচার করিতে যাইয়া যদি প্রাচীন শিক্ষার সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তবে তাঁহাকে ধর্ম্মসংস্কারকরূপেও দাঁড় করান চলিবে। অবশ্য, এ সকলই পরবর্ত্তী কালের কল্পনা, উপনিষদে শিষ্যত্ব ছাড়া আর কিছুই নাই। কৃষ্ণতত্ত্বে কত দার্শনিক কথা আসিয়া মিশিয়া গিয়াছে, যাহা দ্বারা ঐতিহাসিক চরিত্র গড়িতে যাইয়া কবিরা চরিত্রের কল্পিতত্ব চোখে অঙ্গুলি দিয়াই দেখাইয়া দিয়াছেন। যিনি জাগিয়া ঘুমান, তিনি অবশ্য দেখিতে পাইবেন না। চতুর্ব্যূহের বাসুদেব পূর্ণব্রহ্ম, সঙ্কর্ষণ তাঁহার ব্যক্তিগত প্রকাশ, প্রদ্যুম্ন সর্ব্বেন্দ্রিয় সমেত মন অথবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ এবং অনিরুদ্ধ অহঙ্কার। বাসুদেবকে একজন মানুষ ধরিয়া আর সকলকে তাঁহার পরিবারবর্গের অন্তর্ভূত করিলে, ইহাকে একটী রূপক ছাড়া আর কিছু ধরা যাইতে পারে না। পানিণি বাসুদেব ও অর্জ্জুনের উপাসকগণের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্জ্জুন (আদিতে ফাল্গুনী নক্ষত্র) তো ইন্দ্র, বাসুদেব নিশ্চয়ই বিষ্ণু বা সূর্য্য। বৈদিক ইন্দ্র ও সূর্য্যই পৌরাণিক কৃষ্ণার্জ্জুন, দুই ভাই। এইরূপ ঘনিষ্ট সম্পর্কের গুরুশিষ্য আরও আছেন। যথা বুদ্ধ ও আনন্দ, এবং জন্ ও যীশু। বিষ্ণু দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। বরাহপুরাণে সূর্য্যের যে বারটি নাম দেওয়া হইয়াছে, ভক্ত বৈষ্ণব আজ বিষ্ণুর নাম বলিয়া সেইগুলিকে "ঔষধে চিন্তয়েৎ বিষ্ণুং" ইত্যাদি ক্রমে স্মরণ করিয়া থাকেন। বিষ্ণুবক্ষে ভৃগুপদচিহ্ন বা শ্রীবৎসলাঞ্ছন সৌরকলঙ্ক ছাড়া আর কিছুই নহে এবং বামন অবতারের ত্রিপাদভূমিও সূর্য্যের প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নের অবস্থিতি। সূর্য্যের বাহন অরুণ ও বিষ্ণুর বাহন গরুড়—তারা দুই ভাই। যাক্, সে কথা পরে হইবে। আধ্যাত্মিক দিকের কথা বলিতেছি না, কিন্তু প্রাকৃতিক ও রাষ্ট্রীয় দিকেও বহুর মধ্য হইতেই একের আবির্ভাব হইয়াছিল। আদিত্য দ্বাদশ হইলেও এক সূর্য্যেরই প্রকাশ। আকাশের বিভিন্ন অংশকে ভিন্ন বলিয়া মনে হইলেও আকাশ এক সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু, এখানেও যেমন 'একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'র অবসর আছে, তেমনই বহু গোষ্ঠী যখন একতাসূত্রে মিলিত হইয়া এক উদ্দেশ্যে সকল বিভিন্নতা ভুলিয়া এক গোষ্ঠীপতি নির্ব্বাচন করে, তখনও 'একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'র অবসর হয়। কে জানে এ তত্ত্ব কি ভাবে মানব অন্তরে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'তৎ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্' তো সূর্য্যের মাধ্যাহ্নিক অবস্থান। কিন্তু ইহা দ্বারা মানুষের কত বড় আধ্যাত্মিক

কৃষ্ণকথায় সৌর-রূপক

প্রয়োজন সাধিত হইতেছে! ভূলোকে, দ্যুলোকে, আকাশে—মানুষ আপনারা শৈশবে কত কাল্পনিক গুণ আরোপ করতঃ যাহাদিগকে দেবতা বলিয়া পূজা করিয়াছে, কত রূপকের সৃজন করিয়াছে, তাহাদিগকেই আবার মানুষরূপে ধরিতে গিয়া সেই সব কল্পনা, সেই সব রূপককে বাস্তব সত্তা দিয়াছে। দশ দেবতাকে আগে যে দশ রূপ দিয়াছিল, এখন এক জনের উপরেই সেই দশ রূপ আরোপ করিতেছে। এইরূপে যে পৌরাণিক নব-দেবতার সৃষ্টি হয়, তাহাও সুনিয়ন্ত্রিত প্রণালীতেই হয়। সূর্য্যের নাম বিষ্ণু, কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার। সূর্য্যের এক রূপ বহ্নি; অগ্নির শিখা "কালী," সুতরাং কৃষ্ণ কালাচাঁদ। অগ্নিতে ঘৃতাহুতিই সেকালের পূজা, কাজেই কৃষ্ণ মাখন ভালবাসেন। ইহাকেই বলে মানুষীকরণ (Evemerisation)। খৃষ্টজগতে যীশুখৃষ্টের উৎপত্তিও এই ভাবেই হইয়াছিল। এক সময়ে একটী শব্দ যে ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, অন্য সময়ে তাহাতে ভাবান্তর ঘটিয়া যায়। ইহা লক্ষ্য না করিলে অনর্থ ঘটে। সূর্য্য প্রাতঃকালে রজনীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত হন, আবার সন্ধ্যাকালে রজনীর সঙ্গে সহবাসের জন্য অন্ধকারে লুক্কায়িত হন। আবার, ভগিনী উষার পশ্চাতে ছোটেন। ইহা লইয়া গল্প লিখিতে বসিলে কি অনর্থ ঘটে না? ঋগ্বেদে সূর্য্যের নাম কেন 'মাতুর্দিধিষুঃ' (৬।৫৫।৫) হইল তাহা সহজেই বুঝা যায়। "তুলনা কি দিব অন্যে, ব্রহ্মা হরে নিজ কন্যে" (দেবগণের মর্ত্তে আগমন, পৃঃ ৯৭), ব্রহ্মার এ অপবাদ আসিল কোথা হইতে? আগে এক সময়ে বৎসর আরম্ভ হইত মৃগশিরা নক্ষত্রে। জ্যোতির্বিদরা বলিয়া দিবেন, পরে রোহিণী নক্ষত্রে আরম্ভ হয়। রোহিণী ব্রহ্মার কন্যা। কথাটা তো এই—রোহিণী নক্ষত্রে বিষুবন্ যাইয়া সেখান হইতে সম্বৎসর আরম্ভ হইল। (সম্বৎসর = প্রজাপতি অর্থাৎ ব্রহ্মা?) আর পায় কে? প্রজাপতির একি কুকাণ্ড, তিনি কন্যার গৃহে প্রবেশ করিলেন, অর্থাৎ কি না কন্যাতে উপগত হইলেন? যখন বিষুবনের পশ্চিম গতি অজ্ঞাত ছিল তখন ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবারই কথা! এই কথাটাই রূপকে বিবৃত হইয়াছে (আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ, পৃঃ ২০ ও ২৭৬); কিন্তু গল্পে কি দাঁড়াইয়াছে ও সাধারণে যাহা সত্য ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করে, তাঁহা আর বলার প্রয়োজন নাই। রাসপূর্ণিমার দিন সূর্য্য থাকেন রাধা (বিশাখা) নক্ষত্রে (সূর্য্য = বিষ্ণু অর্থাৎ কৃষ্ণ)। সুতরাং রাধাকৃষ্ণের লীলা যা ইচ্ছা তাই বর্ণনা করিতে কবির হস্ত নিরঙ্কুশ।

আখ্যান রূপকমাত্র

কিন্তু তাহা যদি বিশ্বাস না কর তবে তোমার আমার প্রাণ লইয়া টানাটানি! কৃষ্ণ দ্বাদশ গোপীর সঙ্গে রাসলীলা করিয়াছেন। প্রত্যেকের ঘরেই তিনি অবস্থিত। এই দ্বাদশ ঘর দ্বাদশ রাশি, এবং সূর্য্য এক বৎসরে এই সকল ঘরেই অবস্থিত হন। অবশ্য ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও চলে। আমরা বীর কৃষ্ণ দেখিয়াছি, উপদেষ্টাও পাইয়াছি, এখন প্রেমিক কৃষ্ণের উপাদানও মিলিল।

পুরাণ (Myth) যে গড়ে এই রকমেই, তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। পুরাণের উপজীব্য রূপক এবং নানা দিক্ হইতে সংগৃহীত। প্রধানতঃ ইহা প্রাকৃতিক, জ্যোতিষিক ও আধ্যাত্মিক। ঐতিহাসিক তত্ত্বও রূপকাকারে পুরাণের মধ্যে আছে। কোন কোন আখ্যায়িকার উপাদান সর্ব্বত্র হইতে সংগৃহীত।

দুর্গাপ্রতিমা আকাশে

আমাদের দুর্গোৎসবের উপাদান কত জায়গা হইতে আসিয়াছে তাহা কে নির্ণয় করিয়া দিবে? কিন্তু প্রতিমাখানি যে আকাশ হইতে প্রাপ্ত তাহা কি আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখি? আর্দ্রা নক্ষত্র রুদ্র, পাশেই বৃষ। অসুর কালপুরুষ। সিংহ ও কন্যা তো পাশাপাশি। এক মিথুন—এ পাশে কৃত্তিকা (ছয় নক্ষত্রই দৃষ্ট হয়, ষড়ানন) ও রোহিণী; ও পাশে আর এক মিথুন—পুনর্ব্বসু নক্ষত্র। দুর্গা-প্রতিমার মধ্যে সাপের সমাবেশ কেন, তাহা অনেক দিন বুঝি নাই। এখন বুঝি—নিকটেই অশ্লেষা নক্ষত্র, বাদ দেওয়া যায় না। আর, আশে পাশে কীট পতঙ্গ এতই আছে, কাহারও বাহনের অভাব হইবে না। বঙ্গদেশেই গণেশের বাহন ইন্দুর, কিন্তু বম্বেতে গণপতি-পূজায় দেখিয়াছি এমন জীব নাই যাহা গণেশের বাহন নহে। অর্দ্ধাকাশ জুড়িয়া এই দৃশ্য; প্রতিমার সঙ্গে অর্দ্ধগোলাকৃতি প্রতিমার চালখানা সেইজন্য এতই অপরিহার্য্য। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নবপত্রিকা-রচনার মধ্যে প্রাকৃতিক রূপক (Agricultural Myth) দেখিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে আকাশের এই অংশ হইতে কৃষ্ণকাহিনীর একটা জ্যোতিষিক রূপক ভেদ করা যাইতেছে। সুদর্শন নামক সর্পের মুক্তির আখ্যায়িকায় ভাগবতে আছে, কোন বিশেষ উপলক্ষে গোপগণ বৃষযুক্ত শকটে সরস্বতী নদীতে উপনীত হন। সেখানে হর-পার্ব্বতীর পূজা করিয়া শায়িত হইলে এক সর্প আসিয়া নন্দকে আক্রমণ করে। প্রজ্বলিত অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইলেও সর্প তাঁহাকে ত্যাগ করিল না। তখন কৃষ্ণ তাহাকে পদাঘাত করিলেন। এখন অর্থ করা যাক্। রোহিণী নক্ষত্র শকট, এবং উহা বৃষরাশির অন্তর্ভূত। এই বৃষরাশি সুর-সরিৎ (milky

way) পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শিব ও দুর্গা এইখানেই অবস্থিত। অশ্লেষানক্ষত্রের অধিপতি সর্প (Hydra), চোখে না পড়িয়া যায় না। নিকটেই অগ্নিনক্ষত্র জ্বল্‌জ্বল্‌ করিয়া জ্বলিতেছে, কবি-কল্পনা নয়। গোপগণ অন্য কোন অস্ত্র ব্যবহার না করিয়া কেন অগ্নি ব্যবহার করিল, তাহার অর্থ বুঝিলাম। এ সর্প আবার কৃষ্ণেরই পায়ের তলায়। কৃষ্ণ কে? ঐ কালপুরুষ-নক্ষত্র। যখন মৃগশিরায় বিষুবন্‌ ছিল, তখন কালপুরুষ প্রজাপতি সম্বৎসর প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যের সঙ্গে একীভূত হইয়া যায়। পুরাতন বাইবেল্‌ গ্রন্থে "My God, my God, why hast thou forsaken me" এই বচনটি আছে; পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে তাহা সূর্য্যের প্রতীক এই কালপুরুষ নক্ষত্রের উক্তি। স্থানান্তরে বলিয়াছি, ভীষ্মও সৌর দেবতা। সোম-বসুও আদিত্য। চন্দ্রই আবার মৃগশিরার অধিপতি। শরশয্যায় ভীষ্মদেব এই কালপুরুষ। শরীরময় তারাগুলি শরাঘাত চিহ্ন! মাথার তিনটী তারা অর্জ্জুনের তিন শর। উহারই মস্তক বিদ্ধ করিয়া উপাধানে পরিণত হইয়াছে। ধনঞ্জয় শায়িত ভীষ্মের দক্ষিণদিকে পৃথিবী বিদ্ধ করিয়া জলদান করিয়াছিলেন। আকাশের দিকে লক্ষ্য করিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন, কালপুরুষ নক্ষত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে মস্তকের নিকট দিয়া স্বর্গগঙ্গা প্রবাহিতা। ভীষ্ম যে গাঙ্গেয়! কথায় কথা বাড়ে, আরও কথা আছে। সন্ধ্যাবেলায় সূর্য্যাস্ত দেখিলে দেখা যাইবে, সূর্য্য যেন অগ্নিমধ্যে ঊর্দ্ধমুখ শরজালে আবৃত হইয়া অস্তমিত হইতেছেন। বৈদেশিক পুরাণেও আছে, সূর্য্যদেব হার্‌কিউলিশ্‌ আগুণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই দুইটি আখ্যানই সূর্য্যাস্ত-কালের এই বিশেষ নৈসর্গিক দৃশ্যের দুই দিক্‌। সূর্য্যপুত্র কর্ণ সর্ব্বদাই ভীষ্মের সঙ্গে স্পর্দ্ধা করিয়া বেড়াইত, তাঁহার গৌরব হরণের চেষ্টা করিত। "পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম্‌" এই ন্যায়ানুসারে কি? রাধেয় যখন শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল, ভীষ্ম তখন কর্ণকে 'পিতেব পুত্রম্‌' সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। কত লোকই তো আসিয়াছিলেন এবং কত লোকই তো আসেন নাই, কিন্তু এই কর্ণ-সমাগমকে এমন করিয়া একটু বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইল কেন? অধিরথনন্দন নও, "সূর্য্যজস্ত্বম্‌" এই কথা বলিয়া ভীষ্ম কেন এমন স্নেহ-গদ্গদ হইয়া পড়িলেন? এ সময়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণ না আসিলে ভীষ্ম তাহাকে অভিসম্পাত

ভীষ্ম সৌররূপক

করিতেন কোন্ শাস্ত্রানুসারে—"যদি মাং নাধিগচ্ছেথা ন তে শ্রেয়ো ধ্রুবং ভবেৎ"—মৃত্যুকালেও পিতার শয্যার পার্শ্বে পুত্রের না আসাটা নিতান্তই ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া নয় কি ? কৃষ্ণতত্ত্বেও সকল রকমের রূপকই আছে বলিয়া মনে হয়। পুরাণাদিতে কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর রূপবর্ণনা বা জীবনের ঘটনাবলির সমাবেশ যে আধ্যাত্মিক ও প্রাকৃতিক রূপক তাহা নিতান্ত অন্ধ না হইলে কেহই অস্বীকার করিবে না। কোন বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা বা কৃষ্ণনামকই কোন ব্যক্তি-বিশেষের জীবনের কোন ঘটনা কৃষ্ণচরিত্রে নাই, তাহাও কেহ বলিতে চায় না। কিন্তু তাহাতেই চরিত্রটি ঐতিহাসিক হইবে না। একাধিক কৃষ্ণচরিত্রের আখ্যায়িকা বহু স্থলে ধরা পড়িয়াছে। অন্যদিকে, ইতিমধ্যেই আমরা জ্যোতিষিক রূপকের গন্ধ পাইয়াছি। অনুসন্ধান করিলে আমরা রূপক-সমষ্টিই প্রাপ্ত হইব। দুঃখের বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ তাহা নষ্ট করিয়াছেন। সুখের বিষয় ঐতিহাসিক বিজয়চন্দ্র মজুমদার এক পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং দার্শনিক সীতানাথ তত্ত্বভূষণ অন্য দিক্ দিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু কাজ এখনও অনেক বাকি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরাণের মধ্যে ঐতিহাসিক তত্ত্ব থাকিতে বাধা নাই। কিন্তু আমাদের ইতিহাসও জঙ্গলাকীর্ণ। শিব আর্য্য দেবতা নহেন।

ইতিহাস-নির্ণয়

তাহাকে প্রবেশ করাইতে যাইয়া বোধ হয় খুবই ধস্তাধস্তি হইয়াছিল। একটা বীভৎস কাণ্ড রচনা করিয়া দক্ষযজ্ঞনামে সে তত্ত্ব চাপা দেওয়া হইয়াছে, তাহা উদ্ধার করিতে যাইয়া আবার দক্ষযজ্ঞের অভিনয় হইবে না তো? যিনি পিতাকে রাজ্য হইতে সরাইয়া রাজা হইয়াছেন, এরূপ অপুত্রক মামার সন্দিগ্ধমনা হওয়া স্বাভাবিক। এমন মামার ভাগিনেয় জন্মিলে তাহাকে লইয়া একটা বিরুদ্ধ দল গড়িয়া উঠিতে পারে এই সম্ভাবনায় ভগিনীর সন্তানদিগকে হত্যা করিতে নিষ্ঠুর মামার আদেশ বাহির হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়! এবং এই নিষ্ঠুরতায় উত্যক্ত হইয়া লোকেরা (দেশের লোকেরা) ষড়যন্ত্র করিয়া প্রহরীদিগকে বাধ্য করতঃ ভগিনীর নবপ্রসূত পুত্রকে লইয়া যাইতে পারে ও তাহাতে অনার্য্যেশ্বর বাসুকী আসিয়াও যোগ দিতে পারেন এবং তাহাতে যমুনা পার হইবার সহায়তাও হইতে পারে। আর এক বাড়ীতে সে ছেলে প্রতি-পালিত হইতেও পারে। কিন্তু কথাটাকে এত অতিনৈসর্গিক করা হইয়াছে, যে

লোকে তাহা বিশ্বাস করে না। আবার যাহা হইতে পারে তাহাই যে প্রকৃতপক্ষে ঘটিয়াছে, ঐতিহাসিক প্রমাণ না পাইলে উহা গৃহীত হইবে না। সে দিনের প্রতাপাদিত্য ও সিরাজ্‌উদ্দৌলার কথা ঐতিহাসিকের হাতে ভাঙ্গিয়া চুর্‌মার্‌ হইয়া যাইতেছে। জনশ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত বা কবিবর্ণিত তত্ত্ব আর আজ ঐতিহাসিক বলিয়া কেহ গ্রহণ করিবে না। আবার, কোন চরিত্রে দু' একটী ঐতিহাসিক ঘটনা জুড়িয়া দিলেই যে তার সঙ্গে যে সকল পৌরাণিক (mythical) অবয়ব রহিয়াছে তাহাও ঐতিহাসিক হইয়া যাইবে, তাহা নহে। আরও একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, একই আখ্যায়িকা ভিন্ন দেশে অবস্থার বিশেষত্বে ভিন্ন আকার প্রাপ্ত হয়। কঠোপনিষদে যে অগ্নি-পূজার কথা আছে পারসিকদিগের অগ্নিপূজার আখ্যায়িকার সঙ্গে তাহার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য। খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ব্বেই পারসিকদিগের সঙ্গে ভারতের আদান প্রদান চলিয়াছিল; কিন্তু আমাদের দেশে ব্রহ্মজ্ঞানের আবির্ভাবও প্রাচীন। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে মিশাইতে গেলে যে টুকু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন সেটুকু পরিবর্ত্তন অবশ্যই আছে। আবার, লেখকের আদর্শের ভিন্নতায়ও একই আখ্যায়িকা ভিন্নাকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহাতে আখ্যায়িকাটি মূলে ভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। যীশু সম্বন্ধেও অনেক পুরাণ (Gospel) আছে। কাহারও সঙ্গে কাহার মিল নাই। একই ঘটনা লেখকের আদর্শানুসারে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ যে চারি পুস্তকে বর্ণিত একই ঘটনাকে চারিটী পৃথক্‌ ঘটনা বলিয়া গর্‌মিল উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন, তাহারা ভ্রান্ত। পৌরাণিক চরিত্রে এ পার্থক্য অনিবার্য্য। বিভিন্ন লোকের একই সময়ের লেখাতেই পার্থক্য হয়, বিভিন্ন সময়ের লেখা হইলে তো কথাই নাই। জ্যোতিষিক রূপকে দেখা যায়, একই নক্ষত্রপুঞ্জকে নানা লোকে নানা ভাবে দেখিয়াছে। কালপুরুষ নক্ষত্র পুরাণে কখনও কূর্ম্ম, কখনও বরাহ, কখনও বা অসুর—এইরূপ বহুরূপে গৃহীত হইয়াছে। যে ভাবে যিনি লাগাইতে পারিবেন তিনি সেই ভাবেই লাগাইয়াছেন। কবির হাতে পড়িয়া এমন আকার পাইয়াছে—যেন উহা হুবহু সত্য ঘটনা। যদিও আদিতে একটা কল্পনা মাত্র। বহু পুরাণে কৃষ্ণ কথা আছে। একই কথা লইয়াও মতভেদ দেখা যায়। কালীয়-দমন সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এ বিভিন্নতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সকলেরই চোখে উহা পড়িবে।

কালীয়-দমন

বিষ্ণুপুরাণে নাগের তিন মাথা। এখানে কাল বা কালীয় একই কথা—তিন

কাল। হরিবংশ সে দিক্ দিয়া না গিয়া ধরিয়াছেন, পাঁচ মাথা। তিনি হয় তো হৃষীকেশ—পঞ্চেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বলিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু ভাগবতকার দিয়াছেন সহস্র ফণা। আমার মনে হয়, আমরা এখানে ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সৌর রূপকে পৌছিলাম, সহস্র কিরণের অধিপতি সূর্য্যকেই পাইলাম। মূল রামায়ণের চতুর্দ্দশ রাক্ষস পরে চৌদ্দ হাজারে পরিণত হইয়াছে।

আকাশের মানচিত্রে দেখা যায়, স্থর সরিতের (Milky way) পার্শ্বে এক বৃহৎ সর্পকে (Serpens) এক কালীয়-দমন (Serpentarius) বধ করিতেছেন। পুরাণের কালীয় সংহার যমুনার নিকটেই ঘটিয়াছিল। যিনি প্রথম গড়েন, তাঁহার আধার হয় তো সৌর কল্পনা। কিন্তু পরে যুগ-যুগান্ত ধরিয়া যাঁহারা বাড়াইয়াছেন তাঁহারা মূল ভুলিয়া গিয়া কত খেয়ালে পরিচালিত হইয়া গল্পের আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা কে নির্ণয় করিবে? তিলক মহাশয় দেখাইয়াছেন, বেদের অনেক কথা—যেমন বৃত্রের উপাখ্যান, শীত প্রধান দেশের জল জমিয়া বরফ হওয়ার কথা। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের টীকা-কারদের সে খেয়ালই হয় নাই। তাঁহারা সে কথা ভুলিয়া গিয়া মেঘ বৃষ্টি ছাড়া আর কিছু খুঁজিয়া পান নাই। এই একটা বিশেষ বিষয়ে তিলকের মত ঠিক কি না তাহা বলিতেছি না। কিন্তু ইহা সত্য, যে পৌরাণিক আখ্যায়িকারূপ মহাসমুদ্রে নানাদিক্ হইতে আসিয়া জল জমিয়াছে। যত দিক্ হইতেই উপাদান সংগৃহীত হউক না কেন, মূল ভুলিয়া অন্য তত্ত্বের সমাবেশ ইহার মধ্যে অন্যতম। দুই তিনটি অখ্যায়িকা একত্রিত হইয়া গল্পের কলেবর বৃদ্ধি সচারাচরই ঘটিয়াছে! কে কোন্ পথে যাইয়া পৌরাণিক আখ্যায়িকা রচনা করেন, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। আজ যে আখ্যান আমাদের উন্নত জ্ঞানের কাছে কিম্ভূতকিমাকার বলিয়া মনে হয়, এবং পরিমার্জ্জিত নীতিবোধকে এমন করিয়া আঘাত করে, সেই আদিম অনুন্নত অবস্থায় এইরূপ একটী আখ্যান-রচনাকারী হয় তো বা 'মহাপুরুষ' বলিয়াই অভ্যর্থিত হইয়া থাকিবেন। এই কথা গুলি মনে রাখিয়া একটু বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

পারসিক কুরাস্ (Cyrus) সূর্য্যদেবতা বলিয়া পুরাণবিদ্গণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার উৎপত্তির বিবরণ এই—রাজা স্বপ্নে বাণী শুনিলেন যে কন্যার গর্ভের সন্তান তাঁহার স্থানে রাজা হইবে। ভয় পাইয়া গর্ভবতী কন্যাকে প্রহরী-বেষ্টিত করিয়া রাখিয়া দিলেন

কুরাস্ ও কৃষ্ণ

পুত্র জন্মিল। যাহার উপর ভার ছিল, সে সালঙ্কার ও বিচিত্র-বস্ত্র-পরিহিত এই সন্তানকে হত্যা করিবার জন্য গোপালকের হস্তে অর্পণ করিল, সেও হত্যা করিল না। কিন্তু সেই দিন গোপালকের পত্নী যে মৃত পুত্র প্রসব করিয়াছিল তাহা দেখাইয়া পুত্র হত হইয়াছে বলিয়া বুঝাইয়া দিল। বালক গোকুলে রাখাল-বালকদিগের সঙ্গে ক্রীড়ামোদে মত্ত থাকিয়া ("Playing in the village in which the ox-stalls were") বাড়িয়া উঠিল। বালকদিগের মধ্যে তিনি রাখাল-রাজ হইলেন, ও দ্বাদশবর্ষে জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তার পর রাজার বিশ্বাসঘাতক অমাত্যের প্ররোচনায় ও সাহায্যে এই বালকের হস্তে রাজার রাজ্যচ্যুতি ঘটিল। এই অমাত্যটিকে কৃষ্ণকথার অক্রূরের স্থান দেওয়া যায়। কেন না, রাজা তাহাকে বিশ্বস্ত অনুচর মনে করিতেন। যাহা হউক, কুরাস্-কাহিনী এখানে বিবৃত করিবার উদ্দেশ্য এই, যে রূপকজাত কাহিনীর মানবীকরণে কতকগুলি সাধারণ সূত্রের আবির্ভাব হইয়াছে, যাহা বুদ্ধ কংফুচ্ প্রভৃতির জীবন-চরিতেও প্রবেশ করিয়াছে। যথা, জন্মের পূর্ব্বেই জাতকের মহত্ত্ব বিষয়ে দৈববাণী, জীবন-রক্ষার জন্য জাতকের স্থানান্তর গমন, পরিণামে জীবন-রক্ষা ও উদ্দেশ্য-সিদ্ধি। মিসর, গ্রীশ প্রভৃতি দেশের পুরাণে এরূপ অসংখ্য কাহিনী বিবৃত আছে! গ্রীশ দেশের পুরাণে এরূপ দুই ভাইএর—জেথো ও এম্ফিওর একত্র পলায়ন ও গোপালক কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইবার কথা আছে। সৌররূপক জাত দেবতার যেমন হার্ম্মিস্, হার্কিউলিস্, যীশু প্রভৃতির সঙ্গে গো-জাতির যে একটা নিত্য সম্বন্ধ আছে তাহা কেবল আমাদের কৃষ্ণতত্ত্বের বিশেষত্ব নহে। 'গো' শব্দের এক অর্থ সূর্য্য-কিরণ বলিয়া এই সম্বন্ধ বুঝিতে আমাদের পক্ষে সহজ হইবে। বিচিত্র বর্ণের পরিধেয় ও মাথার চূড়া বা কিরীট-কুণ্ডলও সৌররূপকের অঙ্গ। কৃষ্ণের জন্ম ও মৃত্যু উভয়ের বর্ণনাতেই উজ্জ্বল পীতবাসের উল্লেখ আছে। উহাতে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের কথাই মনে পড়ে। মৃত্যুকালে কৃষ্ণকে পীতবসনাচ্ছাদিত করিয়াই উপস্থিত করা হইয়াছে, ব্যাধ মানুষ বলিয়া চিনিতেই পারে নাই। ইহাতো সূর্য্যাস্তের বর্ণনা। যিনি সূর্য্যাস্তকালীন পীতরাগরঞ্জিত পশ্চিমাকাশ দেখিয়াছেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন, ইহা স্বেচ্ছাকৃত পুরাণ ("Conscious myth")। বিলম্বিত কেশদামও ঐ সংজ্ঞাভুক্ত। কৃষ্ণের কেশব নাম সেইজন্য।

কৃষ্ণকাহিনীতে বৈদেশিক প্রভাব।

তার পর, নব প্রসূত সন্তানকে সূতিকা গৃহের কাপড় চোপড় দিয়া ঢাকিয়া স্থানান্তর করা, এমন কি পিতা-কর্ত্তৃকই নদী পার হইয়া লইয়া যাওয়া, গ্রীক্ পুরাণেও আছে। নদী পার হওয়ার আধ্যাত্মিক রূপক পুত্র লাভে বৈতরণী (Styx) পার হওয়ার কথা গ্রীক্ পুরাণে একাধিকবার আছে। আমাদের দেশে যমুনা নামটীর সঙ্গেও সূর্য্যের সম্বন্ধ আছে।

'সপ্ত' শাস্ত্রীয় সংখ্যা। আমাদের দেশের তো কথাই নাই, অনেক বৈদেশিক পুরাণেরও ঐ কথা। প্রাচীন গ্রীক্ বা হিব্রুদিগের মধ্যে দেখা যায়, অনেক দৈব পরিবারে সন্তান-সংখ্যা সাত কি আট। এ সকল দৈব পরিবার সৌর। পারসিকদিগের মধ্যে সপ্তাদিত্য ; ইঁহাদের একজন মিথ্র খুব শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া 'ঈশ্বর' পদবীতে উঠিয়াছিলেন। হিব্রুদের মধ্যে জেকবের দুই স্ত্রীর মিলিয়া আট সন্তান, অষ্টম সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জোসেফ্। ইনি যে সৌর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যে আবার কৃষ্ণবলরামের ন্যায় রুবেন ও জোসেফ্ শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। এইরূপ যুগলের শ্রেষ্ঠতা পুরাতন বাইবেলে অনেক আছে। কৃষ্ণ অষ্টম গর্ভজ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু এখানে প্রণিধান করিবার বিষয় যথেষ্ট আছে। বলিয়াছি 'সপ্ত' দৈব সংখ্যা ; ইহার দাবী অগ্রাহ্য করা সহজ নহে। তাহাতে আবার ঋগ্বেদে আদিত্য সপ্ত বলিয়াও কথিত হইয়াছে। কিন্তু তৈত্তিরীয় সংহিতায় আদিত্য আট। এরূপ স্থলে পুরাণকার কি মুস্কিলে পড়িয়াছেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি কেন যে বলরামকে দৈবকীর গর্ভে স্থান দিয়াও প্রসবের পূর্ব্বেই তাহাকে স্থানান্তর করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে দেরী হইবে না। সুতরাং এখন সেই গর্ভে কৃষ্ণের জন্মে সপ্তম ও অষ্টম উভয়ের মান্যই রক্ষিত হইবে। যিনি সপ্তম চাহেন, তিনি সপ্তম অর্থ করুন ; যিনি অষ্টম চাহেন, তাহার মানও রক্ষিত হইবে। একটী কথায় মনোযোগ দিবার আছে। এখানে হয় তো বা ভারতীয় ধর্ম্ম-বিবর্ত্তনের ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা গুপ্ত আছে। "রামো রামশ্চ রামশ্চ", বলরামই তো অবতার। কিন্তু কৃষ্ণপূজা প্রচলিত হইলে বলরামকে এমনই ভাবে আল্‌গোছে সরাইয়া দিয়া কৃষ্ণকেই প্রধান ভাবে সম্মুখে আনিয়া ধরা হয় নাই তো ? মেগাস্থিনিসের সময়েও বলরামকেই প্রধান বলিয়া মনে হয়। পরে তিনি কৃষ্ণের ছায়ামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছেন। বেদে এ কথাও পাওয়া যায়, অদিতি অষ্টম গর্ভে মার্ত্তণ্ড-দেবকে প্রসব করেন। কিন্তু স্তন্যদানে সমর্থ হন নাই। দৈবকীও কৃষ্ণকে স্তন্য দেন নাই। পুরাণকার স্বীয় কল্পনার মূলকে অস্বীকার

করিবেন না। বসুদেবকে কশ্যপ ও দৈবকীকে অদিতি বলিয়াই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। অষ্টম গর্ভের সন্তান শ্রেষ্ঠ হয়, এই প্রবাদের আদি বোধ হয় মার্ত্তণ্ডকে লইয়া। পুরাণকারের দিক্ হইতে আরও একটু বলিবার আছে। বিশ্বকর্ম্মা ক্রুদ্ধ হইয়া এক সময়ে সূর্য্যের তেজ চাঁচিয়া ফেলিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু অষ্টমাংশ অক্ষয় বলিয়া সূর্য্য মারা গেলেন না। অষ্টমের শ্রেষ্ঠতার ইহাই কারণ। সূর্য্যের বর্ত্তুলাকার ভ্রমণ-পথই যে কৃষ্ণের হাতের চক্র, তাহা আর এখন বলিয়া দিতে হইবে না। এ চক্রের কথা আবার বলিব।

কৃষ্ণকথায় সৌর রূপকের বাহুল্য

গ্রীক্ পুরাণের হার্কিউলিশ্ সূর্য্যদেবতা। তাঁহার অনেকগুলি কীর্ত্তি আছে। এই কীর্ত্তিগুলির পর্য্যায়ভুক্ত কৃষ্ণেরও অনেকগুলি কীর্ত্তি আছে। যাহারা তিন মাসের শিশুর পুতনা-বধ, যমলার্জ্জুন-ভঙ্গ প্রভৃতিকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলেন, তাহাদের সঙ্গে তর্ক আমাদের সাধ্যাতীত। কিন্তু কেহ তর্ক তুলিতে পারেন, যে হার্কিউলিশের দ্বাদশ সৌর-কীর্ত্তি তো রাশিচক্রের মধ্যে পাওয়া যায়। পুতনাবধ বা চাণূরমুষ্টিক-সংহার দ্বাদশ রাশির কোন্খানে পাওয়া যাইবে? আমরা কষ্ট-কল্পনা করিয়া তাহা দেখাইতে বসিব না। কেন না, কৃষ্ণ-উপাখ্যান যাঁহারা রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে সর্ব্ব বিষয়ে একমত নহেন। নক্ষত্রসমূহের আকার সকলের কাছে একই মনে হইবে, সেরূপ আশা করা যায় না। তবে খুব বেশী কষ্টকল্পনাও যে করিতে হইবে, তাহাও বলিতে চাই না। রোহিণীনক্ষত্র শকটভঞ্জের কীর্ত্তি-স্থান সহজেই হইতে পারে। জ্যোতিষ-মতে রোহিণীর আকার শকট। ফল্গুনীনক্ষত্রদ্বয়ের আকৃতি বৃক্ষের ন্যায়ও কল্পিত হয়, এবং ইহাদের নামও অর্জ্জুন নক্ষত্র। সুতরাং যমলার্জ্জুনভঞ্জন সূর্য্যের এই নক্ষত্র-পরিত্যাগ, অথবা এই রকম কিছু। তবে কেবল দ্বাদশ রাশিতে আবদ্ধ থাকিবারও প্রয়োজন নাই। আকাশের শত শত নক্ষত্রপুঞ্জকে যক্ষ রক্ষ দেব দানব নাগ অসুর পশু পক্ষী মনুষ্য প্রভৃতি যে সকল আকার দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কৃষ্ণের যে কত ধেনুক, কত প্রলম্বের সঙ্গে সংঘর্ষের অবসর হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কেবলই কি ঝগড়াবিবাদের কথা, সুকল্পনার ব্যবস্থা কি নাই? জ্যোতিষীরা নক্ষত্রাদির যে সকল রূপ কল্পনা করিয়াছিলেন, পুরাণকারদিগের তাহা অবিদিত ছিল না। সূর্য্যের আকাশভ্রমণের পথে গৃহ, তোরণ, মঞ্চ, পালঙ্ক, শয্যা, প্রবাল, মণি, মুক্তা, কুণ্ডল, মৃদঙ্গ, তীর, ধনুক, ঘোড়া, গাড়ী, শঙ্খ, চক্র প্রভৃতি মানুষের আবশ্যকীয় অনাবশ্যকীয় কোন

জিনিষেরই অভাব নাই। কলম লইয়া বসিয়া গেলে কাব্য গড়িয়া উঠিতে এক মুহূর্ত্তও লাগিবে বলিয়া মনে হয় না। মেঘ-কর্ত্তৃক সূর্য্যের আবরণ—সূর্য্যাস্তের সময়কার রং বেরংএর মেঘের খেলা—সৌর পুরাণের এক মস্ত অধ্যায়। মেঘ-গুলিরও নামকরণ হরেক রকমের, দ্বাদশ মাসে সূর্য্যেরও দ্বাদশ নাম। তার পর সূর্য্যগ্রহণ আছে। এই সকল কথা মনে রাখিলে পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণকে মারিয়া ফেলিবার জন্য তমোরূপী কংসানুচরগণের চেষ্টার অর্থ বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। আকাশের কোন্ অংশে এইরূপে সূর্য্যের সঙ্গে কাহার সংঘর্ষ ঘটিবে, এবং তাহা লইয়া কোন্ কবি আপনার কোন্ খেয়ালের পরিচয় দিতে বসিবেন, তাহা ন্যায়শাস্ত্রের কোন নিয়মের অধীনে আসিবে বলিয়া মনে হয় না। একটী বন্ধুকে বলিলাম, কালপুরুষের মধ্যে কোন শঙ্খের চিহ্ন দেখিতে পাইতেছেন কি? তিনি বলিলেন, একটু একটু যেন মনে হয়। তাঁহার নক্ষত্র-চর্চ্চার বাতিক আছে। আর একটী বন্ধু পাশেই ছিলেন, তাঁহার ও বালাই নাই। তিনি কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আমি কালপুরুষের মধ্যে বেশ একটী শঙ্খ-চিহ্ন স্পষ্ট দেখিতে পাই। এই দৃষ্টিশক্তিকে পরিচালিত করিবার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম উদ্ভাবিত হইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, লেখক আখ্যান সকল আপনার অভীষ্টানুযায়ী পরিবর্ত্তন করিয়া লন। তার পর, গ্রীকৃগণ যে নক্ষত্র-পুঞ্জকে যে আকারে দেখিয়াছেন, হিন্দুরাও সেই আকারে দেখিবেন তাহার কোন স্থিরতা নাই। অবস্থা-বিশেষে পারিপার্শ্বিক ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে যাইয়া নকলও ভিন্নাকার ধারণ করে। কাহারও নিকট হইতে প্রায়ই হুবহু নকল হয় না। রাশিচক্র গ্রীকৃদিকের মারফতে বেবিলোন হইতে গৃহীত বলিয়াই সকলের সিদ্ধান্ত। কিন্তু গ্রীকের যেখানে 'ছাগ', আমাদের সেখানে 'মকর'। কেন? উত্তর বহু দূরে নয়। প্রথম রাশি মেষ; বৃহজ্জাতক ইহাকে বলেন 'অজ'। অজ—মেষ ও ছাগ উভয়ার্থবোধক, সুতরাং এক রাশির নাম মেষ ও অন্য একটীর নাম ছাগ হইলে গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে পার্থক্যসত্ত্বেও একতা সুস্পষ্ট। বেবিলোনের মকররাশি ছাগমুখ মৎস্য। সুতরাং মাথা কাটিয়া পশ্চাৎ গ্রহণ করা হইয়াছে, অধিপতি দেবতা কিন্তু "মৃগাস্যঃ মকরঃ"ই (শব্দ-কল্পদ্রুমঃ) রহিয়াছেন। আকৃতি মকর, রাশির একটী নাম কিন্তু মৃগ! ইনি বেবিলোনের ইয়া (Ea) দেবতা এবং দশম রাশির প্রতিকৃতি। সুতরাং এখন আকার না মিলিলেও কিছু আসিয়া যায় না। তবে একটী কথা বক্তব্য। কৃষ্ণের

বীর্য্যকীর্ত্তির মধ্যে বৃষভ ও অশ্বতরবধের কথা আছে। সৌর দেবতার সঙ্গে বৃষ ও গর্দ্দভের সম্বন্ধ পুরাণ-বেত্তারা সার্ব্বজনীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। গল্প, যত সময় যায়, হস্ত হইতে হস্তান্তরিত হইয়া ডাল পালায় বাড়িয়া উঠে। দেশান্তরিত হইলে তো কথাই নাই, আদিম প্লট্ বজায় থাকে না। বৈদিক গ্রন্থোক্ত দক্ষযজ্ঞের অর্থ কালপুরুষ ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী নক্ষত্রপুঞ্জের দ্বারাই পাওয়া যায়। কিন্তু পৌরাণিক দক্ষযজ্ঞ পরবর্ত্তীকালের বহু ঘটনার সমাবেশ ব্যতীত ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। আর এক সৌর দেবতা একিলিস্। ইঁহারই মত ব্যাধ-কর্ত্তৃক পদবিদ্ধ হইয়া কৃষ্ণের মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণের গৃহ তিন খানি—মথুরা, বৃন্দাবন ও দ্বারকা। রাশিচক্রে সূর্য্যের ঘর সিংহ ; উচ্চ গৃহ মেষ, সিংহ হইতে মেষে যাইতে যমুনা (Milky way) পার হইতে হইবে। নীচ গৃহ তুলা, এটা বোধ হয় সমুদ্র গর্ভস্থ দ্বারকা। সূর্য্য যখন সিংহরাশিতে তখনই কৃষ্ণের জন্ম। জন্মরাশিটাও বৃষ, নক্ষত্রটা রোহিণী। নন্দ (নন্দী ?) তো বৃষ ; আবার রোহিণী এক মায়ের নাম। জানি না কিসে কি হয়। তবে দ্বারকায় পলায়নটা সমুদ্রে সূর্য্যাস্তের রূপক হইতে বাধা নাই। এই পলায়নকেও আবার কৃষ্ণবর্ণের দ্যোতক বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কৃষ্ণের জন্মোৎসব লইয়া বরাহপুরাণ যে তর্ক তুলিয়াছেন, তাহাতে বছরের মধ্যে গোটা বারো জন্ম দিন করিতে হয়, অর্থাৎ সূর্য্যের প্রত্যেক রাশিপ্রবেশে এক একটী। সাধারণতঃ যে সময়ে 'জন্মাষ্টমী' হয়, তাহা বৎসরের প্রথমেই পড়িবে যদি মৃগশিরা নক্ষত্রে বিষুবন্ ধরা যায়, এবং এক সময়ে যে মৃগশিরায় বিষুবন্ ছিল তাহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, পরেও বলিতে হইবে। মিসরীয় সৌরদেব হোরাসের জন্মদিন আমাদের জন্মাষ্টমীর সময়েই পড়ে। আশ্চর্য্য এই, বরাহপুরাণ যেমন কৃষ্ণের একাধিক জন্মদিনের কথা বলিয়াছেন, ইঁহারও তাহাই। শীতের রূপক কারাগৃহের দুঃখকষ্টের পর কৃষ্ণের জন্মদিনের বর্ণনায় এই বাসন্ত বিষুবন্‌কেই মনে করাইয়া দেয়। সুতরাং সৌর-রূপক কাণায় কাণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। কেন না, বৎসরের মধ্যে যে চারিটি বিশিষ্ট দিন, উহার কোন এক দিনে সৌর রূপকোদ্ভূত দেবতাদের জন্ম হয়—যেমন মিথ্র, ডাইওনিসস্, যীশু প্রভৃতি। ব্রিটন্‌দিগের আর্থারের উপাখ্যান গ্রীক্‌দিগের নিকট প্রাপ্ত। ইনি পীতবসন সৌরদেব ("Gold-clothed solar Child")। ইঁহার আত্মীয়েরাও যাদবদিগের ন্যায় আপনাদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করিয়াছিল, এবং ইনি এভিলিয়ন দ্বীপে ('The

island valley of Avilion") চলিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের দেশে সূর্য্যমূর্ত্তিই যে পরে বিষ্ণুমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছিল, যাঁহারা প্রাচীন মূর্ত্তির আবিষ্কারে ও অর্থবিচারে নিযুক্ত তাঁহারা সে কথা বুঝাইয়া দিবেন। ধামরাই নামক স্থানের রথ ও দেবতা মাধবের কথা সকলেই জানেন। রথের দেবতা সূর্য্য, এবং মাধব বরাহপুরাণের মতে দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। কিন্তু মাধবকে লোকে বিষ্ণু বলিয়াই জানে। নবাবিষ্কৃত একখানা সূর্য্যমূর্ত্তি দেখাইলে সর্ব্ব-সাধারণ এক বাক্যে উহা বিষ্ণুমূর্ত্তি বলিয়া ধার্য্য করিবে। সূর্য্য হইতে বিষ্ণু, বিষ্ণু হইতে কৃষ্ণ। ব্রহ্ম-শব্দটীর ন্যায় বিষ্ণু-শব্দও আপনার অবাধ গতিপথে কত অর্থ যে আপনার দেহে জড়াইয়া আসিয়াছে তাহা একখানা সাধারণ অভিধান খুলিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। কৃষ্ণ এই সকল অর্থেরই উত্তরাধিকারী। তার পর, সকল দেবতার দোষগুণ দিয়া কৃষ্ণ চরিত্রের পূর্ণতা। আর সব দেবতা খণ্ড, কৃষ্ণ যে পূর্ণ তাহার এই অর্থ। ক্রমে ক্রমে এই পূর্ণতা আসিয়াছে। শিরোনামায় উদ্ধৃত মহাভারতের শ্লোকটিতে তাহা অভিব্যক্ত আছে।

কৃষ্ণ চরিত্রের অভিব্যক্তি

প্রথম-কৃষ্ণের স্তব কালা-কৃষ্ণের, তাহা বৈদিক। শক্ত কথা—বেদবাক্য অলঙ্ঘ্য। অনার্য্যগণের সঙ্গে সঙ্গে অনার্য্যেশ্বর কৃষ্ণও আর্য্য সমাজে স্থান পাইলেন। সেই জন্যই কি চিরদিন 'কালা' নাম রহিয়া গেল, কৃষ্ণবর্ণ ঘুঁচিল না? ঐ শ্লোক হইতেই পাইতেছি, প্রথমতঃ যদুনন্দন, খুব কুলীন নহেন, গায়ে যেন অনার্য্য গন্ধ রহিয়াছেই। কেবল সমাজে ঢুকিয়াছেন; সকল ক্ষত্রিয়ের যে সাধারণ অধিকার রাজা হইবার দাবী, তাহা এখনও দেওয়া হয় নাই। অর্থাৎ কুলীনও নহেন, অপাংক্তেয়ও নহেন। এখন দেবকুলে স্থান চাই। আদিত্যমণ্ডলে প্রবেশ না করিলে দেবকুলে স্থান নাই। সব দেবতা আদিত্যের প্রকাশ। তাই অদিতির গর্ভের নামে একটা বৈদিক পুরাণের মধ্য দিয়া বামনরূপ। কেবল আদিত্যকুলে স্থান নয়, ব্রাহ্মণ-গোত্রে উন্নীত। ব্রাহ্মণের পূজাও তো পাইতে হইবে! ইন্দ্র যখন দেবরাজ, তাঁহার সঙ্গেও একটা সম্বন্ধ চাই। তাই ইন্দ্রাবরজ বা উপেন্দ্র। সূঁচ হইয়া প্রবেশ, ফাল হইয়া বাহির। ইন্দ্রের পূজা রহিত হইল, ইন্দ্র প্রতিবিধানে অক্ষম। আদিত্য হইয়া সমস্ত আদিত্যমণ্ডল দখলে আসিল। ক্ষমতা সকল আকাশে ব্যাপ্ত হইল। আকাশই বিষ্ণু, আদিত্যও বিষ্ণু। কিন্তু বিষ্ণু এত দিনে সূর্য্য হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণ সূর্য্য হইতেও তেজীয়ান্। তার পর,

উপনিষদের সর্ব্বভূতাত্মা হইয়া শেষ। সহস্র সহস্র বৎসরে বিকশিত জাতীয় জীবনের ভাবরাশি যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া আকার পাইয়াছে, তাঁহাকে যদি কেহ বিশেষ দেশ-কালে অবচ্ছিন্ন কোন ঐতিহাসিক পুরুষ বলিয়া মনে করে, তবে তাহার ইতিহাসের ধারণাকে শ্রদ্ধা করা যায় না। এ বিকাশ তো এক দিনে হয় নাই ; ভগবান্ এক দিনে অবতীর্ণ হইতে পারেন না। ভগবানের অবতরণ অনন্তের নিঃসরণ (Eternal process), তাহা দেশ-কালে আবদ্ধ নয়। এক কালের অভিব্যক্তি অন্য কালের সঙ্গে মিলিবে না। গীতা মহাভারতে আছে বটে, কিন্তু গীতাতে কৃষ্ণ যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন, মহাভারতেই চিত্রিত কৃষ্ণ-চরিত্রের সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য কোথায়? তার পর, পুরাণ উপপুরাণ তো স্বতন্ত্র রাজ্যের কথা।

ইতিপূর্ব্বে জন্মদিনের কথা বলিয়াছি, এখন একটু জন্মের প্রসঙ্গ করা যাউক। ভাগবতে পাই জন্মের সময়েই—পীতবাস-পরিধান শ্রীবৎসলাঞ্ছন। এই দুইটীই সৌর চিহ্ন, সুতরাং এ দুইএতেই সূর্য্যের বিবর্ত্তন কৃষ্ণের জন্মগত অধিকার। কবিরা আর যাহাই করুন, এ অধিকার হরণ করিতে পারেন নাই। হরিবংশ এই স্থানে যে 'অধোক্ষজ' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা নিরর্থক হইতে পারে না। অভিধানে আছে, অধঃ প্রদেশে কৃষ্ণের ক্ষয় নাই বলিয়া তাঁহার নাম অধোক্ষজ হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, সূর্য্যের অষ্টমাংশ বিশ্বকর্ম্মা ক্ষয় করিতে সমর্থ হন নাই। বিশেষতঃ—এই শব্দটির সঙ্গে সূর্য্যের রথ, সূর্য্যের ভ্রমণপথ ও রাশিচক্রাদিরও সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ একেবারে সংশয়চ্ছেদি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। কৃষ্ণের জন্মটা কি? "অখিল-জগৎরূপ পদ্মের বিকাশের জন্য দেবকীরূপ পূর্ব্ব সন্ধ্যাতে মহাত্মা বিষ্ণুরূপ সূর্য্য আবির্ভূত হইলেন" (পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপঞ্চানন তর্করত্নের অনুবাদ)। যে সমস্ত ঘটনাবলির উল্লেখ করিয়া ভাগবত জন্ম-সময় নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহার মধ্যে আছে—দিঙ্মণ্ডল নির্ম্মল হইয়া উঠিল, আকাশে তারকাসমূহ স্বচ্ছরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল, নদীসকলের সলিল নির্ম্মলভাব ধারণ করিল, জলাশয়ের কমলজন্য শোভা হইল, বন্য বৃক্ষগণের স্তবক ফুটিয়া উঠিল ও তাহাতে বিহঙ্গকুল মনের আনন্দে গান করিতে লাগিল, সমীরণ পবিত্র-গন্ধবাহী, পবিত্র ও সুখ-স্পর্শ হইয়া বাহিত হইতে লাগিল ইত্যাদি। বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিতেরা ইহাকে নিশীথ-কাল বলিতে পারেন। কিন্তু

কৃষ্ণের জন্ম ও সূর্য্যোদয়

অতিমূর্খ বালকেও বলিবে ইহা সূর্য্যোদয়ের বর্ণনা। হ'তে পারে ইহা কোন বিশেষ দিনের সূর্য্যোদয়, সূর্য্যোদয় ইহা নিশ্চিত। কেহ তর্ক তুলিতে পারেন, মহাপুরুষদিগের জন্মবর্ণনার ধারাই এইরূপ। আমরাও তাহা স্বীকার করি। কিন্তু এ ধারা কোথা হইতে প্রবর্ত্তিত হইল? ইহা নিতান্ত নিষ্কারণ নহে। জগতের আদি মহাপুরুষ যে অদিতির অষ্টম গর্ভের সন্তান মার্ত্তণ্ডদেব, সে কথা যেন আমরা না ভুলি! সূর্য্য একচক্র রথে অবস্থিত, এখন যদি কাহারও এক পদের উল্লেখ দেখা যায়, তবে সেখানে সূর্য্যসম্বন্ধ দেখিলে ভুল হইবে না। রূপকের অর্থ এইরূপেই বাহির করিতে হয়। মহাভারত বলেন, কৃষ্ণ এক পদে শতবর্ষব্যাপী তপস্যায় নিরত ছিলেন। ইহার মধ্যে সূর্য্যের গন্ধ সুস্পষ্ট। দ্বাদশ বর্ষ, শতবর্ষ, সহস্রবর্ষ মানুষ জীবনের কথা নহে, জ্যোতিষিক কালমান-নির্দ্দেশক।

গ্রীক্‌দিগের সূর্য্যদেবতা এপোলো মাসের সপ্তম দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

কৃষ্ণ ও এপোলো

এখানে অবশ্য সপ্তম-অষ্টমের বিবাদ স্মর্ত্তব্য, এবং কৃষ্ণের জন্মও অষ্টমী তিথিতে। জন্ম-মাত্র এপোলোও কৃষ্ণেরই ন্যায় কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইনি পাইথন্ সর্পকে বিনাশ করেন! কালীয়দমনের কথা মনে পড়ে। আকাশে সাপের এমন ছড়াছড়ি যে সূর্য্যের সঙ্গে সাপের সংঘর্ষ একরূপ অনিবার্য্য। ইন্দ্র বৃত্র অহি কত কি বিনাশ করিয়াছেন, কৃষ্ণ না করিবেন কেন? এপোলো-দেব বংশীবদন। এইখানে আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া উঠিল। মনে হয়, প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে পাখীকুল সুললিত স্বরে গান করিয়া উঠে বলিয়া সৌর দেবতার সঙ্গে বংশীধ্বনির সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। কৃষ্ণ যেমন তুলসী-কর্ত্তৃক এপোলো তেমনিই ডফিন্-কর্ত্তৃক নাকাল হইয়াছিলেন। সূর্য্য-কর্ত্তৃক উষার ব্যর্থ পশ্চাদ্ধাবন হইতে এই উভয় গল্পের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। আরও অদ্ভুত এই, ডফিন্ ও তুলসী উভয়েই শেষে বৃক্ষে পরিণত হয়। ডফিনের পরিণতি লরাস যেমন এপোলোর কাছে পবিত্র, তেমনই তুলসী কৃষ্ণপূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ হইয়া রহিয়াছে। যদি মানুষের বিচার-বুদ্ধি নামপার্থক্যে বা দেশপার্থক্যে, অথবা বিশেষ অবস্থাজাত বিভিন্নতায় প্রতিহত না হয়, তবে এই দুইটী আখ্যানের একত্ব বা একমূলত্ব অবধারণে অসমর্থ হইবে না। পৌরাণিক তত্ত্বগুলির মূল খুঁজিতে গেলে একই জায়গায় পৌঁছাইতে হয়। বৈজ্ঞানিক ভাবে যাঁহারা পৌরাণিক আখ্যানগুলির তত্ত্ব নিষ্কাশন

করিয়াছেন, তাঁহারা কতকগুলি বিশ্বজনীন সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন যাহা সকল দেশের পুরাণেই খাটে। এই কথা মনে রাখিয়া আমরা আবার আসল বিষয়ের অনুসরণে প্রবৃত্ত হই।

এক দিন নারদ কৃষ্ণকে তদীয় অন্তঃপুরের পর পর যে ঘরে প্রবেশ করেন সেই ঘরেই দেখিতে পান। ইহা কি ভোজের বাজী? না, ইহা বৎসরের সেই বিশেষ দিনের কথা যে দিন সমস্ত দিবসের মধ্যে পৃথিবীর কোন স্থানেই সূর্য্যোদয় না হইয়া যায় না। পুরাণকার গোপনও করেন নাই। বিষুবদ্-দিনেই নারদ কৃষ্ণদর্শনে গিয়াছিলেন। ষোড়শ সহস্র স্ত্রীর ঘরে কৃষ্ণের বিচরণ নক্ষত্র পুঞ্জের মধ্য দিয়া সূর্য্যের গমনাগমনের রূপক ছাড়া আর কিছু হইতেই পারে না। রাসের মধ্যে যে প্রধানা গোপীর উল্লেখ আছে, তাহাও এই বিষুবদ্ দিন; সকল দিনের মধ্যে এই দিনের শ্রেষ্ঠতা। অন্য দিকে, বেদ অগ্নিকে সকল গৃহে প্রবেশকারী দেবতা বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। সকল দেশের সৌর দেবতারই পাতাল বা যমপুরী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা আছে। অদৃশ্য হইয়া পুনরায় সূর্য্যোদয় হইতেই ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

যমালয়ে গমন ও দক্ষিণায়ণ

কৃষ্ণের পাতালপুরী ও যমপুরী প্রবেশ আলাদা আলাদা বর্ণিত আছে। হিন্দু জ্যোতিষে বিষুবন্ হইতে রবির সমুদায় দক্ষিণ পথ যমপুরী। যমালয় দক্ষিণে এই প্রবাদের মূল আমরা পাইলাম। যমালয়ে যাইবার পথ বৈদিক গ্রন্থেই বর্ণিত আছে (আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ)। পথে একটী নদী, একটী নৌকা, দুইটী কুকুর ও একটী ভীষণ অসুর। পুরাণ বলেন, যমপুরীর পথে কৃষ্ণ এক অসুর বধ করেন, যাহাকে মারিয়া তিনি পাঞ্চজন্য শঙ্খ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই অসুরকে পঞ্চজনা বা শঙ্খাসুর বলা হয়। এ পথে কালপুরুষই (Orion) এই অসুর। ইহার হস্তপদের দু'টি দু'টি চারিটি উজ্জ্বল নক্ষত্র, ও মস্তক লইয়া ইহাকে পঞ্চজনা বলা হইয়াছে। ইহার শরীরে শঙ্খচিহ্নের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিলক মহাশয় বলেন, আকাশগঙ্গাই (Milky way) বৈতরণী, অগস্ত্য (Canopus) নক্ষত্র সম্বলিত নক্ষত্রপুঞ্জই ঐ বেদোক্ত নৌকা (Argo navis), লুব্ধক (Sirius) ও প্রলুব্ধক (Procyon) দুই কুকুর। লুব্ধকের বৈদিক নাম সরমা। মৃগশিরানক্ষত্রে বিষুবন্ থাকিলে এই বর্ণনা হুবহু মিলিয়া যায়। আমরা ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণের জন্মোৎসবের প্রসঙ্গে মৃগশিরায় বিষুবনের কথা

আচার ও উপাখ্যান

বলিয়াছি। তাহা তো বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কথা। জন্মাষ্টমীর উৎসব-কৃত্য কি সে দিনের? পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, মানুষ স্মরণাতীত কাল হইতে গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র তারা ও রবিকে লইয়া ক্রিয়া ও আচার (Rituals) প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। যখন প্রশ্ন উঠিয়াছে, "কেন করি?" তখন হইতেই উহার সঙ্গে উপাখ্যান (Myth) যুক্ত হইয়াছে। মানুষ চির দিন পশুপালন, শস্যোৎপাদন, শিল্পবাণিজ্য, ঝড়বৃষ্টি, শীতগ্রীষ্ম, জন্মমৃত্যু প্রভৃতি যাহাদের সঙ্গে তার নিত্যকার যোগ, সে সকলেরই সম্বন্ধে আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছে। আমরা যে সকল ক্রিয়াকাণ্ড ও আচারাদিতে এখনও রত হই, তাহার কোন্ গুলি যে কোন্ প্রাগৈতিহাসিক যুগে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিয়া দিবে? অবস্থার কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তবুও এই সকল আচার পালন করি, কিন্তু অর্থ বুঝি কি? আমরা হোলি উৎসবে মাতি। ইহার আদি কোথায়? বৎসর শেষ হইয়াছে। পুরাতন খড়কুটা একত্রিত করিয়া ক্ষেত্রে আগুন জ্বালিয়া সেই ভস্ম চারিদিকে ছড়াইয়া দিবার নিয়ম ছিল। এখনও আছে। বর্ষার জলে ভিজিয়া ক্ষেত্রের সার হইবে এবং নূতন শস্যে ক্ষেত্র পূর্ণ হইবে। আমরা এখন কেবল 'আবির' ছিটাই। কালে ইহার সঙ্গে আখ্যান জুটিল। রাজার বৃদ্ধা দুষ্টা ভগিনী শিশুকে কোলে লুকাইয়া লইয়া আগুনে প্রবেশ করিল। বুড়ী পুড়িয়া মরিল, শিশু হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া আসিল অর্থাৎ পুরাতন খড়কুটা পুড়িয়া সার হইল, নূতন বৎসরে শস্যপূর্ণা হাস্যময়ী ধরার আবির্ভাব হইল। পর্ব্বের নাম 'হোলি' হইল কেন? রাজার বোনের নাম ছিল যে 'হোলিকা'! ভারতের নানাস্থানে এ সম্বন্ধে নানা আখ্যায়িকা প্রচলিত থাকিয়া আমাদের কথারই সমর্থন করিতেছে। 'কেন করির উত্তর যে যার বুদ্ধিমত উদ্ভাবন করিয়াছে। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় দেখাইয়াছেন, ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে রবি উত্তরে যাইতে যাইতে দক্ষিণে অবতরণ করিতেন—যেমন দোলায় দোলায়মান, তাই নাম হইয়াছে দোল (আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ, পৃঃ ৩৩৩)। কৃষ্ণ আসিয়া তো ইহার মধ্যে সে দিন যুক্ত হইয়াছেন। পদ্মপুরাণে আছে—"দক্ষিণাভিমুখং কৃষ্ণং দোলায়ন্"—ইহা খাঁটি দক্ষিণায়ণ প্রবৃত্তির কথা। হিন্দোল, পুষ্পদোল সকলই ঐরূপ ক্রান্তিবৃত্তের বিশেষ বিশেষ স্থানে সূর্য্যের অবস্থিতি।

সকলের নাম করিলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। বিদ্যানিধি মহাশয় স্পষ্টই বলিয়াছেন, যে, যে পর্ব্বের সঙ্গে কৃষ্ণ, হরি বা জগন্নাথ যুক্ত হইয়াছেন, ক্রান্তিবৃত্তের বিশেষ বিশেষ স্থানে সূর্য্যের আগমন উপলক্ষ করিয়া সে সকলের উৎপত্তি। সূর্য্যকে হরি মনে করিলে আর কোন খট্‌কাই থাকে না। রঘুনন্দনও তিথিতত্ত্বে বরাহ-পুরাণ হইতে লিখিয়াছেন—পূজয়েৎ ভাস্করং দেবং বিষ্ণুরূপং সনাতনম্। অথবা, রবিশ্চ বিষ্ণুরূপতয়া পূজাকালে ধ্যেয়ঃ (পৃষ্ঠা ৩২৯-৩৩০)। অর্থাৎ মানুষ অতি প্রাচীন কাল হইতে এই সব পার্ব্বণ তেওহার পালন করিয়া আসিতেছে। তবে মানব জাতি আপনার এই দীর্ঘ যাত্রাপথে, যেহেতু "কালোহয়ং নিরবধিঃ বিপুলা চ পৃথ্বী", যখন বা যেখানে অবস্থার পরিবর্ত্তনে যে দেবতাকে ইষ্ট বলিয়া ধরিয়াছে, তাঁহাকেই ইহার মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়াছে। অধুনা বড় দিনের পর্ব্ব যীশু খৃষ্টের নামে করা হয়। কিন্তু খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ব্ব হইতেই ঐ সময়ের উৎসব চলিয়া আসিতেছে। মাসাদির যে গরমিল হয় তাহা কেবল বিষুবনের অস্থিরতার (Precession of the Equinoxes) জন্য। অতি প্রাচীন কালে যে সময়ে যে দিনে যে নক্ষত্রে সূর্য্যের অবস্থিতি দেখিয়া কৃত্য আরম্ভ হইয়াছে, সূর্য্য আর এখন সে স্থানে নাই। প্রতি ৭২ বৎসরে এক দিনের গোলমাল হয়। জ্যোতির্ব্বিদ্ বরাহের সময় হইতে সূর্য্য চলিয়া গিয়াছে প্রায় ২০ দিন। আমাদের অচলায়তন নড়ে নাই। যদিও দিনরাত্রি সমান ১০ই চৈত্র (Vernal Equinox), আমরা বিষুবসংক্রান্তি কৃত্য করি ৩০শে চৈত্র। তারও পূর্ব্বে বিষুবন্ ছিল কৃত্তিকা নক্ষত্রে, তাই কৃত্তিকা নক্ষত্র ছিল নক্ষত্রের আদি। এখনও অষ্টোত্তরী ফলিত জ্যোতিষে কৃত্তিকা হইতে দশা গণনা আরম্ভ হয়। বরাহের সময়ে ছিল অশ্বিনীতে। তাই অশ্বিনী ছিল আদি নক্ষত্র। বিষুবন্ এখন উত্তরভাদ্রপদে। আমরা কিন্তু নড়ি নাই, আমরা এখনও গণি "অশ্বিনী ভরণী……"একেবারে সনাতন। কেহ হয়তো বলিবেন অচলায়তন! সুতরাং হাজার হাজার বৎসর পরে যদি কোথায়ও হঠাৎ একটা গণনার কিছু গরমিল দেখি, তাহাতে ঘাব্‌ড়াইবার প্রয়োজন নাই। একটু চিন্তা করিলেই সামঞ্জস্য মিলিবে।

সূর্য্যমণ্ডলই গোলোক

আবার গোলোক শব্দটিও অর্থপূর্ণ। গো অর্থ সূর্য্য-রশ্মি। সূর্য্যরশ্মির লোক বা বাসস্থান সূর্য্যমণ্ডল। সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আদিত্য। আদিত্যের এক নাম বিষ্ণু। বিষ্ণু যে গোলোকবাসী কেন সে কথার অর্থ এখন স্পষ্ট হইল। বিষ্ণুই তো

কৃষ্ণরূপে বিবর্ত্তিত। সূর্য্যমণ্ডলে কালো কালো দাগ রহিয়াছে। উহারই নাম সৌর-কলঙ্ক (Solar spots)। সেই সকল দাগ হইতে কেহ যদি 'ত্রিভঙ্গমুরলীধর' কল্পনা করিয়া থাকে তবে তাহাকে কল্পনার অপব্যবহার বলা চলে না, এবং কৃষ্ণও কালো। কেন যে কৃষ্ণমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তাহার চারি দিক্ গোলাকার কিরণজালে আবৃত করার পদ্ধতি আছে, সাধারণ চিত্রকর তাহা না জানিলেও বুদ্ধিমান্ তাহা বুঝিবেন। সকল দেশের মহাপুরুষের ভাগ্যেই এই কিরণ-জাল। কেননা, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জগতের আদি মহাপুরুষ মার্ত্তণ্ডদেব। সেখান হইতেই ধারা চলিয়া আসিয়াছে।

পাতালপ্রবেশ বা শীতকালে সূর্য্যের অন্তর্ধান

এখন পাতাল-প্রবেশ বা স্যমন্তক মণির আখ্যান। এই মণি যে সূর্য্যতেজ তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। সুতরাং এই একটা বস্তুর প্রতি কৃষ্ণের বিশেষ রোখের কথা পুরাণকার কেন এমন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে। রাজা সত্রাজিৎ সূর্য্যের বন্ধু, তিনি এই মণি সূর্য্যের নিকট প্রাপ্ত হন। ভাগবতে উক্ত আছে, মণি গলায় দিয়া সত্রাজিৎ যখন যাদবপুরীতে প্রবেশ করিলেন তখন সকলে সূর্য্যের আগমন ভাবিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। সিংহকে মারিয়া ভল্লুক মণি গ্রহণ করিল। আশ্চর্য্য নয় কি? সিংহ কিন্তু সূর্য্যের রূপক। সিংহরাশি সূর্য্যের ঘর। ভাদ্র মাসে সূর্য্য থাকে সিংহরাশিতে, এবং কৃষ্ণের জন্মও ভাদ্র মাসেই। ভল্লুক শীতের প্রতীক। বৈদেশিক পুরাণে (Osiris myth) এরূপ স্থলে হিংস্র বরাহ ("Fatal boar") উল্লিখিত হইয়াছে। মণি আহরণের জন্য কৃষ্ণ পাতালে প্রবেশ করিলেন। অনেক কথা! সাধারণের নিকট সূর্য্যাস্ত সূর্য্যের পাতাল প্রবেশ বলিয়া মনে হয় না কি? অন্য দিকে তিলক মহাশয় দেখাইয়াছেন, এক সময়ে সূর্য্য যে ছয় মাস বিষুবনের দক্ষিণে অর্থাৎ যমপুরীতে থাকিতেন, তাহারই নাম ছিল দক্ষিণায়ণ। ইহাই আবার সূর্য্যতেজাপহারী শীতকাল, ইহাই ভল্লুক। কৃষ্ণ মণি আনিতে পাতালেই গেলেন। বহু-দিনের জন্য অন্তর্হিত রহিলেন। লোকে বলিতে লাগিল তিনি মরিয়াছেন, অর্থাৎ যমপুরীতে গিয়াছেন। সকলে শোক করিল। কিন্তু যখন মণি লইয়া ফিরিয়া আসিলেন তখন কি আনন্দ! অর্থাৎ কৃষ্ণ অস্তমিত সূর্য্য, পুনরুদিত হইয়া সকলের আনন্দ বিধান করিলেন। আমরা এখান হইতে এই শোকের ও আনন্দের বেগ ধারণা করিতে সমর্থ হইব না। মেরুপ্রদেশের সন্নিহিত

স্থানের কথা মনে করুন, যেখানে সেই দারুণ শীতে বহুদিনের জন্য সূর্য্য অস্তমিত হয়। আর্য্যগণ এক সময়ে এই মেরুপ্রদেশে ছিলেন, তাহারই স্মৃতি লইয়া এই আখ্যানভাগ রচিত। অন্ধকারে প্রবেশ করিয়া আলোক-লাভের জন্য বৈদিক ঋষিগণের যে ব্যাকুলতা তাহা হইতেই বুঝি, দীর্ঘ রাত্রির অবসানে সূর্য্যতেজের পুনরাবির্ভাবে তাঁহাদের কি আনন্দ!

শিশুপাল-বধ সুদর্শন চক্রে রাহুর শিরশ্ছেদের রূপান্তর মাত্র। রূপক যে খুব বদ্‌লাইয়াছে তাহাও নহে। যোগেশবাবুর "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" হইতে বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা গিয়াছে, যে উহার মূল জ্যোতিষিক। "রাশিচক্ররূপ সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রদ্বারা রাহুর শিরশ্ছেদ (চন্দ্রপাত) ঘটে।" (পৃঃ ২২৯)

রাহুই শিশুপাল

শিশুপালেরও শিরশ্ছেদ সুদর্শনচক্রের দ্বারাই হইয়াছিল। রাহু অমৃত পান করিতে চাহিয়াছিল। শিশুপালের রুক্মিণীর (লক্ষ্মী অমৃতের একই পর্য্যায়ভুক্ত) পরিণয়-পিপাসা ইহারই ঐতিহাসিক রূপক। রাহু গুপ্তভাবে অমৃত আস্বাদনও করিয়াছিল। শিশুপালও গুপ্তভাবে যাদব রমণী বভ্রু বণিতার সতীত্ব হরণ করিয়াছিল। সূর্য্যের প্রতি রাহুর শত্রুতা জ্যোতিষ ও পুরাণ প্রসিদ্ধ, সূর্য্যের গৌরব হরণ করাই ইহার কাজ। শিশুপাল রাজসূয় ক্ষেত্রে কৃষ্ণকে অর্ঘ্যদানে বাধা প্রদান করিয়া এই শত্রুতা-সাধনে পূর্ণাহুতি দিয়াছিল। স্বর্ভানু সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে, ইহা বৈদিক প্রবাদ। ভানু ও স্বর্ভানুতে নাম সাদৃশ্য রহিয়াছে। শিশুপালও বাসুদেব নাম গ্রহণ করিয়া এই নামসাদৃশ্য প্রকটিত করিয়াছিল। রাহু দেবচিহ্ন ধারণ করিয়া দেবপংক্তিতে বসিয়াছিল। শিশুপালও কৃষ্ণের বেশ ভূষা ও প্রহরণাদির অনুকরণ করিত। রাহুর মুণ্ড অমৃতস্পর্শে অমর, গ্রহরূপে সে আদিত্যমণ্ডলে স্থান পাইল। শিশুপালও আর কাহারও হাতে মরিবে না, সুদর্শন চক্রে ছিন্ন হইয়া তাহার তেজ কৃষ্ণে স্থান প্রাপ্ত হইল। বিষ্ণুপুরাণ (৪।১৫) বলেন, যে কৃষ্ণকর্তৃক হত হইয়া শিশুপাল "তস্মিন্নেব লয়মাযযৌ"। ইহা আধ্যাত্মিক লয়তত্ত্বের অন্তর্ভূত নহে। শিশুপালের এমন কিছু সুকৃতি ছিল না, যে সে হঠাৎ যোগিজন-বাঞ্ছিত পদ লাভ করিবে। কৃষ্ণের হস্তে হত হইয়াছে এমন অসুরের সংখ্যাও অনেক। তাহারা সকলেই কৃষ্ণে লয় প্রাপ্ত হয় নাই। শিশুপালের লয় পাওয়া সূর্য্য ও রাহু সম্বন্ধীয় একটা রূপক মাত্র, পুরাণকার সে কথা ভুলিয়া গিয়া যে অর্থই করুন না কেন।

তিলক মহাশয় দেখাইয়াছেন, বেদব্যাখ্যাতারাই অনেক রূপকের আসল অর্থ ভুলিয়া কদর্থ করিয়াছেন, পুরাণকার করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? দেবাসুর সকলের সম্মুখে রাহুর শিরশ্ছেদ হয়, শত্রু মিত্র সকল দর্শকবৃন্দের সম্মুখেই শিশুপাল নিহত হয়। পুরাণকার রাহুর ধূসরবর্ণের রথে ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব যোজনা করিয়া দিয়াছেন। শিশুপালেরও রথে চড়িয়া ভ্রমণের বিশেষ বর্ণনা আছে। ঋগ্বেদে স্বর্ভানুকে অসুর বলা হইয়াছে। ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতারা আদিতে অসুর নামেই পরিচিত। তখন দেব ও অসুর একার্থ-বোধক। পরে অসুর শব্দের বর্ত্তমান গ্লানিসূচক অর্থ হইয়াছে। পুরাণকার শব্দটীর এই বিবর্ত্তন উপলক্ষ করিয়া অনেক দিব্যলোকবাসীকে অসুরযোনিতে অধঃপাতিত করিয়াছেন। শিশুপালের পূর্ব্ব বিবরণে তাহাকে দেবলোকবাসী বলিয়াই ধরা হইয়াছে। স্বর্ভানু স্বর্গীয় দীপ্তি—সকল দীপ্তিই আদিত্যের। সুতরাং শিশুপালের তেজ কৃষ্ণে বিলীন হইল। জ্যোতিষিক ব্যাখ্যায় সূর্য্য হইতেই রাহুর উৎপত্তি। চন্দ্রপাতের নাম রাহু, এবং রবিপথ ও চন্দ্রপথের সম্পাতেই চন্দ্রপাত (পৃঃ ২২৮)। সুতরাং রবির সঙ্গে যেমন রাহুর তেমনই কৃষ্ণের সঙ্গে শিশুপালের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। চন্দ্রপাতেই রাহুর, দিব্যলোকবাসীর পাতেই অসুরের উৎপত্তি এবং শত্রুতার কারণও ঐখানেই। চন্দ্রপাতের নিকট সূর্য্য না থাকিলে গ্রহণ হয় না (পৃঃ ২২৯)। পুরাণকার অসুরের সঙ্গে অসুরারির অতি নিকট সম্বন্ধের কথাই বলিয়াছেন। শত্রু হইলেও নিকট আত্মীয়। চন্দ্রপাত হয় দুই বিন্দুতে, এবং জ্যোতিষ-সিদ্ধান্ত দুই রাহুই সিদ্ধান্ত করেন (৩৮৭ পৃঃ)। আমরাও অসুর জোড়ায় জোড়ায় পাইতেছি—হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু; রাবণ কুম্ভকর্ণ; এবং শিশুপাল বক্রদন্ত। জন্মকালে শিশুপালকে বিকৃত মুখ প্রদান করিয়া পুরাণকার আবার তত্ত্বটা যতদূর সম্ভব প্রকট রাখিতেই প্রয়াস পাইয়াছেন।

সূর্য্যের অপবাদের কথা একবার উক্ত হইয়াছে। কৃষ্ণের নামে যে কলঙ্ক আছে তাহা সৌর রূপক হইতেও উৎপন্ন হইয়াছে। রাসমণ্ডলে কৃষ্ণকে গোপীদের সঙ্গে চক্রাকারে ঘুরিতে হয়। এ চক্র সূর্য্যের ভ্রমণ পথের দ্যোতক। এখানে রূপককে অতি বিশদ করা হইয়াছে। সূর্য্যের নক্ষত্র হইতে নক্ষত্রের নিকট গমন করাকেই কৃষ্ণের বহুস্ত্রীগমন ও পরদারাভিমর্ষণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ষোলশত গোপী বা ষোড়শ সহস্র একশত অষ্ট স্ত্রী—এত নায়িকা

বহু নায়িকা আকাশের নক্ষত্র

এক সঙ্গে কেবল ঐ আকাশের গায়েই কবিরা সংগ্রহ করিতে পারেন। এক নায়কের "লক্ষ কোটি" নায়িকার কথা চন্দ্র-সূর্য্যের ভ্রমণ-পথে নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্য দিয়া গমনের রূপক ছাড়া আর কিছুর কল্পনাতেই আসিতে পারে না। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণকারের বদ্‌রুচিপ্রসূত কবিত্বোচ্ছাসের উহাই একমাত্র ক্ষেত্র। বিষুবন্ যে নক্ষত্রে, তাহাকে প্রাধান্য দেওয়া চলে। কৃষ্ণকর্ত্তৃক গোপিকাদিগের মাখন চুরি, বস্ত্রহরণ ও ধর্ম্মনাশ, সূর্য্য কর্ত্তৃক তারকাগণের জ্যোতিঃহরণ ধরা যায়। আমি সৌর রূপকের কথাই বলিতেছি। কৃষ্ণকথায় আধ্যাত্মিক রূপক নাই, তা বলিতেছি না। বস্ত্রহরণকে বেশ আধ্যাত্মিক রূপকে পরিণত করা হইয়াছে। ঐতিহাসিক সত্য হইলে কোন ভদ্রলোক কোন ভদ্রলোকের সম্বন্ধে এমন কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে না।

বৈদিক সূর্য্য ও অগ্নি

ঋগ্বেদে মেঘসমূহ ইন্দ্রের গাভী যাহাদিগের দুগ্ধে মেদিনী প্লাবিত হয়। সুতরাং আকাশটা গোশালা বা গোকুল। এই আকাশে সূর্য্য মেঘের মধ্যে কি লুকোচুরি খেলেন না? আমরা গোকুলে ধেনুগণের মধ্যে ক্রীড়ানিরত কৃষ্ণকে পাইতেছি। মিশরীয় ধর্ম্মমতের বিবর্ত্তনে দেখা যায়, সব দেবতার পরিণতি সূর্য্যে। আমাদের দেশে সূর্য্যের রূপান্তর বিষ্ণুতে। মিশরে সূর্য্যের অবতার কমনীয়-কান্তি প্রিয়দর্শন (**New-born Sun-god**) বাল-গোপালের পূজা প্রচলিত ছিল। নবজাত সুদর্শন অগ্নির পূজা বৈদিক। বাজসনেয়-সংহিতা মতে অগ্নি পৃথিবীতে বিষ্ণুর বিগ্রহ। নবজাত অগ্নি নবজাত পুত্রের ন্যায় আনন্দদায়ক। অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে গৃহ আলোকিত হয়। ভাগবত বলেন, কৃষ্ণ স্বীয় প্রভাদ্বারা সূতিকাগারের শোভা সম্পাদন করিয়া ছিলেন। গোবর্দ্ধনধারণ সদ্যপ্রজ্বলিত অগ্নির উপরে পর্ব্বতাকার ধূমরাশি। দুই খানি অরণিযোগে অগ্নির উৎপত্তি, সুতরাং অগ্নি দ্বৈমাতৃক বা দ্বিজ। কৃষ্ণেরও দুই মাতা। সূর্য্যেরও দুই মা—ভূ এবং দ্যুঃ। অগ্নি জাতমাত্রই তাহাতে হবিঃ নিক্ষেপ, কৃষ্ণেরও মুখে মাখন। অগ্নি জাতবেদা। কৃষ্ণের জ্ঞানেরও তুলনা নাই। অগ্নি দৌত্যকর্ম্মে নিপুণ, কৃষ্ণকেও দূত সাজিতে হইয়াছিল। জন্মমাত্র দেবতারা অগ্নিকে সম্বর্দ্ধনা করেন এবং দস্যু-দিগের বিনাশকারী বলিয়াও অগ্নিদেব বেদে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। অগ্নি ও সূর্য্য উভয়েই কামিনীপ্রিয় ও বহু স্ত্রীর স্বামী বলিয়া বেদে বর্ণিত। কিন্তু বিশেষ ভাবে দুই স্ত্রীর প্রসঙ্গ আছে। বহু স্ত্রী বলিয়াও আবার দুই জনকে নির্দ্দেশ কেন? দুই জনের মধ্যে পার্থক্য যেমন দিবা ও রাত্রি। কবিবর নবীনচন্দ্র

রুক্মিণী ও সত্যভামার মধ্যে গঙ্গা ও যমুনা সম্বন্ধই স্থাপন করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও যাইয়া দুই জনেই ঠেকিয়াছেন। ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার যেন সেই বৈদিক আখ্যানে যাইয়াই উপস্থিত। ঋগ্বেদের অনেক সূক্ত এখনও অস্পষ্ট। তিলক মহাশয় Orion ও Arctic Home এ অনেক নূতন অর্থ করিয়াছেন। তবে এ কথা ঠিক, অনেক স্থলে অগ্নির সঙ্গে গহ্বর ও তার মধ্যে লুক্কায়িত ধেনু বৎসের সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে। সে সব স্থান পাঠ করিলে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক গো-হরণ ও কৃষ্ণকর্ত্তৃক উদ্ধার মনে পড়িবে। অন্য দিকে, অসুরগণ-কর্ত্তৃক অপহৃত গাভীসকল ইন্দ্র প্রত্যাহরণ করিয়াছেন, এরূপ বৃত্তান্তও আছে। এ হয় তো শীতকালে অন্তর্হিত মেঘসকলের পুনরাগমনের ও বজ্রপাতসহ তাহাদের বারিবর্ষণের কথা রূপকে বর্ণিত। যাহা হউক, কৃষ্ণ তো উপেন্দ্র, ইন্দ্রের গুণ তাহাতে বর্ত্তিবে না কেন? আবার শত্রু বলিয়াও বর্ত্তিবে। প্রাচীনকালের যোদ্ধজাতিরা শত্রুর কঙ্কাল ধারণ করিত শত্রুর গুণের অধিকারী হইবার জন্য। সুতরাং ইন্দ্র যখন অন্তর্হিত হইলেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্য উপেন্দ্রে আসিয়া বর্ত্তিল। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে, কৃষ্ণকর্ত্তৃক ইন্দ্রের স্থানচ্যুতির মধ্যে ভারতীয় ধর্ম্ম-বিবর্ত্তনের একটী জটিল ঐতিহাসিক রহস্য থাকা খুবই সম্ভব। পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এপোলো ও হার্ম্মিসের বিবাদ দুই বিভিন্ন জাতির বিবাদের প্রতীক। এপোলো বিজেতা ডোরিয়ানদের দেবতা, আর হার্ম্মিস্ বিজিত আদিম অধিবাসীদিগের উপাস্য। ঋগ্বেদের ইন্দ্র ও কৃষ্ণের বিবাদের কথা উল্লেখ করিয়াছি। ইন্দ্র কৃষ্ণকে পরাজিত করিয়াছেন। ইহার অর্থ, আর্য্যগণ আদিম অধিবাসীদিগের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। পরে যে কৃষ্ণ ইন্দ্রকে হারাইলেন তাহার অর্থ এই, যে দেশ-প্রচলিত প্রাচীন ধর্ম্ম বিজেতাদের ধর্ম্মের উপর জয়লাভ করিল। ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। বিজেতৃ রোমকগণ বিজিত গ্রীক্‌দিগের দেবতাসকল গ্রহণ করিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে বিজিত ভারতীয়গণের ধর্ম্ম বিজেতাদিগের শ্রোত্রাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, অগ্নির জিহ্বার উপমায় কৃষ্ণবর্ণ। ঘটনাচক্রে সূর্য্যের উপমায়ও কৃষ্ণবর্ণ আসিয়াছে। কালাচাঁদ ক্রোড়ে যশোদা (Madonna) পৌরাণিক জগতের বিশ্বজনীন চিরন্তন সত্য। আইসিসের ক্রোড়ে হোরাস্ এবং তদনুকরণে মেরীর ক্রোড়ে যীশু কৃষ্ণবর্ণ। সৌর রূপকের অভিব্যক্তি অনেক দেবতাই কালাচাঁদ। কেন? সংক্ষেপে এই—সূর্য্যের দুই রূপ দিবা ও

রাত্রি। রাত্রিবেলার রবি আবার চন্দ্রের সঙ্গে মিশিয়া চন্দ্র সম্বন্ধীয় রূপকের অংশীভূত হয়। চন্দ্রের দুই রূপ আবার পূর্ণিমা ও অমাবস্যা। সুতরাং মসীবর্ণের আবির্ভাব সহজেই হইতেছে। অমাবস্যার চন্দ্র পূর্ব্বদিন ও পরদিন লইয়া তিন দিন দৃষ্টিগোচর হয় না বলিয়া তিন দিন কবরে থাকিবার পুরাণ প্রচারিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ অসিরিস্ প্রভৃতি সৌরদেবতারা যে কারণে কালাচাঁদ, কৃষ্ণও সেই কারণে। বিষ্ণুও কৃষ্ণবর্ণ—বোধ হয় অভিব্যক্তির এক স্তরে আকাশের সঙ্গে একীভূত করা হইয়াছিল। বোম্বায়ের উপকণ্ঠ বেণ্ড্রার সমুদ্রতীরে যখনই দেখিলাম, অনন্ত নীলসাগরের সহস্র উর্ম্মি ফণীর ফণামণ্ডলের নিরুপম শোভা বিস্তার করিয়া আর এক সর্ব্বব্যাপী অনন্ত নীলাকাশকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া রহিয়াছে, তখনই যেন অলক্ষিতে বিষ্ণুর অনন্ত-শয্যার চিত্র চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। নীল জলে নীল তনু সিত লহরী! তার পর মনে হইল, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"। যে উদ্যোগী পুরুষসিংহ সাহস করিয়া বাণিজ্যের জন্য তরী এই সাগরে ভাসায় লক্ষ্মী তাঁহার করায়ত্ত—লক্ষ্মী যে জলধিতনয়া, সাগর সেঁচিয়া সংগ্রহ করিতে হয়।

পুরাণ কিরূপে ইতিহাস হয়

সে কালে পুস্তক রচিত হইত কম। প্রচার হইত আরও কম, সাধারণের সঙ্গে আদিতে কোন সম্পর্কই থাকিত না। লেখক হয় তো একটা রূপককে কবিত্ব দিয়া বাড়াইয়া তুলিয়া নিজের মনোরঞ্জন করিতেন, এবং সেই ভাবের ভাবুক সমধর্ম্মী দু চার'জন পণ্ডিতের সন্তোষ সাধন করিতেন। তাঁহারা জানিতেন উহা রূপক, হয় তো ভাষা তাহা বলিত না। যেমন ব্যঙ্গচিত্রে (Cartoon) একটী ভাব অঙ্কিত হয়। শুধু চিত্রে যাহা পাই, তাহাকে বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিলে ভুল হয়। যিনি আখ্যান লেখেন তাঁহার আখ্যানবৃক্ষ ভাবটি জানা আছে। অন্যেরাও যাহারা জানে, তাহাদের ভুল হইবে না। তাহারা ঠিকই জানে ইহা পুরাণ (Myth)। ইতিহাস বলিবে তাহারা যাহারা ভাব হইতে অনেক দূরে। সাময়িক ঘটনার দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রী-নির্ব্বাচন (২৩।৩।২৫) লইয়া নানা রঙ্গরস চলিতেছে। মনের ভাব চিত্রের মধ্য দিয়া আত্ম-পরিচয় দিতেছে। একই ভাবের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন চিত্রে প্রকাশিত হইতেছে। এক ভাবই বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে বিভিন্ন আকার ধারণ করিতেছে। এই সকলকে পাশাপাশি সাজাইয়া এক কাব্যের বিভিন্ন সর্গে

পরিণত করা যায়। পুরুষকে নারীরূপে চিত্রিত করা হইতেছে, কখনও বা মানুষই পশুপক্ষীর আকার পাইতেছে। যাহারা জানে তাহাদের ভুল হইবে না, রস উপভোগ করিবে। ধরুন, কাব্য লিখিয়া ফেলিয়া রাখা হইল। পরে ব্যাসের নামে পরিচিত হইল। যাহাদের পুরাণ কাব্য ইতিহাস জীবন-চরিতের পার্থক্যের জ্ঞান নাই, তাহাদের দুর্দ্দশার কথা ভাবুন। তাহারা ভাবিবে, সে কালের মানুষেরা হয়তো মন্ত্র-শক্তি-বলে পশুপক্ষী হইতে পারিত, পুরুষেরা স্ত্রীলোক হইত। এইরূপেই পুরাণ রচিত হয় ও মানুষ ভ্রমে পড়ে। সেকালে সাধারণে পুরাণ গ্রহণ করিত গ্রন্থকারের নামের জোরে। সেইজন্য গ্রন্থকার নিজের নাম না দিয়া ব্যাসের নামে প্রচার করিতেন। গ্রন্থ প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেই হয় তো গ্রন্থকার মারা গেলেন। লোকে জানে ব্যাসরচিত এক পুঁথি ওমুকের বাড়ীতে আছে। তাহা কিন্তু দুই খানা কাষ্ঠের মধ্যে দু'চার পুরুষ বাঁধাই রহিল। ফুল-চন্দনে পিষ্ট বা কীটদষ্ট হইতে থাকিল। তার পর এক প্রত্নতাত্ত্বিক—সে কালের অবশ্য—জাহির করিলেন, যে উহা ব্যাসদেব-লিখিত ওমুক পুরাণ। ভাষায় যাহা লেখা আছে তাহাই লোকে বুঝিল, ভাব পশ্চাতে পড়িয়া গেল। মনে 'কিন্তু' উপস্থিত হইলেও মুখে বলা চলে না; কেন না, ব্যাসের কলম। এখনও দেখা যায়, শিক্ষিত লোকেরাও যেন শঙ্করের মতের প্রতিবাদ করিতে সাহস করেন না; যদি সত্য না হইবে তবে শঙ্কর লিখিলেন কেন? কিন্তু সন্দেহ লোকের মনে উঠে। রূপক প্রাকৃত অর্থে লইলে খট্‌কা না লাগিয়া যায় না। ব্রহ্মারও দুর্দ্দশা হইয়াছে। ভাগবত শুনিতে শুনিতে পরীক্ষিৎও প্রশ্ন না করিয়া পারিলেন না, শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ কিছু দেখিতে পাইলেন। সুতরাং উত্তর দিতে যাইয়া পুঁথি বাড়িয়া উঠিল। গ্রন্থ তখন অতি ক্ষুদ্র করিয়াই লেখা হইত। ছাপানও হইত না, লেখাও সহজ ছিল না। সুতরাং বড় গ্রন্থ প্রচার হইবে কেন? আমাদের এমন যে শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট বিশাল বট-বৃক্ষ-সদৃশ মহাভারত তাহাও আদিতে "শ্লোকৈশ্চতুর্ভিঃ"তে লিখিত। এই ক্ষুদ্র বীজ হইতেই উহার উৎপত্তি। নূতন বাইবেল্ গ্রন্থের ইতিহাসে দেখা যায়, একজন যীশু খৃষ্টের সম্বন্ধে দুই পাতা লিখিয়াছে, তাহা পঠিত হইল, এবং বিরুদ্ধবাদীর উত্তর দিতে যাইয়া আর দুই পাতা তাহার সঙ্গে জোড়া লাগিল। এইরূপে গ্রন্থ বাড়ে এবং লোকপরম্পরায় প্রসিদ্ধি লাভ করে। অকথা কুকথা থাকিলেও বাপ-পিতামহের আমল হইতে চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া লোকের সহিয়া

যায়। পরে আবার ব্যাখ্যাদির দ্বারা হয় তো প্রাচীন ভাবেই যাইয়া মানুষ উপনীত হয়। যিনি রূপক ব্যবচ্ছেদ করিয়া লৌকিক ভাবে তত্ত্বটিকে ভাষায় ব্যক্ত করেন, তিনিই বাস্তবিক পুরাণকার। পরে যাঁহারা অলঙ্কারে সাজাইয়া রূপককে একেবারে ঢাকিয়া ফেলেন, তাঁহাদিগকে কবি বলা যায়। তেমন তেমন কবির হাতে পড়িয়া এমন যে অবোধ্য ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের যমযমী-সংবাদ, তাহাও মানুষের ঘরের কথার মত হইয়া ধরা ছোঁয়া দিতে পারে। তখন এটা কিসের রূপক সে কথা লইয়া আর পণ্ডিতগণের মাথা ঘামাইতে হয় না। প্রাচীন কালের কোন কবি হয় তো রূপক ভাঙ্গিয়া কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা যে রূপক তাহা বলিতে সাহস করিয়া এখন কে লাঠি খাইতে যাইবে? কোন নৈতিক তত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্যও এইরূপে পুরাণের (Conscious fiction) আশ্রয় লওয়া হয়। কিন্তু বিচারবিহীন বুদ্ধি-বিশ্বাসের কাছে পুরাণ জীবন-চরিত হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথের "রক্ত করবী" প্রভৃতির নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণকে ঐতিহাসিক মনে করার ন্যায় নির্ব্বুদ্ধিতা আর কি হইতে পারে? যেমন খৃষ্টীয় মস্মিগণ ঐতিহাসিক যীশুকে পূজা করা পৌত্তলিকতা বলিয়া মনে করেন, এবং পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ অধ্যাত্মিক ভাবে গ্রহণ করেন, তেমনি বৈষ্ণব ভক্তগণও রাধাকৃষ্ণের লীলাকে আধ্যাত্মিক ভাবেই গ্রহণ করিয়া তাহার রসাস্বাদন করিয়াছেন। নতুবা আল্‌ওয়াল্ আক্‌বর সা প্রভৃতি বৈষ্ণব মুসলমান কবিগণ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণরাধা-বিষয়ক পদাবলী কখনও রচনা করিতে পারিতেন না। কাব্যে কৃষ্ণলীলা যাহা পাই, সাধু মুসলমানের বিবেক তাহার বিদ্রোহী না হইয়াই পারে না। তাই মনে হয়, যদি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা সুপ্রাচীন রূপকের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইত এবং আদিতে বিদ্বজ্জন সমাজে ঐ ভাবেই গৃহীত এবং প্রচারিত না হইত, তবে প্রাচীন আর্য্যদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী ঋগ্বেদের সেই সুর-দৈবত বেদের মন্ত্ররচয়িতা ঋষি এবং উপনিষদের সর্ব্বজ্ঞান-পারদর্শী নিষ্কাম কৃষ্ণের নন্দদুলাল হওয়া, এবং কেবল সমূহ বালচাপল্য নহে কিন্তু বাল্যেই যৌবনের পারদর্শন, জনসমাজ সহ্য করিতে পারিত না। সুতরাং আমাদের কল্পিত গ্রন্থকার উহা লিখিতেনও না। ব্রহ্মার কথা যাঁহারা লিখিয়াছিলেন, তাঁহারা জানিতেন উহা রূপক, তাই শ্রদ্ধা হারান নাই। যদি উহা কেহ প্রকৃত ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করে, তবে শ্রদ্ধা থাকিতেই পারে না। এখনও এক জন সাধারণ লোককে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে, উহার গূঢ় অর্থ আছে, কিন্তু কি অর্থ তাহা সে না জানিতে পারে। "তেজীয়সাং ন দোষায়" বলিলে ধর্ম্মনীতিমান্ জীব মানুষ তৃপ্ত হইতে পারে না।

ধর্ম্মের তত্ত্ব ও সাধন

খ। দর্শনভাগ

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ গীতা

কৈফিয়ৎ

আমরা ইতিপূর্ব্বে হার্বার্ট স্পেন্সারের সমালোচনা করিয়া অজ্ঞেয়বাদ খণ্ডন করিয়াছি। স্পেন্সার ব্যক্তিবিশেষ নহেন। তিনি একটা দার্শনিক মতবাদের প্রতিনিধি। সেই জন্যই আমরা তাঁহার মতের আলোচনা করিয়াছি। এখানেও আমরা উক্ত পন্থাই অবলম্বন করিব। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল দেশে সর্ব্বজনবিদিত। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতারূপে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, এবং নবদ্বীপ যাইয়া তত্রস্থ প্রধানদিগের নিকটে সুখ্যাতিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সমালোচনা করিয়াই আমরা কৃষ্ণতত্ত্বের মধ্যে যতটুকু ভ্রান্ত অবতার-বাদ আছে তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। এ পরিচ্ছেদে এই উপলক্ষে অবতারবাদের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য যে সকল আনুষঙ্গিক অবান্তর কথার অবতারণা করা হইয়াছে তাহারই সমালোচনা থাকিবে। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে স্বতন্ত্রভাবে অবতারবাদের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিব। তবে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, বিপিনবাবুর সমালোচনা বিপিনবাবুর জন্য নয়। তিনি হয় তো ইতিমধ্যেই মত পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছেন। 'হয় তো' কেন, অন্ততঃ কোন কোন বিষয়ে করিয়াছেনই। কিন্তু ভ্রান্ত যুক্তিতে যাহাদিগকে স্বমতে আনিয়াছিলেন অর্থাৎ বিপথে পাঠাইয়াছিলেন তাহাদের নিশ্চয়ই এত শিগ্‌গির শিগ্‌গির মত পরিবর্ত্তন করিবার সুযোগ ও সামর্থ্য নাই। সেই জন্য ভ্রান্তি প্রদর্শন প্রয়োজন। মহাত্মা গান্ধী কতবার মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন এবং মহাত্মা নিজেও স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার অনুপস্থিতিতে "No changer" নাম লইয়া অটল হইয়া বসিলেন। ইঁহাদের জন্য পথ্য-প্রদান প্রয়োজন। "No changer" নামেই পরিচয়, ইঁহারা "psychologically impossible" জীব। ইহা মানসিক ব্যাধি, চিকিৎসা দরকার। বিপিন-

বাবুর মত বদ্‌লাইয়াছে, সত্য; কিন্তু এই দীর্ঘজীবন-পথে পথ চলিতে চলিতে যাহাদিগকে তিনি পথভ্রষ্ট করিয়াছেন, তাহারা যে এত সহজে পথ পাইবে না, তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর শত-বার্ষিকী উপলক্ষে যে "Truth" নামক পুস্তক (১৯২৫) প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ৩য় পৃষ্ঠায় গ্রন্থ-লেখক বিপিনবাবুর একটা অধুনা পরিত্যক্ত মতকে ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন। তাই বলি, সমালোচনা বাহুল্য নহে।

মুখবন্ধ

বিপিনবাবুর প্রধান দোষ, অথবা যাহা আমাদের কাছে দোষ বলিয়া মনে হয়, তাহা তাঁহার ভাব-প্রবণতা—যখন যে ভাবের ঢেউ আসে, তিনি যেন তাহারই সঙ্গে আপনাকে একীভূত করিয়া ভাবেন। তাই, এ ঢেউ হইতে ও ঢেউর উপর দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়, বুঝি মূল ওলট্ পালট্ হইয়া গেল। নদীর অন্তঃস্রোত চিরদিনই সমুদ্রমুখী—কিন্তু উপরের তরঙ্গ বাতাসের বেগে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সব দিকেই ঘোরে। আত্মারও একটা অনন্তমুখী গতি আছে—উপরের ভাবাবেগ তাহাকে অন্য দিকে লইয়া যাইতে পারে কি? সেই জন্যই যে কোন মুহূর্ত্তের এই সাময়িক ভাবকে জীবনের সবটা বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। এই কিম্বা এতাদৃশ কোন ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই কি তিনি পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে জানাইয়াছেন, যে তিনি ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িতেছেন না, কিন্তু একটু ছাড়াইতেছেন মাত্র। ব্রাহ্মসমাজের দুই দিক্,—তাহার প্রকৃতের (actual) দিক্ ও তাহার আদর্শ (Ideal)এর দিক্। "সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্" যে সমাজের মূলমন্ত্র, সত্য লাভ করিয়া কেহ সে সমাজকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। ইহা অবশ্য আদর্শের দিক্। এই জন্যই তিনি আজ যে সত্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহা সত্ত্বেও তিনি ভাবিতেছেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বর্জ্জন করেন নাই। কিন্তু তাহা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে মিলিবে না বলিয়া তিনি মনে করিয়াছেন, যে সমাজকে ছাড়াইয়া উঠিতেছেন। সত্য-ধর্ম্ম কেবল এইমাত্র বলিতেছেন, 'See that your light is not darkness.' আজ তাই পরীক্ষা করিতে আসিয়াছি! সত্য হইলে উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য, মিথ্যা হইলে আবার পরিত্যাগ করিতেও বাধ্য; কেননা, ব্রাহ্মের উহাই ধর্ম্ম। বিপিনবাবুর সম্বন্ধেও

* শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক লিখিত ১৩২০ সাল, (ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক) "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত "শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব"।

ঐ কথা, তিনিও ব্রাহ্মত্বের দাবী পরিত্যাগ করেন নাই। পরে তো কবুল জবাবই দিয়াছেন। "হিন্দুর ঘরে জন্মিয়াছিলাম, ইহাও মহাভাগ্য, ব্রাহ্ম সমাজে আসিলাম ইহাও মহাভাগ্য।" পুনশ্চ, "হিন্দুসমাজে না জন্মিলে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হইতাম, ব্রাহ্মসমাজে না আসিলে সেইরূপ বা ততোধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতাম"। (নব্যভারত, আশ্বিন ১৩২৯)।

আমাদের এই সমালোচনা কাহারও কাহারও কাছে তীব্র বলিয়া মনে হইতে পারে—তাঁহারা রাগ করিবেন ও গালাগালি দিবেন। রাগ করা যেমন সহজ, দুঃখিত হওয়া তত সহজ নহে। যাঁহারা দুঃখিত হইবেন, তাঁহাদিগকে বিনীতভাবে জানাইতেছি, যে আমাদিগকে এই সমালোচনা করিতে হইল বলিয়া আমরা তাঁহাদের অপেক্ষা কম দুঃখিত নহি তাঁহারা বলিতে পারেন, তবে এ অধ্যবসায় হইতে ক্ষান্ত হইলেই হইত। তাহার একমাত্র উত্তর এই, যে "There is no higher work than to fight untruth." দ্বিতীয় কথা, ক্ষত্রিয়ের অনুরোধ উপরোধ নাই। গুরু দ্রোণ কি পিতামহ ভীষ্ম, সে বিচারের অবসর কোথায়? তাহার তূণীরে যে ক'টা বাণ আছে, তাহার একটাও সে অব্যবহৃত রাখে না। সাহিত্য-ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণ আছেন, তা জানি। কিন্তু সে উচ্চ পদ এখনও লাভ করিতে পারি নাই, সুতরাং তার ভাণ করা আমার পক্ষে ভয়াবহ। বিশেষ, আমার সম্মুখে দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। পথ-প্রদর্শক স্বয়ং বিপিনচন্দ্র। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যে পথে যায়, সেই পথেরই অনুসরণ করিতে হয়। শ্রাদ্ধ ঔর্দ্ধদৈহিক ব্যাপার। এই জন্যই ইহার নাম প্রেতকৃত্য। ইহা আবার পুত্র-কৃত্যও বটে। সেই জন্য বিপিনবাবু দেশশুদ্ধ লোকের শ্রাদ্ধ শেষ করিয়া রাখিয়াছেন। তবে নিজের শ্রাদ্ধটাই বা না দেখিয়া যান কেন? ভগবানের কাছে প্রার্থনা, তিনি সুদীর্ঘজীবী হইয়া মায়ের সেবায় রত থাকুন, এবং প্রেতকৃত্যের দিন পিছাইয়া দিয়া আমাদিগকে পুত্রকৃত্যের দীর্ঘ অবসর প্রদান করুন।

যাহা হউক, আমার অধ্যবসায়ের কারণটা একটু খুলিয়া বলি।

কারণ-চতুষ্টয়

(ক) যে ব্রহ্মসঙ্গীতের অনুবাদ মাত্র আস্বাদন করিয়া সভ্যজগৎ রসের উৎস লাভ করিল বলিয়া মনে করিতেছে, বিপিনবাবু উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বলিয়াছেন, যে উহা অজীর্ণ বৈষ্ণব রসের উদ্গার মাত্র। ব্রহ্মসঙ্গীতে বিপিনবাবু এই হুঙ্কারজনক বস্তু ছাড়া আর কিছুই পান নাই। এক জন গণিতবিদ্ "Paradise Lost" পাঠ

করিয়া বন্ধুকে বলিয়াছিলেন "What does Milton prove by writing Paradise Lost?" বন্ধু উত্তর দিয়াছিলেন, "He proves you a fool." আমার কথাটা কিন্তু ইহা নহে। বিপিনবাবুর মুখেই ব্রহ্মসঙ্গীতের মাধুর্য্যের কথা আমরা শুনিয়াছি। ওকালতি করিতে গেলে তিনি আত্মস্থ থাকেন না, ইহাই দুঃখ।

(খ) ব্রাহ্মসমাজ অবতার মানেন না। বিপিনবাবু বিজ্ঞের মত চাবুক্ হাতে লইয়া বলিতেছেন, যে উঁহাদের এই মত নিতান্ত অজ্ঞান-কল্পনা মাত্র।

(গ) ব্রাহ্মগণ ত নিরাকার-তত্ত্ব বুঝেনই না!

(ঘ) বিপিনবাবু ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাকে ব্রহ্মোপাসনা বলিতে নিতান্তই নারাজ। কখনও ঠাট্টা করিয়া বলিতেছেন, মামুলি নিরাকার উপাসনা বাক্য যার বাহন; কখনও উপহাস করিতেছেন- তথাকথিত নিরাকার উপাসনা, কখনও বা বলিতেছেন প্রচলিত বাঙ্ময়ী উপাসনা ইত্যাদি। সুতরাং ইহার উত্তর কেবল শুনিতে হইবে তাহা নহে, একটু ধৈর্য্যের সঙ্গেই শুনিতে হইবে। ঐষিক বাণ প্রতিরোধ করিতে হইলে অর্দ্ধচন্দ্র বাণ নিক্ষেপ করিতে হয়। ক্ষত্রিয়ে ক্ষত্রিয়ে কোলাকোলি, অস্ত্রের খোঁচা লাগা কিছু অসম্ভব নয়—ব্যাঘ্রনখও বাহির হইতে পারে, তবে তাহা সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রণালীতে নয়। সুতরাং ধৈর্য্যের অবসর যথেষ্টই রহিয়াছে। এখন আসল বিষয়ের অবতারণা করা যাউক।

ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্

কৃষ্ণতত্ত্বের নানারকম ব্যাখ্যা হয়—আধ্যাত্মিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক—যাঁহার মনের গতি যে দিকে, তিনি সেই দিকেই টানিতে পারেন। কৃষ্ণ কেমন? যার মন যেমন, এইখানেই বেশ খাটে। কেবল কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধেই যে মতভেদ হয়, তাহা নহে। জগতে এমন তত্ত্ব কমই আছে, যাহার নানা ব্যাখ্যা নাই। ব্যাখ্যাকার মানুষের স্বানুভূতি। তত্ত্ব যাহাই হউক না কেন, তাহা শূন্য হইলেও আমি পূর্ণ করিয়া দিতে পারি। বিপিনবাবু ঠিক কোন্ অর্থে কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন, তাহা যদিও স্পষ্ট বুঝা যায় না, তবে তাহার মনের ঝোঁক্ কোন্ দিকে, তাহা বুঝা গিয়াছে। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, কৃষ্ণনামে খ্যাত যে অবতারের ভজনা বৈষ্ণবেরা করেন, এবং যাঁহার ভোগরাগ আখ্ড়ায় হয়, তাহাই যে পরম তত্ত্ব ইহা লাখে না জানয়ে এক। আমাদের বিচার্য্য বিষয় কৃষ্ণতত্ত্বের এই ব্যাখ্যা। এই

কৃষ্ণতত্ত্বের চরমত্ব প্রদর্শনের জন্য বিপিনবাবু, ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্—ঈশ্বরতত্ত্বের এই তিন দিকের বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সে আলোচনায় 'আলো'র ভাগ যে খুব বেশী তাহা কোন বিবেচক ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন না। 'আলো' নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অন্ততঃ আমার চোখে যে পড়িতেছে না, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এই আলোচনা যে ইতিহাস ও দর্শন, দুই দিক্ হইতেই নিতান্ত ভ্রান্ত, তাহা প্রদর্শন করিতে গেলেই এক পুঁথি হইয়া পড়িবে। কিন্তু যে টুকু আমাদের আলোচনার মধ্যে আসিবে, তাহাতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, যে আমি আমার এই মন্তব্যে বিপিনবাবুর উপর একটুও অবিচার করিবার সুযোগ পাই নাই। ইতিহাসের দিক্ দিয়া যদি বলিতে হয়, তবে সাধারণ ভাবে বলা যায়, যে বেদে ব্রহ্ম-ভাব, বেদান্তে পরমাত্ম-ভাব ও পুরাণে ভগবান্ ভাবের বিকাশ হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে রাজর্ষি রামমোহনের সময়কে ব্রহ্ম-ভাবের, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে পরমাত্ম-ভাবের এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে ভগবান্‌ভাবের প্রতিনিধি (Representatives) বলিয়া সাধারণ ভাবে গ্রহণ করিলেও যেমন এ কথা বলা যায় না, মহর্ষির মধ্যে ভগবান্‌ভাবের কোনই বিকাশ হয় নাই, সেইরূপ উপনিষদে প্রধানতঃ পরমাত্মভাবের পূর্ণতা হইলেও সেখানে ভগবান্‌ভাবের কোন বিকাশ নাই, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। প্রাচীন উপনিষদেই ঐ ভাবের স্বীকার দৃষ্ট হয়। অন্যপক্ষে, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতিতে সে ভাব এতই স্পষ্ট, যে আজ যদি আমাদিগকে শ্লোক তুলিয়া তাহা প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তবে শতাধিক বর্ষ হইল রাজর্ষি যে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী জীবনে নিতান্ত ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

'ভগবান্' শব্দটীই উপনিষদ্ হইতে গৃহীত। ভাব ছাড়া শব্দ হয় না, অর্থহীন বাক্য হয় না। 'বাগর্থে'র নিত্যসম্বন্ধকে কালিদাস উপমান-রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং ভগবান্-ভাবেরও পত্তন উপনিষদে, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কেন না, উপনিষদের ব্রহ্ম,—"এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ"। শ্বেত, ৫।৪। ইহা অস্বীকার করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই, যে ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার বিকাশে পুরাণের অবিসম্বাদী স্থান রহিয়াছে। ব্রহ্মদর্শন তিন রকমে হয়,—জগতে ব্রহ্মদর্শন, আত্মায় ব্রহ্মদর্শন এবং ইতিহাসে ব্রহ্মদর্শন। ইতিহাসে ব্রহ্মদর্শনকেই ব্রহ্মের

ভগবান্‌ভাব বলা যায় এবং এই খানেই পুরাণের বিশেষত্ব। কিন্তু আজ এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে গোটা পুরাণটা গলাধঃকরণ সম্ভব কি? অন্ততঃ ইহাকে অবতারবাদের আবর্জ্জনামুক্ত করিতে না পারিলে সমগ্র জিনিষটাই সমূলে বিনষ্ট হইবে। পুরাণেরও তত্ত্বালোচনা (higher criticism) চাই। তাহাই তো ব্রাহ্মসমাজ করিয়াছেন, তবে সেটা স্বতন্ত্র কাহিনী। যাহা হউক, বিপিনবাবু কখনও উপনিষদ্ শাস্ত্ররূপে পাঠ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না; উহাকে কেবল নিজের মত সমর্থনের জন্য কখন কখন দুই একটি শ্লোক উদ্ধার করিবার ভাণ্ডাররূপেই দেখিয়াছেন; নতুবা তিনি কি রূপে বলিলেন, এবং কোনও চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি কি রূপে এ কথা বলিতে পারে, যে আধুনিক অজ্ঞেয়বাদ (Agnosticism) যাহাকে অজ্ঞাত (Unknown) এবং জ্ঞানাতীত (Unknowable) বলে, উপনিষদ্ ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা মনোময় কোষস্থিত, সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র কারণরূপী শুদ্ধ-সত্তামাত্র-জ্ঞেয় নির্গুণ ও নিরাকার তত্ত্বকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই উক্তির মধ্যে ভ্রান্তি, গুণে ও পরিমাণে (qualitatively and quantitatively), এত বেশী, যে সে জঞ্জাল ঘাঁটা হার্‌কিউলিশের পক্ষেও পরিশ্রমসাধ্য, মাদৃশ ক্ষীণজীবীর তো কথাই নাই। উপরে দুই একটী যা দেখা যায়, তাহার কথাই বলি। ঐতিহাসিক ভাবে উপনিষদের তত্ত্ব পরমাত্মা, ব্রহ্ম নহেন। ব্রহ্মভাব কারণরূপী নির্গুণ নহে, কার্য্যরূপী ত্রিগুণাত্মক। আগে মানুষ জগতেই ব্রহ্মকে দেখে, তার পর অন্তরালে খুঁজিতে যায়। এই ত্রিতত্ত্বই Hegel তাঁহার The Kingdom of the Son, the Kingdom of the Father এবং the Kingdom of the Spirit, এই তিন নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্রহ্ম শব্দ যে ব্রাহ্মসমাজে অতিব্যাপক অর্থে গৃহীত হইয়াছে, তাহা বিপিনবাবুর অবিদিত নাই! তিনি যাঁহাকে ভগবান্ শব্দে অভিহিত করেন, সেই পূর্ণব্রহ্মকেই যে পৌরাণিক আবর্জ্জনা হইতে মুক্ত করিয়া ব্রাহ্মসমাজ পরমপুরুষরূপে ভজনা করেন, যাঁহারা বাহির হইতে আসিয়া ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগ দেন, তাঁহারাও এ কথার সাক্ষ্য দিবেন, সুতরাং সে কথা লইয়া বিবাদ করিব না। তবে বৈষ্ণবগণ বলিতে পারেন, যে উহা তাঁহাদের তত্ত্ব, ব্রাহ্মগণ ধার করিতেছেন মাত্র। সত্য ধার করিতে ব্রাহ্মগণ কোন কালেই পশ্চাৎপদ হন নাই, সুতরাং সে কথা স্বীকার করিতে তাঁহারা লজ্জিতও হইবেন না। ধার করা কেন, কেহ যদি ঈশ্বরের সত্য ধার দিতে রাজি না হন, তবে ব্রাহ্মগণ তাহা 'চুরি' করিতে নারাজ নহেন; যেন তেন

প্রকারেণ ভগবান্‌কে 'আত্মসাৎ' করিতেই হইবে। তাই, ব্রাহ্মগণ সত্য চুরি করে, এই কথা শুনিয়া কেশবচন্দ্র বিস্ময়ের সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "Pilfering God's truth"? তবে, ব্রাহ্মগণ সত্য ধার করেন কি আপনার পূর্ণব্রহ্মতত্ত্বের একাংশ মাত্র স্থানে স্থানে বিকশিত দেখিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করেন, সে তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া প্রবন্ধ-কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাই না। ভগবানের ভাণ্ডারের তত্ত্ব ও রস দুই-ই যে অফুরন্ত, প্রাচীনকালেই নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই, তাই আজও নব নব ভাবে প্রকাশিত হইতেছে, এ কথার সাক্ষ্য প্রতি মুহূর্ত্তেই আমরা পাইতেছি। আর কেহ স্বীকার না করিলেও ব্রাহ্মগণ তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য। কেন না, অভিজ্ঞতাকে চক্ষুষ্মান্ অস্বীকার করিতে পারেন না।

আলোচনার সময়ে মনে রাখিতে হইবে, উপনিষদ্ বলিতে কোন এক বিশেষ তত্ত্ব বুঝায় না। কেন না, উহা একটী প্রকাণ্ড তত্ত্বভাণ্ডার। সুতরাং উহার মধ্যে সর্ব্বনিম্ন কি তত্ত্ব আছে তাহা দ্বারা নহে, উহাতে সর্ব্বোচ্চ কি তত্ত্ব বিকশিত হইয়াছে তাহার দ্বারাই উহার গুণ বিচার করিতে হইবে। উপনিষদ্ নামক গ্রন্থাবলিতে কেবল যে তত্ত্বের ক্রমবিকাশ আছে তাহা নহে, কিন্তু উহাতে নানা বিভিন্ন ধারার চিন্তাও একত্র গ্রথিত হইয়াছে। তাই,

উপনিষদের কথা

উপনিষদের ব্রহ্ম যে সত্তামাত্রে জ্ঞেয়, এই মহাতত্ত্ব (!) সম্বন্ধে দু' একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এই কথা আমি প্রথম শুনিতে পাই, অধ্যক্ষ কেয়ার্ডের মুখে। তিনি তাঁহার "Introduction to the Philosophy of Religion" গ্রন্থে বলিয়াছেন, যে উপনিষদের ব্রহ্ম সত্তামাত্রে জ্ঞেয়। তিনি এ স্থানে ওকালতি করিতেছেন,—খৃষ্টধর্ম্ম যে হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাই প্রমাণ করিতেছেন। হিন্দুগণ তত্ত্ববস্তুর সত্তামাত্র জ্ঞাত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার খৃষ্টধর্ম্মে সে তত্ত্ব পূর্ণরূপে বিকশিত, সুতরাং খৃষ্টধর্ম্মই পূর্ণধর্ম্ম। এই গ্রন্থ পাঠ করি, সে বহুদিনের কথা। তখন ইহার সত্যতা পরীক্ষা করিবার শক্তি ছিল না। কিন্তু পরে যখন উপনিষদ্ শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ প্রবেশ লাভ করিলাম, তখন বুঝিতে পারিলাম আচার্য্য কেয়ার্ড একটা মস্ত ভুল করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে আশ্চর্য্য হই নাই। বিদেশীর পক্ষে এরূপ ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী না হইলেও নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। কঠোপনিষদের "অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মত পণ্ডিত লোকের হাতেও

এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, যখন দেখিলাম, তখন বিস্মিত না হইয়া পারি নাই! এখন বিপিনবাবু যখন বলিলেন, যে উপনিষদের ব্রহ্ম "আছেন" এই মাত্র বলা যায়, তখন আর বিস্ময় প্রকাশ করিবার অবসর রহিল না। তিনি বল্লেন, যে উপনিষদের ব্রহ্ম কেবল সত্তামাত্রে জ্ঞেয় এবং মনোময় কোষে আবদ্ধ। ইহাতে কি ইহাই বুঝায় না, যে মন কেবল সত্তামাত্রের ধারণা করিতে পারে, আর কিছুর ধারণা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়? মনের যে কোন অর্থই গ্রহণ করি না কেন, এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক। অবশ্য, বিপিনবাবুর সব ভ্রান্তিরই আলোচনা এখানে চলিবে, তাহা আপনারা ভাবিবেন না। তাহা আপনাদের ধৈর্য্যে কুলাইবে না, আমারও সাধ্যাতীত। তাই স্থূল স্থূল বিষয় গুলিই আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। তবে বিপিনবাবু ব্রহ্মকে নিতান্তই মনোময় কোষে আবদ্ধ রাখেন নাই। যদিও তিনি বলিয়াছেন এবং তাহা স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন, যে মনোময় কোষ ভেদ না হইলে কেহ উপনিষদের ব্রহ্মবাদ অতিক্রম করিতে পারে না। তবুও তিনি এবারেও স্পষ্টাক্ষরেই বলিতেছেন, যে উপনিষদ্ই এই সাধারণ ব্রহ্মতত্ত্বের আরও অনেক উপরে উঠিয়াছেন। 'অনেক উপরে' শুনিয়া ভাবিয়াছিলাম যে তিনি বুঝি ব্রহ্মের মুক্তির পথ সুগম করিলেন। আমাদের আশা বৃথা। যদিও মুখে বলিতেছেন অনেক উপরে, কিন্তু কাজে ব্রহ্মকে কেবল বিজ্ঞানময় কোষ পর্য্যন্ত উঠিতে দিয়াছেন—এক ঘাটি হইতে আর এক ঘাটি—একটী ধাপ মাত্র,—ইহাকে অনেক উপরে বলা যায় কি? কিন্তু যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাতে তো সাক্ষীচৈতন্য একরূপ সাক্ষী-গোপাল হইয়া দাঁড়াইয়াছেন—তিনি যে নড়িয়াছেন, এমন তো মনে হয় না—মনোময়েই যেন রহিয়াছেন। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা যে অনুভবগুলিকে (Sensations) একত্রিত করি, তাহা তো মনের (Sensorium) কাজ—ইনিই সাক্ষী-চৈতন্য হইলে তো তিনি মনোময় কোষেই রহিলেন। এই মনকে যিনি ধরিয়া রাখেন, তিনিই তো বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ (Understanding), কই সে কথা তো বিপিনবাবু বলিলেন না। তবে ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ে আসিলেন কি রূপে? অবশ্য, দার্শনিক আলোচনা আমরা বিপিনবাবুর কাছে প্রত্যাশা করি নাই। কিন্তু পুস্তকে যে কথা লিখিত আছে, এবং যাহা তিনি পাঠ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, তাহারও যথাস্থানে সন্নিবেশ আশা করিতে পারি না কি? তিনি নিজেই ভৃগুবারুণি-সংবাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,

অথচ তিনি কি রূপে বলিতে সাহসী হইলেন, যে উপনিষদ্ ব্রহ্মকে বড় জোর বিজ্ঞানময় কোষে রাখিয়া গিয়াছেন—ইহার উপরের যে তত্ত্ব, তাহা পরাতত্ত্ব কৃষ্ণতত্ত্ব। "আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" এই তত্ত্ব কি আমরা ভৃগুবারুণি সংবাদেই পাই না? তবে সমগ্র রস কৃষ্ণতত্ত্বের জন্যই রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, এ কথার সার্থকতা কোথায়? সার্থকতা কোথায়, এ তথ্য আমাদিগকে একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে। বুঝিবার পূর্ব্বে পাঠক মহাশয়ের একটু ধৈর্য্যাবলম্বন চাই। নির্গুণ ও নিরাকার সম্বন্ধে এখানে তিনি কি বলিয়াছেন তাহার সঙ্গে, পরে কি বলিবেন তাহা মিলাইয়া দেখিলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন, যে কোন পক্ষসমর্থনে এক জন উকীলের যতটা সার্থকতা, বিপিন বাবুরও ততটা সার্থকতা—তার চাইতে এতটুকুও বেশী নয়। আপনারা হয় তো মনে করিতেছেন যে আমি গালাগালি দিতেছি, তাই আপনাদের কাছে আমার দলীল দস্তাবেজ উপস্থিত করিলাম।

ভ্রান্তি ও তাহার কারণ

বিপিনবাবুর উদ্দেশ্য কৃষ্ণ তত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা। সুতরাং উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বকে নীচে নামাইয়া না দিলে তাঁহার বৈষ্ণব বেদান্তের দাঁড়াইবার স্থান (*Locus standi*) হয় না। যদিও আমরা আনন্দময় ব্রহ্মের খবর উপনিষদেই পাই, তবুও বিপিনবাবুর কাছে উপনিষদের ব্রহ্ম মনোময়; বড় জোর তিনি বিজ্ঞানময় কোষের মধ্যে আছেন। উকীলের পক্ষে বিপক্ষের বলের ও নিজের দুর্ব্বলতার কথার উল্লেখ করিতে নাই। বিপক্ষকে হীন করিতে পারিলে যেমন নিজের কথার বাঁধুনি হয়, তেমনই দু'পয়সা রোজগারও হয়। সুতরাং "তুই ব্যাটা ৩ হাত, আমি ৩৷৷ হাত, অতএব তোর চাইতে বড়" এই কথা খুব তেজের সঙ্গে বলিতে পারিলেই হইল। পরের দিন যদি আবার ঘটনাচক্রে ঐ ধরণের একটা মোকদ্দমায় ঠিক উল্টা পক্ষে সওয়াল করিতে হয়, তবে ঐ ৩ হাতই বড় দেখাইবে। আর কা'লের কথা মনেই থাকিবে না। ঐ ৩ হাত যদি একটা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বস্তু হয়, বা সত্য হয় তবেই না মনে থাকিবার কথা—তর্কের খাতিরে একটা কথা বলিলাম, তাহা আবার কে মনে করিয়া রাখে! বিপিনবাবুর পক্ষে ঠিক তাহাই হইয়াছে। যখন ব্রহ্মোপাসনা ও মূর্ত্তিপূজার কথা আসিয়াছে, তখন বিপিনবাবু মূর্ত্তিপূজার পক্ষে ওকালতনামা গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মোপাসনা হয় না,

অথবা এরূপ দুরূহ যে না হওয়ারই মধ্যে। তখন তাঁহার সুর বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। যখন আলিপুরে মোকর্দ্দমা হইতেছিল, তখন এক দিন সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার নর্টন বেলিয়াঘাটার এক অস্ত্র-আইনের মোকর্দ্দমায় আসামীর পক্ষে উপস্থিত হইয়া পুলীশের কুষ্ঠি কাটিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন! অথচ এই পুলীশকে দেবত্বে মণ্ডিত করিবার জন্য আলিপুর আদালতে দিনের পর দিন আসামীদের উকীলগণের বিপক্ষে লড়িতেছিলেন। আপনারা এখন দেখুন, বিপিনবাবু যেমন মক্কেলের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশ্বস্ততার সঙ্গে লড়িতে পারেন—মক্কেল যিনিই হউন না কেন—এমন আর কোন উকীল কখনও পারিয়াছেন কি না। যেখানে কৃষ্ণতত্ত্বের মহত্ত্ব প্রদর্শন করিতে হইবে, সেখানে ব্রহ্ম কি? "স্রষ্টা—এই কার্য্যের কারণ, এই সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র, ভিন্ন, পৃথক্; সুতরাং তিনি নির্গুণ ও নিরাকার।" (পৃঃ৩৫৯) এখানকার উদ্দেশ্য এই, যে ব্রহ্ম তো তত্ত্বের এক দিক্ মাত্র, সুতরাং পূর্ণ তত্ত্ব হইতে নিকৃষ্ট। আবার যখন ব্রাহ্ম-সমাজের ব্রহ্মবাদকে দূরীকৃত করিয়া মূর্ত্তিপূজার সমর্থন করিতে হইতেছে, অথবা মূর্ত্তিপূজার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মোপাসনার বড় বেশী পার্থক্য নাই দেখান হইতেছে, তখন ব্রহ্ম কি? "ব্রহ্মবস্তু যখনই জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন বলিয়া বিবেচিত হন, তখনই বিশিষ্ট হইয়া, নিরাকারধর্ম্ম হারাইয়া ফেলেন" (পৃঃ ৫০০)। অর্থাৎ ভাদ্রমাসে ব্রহ্ম যে কারণে সুতরাং নিরাকার, আশ্বিনমাসে ঠিক সেই কারণেই তিনি নিরাকার-ধর্ম্ম হারাইয়া ফেলেন। যখন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার নিন্দা করিতে হইবে, তখন "প্রকৃত নিরাকার তত্ত্ব অবাঙ্‌মনসোগোচর। সে তত্ত্বকে বাক্য মনের গোচরীভূত করিতে গেলেই আর তার নিরাকারত্ব থাকে না।" (পৃঃ ৫০০) কিন্তু যখন ব্রহ্মকে হটাইয়া দিয়া বলিতে হইবে যে ব্রহ্ম কেবল শ্রীকৃষ্ণের "অঙ্গআভা মাত্র," * তখন "নিরাকারবাদ ও নির্গুণবাদ প্রকৃতপক্ষে কেবল মনোময় কোষেরই কথা" (পৃঃ ৩৫৯)। এক জায়গায় আছে, "যতক্ষণ না মনোময় কোষ ভেদ হইয়াছে, ততক্ষণ মানুষ নিরাকার ও নির্গুণ ব্রহ্মবাদকে অতিক্রম করিতে পারে না" (পৃঃ৩৫৯)। অন্য জায়গায়, "কোষপঞ্চক যতক্ষণ না ভেদ হইয়াছে ততক্ষণ এই

* আমি এই কথাটা এক জন নিরক্ষর বৈরাগীর কাছে শুনিয়াছিলাম। বিপিনবাবুর নিকট আশা করি নাই। এই 'আভা' জিনিষটা কি বস্তু, পাঠক তাহা 'গোলোক' তত্ত্বের আলোচনায় দেখিতে পাইবেন। ৭৩—৭৪ পৃঃ দেখুন।

অদ্বৈত (অর্থাৎ নির্গুণ ও নিরাকার) ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না” (৪৯৯)। এক বার বলেন, ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্ম নিরাকার-তত্ত্ব নয় (পৃঃ ৪৯৯-৫০০), আবার বলেন, ব্রাহ্মেরা নিরাকার ব্রহ্মে মানস ধর্ম্ম আরোপ করে (পৃঃ ৫০০)। একবার বলেন, নিরাকার ব্রহ্মে মানস ধর্ম্ম আরোপ করা অন্যায়; আবার বলেন, নিরাকার ব্রহ্মকে জগৎ ও জীব হইতে ভিন্ন ভাবা অন্যায় (পৃঃ ৫০০), যেন মানস ধর্ম্ম জীব ও জগতের ধর্ম্ম নয়! কি ন্যায় কি অন্যায় তাহা বলিতেছি না, কিন্তু বিপিনবাবুর ন্যায় অন্যায় জ্ঞানের একটা মাপকাঠি খুঁজিতেছি। আপনারা যদি ভ্রান্তির একটা তালিকা প্রস্তুত করেন, তবে দেখিতে পাইবেন, যে ‘বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি’ একটা মিথ্যাপ্রবাদ নয়। আমরা ইতিপূর্ব্বে যে বলিয়াছি, যখন যে ঢেউ আসে তিনি তাহারই সঙ্গে আপনাকে একীভূত করেন, সুতরাং জীবনের খেই হারাইয়া যায়, ইহা তাহারই অন্যতম দৃষ্টান্ত। এ বিভ্রাটের কারণ কি? কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বিপিনবাবুর গরজ ও তাঁহার ওকালতি বুদ্ধি। ব্রহ্ম সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কর্ত্তা, বিপিনবাবু ব্রহ্মের কর্ত্তা—অন্ততঃ যতক্ষণ ব্রহ্ম তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যে আছেন! যখন খুসি তিনি ব্রহ্মকে নিরাকারত্ব দিচ্ছেন, আবার যখন ইচ্ছা কেড়ে নিচ্ছেন! কখনও বল্‌ছেন, এই মনোময় কোষের মধ্যে থাক, বড় জোর ঐ বিজ্ঞানময়ের কোঠায় যেতে পার; কিন্তু খবরদার! এই আনন্দময়ের দিক্‌ও মা’ড়াতে পাবে না! তাহ’লে যে তাঁর শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের আভা আকাশে মিলিয়ে যায়। আবার যখন দরকার হচ্ছে, তিনি ব্রহ্মকে বল্‌ছেন—দেখ, ও সব ছাড়িয়ে একটু উপরে যেয়ে ব’স! সাবধান! ব্রাহ্মেরা যেন তোমার নাগাল না পায়। তাঁরা পঞ্চকোষ ভেদও কর্ত্তে পার্ব্বে না, ব্রহ্মোপাসনাও হবে না। সুতরাং অবতার ও মূর্ত্তিপূজার দ্বার উন্মুক্ত। “আমাকে যদি কেহ বুঝাতে পারে, তবে আমি তাকে আমার হালের পাঁচ বলদ্ দি”। “আরে, হালের পাঁচ বলদ্ দিবি, খাবি কি করে”? “হোঃ হোঃ, আমি যদি বুঝেও না বুঝি তবে আমায় বুঝায় কে”! ইহার উল্টোটাও ঠিক! আমি যদি না বুঝেও বুঝি, তবে আমার ভুল ধরে কে? এই যখন অবস্থা, তখন উভয় পক্ষের এক বৃদ্ধ বন্ধু আমাকে বলিলেন, যে বিপিনবাবুর প্রবন্ধ নিয়ে আপনি এত ব্যস্ত হয়েছেন কেন? উহার মধ্যে কিছু নাই। আমিও প্রায় তাই-ই ভেবে ফেলেছিলাম আর কি; এমন সময় একটা নূতন তত্ত্বের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বিপিন বাবু বলিতেছেন “শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনা করিবার কোনও অধিকার জন্মিয়াছে, এমন কল্পনা করি না,”

কিন্তু নিশ্বাস ফুরাইতে না ফুরাইতেই তিনি বলিতেছেন, বুঝুন আর না বুঝুন, কৃষ্ণকথা ভাল লাগে, তাই তিনি এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এখানে নূতন তত্ত্ব এই—যাহাতে আমার অধিকার নাই এবং যে অধিকারের কল্পনাও নাই, ভাল লাগিলেই তাহাতে আমার অধিকার জন্মে। কিন্তু বুঝি আর না বুঝি—তা মিষ্টি লাগায় হানি নাই। বুঝিয়া লিখিলেই বা হানি কি? কিন্তু না বুঝিয়াও সে তত্ত্ব সম্বন্ধে লেখা যায় এবং এই অনায়ত্ত তত্ত্বের গৌরব কাহিনী সকলের নিকট ঘোষণা করা যায়, ইহা সম্পূর্ণ নূতন আবিষ্কার। তিনি যে বুঝেন নাই, সে কথা বুঝিতে কাহারও বাকি নাই। তার পর বিপিনবাবু আমাদিগকে জানাইয়াছেন, যে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তিনি যে পূর্ব্বকার তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত ও ধর্ম্ম-সাধনকে ভ্রান্তি বোধে পরিহার করিয়াছেন, তাহা নহে। তবে সেগুলিকে একটু ছাড়াইয়া যাইতেছেন। তিনি ছাড়াইয়া যাইতেছেন, সে বিষয়ে আমাদিগেরও সন্দেহ নাই। কিন্তু তলের দিকে যাইতেছেন কি উপরের দিকে যাইতেছেন, আমাদিগকে সেইটাই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। আমরা এই তলের দিকে যাওয়ার কথাটা বলিয়াছিলাম বার বৎসর আগে। সেটাও বলিয়াছিলাম সন্দেহের ভাবে। এখন আবার তিনি উপরের দিকে দৃষ্টি করিতেছেন দেখিয়া আমাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিতেছে, তিনি তলের দিকেই গিয়াছিলেন। সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাধনকে তিনি নিতান্তই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়াছিলেন। এখন কিন্তু অন্য সুর! মানুষের মতের পরিবর্ত্তন আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। কিন্তু পরিবর্ত্তনটা সিদ্ধান্ত বিষয়ে না হইয়া উপাদান (data) বিষয়ে হইলে অন্ধতা ও পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দেয়। বিপিনবাবুর মতের সমালোচনার বিপদ এই, যে তিনি কোন্ মুহূর্ত্তে নিজের অজ্ঞাতসারে নিজেই নিজের সমালোচক দাঁড়াইবেন তাহার স্থিরতা নাই। স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্তের ধর্ম্ম-জীবনের বিকাশ বিষয়ে লিখিতে যাইয়া তিনি বলিতেছেন—"যদিও প্রথম যৌবনে অশ্বিনীকুমার বেদান্তাদি ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই, তথাপি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যদিগের উপদেশাদিতে অনেক পরিমাণে অজ্ঞাতসারে তিনি বেদান্তবিদ্যার অনুশীলন করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের সিদ্ধান্ত ও মতবাদ যদিও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীনে শঙ্কর-বেদান্তের সিদ্ধান্তকে বর্জ্জন করিয়াছিল, তথাপি কোনও কোনও দিক্ দিয়া দেখিলে তাহা উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যার উপরেই গড়িয়া

উঠিয়াছিল *। মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্ম উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানকেই আশ্রয় করিয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মধর্ম্মও উপনিষদ্‌কে বর্জ্জন করে নাই, কিন্তু তাহারই সঙ্গে খৃষ্টিয়ান্ একেশ্বরবাদকে মিলাইয়া লইয়াছিল। মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই নিজেদের ব্রহ্মতত্ত্বে এবং ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনে আমাদিগের প্রাচীন ব্রহ্মতত্ত্ব এবং পরমাত্মতত্ত্বকে মিলাইয়া লইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র শেষ জীবনে ইহার সঙ্গে ভগবদ্-তত্ত্বকেও মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইরূপে সেকালের ব্রাহ্মসমাজে সত্যই ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনের একটা চেষ্টা হইয়াছিল। আর ব্রাহ্মসমাজের এই ব্রহ্ম-জ্ঞানের উপরেই অশ্বিনীকুমারের ধর্ম্মজীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই ব্রহ্মজ্ঞানের উপরেই প্রথমে তাঁহার ভক্তিযোগের এবং এই ভক্তিযোগের উপরে ক্রমে তাহার কর্ম্মযোগের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এইরূপে অশ্বিনীকুমারের জীবনের কর্ম্মপথে জ্ঞান ও ভক্তিযোগের মিলন হইয়াছিল।" (বঙ্গবাণী—পৌষ, ১৩৩০)। সাধনে নিষ্ঠা থাকিলে ব্রাহ্মসমাজকে ছাড়াইতে হইবে না, কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজনির্দ্দিষ্ট পথেই সকলে এই যুগধর্ম্ম—জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের মিলন প্রাপ্ত হইবেন। যাহা হউক, ব্রাহ্মসমাজ ছাড়াইয়া যাওয়ার বিষয়ে বিপিনবাবু কেবলমাত্র নিজের বিশ্বাসের উপরই নির্ভর করেন নাই, সাক্ষীও মানিয়াছেন। সাধুবর স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ও নাকি ঐ রূপই মনে করিতেন। সাক্ষীকে জেরা না করিয়া তাহার সাক্ষ্য গৃহীত হয় না, সভ্য জগতের ইহাই নিয়ম। সাক্ষীকে জেরা করিলে যদি তাহার অসম্মান হয়, তবে সে জন্য জেরাকারী দায়ী নহে; যিনি সাক্ষী মানিয়াছেন, তিনিই দায়ী। আমার ঘরে আগুন দিতে আসিলে, লগুড়াঘাতে আমি তাহার মস্তক চূর্ণ করিব; আমার দেখিবার অবসর নাই, ব্রাহ্মণ কি চণ্ডাল। যদি ব্রহ্মহত্যা হয়, তবে যিনি পাঠাইয়াছেন তিনি দায়ী, আমি নই। গোস্বামী মহাশয়ের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব কাহারও থাকিতে পারে না। তাঁহার ভগবন্নিষ্ঠার কণিকামাত্র পাইলে আমি জীবনকে কৃতার্থ মনে করিব। কিন্তু তিনি যখন সাক্ষী দিতে হাজির, আমি জেরা না করিয়া পারিব না। ইহা আমার

* বিপিনবাবুর উপনিষদ্ বিষয়ক ভ্রান্তি তো কোন দিন গেলই না, তার সঙ্গে আবার বেদান্ত-বিদ্যার বিষয়ে ভ্রান্তি যুক্ত হইল। উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যা আর শঙ্কর-সিদ্ধান্ত কোনও দিনই এক জিনিষ নহে। ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বেই বেদান্ত-বিদ্যা শঙ্কর-সিদ্ধান্তের বাহিরে বহু পথে বিচরণ করিয়াছে। আমরা পরে দেখাইতেছি, যে রাজর্ষি রামমোহনই শঙ্কর-সিদ্ধান্তকে বর্জ্জন করিয়া আপনার বেদান্ত-শাস্ত্র গঠন করিয়াছিলেন।

কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ক্ষত্রিয়ের অনুরোধ উপরোধ নাই। গোস্বামী মহাশয় মর্ফিয়া সেবন করিতেন। তাহার এক এক ডোজ্ স্বাভাবিক অবস্থার তিন চারি জন মানুষের পক্ষে বিষ। শারীর-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, এরূপ অবস্থায়, মতামতের কোনও মূল্য নাই। * সুতরাং গোস্বামী মহাশয় যদি আপনার পরবর্ত্তী কালের সাধনাকে ব্রাহ্ম সাধনের বিরোধী বলিয়া মনে না করিয়া থাকেন, সেই জন্যই উহা ব্রাহ্ম সাধনের বিরোধী নয় বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। বিপিনবাবুও যে ঐ রূপ মনে করিতেছেন, তাহা কেবল তাঁহার পূর্ব্ব সংস্কারের প্রীতির বন্ধন। সে বন্ধন ছেদন করা শক্ত,—"Superstitions die hard"! সুতরাং বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় তাঁহার নিজের না হউক, তাঁহার ব্রাহ্ম জীবনের যে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ।

যোগবাশিষ্ঠে উক্ত হইয়াছে :—

অভ্রান্ত শাস্ত্র ও গুরু এবং ব্রাহ্মসমাজের শাস্ত্র-বাদ

"সানুভূতেঃ সুশাস্ত্রস্য গুরোশ্চৈবৈকবাক্যতা।
যস্যাভ্যাসেন তেনাত্মা সন্ততেনাবলোক্যতে॥"

সুশাস্ত্র, গুরুবাক্য এবং আপনার অনুভব এই তিনের ঐক্য করিয়া যিনি নিরন্তর ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস করেন, তিনি পরমাত্মার দর্শন লাভ করেন।

বুদ্ধির দোষে নিতান্ত জটিল করিয়া তুলিয়াছি এমনই একটী বিষয়ের আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইব। বিপিনবাবু শাস্ত্র, গুরু ও স্বানুভূতি সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বিচার উপস্থিত করিয়াছেন। আমাদের মতে এই তিন বস্তু স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে। যোগবাশিষ্ঠ তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন। ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্ যেমন তিনটী স্বতন্ত্র বস্তু নহেন, একই পূর্ণতত্ত্বের বিভিন্ন ধারণা (different aspects) ; শাস্ত্র গুরু ও স্বানুভূতি সম্বন্ধেও সেই কথা। শাস্ত্রকে ব্রহ্ম, গুরুকে আত্মা, এবং স্বানুভূতিকে ভগবান্ ভাবের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে

* "It is my rule never to ask any question of a morphinist which requires a serious answer, or at any rate never to give any weight to the answer." A *System of Medicine* Edited by Thomas Clifford Allbutt. "No reliance whatever can be placed upon their statement." *The Principles and Practice of Medicine* by William Osler, M. D. এই প্রসঙ্গে Encyclopedia Britannicaও দ্রষ্টব্য। আরও অনেক আছে, কিন্তু তাহা অনেকের নিকট অপ্রীতিকর বোধ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় উদ্ধার করা গেল না।

পারে। এক দিকে যেমন ভগবান্ ভাবের মধ্যে ব্রহ্ম ও পরমাত্মাকে গ্রহণ করিয়া ভগবান্‌কে পূর্ণতত্ত্ব মনে করা হইয়াছে, তেমনই শাস্ত্র ও গুরুকে আত্মানুভূতির মধ্যে দর্শন করিয়া আত্মানুভূতিকে পূর্ণ বস্তু বলিয়া গ্রহণ করা যায়। এই তিনের সম্বন্ধ একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিব। মনে করুন, জন্মমাত্র একজন মানুষকে জনসমাজ হইতে দূরে লইয়া রাখা হইল। কোন রকমে তাহার জীবন রক্ষার ব্যঁবস্থা হইল, কিন্তু সে জনসমাজের সঙ্গে মানসিক আদান প্রদানের সুযোগ পাইল না—তাহার আত্মানুভূতি কখনও গড়িবে কি? ইহার এক উত্তর, না। কেন না, শাস্ত্র ও গুরুর সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া আত্মানুভূতি গড়ে না। শাস্ত্র আর কিছুই নহে—জনসমাজের সঞ্চিত সমষ্টীভূত অভিজ্ঞতা। কতক গ্রন্থাবদ্ধ আকারে, কতক সমাজের আবেষ্টন ও আব্‌হাওয়া আকারে রহিয়াছে। আমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট যে শিক্ষা লাভ করি, তাহা স্বানুভূতির বিনিময়, সুতরাং ইহার মধ্যে কেহ বিশেষ অভিজ্ঞ হইলে তিনিই গুরু। আপনারা দেখিতেছেন, গুরু ও শাস্ত্রের মধ্যে যে পার্থক্যের রেখা তাহা অতি সূক্ষ্ম। আজ যাহাকে শাস্ত্র বলি, তাহা প্রাচীন কালের অভিজ্ঞ স্বানুভূতির স্থায়ীআকার। আজ যাহাকে গুরুবাক্য বলি, তাহাই ভবিষ্যতে শাস্ত্র বলিয়া গৃহীত হইবে। সুতরাং স্বানুভূতি ছাড়া গুরু ও শাস্ত্র কিছুই নয়—এ তিন একই বস্তুর অবস্থাত্রয়। প্রাচীনকালে গুরুর যে প্রাধান্য স্বীকৃত হইত, এখন আর সে প্রাধান্য নাই। তখন গুরু অপরিহার্য্য ছিল। শাস্ত্র তখন গ্রন্থাবদ্ধ ছিল না, পুরুষ পরম্পরায় চলিয়া আসিত—সেই জন্য উহা শ্রুতি, শুনিয়া লাভ করিতে হইত। এরূপ শুনা যায়, যে এমন ব্রাহ্মণ পরিবার দাক্ষিণাত্যে এখনও আছেন, যাঁহাদের কাছে সমগ্র বেদ এখনও শ্রুতিত্ব হারায় নাই—পুরুষ পরম্পরায় শুনিয়াই বেদ মুখস্থ করেন, কখনও গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করেন না। এরূপ স্থলে গুরুর প্রয়োজনীয়তা সহজেই বুঝা যায়। এবেলার্ড প্রভৃতি যখন য়ুরোপে প্রথম প্রথম টোল (University) খোলেন, তখন তাঁহাদের নিকটে যাইয়া না শুনিলে শিক্ষালাভ হইত না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের অবস্থা স্বতন্ত্র। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে—টোলের এই নাম এখন সার্থক—যে লেক্‌চার দেওয়া হয়, তাহা বিশ্ববার্ত্তাবহ তাড়িৎ মুহূর্ত্ত মধ্যে বিশ্বের চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়—তত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তা বা বক্তা কে, তাহার কোনই খবর না জানিয়াই আমরা তত্ত্বলাভের অধিকারী হই। কেয়ার্ড, মার্টিনো, মোক্ষমূলরের মৃত্যু-খবর

যখন পাইয়াছিলাম, একজন নিকট আত্মীয় চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া অনুভব করিয়াছিলাম—তাঁহাদিগকে কখনও দেখি নাই, তাঁহাদের মুখের বাক্য শুনি নাই—অথচ তাঁহারা গুরু ছিলেন। গুরু বলিব কি শাস্ত্র বলিব—তাঁহাদের জীবদ্দশাতেই তাঁহারা শাস্ত্র হইয়া গিয়াছিলেন, এখানে গুরু ও শাস্ত্রের পার্থক্য-রেখা বিলুপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রচারিত হওয়ায় সাধারণভাবে গুরুর অপরিহার্য্যতা অনেকাংশে দূরীভূত হইয়াছে—অথচ অন্যদিকে গুরু না হইলে আমাদের বাক্যস্ফূর্ত্তিই হইবে না, সে কথাও বলিয়াছি। আবার, গুরুর ভাব ভাষার সাহায্যে যতক্ষণ না আমার স্বানুভূতির আকার ধারণ করিতেছে, ততক্ষণ গুরু গুরুই নহেন। সুতরাং গুরুর প্রতিষ্ঠা আমার স্বানুভূতির মধ্যে। হইতে পারে, যে এই অনন্ত জীবন পথে পথ চলিবার পক্ষে স্বানুভূতির (Reason) আলোক অতীব ক্ষীণ ও অস্থির, কিন্তু তাহা ছাড়া আমাদের আর কি আছে? ইহাকে ছাড়িয়া দিলে, ইহা অপেক্ষা স্থিরতর ও উজ্জ্বলতর অন্য কোন আলোক আমাদের আছে কি? এই যে সামাজিক রীতি নীতি আচার পদ্ধতি অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, ইহারা কি মানবজাতির সমবেত স্বানুভূতিরই অতীতের ঘনীভূত মূর্ত্তি নহে? মানুষের পক্ষে স্বানুভূতির অধিকার অস্বীকার করা, আর পশুজীবনে ফিরিয়া যাওয়া একই কথা। স্বানুভূতির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিলে মানুষ আর কিছুরই উপর বিশ্বাস করিতে পারে না। স্বানুভূতি যদি বিপথে লইয়াছে বলিয়া মনে কর, তবে স্বানুভূতিরই উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ কর, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাবে কোথায়? পা দুখানি বিপথে লইয়াছে বলিয়া পা কাটিয়া ফেলিতে হইবে না, তাহা সুপরিচালিত করিতে হইবে। একদিন পা গর্ত্তে পড়িয়া গিয়াছিল বলিয়া কেহ ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকে না।

এখন শাস্ত্রের কথা। মানুষ উন্নতিশীল, মানব সমাজও উন্নতিশীল। তাহার সমষ্টীভূত অভিজ্ঞতাও যে উন্নতিশীল, তাহা বলাই বাহুল্য। এই উন্নতির (Progress) ধারণা যখন মনে মনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন হাজার দু'হাজার বা তিন হাজার বৎসরের প্রাচীন উপদেশাবলিকে চরম বলিয়া মানুষ গ্রহণ করিতে পারিয়াছে, আজ তাহা অসম্ভব। ব্যক্তি বা সমাজের উন্নতি বন্ধ হইলে যেমন তাহা মৃত বলিয়া গৃহীত হয়, শাস্ত্রের উন্নতি বন্ধ হইলেও তাহা মৃত বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে। মানব সমাজ যেমন দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, তাহার শাস্ত্রও দিন দিন

পরিপূর্ণতা লাভ করিবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। ইহা না বুঝিয়া যাঁহারা শাস্ত্রকে অভ্রান্ততা বা পূর্ণতার কারাগারে বদ্ধ করেন, তাঁহারাই শাস্ত্রের প্রাণ বিনাশ করেন। যাঁহারা কোনও তথাকথিত শাস্ত্রবিশেষকে চরম বলিয়া গ্রহণ করেন না, কিন্তু তাহার উন্নতির পথ খুলিয়া রাখেন, তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা শাস্ত্রবর্জ্জন নহে। উন্নতির পথে শাস্ত্র লইয়া অগ্রসর হওয়া। পুত্র যখন পিতার স্কন্ধে বসিয়া মাপে, যে সে বাবার চাইতে আধ্ হাত উচু, তাহা কেবল পিতার স্কন্ধে বসিয়াছে বলিয়া। আজ কেম্ব্রিজের সাধারণ গ্রাজুয়েট্ নিউটনের প্রিন্সিপিয়ার আবর্জ্জনা দূর করিতেছে বলিয়া নিউটনকে বর্জ্জন করিতেছে না, একটু অতিক্রম করিতেছে মাত্র। প্রিন্সিপিয়া না থাকিলে গ্রাজুয়েটের ঐ বিদ্যা যেমন কখনও আসিত না, তেমনি আবার গ্রাজুয়েটকে ঐ অধিকার না দিলে প্রিন্সিপিয়া একখানা মৃত কেতাব মাত্রে পরিণত হইয়া যাইত। শাস্ত্রকে জীবন্ত রাখিতে হইলে স্বানুভূতিকে সর্ব্বপ্রকারে শৃঙ্খলমুক্ত রাখিতে হইবে। শাস্ত্র অর্থই তাহার সংস্পর্শে আসিলে তাহা হইতে নূতন অনুপ্রাণন (inspiration) পাই। যতবার পাঠ করি, ততবারই নূতন তত্ত্ব, নূতন ভাব লাভ হয়। নতুবা এক-বার অধ্যয়ন করিয়া ফেলিয়া রাখিলেই চলে! তবে যাহারা মনে করেন, তোতা পাখীর মত শাস্ত্রের এক অধ্যায় আওড়াইলে অশ্বমেধের ফল হয়, তাহা-দের কথা স্বতন্ত্র। দুই সহস্র বৎসর হইল গীতা বা বাইবেল লোকে পাঠ করিতেছে, তবুও পাঠ শেষ হইল না; কেন না, যাহার স্বানুভূতি শৃঙ্খলমুক্ত, সে নিত্য নূতন ভাব শাস্ত্রের মধ্যে পায়। শাস্ত্রকে ব্যক্তিবিশেষের উক্তি বলিয়া গ্রহণ করিলে তাহাকে মূল্যহীন করা হয়! মানবাত্মার অভিব্যক্তিতে যুগে যুগে মানব সমষ্টি কর্ত্তৃক যাহা সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে, তাহাই গ্রন্থাবদ্ধ হইয়া শাস্ত্র আখ্যা পাইয়াছে। আমি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহাও আজ না কাল সেখানে স্থান পাইবে। বাইবেল যীশুর উক্তি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া যতদিন মনে করিতাম, ততদিন উহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখিতে পারি নাই। যখন হইতে বুঝিয়াছি, এগুলি পরীক্ষিত সত্য—একব্যক্তির নাম করিয়া সংগৃহীত হইয়াছে, তখনই উহাকে 'গীতা' প্রভৃতির স্থানে বসাইয়াছি। গীতাকে কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে কথিত ব্যক্তিবিশেষের মতামত বলিয়া বিশ্বাস করি নাই। এবং যে সময়ে গ্রন্থাবদ্ধ হইয়াছে সে সময়কার অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার উহার মধ্যে নাই, তাহাও কখনও মনে করি নাই। তবুও শ্রদ্ধা করি।

কেন না, উহার মধ্যে সহস্র সহস্র বৎসরের পরীক্ষিত সত্য আছে। হয় তো এক জন লিখেছেন, সকলের হ'য়ে। শাস্ত্রের অর্থই তাই। যাহা কিছুতে শাস্ত্রের এই শক্তি বিনষ্ট হয়, তাহাই শাস্ত্রের শাস্ত্রত্ব অপহরণ করে। যদি বল, শঙ্কর যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাই ঠিক, তবে ঐ খানে গীতার শেষ, শঙ্করের আরম্ভ—এখন শঙ্করের নানা অর্থ করিয়া তাঁহাকে জীবিত রাখিতে পার, গীতার মৃত্যু হইল। আবার গীতা যদি আমাকে অনুপ্রাণিত করিতে চান, তবে সেই প্রাচীন গীতার আক্ষরিক গণনায় তাহা হইবে না, এই দুই সহস্র বৎসরের উন্নতি বহন করিয়া গীতাকে আমার অনুভূতির মধ্যে জীবন্ত হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। সুতরাং এই নবানুভূতির সঙ্গে যদি তাহার কোন অংশের অমিল হয়, তবে তাহা পশ্চাতে ফেলিয়া আসিতে হইবে। আপনার উন্নতির পথে বসুন্ধরা কত ধনই না পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছেন! কেননা, এখন আর তাহার প্রয়োজন নাই। যা তা অর্থ করিয়া রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলে উহা ইতিহাস-বিরুদ্ধ হইবে, এবং মানবাত্মা ও মানবসমাজের উন্নতিশীলতা অস্বীকার করা হইবে। ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। স্বানু-ভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া শাস্ত্রকে অগ্রসর হইতে হইবে—সুতরাং স্বানুভূতি শাস্ত্রের এই অগ্রসর রূপই গ্রহণ করিতে পারে। কেন না, এই শাস্ত্রই তাহাকে গড়িয়াছে; তাহা ছাড়া আর কিছু করিলে তাহার পক্ষে অপঘাত হইবে এবং স্বানুভূতির অপঘাতে শাস্ত্র ও গুরু উভয়েরই বিনাশ! এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, অভ্রান্ত শাস্ত্র ও গুরুর অর্থ মৃত শাস্ত্র গুরু—এবং অভ্রান্ত-তার চাপে স্বানুভূতিও মৃত হইয়া যায়। আমরা মৃত্যু চাই না, জীবন্ত বস্তু চাই। তাই ব্রাহ্মসমাজ স্বানুভূতিকে অভ্রান্ত গুরু ও শাস্ত্রের চাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন—শাস্ত্র বা গুরু বর্জ্জন করেন নাই, প্রকৃত শাস্ত্র-গুরুবাদ প্রচার করিয়াছেন। জগৎ এত কাল মৃত শাস্ত্র ও গুরুর উপাসনা করিয়াছে। জীবন্ত শাস্ত্র ও গুরুর কথা এই আরম্ভ হইল। দেড় বা দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এক জন জগতের এক কোণে এক কেতাব রচনা করিয়াছেন; কিছুদিন পরে দশ জনে তাহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই আজ জগৎময় সর্ব্বত্র সকলের ঘাড়ে চাপাইতে যাইয়াই তো রক্তপাতে মানবের ইতিহাস কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। শাস্ত্রকে স্বানুভূতির উপর ছাড়িয়া দাও, শাস্ত্রেরও প্রাণ রক্ষা হইবে, ব্যক্তিও উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার পথ পাইবে, নতুবা বিপদ্ পদে পদে। ঈশ্বরাদিষ্ট পুরুষ (Man of God) শাস্ত্রানুসারে (Word of

God) জনমগুলীকে নিয়মিত করিবে, সে কুসংস্কারের দিন চলিয়া গিয়াছে। ঈশ্বর আজ স্বানুভূতির মধ্যে অবতীর্ণ। রাজর্ষি রামমোহন শাস্ত্র-ও-গুরুবাদী ছিলেন—কিন্তু প্রাচীন বিকৃত অর্থে নহে। আমরা যে অর্থের কথা বলিলাম, তাহা রামমোহন হইতে প্রাপ্ত। শাস্ত্র ও গুরু মানিয়াও তিনি বলিয়াছেন—পূর্ব্ববর্ত্তিগণের অনুসরণ করা পশুর ধর্ম্ম, মানুষের নহে। মানুষ কিছুই অবিচারে গ্রহণ করিতে পারে না, "যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।" এখান হইতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছে—শাস্ত্র গুরু মানিলেই যে তাহাদের চরণে স্বানুভূতিকে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, তাহা নহে—কিন্তু আত্মালোকে তাহাদিগকে বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। শাস্ত্রবাদী শাস্ত্র ও গুরুর জন্য অভ্রান্ততার দাবী করেন। কিন্তু স্বানুভূতি সে দাবী করেন না। সুতরাং স্বানুভূতির প্রতিষ্ঠায় ভ্রান্তাভ্রান্তের চীৎকার নিরস্ত হইয়াছে। গুরু বা শাস্ত্রের মধ্যে অন্যতরের প্রাধান্য স্বীকারে প্রকারান্তরে আর দুটির মৃত্যু ঘোষণা করা হয়—কিন্তু স্বানুভূতিকে গ্রহণ করিলে, সে আপদ্ নাই। এই ত্রিকের মধ্যে আর দুটিকে বর্জ্জন না করিয়া স্বানুভূতির প্রাধান্য ঘোষণা এই প্রথম। কিন্তু ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব। গুরু প্রণামেও আমরা এই তত্ত্বেরই আভাস :াই। যিনি আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছেন, অথবা যিনি আমাকে ব্রহ্মে: সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম করি। যিনি আমার এই উপকার করেন, তাঁহার সঙ্গে তো লৌহ যেমন চুম্বকের সঙ্গে যুক্ত হইয়া যায়, তেমনই যুক্ত হইব, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখানে আমরা জাগ্রত আত্মানুভূতিরই প্রাধান্য দেখিতেছি। দশ জনের সঙ্গে মিলি, কিন্তু যাঁহার কাছে আমি এই উপকার পাইলাম, তাঁহাকেই গুরু বলি। আমি এরূপ বলিতেছি না, যে পুত্রকন্যাগণকে উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে দিতে হইবে না, কিন্তু কে তাহাদের গুরু হইবেন, তাহা প্রথম হইতেই নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। সে ভার স্বানুভূতির হাতে। ইহাই রামমোহনের শাস্ত্র-গুরুবাদ, ইহাই ব্রাহ্মসমাজের শাস্ত্র-গুরুবাদ। ইহা নূতন, এই নূতন তত্ত্ব ব্রাহ্মসমাজই প্রচার করিয়াছেন।

এখন দেখা যাক্, বিপিনবাবু এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য কোথায়। তিনি বলেন, যে পথ ধরিয়া প্রথম যৌবনে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন—সেই পথেই শাস্ত্র ও গুরু পাইয়াছেন। শাস্ত্র ও গুরু ধরিয়া তিনি স্বানুভূতির প্রমাণমর্য্যাদা নষ্ট করেন নাই, বরং দৃঢ়

করিয়াছেন। কুলগুরু ছাড়িয়া সৎগুরু পাইয়াছেন, কুশাস্ত্র ছাড়িয়া সুশাস্ত্র পাইয়াছেন! ইহার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের পার্থক্য কোথায়? স্বানুভূতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া কু ছাড়িয়া সু ধরিবার জন্যই তো সকলেই ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন। তবে বিপিনবাবুর সঙ্গে আমাদের পার্থক্য কি? স্বানুভূতিকে প্রমাণমর্য্যাদাচ্যুত না করিয়া যে শাস্ত্র ও গুরু লাভ—এই মতটা যে তিনি ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী মত বলিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন, তিনি তাহা নিশ্চয়ই নিজের অজ্ঞাতসারে ভাবের উত্তেজনায় করিয়াছেন, কোনও অভিসন্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া করিতে চাহেন নাই! যে শাস্ত্র ও গুরু স্বানুভূতির প্রাধান্য অস্বীকার করে, ব্রাহ্মসমাজ তো কেবল তাহারই প্রতিবাদ করিয়াছেন। যাহা স্বানুভূতির প্রামাণ্যমর্য্যাদা দৃঢ় করে, এরূপ শাস্ত্র ও গুরুবাদ তো ব্রাহ্মসমাজেরই সিদ্ধান্ত। সুতরাং তিনি এতকাল "সোতের শেয়ালা"র মত ব্রাহ্মসমাজে ভাসিয়া আজ সেই ব্রাহ্মসমাজের মতই গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে কূল পাইলেন কেন, তাহা আমরা ভাল বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। শাস্ত্র ও গুরু গ্রহণ করিয়া যে স্থলে স্বাভিমতকে বর্জ্জন করিতে হয় না, ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে হয় না—যে শাস্ত্র ও গুরু ব্রহ্মলাভের পথে আত্মার সহায়, সে মতের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের কোন বিরোধ নাই, তাহা ব্রাহ্মসমাজই গ্রহণ ও প্রচার করিয়াছেন। অবশ্য তাহা সমাজের কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠান হয় নাই। বিপিনবাবু নিজেই বলিয়াছেন, যে গুরু-ও-শাস্ত্র-গ্রহণ স্বানুভূতির কাজ। যাহা স্বানুভূতির কাজ, তাহার ভার সমাজ লইলে, এ ক্ষেত্রে তাহা বাইবেল্ ও পোপে যাইয়া দাঁড়াইবে। সে বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ শেষ মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন। সমাজ স্বানুভূতির পথে বাধা না দেয়—সমাজের মত স্বানুভূতির বিরোধী না হইয়া উঠে, তাহাই দেখিতে হইবে। তাহা যে নয়, প্রমাণ তো প্রত্যক্ষই রহিয়াছে। বিপিনবাবু যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, সকলেই জানিত, তখনই তাঁহার শাস্ত্র ও গুরু লাভ হইয়াছে, কিন্তু তখনও কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় নাই। সুতরাং ব্রাহ্ম নন বলিয়া সে সময়ে তাঁহার মনেও যেমন কোন প্রশ্ন উঠে নাই, ব্রাহ্মসাধারণও কোন আপত্তি উত্থাপন করে নাই। কিন্তু আজ যেই তিনি অবতার মানিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তিনিও ভাবিতেছেন যে ব্রাহ্মসমাজ ছাড়াইলেন, অন্যেরাও ভাবিতেছেন, তিনি আর ব্রাহ্ম নহেন। এই ব্যাপারে কি ইহাই স্পষ্টাক্ষরে প্রমাণিত হইতেছে না, যে ব্রাহ্মসমাজ শাস্ত্র ও গুরু মানেন, কিন্তু অবতার

মানেন না। এই সহজ কথাটা আমাদিগকে বুঝাইতে হইল, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। কেহ হয় তো বলিতে পারেন, যে স্বানুভূতিদ্বারা পরিচালিত হইয়া অভ্রান্ত শাস্ত্র ও গুরু পাওয়া গিয়াছে। এ কথা অন্য কেহ বলিতে পারেন, বিপিনবাবু পারেন না। তিনি বলেন, যে স্বানুভূতিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তের মধ্যে সর্ব্বদাই অসত্য ও ভ্রান্তি মিশিয়া থাকিবার সম্ভাবনা (পৃঃ ৪৯৪)। এই সিদ্ধান্তের মধ্যেও যে ভ্রান্তি আছে, তাহা স্পষ্ট। ইহা স্বীকার করিলে, স্বানুভূতি নিত্য সত্য ধরিতে পারে না, ইহাই বুঝিতে হয়। কিন্তু বিপিনবাবু নিজেই বলিয়াছেন (পৃঃ ৫৬৪-৪৬৫), স্বানুভূতি আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ এবং স্বতঃসিদ্ধ অনেক সত্যের সাক্ষ্য দিতে পারে—যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁহার স্বরূপ। এখানে দেখা যাইতেছে, বিপিনবাবুর এমন কোন মত নাই, যাহা তিনি নিজেই খণ্ডন করেন না। যাহাই হউক, তাঁহার এই সিদ্ধান্তানুসারে স্বানুভূতিগ্রাহ্য শাস্ত্র ও গুরু অভ্রান্ত হইতে পারেন না। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গেও কোন বিরোধ রহিল না। তবে এ হাঙ্গামার উদ্দেশ্য কি? একটা কিছু হৈ চৈ না হইলে সৎগুরু-প্রদর্শিত পথে আমাদের সাধন ভজন চলেই না।

বিপিনবাবু এই ব্রাহ্মমতটাকে নিজের মত বলিয়া চালাইবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের যে সমালোচনা করিয়াছেন, এখন আমরা তাহার বিচার করিব। তিনি বলেন, "ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত ও ধর্ম্মসাধন একমাত্র স্বানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত" (পৃঃ ৪৯)। একমাত্র স্বানুভূতি বলিয়া কোন জিনিষই নাই, সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ তাহা পাইবেন কোথায়? কিন্তু কথাটা কি একেবারেই মিথ্যা নয়? এই ভারতে যদি কোন একটী মাত্র ধর্ম্মসম্প্রদায় হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়, বৈষ্ণব মুসলমান শাস্ত্র সকলের সার নিষ্কাষণ করিয়া জগৎকে বিলাইয়া থাকেন, এক একটা শাস্ত্র ধরিয়া সমাজের ব্যক্তিবিশেষ জীবন পাত করিয়া থাকেন, এবং তাঁহারা সমভাবে সেই সম্প্রদায়ের পূজা পাইয়া থাকেন, তবে তাহা কি ব্রাহ্মসমাজ নহেন? অথচ বিপিনবাবু প্রচার করিলেন, ব্রাহ্মগণ কেবল স্বানুভূতির উপর নির্ভর করে। তাঁহার মনে রাখা উচিত, সাধারণের কাছে তাঁহার কথার একটা মূল্য আছে। কেন না, তিনি বহুদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। লোকে ব্রাহ্মসমাজের গ্লানি শুনিবার জন্য উৎগ্রীব হইয়া রহিয়াছে—তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই তাহারা বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিবে—সত্যাসত্য

নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিবে না—চিলের পশ্চাতে ছুটিবে, কেহই কাণে হাত দিয়া দেখিবে না। দেশের এই দুর্দ্দশার কাহিনী শত শত দৃষ্টান্তদ্বারা বিবৃত করা যাইতে পারে। এরূপ স্থলে একটা অমূলক কথা বলিয়া নিন্দা করা নিতান্তই অবিচার নয় কি? তত্ত্ব বিচার করিতে যাইয়া ভাবের উত্তেজনায় বহিয়া যাওয়া যে বিপদ, তাহার পরিচয় আমরা এই আলোচনায় বিশেষ ভাবেই পাইতেছি—এত ভ্রান্তি, এত স্ববিরোধিতা ধীর ভাবে চিন্তা করিলে জন্মিতে পারে না। পরে আরও পাওয়া যাইবে। বিপিনবাবু বলেন, ব্রাহ্মসমাজ "জগতের যাবতীয় শাস্ত্র ও ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণকে সর্ব্বপ্রকারের প্রমাণ-মর্য্যাদাচ্যুত করিয়াছেন" (পৃঃ ৪৯৪)। ইহাকে সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। ব্রাহ্মগণ যত শাস্ত্র ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মানেন আর কেউ তত মানেন কি? হিন্দুর "মোক্ষপ্রতিপাদকং শাস্ত্রম্"—এই উচ্চ শাস্ত্রবাদ যাহা অভ্রান্তগ্রন্থাবদ্ধ-দৃষ্টি শাস্ত্রবাদীদিগের হস্তে বিনাশ পাইতেছিল, তাহাই কি ব্রাহ্মসমাজের "সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্" রূপে আবির্ভূত হয় নাই? ব্রাহ্মগণ ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগকে চিরদিনই অবনত মস্তকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ কাহারও হইতে পশ্চাৎপদ নহেন। তবে অন্যেরা যা কাজে মানেন না মুখে বলেন মানি, ব্রাহ্মসমাজের সে স্থলে মুখে কাজে এক কথা, এই মাত্র পার্থক্য। ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণের চরিত্রানুধ্যান তাঁহাদিগের ধর্ম্মসাধনের অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত—তাহা সমাজের দ্বারা প্রতিষ্ঠানরূপে গৃহীত—হইয়াছে। সুতরাং ইহা কেমন করিয়া অস্বীকার করা যায়, আমরা ভাবিয়া পাই না। বিপিনবাবু এতকাল ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া কি রূপে একথা বলিলেন? এক জন শ্রীক্ষেত্র থেকে রথ দেখে ফিরে এলে জিজ্ঞাসা করা হইল, জগন্নাথ দেখ্‌লে কেমন? তিনি উত্তর করিলেন, এত তো নজর করি নাই। সেই গুলির আড্ডার গল্পটাও খাটে। আস্‌তো, গুলিও খেতো তা সত্যি, কিন্তু আদৌ উহার মাথা ছিল কি না তা বল্‌তে পার্ব্বো না। সেখানে ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ সর্ব্বদাই শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছেন, আচার্য্যগণ উপাসনার অঙ্গরূপে শাস্ত্রপাঠ করিতেছেন - ইহা জানিয়াও কেহ যদি বলে যে ব্রাহ্মসমাজ শাস্ত্র বর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা হইলে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে রেখা টানিব কোথায়? স্বানুভূতির সঙ্গে মিলাইয়া, অথবা আচার্য্যের উপদেশে স্বানুভূতির সঙ্গে মিলাইয়া শাস্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই ব্রাহ্মসমাজের মত। ব্রাহ্মসমাজের কাছে শিখিয়া ইহাই বিপিনবাবুরও মত। এইরূপ শাস্ত্রগ্রহণের

কথাই তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—অথচ তিনি শাস্ত্রবাদী আর ব্রাহ্মসমাজ শাস্ত্রত্যাগী। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহাই চূড়ান্ত অবলম্বন বলিয়া ধরিতে পারি না, অথবা নূতন-লব্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যদি তাহার অমিল হয়, তবে প্রাচীন শাস্ত্রকে অতিক্রম করিতে হইবে, ইহা বলিলে শাস্ত্র বর্জ্জন করা হয় না, একটু ছাড়াইয়া উঠা হয় মাত্র। এই কথা নিজের বেলায় বিপিনবাবু অতি জোরের সঙ্গে আমাদের কাছে পুনঃ পুনঃ উপন্যস্ত করিয়াছেন। তিনি নিজের দরকারে বলিতেছেন, "স্বাভাবিক ক্রম-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কোনও পুরাতন অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া, আর অসত্য বলিয়া কোনও সাধন-সিদ্ধান্তকে বর্জ্জন করা, এক কথা নহে" (পৃঃ ४৯৫)।

এই প্রসঙ্গে বিপিনবাবু যত কথা বলিয়াছেন, তাহার সমালোচনা চলে না। কখনও বা বলিতেছেন, ব্রাহ্মেরা অধিকাংশের মতানুসারে সত্য নির্দ্ধারণ করেন; কোথায়ও বা বলিতেছেন, ৬০।৭০ বৎসরের স্মৃতিই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন। এই সব কথা এমন ভাবে বলিতেছেন, যাহাতে মনে হয়, এই সব কারণেই তিনি ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিতেছেন। এ সব কথার উত্তর দিতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। যেখানে শাস্ত্র গুরু ও স্বানুভূতির দ্বারা সত্য নির্ণয়ের কথা হইতেছে, সেখানে যদি বলা হয়, যে ব্রাহ্মেরা অধিকাংশের মতে সত্য নির্ণয় করে, তাহা হইলে কি ইহাই বলা হয় না, যে ব্রাহ্মগণ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল হাত তুলিয়াই নির্দ্ধারণ করে? এখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যিনি ভাবের ঢেউএর উপর বেড়ান, তাঁর কাছে প্রতিপক্ষের জন্য সুবিচার আশা করাই বাতুলতা। তিনি নিজেই এই সব আপত্তির অখণ্ডনীয় উত্তর অনেক সময়ে দিয়াছেন—সে কথার আর উল্লেখ করিব না। কার্য্যক্ষেত্রে অধিকাংশের মতানুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করা যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নির্ণয় নহে, ইহা বোধ হয় অতি বড় মূর্খও অস্বীকার করিতে পারিবে না। স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের নিয়মে কার্য্যনির্ব্বাহের ইহা অপেক্ষা উন্নততর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নাই। যদি সাধারণ অপেক্ষা গুণে জ্ঞানে কেহ বড় থাকেন, তিনি সাধারণের উপরে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেনই, নতুবা তাঁহার গুণ ও জ্ঞানের কোনই অর্থ নাই। কিন্তু গৃহে একরূপ আচরণ করিয়া বাহিরে যে তার উল্টাটা প্রতিষ্ঠিত হয় না, ইহা না বুঝিয়াই আমাদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা যে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেও

যাঁহারা বুঝিবেন না, তাঁহাদের সঙ্গে তর্ক বৃথা বিতণ্ডাই সার। এই অধিকাংশের মতের প্রণালীটাই কি আমরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দাবী করিতেছি না? ঘরে করিয়া না দেখাইলে বাহিরে পাইব কিরূপে? ভাবের তরঙ্গ ছাড়িয়া রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিপিনবাবু যেই সত্যের সম্মুখীন হইয়াছেন অমনি বলিতেছেন— Swarāj can never be attained by us until there has been more or less radical reconstruction of our social and domestic life. Society based on slave-mentality can not get a free mind in politics merely for asking (*The Englishman, 26. 10. 25.*). আশা করি, এখন এ কথাটা বেশ সম্ঝে দেখার মত মনের অবস্থা বিপিন-বাবুর হইয়াছে, যে গুরু শাস্ত্রাদি দ্বারা পরিচালিত হইবার জন্য মনের যে প্রবণতা তাহা হইতেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে Slave mentality গজায়। এ দুর্দ্দশা দূরীভূত না হইলে 'ডিমক্র্যাটিক' স্বরাজ নিতান্তই পাগলের কল্পনা। ব্রাহ্মসমাজের পথই উদ্ধার পাইবার একমাত্র পথ। এ কথাটা পরে পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিব (১৮শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। আবার, অধিকাংশের মতের এই প্রণালীটা যে কেবল স্বানুভূতি নহে, ইহাও যাঁরা বুঝিবেন না, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার শক্তি স্বয়ং বৃহস্পতিরও নাই। যাক্, তাঁহার মতে স্বানুভূতি কেবল সত্যের এক দিক্ দেখে। স্বানুভূতি বস্তুটির সম্যগ্ ধারণা না থাকাতেই যত গোল হইতেছে। বিপিনবাবুর অর্থে স্বানুভূতি বাস্তবিকই কিছু দেখে না, কিন্তু প্রকৃত অর্থে স্বানুভূতিই দেখে, দেখিবার আর কেহ নাই। তিনি বলিতেছেন—"শাস্ত্র যখন তত্ত্বদর্শী গুরুর উপদেশের দ্বারা সার্থক হইয়া স্বানুভূতির দ্বারা সমর্থিত হয়, তখনই তাহা প্রামাণ্য-মর্য্যাদা লাভ করে" (পৃঃ (৪৯৬)। এই কথা ক'টির মধ্যে যদি গুরুবক্ত্রগম্য কোনও নিগূঢ় অধ্যাত্ম তত্ত্ব না থাকে, তবে সহজ বাঙ্গালা ভাষায় ইহার অর্থ এই হয়,—তোমরা যাহাকে শাস্ত্র বল, বাস্তবিক তাহা শাস্ত্র নহে। আমি যদি তাহার অর্থ বুঝিতে না পারি, তবে কোনও অভিজ্ঞ শিক্ষক আমাকে তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিবেন। তার পর, আমি যখন গ্রন্থোক্ত মত সমর্থন করিব, তখন তাহা শাস্ত্রপদবাচ্য হইবে। আমার মনে শাস্ত্রের একটা আদর্শ আছে, যার সঙ্গে মিলিলে আমি শাস্ত্রকে শাস্ত্র বলি— যেমন, "সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্" অথবা "মোক্ষপ্রতিপাদকং শাস্ত্রম্ ("শাস্ত্রবাদ— প্রাচীন ও নবীন" দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৪৯-৫৩)। গুরু যে অর্থ করিলেন, তাহা যদি আমার কাছে সত্য বা মোক্ষপ্রতিপাদক বলিয়া মনে হয়, তবেই উহা শাস্ত্র।

অর্থাৎ আমার স্বানুভূতিই শাস্ত্রের কষ্টিপাথর। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে বিবাদ কোথায়? এক মাত্র ব্রাহ্মসমাজ ছাড়া শাস্ত্রকে এই ভাবে কেহই দেখে নাই। অথচ, এই মত মানিয়াই বিপিনবাবু শাস্ত্রবাদী, আর ব্রাহ্মসমাজ শাস্ত্র মানেন না। চিন্তা-শক্তির একটা বিশেষ বিপত্তি না ঘটিলে এমনটা হয় না। আপনাদের হয় তো আশঙ্কা হইতেছে, তিনি শাস্ত্র সম্বন্ধে এই খাঁটি মতটা ধরিয়াই কি শেষ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবেন? আপনাদিগের এই আশঙ্কা করিবার অধিকার আছে, এবং বিপিন-বাবুও আপনাদিগকে নিরাশ করিবেন না। সব সময়ে আমরা আমাদের নিজেদের কথার অর্থ বুঝি না। সুতরাং যা বলি, তাহাতে আমাদের মনের ভাব ব্যক্ত হয় না। সেই জন্য কেহ কেহ বলেন, যে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল মনের ভাব গোপন করিবার জন্য, প্রকাশের জন্য নহে। বিপিনবাবুর এক একটি কথা বেশ পরিষ্কার, যেমন উদ্ধৃত বচনটি। কিন্তু তিনি যখন ভাবের স্রোতে ভাসিয়া ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন, তখন "দিনের মতন জিনিষ হয় রাতের মতন অন্ধকার।" অনর্থক একটা দীর্ঘ বক্তৃতার পর তিনি সমাধান করিতেছেন, আমার স্বাভিমতের সত্যাসত্যের কষ্টিপাথর শাস্ত্র (পৃঃ ৪৯৭)। আমার স্বাভিমত অনুমোদন না করিলে যাহা প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে না, সেই শাস্ত্র আমার স্বাভিমতের সত্যাসত্যের বিচারক! একটা ছোটখাট ইতরেতরাশ্রয় দোষ (Fallacy of begging the question) হইল না কি? একটী হইল বটে, কিন্তু সব ক'টি শেষ হইল না। এক জায়গায় বলিতেছেন, শাস্ত্রের কষ্টিপাথর গুরু। কিন্তু গোটা পাঁচ সাত কথার পরেই শাস্ত্রই গুরুবাক্যের প্রমাণ হইয়া দাঁড়াইল। অর্থাৎ শাস্ত্রের কষ্টিপাথর গুরু এবং গুরুর কষ্টিপাথর শাস্ত্র! দুই পাথরে ঠোকা-ঠুকি হইয়া উভয়েই চুরমার। বিপিনবাবু ভুলিয়া গিয়াছেন, জগতে যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধটা ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহা সত্যিকার খাঁটি বস্তু, তাহা সোতের শেয়ালার মতন এক টানে কার্য্য হইতে কারণ, অন্য টানে কারণ হইতে কার্য্য গড়ে না। তিনি হয় ত বলিবেন, আমার স্ববিরোধ তা তোমাদের কি? আমার পাঁঠা যদি আমি ন্যাজে কাটি? তা বটেই তো। এখানে আমরা হার মানিতে বাধ্য। কাজেই আবার গুরু-শাস্ত্রেরই শরণাপন্ন হই, সেই কথাই বলি। স্বানুভূতির কষ্টিপাথর শাস্ত্র, শাস্ত্রের কষ্টিপাথর গুরু, কিন্তু গুরু দাঁড়াইবেন কোথায়? ইহাকেই শাস্ত্রে বলে অনবস্থা-দোষ (Fallacy of Endless Regress)। দাঁড়াইবার স্থান নাই, অনন্ত কাল পিছে হটিয়া যাইব কি? কিন্তু বিপিনবাবু আমাদিগকে বিপদে ফেলিয়া পলায়ন করেন নাই। তিনি সশরীরে

উপস্থিত থাকিয়া আশ্বাস্ দিয়া বলিতেছেন—আমি যাহার সাহায্যে কুলগুরু ছাড়িয়া সৎগুরু পাইয়াছি, এ বিপদে সেই স্বানুভূতিই এক মাত্র সহায়। অর্থাৎ ঐ নিদানের সম্বল স্বানুভূতিই আবার গুরুর কষ্টিপাথর। ঘুরে শোও ফিরে শোও পৈতানেতে পা! স্বানুভূতিকে একদেশদর্শী বলিয়া ছাড়িলে কি হইবে? কম্‌লি ছোড়্ তা নেহিন্। উহাকে যতই নির্য্যাতিত কর, যতই অপমান কর "তরোরপি সহিষ্ণুঃ" বিচলিত না হইয়া অটল পর্ব্বতের ন্যায় বসিয়া হাসিতেছে। সে জানে, যতই ছুটাছুটি কর, যতই লম্ফ ঝম্ফ কর, উহার কাছে আসিতেই হইবে, উহার প্রামাণ্য স্বীকার করিতেই হইবে! স্বানুভূতি ছাড়িয়া মানুষের দাঁড়াইবার স্থান নাই। যাক্, যা বলিতেছিলাম। পৃথিবীটা আছে কাহার উপর? কচ্ছপের উপর। কচ্ছপ কাহার উপর? সাপের উপর। অর্থাৎ সাপের ল্যাজ্ পৃথিবীর উপর, মাথায় কচ্ছপ। তেমনি, আত্মানুভূতি শাস্ত্রের ঘাড়ে, শাস্ত্র গুরুর ঘাড়ে, গুরুকে কাজেই বস্‌তে হয় আত্মানুভূতির ঘাড়ে, নতুবা তাহাকে ল্যাজ্ গুটাইতে হয়। গুরু বাঁচিলেন বটে, কিন্তু আমরা যে গোলোক-ধাঁদায় পড়িয়া গেলাম। সে তো ছিল ভালো। তবুও তো অগ্রসর হচ্ছিলাম, যদিও পেছনের দিকে। এ যে ঘূর্ণীপাক! না ঘর্‌কা, না ঘাট্‌কা! এটা একটা চক্রক হেত্বাভাস (Fallacy of arguing in a circle)। গুরু ও শাস্ত্রকে প্রামাণ্য-মর্য্যদা দিবার তর্কে যে তর্কশাস্ত্রই অপ্রমাণ হইয়া যায়! গ্রাম্য প্রবাদে বলে, দু'টো সাপ খেল্‌তে খেল্‌তে একটা আরটার ল্যাজ্ গিল্‌তে আরম্ভ করে, অতঃপর দুজন দুজনাকে গিলে খায়, আর কেউ থাকে না। বিপিনবাবু শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের আলোচনায় শাস্ত্র গুরু ও স্বানুভূতি লইয়া যে খেলা খেলেছেন—একবার এ ও'র ঘাড়ে, আর বার ও এর পুচ্ছ নাড়ে, ফলে তিন জনই কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথে! কিন্তু আমরা তো আর ছাড়তে পারি না। আমরা স্বানুভূতিকে আকৃড়াইয়া ধরিয়াছি। শাস্ত্র ও গুরু ধরিলে অভ্রান্ত ব'লে ধর্‌তে হয়, স্বানুভূতির সে বালাই নাই। ইহারা যখন একে তিন, তিনে এক, স্বানুভূতিকে ধর্‌লেই তিন জনকেই পাব; যেমন কাণ ধরিয়া টানিলে নাক ও চোখ আপনা হতেই আসে। ঠিক সেই পুরাতন গল্পের মত, ধর্ম্মকে আপ্রাণ চেষ্টায় ধরিয়া থাকিলে সকলেই থাকিয়া যায়। তবে ঠিক জায়গায় ধরা চাই। অভ্রান্ত শাস্ত্র গুরু ধরিলে কিন্তু স্বানুভূতির অপঘাত মৃত্যু ঘটে। এখন আসল কথাটা এই, যাহারা কোনও শাস্ত্র ও গুরুবদ্ধ সম্প্রদায়ে জন্মে, তাহাদের কোনও ল্যাঠা নাই। শাস্ত্রগুরু অভ্রান্ত, বিচার বিতর্কের স্থান কোথায়? বিপিনবাবুর

মনের টান্ অভ্রান্ত শাস্ত্রগুরুর দিকেই, অথচ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে তিনি বুঝিয়া গিয়াছেন, স্বানুভূতি একটা খাঁটি নিরেট বস্তু, ছাড়া চলে না। তাই দোটানায় পড়িয়া বাজীকরের মত একবার ডিগ্বাজী খাইয়া গড়াইতে গড়াইতে ক হইতে খ' এর মধ্য দিয়া গ'এ, আবার উল্‌টা ডিগ্বাজীতে গ হইতে ক'এ, কোথাও স্থির হইয়া থামিবার অবসর নাই। কাজেই তামাসগিরেরা অবাক্ হইয়া ভাবিতেছে, স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে কি সুন্দর গতি ও বৃদ্ধি! কি সুন্দর বিকাশ ও স্ফূর্ত্তি !! কি সুন্দর পূর্ব্বাবস্থাকে ছাড়াইয়া উঠা !!! তিনি নিজে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই একটু তলাইয়া দেখিলেই তো গোল মিটিত,—অর্থাৎ কেহই স্বতন্ত্র ও স্বপর্য্যাপ্ত নহে। একটা যেখানে আছে, তিনটাই সেখানে আছে। ইহাদের সম্বন্ধের কথাও তো এক এক বার ঠিকই বলিয়াছেন, যে শাস্ত্র ও গুরু উভয়েই স্বানুভূতি-প্রতিষ্ঠ। সোতের শেয়ালার মত না ভাসিয়া এই কথাগুলি ধরিয়া ডুবিলেই তো দেখা যাইবে, যে উহা ব্রাহ্ম-সমাজেরই কথা এবং রাজর্ষি রামমোহনের সময় হইতেই চলিয়া আসিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিপিনবাবুর সমালোচনার একটা মস্ত বিপদ আছে। তিনি কখন রুখিয়া দাঁড়াইয়া আমাদের সকল শ্রম ব্যর্থ করিয়া দিবেন, তাহার স্থিরতা নাই। ঘটিয়াছেও তাহাই। নিম্নোদ্ধৃত অংশটি পাঠ করিলে বুঝা যায়, যে দশ কি বারো বৎসর পূর্ব্বে ঐ কথাগুলি বলিলে বহু লোক ভ্রান্ত পথে যাইত না। যাহারা তাঁহার দ্বারা নীয়মান হইয়া ভ্রান্ত পথে গিয়াছে, তাহাদের জন্য আমাদের সমালোচনার সার্থকতা থাকিবেই। বিপিনবাবু বলিতেছেন,—"আধুনিক যুক্তিবাদ গুরুকরণকে কুসংস্কার বলিয়া বর্জ্জন করিতে চাহিয়াছে। ইহাতে যুক্তিবাদের কোনওই দোষ নাই। কারণ, সচরাচর যে ভাবে এ দেশের লোকেরা গুরু করিয়া থাকেন তাহাতে ভক্তিসাধনে গুরুর সত্য স্থান যে কি, ইহার কোনওই সন্ধান পাওয়া যায় না। অনেক সময় এই গুরু-করণ এবং গুরু-শক্তি একটা অতি-প্রাকৃতিক ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার এবং বস্তু বলিয়াই মনে হয়। এই গুরু-করণের যে কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে, ইহা ধরা অসম্ভব হয়। এই গুরু-করণের দার্শনিক তত্ত্বটাও বুঝা যায় না। এই জন্য যাঁহারা এ সকল বিষয়ে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে এই গুরুবাদের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করা কঠিন হইয়া উঠে।" যাহার যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করা কঠিন, যার দার্শনিক তত্ত্বটাও বুঝা যায় না এবং উহার বৈজ্ঞানিক

ভিত্তি আছে কি না তাহা ধরাও অসম্ভব, এমন একটা অতি-প্রাকৃত ঐন্দ্রজালিক বস্তু অস্বীকার করার বিচারবুদ্ধি থাকার জন্য বিপিনবাবুর হাতে ব্রাহ্মসমাজকে কতই না গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছে। শাস্ত্র মানুষকে বলে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব—Rational animal. সুতরাং বিচারবুদ্ধি ফিরাইয়া পাওয়া একটা আনন্দের বিষয়, সন্দেহ নাই। আমরা বলিয়াছি, গুরু বা শাস্ত্র এবং স্বানুভূতির সামঞ্জস্যে সত্য লাভ হয়। বিপিনবাবু আজ আমাদের কথাই প্রমাণ করিতেছেন—"কেবল ভাণ্ডের দ্বারা জ্ঞান লাভ হয় না, কেবল ব্রহ্মাণ্ডের দ্বারাও হয় না। ভাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড উভয়ের যোগেতেই জ্ঞান সম্ভব হয়। আত্মপ্রত্যয় (যা নাই ভাণ্ডে তা নাই ব্রহ্মাণ্ডে) এবং বস্তু-সাক্ষাৎকার (যাহা দেখি না ব্রহ্মাণ্ডে তাহা জাগে না ভাণ্ডে) উভয়ই জ্ঞানলাভের জন্য সমান প্রয়োজন।" বিপিনবাবু এখন বেশ বুঝিতেছেন, যে ব্রাহ্মসমাজ কাহাকেও প্রমাণ-মর্য্যাদাচ্যুত করেন নাই। তিনিই স্বানুভূতিকে উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। সেই ভ্রান্তি ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়া সকল বিবাদ মিটিয়া যাইতেছে। বিপিনবাবু যে ভ্রান্ত পথে গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার এখনকার প্রত্যেক কথায় ও কাজে প্রমাণিত হইতেছে। রাজনীতি-ক্ষেত্রের 'কর্ত্তাভজা'দের দ্বারা উত্যক্ত হইয়া তাঁহার হুঁস্ হইয়াছে, তাই তিনি ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের খুঁটির জোর না পাইলে কি তিনি এত তেজের সঙ্গে বলিতে পারিতেন: **I have been brought up in a school that admits of no transfer of one's reason or conscience to any body, however eminent, or even saintly he may be (*The Englishman*, 12. 6. 25)**। ইহাই তাঁহার প্রথম যৌবনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ সত্যের কথা। মাঝখানে দৈব দুর্ব্বিপাকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন বৃদ্ধ বয়সে প্রাচীন কথা স্মরণ (*Reminiscences*) করিতে যাইয়া মনে পড়িয়া গিয়াছে।

নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা

নিরাকারের উপাসনা নিরসন করিতে না পারিলে অবতার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন থাকে না। তাই এইবার গোড়ার কথা আসিতেছে। তিনি বলিতেছেন, ব্রাহ্মসমাজে যে উপাসনা প্রচলিত, তাহা ব্রহ্মোপাসনা নহে। এ উপাসনা নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। সাকারোপাসনার প্রতিবাদে বাহ্য-মূর্ত্তি-নিরপেক্ষ উপাসনা মাত্র। নিরাকার-তত্ত্ব বাক্য-মনের অতীত, বাক্য মনের

গোচরীভূত করিতে গেলেই তাহা নিরাকারত্ব হারায়। সুতরাং ব্রাহ্ম-সমাজের বাঙ্ময়ী উপাসনা নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা নহে। রাজা রামমোহন রায় বাক্যের অর্থ চিন্তনের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাজর্ষি নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারেন নাই, বিপিনবাবু তাহা আমাদিগকে বুঝাইবার ভয় দেখাইতেছেন, ইহাতে আমরা তাঁহার সাধুবাদ না করিয়া কিছুতেই নিরস্ত হইতে পারি না! কিন্তু নিজে তিনি এই নিরাকার-তত্ত্ব কিরূপ বুঝিয়াছেন, তাহার পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই আমরা পাইয়াছি, পরে আরও পাইব। তবে, যে তত্ত্ব বাক্যমনের অতীত, তার সম্বন্ধে যে 'হা' 'না' চলে না, তাহার সম্বন্ধে যে বাঙ্ময়ী আলোচনারও অবসর নাই, এই অতি স্থূল কথাটারও যে মর্ম্মগ্রহণ বিপিনবাবুর কাছে আশা করা যায় না, তাহা ইতিমধ্যেই আমাদের হৃদ্গত হইয়াছে। কিন্তু যেখানে বক্তৃতা কণ্ডূয়নের চরিতার্থতাই লক্ষ্য, সেখানে ভদ্রাভদ্রের বিচার কে করে? সুবিধা হয় বলিয়া ব্রহ্মোপাসনার নিন্দার সময় তিনি বাক্যকে যে ভাবে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন (পৃঃ ৫৯০) তাহা, Logos-তত্ত্বের আলোচনায় তিনি নিজে জোরের সঙ্গে যে সিদ্ধান্তের ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার যে সম্পূর্ণ বিরোধী (পৃঃ ৫৭০) এই কথা তিনি বিবেচনা করিবেন, এ আশা আমাদের মনে ক্ষণিকের জন্যও উদয় হয় নাই, সুতরাং নিরাশও হইলাম না। অন্যদিকে যে আবার তাঁহার লগস্-তত্ত্বও আমরা গ্রহণ করিতে পারি, তাহাও নহে। বস্তুনিরপেক্ষ কল্পনা (abstraction) তাঁহার আলোচনায় যথেষ্ট রহিয়াছে। লগস্ কি, তাহা বুঝান নাই। কিন্তু তিনি ভয় দেখাইতেছেন, যে এই লগসই যিশুখৃষ্ট, এবং এই তত্ত্বের সঙ্গে যে বৈষ্ণবীয় রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের সাদৃশ্য আছে, তাহা তিনি পরে বলিবেন। সুতরাং এ তত্ত্ব আমাদিগকে একটু বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। বিপিন বাবুই রাস্তা একটু ধরাইয়া দিয়াছেন, তবে নিজে বুঝিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

ভাষা ও ভাব

"পরমতত্ত্ব লগসের (Logos) ভিতর দিয়াই আত্ম প্রকাশ করেন" (পৃঃ ৫৭০)। অর্থাৎ ব্রহ্মের যে ভাব জগৎরূপে প্রকাশিত, তাহাই লগস্। এই জগৎ ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয়রূপে চিরদিনই তাঁহার সঙ্গে যুক্ত। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, যে যাঁহার প্রসাদে অতীত ও অনাগত বিষয়ের জ্ঞান যোগীদের হয়, তাঁহার যে এই জ্ঞান নিত্যকাল আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। এই জ্ঞান কি? না, "নামরূপে অব্যাকৃতে ব্যাচি-

কীর্ত্তিতে", যাহা ব্যক্ত হয় নাই, ব্যক্ত হইতে উন্মুখ তাহাই নাম-রূপ। ইহাই লগস্। যে তত্ত্ব বড় বড় গ্রন্থে স্পষ্ট হয় নাই, তাহা এক কথায় স্পষ্ট হইবে না, তাহা জানি। কিন্তু যে লগস্ জগৎরূপে অবতীর্ণ, তিনি আবার সেই জগতে যিশুরূপে আলাদা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং যার সঙ্গে রাধাতত্ত্বের সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইবে, সে তত্ত্বটা কি নিজেই একটা নিতান্ত abstraction নহে ? এবং সকল abstractionএর মতন ইহাও মিথ্যার মিথ্যা, কেননা, উহা অর্দ্ধসত্য। এ কথা 'অবতার-তত্ত্বে' ব্যাখ্যাত হইবে। এই লগস্‌কে Word বা শব্দ-ব্রহ্ম বলা হয়। ইহা হইতেই ধর্ম্মজগতে এক মহা ভ্রান্তির উৎপত্তি হইয়াছে। "Revealed Religion" এ "Verbal Inspiration"এর মত আছে, আপনারা সকলেই জানেন। ঐ মত ভ্রান্ত। শব্দের সঙ্গে অর্থের নিত্য সম্বন্ধ স্বীকার করিলে লগসের অবতারের ভ্রান্তিও বেশ বুঝা যায়। শুধু Wordএর অবতার বলিলে abstraction হইয়া পড়ে না কি ? অন্যদিকে, নামরূপের অবতার তো এই জগৎ রহিয়াছেই, আর অবতার কি ? অর্থের সঙ্গে শব্দের এই নিত্য সম্বন্ধ দেখিয়া তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, ভাব যিনি দিয়াছেন, ভাষাও তিনিই দিয়াছেন। সুতরাং বেদ বাইবেল কোরাণের ভাবের সঙ্গে তাঁহারা তত্তৎ ভাষাকেও অপরিহার্য্য বলিয়া ধরিয়াছিলেন। শেষে দাঁড়াইয়াছে, ভাব গ্রহণ করি আর না করি, ভাষা আওড়াইলেই হইল। মুসলমান যে দেশেরই হউন, নমাজ তাঁহার আরবি ভাষায়। Bibleএর ভাষান্তর লইয়া য়ুরোপে কি তুমুল কাণ্ডই না হইয়াছিল! বুদ্ধদেব প্রাকৃত ভাষার আশ্রয় লইয়া একঘরে হইয়াছিলেন, এবং বর্ত্তমান কালে রামমোহন বাঙ্গালা ভাষায় বেদান্ত প্রচার করিয়া জলপ্লাবন ও মহামারির হাতে নাকি দেশকে সঁপিয়া দিয়াছিলেন! এতো গেল বিকৃতি। বাস্তবিকই ভাষার সঙ্গে ভাবের, বাক্যের সঙ্গে অর্থের একটা নিত্য সম্বন্ধ আছে। বাক্য উচ্চারণ করি আর না করি, চিন্তার সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে বাক্য আছেই—ইহারা অচ্ছেদ্য যোগে আবদ্ধ। শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, বাক্য উচ্চারণ করিয়াই চিন্তা কর, আর উচ্চারণ বন্ধ করিয়াই চিন্তা কর, মস্তিষ্কে একই প্রকারের কার্য্য হইবে। চিন্তা বাঙ্ময়ী, বাক্য ছাড়া অর্থের ধারণা হয় না, ভাব গ্রহণ হয় না। কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন, দর্শন শ্রবণেও ভাষার প্রয়োজনীয়তা আছে। বোবা কালারা যে সভ্য সমাজে থাকিয়াও মনের বিকাশ লাভ করিতে পারে না, ইহাই তাহার কারণ। যে কোন রকমেরই হউক, ভাষার ভিতর দিয়াই হৃদয়ের ভাব পরিপুষ্ট হয়। প্রথম

প্রথম বাক্য উচ্চারণ করিয়াই আমরা চিন্তা করিতে শিখি—অনুচ্চারিত বাক্যের সঙ্গে ইহার মূলগত কোনই পার্থক্য নাই। ভ্রমণকারিগণ বলেন, যে অসভ্যেরা চিন্তা করিতে হইলে নির্জ্জনে যায়। জঙ্গলের ভিতর দিয়া চলিতেছ, কথোপকথনের শব্দ শুনিতে পাইলে—নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখ একজন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন—বাক্য উচ্চারণ না করিয়া চিন্তা করিতে পারে না। ক্রমে অভ্যাসের দ্বারা উচ্চারণ পরিহার করা যায়। কিন্তু বাক্য কখনও জাগ্রৎ কিম্বা স্বপ্নাবস্থায় মানুষকে পরিত্যাগ করে না। সুতরাং ব্রহ্মধারণা কথাটার মধ্যে যদি অর্থ থাকে, ভাব থাকে, সেটা যদি নিরর্থক কথা না হয়, তবে তাহা বাঙ্ময়ী না হইয়াই পারে না, এবং বাঙ্ময়ী ব্রহ্মোপাসনা ব্রহ্মোপসনার কক্ষাবিচ্যুতও হয় না। বিপিনবাবু বাক্যের অতীত যে ব্রহ্মতত্ত্বের কথা বলিয়াছেন, তাহা কাজেই abstraction হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং নিজেই আবার সে কথা প্রত্যাহার করিতেছেন। তিনি বলেন, "আমাদের ভাব ও চিন্তা ভাষার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়" (পৃঃ ৫০০)। বিপিনবাবু যাহাকে প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা বলেন, তাহা কি ভাব ও চিন্তা বিহীন? তাঁহার মতেই পরমতত্ত্ব ও লগস্ "বাগর্থাবিব" অনন্ত কাল যুক্ত। তাহা হইলে কথাটা দাঁড়াইতেছে এই—যে তত্ত্বের হস্ত হইতে পরমেশ্বরেরও কোন কালে নিস্তার নাই, মানুষ তাঁহার উপাসনা করিতে যাইয়া সেই তত্ত্বেরই অতীত হইবে, নতুবা প্রকৃত উপাসনা হইবে না। ব্রহ্মোপাসনার নিন্দা করিতে যাইয়া বিপিন-বাবু এই যে অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দ্বিতীয় ব্যক্তি যে ইহা গ্রহণ করিতে পারে, সে বিশ্বাস আমাদের নাই। তিনি নিজেই গ্রহণ করিবেন কি? নিজের সিদ্ধান্তের মর্ম্ম নিজেই অবগত আছেন কি না, সে বিষয়েও আমাদের সন্দেহ আছে।

শূন্য সত্তা ও পূর্ণ ব্রহ্ম

বিপিনবাবু বলিয়াছেন, পঞ্চকোষ ভেদ না হইলে ব্রহ্মোপাসনা হয় না। যে ব্রহ্মকে জগৎ হইতে ভিন্ন বলিয়া ভাবা অন্যায়, তাঁহার উপাসনায় কেন পঞ্চকোষভেদের প্রয়োজন হইবে, তাহা বিপিনবাবু ছাড়া আর কেহ নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে কি? এই পঞ্চকোষ-ভেদ কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা তিনিই জানেন। তবে তিনি ইন্দ্রিয়-চেষ্টা নিরোধ করিতে বলিয়াছেন। তাহাতেই বুঝা যায়, যে এ ভেদও একটা abstraction মাত্র। কোষগুলি মানবাত্মার বস্তুধারণার সোপান (categories) মাত্র। উপরের অবস্থায় উঠিলে

যে নীচের অবস্থা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে। যিনি আনন্দময়ের ধারণা করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এক অখণ্ড অদ্বৈত সূত্রে আবদ্ধ দেখিতে পান, তাঁহার যে ইন্দ্রিয়কার্য্য স্থগিত হইবে, তাহা কে বলিল! সে তো সুষুপ্তির অবস্থা। মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন যে Sensation, perception, imagination, ideation, ratiocination প্রভৃতি পর পর উপরের অবস্থা—তাই বলিয়া উচ্চাবস্থা লাভ করিলে নিম্নাবস্থার 'ভেদ' হয় না। অসভ্যদের মধ্যে সাধারণতঃ ideation এর অভাব, সভ্যদের মধ্যেও তো ratiocinationএর অভাব প্রত্যক্ষ দেখা যায়। অন্যদিকে আবার যাহাদিগের মধ্যে এগুলির সদ্ভাব, তাহাদিগের sensation, perception এবং imaginationএর ভেদ হইয়াছে, এমন বলা যায় না! ঋষিও তাহা বলেন নাই। যে ঋষি আনন্দময় কোষের বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি এই বর্ণনার আগে নয়, পরে, বিশেষভাবে অন্নের স্তুতি করিয়াছেন। তাহাতেই বুঝা যায়, পঞ্চকোষ ভেদ হইলে ইন্দ্রিয়চেষ্টার বিরাম হইবে না। সুতরাং ব্রহ্মোপাসনার জন্য পঞ্চকোষ ভেদ হওয়া চাই—ইত্যাদি তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা অর্থহীন বাগাড়ম্বর মাত্র। আর প্রকৃত অর্থে পঞ্চকোষ-ভেদ একটা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার কি? অন্নের জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকিয়াও যদি প্রাচীন কালে আনন্দময়ের ধারণা সম্ভব হইয়া থাকে, তবে বর্ত্তমান কালের ব্রহ্মোপাসকের হইবে না, একথা বলিবার কি যুক্তি আছে? একটা কথা বিপিনবাবু খুব গুরুতরই বলিয়াছেন—সমাধির অবস্থা লাভ না করিলে স্বরূপের উপলব্ধি হয় না। এই সমাধি কথাটার অর্থ কি? আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, ব্রহ্মোপাসনায় যদি অর্থ গ্রহণ থাকে—ভাবের স্থান থাকে—তবে সকল ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ হইলেও চিন্তার সঙ্গে অচ্ছেদ্য যোগে আবদ্ধ বাক্‌যন্ত্র খোলাই থাকিবে। জাগ্রৎ বা স্বপ্নাবস্থাতে ইহার অতীত হওয়া যায় না। তবে সমাধি কি সুষুপ্তির অবস্থা—যেখানে চিন্তা নাই, ভাব নাই, অর্থ গ্রহণ নাই? তাহা হইলে ইহা লইয়া এত তর্ক বিতর্কের কিছু প্রয়োজন দেখি না। দু'পয়সার অহিফেণে যে কার্য্য সাধিত হয়, যে অবস্থা লাভ হয়, তাহা লইয়াই কি জগৎ যুগ যুগান্ত ধরিয়া এত ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে?

বিপিনবাবু যদি বলেন, এই বাক্যভাবহীন রাজ্যে না পৌঁছিলে ঐ সত্তামাত্র-জ্ঞেয় নিরাকার ব্রহ্মকে ধরা যায় না, তাহা হইলে আমরা বলিতে বাধ্য, যে পূর্ণপুরুষের উপাসনায় অভ্যস্ত ব্রাহ্মসমাজ এই শূন্য সত্তার

জন্য কোনই আকর্ষণ অনুভব করিতেছেন না। ইতিহাস প্রমাণ করে, যে এই সত্তা বেশী দিন আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে না। ব্রহ্মকে যেমন কাটিয়া ছাটিয়া সত্তামাত্রে পর্য্যবসিত করিতে হইবে, আত্মাকেও ঘসিয়া মাজিয়া সুষুপ্তিতে লইয়া যাইতে হইবে—তার পর উভয়েরই কৃষ্ণপ্রাপ্তি, যেমন বৌদ্ধশূন্য-বাদে। প্রমাণ আরও আছে। "পঞ্চদশী" প্রভৃতির সিদ্ধান্ত যে প্রায় শূন্যবাদে যাইয়া উপনীত হইয়াছিল, তাহার জন্য শঙ্করের শিষ্যগণই সম্পূর্ণ দায়ী নহেন। আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিলে দেখা যায়, কিছুদূর যাইয়া আলেয়া শূন্যে মিলাইয়া যায়, মানুষ গর্ত্তে পড়িয়া প্রাণ হারায়। যদি ব্রহ্মের সত্তামাত্র-জ্ঞেয় একটা অবস্থা আছে বলিয়া স্বীকার কর এবং জীবের কাছে প্রলোভন উপস্থিত কর, যে সুষুপ্তির অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া এই ব্রহ্মে অবস্থিতিই তাহার জীবনের পরম চরিতার্থতা, তাহা হইলে পতঙ্গ যেমন অনলের দিকে ছুটিয়া যায়, সেও তেমনই আগ্রহের সঙ্গে ছুটিয়া যাইবে। কিন্তু পরিণামে এই abstract thinkingএর সাহারা মরুভূমিতে উভয়েরই পঞ্চত্ব প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী, ইহা ইতিহাসের সাক্ষ্য। এ দেশের জল বায়ুতে কি আছে, ইতিহাসের সঙ্গে তাহার মিল হইল না। জাতীয় জীবনে অন্ততঃ দুইবার অতি বৃহদাকারে প্রমাণ হইয়াছে, ইহা বিনাশের পথ। তবুও ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই পথের পথিক।

ব্রাহ্মসমাজ পূর্ণ পুরুষের উপাসক

বিপিনবাবু আজ কাল ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনাকে আর তাচ্ছিল্য করিতে চাহিতেছেন না। অবাঙ্‌মনসোগোচর নিরাকার নির্ব্বিশেষ তত্ত্বও যে ব্রহ্মতত্ত্ব, ব্রহ্মসাধনে যে এই 'ব্যতিরেকী' তত্ত্বেরও স্থান আছে তাহা তিনি এখন ধরিতে পারিয়াছেন। তবে "এই নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানের উপরে ভক্তি গড়িয়া উঠিতে পারে না।" এ কথাটাও যে ব্রাহ্মসমাজেরই কথা, একটু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া কথাটা বলিলেই তিনিও উহাই বলিবেন। তিনি যাহাকে বলিয়াছেন ব্যতিরেকী প্রণালীর ব্রহ্মজ্ঞান, রাজর্ষি রামমোহন তাহাকেই বলিয়াছেন আত্মসাক্ষাৎকার, ইহা ধ্যানগম্য। তার পরে "সমাধিবিষয়-ক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ব্রহ্মময় ব্রহ্ম এই রূপে সাধনীয় হয়েন।" বিপিনবাবুর রূপরসগন্ধময় ভাবাঙ্গসাধনের পথ রামমোহন-মার্গে খোলাই রহিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজকে ছাড়াইতে হইবে না। ব্রাহ্মসমাজ কোন দিনই সত্তা-মাত্র-জ্ঞেয় কোন বস্তুর উপাসনার কথা বলেন নাই। বিপিনবাবু

স্বকৃত ছায়াচিত্রের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছেন মাত্র। যাহা হউক, এ সকল কথা ব্রহ্মসাধন ও ব্রহ্মোপাসনা প্রভৃতি প্রস্তাবে বিশদভাবে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। বিশেষভাবে ১১শ ও ১৪শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণব বেদান্তের টীকা ও ভাষ্য

এখন অন্য একটী বিষয়ের দিকে মনোনিবেশ করা যাক্। বিপিনবাবু আমাদের কাছে দুইটী মাত্র পথ খুলিয়া দিয়াছেন—শাঙ্কর বেদান্ত আর বৈষ্ণব বেদান্ত, তৃতীয় পথ নাই। শাঙ্কর বেদান্ত বলিতে তিনি যাহা বুঝিয়াছেন তাহা তো abstraction দোষে দূষিত। তাঁহার বৈষ্ণব বেদান্ত আমরা গ্রহণ করিতে পারি কি না, এখন ইহাই বিচার্য্য। যাহা দ্বারা অবতার, পৌত্তলিকতা, ব্যভিচার প্রভৃতি সমর্থিত হয় তাহা আমরা কিরূপে গ্রহণ করিব ? দর্শনের দিক্ তো অনির্ব্বচনীয় ! বিপিনবাবুকে একটা খবর দিতে পারি। জীব-ব্রহ্মের ভেদাভেদ যত অনির্ব্বচনীয় প্রাচীন কালে মনে হইত, তত অনির্ব্বচনীয় মনে করিবার আজ আর কোন কারণ নাই। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, জগৎ উন্নতিশীল। ব্রহ্মতত্ত্ব আজ আর নিতান্ত অনির্ব্বচনীয় নহে। অন্ততঃ, তাঁহার বৈষ্ণব বেদান্ত ছাড়াইয়া জগৎ অনেকটা এগিয়ে এসেছে। জগৎ আবার সে অন্ধকার গৃহে ফিরিয়া যাইবে না। সুতরাং ব্রাহ্ম বেদান্ত শঙ্কর বেদান্তও নয়, বৈষ্ণব বেদান্তও নয়,—উহা ব্রাহ্ম বেদান্তই থাকিবে—অন্য কিছু হইবে না। স্বানুভূতিকে শৃঙ্খলমুক্ত করিলে যা হয়, ব্রাহ্ম বেদান্ত তাই—অনন্ত উন্নতিমুখী, সে মৃত শাস্ত্রের আশ্রয় লইবে কেন? স্বানুভূতির মৃত-সঞ্জীবন মন্ত্রে জগতের শাস্ত্রভাণ্ডার ব্রাহ্মসমাজের কাছে চির জীবন্ত। স্বানুভূতিকে কেন যে শৃঙ্খলমুক্ত করিতে হইবে তাহা তিনি নিজেই স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন—"সর্ব্ব সংস্কার-বর্জ্জিত না হইতে পারিলে সত্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকার জন্মে না। পুরুষানুক্রমাগত সংস্কার এবং গতানুগতিক ধর্ম্মের অনুসরণ মানুষকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেয় না। এ পথে মানুষ কলের পুতুলের মতন নির্দ্দিষ্ট আচার বিচার মানিয়া চলে। এ সকল আচার বিচার প্রতিপালনে তাহার ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা বা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার উদয় হয় না। প্রচলিত মতে সন্দেহ উপস্থিত না হইলে জিজ্ঞাসা জাগে না। জিজ্ঞাসা না জাগিলে বিচারের প্রেরণা জাগে না। বিচার ব্যতিরেকে কোনও সত্যই সাধকের অনুভবে প্রতিষ্ঠিত হয় না। অনুভবে যাহা প্রতিষ্ঠিত হয় না তাহা অপরোক্ষ জ্ঞান নহে। এই জন্যই আমাদের প্রাচীনেরা "অনুভূতিপর্য্যন্তং জ্ঞানং" জ্ঞানের এই সংজ্ঞা দিয়া গিয়াছেন।

সংস্কার-মাত্রেই তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, মানুষের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে। সংস্কার যত বদ্ধমূল হয় ততই তাহা প্রকৃত জ্ঞান-লাভের অন্তরায় হইয়া থাকে। সংস্কারবদ্ধ গতানুগতিক ধর্ম্মে নিষ্ঠা দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে দেহ-শুদ্ধি এবং চিত্ত-শুদ্ধি লাভ হইলেও অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ সম্ভব হয় না। এই জন্যই জ্ঞান-সাধনে প্রথম কথা, সর্ব্ব সংস্কার বর্জ্জন করিয়া মনোদর্পণ নির্ম্মল হইলেই তাহার উপরে সত্যের স্বরূপ প্রতিভাত হয়। ইহাই সাধনপথে সংস্কার বর্জ্জনের প্রয়োজন" (বঙ্গবাণী ; পৌষ, ১৩৩০)। যাহা হউক, বৈষ্ণব বেদান্ত সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, আপনাদের কাছে তাহা অবিচার বলিয়া মনে হইতে পারে। সেই জন্য আমি আমার সাক্ষী-সাবুদ্ উপস্থিত করিতেছি, আপনারাই বিচার করুন।

ভাগবত বৈষ্ণব বেদান্ত, কেন না উহা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য! যদিও রাজর্ষি রামমোহন কোন কোন বিষয়ের উল্লেখ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ও গুলি কোন্ সূত্রের ভাষ্য? গোস্বামী কোন উত্তর দিয়াছিলেন কি না জানি না। কিন্তু আমরা রামমোহনের মত এত সেকেলে নই যে ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য এই সহজ-জ্ঞানলব্ধ প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্যটা বুঝিতে পারিব না। এই সত্যের পশ্চাতে আবার বলবান্ শব্দ-প্রমাণ রহিয়াছে; চৈতন্য চরিতামৃতে ও কথা স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে। সুতরাং নির্ব্বিবাদে প্রমাণিত হইল ভাগবত বৈষ্ণব বেদান্ত। ভাগবতের সার কথা পরমতত্ত্ব কৃষ্ণতত্ত্ব, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ হইতেই পারে না। এই কৃষ্ণতত্ত্বের সার যে আবার রাসলীলা, এ কথা যে না মানে সে তো বৈরাগীই না। * এখন এই রাসলীলার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলেই বৈষ্ণব বেদান্তের সার নিষ্কাশিত হইয়া আসিবে। লীলার সার রাসের বর্ণনা শুনিতে শুনিতে প্রতিমুহূর্ত্তেই মৃত্যুকে প্রতীক্ষা করিতেছেন যে প্রায়োপবিষ্ট পরীক্ষিৎ, তাঁহার মনেও একটা গভীর

---

* গুরু আসিয়াছেন শিষ্যবাড়ী। উভয়েই বৈষ্ণব। শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু, 'পদ্ম-পলাশলোচন' অর্থ কি? গুরুর তো চক্ষু স্থির—"নিমাই শচীমায়ের বেটা," তাহার বিদ্যার দৌড় ঐ পর্য্যন্ত। কিন্তু তিনি হটিলেন না। বিস্তৃত ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। পদ্ম তো পদ্মই, পলাশ যে পলাশ তা তো জানই, আর লোচন অর্থ যে না জানে, "সে তো বৈরাগীই না।" শিষ্য তখন বেগতিক দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, তা তো বটেই, লোচন অর্থ আর কে না জানে। কিন্তু ইহাতে অর্থ কতটা বিশদীকৃত হইল, তাহা গুরুও আর জিজ্ঞাসা করিলেন্ না, শিষ্যও নিবেদন করিবার অবসর পাইল না।

সন্দেহের আবির্ভাব হইল। এখানে বলা উচিত যে স্বর্গীয় নীলমণি গোস্বামীর আধ্যাত্মিক বা পণ্ডিতপ্রবর উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় কৃষ্ণচরিত্র কলঙ্কমুক্ত হয় নাই। অন্ততঃ ভাগবতের কৃষ্ণচরিত্র। এবং কোন কোন মহাত্মার মতে হিন্দুর সকল শাস্ত্র লুপ্ত হইয়া যদি একমাত্র ভাগবত থাকে তবে দুঃখিত হইবার কারণ নাই। শুকদেব ও পরীক্ষিৎ, দু'জনের একজনও রাসতত্ত্ব বুঝেন নাই, এ কথা না বলিলে ইহার অন্য কোন ব্যাখ্যাই হইতে পারে না। সন্দেহান্দোলিত পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিলেন, যিনি ধর্ম্মের স্থাপয়িতা,

স কথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্ব্রহ্মণ্ পরদারাভিমর্ষণম্॥ ভাগবত, ১০।৩৩।২১

তিনি ধর্ম্মের বক্তা কর্ত্তা ও রক্ষিতা হইয়াও পরদারাভিমর্ষণরূপ গর্হিত কর্ম্ম করিলেন কেন? শুকদেব কি বলিলেন তুমি বুঝিতে পার নাই? না, তিনি দুইটী যুক্তির দ্বারা এই কার্য্য সমর্থন করিলেন। একটী যুক্তির মর্ম্ম পরবর্ত্তী অবতারবাদ প্রবন্ধে (ষষ্ঠ অধ্যায় ৩য় পরিচ্ছেদ) ব্যাখ্যাত হইব, তিনি গোপীকাগণের স্বামীদিগের অন্তরাত্মা, কেবল ক্রীড়ার জন্যই না দেহ ধারণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার পক্ষে ইহা কখনও দোষের হইতে পারে না! সকলেরই অন্তরাত্মা এক। রাজর্ষি রামমোহনও বলিয়াছেন, "যে তোমার আত্মারূপে প্রকাশ সেই ব্যাপ্ত চরাচরে"— এই দুইটী একত্র করিলে কি দাঁড়ায়, বৈষ্ণব বেদান্তের সার উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে কি না, তাহা আপনারাই ভাবিয়া দেখুন। দ্বিতীয় যুক্তিটি আরও চমৎকার। প্রভাবশালী পুরুষদিগের এরূপ "ধর্ম্মব্যতিক্রম" দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাতে তাঁহাদের দোষ হয় না, যেহেতু, "তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজোঃ যথা" (১০।৩৩।৩০), আগুন বিষ্ঠা পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়াও পবিত্র থাকে, তাই বলিয়া তোমার আমার পক্ষে সে নিয়ম খাটে কি? মূর্খতাবশতঃ অনুকরণ করিতে যাও তো বিনাশ পাইবে, "বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্"—মহাদেব বিষ খাইয়াছিলেন বলিয়া তুমিও খাইতে পার কি? বাপ্‌রে বাপ্! যে বিষ আর আগুণের ছড়া ছড়ি! এখানে কি আর তর্ক চলে? আমরাও এই সারগর্ভ উপদেশ শুনিয়া সুবোধ বালকের মতন নীরবে গৃহে ফিরিতেছিলাম, কিন্তু পথি মধ্যে গীতা আমাদিগকে মহা ফ্যাসাদে ফেলিয়া দিয়াছেন। সে বৃদ্ধ বলেন কি, "যদ্ যদাচরতি প্রাজ্ঞস্তত্তদেবেতরো জনাঃ"—প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা যে আচরণ করেন অন্যেরা তাহার অনুকরণ করে। কার কথা মান্য? বাপ ব্যাসের, না পুত্র শুকদেবের? এ দিকে পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে ডাকছেন,

যে আমার পথ অনুবর্ত্তন কর। কৃষ্ণের মত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কোথায়? একেবারে পরমতত্ত্ব! তাঁর অনুবর্ত্তন না করিয়া কি বিপথে চলিয়া যাইব? সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে তাঁহার আচরণ অনুকরণ করিবার অধিকার আমরা পাইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি গৃহে ফিরিতেছিলাম, সুতরাং আমি গতিশীল। গতিমাত্রই পরিবর্ত্তন আনয়ন করে, সুতরাং যে ডিগ্বাজি না খায় সে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দুর্ঘটনার ভেষজ-স্বরূপ আমি ডিগ্বাজি খাইতে খাইতে শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে ছুটিলাম। এই স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের নিয়মে আমি যে প্রাচীন মতকে অসত্য বলিয়া বর্জ্জন করিতেছি তাহা নহে, কেন না রাসলীলা যে কৃষ্ণতত্ত্বের সার তা আমি এখনও বিশ্বাস করি, তবে ভাগবতকে একটু ছাড়াইয়া যাইতেছি, তাহা মিথ্যা নয়। যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ ইতরসাধারণ সকলকেই এই রাসলীলার অধিকার দিতেছেন, বিষ বা আগুণের ভয় দেখাইতেছেন না। কিন্তু সর্ব্বনাশ! ও দিকে মানব সমাজে আগুন ধরিয়া গিয়াছে! অর্থাৎ বৈষ্ণব বেদান্তের এই দুই শক্তিশেল মিলিত হইয়া মানব সমাজের অস্থিচর্ম্ম চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতেছে। গীতা ও ভাগবত—বৈষ্ণব বেদান্তের এই দুই শাখানদী মিলিত হইয়া প্রবল বেগে মানব সমাজকে বিনাশ সমুদ্রের দিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, সে মহা বিনাশ হইতে শুকদেবের মতন সৎগুরু বা গীতার মতন সৎশাস্ত্র আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। এই আকস্মিক বিপদে একমাত্র সহায় বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান-বিশোধিত স্বানুভূতি। ব্রাহ্মসমাজ সেই অটল শৈলে আপনার আসন পাতিয়া বসিয়াছেন, সুতরাং বিপিনবাবু যে আমাদিগকে তাঁহার বৈষ্ণব বেদান্তের জীর্ণ কুটীরে আশ্রয় লইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন সে নিমন্ত্রণ দুঃখের কিন্তু দৃঢ়তার সহিত নির্ভয়ে প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলাম, তিনি যেন কিছু মনে না করেন। না পারিলাম আমরা শঙ্করপন্থী হইতে, না হইলাম আমরা গৌরপন্থী। বিপিন-বাবু ভুলিয়া গিয়াছেন, আরও একটা পথ আছে যে পথে আমরা রহিয়াছি—সে পথ হইতে কেহ আমাদিগকে টলাইতে পারিল না।

নির্গুণ ও নিরাকার বিষয়ক ভ্রান্তি।

আর একটা কথা হইলেই এ পর্ব্ব শেষ হয়। বিপিন বাবু পাণ্ডা হইয়া আমাদিগকে ঐ ঐ পথে যাত্রা করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু দেখা উচিত, তাঁহার সাথী হইলে আমাদের যাত্রা মহাযাত্রায় পরিণত হয় কি না! নিশ্চয়ই হয়। কেন না, নিরাকার তত্ত্বের বিচারে তিনি কি সব ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়াছেন, তাহা

আমরা তো ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি। কখনও বলিতেছেন, জগৎ হইতে ভিন্ন বলিয়াই ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিরাকার, আবার বলিতেছেন, ভিন্ন বলিয়া বিবেচিত হইলেই তিনি নিরাকারত্ব হারান। উপনিষদেও ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হইয়াছে, কিন্তু সে নির্গুণ অর্থ সত্তামাত্রজ্ঞেয় অর্থাৎ অজ্ঞেয়, অজ্ঞাত, একেবারে অনস্তিত্বের কোঠায় পর্য্যবসিত ব্রহ্ম নহেন। কেবল সত্তা আর অসত্তা একই বস্তু— কেবল সত্তা বলিয়া বস্তু নাই, তাহা অবস্তু,abstraction মাত্র। Spencer-দর্শন সেই জন্যই এত স্ববিরোধিতাদোষে দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। উপনিষদ্ ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে "সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি" বলিয়াছেন। রাম-মোহন "নির্গুণমপরিচ্ছিন্নম্" বলিয়াই অমনি "বিততবিকাশং জগদাবাসম্" বলিতে ভুলেন নাই। গীতায় "নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ" একই সঙ্গে বলা হইয়াছে। ব্রহ্মকে যদি জগতের সঙ্গে এক করিয়া ভাবিতে হয় তবে ইন্দ্রিয়ক্রিয়া বন্ধ করিলে চলিবে কি? ইন্দ্রিয়ক্রিয়া বন্ধ করিয়া না হয় ব্রহ্মকেই জানিলাম (যে ব্রহ্ম জগতের সঙ্গে এক তাঁহাকে ইন্দ্রিয় ক্রিয়া বন্ধ করিয়া অবশ্য জানা যায় না!), কিন্তু জগৎকে না জানিয়া কিরূপে বুঝিব ব্রহ্ম জগৎ হইতে ভিন্ন না অভিন্ন? ইন্দ্রিয়ক্রিয়া বন্ধ করিয়া জগৎকে জানা সম্ভব কি? এই নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মই যদি শঙ্কর-সিদ্ধান্ত হয়, তবে তিনি আবাঙ্‌মনসোগোচরও নহেন, এবং তাহাকে জানিতে ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া বন্ধ করিলেও চলে না। এখানে ইন্দ্রিয় বলিতে কেবল বাহ্যেন্দ্রিয় বুঝাইতেছে না। হোমর ও মিল্টন চক্ষু হারাইয়াও বর্ণ বৈচিত্রের জ্ঞান সাধারণ লোক অপেক্ষা অনেক অধিক রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং বর্ণাদির দর্শন ও চিন্তনে মস্তিষ্কের কার্য্য একই। তাই যদি হয়, তবে বিপিনবাবু আমাদিগকে কোন্ পথে লইয়া চলিয়াছেন? শঙ্করের নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম কি জগতের সঙ্গে এক? (৭ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) শঙ্কর ব্রহ্মেরই কেবল পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করেন, জগতের পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করেন নাই! সুতরাং দুই এক হইল কি? বিপিনবাবু যাহাকে সাচ্চা নিরাকার তত্ত্ব বলেন তার সঙ্গে শঙ্কর-সিদ্ধান্তের অহিনকুল সম্বন্ধ। অথচ তিনি মীমাংসা করিলেন, শঙ্কর সিদ্ধান্ত সাচ্চা নিরাকার সিদ্ধান্ত। যেখানে বলিতে হইবে 'নয়' বিপিন বাবু সেইখানে ঠিক বলিবেন 'হয়', কিন্তু ইহা যে তর্ক-বিজ্ঞানের *Ignoratio Elenchi*! এমন পাণ্ডার পশ্চাৎ লইলে আমাদিগকে "অন্ধেনৈব নীয়মানাঃ" হইয়া পরিণামে গর্ত্তে পড়িয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে না কি? বিপিন বাবুকে একটা কথা বলিব, তিনি ক্ষমা করিবেন। যে তত্ত্বের কখনও আলো-

চনা করা হয় নাই, তাহা লইয়া এই বহ্বারম্ভ কি নিতান্তই লোক হাসান নয়? এত সহজেই তিনি নিজেকে চিনিতে দিলেন কেন? তাহাও স্বইচ্ছায় এবং নিজেরই স্বীকারোক্তিতে। বৈষ্ণব বেদান্তের আলোচনা করিয়াছেন কি না তাহার খাঁটি পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নাই। বাগাড়ম্বর তত্ত্বের অবধারণ নয়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। শাঙ্কর বেদান্তের আলোচনা তিনি এ জন্মে করেন নাই, তাহা আমরা জানি। তবে আমরা যাহা জানি না, তাহা নাই, এরূপ কথা বলিব না, যদিও বিপিন বাবু তাহাই বলেন। ব্রাহ্মসমাজের নিরাকারবাদের আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন, যে দেশপ্রচলিত সাকার উপাসনার বিরুদ্ধে একটা নিরাকারবাদ প্রচার করা হইয়াছিল,—"আমরা প্রকৃতপক্ষে কোনও নিরাকারতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করি নাই" (পৃঃ৪৯৯)। অর্থাৎ বিপিনবাবুর মনে যখন কোনও নিরাকারতত্ত্বের ধারণা ছিল না, তখন নিশ্চয়ই জগৎশুদ্ধ সব অন্ধকার, কেহই আর চোখে দেখিতে পাইবে না। শুনিয়াছি ক্ষুদ্র জীব-বিশেষও শত্রু তাড়িত হইয়া ঐ রকমই কি একটা নাকি মনে করে! আমরা কিন্তু এইরূপ *Solipsism* বা আত্মাশ্রয়-দোষে দোষী হইতে চাই না। এই একটি মাত্র প্যারাগ্রাফেই যখন এত প্রত্যক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে, তখন অন্য সাক্ষীর আর প্রয়োজন কি। শাঙ্কর বেদান্তের গোড়াকার ঐ স্থূল কথাটারই ধারণা নাই, যে ব্রহ্ম ও জগৎ এক নহে।

আমরা বিপিনবাবুর নির্গুণ ব্রহ্ম ও সমাধিযোগে তাঁহার ধারণা এই দুইএরই সমাধি দেখিলাম, কিন্তু তাহা সুষুপ্তিরাজ্যের কথা। এখন একবার বাস্তব জগতে আসা যাক্। সম্মুখেই দেখি তিনি প্রচলিত মূর্ত্তিপূজার সমাধির আয়োজন করিয়া বসিয়াছেন। যদিও তিনি মনে করিয়াছেন ইহা জন্মোৎসব! আমরা দেখিতেছি, সমাধি পশ্চাৎ হইতে উঁকি মারিতেছে। তাঁহার মতে দেশপ্রচলিত পূজার মূর্ত্তিসকল ঈশ্বরের মূর্ত্তি নহে, কেন না, ঈশ্বরের মূর্ত্তি হয় না; উহারা ইষ্টমূর্ত্তি। ইষ্টমূর্ত্তির জন্ম এই প্রকার—কোন সাধকের মনে সমাধি-অবস্থায় অতীন্দ্রিয় চিন্ময় ভাব উপস্থিত হইল, তিনি তাহা মানসপটে ধরিয়া রাখিবার জন্য আগে ধ্যান রচনা করিলেন, পরে তদনুযায়ী মূর্ত্তি গড়িলেন। কিন্তু এই ইষ্টমূর্ত্তি একজন আর এক জনকে গড়িয়া দিতে পারে না (পৃঃ ৪৯৮-৪৯৯)। বিপিন বাবুর কথা সত্য হইলে এই দেশের মূর্ত্তির উপাসক কোটী কোটী লোককে এই মুহূর্ত্তেই প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া সমাধির পথে চলিতে হইবে। ইহা মূর্ত্তিপূজার জন্মের ব্যাখ্যা নয়, অগ্নি-সংকারের আয়োজন। তাহারা

সমাধিতে নিজেরা এই মূর্ত্তি পায় নাই, কোন্ ভাবের ঐ মূর্ত্তি তাহাও জানে না। সুতরাং তাহারা ইষ্টের পূজা করে না, মূর্ত্তিরই পূজা করে, ইষ্ট না হইয়া কাজেই তাহাদের অনিষ্ট হইতেছে। বিপিনবাবু ইহাদিগকে এই অনিষ্ট পূজার হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবেন কি? তিনি অবশ্যই জানেন, এক মাত্র ব্রাহ্মসমাজই তাহাদিগকে এই অনিষ্ট হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিতীয় কথা এই, ভাবের মূর্ত্তি কি একান্ত প্রয়োজনীয়? ভাবকে মূর্ত্তি দিয়া ভাব ভুলিয়া ধূপ ধূনা নৈবেদ্যে মূর্ত্তিপূজা কি ইষ্টের সাধনা? তিনি দশ দিক্ রক্ষা করেন– এই ভাব যিনি পাইলেন, নিতান্ত তরল মস্তিস্ক না হইলে ইহার ধারণার জন্য দশভূজা মূর্ত্তির প্রয়োজন হইবে না। যার ধ্যানে ইষ্ট ধরা দেন, তার মস্তিষ্ক এত নরম বলিলে অবিচার হইবে না কি? যিনি ভাব পাইয়াছেন তাঁহার মূর্ত্তি অনাবশ্যক। যে ভাব জানে না, বা ভুলিয়া গিয়া, "দশভূজা কৈলাসে থাকেন, তিন দিনের জন্য পৃথিবীতে আসেন," এই বলিয়া উৎসবে প্রবৃত্ত হয়, তাহার পক্ষে যে মূর্ত্তি অনিষ্টকর, ইহার যে প্রতিবাদ করিতেই হইবে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন কি? অন্ততঃ মূর্ত্তির জন্মতত্ত্ববিদ্ বিপিনবাবু পারেন না। দুই দিক্ হইতেই মূর্ত্তিপূজার সমাধির আবশ্যক। বিশ্বস্রষ্টার একটী চিন্ময় ভাব হৃদয়ে ধারণা করিয়া তাহাকে মূর্ত্তি দিলে, ঈশ্বরমূর্ত্তিই যে গড়া হইল তাহাই বা অস্বীকার করা যায় কিরূপে? সুতরাং মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিয়া ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজ ভাব গ্রহণে কখনও আপত্তি করেন নাই। ব্রাহ্মসমাজই কি আবর্জ্জনা হইতে ভাব উদ্ধার করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথম কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন না? কে না জানে ব্রাহ্ম-সমাজের বেদী হইতেই মূর্ত্তির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। আরও একটা কথা। ধ্যানযোগে ইষ্টমূর্ত্তি প্রকাশিত হয়, তাহা না হয় স্বীকার করিয়া লইলাম। কিন্তু মূর্ত্তিপ্রকাশ আরও নানা রকমে হয়। আমাদের দেশের সাধুভক্ত-সম্প্রদায়ে গঞ্জিকা প্রভৃতির বহুল প্রচলন আছে। উহাদের প্রভাবেও মানসপটে অনেক মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। মনের গতি নিতান্ত জ্ঞানপ্রবণ (rationalistic) ও মূর্ত্তিপূজা-বিরোধী না হইলে এই সব মূর্ত্তিকে ইষ্ট মূর্ত্তি বলিয়া গ্রহণ না করা অসম্ভব—শুনা যায় উহারা প্রত্যক্ষ-দৃষ্টবৎ প্রতীয়মান হয়। ইহা পরীক্ষিত সত্য। এরূপ স্থলে প্রচলিত

মূর্ত্তিসকলের কোন্‌টা ইষ্টমূর্ত্তি কোন্‌টা বা গঞ্জিকারসের ঘনীভূত মূর্ত্তি, তাহা কে নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে? সুতরাং "The benefit of the doubt" এর নিয়মানুসারে সকল মূর্ত্তিকেই খালাস দিতে হয় না কি? যে দিক্ দিয়াই বিচার করি, বিপিনবাবুর প্রস্তাব মূর্ত্তিপূজার জন্য গঙ্গাযাত্রার পথই দেখাইয়া দিতেছে।

উপাসনার প্রকার-ভেদ

বিপিনবাবু তিন রকমের উপাসনার কথা বলিয়াছেন। প্রথম ব্রহ্মোপাসনা। ইহার আয়োজন অনেক। পঞ্চকোষের ভেদ হওয়া চাই, ইন্দ্রিয়ক্রিয়া স্থগিত হওয়া চাই, বাক্যমনের কার্য্য বন্ধ হওয়া চাই। এ অবস্থা অতি উচ্চ সাধকদের জন্য। ব্রাহ্মদের তাহাতে অধিকার নাই। ইহার মধ্যে কতটুকু সত্য আছে, তাহা আপনারা পূর্ব্বেই দেখিয়াছেন। তবে এই সমাধির আইনের কঠোরতা কেবল "কালা আদ্‌মি" ব্রাহ্মদের জন্যই! তাঁহার স্বপন্থী সাধকেরা সমাধির অবস্থায় ইষ্টমূর্ত্তি সব লাভ করেন, সে গুলির শব্দাত্মিকা ধ্যানমূর্ত্তিসকল রচনা করেন, এবং সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা তাহা উপভোগ করিবার জন্য সাকার দেবমূর্ত্তি সকল গড়িয়া তোলেন, তাহাতে তাঁহাদের সমাধির পাণ থেকে চূণ একটুও খসে না। ব্রাহ্মেরা উপাসনায় বাক্য ব্যবহার করেন, সুতরাং তাহা বাঙ্ময়ী উপাসনা, সমাধির উপাসনা নয়। ব্রাহ্মেরা উপাসনায় উপমা ব্যবহার করে সুতরাং উহা সম্পদুপাসনা, ব্রহ্মোপাসনা নহে। ব্রাহ্মদের উপাসনায় কোনও মূর্ত্তি ব্যবহৃত হয় না বটে, তবে তাঁহারা সর্ব্বদাই ব্রহ্মের বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি রচনা করিয়া থাকেন! ইহাতে তো নিঃসন্দেহেই প্রমাণিত হইল যে মামুলী ব্রহ্মোপাসনা আর দেশপ্রচলিত মূর্ত্তিপূজায় কোনই পার্থক্য নাই! এই সহজ কথাটা যদি আপনারা না বুঝেন তবে বৃথাই এত কাল ধরিয়া বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠা মসিরঞ্জিত হইতেছিল।

দ্বিতীয়, প্রতীকোপাসনা। ইহা নিম্নতর অধিকারীর জন্য, ইহাকে অধ্যাসজনিত উপাসনা কহে। এক স্থানে এক বস্তু দেখিয়া আসিয়া অন্যত্র যেখানে তাহা নাই সেখানে তাহার আরোপের নাম অধ্যাস। প্রচলিত মূর্ত্তিপূজা এই অধ্যাসজনিত উপাসনা। ইহাই বিপিনবাবুর সিদ্ধান্ত (পৃঃ ৪৯৭)। জিজ্ঞাসা করি, মূর্ত্তিতে কিসের অধ্যাস? সাদৃশ্য না থাকিলে অধ্যাস হয় না। সর্পের সঙ্গে রজ্জুর সাদৃশ্যই অধ্যাসের কারণ। কাষ্ঠলোষ্ট্রের সঙ্গে হৃদয়ে উদ্ভাসিত অতীন্দ্রিয় চিন্ময় ভাবের সাদৃশ্য কোন্ জায়গায় যার জোরে অধ্যাস সম্ভব হইয়াছে? যে

মূর্ত্তি খায়, নায়, মলমূত্ররূপ প্রসাদ ত্যাগ করে, (আপনারা আচার্য্য নগেন্দ্রনাথের পুস্তকে 'হগ্‌গা' প্রসাদের বিবরণ পাইবেন), ডাশ মশার হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য মশারী খাটায় এবং অতিরিক্ত স্নানে জ্বর হয় ও ভক্তেরা পাচনের ব্যবস্থা করে, তাহা অন্তরে প্রকাশিত কোন্ ইষ্টদেবতার আভাস যাহা এই কাষ্ঠলোষ্ট্রে অবভাসিত ? রজ্জুতে সর্পভ্রম অধ্যাস। অধ্যাসটা ভ্রান্তি, কিন্তু মূর্ত্তিপূজার এই বিরাট খেলা তো ইচ্ছাকৃত। মানুষ কখনও ইচ্ছাবশতঃ রজ্জুকে সর্প মনে করিয়া ভয় পায় না। সুতরাং মূর্ত্তিপূজা, অধ্যাসজন্য উপাসনা এই নাম পাইতে পারে কি ? ব্রহ্মসম্বন্ধে অধ্যাস তো হইতেই পারে না। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—সকল ব্রহ্মময় এই জ্ঞান না হইলে তো ব্রহ্মদর্শনই হয় না, সুতরাং ব্রহ্মদর্শনের পরে কোন কিছুতে তাঁহার অধ্যাসের একান্ত স্থানাভাব। প্রাচীন কালের দৃষ্টান্তটিতে জগতের অধ্যাস ব্রহ্মে। ঐ দৃষ্টান্তটিও ভ্রান্ত। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম। প্রত্যক্ষদৃষ্ট সর্পের জ্ঞান থাকাতেই রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্রভাবে জগতের জ্ঞান থাকিলে তো ব্রহ্মে জগতের অধ্যাস হইবে ? যিনি বিন্দুতেও পূর্ণ সিন্ধুতেও পূর্ণ তাঁহাকে কোন্ জঙ্গলে দেখিয়া আসিয়া কোন্ প্রাঙ্গনে অধ্যাস করিব ? শুনিয়াছি সরকার বাহাদুরের কৃপায় ব্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা সরিষা ফুল নয় তো ? উপনিষদ্ বলেন, যোগে বসিলে প্রথম প্রথম জোনাকী, বিদ্যুৎ প্রভৃতির খেলা চোখের সম্মুখে ভাসে,— নীহারধূমার্কানিলানলানাং খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশিনাম্। এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে॥ শ্বেতাশ্বতর, ২।১১। তবে সরিষার ফুলই বা কি দোষ করিল ? অধ্যাস করিতে হইলে, যে বস্তুর অধ্যাস তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান চাই। ব্রহ্ম সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপী, এ কথা ঋষিদের সঙ্গে ব্রাহ্মগণ স্বীকার করিয়া থাকেন, আর কেহ স্বীকার করুক আর না করুক। যিনি তাহা জানেন, তাঁহার পক্ষে অধ্যাসজনিত উপাসনা অসম্ভব। অধ্যাসের স্থানাভাব। যেখানেই অধ্যাস করিতে যাও, অধ্যাস হইবে না। "অন্যত্র দৃষ্টঃ পরত্রাবভাসঃ" ব্রহ্মসম্বন্ধে খাটে না। সুতরাং বিপিনবাবু যে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন—বাক্যবাহিত, ব্রাহ্মসমাজের তথাকথিত বাঙ্ময়ী উপাসনায়ও অধ্যাস আছে, তাহা তিনি যে অধ্যাসবিজ্ঞান একেবারেই বুঝিতে পারেন নাই, তাহারই অন্যতম নিদর্শন। যিনি সর্ব্বগত তাঁহার কোন বস্তুতে অধ্যাস হয় না। অন্যদিকে,

বিপিনবাবু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, ব্রহ্ম জীব ও জগৎ হইতে স্বতন্ত্র নহেন, সুতরাং ব্রহ্মেতেও কোন বস্তুর অধ্যাস হইতে পারে না। অবশ্য, কোন কথা বলিয়া তিনি মনে রাখিবেন, সে অভ্যাস তাঁহার নাই। যে বাটখারা দিয়া তিনি মূর্ত্তিপূজা মাপিয়াছেন, সেই বাটখারা দিয়াই তিনি ব্রহ্মোপাসনা মাপিতে গিয়াছেন, সুতরাং ওজন জ্ঞান না থাকিলে যে বিপত্তি ঘটে, তাহাই ঘটিয়াছে। প্রবাদপ্রসিদ্ধ রাজার বিখ্যাত মন্ত্রীর ব্যবহারের অনুকরণে তিনি মূর্ত্তিপূজা ও ব্রহ্মোপাসনার এক দর স্থির করিয়াছিলেন। সুতরাং যাহা হইবার তাহা তো আপনারা প্রত্যক্ষই দেখিলেন।

তৎপর সম্পদুপাসনা। ইহা মধ্যমাধিকারীর জন্য। সম্পদুপাসনা সম্পদ্ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। আয়ত্ত বস্তুর সাহায্যে যে অনায়ত্ত বস্তুর জ্ঞানলাভ, তাহাই সম্পদ্‌জ্ঞান, যেমন কমলালেবুর দ্বারা পৃথিবীর জ্ঞান। সূর্য্য স্বপ্রকাশ, এবং সঙ্গে সঙ্গে জগৎকেও প্রকাশিত করেন। চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মও স্বপ্রকাশ এবং জগৎ-প্রকাশক। সুতরাং এই সাধারণ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া "প্রত্যক্ষ সূর্য্যগ্রহের ধ্যানযোগে ব্রহ্মোপাসনা করা সম্পদুপাসনা" (পৃঃ ৫০০)। ব্রাহ্মসমাজ যখন উপমা ব্যবহার করেন, তখন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা ব্রহ্মোপাসনা নহে, সম্পদুপাসনা। বিপিনবাবু এটা খেয়াল করেন নাই, যে তিনি এখানে ন্যায়, অলঙ্কার ও প্রত্যক্ষ তিনটিরই মুণ্ড এক সঙ্গে চর্ব্বণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় সূর্য্যের সঙ্গে ব্রহ্মের এই সামান্য ধর্ম্মের উল্লেখ হইয়া থাকে। কেহ কি কখনও শুনিয়াছেন, যে ব্রাহ্মগণ ভুলেও এক বার প্রত্যক্ষ সূর্য্যগ্রহের আরাধনা করিয়াছেন? উপমা বা রূপকের কি উদ্দেশ্য, বিপিনবাবুর তাহা জানা নাই। উপমানের সাহায্যে মানুষ উপমেয়কে বুঝিতে চায়, তাহাও কোনও একটা সামান্য ধর্ম্মবিষয়ে, সকল বিষয়ে নহে। কেহ কখনও উপমানকে উপমেয়রূপে ব্যবহার করে না। উপমেয়ই লক্ষ্য, উপমান উপলক্ষ্য। উপায়কে উদ্দেশ্যের স্থানে বসান কোন্ ন্যায় শাস্ত্রানুমোদিত? সুখের জন্য ধন, এরূপ মুর্খ জগতে আছে, যে ধনোপার্জ্জনে সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া ধরাধাম হইতে চলিয়া যায়। কিন্তু কমলালেবুর ওজন করিয়া পৃথিবীর গুরুত্ব, কমলালেবুর পরিধি লইয়া পৃথিবীর পরিধি, কমলালেবুর বস্তু বিচার করিয়া পৃথিবীর বস্তুজ্ঞান নির্ণয় বোধ হয় সরকারের বিষ্ণুতেলসেবী অতিথিগণ ছাড়া আর কেহ করিবে না। সেইরূপ, ব্রহ্মের সঙ্গে সূর্য্যের একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য সামান্য ধর্ম্মের উপলব্ধি করিতে যাইয়া যদি কেহ ব্রহ্ম ছাড়িয়া প্রত্যক্ষ সূর্য্যের ধ্যানে

প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহাকে সেই রামদাসদিগের সঙ্গেই তুলনা করা চলে, যাহারা দুই খুরী চানা পাইয়া মোহরের থলি ফেলিয়া যায়। উহা স্বর্ণ ফেলিয়া দিয়া অঞ্চলে গ্রন্থি-বন্ধন। আমরা ব্রাহ্মসমাজে একটা উপমায় অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি। কিন্তু কেহ স্বপ্নেও তাহার উপর বিপিনবাবুর ব্যাখ্যা অর্পণ করেন নাই। দেহের পক্ষে যেমন অন্নপান, আত্মার পক্ষে তেমনি উপাসনা। বিপিনবাবুর ন্যায়শাস্ত্রানুসারে প্রাণপণে দেহের তোয়াজ্ করিলেই আত্মার পক্ষে উপাসনার কার্য্য শেষ হইল! কেন না, ব্রহ্মও স্বপ্রকাশ, সূর্য্যও স্বপ্রকাশ —সেই জন্য বলা হয়, ব্রহ্ম যেন সূর্য্য। সুতরাং প্রত্যক্ষ সূর্য্যগ্রহের ধ্যান করিলে ব্রহ্মোপাসনা হইল! বিপিনবাবুও এত বড় ভ্রান্তিতে আর পড়িয়াছেন কি না সন্দেহ! এস্থলে প্রত্যক্ষ সূর্য্যগ্রহের ধ্যান—"জবাকুসুমসঙ্কাশং" ইত্যাদি, উহা পৌত্তলিকতা, সম্পদুপাসনা নহে। ইহার সঙ্গে উপমাগ্রাহ্য সামান্য ধর্ম্মের কোনই সম্বন্ধ নাই। আবার, স্ব-প্রকাশত্ব ও জগৎ-প্রকাশত্ব বস্তু যে কি তাহা বুঝিবার জন্য সূর্য্যের উপমা গ্রহণ যদি সম্পদ্ জ্ঞানের অন্তর্বর্ত্তীও হয়, তবুও তাহার সঙ্গে স্বরূপজ্ঞানের বিরোধ কোথায়? আমার তো উদ্দেশ্য, ব্রহ্মের স্বপ্রকাশকত্ব ও জগৎপ্রকাশকত্বের ধারণা—সূর্য্য আমাকে যদি এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ সাহায্য করে, তবে আমি অবশ্যই কৃতজ্ঞ হইব। কিন্তু সে ঋণ এত বেশী হইতে পারে না, যে আমি ব্রহ্ম ছাড়িয়া সূর্য্যের উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা শেষ করিব? বিপিনবাবু সন্দেশ ফেলিয়া দিয়া হাত চাটিতে চাটিতে ব্রহ্মমন্দিরের বাহিরে যাইয়া ভাবিতেছেন, ব্রাহ্মদের খুব ঠকাইয়াছি এবং তাহাদিগকে যে ছাড়াইয়া উঠিতেছি, তাহা নিঃসন্দেহ! বিপিনবাবু ভুলিয়া গিয়াছেন, অথবা জানেনই না, যে উপনিষদের ঋষিগণ এই উপমা বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা স্বরূপোপাসনার নিম্ন গ্রামের নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সহস্র সহস্র বৎসরের লব্ধ ও সাধিত ঋষিগণের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বিপিনবাবু যে বলিয়াছেন পঞ্চাশ ষাট্ বৎসরের স্মৃতিই ব্রাহ্মগণের একমাত্র অবলম্বন, তাহা নিতান্ত অসার কথা। "সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুঃ" (কঠ), অথবা "সর্ব্বা দিশো ঊর্দ্ধমধশ্চ তির্য্যক্" (শ্বেতশ্বতর) প্রভৃতি শ্লোকে ঋষি সূর্য্যের সঙ্গে ব্রহ্মের তুলনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সমস্ত

উপমা-বিভ্রাট্

উপনিষদ্ শাস্ত্র হইতে বিপিনবাবু দেখাইতে পারিবেন কি, যে তাঁহারা কোথায়ও প্রত্যক্ষ সূর্য্যগ্রহের ধ্যানের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন? উপমা ব্যবহার করিলেও ব্রহ্মোপাসনা

যে ব্রহ্মোপাসনাই থাকে ঋষিগণের অভিজ্ঞতা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ব্রহ্মোপাসনা যাঁহাদের সাধনার সিদ্ধি—এই তিন সহস্র বৎসর যাহা নাড়িয়া হিন্দুর হিন্দুত্ব, বিপিনবাবু তাঁহাদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য করিবেন কি? উপাস্যের আসন হইতে নামাইয়া সূর্য্যকে তাঁহারা ব্রহ্মোপাসনার ধূপ ধুনায় পরিণত করিয়াছেন। অতি মোলায়েম ভাবে তাঁহারা সূর্য্যকে বলিয়াছেন, এখন তুমি পথ দেখ: "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং। তত্ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে" ঈশ॥ এত কাল তুমি সত্যের মুখ আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলে, এখন সরিয়া দাঁড়াও। সূর্য্যের ধ্যান পৌত্তলিকতা, সম্পদুপাসনা নহে। বিপিনবাবু সম্পদুপাসনার ভিতরকার কথা ধরিতেই পারেন নাই। হৃদয়ের ভাবকে বাহিরের যে বস্তুর সাহায্যে দৃঢ় করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, সেই বস্তুকে ভাবের স্থানীয় বলিয়া গ্রহণ করায় এই জাতীয় মূর্ত্তিপূজার উৎপত্তি হইয়াছিল। এরূপ ভ্রান্তির দৃষ্টান্ত আছে। ন্যায়বাগীশ মহাশয় ঘি কিনিতে গিয়াছেন। দোকানী বলিল, অতি উৎকৃষ্ট ঘি আছে—ঠিক যেন তেলের মতন। একে তো ন্যায়ের পণ্ডিত, তাহাতে সবে "ভাণ্ডাধার তৈল কি তৈলাধার ভাণ্ড" ছাড়িয়া মৃৎভাণ্ড হাতে লইয়া হাটে আসিয়াছেন। মাথায় তখনও "দাঁড়াইয়া ঘণ্টানাড়া'র যুক্তিতত্ত্ব ঘুরিতেছে! এমন স্থলে তিনি কি উপমান ছাড়িয়া উপমেয় লইয়া ঘরে যাইবেন? তাহা হইলে ন্যায়শাস্ত্রের জাত যায়। তিনি কলুবাড়ী যাইয়া ভাল তেল প্রার্থনা করিলেন। কলু বলিল, ঠাকুরমশায়, বহুৎ উম্‌দা তেল, ঠিক যেন জলের মতন। নৈয়ায়িক তখন নিকটবর্ত্তী সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে ভাণ্ড পূর্ণ করিয়া গৃহে ফিরিলেন। গৃহিণী কি করিলেন, তাহা আমাদের জানা নাই, কিন্তু কি করা উচিত, তাহা আমরা জানি। পৌত্তলিকতার প্রতি যদি সেই ব্যবস্থা হইয়া থাকে, তবে অন্যায় হয় নাই। প্রত্যক্ষ সূর্য্যগ্রহের ধ্যানকে সম্পদুপাসনা বলিলে বুদ্ধির প্রাখর্য্যই প্রমাণিত হয়। প্রত্যক্ষ সূর্য্যকে বিভূতি উপাসনার অঙ্গীভূত করা যায়, কিন্তু তাহার মন্ত্র স্বতন্ত্র। উপমা বিভ্রাট্ বিষয়ে আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—"মাঘ মাসে মূলা যেন গরুর সিং" এই কথা হয় তো কোন দিন কাহারও মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল, তাহার ফলে কোন কোন স্থানে দাঁড়াইয়াছে, পৌষ সংক্রান্তির পূর্ব্বেই মূলা খাওয়া শেষ করিয়া মাঘের প্রথম দিনে গোমাংস-স্পৃষ্ট হইয়াছে বোধে রন্ধনশালা বিশুদ্ধ করিতে হয়!

শ্রীরামের বিষ্ণুত্ব ও সীতার লক্ষ্মীত্ব উপমা বিভ্রাটের বিরাট্ দৃষ্টান্ত। কবিগুরু

বাল্মীকি রামকে বিষ্ণুর ও সীতাদেবীকে শ্রীর উপমেয় করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁহারা উপমানের আসন গ্রহণ করিয়া বসিয়াছেন। শ্রীরামের জন্মে আদি কবি বলিলেন, "কৌশল্যা জনয়ৎ রামং বিষ্ণুতুল্য-পরাক্রমম্" অবতারত্বের কোন কথাই নাই। রামসীতার বিবাহের পর সুমন্ত্র সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া শ্রীরামকে দেখিলেন,—"বাল-ব্যজনধারিণ্যা সীতয়া পার্শ্বে সংস্থয়া। সপদ্ময়া সেব্যমানং শ্রিয়েব মধুসূদনম্॥" এখানেও অবতারত্বের অবতারণা নাই। রাবণের মৃত্যু হইলে, সীতা যখন রামের নিকট আসিলেন— "তে তাং দদৃশুরায়ান্তীং শ্রিয়ং দেহবতীমিব।" এখানেও লক্ষ্মী সীতার উপমান মাত্র। তারপর, সীতা রামের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন যেন বিষ্ণুর পার্শ্বে লক্ষ্মী, "তস্থৌ ভর্ত্তারমাসাদ্য শ্রীর্বিষ্ণুমিব রূপিণী"। আদি অন্ত কোথায়ও অবতারত্বের নামগন্ধ নাই, কেবল উপমা। অথচ ক্ষুদ্র হাতে পড়িয়া উপমান ও উপমেয়ের প্রভেদ চলিয়া গিয়াছে, তাই এই বিভ্রাট্। বিপিনবাবুও ঠিক এই বিভ্রাটেই পতিত হইয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের মামুলী উপাসনায় অর্থাৎ প্রচলিত তথাকথিত নিরাকারোপাসনায় - (তাহা ব্রহ্মোপাসনাও নহে—আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক কথার ভঙ্গিমা লক্ষ্য করিবেন)—রূপ নাই বটে, অর্থাৎ চক্ষুগ্রাহ্য রূপ নাই বটে, কিন্তু তাহার উপজীব্য রূপক। সুতরাং মূর্ত্তিপূজার সঙ্গে তার আর পার্থক্য কি? আমি বলি, রূপ আর রূপকের যে পার্থক্য তাই। বিপিনবাবুর মনের ভাব, বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। মূলে দুই একই, কেন না, উভয়ত্রই অধ্যাস। অধ্যাসবিজ্ঞানের বিদ্যাবুদ্ধি আমরা ইতিপূর্ব্বেই টের পাইয়াছি, এখন রূপকবিজ্ঞানের বিদ্যার ঝুলি নাড়িয়া দেখিতে হইবে। প্রথমেই কালিদাসকে মনে পড়িল। ধাত্রী শিশু ভরতের নিকট একটি ময়ুর আনিয়া বলিল, "বৎস শকুন্ত-লাবণ্যং পশ্য," ভরত বলিল 'কই আমার মা'! তখন ধাত্রী আক্ষেপের সহিত বলিল "নামসাদৃশ্যেন বঞ্চিতঃ মাতৃবৎসলঃ।" কৃষ্ণবৎসল বিপিনবাবুও সেইরূপ ধ্বনি-সাদৃশ্যে বঞ্চিত হইয়াছেন। রূপ ও রূপকের সাদৃশ্য চেহারায় যা, কাজে তার বিপরীত। রূপক বুদ্ধিগ্রাহ্য, রূপ চক্ষুগ্রাহ্য। এখন আর না বলিলেও চলে। তবু কিছু একটা দৃষ্টান্ত দিই। মোহমুদ্গরে আছে "নলিনীদলগতজলমতিতরলং। তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্॥ এখানে রূপক 'জীবন যেন পদ্মপত্রের জল' আর রূপ 'পদ্মপত্রের জল।' জিনিষ দুইটি একই বটে! এমন না হইলে কি মানুষ ব্রহ্মোপাসনা ছাড়ে। অনেক সময় শুনি, আমরা ইংরাজদের চাইতে সভ্যতায় কত বড়। এই দেখ না, দেশীয় সৈন্য

আর ইংরাজ সৈন্য। কিন্তু ভুলিয়া যাই যে তুলনাটা খাটে না। সৈন্য-দলে প্রবেশ করে আমাদের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, আর ইংরাজ সৈন্যের অধিকাংশই হাড়িডোম শ্রেণীর; সুতরাং এক সমাজের মস্তক আর অন্য সমাজের পা লইয়া তুলনাটা ঠিক ন্যায় সঙ্গত হয় না। বিপিনবাবু ব্রহ্মোপাসনার যত দূর সম্ভব একটা বিকৃত ছবি আঁকিয়াছেন, তাহাকে টানিয়া যত দূর নামান যায়, তাহা নামাইয়াছেন; আর মূর্ত্তিপূজার ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করিয়া তাহাকে যতদূর উপরে তোলা যায় তা তুলিয়াছেন। তবুও একটা অনতিক্রমণীয় পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে। জীবন ও পদ্মপত্রের জলের যে পার্থক্য তাহা কোন দৈব শক্তিও দূর করিতে পারে না। বিপিনবাবু ধ্বনি-সাদৃশ্যে বঞ্চিত হইয়া এই পার্থক্য ধরিতে পারেন নাই। তাই বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া অতি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিয়াছেন, ঐ তথা-কথিত নিরাকার উপাসনা! উহার সঙ্গে মূর্ত্তিপূজার কি পার্থক্য? এখন যদি কেহ ঐরূপ বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলে, হনুবংশীয়েরা মুক্তামালা দাঁতে পরখ্ করিয়া এমনি করিয়াই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া থাকে, তবে কি অন্যায় বলা হয়?

কিঞ্চিৎ মনোবিজ্ঞান

অতঃপর বিপিনবাবু সত্য ও কল্পনার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের দ্বারা ব্যাবহারিক সত্য ও আত্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা পারমার্থিক সত্য লাভ হয়। উভয়ত্রই অপরোক্ষানুভূতি। ইহা ছাড়া আর যাহা কিছু সব কল্পনা, সুতরাং অসত্য। যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের গোচর, তাহার উপর কল্পনা কিছু যোগ করিয়া দেয় বলিয়াই অসত্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ব্যাবহারিক সত্য-লাভে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের উপর কল্পনার (Imaginationএর) প্রভাব কি তাহা বিপিনবাবু আদৌ অবগত নহেন। জগৎটাকে আমরা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষজনিত (বিপিনবাবুর অর্থে) অপরোক্ষানুভূতি বলিয়াই মনে করি, কিন্তু ইহার উপর যে কল্পনার কি অসীম প্রভাব তাহা লক্ষ্য করি না। জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমি যা দেখি, বৈজ্ঞানিক তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী দেখিতে পান; আমি ঐ শিশু অপেক্ষা ঢের বেশী দেখি। ঐ যে শিশু সাদা হইতে কালকে পৃথক্ করিতে শেখে নাই, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ উহারও যাহা আমারও তাহাই, নিউটনেরও তাই। কিন্তু আমাদের তিন জনের জগদনুভূতি কত বিভিন্ন। ঐ শিশু যে দিন শ্বেত হইতে কৃষ্ণকে বিভিন্ন বলিয়া ধরিতে পারিল, তার জীবনের ঐ দিন, আর নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারের দিন একই—উভয়ত্রই ভেদজ্ঞান

(Discrimination), Chaos হইতে Cosmosএর উদ্ধার। আমরা যে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের উপর কল্পনা চড়াইয়া এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইব বটে, কিন্তু ব্যাবহারিক সত্য (phenomenal knowledge) অর্থই তাই। এই কল্পনাটুকু বাদ দিলে, ঐ নবজাত শিশু, আমি ও আচার্য্য জগদীশ একই বস্তু—আমাদের জগৎ একই। ঐ শিশুর কর্ণপটহে যে বায়ুপ্রবাহের আঘাত, তাহার চক্ষু-গোলকের উপর যে আকাশতরঙ্গের সংঘাত, বিথোভেন্ (Beethoven) বা মাইকেল এঞ্জেলোরও তাই। ভিন্নতা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের নয়, ঐ কল্পনার। কল্পনাকে বাদ দিলে আমাদের জগৎজ্ঞান চিরদিনই ঐ নবজাত শিশুর জ্ঞানের কোঠায় আরব্ধ থাকিবে। সুতরাং বিপিনবাবু যে ব্যাবহারিক সত্য ও কল্পনার মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন, তাহা ভ্রান্তি-মুলক। একটী সহজ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র গোলাকার পীতবর্ণের বস্তু দেখিতেছি। (ইহার মধ্যেও কল্পনা আছে, তাহা ছাড়িয়া দিলাম) উহাই প্রত্যক্ষ। আমি বলিলাম, উহা কমলালেবু। কমলালেবু বলিতে যাহা বুঝায়, আর যাহা এখানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। শত ভাগের এক ভাগ মাত্র প্রত্যক্ষ, বাদ্ বাকি সব কল্পনা (imagination)। ক্ষুদ্র পীতবর্ণের লক্ষ বস্তু আপনাদের কাছে উপস্থিত করিতে পারি, আপনারা বলিবেন উহা কমলালেবু নহে। অন্ততঃ কোমলত্ব, গন্ধ, মিষ্টত্ব, আবরণের মধ্যস্থিত বস্তুর বিভাগ ইত্যাদি কল্পনা বলে উহার উপর আরোপ না করিয়া আপনারা উহাকে কমলালেবু বলিবেন না। অথচ উহাদের কিছুই এখন ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ নহে। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের জ্ঞান এইরূপই। আমি একটী প্রবন্ধ পাঠ করিতে করিতে মানসপটে বিপিনবাবুর অস্তিত্ব ও অতীত জীবন অঙ্কিত করিলাম। আমি কি ভাবিব যে বিপিনবাবু আমার কাছে মিথ্যা জিনিষ! এই স্থানে স্বীয় মত ফুটাইয়া তুলিবার জন্য তিনি অন্ধের হস্তি-দর্শন-ন্যায়ের কেন অবতারণা করিলেন, বুঝা গেল না। তিনি দেখাইতেছেন, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের উপর আমরা কল্পনা বলে কিছু জোড়া দিই বলিয়া ভ্রান্তি হয়। অন্ধদের ভ্রান্তি কি ঠিক বিপরীত কারণে ঘটে নাই? বেচারারা যে যতটুকু প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহার উপরে কিছু যোগ কবিতে পারে নাই বলিয়াই তো ভ্রান্তিতে পড়িয়াছিল। কল্পনা বলে যদি সমগ্র হাতীটার ছবি মনের কাছে ধরিতে পারিত, তবে

কাণ, পা, শুঁড় বা দেহ, যে যা ধরিয়াছিল তাহা অবলম্বন করিয়াই তো সমগ্র হাতীর জ্ঞানে যাইয়া পৌছিতে পারিত। কল্পনা করিতে পারিল না বলিয়াই তো বিবাদ করিয়া মরিল। যাহার ভিতরে হাতীর কল্পনা আছে সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হাতীর যে অঙ্গই স্পর্শ করুক্ না কেন, সে কেবল ঐ অঙ্গবিশেষ নয় সমগ্র হাতীটাই পাইবে। অন্ধকারে কোন বস্তু স্পর্শ করিয়া তাহার স্পর্শেতর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণগুলির জ্ঞান যে তাহার হয়, তাহাতে এই কল্পনারই প্রভাব। এই কল্পনা ছাড়িয়া বস্তুজ্ঞান সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন ছাত্র বিপিনবাবুকে এই কল্পনাতত্ত্ব বিষয়ে সাহায্য করিতে পারিত। এই তত্ত্বের সম্যক্ ধারণা নাই বলিয়াই তিনি ভাবিয়াছিলেন অন্ধেরা কল্পনার প্রভাবে বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অথচ কল্পনার অভাবই তাহাদের বিবাদের কারণ। বিপিনবাবু পূর্ব্ব পক্ষ করিলেন যা, দৃষ্টান্ত দিলেন তার উলটা। সেই জন্যই শাস্ত্রে বলে, "শতং বদ মা লিখ মা লিখ।" বক্তৃতায় এ সব ধরা পড়ে না, লিখিলেই মুস্কিল। অংশ মাত্র লইয়া হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান এত কাল মারামারি করিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়াই কি ধর্ম্ম-জগৎকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন নাই? ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়া বলিলেন, তোমরা বিবাদ করিতেছ কেন? কাণ, শুঁড় দেহ, পা, লেজ একত্র করিয়া দেখ, হাতীটা পাইবে। এত দিন হাতীর নাম মাত্র শুনা ছিল, হাতীর জ্ঞান ছিল না। তাই যে যে অঙ্গ পাইয়াছিল তাহাতেই পূর্ণ হাতী মনে করিয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম হাতীর পূর্ণ আদর্শ দেখাইয়াছেন। সুতরাং সব অঙ্গ মিলিয়া এক হওয়ায় বিবাদেরও অবসান হইয়াছে। সকলে এক ঘরে স্থান পাইয়াছেন। যুগপ্রবর্ত্তক রাজর্ষি রামমোহন এই আদর্শ দেখাইয়া বলিলেন, যে যেখানে ধরিয়াছ ঠিক হাতীই ধরিয়াছ—সমগ্র হাতীটা পাইতে হইলে যে কাণ ছাড়িয়া পা ধরিতে হইবে তাহা নহে, কিন্তু পা ধরিয়া বসিয়া পড়িয়াছ কেন—অগ্রসর হও, শুঁড়, কাণ, দেহ, লেজ সব আয়ত্ত কর—সমগ্র হাতীটাই তোমার। পাইয়াছ ঠিক, কিন্তু তাহাতে বদ্ধ হইয়াই সব খোয়াইলে। ইহাই জগতের কাছে ব্রাহ্মধর্ম্মের বার্ত্তা (message)। সমগ্র আদর্শের আলোকে আশাবদ্ধকে মুক্ত করাই এই বার্ত্তা। স্থানান্তরে এ বিষয়ের যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি, এখানে বিস্তৃত ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। *

---

* গ্রন্থকার-প্রণীত "সংস্কার ও সংরক্ষণ" দ্রষ্টব্য।

যাহা হউক, বিপিনবাবু যে বলিয়াছেন, ব্রাহ্ম বলিয়া তিনি বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে যাহা সত্য আছে তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারিতেছেন তাহা সত্যই। কিন্তু তিনি যে বলিয়াছেন খৃষ্টান বা মুসলমান হইলে পারিতেন না, তাহা কিন্তু সত্য নয়! হাতীর শরীরটা গোটা বস্তু, খণ্ড নয়, সুতরাং এক অঙ্গ হইতে অন্য অঙ্গে যাওয়া চলে। তাঁহার কথা স্বীকার করিয়া লইলে, হয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত না হয় খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্ম, মূলেই অসত্য দাঁড়ায়। কথা কিন্তু তাহা নয়। বিপিনবাবু বলেন, ধর্ম্ম-বস্তু অনন্ত, বহু ভাগ্যবলে মানুষ তাহার কণা মাত্র ধরিতে পারে। সমগ্রের ধারণা যদি সম্ভব না হয়, তবে কণিকার পক্ষে সমগ্রের স্থান অধিকার করা অবশ্যম্ভাবী। যাহার মহাকাশের জ্ঞান আছে, সেই গৃহাকাশই সমগ্র নয়, ইহা ভাবিতে পারে। সে জ্ঞান যাহার পক্ষে অসম্ভব, গৃহাকাশকেই একমাত্র আকাশ ভাবা ছাড়া তাহার আর গত্যন্তর নাই। অথবা সে জ্ঞানও তাহার হয় না। সুতরাং অংশকে সমগ্র ভাবিয়া লোকে বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছে, ইহা বলিয়া আক্ষেপ করিবার অধিকার বিপিনবাবুর নাই, কেন না, কণার অতিরিক্ত তিনি মানুষের ভাগ্যে ব্যবস্থা করেন নাই। সামঞ্জস্য রাখিয়া কথা বলিবার চেষ্টা তিনি আদৌ করেন না, আমরাও তাঁহার সম্বন্ধে সে আকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া দিয়াছি। বিপিনবাবু মনে রাখিবেন, যে কণাকে কণা বলিয়া জানিতে হইলে কণাকে অতিক্রম করিয়া ভূমায় পৌছিতে হয়। সুতরাং তিনি যাহাকে কল্পনা বলিতে চান তাহাই সকল সত্যের মূল সত্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই মূল আদর্শ সত্যের—আদর্শ হাতীর ধারণার উপর দাঁড়াইয়াই সকলের মধ্যে সমন্বয় দেখিতে পাইয়াছেন, সকল অন্ধের দৃষ্টিশক্তি লাভের পথ দেখাইয়াছেন। কিন্তু সে কথা এখানে নয়।

অবতার-নির্ণয়

অবতার সম্বন্ধে বিপিনবাবু যে সমস্ত কুযুক্তি ও অজীর্ণ দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন আমরা তাহার বিচার পরবর্ত্তী সন্দর্ভে করিব। তবে অবতারের পথ পরিষ্কারের জন্য তিনি **John the Baptist** এর কাজ যে টুকু করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিয়াই উপসংহার করিতেছি। প্রথম তাঁহার কথাই এই, যে ব্রাহ্মসমাজের মূল মতের সঙ্গে অবতারবাদের কোনও বিরোধ নাই। স্বীকার করিলাম, বিরোধ নাই। কিন্তু তাহাতে কাহারও অবতার স্বীকার করিবার পক্ষে কার্য্যতঃ কোনও সাহায্য হইবে কি? যাঁহাকে

অবতার বল, তিনি যে মানুষ নহেন, ইহার প্রমাণ করিতে হইলে, মানুষ কতদূর উঠিতে পারে, তাহার একটা সীমা নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন। কিন্তু উপনিষদ্ মানুষকে বলিয়াছিল "স চানন্ত্যায় কল্পতে" সে অনন্ত উন্নতির জন্য কল্পিত। অবতারেরা আপনাদিগকে ঈশ্বরের সঙ্গে এক বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদিগকে ঠগ (impostor) না বলিলে অবশ্যই অবতার বলিতে হয়। "সোঽহম্" বা "I and my father are one" যে ভাবেই কেন গ্রহণ করা যাক্ না, প্রত্যেক মানুষই ও কথা বলিবার অধিকারী। এই কথা রাজর্ষি রামমোহন ব্রাহ্মদের জন্য বলিয়া দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ঐ সব উক্তি ব্রাহ্মসমাজের কাছে তথাকথিত অবতারকে মনুষ্যত্বের উপরে লইয়া যাইতে পারিবে না। তারপর, আর একটী কথা। বিপিনবাবুর মতে, হাঁ-বাচক সিদ্ধান্ত আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতিলব্ধ এবং মানব-প্রকৃতির সাক্ষ্য (necessity of thought) হইতে গৃহীত—যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁহার স্বরূপ। না-বাচক সিদ্ধান্ত, হয় necessity of thought হইতে উৎপন্ন, না হয় অনুমান-লব্ধ। অনুমান প্রত্যক্ষকে ছাড়াইয়া যায়। বিপিনবাবুর মতে অন্ধের হস্তিদর্শন ভ্রান্তিতে এই অনুমানেরই প্রভাব! বিপিনবাবু যে অন্ধের হস্তিদর্শনন্যায়ে স্বীয় বিচারান্ধতাই প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। সে বেচারারা প্রত্যক্ষের ভিতরে থাকাতেই গোল করিয়াছে, বাহিরে যায় নাই। বিপিনবাবুর হয় তো জানা নাই, যে কোন কোন প্রণালীর অনুমানে অনুমানলব্ধ সত্যের নিঃসন্দিগ্ধতা প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। তবে সে বিচার এখানে চলে না। যাহা হউক, তিনি যে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছেন, স্বানুভূতিলব্ধ সত্যে ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে, আবার এখানে যে বলিতেছেন, হাঁ-বাচক খাটি সিদ্ধান্ত স্বানুভূতিতে পাওয়া যায়, সে কথাও আপনাদের কাছে নিবেদন করিতেছি, আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক অনুধাবন করিবেন। এখন শুধু তাঁর একটী কথার আলোচনা বাকি। তিনি বলিয়াছেন, 'ঈশ্বরের অবতার হয় না' ইহা না-বাচক সিদ্ধান্ত, সুতরাং স্বানুভূতি বা আত্মপ্রত্যয় তাহা দিতে পারে না, এবং স্বানুভূতি বা আত্মপ্রত্যয় ছাড়া ব্রাহ্মদের সত্য-নির্ণয়ের অন্য কোন পন্থা নাই। সুতরাং প্রমাণিত হইল, অবতারবাদ ব্রাহ্মধর্ম্মবিরোধী নহে। এই সমস্ত কথার আলোচনা করিতে গেলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হয়, তাহা এখন থাক্। কিন্তু একটা কথা এই, একজন যাহাকে বলে আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ, অন্যে বলে 'না';

এক জন যাহাকে বলে 'না', অন্যেরা বলে "হাঁ"। সুতরাং বিপিনবাবুর বচন-প্রামাণ্যে "অবতার হয় না, ইহা আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ নহে," এই সিদ্ধান্ত লইয়া সকলে গৃহে যাইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। বিপিনবাবু যাহাকে আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ বলিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে রাশি রাশি গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে এবং তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আবার কত লোক জীবনপাত করিয়াছেন। সুতরাং তিনি অতি সহজেই বলিতে পারিতেন 'অবতার হয়' ইহা আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ। কেন না, তিনি বহু জিনিষ আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ ধরিয়া লইয়াছেন—আর এই একটা মশা কি এতই বড়? তবে যদি 'হয় না'কে কেহ আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ বলে, তবে দুই আত্মপ্রত্যয়ে ঠোকাঠুকি চলিতে থাকিবে, মীমাংসার জন্য আত্মপ্রত্যয়ের অতীত স্থান খুঁজিতে হইবে, ততদিন কৃষ্ণপ্রাপ্তি সারা! কৃষ্ণপ্রাপ্তির এমন সোজা রাস্তা থাকিতে, তিনি ঘোরাও পথে যাইয়া আমাদিগকেও কর্ম্মভোগে ফেলিয়াছেন, আর লোকেও হাসিতেছে। কেন না, তিনি বার বার রাস্তা ভুলিতেছেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, ব্রাহ্মগণ ঈশ্বরের যে সমস্ত স্বরূপ স্বীকার করেন, তাহা উন্নত ধর্ম্ম-মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকে। এই সমস্ত স্বরূপ আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ (intuitive) অথচ "ঈশ্বরের অবতার হয় না" ইহা আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ হইতে পারে না—না-বাচক সিদ্ধান্ত আত্মপ্রত্যয়ের অধিকার বহির্ভূত (পৃঃ ৫৬৪)। "ঈশ্বর সান্ত হইতে পারেন না, তিনি অনন্ত", ইহার সঙ্গে "তিনি অবতীর্ণ হইতে পারেন না—তিনি সর্ব্বব্যাপী", ইহার কোনও জাতিগত (qualitative) পার্থক্য আছে কি? ব্রহ্ম অনাদি ও অনন্ত, নিষ্কাম, অপাপবিদ্ধ এবং অদ্বিতীয়, ইহা আত্ম-প্রত্যয়সিদ্ধ বা মানবপ্রকৃতির সাক্ষ্য হইতে গৃহীত বলিয়া তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্মের অনবতীর্ণত্ব স্বীকার করা যায় না। কেন না, বিপিনবাবুর মতে—আত্মপ্রত্যয়লব্ধ সত্য যে না-বাচক হয় না! কেন? বিপিন-বাবুর গরজ, কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথে বাধা জন্মে বলিয়া কি? স্ববিরোধিতারও একটা সীমা আছে, কিন্তু বিপিনবাবু এ বিষয়ে অসীম। আমরা কিন্তু সীমাবদ্ধ জীব। সুতরাং এই খানেই সীমারেখা টানিয়া শেষ করিতে বাধ্য হইলাম। গোলোক-ধাঁধায় আর কত ঘুরিব!

উপসংহার

বিপিনবাবু ব্রাহ্মধর্ম্মের সমালোচনা করিয়াছেন, সেজন্য একটুও দুঃখিত নই। যার নাক টিপিলে দুধ গলে—কেবল বয়সে নয়, বিদ্যাবুদ্ধিতেও, সেও আজ রামমোহন রায়ের সমালোচনা করে। সুতরাং বিপিনবাবু ব্রাহ্মধর্ম্মের সমালোচনা করিয়াছেন, ইহা একটা

আশ্চর্য্যের কথা কি? কিন্তু "ন তথা বাধতে স্কন্ধঃ যথা বাধতি বাধতে।" তিনি ব্রাহ্মসমাজকে গালি দিয়াছেন, তা বেশ করিয়াছেন—কত জনেই তো দেয়—সময়ে সময়ে দরকারও হ'য়ে পড়ে—ব্রাহ্মসমাজকে গালি না দিলে অনেক সময় দিন গুজরাণ হয় না। দুঃখ হচ্ছে বিপিনবাবুর জন্য—তিনি নিজের এমন দুর্দ্দশা করিলেন কেন? তিনি বঙ্গসাহিত্যের একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখক—তিনি অনবরত লিখিতেছেন! আমরা মোটে তিনটি মাত্র প্রবন্ধের সমালোচনা করিলাম—ইহাতেই আপনারা দেখিলেন ন্যায়শাস্ত্রের এমন আবর্ত্ত নাই যার মধ্যে তিনি পতিত হন নাই। স্ববিরোধের তো কথাই নাই! সুতরাং আপনারা সকলেই এখন বেশ বুঝিতেছেন, কেন বলিয়াছি,—"ন তথা বাধতে স্কন্ধঃ যথা বাধতি বাধতে!" বিপিনবাবু কৃষ্ণপূজা করুন, আমাদের তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু তিনি এইখানে থামিলে বাঁচি। "সোথের শেয়ালা"র পক্ষে তাহা সম্ভব কি? তিনি শাস্ত্র ও গুরুভক্তির যতই বাহানা করুন না কেন, কোন দিন তিনি শাস্ত্র ও গুরুর ধার ধারেন নাই, এই বৃদ্ধ বয়সে ধারিবেন, সে আশাও আমাদের নাই। চিরদিন এক অভ্রান্ত শাস্ত্র গুরু তিনি মানিয়া আসিয়াছেন—তাহা আপনার নিজের অপরীক্ষিত মত—তাই চিরজীবন পরিবর্ত্তনে পথ দিয়াই বহিয়া আসিয়াছেন। তিনি যে সোথের শেয়ালা, সে জন্য আর কাহাকেও তিনি দায়ী করিতে পারেন না, করিলে মহা অপরাধ হইবে। যখনই যাহা সত্য বলিয়া তাঁহার কাছে আত্ম প্রকাশ করিয়াছে, তখনই তাহা লইয়া তিনি ছুটিয়াছেন। বলিবার ও লিখিবার ক্ষমতা তাঁহার মারাত্মক রোগে পরিণত হইয়া তাঁহাকে চিরদিন বিব্রত করিয়া রাখিয়াছে। যাহা পাইলেন বলিয়া মনে করেন, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, অমনি জগতের দ্বারে যাইয়া তাহার ঢোল পিটিয়া দিয়া আসেন। তিনি স্বীয় ভাবুকতা-গ্রাহ্য মতকেই চিরদিন অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া গণনা করিয়া আসিয়াছেন, ভাবুকতা ছাড়া যে মানুষের আশ্রয় করিবার অন্য কোনও নিরাপদ ভূমি আছে, তাহা যে তিনি কোনও দিন গ্রাহ্য করিয়াছেন এ কথা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট সুযোগ তিনি জগৎকে কখনও প্রদান করেন নাই। সুতরাং জগৎ বিশ্বাস করিয়াছে, কোন তত্ত্বই তাঁহার কাছে সাধনালব্ধ সত্য হইয়া দাঁড়ায় নাই। যে নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন, অনুসন্ধান ও পরীক্ষা দ্বারা সত্যাসত্যের নির্দ্ধারণ প্রয়োজন, তাহা কোন দিনই তাঁহার ধৈর্য্যে কুলায় নাই—বক্তৃতাশক্তি এই সর্ব্বনাশ করিয়াছে। সুতরাং ভাব (impulse) তাঁহাকে যে পথে

চালাইল, তিনি সেই পথে চলিলেন, এবং ইহাই সোথের শেয়ালার পথ। কাজেই, আজ তাঁহার বৈষ্ণবী প্রীতি দেখিয়া যেমন একটুও বিস্মিত হই নাই, কাল সে প্রীতিতে ভাটা লাগিলে একটুও বিস্ময়ের স্থান থাকিবে না। তিনি যদি তাঁর এই নবপ্রেমের কথা জগতে প্রচার না করিয়া সাধন করিতে বসিতেন, তবেই আশ্চর্য্য হইতাম। প্রচার করা ছাড়া তিনি আর কিছুরই জন্য এ পৃথিবীতে আসেন নাই। বিপিনবাবু ঘাটির পর বহু ঘাটি পার হইয়াছেন, তাহা সত্য—উন্নতির পথে সকলকেই পার হইতে হয়, তাহাও সত্য! কিন্তু উন্নতির মুখে ঘাটির পর ঘাটি পার হওয়া, আর যখন যে ঘাটিতে আসিলাম সেই ঘাটিকে শেষ ঘাটি মনে করিয়া সেইখানে বসিয়া পড়া, এবং দু'দিন পরে "না, তাতো নয়" বলিয়া সেটা ছাড়িয়া অন্য এক ঘাটিতে যাইয়া ঐরূপ বসিয়া পড়া কি একই কথা? কোন স্পষ্ট আদর্শের ধারণা না থাকিলে, পথ চলিতে এই বিড়ম্বনা অবশ্যম্ভাবী। ইহা অতি নিম্নশ্রেণীর ঠেকিয়া শেখার পথ (empirial method). চিরজীবনই ঠেকিয়া শিখিব, ইহা সুশিক্ষার পরিচায়ক নহে! কেহ কেহ আবার ঠেকিয়াও শেখে না। বৃন্দাবন যাইব বলিয়া হাওড়ার ট্রেনে উঠিলাম৷ তারপর গাড়ী যেখানেই থামে, আমিও "এই বৃন্দাবন" বলিয়া লাফাইয়া পড়ি—দু'দিন পরে ভ্রম নিশ্চয়ই ভাঙ্গে। এইরূপ দশ বার ভ্রম ভাঙ্গিবার পর যখন কাশী পৌঁছিলাম, তখন উহাকে বৃন্দাবন বলিয়া ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে একটু অনুসন্ধানের কি প্রয়োজনীয়তা নাই? নিজের জীবনের পশ্চাৎ দিকে তাকাইলে কি এই প্রশ্ন স্বতই মনে উদয় হইবে না? "নারায়ণে"র কৃষ্ণতত্ত্ব পাঠ করিয়া কি সকলেই বলিবেন না, যে "বঙ্গদর্শনে"র কৃষ্ণ নিতান্তই অকাল-প্রসূত। যাঁহার নিজের জীবনই সাক্ষ্য দিতেছে, যে দশ বার ভুল হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে আর এক বার ভুল করাটা কি একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার! সুতরাং নূতন সত্যটি সম্বন্ধে ঢাকঢোল না বাজ'ইয়া তাহার সম্বন্ধে উপযুক্ত স্থানে লোক চক্ষুর আড়ালে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হওয়াই কি যুক্তিযুক্ত পথ ছিল না? বিপিন বাবু যে তাহা করেন নাই, অতি সহজেই তাহা প্রমাণ করা যায়। তিনি কৃষ্ণ-রাধিকার প্রেমকে জগতের সেরা তত্ত্ব, সেরা কাব্য—এমন কি, সাধারণ নায়ক-নায়িকার প্রেম ধরিলেও ইহা আদর্শ প্রেম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আমরা এখানে পরীক্ষা ও অনুসন্ধানবিহীন চিন্তা ও বাগ্‌জাল, যে ঘাটিতে পৌঁছিয়াছেন সেই ঘাটির 'গোলে হরিবোল' ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইতেছি না। কৃষ্ণলীলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ভাগবত যে শ্রেণীর প্রেমকে

"তেজীয়ান্ ব্যক্তিদিগের কোন অপকর্ম্মেই দোষ নাই" বলা ছাড়া অন্য কোন যুক্তিদ্বারা সমর্থন করিতে পারেন নাই, সেই প্রেমকে জগতের সম্মুখে আদর্শ প্রেম রূপে উপস্থিত করা যে কতটা চিন্তাহীনতার ফল, তাহা বলাই বাহুল্য ইহাকে বিপিনবাবুর মত শিক্ষিত লোকের পক্ষে 'গোলে হরিবোল' ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? তিনি একটু অধ্যয়ন, একটু অনুসন্ধান একটু পরীক্ষা করিলেই এই ভ্রান্তি অতিক্রম করিতে পারিতেন, এই ঘাটি ছাড়াইয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহার কাছে এ টুকুও আশা করিতে পারি না কি? পারি! ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত আছে। "বঙ্গদর্শনে"র মৃত্যু ও "নারায়ণে"র আবির্ভাব, এই স্বল্প কালের মধ্যেই যে বিপিনবাবুর শ্রীকৃষ্ণ, তত্ত্বের দিকেও, পরিবর্ত্তন-সাগরে বিশাল চুবান খাইয়া আসিয়াছেন, বিশেষজ্ঞ তাহা জানেন।

নিদান ও চিকিৎসা

গ। গীতার অভিমত

ভগবদ্গীতা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ কি না সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে, থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু গীতা যে উচ্চ ধর্ম্ম-শাস্ত্র, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহই নাই। যে জিনিষ যত উচ্চ তাহার অসদ্ব্যবহারও জগতে বড় রকমই হয়। আপনারা জানেন সেই গল্প, "গীতা ময় বিগড় দিয়া।" সন্ন্যাসী গীতার খাতিরে ঘোর সংসারী হইয়া পড়িলেন। আর এক রকমে শাস্ত্রের ব্যবহার আছে, যাহাতে কত অমূল্য গ্রন্থ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। দুই খানি কাষ্ঠের মাঝখানে শাস্ত্র বাঁধা রহিয়াছে, তাহার উপর শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ কত ফুল চন্দন পড়িয়া উহা বিনষ্ট হইয়া গেল। দেখিয়াছি, বৎসরের মধ্যে শ্রীপঞ্চমীর দিন মাত্র গ্রন্থখানি গঙ্গাজলে আর্দ্র হইবার জন্যই কেবল বস্তানি হইতে বাহির হয়। শুনিয়াছি, মরক্কো লেদারে বাঁধাই বাইবেল্ ক্ষৌরী হবার সময় ক্ষুর ধার দিবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শাস্ত্র পাঠের জন্য, উহা অবশ্য কর্ত্তব্য। পাঠ একটী ঋণ-শোধ—

শাস্ত্রের সদ্ব্যবহার

ঋণং দেবানাং যাগেন ঋষিণাং পাঠকর্ম্মণা।
সন্তত্যা পিতৃলোকানাং শোধয়িত্বা পরিব্রজেৎ॥

গীতাসম্বন্ধেও আমাদিগকে পাঠের দ্বারাই ঋষিঋণ শোধ করিতে হইবে। ব্যবস্থাও তাই :

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাৎ বিনিশ্রিতা ॥

গীতা বিষয়ে এমন কথা নাই যাহাতে তর্ক উঠে নাই। এখানেও "পদ্মনাভ" কথাটা লইয়া তর্ক উঠিয়াছে। স্বর্গীয় পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বলেন, যে গীতাশাস্ত্র পদ্মনাভ-নামক ঋষির রচিত। পদ্মনাভের যৌগিক অর্থ বিষ্ণু বটে, কিন্তু গীতা বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত নহে। যাক্। গীতা সুগীতা করিতে হইবে। সুগীতা করার অর্থ কি তানলয়ের সঙ্গে পাঠ করা, না অর্থ-বোধ? এ দেশে একটী মত প্রচলিত আছে—শাস্ত্র শুদ্ধ উচ্চারণের সঙ্গে পাঠ করিলেই ফল লাভ হয়। পূর্ব্বমীমাংসাকার এই দলে। মন্ত্রের উচ্চা-রণের বলেই আমরা ফল পাই—মন্ত্রনির্দ্দিষ্ট দেবতা যে ফলদাতা, তাহা নহে। মন্ত্রনির্দ্দিষ্ট দেবতা বলিয়া বস্তুতঃ কিছুই নাই। ইন্দ্র যদি মন্ত্রনির্দ্দিষ্ট ঐরাবতে চড়িয়া তোমার ঘটের উপরে অধিষ্ঠান করেন, তবে কি ঘট থাকে? ঘট যে ভাঙ্গে না, তাহাতেই প্রমাণ ইন্দ্র বলিয়া বস্তুতঃ কোন দেবতা নাই। ঐ মন্ত্রই সব। "ইন্দ্রশত্রুং জহি" বলিয়া নহুষ যখন যজ্ঞে আহুতি দিয়াছিলেন, জোর (Emphasis) যে শব্দে পড়া উচিত ছিল, তাহা না পড়িয়া অন্য শব্দে পড়াতে ফল বিপরীত হইয়া গেল। ইন্দ্ররূপ শত্রুর হানি না হইয়া, ইন্দ্রের শত্রু নিজেরই হানি হইল। আমি বাল্যকালে পাঠ মানে আওড়ানই বুঝিয়াছিলাম। কাশীদাসের মহাভারত পাঠ করিতে করিতে এক জায়গায় দেখিলাম, লেখা আছে—ইহার একটী পর্ব্ব নিষ্ঠার সঙ্গে শুচিভাবে পাঠ করিলে বহু ফল লাভ হয়। আমি উক্ত মহাভারতের সব চাইতে ছোট পর্ব্বটি এইরূপে পাঠ করিয়াছিলাম। কিন্তু আজ পাঠের এই অর্থ-কেহ মানিবে না—

মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যো ন জানাতি সাধকঃ।
সহস্রং জপ্যমানোঽপি তস্য সিদ্ধি র্ন জায়তে ॥

গীতা সুগীতা করিতে হইবে অর্থবোধের দ্বারা। সে জন্য গীতাকার কোন্ দার্শনিক সম্প্রদায়ভুক্ত তাহাই সর্ব্বাগ্রে নির্ণয় করিতে হইবে। অন্য দেশের কথা বলি না, এ দেশের জল মাটিতে দর্শন ও সাধন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সাধনের ভিত্তি যে দর্শন তাহা ছাড়িয়া সাধন হয় না। বিদেশীয়েরা এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া অবাক্ হইয়াছেন।

দর্শন ও সাধন

Oldenburgh বুঝিয়াই উঠিতে পারেন নাই, কেন ধর্ম্মসাধনের সঙ্গে কোন বিশেষ দার্শনিক মতের এত ঘনিষ্ঠতা থাকিবে! যাঁহারা ধর্ম্মকে কতকগুলি আচার ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে একীভূত করেন, বড় জোর একটু ভাবোদ্রেক, তাঁহাদের ইহা বাস্তবিকই বুঝা শক্ত। গীতারও একটা দর্শন অবশ্যই আছে। কেন না, গীতা ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র। গীতা কোন্ দার্শনিক সম্প্রদায়ভুক্ত, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে উপনিষদের দর্শন-তত্ত্ব হইতে। কেন না,

সর্ব্বোপনিষদঃ গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থঃ বৎস সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতম্মহৎ॥

কৃষ্ণ ও গীতা

শ্রীকৃষ্ণ দোগ্ধামাত্র, দুগ্ধের স্রষ্টা নহেন। দুগ্ধের গুণাগুণের জন্য গাভী দায়ী—দোগ্ধা নহেন। সুতরাং আমরা যদি শাস্ত্র-নিয়ন্ত্রিত পথে, আচার্য্যগণের নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে গীতা-তত্ত্বের আলোচনা করিতে চাই, তবে প্রথমেই একটি কথা আমাদিগকে ধরিয়া লইতে হইবে, যে উপনিষদ্-বিরুদ্ধ কিছু গীতার মধ্যে স্বীকার করা যাইবে না। অনেককেই এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিতে শুনি, বেদবেদান্ত অতি দুরূহ, গীতা-শাস্ত্রে ধর্ম্ম অতি প্রাঞ্জল, উহাই সকলের গৃহীতব্য। কিন্তু উপনিষদ্ বাদ দিলে গীতা শাস্ত্রের অর্থই বোধগম্য হইবে না, প্রাঞ্জলতা দূরের কথা। আমাদের শাস্ত্রানুসারে সত্য নির্ণয় করিতে হইলে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণ করিতে হইবে, তাহা এই—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণানাং বিরোধঃ যত্র বিদ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥

বেদান্তের প্রস্থানত্রয়—উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা—ইহাদিগকে ক্রমান্বয়ে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ ধরা যাইতে পারে। সুতরাং গীতাকে উপনিষদের মতেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে, পুরাণকে শ্রুতির উপরে স্থাপন করা যায় না। কেহ যদি বলেন, যে উপনিষদেও তো বহু মত দেখা যায়, তবে উপায় কি? উপায়—ব্রহ্মসূত্রে উপনিষদ্ সমূহের সারনিষ্কাশন আছে; হয় তাহাই অবলম্বনীয়, না হয় উপনিষদের কোন এক মত গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন, "তদিদং গীতাশাস্ত্রং বেদার্থ-সারসংগ্রহঃ", সুতরাং গীতাব্যাখ্যায় বেদবিরুদ্ধ কোন মত গৃহীত হইতে পারে না। পূর্ব্বে (৫৫ পৃঃ) উল্লিখিত হইয়াছে, ছান্দোগ্য (৩।১৭.৬) বলেন, দেবকীনন্দন কৃষ্ণ ঘোর ঋষির নিকট ব্রহ্মদীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি সেখানে

এমন মন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহার সকল কামনার নিবৃত্তি হইল। এইখানেই যে গীতার প্রধান কথা নিষ্কাম কর্ম্মবাদের পত্তন তাহা সহজেই বুঝা যায়। যাহা নিজের জীবনে পাওয়া গিয়াছে তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার, তাই গীতাতে কৃষ্ণের উক্তি ভগবদুক্তি রূপে বর্ণিত হইয়াছে—এই যে সাধারণ বিশ্বাস তাহা বেদ-বিরুদ্ধ। তবে, ভগবৎস্থানীয় করিয়া কৃষ্ণের মুখ দিয়া এ সকল তত্ত্বের উদ্ভব হইল কেন? পুরাতন বাইবেলে দেখি, উপদেষ্টা কিছু বলিতে যাইয়া আরম্ভ করেন, "Thus saith the Lord". উপদেশ দেবার এটাও একটা প্রণালী। ব্রহ্মসূত্রে (১।১।৩০) ইহার মীমাংসাও আছে—"শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তু উপদেশঃ বামদেববৎ", ব্রহ্মস্থ হইয়া ব্রহ্মদৃষ্টিতে সকলেই আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণনা করিয়া উপদেশ দিবার অধিকারী। রাজর্ষি রাম-মোহনও বেদান্তসার ও অন্যান্য গ্রন্থে এই মত সমর্থন করিয়াছেন, যে "এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাতে ব্রহ্মের আরোপণ করিয়া ব্রহ্মরূপে আপনাকে চিন্তন ও বর্ণন করিবার অধিকার রাখেন"। সকল ব্রাহ্মণই তো জপের সময়ে বলেন—

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥

কবিবর নবীনচন্দ্রও (কুরু, ৯ম সর্গ) কৃষ্ণের মুখে, "গায়ক সে নারায়ণ; এই গীতা তাঁর; আমি ও মহর্ষি মাত্র নিমিত্ত ইহার", গীতা সম্বন্ধে এই উক্তি দিয়া ঐ মতই সমর্থন করিয়াছেন। পুরাণও শ্রুতি এবং স্মৃতিকেই মান্য করিয়াছে, লোকমত সমর্থন করে নাই। ভগবদুক্তি, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন, উপদেষ্টা ও উপদিষ্ট উভয়কেই এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া গ্রহণ করিয়াছে—বৃষ্ণীণাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ। ১০।৩৭

শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মস্থ উপদেষ্টা, উপদেষ্টা স্বয়ং ব্রহ্ম নহেন—ইহাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। অনুগীতাতেও দেখিতে পাওয়া যায়, অর্জ্জুন যখন পুনরায় গীতোক্ত তত্ত্ব কৃষ্ণের মুখে শুনিতে চাহিয়াছিলেন, কৃষ্ণ স্পষ্টই বলিলেন—যোগস্থ হইয়া আমি যাহা বলিয়াছিলাম এখন তাহা মনে হইবে কেন? বাক্য ইহা অপেক্ষা সংশয়চ্ছেদি আর হইতে পারে না। গীতাদ্বারা কৃষ্ণ একজন সাধক ছাড়া আর কিছু প্রমাণিত হন না। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ এক বাক্যে একই কথা বলিতেছে। সুতরাং গীতা ভগবদুক্তি, ইহার উপর বিচার চলে না বলিয়া যাঁহারা তর্ক তোলেন তাঁহাদের কথার কোন মূল্য নাই। আর্য্য-মিশন হইতে সেকালে যে গীতা বাহির হইয়াছিল—তাঁহারাই বাস্তবিক গীতা পপুলার

করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক কথাতেই সকল বিবাদের মীমাংসা করিয়াছেন, যে কুরুক্ষেত্র মানুষের জীবনক্ষেত্র, উপদেষ্টা কূটস্থ ব্রহ্ম আর শ্রোতা জীবাত্মা।

গীতার বিভিন্ন ব্যাখ্যা

গীতার শত শত টীকা ও ভাষ্য আছে। সকলে একমত নহে। উপনিষদ্ সম্বন্ধে যখন ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক মত আছে, তখন গীতা সম্বন্ধেও থাকিবে। যে কোন তত্ত্ব বিষয়েই ধরা যাক্—গীতাকারের কি মত? এই সকল ঔপনিষদিক নানা মতের কোন একটা কি গীতাকারের মত? না, গীতাকারের মত এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই? গীতাকারের নিজের মত একটা ছিলই। টীকাভাষ্যের সবগুলিই তাঁহার ঘাড়ে চাপাইলে চলিবে না। কেহ কেহ বলেন, যে, সকল টীকা-ভাষ্যই সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া গীতামত ব্যাখ্যা করিতে হইবে। টীকাকার ও ভাষ্যকারেরা জ্ঞানী ও সাধক, তাঁহাদের এক জন সত্য অন্যেরা মিথ্যা, ইহা কেমন করিয়া বলা যায়? এই তর্কের কোন মূল্য নাই। ভাষ্য ও টীকাকারেরা প্রতিপক্ষের মতকে মিথ্যা বলিয়াই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শঙ্কর বলিয়া উঠিলেন, "অহোঽনুমানকৌশলং দর্শিতমপুচ্ছশৃঙ্গৈস্তার্কিকবলীবর্দ্দৈঃ"। আবার ব্যাসসূত্রের মায়াবাদী ভাষ্য শুনিতে শুনিতে চৈতন্য বলিয়াছেন—

জীবনিস্তারের তরে সূত্র কৈল ব্যাঁস,
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ।

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বুদ্ধমেব তৎ" ইহা তো প্রাচীন কথা। সুতরাং আচার্য্যেরা যেখানে সমন্বয় দেখেন নাই আমরা সেখানে সমন্বয় দেখিতে গেলে, যে দোষ পরিহার করিবার জন্য এই তর্ক তাহা দ্বিগুণ মাত্রায় আসিয়া উপস্থিত হইবে। সুতরাং এ তর্কের উদ্দেশ্য সত্য-নির্ণয় নহে, সত্য-নির্ণয়ে বাধা-প্রদান। ইংরাজীতে ইহাকেই বলে Obscurantism. বিশেষতঃ, এইরূপ অন্ধভাবে উপদেষ্টাকে অনুসরণ করা বাংলার শিক্ষা ও সভ্যতার বিরোধী। ব্যক্তির উপর শাস্ত্র ও গুরুর আধিপত্যের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, পূর্ব্ব প্রস্তাবে প্রদর্শিত

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বাঙ্গালীর বিশেষত্ব

হইয়াছে। হাজার বৎসর আগে যীমুতবাহন বলিয়া গিয়াছেন, শাস্ত্রের আদেশে বস্তুর বস্তুত্ব পরিবর্ত্তিত হইবে না। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত অনুমান শাস্ত্রবচনে নিরাকৃত হইবে না। কর্ত্তাভজাদিগের মধ্যে একটা প্রবচন আছে যাহা এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য। কেন না, কর্ত্তাভজা মত বাংলার নিজস্ব। প্রবচনটি এই—

যদি নাহি দেখিয়াছ আপন নয়নে,
প্রত্যয় না ক'রো তাহা গুরুর বচনে।

মুণ্ডকোপনিষদ্ "তত্রাপরা" মন্ত্রে যে শাস্ত্রবাদের ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত শাস্ত্রবাদ। শাস্ত্র কোন গ্রন্থ নহে, যাহাদ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞাত হয়েন তাহাই শাস্ত্র। সত্যই ব্রহ্ম, তাই ব্রাহ্মসমাজ ঘোষণা করিয়াছেন, "সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।" হাজার বৎসর পূর্ব্বে যদি কেহ কিছু বলিয়া থাকেন এবং তাহার মধ্যে যদি সত্য থাকে তবে তাহা যেমন শাস্ত্র, আমি এখন যাহা বলিতেছি তাহার মধ্যে যদি এমন কিছু থাকে যাহা দ্বারা "তদক্ষরমধিগম্যতে" তবে তাহাও শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—কোরাণ পুরাণ বাইবেলের তো কথাই নাই। কেন না, যুক্তিযুক্তেমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি। অন্যত্তৃণবদগ্রাহ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥

ইহা "তত্রাপরা ঋগ্বেদঃ" ইত্যাদিরই প্রতিধ্বনি, blasphemy নহে। বাস্তবিক, সত্যনির্ণয়ে কেবল শাস্ত্রের দোহাই দিলেই চলিবে না। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে সৎশাস্ত্র, সৎগুরু ও স্বানুভূতি—এই তিনের মিল চাই। 'দিল্ কিতাব' বা চৈত্ত্য গুরুর সায় না পাইলে সত্য নির্ণয় হয় না। কেননা,—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

রাজর্ষি রামমোহন বলিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তিগণের হুবহু অনুসরণ পশুধর্ম্ম, মানব ধর্ম্ম নহে। "রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাদামনোঃ বর্ত্মনো পরম্" মনুবংশীয়দের উপর প্রযোজ্য নহে। ইহা হনুবংশীয়দের ধারা। পাঁচ হাজার দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও যেমন এখনও তেমনই হনুবংশীয়েরা এক ডাল থেকে আর ডালে সনাতন প্রথা অবলম্বন করিয়াই চলা ফেরা করে—রেখামাত্র বিচলিত হয় না। মানুষকে ক্রমবিকাশ (evolution) মান্‌তেই হবে। শাস্ত্রেরও ক্রম-বিকাশ চাই। এমন শাস্ত্রবাদ চাই যাহাতে ক্রমবিকাশের সঙ্গে শাস্ত্রের বিরোধ না ঘটে। শাস্ত্রকে কোন বিশেষ ব্যাখ্যায় আবদ্ধ করিলে চলিবে না। ব্যাখ্যাকেই শাস্ত্র বলিয়া মানিতে পারি না। ব্যক্তির বিকাশের সঙ্গে শাস্ত্রকেও বিকশিত হইতে হইবে। যে শাস্ত্র মৃত (obsolete, antediluvian) সে জীবন্ত মানুষের উপদেষ্টা হইতে পারে না। উপদেষ্টাকে আমার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে হইবে। আমার বৃদ্ধির সঙ্গে শাস্ত্রেরও বর্দ্ধন চাই। পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিশোধন ক্রমবিকাশের নিয়ম। সুতরাং শাস্ত্রকে শাস্ত্রত্ব রক্ষা করিতে হইলে আমার জীবনে নবীভূত হইয়া উঠিতে হইবে। শাস্ত্রের কর্ত্তৃত্ব (autho-

rity) ব্যক্তির উপর নয়, ব্যক্তির কর্ত্তৃত্ব শাস্ত্রের উপর। আমার পক্ষে কি শাস্ত্র কি অশাস্ত্র তাহা নির্ণয় করিবার ভার আমার উপর। শাস্ত্র একটী আদর্শ—যাহা ধরিয়া আমি চলিব; শাস্ত্র একখানা গ্রন্থ নহে—যাহা আমাকে চালাইবে। ইহার সঙ্গে উপনিষদের শাস্ত্রবাদের কোন বিবাদ নাই। যাঁহারা গ্রন্থকে শাস্ত্র বলিয়া প্রচার করেন, তাঁহারা উপনিষদের শাস্ত্রবাদ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া উপধর্ম্মের শাস্ত্রবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। কথাটা এতই প্রায়াজনীয় যে ইহার পুনঃ পুনঃ আলোচনা প্রয়োজন, তাই পুনরাবৃত্তি করিলাম।

গীতার অর্থ নির্ণয় করিতে নানা প্রণালী অবলম্বন করা যাইতে পারে—

গীতার্থনির্ণয়-প্রণালী

(ক) কোন মতামতের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া অগ্রসর হওয়া, তাহাতে যে অর্থ আসে তাহাই গ্রহণ করব। ইহা কতকটা অবরোহ প্রণালী (Inductive method).।

(খ) জ্ঞান ভক্তি বা কর্ম্ম—কোনও নির্দ্দিষ্ট পন্থার দ্বারা পরিচালিত হওয়া। ইহা এক প্রকার আরোহ প্রণালী (Deductive method)। কিন্তু তা নির্ণয় হবে কি রূপে? হয়, বিচারকর্ত্তা যে পন্থী গীতা নিশ্চয়ই সেই পন্থী, এইরূপে গায়ের জোরে (dogmatically) নির্ণয় করা। না হয়, সমস্ত গীতা পাঠ করিয়া কিসের উপর জোর তাহা দ্বারা নির্ণয় করা। এটা (ক) প্রণালীরই অনুসরণ। ইহাতে গীতাকারের মত নির্ণয় হওয়া দুরূহ! গীতায় প্রক্ষিপ্ত নাই, তাহা কেমন করিয়া বলা যায়? ৭০টি মাত্র শ্লোকের গীতা আবিষ্কৃত হইয়াছে। গীতা যাহা আমাদের কাছে উপস্থিত তাহা ধরিয়াই আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে।

(গ) বিষয়-সন্নিবেশের পৌর্ব্বপর্য্যায় এক প্রধান প্রণালী। ১ম কর্ম্ম-ষট্‌ক, ২য় ভক্তি-ষট্‌ক এবং শেষে জ্ঞান-ষট্‌ক রহিয়াছে। সুতরাং বুঝা যায়, গীতাকার জ্ঞানের প্রাধান্য দিয়াছেন। গীতাকার কিসের প্রাধান্য দিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা অবশ্য শক্ত। তিনি যেন জ্ঞানভক্তিকর্ম্মের নামে এক জিনিষই বর্ণনা করিতেছেন, তিনের সমন্বয় (synthesis) ঠিক নয়। মোটের উপর নিষ্কাম কর্ম্মের উপরই জোর। কিন্তু গীতার নিষ্কাম কর্ম্মকে নৈষ্কর্ম্ম্য বা জ্ঞান হইতে পৃথক করা যায় কি না সন্দেহ। যাহা হউক, আমরা যে গীতা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রাখিয়া, দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া অর্থ করিতে হইবে।

মহাভারতের আখ্যায়িকার সঙ্গে গীতা অনুস্যূত। সুতরাং ইতিহাসের চক্ষে দেখিয়াই বিচার করিতে হইবে। সমস্ত গীতা খানাই প্রক্ষিপ্ত—ইহা বলিলেও নিষ্কৃতি নাই। প্রক্ষেপকারেরও একটা মত ছিল। সুতরাং তিনি যদি কর্ম্মত্যাগ-পন্থী হইতেন তবে এমন স্থানে গীতা সন্নিবেশিত করিতেন না, যেখানে কর্ম্মে প্রবৃত্তি লওয়ানটাই যে উদ্দেশ্য তাহা বালকেও বুঝিতে পারে। একেবারে কর্ম্মত্যাগ যদি কোন শ্লোকের উদ্দেশ্য বুঝা যায় এবং যাহা হইতে মনে যথার্থ সন্দেহ আসে—"কথং মাং কর্ম্মণি ঘোরে নিয়োজয়সি কেশব?" তবে সে শ্লোক প্রক্ষিপ্ত, এ সিদ্ধান্ত করিলে যুক্তিবিরুদ্ধ হইবে না। প্রথম প্ররোচনা তো সকামভাবেই হইয়াছে (২।৩১।৩৮)। বঙ্কিমচন্দ্র এগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছেন। ইহারা নিষ্কাম-কর্ম্মের বিরোধী, সন্দেহ নাই। কিন্তু উদ্দেশ্য যখন একটী বিশেষ কর্ম্মের প্ররোচনা, সকামভাবে তাহা সিদ্ধ করিতে হানি কি? অর্জ্জুন যে নিষ্কামভাবের উপযুক্ত তাহার পরীক্ষা তো চাই। কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে আগেই উচ্চতত্ত্ব প্রদান করেন নাই। অধিকারী না হইলে নিষ্কাম উপদেশে কাজ হয় না। শিশুদিগকে "লেখা পড়া যেই করে, গাড়ী ঘোড়া সেই চড়ে" বলিয়াই প্ররোচিত করিতে হয়। চিত্রসেনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিতে যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে শেষে সকাম উপদেশ দিতেই বাধ্য হইয়াছিলেন, নিষ্কামে ফল হয় নাই। একটি বিশেষ শ্লোক নিয়ে দেখা যাক্। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকটি প্রায় সর্ব্বশেষ প্রধান শ্লোক। কিন্তু এটির সম্বন্ধে মতবিরোধ অত্যন্ত বেশী। "ধর্ম্ম" কথাটার অর্থ লইয়াই মহাতর্ক। শঙ্করের মতানুযায়ী ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয় পরিত্যাগই সমিচীন। অর্জ্জুন যুদ্ধটা অধর্ম্ম্য বলিয়াই বিরত হইতেছিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার তুমি ছাড়, আমি যা বলি তাই কর। ধর্ম্মকথাটার মধ্যে অধর্ম্মও যে গৃহীত তাহা পরের পাদে প্রকাশ—সকল পাপ হইতে মুক্ত করিবার ভরসাও দেওয়া হইয়াছে। "আমার কথা না শুন্‌লে বিনাশ পাবে" বলিয়া ইতিপূর্ব্বে ভয় দেখান হইয়াছে। অর্জ্জুনকে দিয়া যুদ্ধ করানই চাই—কৃষ্ণের মধ্যে এই গরজ বেশই বর্ত্তমান। সেই অনুসারে অর্থ করাই ভাল।

গীতার ইতিহাস ও কর্ম্মবাদ

গীতার দেশে যুদ্ধকে হিংসার দিক্ দিয়া দেখিলে চলিবে না। গীতার উদ্দেশ্যই এই দেখান, যে স্থলবিশেষে যুদ্ধ না করাটাই অধর্ম্মজনক "কিং

কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি" প্রভৃতি (৪।১৬।১৮) শ্লোকে বেশ স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে যে সাধারণ ধারণা হইতে কর্ম্ম অকর্ম্ম বিচার করিও না। সুতরাং লোকে যাকে হিংসা বলে তাহাই অহিংসা হইতে পারে। "যাহা বাহান্ন তাহা তিপান্ন"র যে লোকপ্রবাদ আছে, তাহাও এই মত সমর্থন করিবে। অহিংসার যে ব্যাখ্যায় কিছু দিন হইল দেশ বিপথে গিয়াছিল, তাহা গীতাবিরুদ্ধ। সর্ব্বশেষ শ্লোকও বিচার্য্য—যোগেশ্বর কৃষ্ণকে পাইলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না, শারীরিক বলের প্রতীক পার্থকেও চাই। গীতার "বৎস" শুধু পার্থ নহেন "ধনুর্ধর" পার্থ যাঁহার স্বধর্ম্ম লৌকিক অর্থে একেবারেই অহিংসা নহে।

গীতা ও অহিংসা

আর একটী শ্লোক (৩।৯), "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র"—সাধারণতঃ এখানকার তর্ক 'যজ্ঞ' কথাটার অর্থ লইয়া। কিন্তু একটি কথা বিচার্য্য—'অন্যত্র' কথাটার অর্থ যদি হয় "পক্ষান্তরে" তাহা হইলে একটী বেশ সুসঙ্গত নূতন অর্থ পাওয়া যায়। আগে কর্ম্মের প্ররোচনা করা হইল, কর্ম্ম না করিলে শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হয় না। পক্ষান্তরে—আরও একটা যুক্তি আছে। সেটা শারীরিক নয়, কিন্তু নৈতিক। সেটা দেবতাদের সঙ্গে একটা চুক্তি (covenant), যজ্ঞরূপ কর্ম্মের মধ্য দিয়াই এই চুক্তি। কর্ম্ম না করিলে দেবতাদের নিকট অপরাধী হইতে হইবে। ইহাই কি "ঋণং দেবানাং" কথার অর্থ? যাক্, দিগ্‌নির্ণয় মাত্র করা গেল। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, যে এই যে দেবতার সঙ্গে মানুষের চুক্তি ইহাতে ইহুদী জাতির ধর্ম্ম শাস্ত্রের (Old Testament প্রভাব অনুমিত হয়! অন্যদিকে, 'এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রম্" (৩।১৬), বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব সূচনা করে। পণ্ডিতবর গার্ব্বে (Garbe) ঐ ৯ম হইতে ১৮শ পর্য্যন্ত ১০ টি শ্লোকই প্রক্ষিপ্ত, বলেন, তাহাতে এই বাহিরের প্রভাবের মতটা দৃঢ়ই হয়।

গীতায় বাহিরের প্রভাব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খৃষ্টতত্ত্ব

"I and my Father are one. Come unto me, O ye heavy-laden, I will give you rest." *New Testament.*

ক। যিশুপুরাণ

পণ্ডিতেরা এরূপ সকল ঐতিহাসিক সূত্রের সন্ধান পাইয়াছেন যাহা ধরিয়া নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছান যায়, যে বাইবেল্ গ্রন্থোক্ত খৃষ্টচরিত্র আর কিছুই নহে, কেবল "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"।

যোহনের নামে প্রচলিত যে তিন খানা পত্র (Epistles of St. John) আছে, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, যে সময়ে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে খৃষ্ট-বিশ্বাসী দলসকল বর্ত্তমান ছিল। নষ্টিক্দিগের মধ্যে ইহা কেবল একটী ধর্ম্মমত ছিল না, ধর্ম্ম-সাধনের অন্তর্ভূত হইয়াছিল। মানবাত্মায় যে ঈশ্বরের প্রকাশ, তাহাই খৃষ্ট। ইহা হইতেই খৃষ্টপুরাণের আবির্ভাব। সর্ব্বসাধারণ শুধু আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম লইয়া তৃপ্ত হইয়া থাকিতে পারে নাই, এখনও পারে না। তাহারা "মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্য" লইয়া সন্তুষ্ট নহে। কেবল শ্রোতব্যও নহে, দ্রষ্টব্যও চায়। তাই, আধ্যাত্মিক ধর্ম্মও রূপকবাহুল্যে বা ভাষার দোষে সহজেই পুরাণে পরিণত হইয়া যাইতে পারে। একজন ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মদিগের উপাস্যকে নিরাকার বলা যায় না। কেন না, ব্রহ্মসঙ্গীতে দেখা যায়, যে ব্রহ্মের মুখ চোখ হাত পা সবই আছে। তবে যে পেটের উল্লেখ নাই, তাহা কেবল খেতে দিতে হবে, এই ভয়ে। ব্রহ্মসঙ্গীত হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া এক দল ব্রাহ্ম যদি বলে, যে তাহারা সাকার উপাসক, তাহা হইলে প্রতিবাদ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বাহ্য পূজার দেশে সাকারবাদীদের দলে পুষ্ট হইয়া নিরাকারবাদীদিগকে এক ঘরে (Heretic) করিয়া দেওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। খৃষ্টধর্ম্মের উৎপত্তি বাস্তবিক এই প্রণালীতেই হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের বিবর্ত্তনের এক অধ্যায়ে দেখা যায়, পরম পুরুষের তিন ভাব—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্। জগতে যে রূপ তাহাই ব্রহ্ম নামে অভিহিত, জনসমাজে লীলাময় ভগবান্। ব্যক্তির মধ্যে আত্মারূপে পরমাত্মা আবির্ভূত—"যত্র জীব

তত্র শিবরূপে নারায়ণ।" কিন্তু এই সর্ব্বভূতান্তরাত্মা নারায়ণকে প্রাচীন সৌর দেবতা বিষ্ণুর সঙ্গে একীভূত করিয়া তাঁহার অবতার কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক রূপ দিয়া উপস্থিত করা হইয়াছে, মানুষের চক্ষু-কর্ণের তৃপ্তি সাধিত হইতেছে। অথচ একদল লোক এমন আছেন, যাঁহারা অবতার মানেন না, কিন্তু ঐতিহাসিক পুরুষকে মানেন। অবতারের জন্যই কিন্তু একটা রূপক বা রূপক-সমষ্টির এই ঐতিহাসিক কল্পনা। অথচ অবতার মানি না, কিন্তু মানি অবতারের জন্য যে কল্পনাটা আবশ্যক হইয়াছিল। ইহারা ভুলিয়া যান, এস্থলে মানুষকে দেবতা করা হয় নাই, দেবতাকেই মানুষ গড়িয়া তোলা হইয়াছে। ঈশ্বর মানুষ নন, সুতরাং ইতিহাসটা নিছক্ কল্পনা। কৃষ্ণ সম্বন্ধে যাহা, যিশু সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছে। ব্রহ্মের যে জীবাত্মায় প্রকাশ, ইহাই খৃষ্ট। এই খৃষ্ট সম্বন্ধে নষ্টিক্ ও নবপ্লেতনিকদিগের মধ্যে বহু রূপক প্রচলিত ছিল। ইহার মধ্যে অনেক জ্যোতিষিক রূপকও মিলিয়া গিয়াছিল। একদল লোক যখন এই রূপককে বাস্তব রূপ দিয়া খৃষ্টকে যিশু নামক এক প্রাচীন দেবতার সঙ্গে এক করিয়া ঐতিহাসিক পুরুষরূপে উপস্থিত করিলেন, তখন এই আখ্যান বহু লোকের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইল। যিশু-দেবতা বহু সম্প্রদায়ের উপাস্য ছিলেন। এক সম্প্রদায়ের উপাস্যের নাম ছিল "Jesus, the God of the Hebrews." এই নামের জোরে ভূত ছাড়ান হইত। খৃষ্টীয় শাস্ত্রে কেন যে যিশুকে ভূতের ওঝা বানান হইয়াছে এবং যিশুনামে কেন ভূত ছাড়ে—এইখানে তার নিদান। বহু লোক এই মত গ্রহণ করিল, কিন্তু সকলে গ্রহণ করিল না। যাহারা গ্রহণ করিল না, তাহাদিগকে গালাগালি দিয়া সমাজ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। কেন না, গ্রহণকারীরা দলে ভারী। যোহনের দ্বিতীয় পত্রে আছে—"Many deceivers are gone forth into the world, even they that confess not that Jesus Christ cometh in the flesh" অর্থাৎ যাহারা বিশ্বাস করে না, যে খৃষ্ট রক্তমাংসের দেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন, তাহারা মহাপাপী। যোহন বলিয়াছেন, ইহাদের সংসর্গ করাও পাপ। সুতরাং ইহাদিগকে কখনও ঘরে স্থান দিবে না। পক্ষান্তরে, দলের লোকদের ঘরে স্থান দেওয়ার মত পুণ্য আর নাই—অর্থাৎ একটা heresy পরিণত হইল orthodoxyতে এবং তাহাই হইল খৃষ্টধর্ম্ম।

এ দিকে এই সময়ে রোমানদিগের অত্যাচারে উৎপীড়িত ইহুদা মেসায়া-

বাদিগণ হঠাৎ প্রচার করিয়া দিয়াছিল, যে মেসায়া (Messiah) আসিয়া গিয়াছেন। মানুষ যখন সংসারে আশা দেখে না, তখন দৈব উপায়ে আশার পূর্ণতা দেখিতে চায়। আমরাও জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগে মার ধর খাইয়া 'স্বরাজ্য' আসিয়া গিয়াছে বলিয়া হঠাৎ ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলাম। এই খৃষ্টপূর্ব্ব ইহুদা Messianist অথবা Christistদের নানা দল ছিল। তাহাদের মধ্যে অনেক সময়ে বিরোধ হইত। তাহাদের মধ্যেও Messiahর প্রকৃতি-বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ ছিল। ইহাদের প্রচারক-দলও ছিল। অনেকে মনে করেন, পিটার পল প্রভৃতি সেই সব বিরুদ্ধদলের প্রচারক ছিলেন। পরে তথাকথিত খৃষ্টধর্ম্ম গড়িয়া উঠিলে ইহাদিগকে টানিয়া লওয়া হইয়াছে। আর একটী যিশুসম্প্রদায় ছিল, যাহারা পৌত্তলিকদিগকে ঘৃণা করিত—যেন কুষ্ঠরোগাক্রান্ত। বাইবেলে যে দেখি যিশু অনেক রোগ আরাম করিতেছেন, তাহা পৌত্তলিকদের খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রহণ। রাজারা পৌত্তলিক, সুতরাং আকার ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে—"ভয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর"। আর একদল গুপ্তসাধক-সম্প্রদায় ছিল, যাঁহারা দ্বাদশজন ও পুরোহিত একত্র হইতেন। পুরোহিত ছিলেন ইষ্টদেবতার স্থানীয়। সেখানে 'পারণ' হইত। পুরোহিত খাদ্যে আপন রক্ত দিতেন এবং সকলে প্রসাদ পাইয়া দেবতার সঙ্গে একত্ব সাধন করিতেন। খৃষ্টধর্ম্মে ইহা কি আকার পাইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। এইরূপে ইষ্টদেবের সঙ্গে একত্ব সাধন অতি প্রাচীনকাল হইতে সাধনার অঙ্গরূপে চলিয়া আসিয়াছে। ইহা পরে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় শুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। যিশু-("Jesus Barabbas, Jesus the son of the Father") বলি (Crucifixion) একটা পর্ব্ব ছিল। প্রথমতঃ নরহত্যাই হইত—প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামী বা মূল্য দিয়া ক্রীত মানুষই বলি পড়িত। বাইবেলের যিশুতে দুই তত্ত্বেরই মান রক্ষা করার চেষ্টা হইয়াছে। এব্রাহাম কর্ত্তৃক আইজাকের কোর্‌বাণি স্মরণ করিয়া বোধ হয় এই পর্ব্বের সৃষ্টি। পরে অভিনয়ে পরিণত হয়। খৃষ্টপুরাণে অভিনয়-ভাগও আছে। এমন করিয়া রাজা সাজিয়া জেরুসালেমে প্রবেশ যদি অভিনয় না হইবে তবে রোমান্‌ গবর্ণর বিনা বিচারে ধরিয়াই ক্রুশে চড়াইতেন। নহিলে তাঁহার নিজের গর্দ্দান্‌ থাকিত না। আমাদের দেশেও মেটে হোলির রাজা গাধায় চড়িয়া নগর প্রদক্ষিণ করে। বলির পাঁঠাকেও তো ঢাক ঢোল বাজাইয়া শোভাযাত্রা করিয়া যূপকাষ্ঠের নিকটে লওয়া হয়! যাহারা রাজ-সম্মানে তাঁহাকে জেরুসালেমে

লইয়া আসিল, তাহারাই কেন "crucify him, crucify him" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল? এ চিৎকার ঐ পর্ব্বের অঙ্গ। যাহারা বলির পশুর সঙ্গে কাঁসর ঘণ্টা বাজাইয়া আসে, বলির সময় আগত হইলে তাহারাই তো "বলি দাও, বলি দাও" বলিয়া চীৎকার করিবে। উৎসৃষ্ট পশুকে বলি না দেওয়াইয়া ছাড়িবে না। Sir Frazer একজন অতি শ্রেষ্ঠ পুরাণ-বিজ্ঞানবিদ্। তিনি দুই দিক্ বজায় রাখিতে যাইয়া তাঁহার Golden Bough নামক যুগান্তরকারী অতি বৃহৎ গ্রন্থে বলিয়াছেন, যে ঐ বিশেষ বৎসরের পর্ব্বে যিশু নামক একজন নীতিবিদ্‌কে সকলে চক্রান্ত করিয়া ক্রুশে চড়াইয়াছিল। তিনিও নিজের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই পুরাণকে ইতিহাস বলিতে অগ্রসর হইয়াছেন; জনমতের প্রভাব বৈজ্ঞানিককেও রেহাই দেয় না। ইহা অপেক্ষা অনেক অল্প প্রমাণে অন্য দেশের ইতিহাস-বলিয়া-মানিত আখ্যায়িকাকে পৌরাণিক বলিতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই। যখন সে দিনও ইতিহাসবেত্তা মোসেম (Mosheim) জুশদেব (Zeus), মার্কারি (Mecury) প্রভৃতিকেও ঐতিহাসিক পুরুষ বলিয়াছেন, তখন যিশুকে পৌরাণিক বলিয়া সাব্যস্ত করিতে আরও যে কিছুদিন লাগিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে যাঁহারা নানা দেশের পুরাণ তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন এবং যাঁহাদের যিশুকে পৌরাণিক বলিতে ধর্ম্মের বাধা নাই, তাঁহাদের বুঝিতে বিলম্ব হইবে না, যিশুদেবও এডোনিস্, অশিরীশ্, মিথ্র, ডাইওনিসস্ প্রভৃতি দেবতার সমপর্য্যায়ভুক্ত এবং ইঁহারা সকলেই যিশুর বহু পূর্ব্ব হইতে জগতের ত্রাণের জন্য পিতৃ-আদেশে মানবী কুমারীর গর্ভে দেবের ঔরসে ২৫সে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করিয়া অল্প বয়সে প্রাণ দিয়া কবর হইতে উঠিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন। কথা আছে, "বা'ণে বা'ণে জল লয়, ডগ ড়ায় যাইয়া এক খানে হয়" খৃষ্টধর্ম্মের আখ্যান-ভাগ সেই ডগ্‌ড়া যাহাতে সকল পুরাণ হইতে জল একত্রিত হইয়া খৃষ্টপুরাণ রচিত হইয়াছে। সকল কথার বিস্তৃত বিবরণের অবসর এখানে নাই।

খ। দার্শনিক আলোচনা

অবতার

ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। যাঁহারা ইচ্ছা করেন লেখকের *"In Search of Jesus Christ."* পাঠ করিতে পারেন। অবতার-কল্পনায় ধর্ম্ম-জীবনের যে অনিষ্টের সম্ভাবনা, এবং ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র না করিলেও যে মানুষের আধ্যাত্মিকতার পথ উন্মুক্ত থাকে, সেই সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। মানব ইতিবৃত্তে বিধাতার লীলা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু মানবের অনন্ত জীবনকে ইতিহাসের কোন এক গ্রন্থির সঙ্গে আট্‌কাইয়া দিয়া ভগবানের লীলা দর্শনের সাধ মিটাইতে যাওয়া দূরদৃষ্টির পরিচায়ক নহে। ইহা দ্বারা কোনও বিশেষ ঐতিহাসিক ধর্ম্মের পক্ষপাতিত্ব ছাড়া আর কিছু প্রমাণিত হয় না। অন্ততঃ বর্ত্তমান যুগের মানুষ এতটা অগ্রসর হইয়াছে যাহাতে ইহা বলা চলে না, যে কোন ঐতিহাসিক ধর্ম্মের পথ অবলম্বন না করিলে সে ধর্ম্মজীবনে চলিবার পথ দেখিতে পাইবে না। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি দেখিতে পান এবং সকল মানুষেরই চক্ষু রহিয়াছে। যদিও দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, যে ধর্ম্মবিষয়ে চক্ষু-থাকিতে-অন্ধ লোকের সংখ্যা বিস্ময়করব্রূপে অধিক,—তাহারা অবশ্য দেখিতে পান না, যে সমগ্র ইতিহাসটাই ভগবানের ক্রীড়া ক্ষেত্র। অনন্ত দেশকালে তাঁহার অনন্ত লীলা স্রোত অবিরলধারে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। এরূপ মনে হওয়া একেবারে অস্বাভাবিক নহে, যে ঐ স্রোত একটু খরবেগে বহিয়া কখনও বা দেশ-কালের সীমাকে অতিক্রম করিতেছে। কেন না, মানুষের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ। কিন্তু এরূপ হওয়া অসম্ভব, যে বিধাতা অনন্ত অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎকে টানিয়া আনিয়া এক ঐতি-হাসিক ঘটনার সঙ্গে বাঁধিয়া দিবেন। যে অনন্ত দেবতা ইতিহাসকে আপনার প্রকট মূর্ত্তিরূপে গড়িয়া তুলিতেছেন, তিনি মানুষকে কোনও একটা ঘটনা বা ঘটনাবলির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দিয়া নিজেকে পঙ্গু করিতে পারেন না। তিনি কখনও বলিতে পারেন না, এই কেতাবখানা আমার শেষ বাণী, এই মানুষে আমার শেষ অভিব্যক্তি। এ মত ইতিহাস হইতে ভগবানকে নির্ব্বাসিত করার নামান্তর মাত্র। মানুষের বুদ্ধি সর্ব্বদাই ঘটনার অন্তরালে যে 'অর্থ' রহিয়াছে তাহা ধরিতে সমর্থ

নহে বলিয়া তাহার ইতিহাসে ব্রহ্মদর্শনের পথে বাধা উৎপন্ন হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু যে আধ্যাত্ম-দৃষ্টিসম্পন্ন ধার্ম্মিক ব্যক্তি ইতিহাসের ধারার মধ্যে এক জ্ঞানময়ী ইচ্ছা-শক্তির প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন এবং নিজেরও পার্শ্ববর্ত্তিগণের জীবনে ইহার ক্রম-বিকাশ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি কখনও এই ধারার ছেদ স্বীকার করিতে পারেন না। এরূপ ছেদ স্বীকার আর জগদাত্মাকে অস্বীকার একই কথা। সুতরাং যিনি জগতে এক অখণ্ড অদ্বৈত তত্ত্বের পরিচয় পাইয়াছেন তাঁহার পক্ষে মহাপুরুষীয় ধর্ম্ম কেবল অনাবশ্যকীয় নহে, নিতান্ত অনিষ্টকর। বর্ত্তমানযুগে সর্ব্ব বিভাগেই এই অদ্বৈত তত্ত্ব বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। ঐতিহাসিক ধর্ম্ম এ যুগের ধর্ম্মজীবনের ঘাড়ে ইতিহাসের বোঝা চাপাইয়া ইহার উন্নতির অন্তরায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান ক্রমোন্নতি যুগের মানুষ সর্ব্ববিষয়ে অতীতকে অতিক্রম করিয়া কেন যে আপনার ধর্ম্মজীবন-বিষয়ে অতীতের প্রাধান্যের বোঝা সেই 'সামুদ্রিক বৃদ্ধের' ন্যায় স্কন্ধে করিয়া অগ্রসর হইবে, তাহার কোনই যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। ইহাতে মানব জীবনের পক্ষে সমূহ ক্ষতি এই হইতেছে, যে চারিদিকের জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সুফল ধর্ম্মজীবনে কার্য্যকরী হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। হায়! সর্ব্বক্ষেত্রে মানুষ স্বাধীনতাকে বরণ করিয়া লইবার জন্য উদ্বুদ্ধ হইলেও আপনার এই ধর্ম্ম-শৃঙ্খলটার প্রতি এমন সস্নেহ দৃষ্টি করিতেছে কেন? আশার কথা, ইস্‌লামও আজ তার একটা শৃঙ্খল সজোরে ছিন্ন করিয়াই যেন উঠিয়া দাঁড়াইতেছে।

মহাপুরুষের স্থান কোথায়?

অবশ্য, ইহাতে কেহ মনে করিবেন না, যে ধর্ম্মজীবনে মহাপুরুষ দিগের স্থান অস্বীকৃত হইতেছে। মহাপুরুষদিগকে মান্য করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিবার অধিকার টুকুই কেবল দাবী করা হইতেছে মাত্র। আমরা থিওডোর পার্কারের এই অমূল্য উপদেশ এত সত্বরই ভুলিয়া যাইতে পারি না, যে "I am more to myself than Jesus, Moses, or Paul". মানুষ এ অধিকার কখনও ছাড়ে নাই, জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে এ অধিকার চিরদিন ভোগ করিয়া আসিতেছে। তবে অন্য সকল অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের হাতে কলমে যে পরিমাণ আগ্রহ দেখা যায়, এ বিষয়ে সেই পরিমাণে উৎসাহের অভাবই লক্ষিত হয়। পরন্তু একটা অস্বাভাবিক লাজুক-

তাই যেন বর্ত্তমান। কাজে যাহা করা হয়, কথায় তাহা স্বীকার করিতে একেবারে নারাজ। এ ক্ষেত্রে সত্যের উপর সৌজন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। মানুষ মহাপুরুষদিগকে গড়িয়াছে—এই কথার মধ্যে তিল-মাত্রও অত্যুক্তি নাই। মহাপুরুষ বলিয়া আজ মানুষ যাঁহাদিগকে মানিতেছে, তাঁহাদিগের জীবনকথা পরিণামে যে আখ্যায়িকায় পরিণত হইয়াছে সেই আকার ধারণ করিবার পূর্ব্বে স্বপক্ষ ও বিপক্ষের—কোন মহাপুরুষই নির্ব্বিবাদে গৃহীত হন নাই, সুতরাং উভয় পক্ষের—ঘাত-প্রতিঘাতে উহা গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। বিপক্ষের আক্রমণের উত্তর দিতে যাইয়া ভক্তদল মহাপুরুষকে যে যথেষ্ট গড়িয়া তুলিয়াছে, ঐতিহাসিক সমালোচনা চোখে আঙ্গুল দিয়া আজ তাহা দেখাইয়া দিতেছে। তাহারা যে সব ক্ষেত্রে প্রবঞ্চনা করিয়াছে, তাহা নহে। ইচ্ছাই দৃষ্টিকে নিয়মিত করিয়াছে—যেমনটি দেখিলে ভাল হয়, তেমনটিই দেখিয়াছে—"Wish is the father of thought" এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কার্য্য করিয়াছে। শিষ্যানুশিষ্যগণ আপনাদের ধর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতায় যে তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন বা মণ্ডলীর পক্ষে উপকারী মনে করিয়াছিলেন, তাহাই ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বা তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণের মুখ দিয়া বলাইয়া লইয়াছেন। ইহাই ইতিহাস। ইঁহাদের জীবনবৃত্ত বহু পরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এখনকার মত ছাপাখানা ছিল না যে সহস্র খণ্ড একবারে ছাপাইয়া দিলাম, নূতন কিছু ইহার মধ্যে প্রবেশ করাইলে সহজেই ধরা পড়িবে। মুখে মুখেই বহুদিন থাকিত—পরিবর্ত্তন অতীব সহজ ছিল। যখনও বা এক আধ খণ্ড লেখা হইত—নকল করিতে যাইয়া নকলকারী আপনার ইচ্ছানুসারে অনায়াসেই পরিবর্ত্তন করিতে পারিত। আবার কখনও বা এক পক্ষ প্রবল হইয়া অপর পক্ষের মতামত পুড়াইয়া দিত। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মোন্মাদগণ যে ৩য় শতাব্দীতে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার বিখ্যাত লাইব্রেরী পুনঃ পুনঃ পুড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে প্রয়াস যে খৃষ্টধর্ম্মের প্রকৃত ইতিহাস বিনাশ করিবার চেষ্টা-প্রণোদিত নহে, তাহা হলপ্ করিয়া বলা যায় না। এই রূপে সত্য বিনষ্ট হইয়া কত জায়গায় মিথ্যাই সত্যের স্থান অধিকার করিয়াছে। খৃষ্টের ঐতিহাসিকতায় বিশ্বাস করেন এমন অনেক মহা মহাপণ্ডিত যে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, গস্পেল্ গুলি হইতে খৃষ্টের কোনও উক্তি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া প্রমাণ

করিতে যাওয়া দুরাশা মাত্র, তাহার যথেষ্ট হেতু বর্ত্তমান রহিয়াছে। কাল-ক্রমে বিরুদ্ধবাদী খৃষ্টীয় সম্প্রদায়সকলের মত সকল একত্রিত করিয়া যখন জীবনবৃত্ত লেখা হইল, তখন জীবনীতে শত অসামঞ্জস্য স্বতঃই রহিয়া গেল। বহু লিপির মধ্য হইতে প্রথমে তিন পরে এক, আপনাদের উদ্দেশ্য-সাধনোপযোগী এই ৪ খানা বাছিয়া লইলেও যিশুজীবনে এত সব মারাত্মক স্ববিরোধ রহিয়া গিয়াছে যাহা প্রকৃত (actual) জীবনে কখনও ঘটিতে পারে না। যিশুর জীবনে যে pro-Gentile কিম্বা anti-Gentile, pro-Judaic এবং anti-Judaic ভাব পাশাপাশি রহিয়াছে অথবা পিটার ও পলের মধ্যে যে অসঙ্গতি দেখা যায়, তাহা পরবর্ত্তী দলাদলির ফল। এরূপ অসঙ্গতি প্রকৃত জীবনে অসম্ভব। বিরুদ্ধ-বাদী উভয় দলই নিজেদের বিসম্বাদী মত গুরুর মুখে দিয়াছে, তাই এত অসামঞ্জস্য। হীনযানবাদীরা বুদ্ধের মুখ দিয়া শূন্যবাদ বলাইয়া লইয়াছে। মহাযানের আস্তিক অবতারবাদে সব তত্ত্বই আছে; বুদ্ধের মুখ দিয়াই দুই দিক্‌কার কথা বলাইয়া লওয়া হইয়াছে। এই পরস্পর-বিধ্বংসী দুই বুদ্ধ কিন্তু একই ব্যক্তিতে আরোপিত! এখন যাঁহারা যিশু-বা বুদ্ধ-চরিত লেখেন, তাঁহাদিগকে Logic ও Psychology দুই-ই ভুলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তির অনুরোধে শস্যের সঙ্গে—যদি কিছু শস্য থাকে—খোসা ও বীচি সবই হজম করিতে হয়।

আমরা এই বিংশ শতাব্দীতেই চক্ষের উপরে মহাপুরুষগঠন যেমন দেখিতেছি ও দেখিয়াছি তাহাতে আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে যে সকল আখ্যায়িকা এই কিছু দিন পূর্ব্বেই শুনিলাম—তাঁহার ক্ষমতা ও কার্য্য বিষয়ে—সে সকল একত্র লিপিবদ্ধ করিলে তিনি প্রাগৈতিহাসিক মহাপুরুষ দাঁড়াইয়া যান। এক কথা একবার যা লিপিবদ্ধ হয় বা লোক-মুখে রটিত হয়, তাহা বিশ্বাস করিবার, এমন কি যুক্তি বা ইতিহাস সহযোগ তাহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার—উহা যতই মিথ্যা হউক না কেন—একদল লোক সব যুগেই মিলিবে। অন্যদিকে আবার, কথা একবার লিপিবদ্ধ হইয়া গেলে তাহা যতই অসুবিধাজনক হউক না কেন, উহার হস্ত হইতে আর নিস্তার নাই। আমরা বর্ত্তমান সময়ে সংযত সেন, লেনিন ও আনোয়ার পাশা প্রভৃতির মৃত্যু ও পুনরাবির্ভাবের "খাটি খবর" একাধিকবার পাইয়াছি। ইহাদের কেহ পরিণামে

মহাপুরুষ হইলে, ইহাকে শত্রুরা কতবার হত্যা করিয়াছে এবং ইনি কতবার কবর হইতে পুনরুত্থান করিয়াছেন”, এই মহা ঐতিহাসিক সত্য সন তারিখ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সহ তাঁহার জীবনীতে স্থান পাইতে কসুর করিবে না। আজ জগতদ্ব্যাপী এক মহা সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের সূচনা হইয়াছে। ইহার ফলে যদি একটা যুগান্তর উপস্থিত হয়, তবে ইহার নায়করূপে এক জন মহাপুরুষ খাড়া করান দরকার হইয়া পড়িবে। কেন না, সভ্যতাভিমানী মানুষ আজও সেই অসভ্য মানুষের ন্যায় ভাব (Idea) অপেক্ষা ব্যক্তির (personality) মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকে। সে মহাপুরুষ কোন ব্যক্তি বিশেষ হইবেন না—জগতের সব মহাপুরুষই বহু পুরুষের সংঘাত। যিনিই এই ক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছেন, তিনিই এই ভাবী **যিশুখৃষ্টের** মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইবেন। বিশেষ ভাবে লেনিন, আনোয়ার পাশা, কামাল পাশা, Wilson, Lloyd George, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর নাম উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা John the Baptist এর কাজ করিয়া গিয়াছেন তাঁহারাও যে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিবেন না, তাহা নহে। সেই জন্যই এ খৃষ্টও বাইবেলোক্ত যিশুরই ন্যায় নানা অসঙ্গতি-দোষ-দুষ্ট হইবেন। ব্যক্তিবিশেষে এরূপ অসঙ্গতি অসম্ভব। তিনি ব্যক্তি নহেন, ব্যক্তি-সঙ্ঘ। ইনি প্রজাপতি বা Logos. মহামন্বন্তর যুগে যুগান্তরকারী ঋষি এইরূপেই গঠিত হয়েন।

যাহা হউক, মহাপুরুষকে অতিক্রম করিয়াই যে মানুষ মহাপুরুষ পাইয়াছে, এই কথাটা সে নিজের কাছে স্বীকার করিতে চায় নাই বলিয়াই সে মহাপুরুষরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে। এই শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হওয়ার নাম অতীতের উপর বর্ত্তমানের প্রতিষ্ঠা। এই কথাটা স্বীকার করিতে মানুষ যেন কেন একটু বিশেষ সঙ্কোচ বোধ করে। যে উচ্চ কণ্ঠে বলিবে, আমি কল্পনানেত্রে দেখিতেছি ভবিষ্যৎ অতীত অপেক্ষা শতগুণে মহিমান্বিত, সেও অতীত অপেক্ষা বর্ত্তমানের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত, যেন অতীত বর্ত্তমানের মধ্য দিয়া না গিয়াই ভবিষ্যতে উপনীত হইবে। বর্ত্তমানের যে সবটাই চোখে পড়ে! কিন্তু অতীতের খোসাটা বর্জ্জন করিয়া কেবল সারটাই দেখি—চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেও অন্য চিত্রটা দেখি না—সীতাকে দেখি, শূর্পনখা মনে থাকে না। যুধিষ্ঠিরকে দেখি, তাও তাঁর ভালটুকু—দুর্য্যোধন চোখে পড়ে না। ভবিষ্যতের কল্পনায় ভাবি, ও

খোসাটাও সারে পরিণত হইয়া যাইবে। মানুষ কল্পনা-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িয়াছে, বাস্তবকে মূল্য দিতে বিশেষ কৃপণতা করিতেছে। আমরা কিন্তু মহাপুরুষকে তাঁহার সব টুকু প্রাপ্য সম্মান দিতেই প্রস্তুত আছি, কিন্তু সত্যের অপলাপ করিতে প্রস্তুত হইব না। প্রচলিত মহাপুরুষ-পূজায় অতীতকে যে বর্ত্তমানের উপর প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়, দেশ-কালাতীতকে যে দেশ-কালের সীমায় আবদ্ধ করা হয়, ইহাকেই আমরা সত্যের অপলাপ বলিতেছি। নতুবা সাধারণ ধর্ম্মজীবনে মহাপুরুষের উপকারিতা অস্বীকার করিবার কোনই হেতু নাই। নিভৃতে আপনার আত্মার মধ্যে "সোঽহম্" বা "আনাল্ হক্" উপলব্ধি করিয়াছেন, এমন মানুষের সংখ্যা যে কিছু কম, তা নয়। ইহাতে সর্ব্বসাধারণের বিশেষ উপকার হয় না। কিন্তু যদি এমন একটী আদর্শ চরিত্র গঠন করা যায়, যাহার রূপ মানব অন্তরকে স্পর্শ করে এবং সেই চরিত্রের মধ্য দিয়া যদি বাহির হয়, "I and my father are one", তাহা হইলে জীব-ব্রহ্মের একত্বের ছাপ মানুষের মনে বদ্ধমূল হইয়া যাইবার কথা। ইহা দ্বারা শত পাপ-তাপগ্রস্ত সাধারণ মানুষের কাছেও তাহার নিজের দেবত্ব স্পষ্টীকৃত হইয়া উঠে। সে ভরসা পায়—"What man has done, man can do". অন্য দিকে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়, ভগবান্ জগৎকে পরিত্যাগ করেন নাই—যথা সময়ে "আত্মাকে" সৃজন করিতে তিনি ভুলেন না। (গীতা)। ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনটাই তার সর্ব্বস্ব নয়, জগদাত্মার সঙ্গে সে জীবন্ত অধ্যাত্মযোগে আবদ্ধ। "ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"র এই আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিন্তু ইহার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই সজাগ থাকিতে হইবে। খৃষ্টধর্ম্মে ইহার প্রায় সার্ব্বভৌমিক অপব্যবহারে ধর্ম্ম-জগতের মহা অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। সুতরাং খৃষ্টীয় অবতার-তত্ত্বের আলোচনা কেবল একটা ঐতিহাসিক তত্ত্ব নয়, একটা মস্তবড় ধর্ম্ম-নৈতিক দার্শনিক প্রশ্নও বটে।

খৃষ্টধর্ম্মের যাহা বিশেষত্ব তাহা তাহার একচেটিয়া নিজস্ব নহে। "The idea of a suffering god, sacrificing himself for humanity and obtaining spiritual healing for man by his death and his subsequent resurrection" খৃষ্টধর্ম্ম পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মসকল হইতে গ্রহণ করিয়াছে, নিজে সৃজন করে নাই। এ তত্ত্বের আদি সূত্র

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে অন্বেষণ করিলে যে মিলিবে না, তাহাও নহে। ফ্রিজিয়া, সিরিয়া, মিসর, গ্রীশ প্রভৃতি দেশের ধর্ম্মের মধ্যে আত্তিশ (Attis), আদোনিস্ (Adonis), অসিরিশ্ (Osiris), দিওনিসশ্ (Dionysos), এবং আরও অন্যান্য দেবতারা যিশুরই ন্যায় জীবন দিয়া মানবের হিত সাধন করিয়া গিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা রহিয়াছে। ইহা প্রাকৃতিক ঘটনানিচয়ের রূপক-বর্ণনা। সূর্য্যের আবির্ভাব তিরোভাব, প্রকৃতির উপর শীতঋতুর আধিপত্য, শীতের উপর বসন্তের জয়লাভ, বাসন্ত সূর্য্যের অভ্যুদয়ে শীতের পরাভব,* উক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের বর্ণিতব্য বিষয়। খৃষ্টধর্ম্ম বিষয়টিকে একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক আকার দান করিয়াছে—সকল দেবতাকে একত্রিত করিয়া এক নরদেবতা যিশুতে পরিণত করিয়াছে মাত্র। এই আধ্যাত্মিক ভাবটিও, যাহাকে বলি খৃষ্ট-ধর্ম্ম, ইতিহাসের ধারায় উহার মধ্যেই প্রথম আবির্ভূত হয় নাই। ইহুদী জাতির প্রাচীন বিধানের মেরুদণ্ডস্বরূপ ঋষি আইজায়া (Isaiah) জগতের ত্রাণকর্ত্তারূপে যে "Servant of God"এর অবতারণা করিয়াছেন, যিশু-চরিত্রের মূল অংশ গুলি তাঁহার জীবন হইতে গৃহীত। বিশেষতঃ যিশুর পূর্ব্বে আলেক্জান্দ্রিয়ার নষ্টিকগণ (Gnostics) নরদেব খৃষ্টের উপাসক ছিলেন। যিশুর নামটিও নূতন নহে। ইহুদা দেশে যিশুদেবতার অনেক উপাসক-সম্প্রদায় ছিল। খৃষ্টধর্ম্ম এই নরদেবতাকে এক ঐতিহাসিক পুরুষরূপে খাড়া করিয়া প্রাচীন বহুদেববাদী ধর্ম্মসকলের উপর টেক্কা দিয়াছিল। তবুও মিথ্র-ধর্ম্ম (Mithraism) চারি শতাব্দী ধরিয়া খৃষ্ট-ধর্ম্মের সঙ্গে সমানে যুঝিয়াছে। এ কথা ঠিক নয়, যে মিথ্র কাল্পনিক বলিয়া ঐতিহাসিক যিশুর সঙ্গে পারিয়া উঠিলেন না। আসল কথা, যিশু-চরিত্র মিথ্রের তুলনায় যেমন উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত, মিথ্র-চরিত্র তেমন নয়। খৃষ্টধর্ম্মের তুলনায় মিথ্র-ধর্ম্মের অধিকতর গুপ্ত-সাধন-প্রবণতা তাহার বহুল প্রচারের পরিপন্থী হইয়াছিল। যাহা হউক, এতদ্দ্বারা যদি কিছু প্রমাণিত হয়, তাহা এই—যে ধর্ম্মসংগ্রামে বস্তুতন্ত্রতা বেশী কার্য্যকরী হয়। এ ক্ষেত্রে কিন্তু পণ্ডিতেরা

আধ্যাত্মিক ভাবের ঐতিহাসিক রূপ

* আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই তত্ত্বটি সম্যক্ হৃদ্গত হইবে না। শীতের যে কি অত্যাচার তাহা উত্তরদেশবাসীর প্রত্যক্ষ। তিলক মহাশয়ের *Arctic Home in the Vedas* পাঠ করিলে উহা কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

অনুমান করেন, একটী আগন্তুক কারণে খৃষ্টধর্ম্ম জয়যুক্ত হইয়াছিল। যদি মিথ্র-ধর্ম্মের প্রধান পাণ্ডা রোম সম্রাট্ জুলিয়ান্ অকালে কালগ্রাসে পতিত না হইতেন তবে খৃষ্টধর্ম্মের জয়াশা ছিল না। সে কালের কথা ছাড়িয়া দিয়া এই জ্ঞান বিজ্ঞানালোকিত যুগে, যখন মানুষ ভূকেন্দ্রিক সৃষ্টি-তত্ত্ব ছাড়িয়া দিয়াছে, মানুষই যে সৃষ্টির আদি অন্ত মধ্য সে বিষয়েও সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন এই পৃথিবী-ছোয়া স্বর্গ হইতে ঠাকুর নামিয়া আসিয়া মানুষের পরিত্রাণের যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, সেই ব্যবস্থাটা ধরিয়া থাকায় মানুষের মুক্তির পথটা যে সুগম হইতেছে না, তাহা নিশ্চয়। বিশেষতঃ যে সময়ে ঐতিহাসিক সমালোচকগণের আলোচনার ফুৎকারে ঐ নরদেবতার ঐতিহাসিক অস্তিত্বও উড়িয়া যাইতেছে। অন্য দিকে, কেবল মাত্র একজন ঐতিহাসিক মানুষকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের মুক্তিতত্ত্ব আর বসিয়া থাকিতে পারিতেছে না। মানুষ কেন অতীতের ঘটনা বিশেষের সঙ্গে আপনাকে এমন জড়িত করিবে? দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার শিক্ষা দীক্ষা যাহা বর্ত্তমান অপেক্ষা বাস্তবিকই হীন তাহাকেই মানুষ আদর্শ ধরিয়া বসিয়া থাকিবে না। অথচ এই ঘটনাটির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধেই গুরুতর প্রশ্ন। এই সন্দেহাত্মক পথে কখনও মানুষ মুক্তির জন্য ছুটিতে পারে না। কবে কোথায় একজন মানুষ—যদিই বা সত্য হয়—ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিল, তাহাই বিশ্বাস করার উপরে আমার ধর্ম্মজীবনকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিতে হইবে—ধর্ম্মজগতে ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর জড়বাদ কি আছে তা জানি না! কেন? আমার মধ্যে যে লীলাময় ভগবান্, নিত্যক্রিয়াশীল ব্রহ্ম সকল জ্ঞানধর্ম্মের উৎসরূপে বর্ত্তমান, তিনি কি আমার ধর্ম্মজীবনকে অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছেন না? এই বিশ্বাসকে আত্ম-প্রতারণা ছাড়া আর কি বলিব, সে আত্মপ্রতারণা যতই অজ্ঞাতসারে কাজ করুক না কেন, যে ব্যক্তি-বিশেষের রক্তের ধারা দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া মানবের ধর্ম্মজীবনকে গঠন করিয়া চলিতেছে। ধর্ম্মের প্রধান কার্য্যই হইল মানুষকে অন্তর্মুখীন করা, চির পরিবর্ত্তনশীল এই বাহ্য-জগৎ-নিরপেক্ষ করা। সুতরাং ইতিহাসের একটা বিশেষ ঘটনা—ব্যক্তিবিশেষের জন্ম ও মৃত্যু যাহার ঐতিহাসিকতাও বিচারসাপেক্ষ এবং যে কোন মুহূর্ত্তে তাহা কাল্পনিক বলিয়া ধরা পড়িতে পারে; এমন একটী ঘটনা অনন্ত জীবনপথের যাত্রী মানবাত্মার ধর্ম্ম-বিশ্বাসের

ধর্ম্ম ইতিহাসে না অন্তরে?

ভিত্তি কিরূপে হইতে পারে? ধর্ম্মজীবনে মানুষ বরং ইতিহাসকে বর্জ্জন করিয়াই চলিবে, আপনার মধ্যে আত্মজীবন যাপন করিবার জন্য বহির্জ্জগতের বন্ধন হইতে মুক্তিই কামনা করিবে। সুতরাং নিঃসন্দেহ-রূপে ঐতিহাসিক হইলেও কোন ঐতিহাসিক ঘটনা ধর্ম্মজীবনের চাবি-কাঠি হইতে পারে না, কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি মনের কি ভাব তাহার উপর মানবের মুক্তি নির্ভর করিতে পারে না। মুক্তির চাবিকাঠি প্রত্যেক মানুষের ভিতরে। ঐ অন্তরাত্মার স্পষ্ট বাণী শুনা যাইতেছে:

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

ইহাই মোক্ষপথের একমাত্র সম্বল এবং ইহাই অপৌরুষেয় বাণী! যত বড় করিয়াই কল্পনা কর না কেন কোন, 'যিশুখৃষ্ট' এই অন্তরাত্মার স্থান গ্রহণ করিতে সমর্থ নহেন। জানি না, কেন মানুষ প্রত্যক্ষ সত্যকে পরিত্যাগ করিয়া কল্পনা লইয়া এত ব্যস্ত। বর্ত্তমান যুগের মানুষের উপর এই কর্ত্তব্যভার পতিত হইয়াছে,—ইতিহাসের খোসায় যে মুক্তি-তত্ত্বকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে তাহাকে খোসামুক্ত করিয়া সার্ব্বভৌমিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কোন কালে এক বিশেষ নরদেবতা আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীকে পবিত্র করিয়াছিলেন তাহা নহে, প্রতি নরেই দেব আবির্ভূত—প্রতি নরই দেব—নরত্বই দেবত্ব। নরের মুক্তিবীজ এই খানে নিহিত। কেবল রাষ্ট্রে নয়, ধর্ম্মেও এই ডিমক্র্যাটিক আদর্শ প্রচার করিতে হইবে—"নিজ-পদধূলি, নিজ মাথে তুলি, লইব ভকতি করি।"

দেব এক নয়, বহু। আবার বহু দেববাদে আসিয়া পৌঁছিলাম। কিন্তু এ বহু একের পদরজ-বিশোধিত বহু—একের বিভূতি। আদির বহু-জ্ঞান বিচ্ছিন্নতার মোহের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরের বহু একত্ব-বিধৃত।

মুক্তি ও মুক্তির উপায়

এক একাই রহিলেন না; কেন না, এক একত্বের ভূমিতে নিজেকে প্রকাশিত করিতে পারেন না। তাই তিনি বহু হইলেন—তাই উচ্চারিত হইল "বহু স্যাম্'। ইহাকে যে কোন একটা কালের ঘটনা, তাহা নহে। "বহু স্যাম্" অনাদি কালের ধ্বনি। তাই বহু মায়া নয়, মিথ্যা নয়। তাই মানুষ বিশ্বাস করিতে পারে—জগতের মূলে জ্ঞান ও মঙ্গল, তার জীবনে এক মঙ্গলময়ী ইচ্ছা কার্য্য করিতেছে। একই বহুর অন্তরাত্মারূপে তার মুক্তি সাধন

করিতেছেন। তাই মানুষ ভরসা করিয়া মুক্তির জন্য আপনার অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারে। নরের মুক্তি অন্তর্নিহিত দেবের দ্বারা—বাহিরের কোন আগন্তুক দেবতাঁর দ্বারা নয়। সুতরাং **আত্মার** দ্বারাই যদি আত্মার মুক্তি সাধিত না হয়, তাহা হইলে মানুষের মুক্তির আর কোন পথ থাকে না। এক বহু হইয়াছেন—ইহাই মানুষের বন্ধন। বহু এক হয়—ইহাই জীবের মুক্তি। বহু এক হইতে পারে; কেন না, এক বহুর মধ্য হইতে অন্তর্হিত হন নাই। মানুষ আপনার এই অন্তর্নিহিত দেবত্ববলেই মুক্তি লাভ করে—তার মুক্তি তার প্রকৃতিগত দেবত্বের অপরিহার্য্য পরিণতি। কোন মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন নাই। গুরু, উপদেষ্টা, পথ-প্রদর্শকের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কেহই মুক্তিপথের অবলম্বন নয়। সে মুক্তি পায়, কেন না, সে "নিত্য-মুক্ত-**স্বভাব**বান্"। অবতারবাদ যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে উহা মুক্তিপথের বিষম অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবতারবাদ দেখায় মুক্তির সংকীর্ণ কূপোদক। এ দিকে কিন্তু অনন্ত মুক্তি-সমুদ্র দিগন্ত প্রসারিত—যার ইচ্ছা সে মহাসমুদ্রে অবগাহন কর—মাশুলের কড়ি গুণিতে হইবে না। ভবিষ্যতের ধর্ম্মে মানুষ মুক্তি লাভ করিবে ভিতর হইতে—বাহির হইতে গ্রহণ করিবে না। হঠাৎ মনে হইতে পারে, ইহা আত্মম্ভরিতা—মানুষ নিজেই নিজের মুক্তি সাধন করিবে? সত্যই ইহা আত্মম্ভরিতা হয়, যদি ভুলিয়া যাই যে আমার এই আমির চির-আশ্রয় রূপে আর এক **আমি**-ই আমার মধ্যে বর্ত্তমান! এই আমির অপরোক্ষানুভূতি, এই আমিকে আমার আত্মার **আত্মা** জানিয়া সজ্ঞানে তাঁহাতে অবস্থিতি—ইহাই আত্ম-সাক্ষাৎকার—ইহাই মোক্ষ। এই আমির বাণী কে শুনে নাই? অতি বড় মোহান্ধও শুনে, কিন্তু অর্থ বুঝে না। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া"—এক শাখীপরে দুবিহগবরে সুখে বসবাস করে—আমার এই অবিভাজ্য আত্মজ্ঞানরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়াই এই দুই "আমি" বর্ত্তমান—এক জনকে ছাড়িয়া অন্য জন থাকে না—তাঁরা সযুজা, নিত্যসাথী। এক জনের হাত হইতে অন্য জন আনন্দে মুক্তি-ফল আস্বাদন করিতেছে। তৃতীয়ের স্থান নাই। মধ্যবর্ত্তীর আবির্ভাবে মানুষের মুক্তি মরীচিকায় পরিণত হয়। তাই আবার বলি, মানুষের যদি কোন মুক্তির উপায় থাকে তবে তাহা "উদ্ধারে**দাত্মনা**ত্মানম্" ("Redemption of the ego by the Self") খৃষ্টের প্রয়োজন নাই—লৌকিক অর্থে অবতার প্রতিবন্ধক-মাত্র।

অনেক সময় এই আশঙ্কার কথা শুনি, যে যদি মহাপুরুষদিগকে স্থানচ্যুত করা যায়, তবে মানুষের ধর্ম্ম দাঁড়াইবার ভূমি পাইবে না! ইহার উত্তর আমরা পূর্ব্বেই একরূপ দিয়াছি—মহাপুরুষেরা ধর্ম্ম গড়েন নাই, ধর্ম্মই মহাপুরুষদিগকে গড়িয়াছে। এ দেশে দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি নানা উৎসব ধর্ম্মের নামে প্রচলিত। ব্যক্তিবিশেষ এই সব উৎসব করিয়াছিলেন বলিয়া এ গুলি প্রচলিত হইয়াছে, তাহা নহে। এ গুলি নৈসর্গিক বা জ্যোতিষিক রূপক। ইতিহাস-পূর্ব্ব যুগ হইতে মানুষের মনের স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব ইহাদিগকে আকার দিয়া আপনার চরিতার্থতা সাধন করিয়াছে। পরে, যাঁহাকে অবতার বা মহাপুরুষরূপে কল্পনা করিয়াছে, তাঁহাকে দিয়াও ঐ ধর্ম্মভাবেরই তৃপ্তি করাইয়া লইয়াছে। ইহাই ইতিহাস। যিশুর মুখে যে দেওয়া হইয়াছে,—ঈশ্বরের আদেশ যে পালন করে সেই আমার মাতা ভ্রাতা ভগিনী, বা রাজপুত্র শাক্যসিংহ যে বলিয়াছিলেন,—আমি যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি সে বংশেব সকলেই ভিক্ষুক, ইহার মধ্যে অত্যুক্তি কিছুই নাই। ইহা মানবাত্মার অন্তর্নিহিত বাণী, তাই বুদ্ধ যিশুর মুখে দেওয়া হইয়াছে। নহিলে যে অবতারের অবতারত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না! অবতার ধর্ম্মাভিজ্ঞতা গড়েন না, ধর্ম্মাভিজ্ঞতাই অবতার গড়ে। সঙ্কোচ পরিহার করিলে সকল ব্রাহ্মই কি সাক্ষ্য দিবেন না, যে ধর্ম্মজীবনের প্রথম উন্মেষ-সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের চিত্তোন্মাদকারী বার্ত্তা যখন হৃদয়দ্বারে যাইয়া পৌঁছিল, তখন আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ যে রক্তের সম্বন্ধের উপরে ইহা কি স্বতঃই অনুভূত হইয়াছিল না? কোন বুদ্ধ যিশু আসিয়া শিখাইয়া দিয়া যান নাই। যখন কোনও ব্রাহ্মের সঙ্গেই ব্যক্তিগত সম্বন্ধ হয় নাই তখনও 'ইনি ব্রাহ্ম' ইহাই প্রাণকে কাড়িয়া লইবার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল কেন? কেন না, উহা আত্মার ধর্ম্ম। আরও দেখুন, মার-বিজয়! ইহা কি কেবল বুদ্ধ যিশুর জীবনের ঘটনা? নচিকেতাই কি কেবল "তবৈব বাহা তব নৃত্য গীতে" বলিয়া ধর্ম্মজীবনে প্রবেশের পথে সংসারকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন? এ প্রত্যাখ্যান আরও প্রাচীন—ছান্দোগ্য-বৃহদারণ্যকেও দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। প্রত্যেক ধর্ম্ম-সাধনার্থীই ইহার সাক্ষ্য দিতে সমর্থ। ইহা বিশ্বজনীন ধর্ম্মভাব বলিয়াই ধর্ম্মাচার্য্যগণের জীবনে নাটকাকারে স্থান পাইয়াছে, তাঁহাদের জীবন হইতে মানুষ শেখে নাই। নিজের জীবনে যে দিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল, সে দিন বুদ্ধযিশুর কথা মনে পড়ে নাই। তাই বলিয়াছি, ধর্ম্ম মহাপুরুষ গড়ে, মহাপুরুষ ধর্ম্ম গড়ে না।

ধর্ম্মের মূলে ব্যক্তিবিশেষ নয়

বর্ত্তমানের দৃষ্টান্তগুলি চক্ষের উপর জ্বল জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছে। তাহার মধ্যে প্রধান একটী Fascism. Mussolini ফ্যাসিষ্টদিগের স্রষ্টিকর্ত্তা নহেন, ফ্যাসিষ্টগণই মুসলিনিকে কার্য্যক্ষেত্রে নামাইয়াছে। যদিও চিন্তাবিহীন দৃষ্টিতে বিপরীতটাই লোকে সত্য বলিয়া মনে করে। একটী ধর্ম্মধারা প্রবর্ত্তনের জন্য যে এক জন বিশেষ নাম করা শক্তিশালী পুরুষ চাই-ই, ইতিহাস তো তাহা বলে না। হিন্দুধর্ম্মের কথা নাই বলিলাম—ইহার আদিতে কোন মানুষকে দেখিতে পাই না—ইহা অপৌরুষেয়। যাঁহারা ঐতিহাসিক সমালোচনার খবর রাখেন তাঁহারা জানেন, মুসা (Moses) পৌরাণিক দেবতার আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাঁহারা এখনও মুসাকে ঐতিহাসিক পুরুষ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারাও আর তাঁহাকে ইহুদাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া মানেন না। আভিশ্, অসিরিশ্ প্রভৃতি ধর্ম্মের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি—ইহাদের প্রবর্ত্তকরূপে ব্যক্তিবিশেষকে পাওয়া যায় না। জরথাস্ত্রের কতটা ঐতিহাসিক আর কতটা কাল্পনিক তাহা নির্ণয় করিতে গেলে পণ্ডিতেরা লোম বাছিতে কম্বল উজাড়ের আশঙ্কা করিয়াছেন। আর দৃষ্টান্ত বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার; অথবা প্রাচীন ধর্ম্মধারার সংশোধন, যে ধর্ম্মধারার আদিপুরুষ বলিয়া কাহাকেও পাই না। আর, ইস্‌লাম আরব ও ইহুদাধর্ম্মের অংশ লইয়া গঠিত। পণ্ডিতেরা ইহাকে খৃষ্টধর্ম্মের Northern Reformationরূপেও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মুসলমান্ ধর্ম্মের বিস্তৃতির কারণের মধ্যে ধর্ম্মাতিরিক্ত অন্য কারণগুলিই প্রবল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ নির্দ্দেশ করেন। আবার, যখন একজন কৃতী পুরুষ আমাদের নেত্রপথে পতিত হন, বাস্তবিক তিনি কি একক আপনার কৃতিত্বের জন্য দায়ী? তার ভাগীদার কি কেউ থাকেন না? যাঁহারা থাকেন, তাঁহারা তো বিস্মৃতির সাগরে ডুবিয়া যান। কিন্তু তাহাতে তো কার্য্যটির হানি হয় নাই। লুথারের পূর্ব্বে যাঁহারা পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়া গেলেন তাঁহারা না হইলে কি Reformation সম্ভব হইত? আরিস্ততল্ কিছু নিউটন অপেক্ষা কম কৃতী পুরুষ ছিলেন না, তবে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারেন নাই কেন? কেন না, মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের আবিষ্কর্ত্তার পূর্ব্বে কেপ্লার, কোপর্ণিকাশ, গ্যালিলিওর আবির্ভাব প্রয়োজন। কিন্তু এই কার্য্যগুলির সঙ্গে ভাগীদারদের নাম না থাকিলেও ইঁহাদের দাবী সামান্য নয়। ইয়োরোপের Renascenceরূপ বিরাট্ ব্যাপারের মূলে কোন ব্যক্তিবিশেষকে পাই না বলিয়া দুই শতাব্দীর

মধ্যেই অন্ধকারযুগকে সম্পূর্ণ নিরসন করিয়া দিতে অপারগ হয় নাই। অথচ এই Renascenceএর মত এত বড় বৃহদনুষ্ঠান জগতের ইতিহাসে কয়টাই বা ঘটিয়াছে! সুতরাং যিশুকে বাদ দিলে ধর্ম্মের উঠিয়া যাইবার যে আশঙ্কা তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। অনেকের এই ভ্রান্ত ধারণা আছে, যিশুর মহৎ জীবনের দৃষ্টান্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই শিষ্যগণ অসাধ্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যিশুকে বাদ দিলে তাঁহাদের কার্য্য অর্থহীন হইয়া পড়ে। প্রথম কথা, উক্ত শিষ্যগণ কিছুই করেন নাই—ইতিহাস প্রথম শতাব্দীতে যিশুবাদের কোন চিহ্নই পাইতেছে না। দ্বিতীয় কথা, সম্পূর্ণরূপে পূর্ব্বসংস্কার-বর্জ্জিত হইয়া নিরপেক্ষভাবে বাইবেল্-গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যাইবে, যিশু তাঁহার শিষ্যবর্গের উপর কোন প্রভাবই বিস্তার করিতে পারেন নাই—বাড়ীর লোকেরা তো তাঁহাকে পাগল বলিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিল। যাহা হউক, অনুপ্রাণনা বস্তুটি সম্পূর্ণ ভিতরের জিনিষ, বাহির হইতে আসে না। এ কথা সত্য, কেহ কেহ সাক্ষ্য দিয়াছেন যে তাঁহারা ব্যক্তিবিশেষকর্ত্তৃক উদ্বোধিত। ইহার মধ্যে অনেক পরিমাণে কল্পনা মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। মিল যে মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার Inspiration আসিয়াছিল Mrs Taylor হইতে—ইহা যেমন খাটি কল্পনা, Arcএর Joan যে ভাবিয়াছিলেন Virgin Mary তাঁহার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন তাহাতেও ঐ Virgin Mother ঐতিহাসিক হইয়া যাইবে না। Miss Violet Gibson বলিয়াছেন, মুসলিনির হত্যাচেষ্টায় তিনি আর্কের জোয়ান কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

আসল কথা, মনুষ্য-জগৎ চলে ভাবের (Idea) দ্বারা, ব্যক্তির (Personalitya) দ্বারা নহে। জগতের নিয়ন্তৃত্ব ব্যক্তির হাতে নয়, ভাবের মধ্যে।

ভাব ও ব্যক্তি

ব্যক্তি ভাবের দাস। জগতের মূলে যে জ্ঞানময়ী শক্তি কার্য্য করিতেছেন, তিনি ভাবের অভিব্যক্তির জন্য ব্যক্তিকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করেন মাত্র। এই ব্যক্তিবিশেষ আবার ঐ বিক্ষিপ্ত ভাব-চক্রের কেন্দ্রস্বরূপ। নতুবা ঐ ব্যক্তির মধ্যে ভাব ফুটিয়া কোন কাজই করিতে সমর্থ হইবে না। ব্যক্তিবিশেষে বা মণ্ডলীবিশেষে ঐ ভাব জমাট্ বান্ধিবার পূর্ব্বে উহা জনমণ্ডলীর মধ্যে আকাঙ্ক্ষারূপে প্রকাশোন্মুখ না হইলে ব্যক্তির কোন কৃতিত্বই প্রকাশ পাইবে না। বৈদিকযুগের শেষে এক দিকে যাগযজ্ঞের চাপে যখন মানুষের নিঃশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল, অন্যদিকে ব্রাহ্মণের অত্যাচারে, জাতিভেদের নিপীড়নে মানুষের মন অতিষ্ঠ হইয়া

উঠিল তখন বুদ্ধবাণীরূপে সর্ব্বজীবে সমভাব প্রচারিত হইল—মানুষ সেই দিকে ছুটিল। এ কি বাহিরের প্রেরণা? মানুষের মনের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—এ ডাকে এখন আর ঐ সাড়া মিলিবে না। জেরুসালেম ধ্বংসের পরে ইহুদীজাতি যখন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, বিনষ্টপ্রায় জাতীয় বিশেষত্ব Heathen জগতের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য পুরোহিতগণ Mosaic Lawএর শাসন এমন কড়া করিয়া তুলিল, পাণ হইতে চুণ খসিলে লোকের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতে লাগিল এবং আপনাদের প্রাধান্যের ও বাহ্ শুচিতার চাপে জনমণ্ডলীর প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া ফেলিল। আহার বিহারে একটু পদস্খলন হইলেই সম্মুখে অনন্ত নরকাবর্ত্ত! এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে স্বতঃই উদিত হয়। আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্তি ধরিয়া সেই মুহূর্ত্তে তাহাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত! ভগবদ্-করুণায় মুক্তি সকলের জন্য অপেক্ষা করিতেছে—Lawএর বোঝা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মানুষ সেই পথে ছুটিল। ইহাই খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারের আদি ইতিহাস—ব্যক্তি-বিশেষের অনুপ্রাণনা নহে। "ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" এই কার্য্যের পোষকতা করিয়াছে মাত্র। আমাদেরই মধ্যে আজ যে উত্তেজনা দেখিতেছি তাহার মূলে ভাব না ব্যক্তি? মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা বা ত্যাগমন্ত্রের খবর কি চা বাগানের কুলিরা কিছু রাখে? জীবন-সংগ্রামে মানুষ হারিয়া যাইতেছে প্রবাদের ৮মণ চাউলের জায়গায় টাকায় পাঁচ সেরও যখন মিলে না, তখন তাহারা শুনিল গান্ধীরাজ্যে দেনা দিতে হয় না, খাজনাও মাপ- খাওয়া পরার কোন কষ্ট নাই—এ কথা তাহারা স্বীকার করিবে না কেন? ইহা যে তাহাদের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষার বহির্ব্বিকাশ। তারা গৃহে ফিরিল—তাহারা তো জানিল গান্ধীই তাহাদের জন্য বিনা খরচায় রেলগাড়ী, বাষ্পীয় পোত জোগাইয়াছেন, সরকারী লোকেরা কেবল বাধা দিয়াছে মাত্র। কাহারা তাহাদিগকে বাস্তবিক সাহায্য করিয়াছে তাহা তাহাদের অজ্ঞাতই রহিল। গৃহে পৌছিয়া যখন দেখিল সেখানে তাদের স্থান নাই, তখন আবার ফিরিয়া গেল। গান্ধীকে দোষ দিল না, অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিল। অবতার এমনই গড়ে, একবার গড়িলে আবার আর তাহা ভাঙ্গে না। কোথায়ও না কোথায় তাহা থাকিয়াই যায়, সুযোগ পাইলেই গজাইয়া উঠে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী আজ অস্তমিত। সাধারণে তাঁহার উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে। কিন্তু দু'চারজন কি নাই যাঁহাদের বিশ্বাস মরিয়াও মরে নাই? আছেই তো, নতুবা আজ আবার নূতন করিয়া মহাত্মার

জন্য আহ্বান আসিল কেন? (৬।৯।২৬)। যাক্। যখন শক্তি-প্রয়োগের অকর্ম্মক সকর্ম্মক কোন অবকাশই নাই, এমন কি আত্মহত্যা করিতে গেলেও পুলীশ হাত কড়া দিয়া লইয়া যায়, তখন দেশের লোক নন্-কো-অপারেশনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া একটা বৃহৎ কর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। শক্তি-প্রয়োগের একটু সামান্য ফুরসুৎ মিলিলে শত গান্ধীর শত বাণী আকাশে মিলিয়া যাইত না কি? আবার, মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্ব যে তিনি অপসারিত করিয়াছেন, সেও পূর্ব্বভাবের ব্যত্যয় হইয়াছে বলিয়া।

সকলের উপরে সত্য

তদানীন্তন কালের কেহ কেহ এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেম, যে Delphia Oracleএর সত্যতা যদি অস্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ইতিহাসের ভিত্তিমূল উৎপাটিত হইয়া যাইবে। আজ তো কেহই উহার সত্যতা মানে না, কিন্তু ইতিহাসের ভিত্তি এক চুলও নড়চড় হয় নাই। এ আশঙ্কা বৃথা যে যিশুর ঐতিহাসিকতা অপ্রমাণিত হইলে ইতিহাসের উপরই মানুষের বিশ্বাস চলিয়া যাইবে। এমন কত কথা অস্বীকার করিয়া মানুষ যুগে যুগে অগ্রসর হইতেছে। মিথ্রধর্ম্মের পুরোহিত-দিগেকে যদি কেহ বলিত যে তাঁদের মিথ্র সূর্য্যের রূপক মাত্র, তবে তাঁহারা তার জন্য নিশ্চয়ই বিষ্ণুতেলের ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু এখনকার মানুষ ভাবে, মিথ্রকে সূর্য্যের রূপক ছাড়া আর কিছুর কল্পনা কেমন করিয়া সম্ভব হইয়াছিল: মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্যে মিথ্যা যে বহুদিন ধরিয়া সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে মানুষের অন্ধবিশ্বাসই প্রমাণিত হয়, ইতিহাস জাহান্নামে যায় না। তদানীন্তন গ্রীকৃগণ যাহাই বিশ্বাস করুন না এবং তাহাতে তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস যতই পরিপুষ্ট হউক না, বৈজ্ঞানিকের চক্ষে হার্‌কিউলিশ্ সূর্য্যই এবং তাঁহার দ্বাদশ বীর্য্য দ্বাদশ রাশির রূপান্তর মাত্র। ইহা যদি প্রমাণিত হয়, যে তত্তদধিকারে মিথ্যার দ্বারাও মানুষের ধর্ম্মভাব পরিপোষিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে ধর্ম্ম বা ইতিহাসের কোন গ্লানি দেখা যাইতেছে না। ব্রহ্মা যে সরস্বতীর পশ্চাতে ফুটিয়াছিলেন, তাহা একটি জ্যোতিষিক রূপক, এ কথা কুমারীল বৌদ্ধদিগের সঙ্গে বিচারে বলিয়া গিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও যদি বর্ত্তমান যুগের নব আচার্য্যগণ বলেন, যে উহা একটা সত্য ঘটনা এবং পরে যদি তাঁহাদের বংশধরগণ এ মতও পরিত্যাগ করে, তবে ইতিহাসের কি আসিয়া যায়? সত্য কথা এই, মানুষের মত রক্ষণশীল জীব আর নাই। সে যাহা ধরিয়া রহিয়াছে, তাহা না ছাড়িবার পক্ষে অনেক ওজুহাত স্বতঃই তাহার মনে উদয় হয়। কিন্তু

যদি একবার ছাড়ে তবে আবার তাহাকে তাহা ধরান সহজ নহে। সেই মানুষই না-ধরার পক্ষে শত যুক্তি উদ্ভাবন করিতে কশুর করিবে না। ইহার দৃষ্টান্ত অহরহ পাওয়া যাইতেছে। সতীদাহ নিবারণের সময় বিপক্ষে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। এখন যদি সেটা পুনঃপ্রবর্ত্তন করিতে যাওয়া যায়, তবে কি শতগুণ প্রবল আন্দোলনের সম্মুখীন হইতে হইবে না? যে দিন প্রথম হিন্দু সন্তানের মুখ হইতে 'গঙ্গা মানি না' এই কথা উচ্চারিত হইয়াছিল, সে দিন 'হিন্দুধর্ম্ম গেল' বলিয়া সমস্ত দেশ টলমল করিয়া উঠিয়াছিল। আর আজ সেই গঙ্গার সঙ্গে Septic Tank এর এমন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ সত্ত্বেও হিন্দুধর্ম্ম একটুও বিচলিত হইতেছে না। যিশুকে ছাড়িয়া পূর্ব্বেও ধর্ম্ম ছিল, এখনও রহিয়াছে, পরেও থাকিবে—খৃষ্টধর্ম্ম লোপ পাইবে না। যখন লোকে মনে করিত খৃষ্ট ঈশ্বরের একজাত পুত্র (Only-begotten Son), তখনও তো খৃষ্টধর্ম্ম ছিল; আবার এখন খৃষ্ট একজন ভালমন্দ-মিশান মানুষই ছিলেন, এই টুকু প্রমাণ করিতেই যাঁহারা হয়রাণ হইয়া প্রায় হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়িতেছেন, তাঁহারাও খৃষ্টধর্ম্মই বজায় রাখিতে চাহিতেছেন। সুতরাং যদি ভবিষ্যতে প্রমাণ হয় যে খৃষ্ট Logosএর মানবীকরণ—যাহা মর্ম্মীগণ (Mystics) পূর্ব্বেও মানিয়া গিয়াছেন, অথবা তিনি জ্যোতিষিক বা আধ্যাত্মিক রূপক তাহাতে খৃষ্টধর্ম্মের কোন হানির কারণ দেখা যাইতেছে না। ক্রমাভিব্যক্তিবাদ ইতিহাসকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া ফেলিয়াছে। যখন এ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় নাই, প্রাচীন কালের শাস্ত্রব্যাখ্যায় রূপকের অবতারণা করিয়া তাহার স্থান পূরণ করিয়া লইবার চেষ্টা হইয়াছিল। ইহাতে ইতিহাসের ধারা বিচ্ছিন্ন হওয়া দূরের কথা, বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া ইতিহাস আপনার একত্বেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইতিহাসের ভিত্তি জ্ঞানের উপরে—মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিলে সে টলিবে কেন?

এখন একটা গুরুতর বিষয়ে মনোনিবেশ করা যাক্। অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে, খৃষ্টধর্ম্ম আপনার আভ্যন্তরীণ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিবলে অন্য ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তুলনামূলক ধর্ম্মের ইতিহাসের খবর লইলে জানা যাইবে, আদিতে যিশুপন্থা কি নৈতিক কি আধ্যাত্মিক ভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কোন জগতেই শ্রেষ্ঠতার দাবী করিতে সমর্থ হয় নাই। খৃষ্ট-ধর্ম্মের আধ্যাত্ম-সম্পদ্ ক্রমে আপনার সম্প্রসারণের রাস্তায় মিসরীয়, হিব্রু ও সেমিটিক্, গ্রীক্ ও রোমক্, নষ্টিক্ ও নব-প্লেতনিক, এবং বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্ম-তত্ত্ব

হইতে আহৃত হইয়াছে। প্রথম হইতেই খৃষ্টধর্ম্ম রাজার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া আসিয়া ছিল। এতকাল যে আমরা শুনিয়া আসিয়াছি, আদি খৃষ্টানদের উপর রোম সাম্রাজ্যে অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছিল তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। খৃষ্টান ধর্ম্মের উপর লোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার জন্য উহা পরবর্ত্তী কালের পরিকল্পনা। ও কথা ভুলিয়া যাইতে হইবে। গিবনই (Gibbon) তো দেখাইয়া গিয়াছেন, Diocletian পর্য্যন্ত কোন অত্যাচার হয় নাই। পরবর্ত্তী গবেষণায় কথাটা আরও পরিষ্কার হইয়াছে। রাজশক্তিকে সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা খৃষ্টধর্ম্মের আদি হইতেই ছিল। সিজারের প্রাপ্য সিজারকে দাও—এই মত যিশুর মুখেই তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এক সময়ে রোম সাম্রাজ্যের খৃষ্টানগণের এটা একটা গর্ব্বের বিষয় ছিল যে তাহারা ইহুদীদের ন্যায় কখনও রাজবিদ্রোহ ঘটায় নাই। ইহার ফলও হইয়াছিল। এরূপ কথিত আছে, সম্রাট্ Tiberius যিশুকে রোমক দেবদেবী-মণ্ডলে স্থান দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এবং Hadrian খৃষ্টপূজা প্রচলিত করিতে চাহিয়াছিলেন। এগুলি গল্প মাত্র, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সকল উপকথা প্রচলনের মূলে এই সত্যটি আছে, যে খৃষ্টানগণ রোম সম্রাটদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য যত্নের ত্রুটি করে নাই। তাঁহারাই কি এই তত্ত্ব ধর্ম্মনীতিরূপে প্রচার করেন নাই, যে প্রজার উপর যথেচ্ছ প্রভুত্ব করিবার দৈব অধিকার রাজার আছে? সুতরাং রাজ-প্রাসাদ হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইবেন কেন? যদি কোন অত্যাচার হইয়া থাকে তাহা রাজনৈতিক কারণে—ধর্ম্মের সঙ্গে তার কোন সংস্রব নাই—যে রূপ অত্যাচার সকল ধর্ম্মাবলম্বীর উপরেই হইয়া থাকে। প্রারম্ভে তো ইহুদা-ধর্ম্মের সঙ্গে বিশেষ কোনও পার্থক্যই ছিল না। যা ছিল তা ঘরাও অবান্তর বিভিন্নতা। কিন্তু ইহুদা জাতির শেষ জাতীয় অভ্যুত্থানে খৃষ্টানগণ রোমের পক্ষ অবলম্বন করাতেই উভয়ের মধ্যে ভীষণ শত্রুতা গড়িয়া উঠে যাহা পরে বাইবেল্-গ্রন্থে যিশুর সঙ্গে Phariseeদের বিবাদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এমন কি নিরোর অত্যাচার কাহিনীর নাড়ীনক্ষত্র তন্ন তন্ন করিয়া বিচার এবং ঐতি-হাসিক সমালোচনার দ্বারা বিশ্লেষণ করতঃ আভ্যন্তরীণ প্রমাণের জোরেই পণ্ডিতেরা দেখাইয়াছেন, উহা একটী উপাখ্যান (Fable) মাত্র। বিদেশী ঐতিহাসিক আপনার দুরভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য নবাব্ সিরাজ্উদ্দৌলার চরিত্রে পুরু করিয়া মসি ঢালিয়া দিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে খৃষ্টমণ্ডলীও ঈদৃশ কোন

খৃষ্টীয় মণ্ডলী গঠনের কতিপয় উপকরণ

প্রয়োজন সাধনোদ্দেশ্যেই সম্রাট্ নিরোকে নরাকার পশুরূপে বর্ণনা করিয়াছে। আবার, খৃষ্টধর্ম্ম সহজে জয়লাভ করিয়াছিল—এ কথাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মিথ্রধর্ম্ম তিন চার শতাব্দী সমানে লড়িয়াছিল—তার পরাভবের কারণ একটা বাহ্য ঘটনা, খৃষ্টধর্ম্মের আভ্যন্তরীণ কোন শক্তিবিশেষ নহে। সকল ঘটনার সমবায় খৃষ্টধর্ম্মকে শক্তি দিয়াছে তাহার কয়েকটি উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ব্ব হইতে Ebionites ও Nazarenes প্রভৃতি সম্প্রদায় বর্ত্তমান ছিল যাহারা যিশু-দেবতার উপাসনা করিত ও তাঁহার নামে ভূত ছাড়াইত। ইহার প্রমাণ Gospelএর মধ্যেই বর্ত্তমান। যিশু-শিষ্যগণ প্রচারে বাহির হইয়া বহুস্থানে আদরে গৃহীত হইলেন; কেন না, তাঁহারা তত্তৎ স্থানবাসীদিগের সুপরিচিত যিশু-দেবতার নামেই ভূত ছাড়াইতে গিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রচার বিবরণে ভূত-ছাড়ান ছাড়া কোন নৈতিক বা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের উল্লেখ নাই। স্থানে স্থানে যিহোবাও যিশু নামে পূজিত হইতেন।

২। এই সময়ে নানা কারণে ইহুদাজাতির মধ্যে ত্রাণকর্ত্তার আবির্ভাবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল এবং লোকের মন নূতন কিছু ধরিয়া পুরোহিতদিগের অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইবার জন্য যে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। আমাদের স্বদেশী অন্দোলনের সময়ে স্থানে স্থানে কল্কি অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই খবর আমরা বহু স্থান হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

৩। যে ধর্ম্মমণ্ডলী গঠিত হইল, তাহার মধ্যে এক দিকে ইহুদা Synagogue অন্যদিকে গ্রীক্ Collegia মিশিয়া এক হইল, এবং জু জেণ্টাইল্ সকলে উহা আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল। পূর্ব্ব হইতেই Judaism পাশ্চাত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, Philo তাহার অন্যতম নিদর্শন। জেরুসালেম ধ্বংস ও Templeএর পুরোহিত দরবার বিনষ্ট হইলে তার স্থান অধিকার করিবার জন্য এতাদৃশ কোন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সকলে স্বভাবতঃই অনুভব করিতে লাগিল। সুতরাং খৃষ্টীয় মণ্ডলীর গুরুদরবারকে সে স্থান অধিকার করিতে কোনই বেগ পাইতে হইল না। অন্য দিকে, যিশুর জন্ম মৃত্যু প্রভৃতির তারিখ কল্পনা করতঃ পেগান জগতের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সকল ক্রমে ক্রমে আত্মসাৎ করতঃ উৎসবপ্রিয় রোমান্ জগতের সর্ব্বপ্রধান বাধাকে অতিক্রম করা হইল।

৪। পরস্পরকে সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি হইতে উপাসক-সম্প্রদায় বান্ধব

সম্মিলনীতে পরিণত হইল। যখন দেশের রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিকূলতায় ও ধর্ম্মের উৎপীড়নে প্রকাশ্য সম্মিলনের পথ বন্ধ হইয়া যায়, তখন এইরূপ অপ্রকাশ্য বন্ধু সমাগম লোকের প্রিয় হইয়া উঠে। যাহাতে বাধা দেওয়া যায়—ভাল হৌক, মন্দ হৌক, তাহারই দিকে যে মানব মনের একটা উগ্র প্রবণতা আসে, ইহা মনোবিজ্ঞান-সিদ্ধ সত্য।

৫। পরস্পরের সহানুভূতির উপরই যাহাদের জীবন মরণ তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ না করিলে চলে না—সংহতি কার্য্য-সাধিকা। ইহাদের মৃত্যুরই অপর নাম বিচ্ছিন্নতা। যে সংঘবদ্ধতার (Organisation)এর নামে আজ কালকার মানুষ শপথ করে, সেই শক্তি আদি খৃষ্টসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। সম্রাট্ কনস্তান্‌তাইনের যে চরিত্র তাহাতে কোন বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বলিবেন না, তিনি আধ্যাত্মিকতার টানে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টানদিগের সংঘবদ্ধ হইয়া কার্য্যকরিবার অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া নিমজ্জমান রোম-সাম্রাজ্যের রক্ষার জন্য ইহাদিগকে গ্রহণ করতঃ খৃষ্টধর্ম্ম বিস্তারের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। সংঘবদ্ধ বলিয়া ঐ ধর্ম্ম অন্য সকল সংঘহীন ধর্ম্মের উপর জয় লাভ করিল।

৬। অর্থের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ স্থাপন করিতে মানুষ বড়ই নারাজ। কিন্তু ইতিহাস বলে, কোন দেশেরই ধর্ম্মযাজকেরা আদি অন্ত মধ্য কোন সময়েই অর্থ সংগ্রহে কুণ্ঠা প্রদর্শন করেন নাই। খৃষ্টধর্ম্মের আদি ইতিহাসে ইহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? বিরুদ্ধ চেষ্টা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক তত্ত্ব ধর্ম্মশাস্ত্রেও স্থান লাভ করিয়াছে। **Judas**এর হাতে একটা থলি ছিল, সে থলিতে কি থাকিত, শাস্ত্রকার তা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। তবে জুডাসের যে অর্থে অরুচি ছিল না, তা সকলেই জানেন। *Acts of the Apostles*এর মধ্যে অর্থ সংগ্রহের দুই চারিটি ফন্দী বোধ হয় অজ্ঞাতসারে স্থান পাইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে একটি বোধ হয় গুরুদরবারের মহিমা প্রকাশের জন্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এনানিয়াস্ নামক এক ব্যক্তি মণ্ডলীর সাহায্যের জন্য আপনার সকল সম্পত্তি বিক্রয় করিল। কি কুমতি হইল—সত্য যুগের লোকেরও দেখি লোভ ছিল এবং গ্রন্থকার বলিতে ভুলেন নাই, যে স্ত্রীর পরামর্শে সে এক অংশ নিজের ব্যবহারের জন্য রাখিল। গুরুদরবারের ("Holy Ghost"এর) বিরুদ্ধ এই অপরাধের জন্য Peter তাহাকে অভিশাপে ভস্মীভূত করিলেন—যে পিতর দু'দিন আগে যিশুকে অস্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। পিতরের মত দুর্ব্বাশা যে মঠের অধিকারী তার অর্থাভাবের কোন

সম্ভাবনা নাই। ভক্তিতে না হউক ভয়ে সে ভাণ্ডারে অজস্র অর্থ বর্ষিত হইবে। বিশেষতঃ যখন লোক মনে করিয়াছিল, পৃথিবীর বিনাশ আসন্ন এবং এখানে এক গুণ দিলে স্বর্গরাজ্যে শত গুণ পাওয়া যাইবে। কোন সত্য নয়, এই কুসংস্কারই খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। কুসংস্কার যত বেগে চলে, সত্য তাহা পারে না। অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন মনের উপর কুসংস্কারের প্রভাব সহজেই বিস্তারিত হয়, সত্যের সিংহাসন অন্ধকারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। মানুষ চিন্তা করিবার পরিশ্রম হইতে বিরত, কিন্তু বিশ্বাস করে সহজেই। তাই রোমান্সে (romance) মুগ্ধ, সত্য ধরিয়া থাকিতে নারাজ। এই তো এনানিয়াস্ স্বর্গ-কামনায় সর্ব্বস্ব দান করিল, কিন্তু তার শতাংশের জন্য সত্যভ্রষ্ট হইল—সত্যের খাতিরে ঐ টুকু ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিল না। তাই স্বর্গরাজ্য-প্রচারে অর্থের অভাব হইল না। এইরূপে যেখানে জলের মত অর্থাগম হয়, সেখানে যে মিশনের কার্য্য জোরে চলিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত বর্ত্তমানেও খৃষ্টধর্ম্মই আমাদিগকে দেখাইতেছে।

৭। সর্ব্বোপরি আদি খৃষ্ট-সম্প্রদায়ের গণতান্ত্রিক (Democratic) ভাব (Principle)। চারিদিকের চাপনে—সে সময়কার ধর্ম্মের সমাজের রাষ্ট্রের নির্যাতন (repression) স্মরণ করিতে হইবে—এই চাপনে মানুষের যখন শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল তখন নিশ্বাস ফেলিবার এই জায়গাটায় মানুষ ছুটিয়া আসিল। ব্রাহ্মসমাজের আশার অনেকখানি তো এইখানে। এই 'জাতিভেদ্' প্রপীড়িত জনমণ্ডলী, যাদের কি ধর্ম্মে, কি সমাজে, কি রাষ্ট্রে—কোথায়ও জ্ঞান ভাব ও ইচ্ছার স্ফুরণের একটীও পথ খোলা নাই, তাহারা যদি এখানে অসঙ্কোচে দেহ মন আত্মাকে খুলিয়া দিয়া স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে প্রাণকে শীতল করিবার সুযোগ পায়, তবেই ব্রাহ্মসমাজের সিদ্ধি। নতুবা এখানেও যদি সেই সঙ্কোচ, এখানেও যদি শক্তি ভীতির কবলে মরে, তবে ব্যর্থতাকেই বরণ করিতে হইবে। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে একমত নহেন, তাঁহারাও সমাজের এই দিকটার দিকে আশানেত্রে চাহিয়া রহিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ দেশের খবর লইয়া দেখুন, তাঁহাদিগকে নিরাশ করিবেন কি না। ভগিনী নিবেদিতা ঠিকই বলিয়াছিলেন, এই যে গুটিকত লোক একটা ডিমক্র্যাটিক্ কন্‌ষ্টিটিউশন্ লইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন, দেশের ভবিষ্যৎ আশা ঐখানে। কিন্তু কন্‌ষ্টিটিউশন্ যদি আত্মার অভিব্যক্তি না হয়, মানুষের হৃদয়ের ছাপ যদি তাহাতে না ফুটিয়া উঠে, তবে উহা খোসা।

এখন শেষ কথা। দেখিলাম, খৃষ্টের ব্যক্তিত্ব বাদ দিলেও খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারের ইতিহাসে কোন অঙ্গহানি পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং তাঁহার ঐতিহাসিকতা চলিয়া গেলে, খৃষ্টধর্ম্মের অপবাদের যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা একটা সত্যকে চাপা দিবার ওজুহাত মাত্র। সত্য কিন্তু ইহার বিপরীত কোঠাতেই অবস্থিত। ধর্ম্মের বাস্তবিক অপবাদ হয় তখনই যখন কোন পুরুষকে পরম-পুরুষের পদবীতে উন্নীত করা হয়। ওজুহাত মানুষের জুটেই, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সম্মতি-আইনের সময় কলিকাতার একখানা বাঙ্গলা সাপ্তাহিক বলিয়াছিল, উহা হিন্দুধর্ম্মের উপর ম্লেচ্ছ রাজার সবুট পদাঘাত। হিন্দুধর্ম্ম কিন্তু প্লীহা ফাটিয়া মরে নাই। বরং অনেকটা তাজা হইয়াই উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আজ ত্রিশ বৎসর পরে দেখিতেছি পণর ষোল বৎসরের পূর্ব্বে কন্যাকে পাত্রস্থা করিবার উৎসাহ কোন ভদ্রলোকেরই নাই। একটা হাঙ্গামা তো আমাদের চক্ষের উপরেই আজ অভিনীত হইয়া গেল। মুসলমান বাবুর্চ্চিওয়ালা অনেক রাজা মহারাজা—হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক সাজিয়া গৌরের বিবাহ-বিলের প্রতিবাদ করিবার জন্য আসরে নামিয়াছিলেন। ইহা কেবল উৎসাহক (Permissive) না হইয়া যদি জবরদস্তি-মূলকও (Compulsory) হইত, তাহা হইলেও হিন্দুধর্ম্ম মরিত না, বরং তাহার বাঁচিয়া থাকিবার আর একটা পথ খুলিয়া যাইত। যাহারা অজ্ঞ তাহারাই মনে করে, আমাদের হিন্দুরক্তে মিশ্রণ হইতে দিব না। অভিজ্ঞেরা বলেন, যুগে যুগে রক্ত-মিশ্রণেই হিন্দুজাতি বাঁচিয়া আছে। বিরুদ্ধ বাদ মনগড়া ওজুহাত মাত্র। বিশেষতঃ অমিশ্রিত রক্তের প্রবাদটাই একটা পৌরাণিক কুসংস্কার (Myth)। কার্য্যক্ষেত্রে যখন নামিবেন, বর্ত্তমানের বিরুদ্ধবাদীও সপক্ষে ওজুহাত দিবেন—উহাতে দোষ নাই, শাস্ত্রে দেখিতেছি সেকালেও অসবর্ণ বিবাহ ছিল। মানুষ তো যুক্তিদ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য করে না; কার্য্য করিয়া তাহার সমর্থনের জন্য যুক্তি অন্বেষণ করে। আর, মানুষ! তোমার এত ভাবনাই বা কিসের। তোমার সম্মুখে তো সোজা পথ পড়িয়া রহিয়াছে; "কর্ত্তব্য বুঝিবে যাহা জ্ঞানের আলোকে, তাই ধর্ম্ম, চল সেই পথে। ততোধিক মানবের নাহি অধিকার।" ফলাফল চিন্তা করিবার ভার তো তোমার উপর নয়—সে চিন্তার ভার আর এক জনের। এ জগৎটা পিতৃমাতৃহীন অনাথ নহে। ইহার জন্য ভাবিবার একজন আছেন।

ইতিহাস মানুষের খেলা নয়, বিধাতার বিধান

তাঁহারই হস্তে ছাড়িয়া দাও। বিবেকানুমোদিত পথে চলিয়া যাও,—তোমার দু'দিনের কোস্তাকুস্তি বই তো নয়; শেষ সাম্‌লাইবেন তিনি। কেবল দ্যাখ, যাহাকে বলিতেছ বিবেক, তাহা বাস্তবিকই বিবেক—প্রবৃত্তির তাড়না নয়, সাময়িক উত্তেজনা নয়:—

তুই শুধু বেয়ে যা দাঁড়, মনরে আমার!
হা'লে যখন আছেন হরি, তোর যেমন ফাল্গুন, তেমনি আষাঢ়।
চাস্ নারে তুই আকাশ পানে, হোক্ না ফর্সা, হোক্ না আঁধার।

ফর্সা হয় ভালই, আঁধার হলেই বা ক্ষতি কি? তিনি যে আছেন! "Be still, I am thy Lord." (O. T.)। একটী মূল সত্যের উপর ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত—ধর্ম্মের উত্থান এই সত্যে বিশ্বাসের উপর। জগৎটা অন্ধ শক্তির খেলা নয়। জগতের মূলে অনন্ত জ্ঞান ও শক্তি—এক অনন্ত প্রেম পুণ্য মঙ্গলের আধার বিধাতা এ বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। তিনি "নিহিতার্থো দধাতি"। জড়বিজ্ঞানের—অন্ততঃ উহার অল্পজ্ঞ রথিগণের—দ্বারা এই অনিষ্টের আশঙ্কা হইয়াছে যে মানুষের মন যেন, সৃষ্টিকার্য্যে যে এই "অর্থ", এই অভিপ্রায়, বর্ত্তমান আছে তাহা বিস্মৃত হইতে বসিয়াছে। তাই, Balfour বহুদিন পরে আবার Gifford Lecturesএর দ্বিতীয় পর্য্যায় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সে দিন এই প্রশ্ন উপস্থিত করিয়া বলিয়াছেন, যদি সৃষ্টির অন্তরালে অচেতন শক্তি না সচেতন পুরুষ- এই দুই এর মধ্যে নির্ব্বাচন করিতে হয় তবে সচেতন পুরুষকে গ্রহণ করিয়া জড়বিজ্ঞানও উপকৃত হইবে। মানুষের পক্ষে 'আমি'র বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার এক সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত—বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম—সকলেই এক উপদেশ প্রদান করিতেছে, একই পথ-প্রদর্শন করিতেছে। জীবন-সংগ্রামে আর নিজের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করিতে হইবে না, তাঁহার চরণ আশ্রয় করিলেই হইবে। তাই গীতার সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া বলি—

ঈশ্বরো সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া।
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।

গ। বিস্তারের ঐতিহ্য

ঐতিহাসিকগণ খৃষ্টধর্ম্মের বিস্তার-বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, জনশ্রুতি ও সাধারণ সংস্কারের সঙ্গে তার মিল নাই। দ্বিতীয় শতাব্দীতে যখন খৃষ্টীয় মণ্ডলী সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে কথঞ্চিৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন

কনস্তান্‌তাইনের পূর্ব্বে খৃষ্টধর্ম্ম কিছুই প্রচারিত হয় নাই

ইহার জন-সংখ্যা খৃষ্টানগণের লিখিত কাগজপত্রে যত বেশী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আদৌ তত বেশী ছিল না। পলের নামে প্রসিদ্ধ পত্রাবলীতে এসিয়া মাইনরের সহরাদিতে যে সকল সম্প্রদায় বা চার্চ্চের উল্লেখ আছে তাহা ব্যক্তি-বিশেষের গৃহে মিলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাসক-মণ্ডলী মাত্র। এমন কি চতুর্থ শতাব্দীতে, কনস্তান্‌তাইনের খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের ষাট্ বৎসর পরেও য়্যান্তিয়োকের মত এমন একটী অতি প্রাচীন খৃষ্টীয়-প্রভাব-সম্পন্ন সহরে এক পঞ্চমাংশ অধিবাসীমাত্র খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিল। তৃতীয় শতাব্দীতে নব-সিজারিয়া নামক একটী বিস্তৃত পল্লীতে মাত্র ১৭জন খৃষ্ট-বিশ্বাসী বাস করিত। এমন কি, ঐ সময়ে রোমের দশ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে কেবল মাত্র ৫০ হাজার খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিল। দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষেও আলেক্‌জান্দ্রিয়ার বাহিরে মিশরে কোন খৃষ্টীয় মণ্ডলী ছিল না। সুতরাং খৃষ্টীয় পিতৃপুরুষগণ (Fathers) যে লিখিয়া গিয়াছেন, রোম সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র খৃষ্টের পূজা প্রচলিত হইয়াছে ও সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছে, তাহা কেবল ধর্ম্মবিষয়ক পক্ষপাতিত্বের অতিরঞ্জন মাত্র। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং নগরে ও গ্রামে বহু স্থানে ব্রহ্মোপাসনা হয়, ইহা হইতে যদি কাহারও ইচ্ছা হয়, তিনি সহজেই বলিতে পারেন—ভারতবর্ষময় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। বাস্তবিক, কেবল সহরেই খৃষ্টীয় মণ্ডলী দেখা যাইত। গ্রামবাসীরা একেবারেই এদিকে ঘেঁসে নাই। তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ এই, যে খৃষ্টীয় সাহিত্যে অখৃষ্টান অর্থই দাঁড়াইয়া গেল মফঃস্বল-বাসী বা পেগান্। আরব-পারস্যে কিছু কিছু প্রচার কার্য্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রথম দুই শতাব্দীর মধ্যে পশ্চিম প্রদেশসমূহে কদাচিৎ খৃষ্টধর্ম্মের বার্ত্তা পৌছিয়াছিল। এমন কি গল্ প্রদেশেও সামান্য দুই চারি জন মাত্র খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ভুক্ত লোক ছিল। যদিও এরূপ কথিত হয়, যে তৃতীয় শতাব্দীতে ইয়র্কে একটি ক্ষুদ্র মণ্ডলী ছিল, কিন্তু রোমক-রাজত্বের প্রথম চারি শত বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডে যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, হাতে কলমে তাহার কোন

নিদর্শনই মিলে না। কিন্তু পারসিক মিথ্রধর্ম্মের এরূপ বহু নিদর্শন ইংলণ্ডে পাওয়া গিয়াছে। কেন না, রোমক যুদ্ধবাহিনী সকলের মধ্যে মিথ্রধর্ম্ম বহু পরিমাণে প্রচলিত ছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগেও রোম-সাম্রাজ্যের নাগরিক দিগের মধ্যে শতকরা এক জনও খৃষ্টধর্ম্মের দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই, মফঃস্বলবাসিগণ একরূপ অপ্রভাবাবিতই ছিল। McCabeর মতে রোমসাম্রাজ্যের ১০কোটী লোকের মধ্যে, জুভেনেলের (Juvenal) সময়ে মাত্র পাঁচ শত খৃষ্টান ছিল। পলের ৩০ বৎসরের পরিশ্রমের ফলে দুই তিন হাজার শিষ্য জুটিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার অধিকাংশ নামে মাত্র খৃষ্টান। মিথ্রধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্ম ইহা অপেক্ষা শীঘ্র গতিতে শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিল। পলের দুই শত বৎসর পরেও রোমের চার্চ্চ বলিতে দুইটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে সঙ্গত বুঝাইত। চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে রোমেও পাঁচ হাজারের বেশী খৃষ্টান ছিল না। ম্যাক্‌ক্যাবি বলেন, তাহারাও "Rice Christians" মাত্র। একটী রোমান পুলিশ দেখিলেই তাহারা পলাইত। ডাইওক্লিসিয়ানের সময়ে, "how cheerfully they brought certificate of Pagan orthodoxy—there were only a few hundred shuddering Christians in Rome and not a thousand in Italy. The Church of Christ was a dismal failure". Then came Constantine, a "brutal and ignorant and unintelligible prince that ever patronised a religion—all rivals were stifled in blood or bludgeoned into silence" (*Literary Guide*, June, 1925)। বাস্তবিক, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরল প্রচারে খৃষ্টধর্ম্মের উদাহরণ দিয়া যাঁহারা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন, তাঁহারা ইতিহাস উদ্ঘাটন করিলে হৃদয়ে বল লাভ করিতে পারিবেন। মাথা গুণ্‌তিতে ব্রাহ্ম সংখ্যা কম হইলেও ব্রাহ্ম ভাব দেশে যে সময় মধ্যে যত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, তুলনায় খৃষ্টধর্ম্ম অপেক্ষা ব্রাহ্মধর্ম্মের কাজ ঢের বেশী হইয়াছে। বহুদিন পূর্ব্বে একেশ্বরবাদীদিগের প্রতিনিধি, Rev. Fletcher Williams বলিয়াছিলেন—ভিতর অপেক্ষা বাহিরেই ব্রাহ্মসংখ্যা বেশী। Dr. Sten Konowও বলিয়াছেন, যে নামধারী সভ্য সংখ্যা বেশী না হইলেও ব্রাহ্মসমাজ "has nevertheless exercised an unexampled influence in Modern India. It has become one of the most important centres of those efforts which aim at creating a Modern India

without severing connection with the past." (*Modern Review*, April 1926, p. 459 from Vis´va Bhárati Quarterly). এই বিশ্ব-পণ্ডিতের মতে ইতিপূর্ব্বে আর কেহ এরূপ প্রভাব বিস্তার করে নাই। জল ছিটাইয়া কতকগুলি লোককে একটা নূতন নাম দিলেই কোন উচ্চ নূতন তত্ত্বের সার্থকতা হয় না। রাজর্ষি রামমোহনের বার্ত্তা (Message) ও কার্য্যের (Missonএর) উদ্দেশ্য বাস্তবিকই একটা নূতন আদর্শে জনমণ্ডলীকে গড়িয়া উচ্চ গ্রামে উঠাইয়া লওয়া। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে আস্তে আস্তে পলি পড়ার মত অজ্ঞাতসারে ভূমি উচ্চ হইয়া উঠিতেছে, হঠাৎ স্থানান্তর হইতে মাটি আনিয়া জমির উচ্চতা দেখান হইতেছে না। এই জন্যই ব্রাহ্মসমাজের কাজকে "unezampled" বলা হইতেছে। ইহাই বর্ত্তমান যুগোপযোগী ধর্ম্ম-প্রচার। পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে মিলাইয়া উভয় হইতে উচ্চতর ও মহত্তর আদর্শের দিকে জগৎকে তুলিয়া লইবার জন্যই রামমোহন রায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। খৃষ্টান বা মুসলমান প্রণালীতে উৎসাহের সঙ্গে প্রচার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, বরং অনিষ্টের সম্ভাবনা। তাই, এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পণ্ডিত প্রশ্ন তুলিয়াছেন :—"Will not this spiritual competition repeat itself in the struggle for wealth and influence, as happened in the past century ?" তাহা না করিয়া, সকলে পরস্পর আদান-প্রদানের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোকে স্বীয় স্বীয় আদর্শের উচ্চতা সম্পাদন করতঃ এক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইয়া এক হইয়া যাইবে। বর্ত্তমান যুগে মানুষের আত্মবোধ এমন জাগ্রত আকার ধারণ করিয়াছে, যে ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ (conversion) একটা অপবাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষা সঙ্গ ও আবেষ্টনের ফলে আজকাল মানুষের মন দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু যাহাকে ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ বলা যায়, তাহাতে অনেক স্থলে ইহার দশমাংশ পরিবর্ত্তন সূচিত হইলেও তাহা আত্মসম্ভ্রমে আঘাত করে। এই পরিবর্ত্তন-আনয়ন করাই বর্ত্তমান সময়ে প্রচারের সফলতা বলিয়া গৃহীত হইবে, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করান নহে। এই পথই পথ। পণ্ডিতবর বলেন :—"This is the way pointed out by *Vis´vabhárati*, the Rabindranath Tagore's gift to his nation and to humanity." ব্রাহ্মসমাজের "unexampled influence" পূর্ব্ব হইতেই এই ভাবে কার্য্য করিয়া আসিয়াছে।

যাহা হউক, যাহারা খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছিল, তাহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের বিষয় আলোচনা করিলে ইতিহাসের এই অন্ধকার পৃষ্ঠায় অনেকটা আলোক পাত হইতে পারিবে। কেন না, তদানীন্তন ধর্ম্মবিষয়ক মতামত হইতে তো দেখা যায়ই, তদ্ভিন্ন সে সময়কার খৃষ্টধর্ম্ম-সমর্থনকারী দিগের দাবী, ধর্ম্মনেতৃগণের অনুযোগ অভিযোগ এবং ধর্ম্ম-সাহিত্যের লেখার ভাব ও গতি প্রমাণ করে, যে যাহারা নবধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত লোক একরূপ ছিলই না। অনেক দাস-শ্রেণীর ও উপায়-হীন লোক ইহার মধ্যে ছিল। ভোজে (Agapae) ও আমোদ-প্রমোদে সকলের সঙ্গে সর্ব্বপ্রথম সমান অধিকার পাওয়াতেই ইহারা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে মণ্ডলীতে যোগ দিয়াছিল। ইহার মধ্যে আবার স্ত্রীলোকের সংখ্যাই প্রচুর। খৃষ্টীয় প্রচারকদিগকে লোকে এই বলিয়া ঠাট্টা করিত, যে নারীজাতির কাছে প্রচার করিতেই তাহাদের বেশী উৎসাহ দেখা যায়। সর্ব্বসাধারণেই ভূতে বিশ্বাস করিত এবং মণ্ডলীর কর্ম্মচারিগণের মধ্যে ভূতের ওঝার সংখ্যা অনেক ছিল, এবং দেখা যায়, তাহাদের খাটুনিও ছিল খুব বেশী। পাপ বলিতে দৈহিক পাপের কথাই লোকেরা বুঝিত, আত্মার দিকে দৃষ্টি করিবার সময় তখনও আসে নাই। রোম নগরীতে অধিকাংশ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পূর্ব্ব-দেশীয়। খৃষ্টীয় চরিত্র বলিয়া তখনও কিছু গড়িয়া উঠে নাই। জ্ঞানের দিকে একেবারে শূন্য বলিলেও চলে। যুক্তি তর্ক একেবারে নিষিদ্ধ। না দেখিয়া যে বিশ্বাস করে সেই ধন্য। অর্থাৎ মনুষ্যত্ব বাদ দিয়া যে টুকু ধর্ম্মকর্ম্ম থাকে, তাহাই অনুমোদন করা হইত। ভাবের দিকের একটু আধটু বিকাশ এবং নৈতিক উৎসাহ এক আধটুকু যা পলের পত্রাবলির মধ্যে পাওয়া যায়, তা ছাড়া আদি খৃষ্টীয় সাহিত্যে এমন কিছুই নাই যাহা তদানীন্তন গ্রীশ্‌ ও রোমের সাহিত্যের সঙ্গে তুলিত হইতে পারে। ধর্ম্ম ও কর্ম্মের মধ্যে যা সংবাদ পাওয়া যায় তার আদি অন্ত মধ্য প্রভুর ভোজ (Eucharist)। এই ভোজ অবশ্য সে দিন আরম্ভ হয় নাই। ইহার উৎপত্তি সেই অনাদি কালের নর-খাদক রাক্ষসদিগের মধ্যে। অধুনা কেবল আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ও মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস-প্রভাবে সংস্কৃত আকারে মানব সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে। খৃষ্টানগণ এখনও বিশ্বাস করেন, পুরুতঠাকুর মন্ত্রোচ্চারণ করিলেই পানীয় ও খাদ্য খৃষ্টের বাস্তব রক্ত-মাংসে পরিণত হত, যেমন কাহারও কাহারও বিশ্বাস অমুক তিথিতে

আদি খৃষ্টানগণের নীতি ও ধর্ম্ম অতি অনুন্নত

অমুক জিনিষ খাইলে গোমাংস খাওয়া হয়। যাহা হউক, সকল মানুষই তো ভূতে পাওয়া। বিশেষতঃ পেগানেরা। হাতে পাইলে প্রথম এক দফা তাহাদিগকে ভূত ছাড়াইয়া অভিষেক করিয়া লইতে হইত। এই অভিষেক বা ব্যাপ্টিস্ম আর কিছুই নয় জেণ্টাইলদের জন্য সারকম্‌সিসন্ (Circumcision) রূপ বর্ব্বর প্রথার বিকল্প বিধান। ইহার প্রয়োজন, ভোজে (Eucharist) প্রভুর রক্ত-মাংসরূপ প্রসাদের অধিকারী হওয়া। অভিষেক না হইলে ভোজে যোগ দিবার অধিকার হয় না, প্রসাদও পায় না। ইহাই ছিল খৃষ্টধর্ম্মের চতুর্ব্বর্গ—ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ। উহাতেই স্বর্গ-লাভ, আর কিছুরই প্রয়োজনীয়তা ছিল না। তাই ব্যাপ্টিস্ম না হইলে অতি অপোগণ্ড শিশুকেও নরকে যাইতে হইবে। এই তীর্থ-সলিল-স্পর্শ ও প্রসাদ-ভক্ষণ রূপ বাহ্য কর্ম্মকাণ্ডের ধর্ম্মে নৈতিক জীবন বিকাশের স্থান অল্পই ছিল। তাই দেখা যায়, অতি বদ্‌চরিত্রের মানুষও রাতা-রাতি স্বর্গে যাইবার প্রলোভনে জীবন দিয়া ও উৎপীড়িত হইয়া মার্টার ও সেণ্ট্‌ রূপে পূজা পাইয়া আসিতেছে। আর, স্বর্গের ভোগবিলাসের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে প্রলোভন না হয় কাহার? "Eat drink and make merry"র যে ধূম তাহাতে মুনির মনও টলে। এই সম্পদ্ লইয়াই তো খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। সেইজন্য, প্লাতুন, আরিস্ততল্ প্রভৃতি জ্ঞান-ধর্ম্মের যে স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাতে অধ্যাত্ম জগতে যে শস্য-শ্যামলা ধরিত্রীর আবির্ভাব হইয়াছিল—সেখান হইতে তদানীন্তন খৃষ্টীয় সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে মনে হয় আলো-বাতাসহীন এক মরুভূমিতে প্রবেশ করিলাম। অন্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি অরিগেনের কথা ধরা যায়, তবেই এই মন্তব্যের সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে। এই অরিগেনকে আদি ধর্ম্ম পিতা ও নেতাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সেল্‌সস্ নামক খৃষ্ট বিরোধী একজন ইহুদীর সঙ্গে তাঁহার যে বাদ প্রতিবাদ-গ্রন্থ (*Contra Celsus*) আছে তাহাতে কি তত্ত্ব কি নীতি, কোন দিক্ দিয়াই তিনি প্রতিপক্ষের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ইহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি কতকগুলি নামের দৈব শক্তির দোহাই দিয়া উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করিতেছেন, যেমন আমাদের দেশে সাধারণ লোকে রাম নামের ভূত তাড়ান শক্তিতে বিশ্বাস করে। গ্রামে দেখা যায়, ফকীর সন্ন্যাসীরা তুক্‌তাক্ মন্ত্র দিয়া শিষ্য সংগ্রহ করে, এও সেই শ্রেণীর। অন্যান্য নেতাদের মধ্যে জষ্টিন্ মার্টার ও ক্লেমেণ্টের সঙ্গে প্লুতার্ক বা এপিক্‌তেতসের তুলনা করিলে খৃষ্টীয় মণ্ডলীর জ্ঞান-দৈন্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

বহুমান্য নেতাদিগেরই (Fathers) যখন এই দশা তখন পেপিয়স্, পলিক্রপ্, ইগ্‌নেসিয়াস্ প্রভৃতি যাঁহারা কেবল স্বর্গের প্রলোভন ও নরকের ভয় দেখাইয়া শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং ইঁহারাই বাস্তবিক শিষ্য সংগ্রহ করিয়া খৃষ্টমণ্ডলী বাড়াইয়াছিলেন—তাঁহাদের অজ্ঞতার কথা না বলাই ভাল। ঐতিহাসিক ইউসিবিয়সের কথায় বুঝা যায়, যে ইঁহারা তুকতাক্ ফুক্‌ফাক্ জলপড়া মাদুলির সাহায্যেই ধর্ম্মপ্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্ম-সমাজে যে একটা সংস্কার আছে, অন্ততঃ কাহারও কাহারও মধ্যে, যে 'জেলে মালা'র দ্বারা খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা সত্যই। কিন্তু ইহাতে প্রমাণ হয় না যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক হইতে হইলে জ্ঞানী লোক চাই না। কেন না, জেলেমালারা যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল তাহা তুক্‌তাক্ ফুক্‌ফাকের ধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্মকেও সেই স্থানে নামাইয়া আনিয়া প্রচার করিলে জ্ঞানীর প্রয়োজন হইবে না। ঐতিহাসিকগণ তুলনামূলক সমালোচনায় দেখাইয়াছেন, যে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থের মধ্যেও তদানীন্তন জগতের নীতিতত্ত্ব অপেক্ষা উচ্চতর কিছুই ছিল না। অগস্তিনের 'স্বীকারোক্তি' হইতে পাওয়া যায়, যে তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম্মো-পদেশের দ্বারা নহে কিন্তু কিকরোর (Cicero) রচনাবলি পাঠ করিয়া ধর্ম্ম জীবনের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ষ্টোয়িক জগতের কাছে নৈতিক জীবনের উচ্চতা দেখাইবার কল্পনাটাই খৃষ্টধর্ম্মের পক্ষে ধৃষ্টতা বলিয়া পরিগণিত হইত। খৃষ্টীয়-চরিত্র বলিয়া একটা কোন কিছুর নামগন্ধও এ যুগে পাওয়া যাইতেছে না। প্লুতার্কের মত ধার্ম্মিক জনহিতৈষী, মার্কাশ্ আরেলিয়াস্ বা এপিক্‌তেতসের মত নীতিবান্‌দিগের নিকট খৃষ্টধর্ম্ম কিছুই উপহার দিবার মত উপস্থিত করিবার স্পর্দ্ধা রাখে নাই। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইতে না হইতেই কি ব্রাহ্ম-চরিত্র বলিয়া একটা বিশেষ বস্তু জনসমাজে প্রচলিত হইয়া ছিল না? অন্যদিকে, আগেকার কথা ছাড়িয়াই দি, এখনকারও সকলের কথা বলিতেছি না—কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে এখনও কি দ্বিতীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বা প্রফুল্লচন্দ্র পাওয়া যায়! খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল নৈতিক বা আধ্যাত্মিক শক্তিবলে নহে; বরং এ সকল বিসর্জ্জন দিয়া। সর্ব্বসাধারণ যা চায় তাই জোগাইয়া, সর্ব্বসাধারণকে উন্নতির দিকে লইয়া গিয়া নহে। এ কথা সত্য যে বাইবেলে অনেক নীতিতত্ত্ব সংগৃহীত আছে এবং

খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের ভ্রান্ত সংস্কার

তুলনায় ব্রাহ্মসমাজের কৃতিত্ব অনেক বেশী

ব্রাহ্মসমাজও এরূপ সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু কেবল নৈতিক জীবনের উচ্চ আদর্শের দৃষ্টান্তে মানব সাধারণকে উপরে তোলা যায় না। কি প্রাচীন কালে কি বর্ত্তমান যুগে এ কথা ভুলিলে ভ্রান্তিতে পতিত হইতে হইবে, যে শিক্ষায় ও সামাজিক জীবনে নৈতিক জীবনোপযোগী গুরুতর মৌলিক পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে না পারিলে কেবল মাত্র নৈতিক আদর্শ মানুষের জীবনকে নূতন করিয়া গড়িতে পারে নাই, পারিবে না। সংস্কারককে সংস্কারের মত্ততায় এই মূল তত্ত্বটী ভুলিলে চলিবে না। ব্রাহ্ম সমাজে একটা মস্ত ভ্রান্তি চিরদিন চলিয়া আসিতেছে, যে যিশু জীবনে উচ্চ-আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লাভ করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন তাই লোকে দলে দলে তাহা গ্রহণ করিয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার এই মিথ্যার উপরে চিরদিন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যিশুর ডাকে যে কেউ সাড়া দেয় নাই, যিশুপুরাণ-রচয়িতা মৃত্যু-কালীন অবস্থার বর্ণনায় প্রকারান্তরে তাহা স্বীকারই করিয়াছেন। খৃষ্টধর্ম্ম রোম সাম্রাজ্যে পরিব্যাপ্ত হইল তদানীন্তন ধর্ম্ম সম্প্রদায় সকলের রীতিনীতি আচার-ব্যবহার পূজা পদ্ধতি অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সকল গ্রহণ করিয়া, আপনার ধর্ম্ম সকলকে বিলাইয়া নহে। নাম পরিবর্ত্তন করিল মাত্র, আর সব বজায় রাখিল কড়ায় গণ্ডায়। মানুষগুলিকে ধর্ম্মের নাম পরিবর্ত্তন ছাড়া আর কিছুই করিতে হইল না। তাহাও জোরজবরদস্তিতে, যে নূতন যিশু দেবতার আবির্ভাব হইল, তিনি নামে মাত্র ভিন্ন। কিন্তু তাঁর জন্মমৃত্যুর তারিখ, জন্মমৃত্যু-প্রণালী জীবনযাত্রা কথাবার্ত্তা অর্থাৎ সমগ্র কুষ্ঠিখানা সবই রহিল তাহাদের পূর্ব্বপূজিত মিথ্র, দিওনিসশ্ প্রভৃতি দেবতা সকলের অনুরূপ, হুবহু তাঁহাদেরই নূতন সংস্করণ। ঐতিহাসিক মোসেম্ স্পষ্টই বলিয়াছেন, যে পেগান্‌দিগের ধর্ম্মের যজন যাজনের সঙ্গে নব-প্রচারিত খৃষ্টধর্ম্মের কদাচিৎ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইত। "পুতুল"-পূজায় তো প্রাচীনকে হারাইয়াই দিয়াছিল। সেই প্রাচীন ধর্ম্মেরই মত মধ্যবর্ত্তী দেবতার দ্বারা সুপারিশ (Intercession), বলিদানে বাহ্যাচারে পাপস্খালন; ব্রতোপবাস ও প্রায়শ্চিত্ত; স্থানে স্থানে বিশেষ উপলক্ষে স্থানীয় দর্গায় সিন্নি ও প্রতিমা-পূজা; এক দিকে গুহ্য পূজাপদ্ধতি, অন্যদিকে আড়ম্বরপূর্ণ পার্ব্বণাদি, রাজার মঙ্গল কামনায় বিশেষ পূজা ও শোভাযাত্রাদি সবই রহিল, কেবল বদ্‌লাইল নাম। পরিণামে নামও যে রক্ষা পাইল, তাহাও খৃষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করা আইনতঃ বারণ ছিল বলিয়া। ব্রাহ্মণ্য

আদিতে খৃষ্টধর্ম্ম ও পেগান্ ধর্ম্ম একই—উভয়েই পৌত্তলিক

ধর্ম্ম যেমন বৌদ্ধধর্ম্মের সবটাই আত্মসাৎ করিয়া বুদ্ধের জন্মভূমি হইতে তাঁহার ধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল, খৃষ্টধর্ম্মও গ্রীক্ ও রোমক ধর্ম্মের পূজা পদ্ধতির মধ্যে আপনাকে মিশাইয়া দিয়া রোম সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল। গোঁড়া একেশ্বরবাদী ইহুদীদেশে এই প্রণালীতে ধর্ম্ম প্রচারের কোন সম্ভাবনা ছিল না বলিয়াই খৃষ্টধর্ম্ম জন্মস্থানে দন্তস্ফুট করিতে পারিল না। একজন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, "What survived as Christianity was really an idolatrous polytheism." সুতরাং ইহুদীদেশে খৃষ্টধর্ম্মের 'ডা'ল' গলিতে পারে নাই। ইহার একটী অর্থনৈতিক কারণও ছিল। ইহুদীদেশের পুরোহিত গোষ্ঠী এমন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, যে সেখানে আর একটী প্রতিদ্বন্দ্বী পুরোহিত সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়া পূর্ব্বোক্তদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া শক্তি সঞ্চয় করিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু রোম-সাম্রাজ্যে খৃষ্টীয় পুরোহিত সম্প্রদায় রাজার সাহায্যে প্রাচীন পুরোহিতদিগের ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়া বসিল। খৃষ্টধর্ম্ম প্রাচীন ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিল অর্থনীতির বলে, ধর্ম্মবলে নহে।

খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারে অর্থনীতির জয়

ধর্ম্মজীবনেও কোন পরিবর্ত্তন আসিল না। অন্যান্য ছোট বড় উপদেবতারা সকলেই সেণ্ট (saint) নামে পূজিত হইতে লাগিলেন। অতি সহজেই Saint প্রস্তুত হইত। এক । সে আছেন দিওনিসশ্ বাক্কস্, ডিমিট্রিয়স, রষ্টিকস্ ও এলুথিরিয়স্। এক সঙ্গে ইহাদের পূজা হইত অক্টোবর মাসে। এই পঞ্চ নামে গ্রীক্ দেবতা দিওনিসশ্ পূজিত হইতেন, যেমন আমাদের "পঞ্চপাণ্ডু" বা পঞ্চবুদ্ধ। হইলে কি হয়, খৃষ্টীয় ইতিহাসে ইহারা ধর্ম্মার্থে জীবন দিয়াছিলেন বলিয়া মার্টার-সেণ্টরূপে পূজিত। মার্টার (Matyr) রূপে ইহাদের জীবনচরিত লিখিত হইতে বাধা হয় নাই। এমন জীবন্ত ইতিহাসের কি প্রতিবাদ চলে? সেণ্ট দিওনিসশ্ কাগজপত্রেই রহিলেন। পূর্ব্বেও লোকেরা দিওনিসশের পূজা করিত, এখনও করিতে লাগিল। God Dionysos কি Saint Dionysos, এত খবরে তাহাদের প্রয়োজন কি? কিন্তু গ্রামের পর গ্রাম খৃষ্টান আখ্যা প্রাপ্ত হইতে লাগিল, অর্থৎ খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইল। এ দিকে রাজারাও সুবিধামত হুকুমের জোরে গ্রামকে গ্রাম খৃষ্টান করিয়া তুলিতে লাগিলেন। ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রাজতন্ত্রের পরিপোষক হইয়াছিল। জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে দেখা যায়, এদেশে সাধারণ তন্ত্রের অভাব ছিল না, কিন্তু ব্রাহ্মণ সাহিত্যে সে খবরের বড়ই

নূতন নামে পেগান্ ধর্ম্মই প্রচারিত হইল

অপ্রতুল। সেই রূপ খৃষ্টধর্ম্ম যথেচ্ছাচারী রাজার পৃষ্ঠপোষক দাঁড়াইয়া গেল। সুতরাং রাজারা খৃষ্টধর্ম্মের সাহায্য লইলেন ও উহাকে বাড়াইয়া তুলিলেন। যাঁহারা প্রচলিত সংস্কারে পিঠে হাত বুলাইয়া চলেন তাহাদের ডাকে কেন লক্ষ লক্ষ লোক একত্রিত হয়, আর যাঁহারা উচ্চ আদর্শ দান করেন তাঁহাদের ডাকে মানুষ কর্ণপাত করে না, ইহা বলিয়া আক্ষেপ করিবার কিছুই নাই। যাঁহারা পুরাতনকে নূতন নাম দিয়া বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া প্রচার করেন, তাঁহাদের দলে ভিড় হইবেই। মানুষ পুরাতন ছাড়িতে চায় না। কেবল তাহাই নহে, ছাড়িয়া উঠিতে পারে না। পুরাতনের সঙ্গে তাহার জীবন নানা দিক্ দিয়া জড়াইয়া রহিয়াছে। সে জাল হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে 'সহস্রে পারে না এক'। খৃষ্টধর্ম্ম পুরাতনকে নূতন নামে পরিচিত করিয়া জন-বল বাড়াইয়াছিল। স্মারক-চিহ্ন-সম্বন্ধীয় বস্তুর পূজা (Relics worship) তো পৌত্তলিকতার নামান্তর মাত্র। সুতরাং চিরপরিচিত পৌত্তলিকতাও এক দরজা দিয়া বাহির হইয়া গিয়া অন্য দরজা দিয়া আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বহুদেববাদ সম্বন্ধেও ঠিক ঐ একই কথা। প্রথমে যে ত্রিত্ব লইয়া বহুদেববাদের আবির্ভাব, ক্রমে তাহা খাটি মিসরীয় ত্রিত্ববাদে পরিণত হইল। নানা দেবতায় দিন দিন মন্দির পূর্ণ হইতে লাগিল। প্রথম পবিত্রাত্ম "(Holy ghost)" হইলেন যিশুর মাতা। কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়াবাসীরা, যাহাদের মধ্যে প্রথম খৃষ্ট ধর্ম্ম মূল পাইয়াছিল, তাহাতেও তৃপ্ত হইল না। সভা করিয়া পাশ করিয়া লইল, যে খৃষ্ট-মাতা মেরী ঈশ্বরের মাতা বলিয়া পূজিতা হইবেন। সুতরাং খাটি পিতা-মাতা-পুত্র সমন্বিত মিসরীয় ত্রিত্বের আবির্ভাব হইল। কাজেই, দেশ শুদ্ধ লোকের খৃষ্টান হইতে আর আপত্তি থাকিবে কেন? পরে ত্রিত্বটা একেবারে মানবীয় লীলায় পরিণত হইল—যোসেফ-মেরী-যিশু। আর এক ত্রিত্ব হইল, য়্যানা (মেরীর মাতা অর্থাৎ যিশুদেবের দিদিমা), মেরী ও যিশু। রাধাঠাকুরানিও যে আসিয়াছিলেন তাহা প্রাচীন অনেক চিত্রেই দেখিয়াছি। সুতরাং বহুদেববাদী পেগন্ দিগের নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কোনও আপ্শোষের কারণ রহিল না রাজা রামমোহন রায় ঐতিহাসিক মোসেমের গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছেন, খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতের বিরোধের সময় একেশ্বরবাদীরা যে হারিয়া গেল, তাহার কারণ—খৃষ্টীয়ধর্ম্মমণ্ডলী সকলের মধ্যে বহুদেববাদী জনসংঘের সংখ্যাধিক্য। ইংরাজিতে বলে "The more the merrier." ইহারা দেখিল তিন তিন-ই সই, একের অপেক্ষা তো ভাল। এই তিন লইয়া যাত্রা সুরু হইল থামিল যাইয়া

যেখানে, সেখানে অনেক দেবতা, অনেক পুতুল জড় হইয়াছে। ইস্‌লামের গুরুতর আঘাতে যে দিন খৃষ্টজগৎ আপনার ঘর সাম্‌লাইতে আরম্ভ করেন, সে দিন দেখা গিয়াছিল, যে এপোলোর মন্দিরের সঙ্গে খৃষ্টীয় চার্চ্চের কোন বিভিন্নতা নাই।

প্রতারণার সাহায্যে প্রচার

মুসলমানেরা খৃষ্টানদিগকে বহুদেববাদী পৌত্তলিক বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিল এবং না ধরিবার কোন কারণই ছিল না। কল্পিত বা প্রকৃত সাধু-মহাত্মাদিগের মূর্ত্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন হইতেই মূর্ত্তিপূজার সূত্রপাত। তার পর মৃতাস্থির দৈবশক্তিতে তাহাদের বিশ্বাস। অস্থি-সংগ্রহের বাতিক এত দূর পর্য্যন্ত গিয়াছিল, যে কোনও সাধু স্বস্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে তাঁহাকে হত্যা করিয়া শিষ্যেরা তাঁহার অস্থি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিবার আয়োজন করিয়াছিল। আর এ সাধুটীও যেমন তেমন সাধু ছিলেন না! ইহার পিতার প্রচলিত ধর্ম্মমতে সন্দেহ উপস্থিত হইলে, পিতাকে লগুড়াঘাতে প্রায় সশরীরে স্বর্গে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল—প্রাচীনের প্রতি এমন নিষ্ঠাবান্ সাধুর স্মরণ-চিহ্ন না রাখিলে চলে! বৃন্দাবন হইতে আনীত বালুকণা বৃদ্ধাদিগকে ভক্তির সহিত গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি। প্যালেষ্টাইনের ধূলি আদি খৃষ্টানগণ যাদুগুণসম্পন্ন বলিয়া মনে করিতেন। যিশু-মূর্ত্তির তো কথাই নাই। ক্রুশচিহ্ন ভূত তাড়াইবার যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইত। ছোটনাগপুরে এখনও বংশদণ্ড এইরূপে ব্যবহৃত হয়। তারপর, যখন কনস্তান্‌তাইনের মাতা হেলেনা আসল ক্রুশখানা আবিষ্কার করাইলেন, তখন সেটা দাঁড়াইয়া গেল খোদার চাইতে উনিশ আর বিশ। গ্রীক্ ভাস্করদিগের মূর্ত্তির কাছে দাঁড়াইয়া কে না বিহ্বল হইয়াছেন? তাই যখন মিশরীয় মাতা আইসিস্ ও পুত্র হোরাসের প্রতিমাখানা (Madonna) মেরী ও যিশুর মূর্ত্তি বলিয়া ধরা পড়িল, তখন প্রতিমা-পূজারও ধূম পড়িয়া গেল! প্রথমে বিশ্বাস ছিল, মৃত ব্যক্তিরা তাহাদের সমাধি-স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। শেষে দাঁড়াইল, তাহাদের আত্মা তাহাদের-জন্য-কল্পিত মূর্ত্তির মধ্যে প্রবেশ করে। সুতরাং সাধু-ভক্তদিগের নিকটে যে প্রার্থনা তাহা তাঁহাদের মূর্ত্তির নিকটে হওয়াই স্বাভাবিক দাঁড়াইয়া গেল। এবং যিশু ও মেরীর মূর্ত্তিও যখন এই ভাবে ব্যবহৃত হইতে লাগিল, তখন পৌত্তলিকতা ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। যে ধর্ম্মের মূলতত্ত্বই এই, যে পুরোহিতের মন্ত্রবলে পানীয় ও খাদ্য যিশুর রক্তমাংসে পরিণত হয়, তাহার

পক্ষে এ সকল তো সমুদ্রে শিশির-বিন্দু। যখন পেগান্ প্রতিবাদকারী ছিল, তখন আচার্য্যেরা বাহিরে ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতেন। তার পর যখন প্রতিবাদ চলিয়া গেল অর্থাৎ সব হইয়া গেল খৃষ্টান্, তখন এই অতি স্থূলভাবেই প্রভুর ভোজ গৃহীত হইত। তখন ধর্ম্ম দাঁড়াইল পুরোহিত-নিয়ন্ত্রিত এক ভোজের বাজী। বিশ্বাসে মুক্তি, কর্ম্মে মুক্তি, অথবা প্রতিবেশীকে ভালবাস ইত্যাদির যুক্তি—এসব গেল চুলোয়। বাকী রহিল পুরোহিতের হস্ত হইতে এই প্রসাদ গ্রহণের অধিকার। এই প্রসাদ পাইলেই মোক্ষলাভ। স্থতরাং স্বর্গের চাবিকাঠী পুরোহিত-গুরু পোপের হাতে আসিয়া পড়িল, এবং এমন একটা সর্ব্বনাশকর পৌরোহিত্যের স্থষ্টি হইল যাহা আর কোন ধর্ম্মেই কখনও হয় নাই। এমন করিয়া মনুষ্য-সমাজের সর্ব্বনাশ আর কোথায়ও দেখা যায় নাই। মানুষ প্রকৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান বর্জ্জিত হইল। পুরুতঠাকুর এক কথায় মানুষের সকল পাপ দূরীভূত করিয়া স্বর্গে পাঠাইতে পারেন, ধার্ম্মিকও পুরুতের রোষে নরকাবর্ত্তে পতিত হন। চাই প্রণামী আর দক্ষিণা। এরূপ স্থলে ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞান পর্য্যন্তও মানুষের লোপ পাওয়াই স্বাভাবিক। নীতিবিদ্ বলেন, এততেও যে খৃষ্টজগতে নীতিজ্ঞান বিলুপ্ত হইল না তাহার কারণ এই, যে মানুষের মধ্যে খানিকটা নীতিজ্ঞান এতই স্বাভাবিক, যাহা না থাকিলে মানুষ মানুষই হয় না এবং মনুষ্যসমাজও টেঁকে না। তাই এই অবশিষ্ট নীতিটুকু খৃষ্টধর্ম্মও নষ্ট করিতে পারে নাই। আর, এই যে পুরোহিত-গোষ্ঠী, ইহারা কি চরিত্রের লোক ছিলেন? ইহারা কি সাধু সন্ন্যাসী ছিলেন? ইহাদের অনেককে তিনটী ব্রত লইতে হইত—ব্রহ্মচর্য্য, দারিদ্র্য ও বাধ্যতা ব্রত। ঐতিহাসিক গিবন্ বলেন—"I have somewhere heard or read the frank confession of a Benedictine abbot: 'my vow of poverty has given me hundred thousand crowns a year: my vow of obedience has raised me to the rank of a sovereign prince.'—I forget the consequences of his vow of chastity." যে বিষয়ের সংবাদটী গিবন্ দিলেন না, আর একজন ঐতিহাসিক তাহা দিতেছেন। রবার্টসন্ বলেন—"Under Justinian we hear of two Eastern Bishops convicted of unnatural vice, and—the law as usual exceeding the crime—punished by mutilation." এ তো গেল "unnatural"এর কথা।

"Natural"এর অন্ধকার ঘর আর খুলিয়া কাজ নাই। এই বলিলেই যথেষ্ট, "bishops took at least as much liberty of life as popes and presbyters." পোপ্ এবং বিশপদিগেরই যদি এই দশা, অন্যদের কথা না তোলাই ভাল। যাক্, কথায় কথায় বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছি। খৃষ্টীয় বহুদেববাদ ও পুতুল-পূজার কথা হইতেছিল। শিক্ষিতেরা দু'এক জন স্থূল পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করিলেন বটে, সেরূপ প্রতিবাদ গ্রীক্ রোমক দার্শনিকেরাও করিয়াছেন, আমাদের দেশের ঋষিমুনিরাও করিতেন, তাহাতে কিন্তু পুতুল-পূজা ঠেকিয়া থাকে নাই। ও প্রতিবাদ পুথি-পুস্তকেই আবদ্ধ রহিয়াছে। রাজরাজড়ারা সময় সময় মৃত্যুদণ্ড ব্যবস্থা করিয়া পেগান্ দেবতার পূজা নিবারণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রজারা জুস্-মূর্ত্তি (Zeus) ছাড়িয়া যিশু-মূর্ত্তি ধরিল। অর্থাৎ খৃষ্টান হইয়াছে বলিয়া পৈতৃক ধর্ম্ম* পরিত্যাগ করিল না; মৃত্যুদণ্ড হইতেও রক্ষা পাইল, খৃষ্টধর্ম্মও প্রচারিত হইল।

খৃষ্টধর্ম্ম জন সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার দ্বিতীয় প্রণালীটি অতি ভীষণ।

অস্ত্রের সাহায্যে প্রচার

খৃষ্টীয় লেখকগণ মুসলমান ধর্ম্মকে বলিয়াছেন—"The religion of the sword." খৃষ্টধর্ম্মেরও সে আখ্যা প্রাপ্ত হইবার স্পষ্টতর যোগ্যতা রহিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ সার্‌লোমেন্ (Charlemagne) হুকুম দিয়াছিলেন, যে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না তাহাকে হত্যা করা হইবে। কত লোক হত হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। যাহারা রহিল, তাহাদিগকে বৈষয়িক সুবিধা দিয়া হাত করা হইল। সর্ব্বত্রই এইরূপ ঘটিয়াছে। না হইলে হাজার হাজার এক দিনে দীক্ষিত হয় কি করিয়া? হিরাক্লিয়াস্ দলে দলে ইহুদীদিগকে ধরিয়া জোরজবরদস্তিতে দীক্ষিত করিতেন। কথিত আছে, ইংলণ্ডে অগষ্টিন্ এক দিনে দশ সহস্র লোক দীক্ষিত করেন। খোঁয়াড়বদ্ধ ছাগল ভেড়া যেমন হাজার দরে বিক্রীত হইয়া এক প্রভুর অধিকার হইতে অন্য প্রভুর অধিকারে যায়, তেমনই মানুষেরাও দলে দলে এমনি ভাবে

* কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দুর্ভিক্ষের সময় একদল কৃষক শ্রেণীর লোক খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে। তারপর যখন সুবৃষ্টি হইল, প্রচুর ফসল জন্মিল, তাহারা 'বারোয়ারি' পূজা আরম্ভ করিয়া দিল। পাদ্রী সাহেব ছুটিয়া আসিলেন—বলিলেন, "তোমরা খৃষ্টান হইয়াছ, প্রতিমা পূজা করা তোমাদের পক্ষে পাপ।" তাহারা বলিল—"সাহেব, খৃষ্টান হয়েছি বলে' কি পৈতৃক ধর্ম্মও ছেড়েছি।"

খৃষ্টধর্ম্মের অধিকারে আসিয়াছিল। বনিফেস্ উত্তর জার্ম্মাণিতে এক বৎসরে এক লক্ষ লোককে স্বর্গের অধিকারী করিয়া ছাড়িয়াছিলেন। যেখানে জোর চলে না সেখানে তৃতীয় পন্থা—পার্থিব প্রলোভন। বনিফেস্ বন্ধুদের পরামর্শে ইহা প্রচার করা প্রণালী স্থির করিয়াছিলেন, যে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরাই জগতে সুখী এবং সুখ লাভ করিতে হইলে খৃষ্টধর্ম্মই গ্রহণ করিতে হইবে। এখনও মিশনারীরা এই যুক্তিটী খাটাইতে পশ্চাৎপদ নহেন। ঐতিহাসিক বলেন—"No religion was ever more unspiritually propagated." ধর্ম্মটীর উচ্চতম আকর্ষণই তো ছিল—স্বর্গের সুখ, অনন্ত নরকের দুঃখের ভয়, এবং পৃথিবীটা শীঘ্রই ধ্বংস হইতেছে। তার উপরে এই তিন প্রচার প্রণালী যুক্ত হইয়া সহস্রাধিক বৎসর মানুষকে দুর্গতিতে ফেলিয়া রাখিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি আপনার উচ্চ আদর্শ বজায় রাখিতে চাহেন তবে ধর্ম্মপ্রচারে খৃষ্টধর্ম্মের অনুসরণ তো করিবেনই না, উহার উল্লেখ করাটাও ধর্ম্মবুদ্ধিতে পরিহার করিবেন। লোক সংগ্রহকে প্রধান স্থান দিলে আদর্শ কখনও অক্ষুন্ন থাকিবে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম থাকিতে চাহেন তবে তাহা লবণরূপে ব্যবহৃত হইবে, ব্যঞ্জনরূপে সাধারণ ভোজে পরিবেশিত হইবে না। আদর্শ-নিষ্ঠ উন্নত চরিত্র যদি বজায় রাখিতে চাই, লোক-সংগ্রহে ব্যস্ত হইলে দুকূল যাইবে।

খৃষ্টধর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানোন্নতির বাধা

খৃষ্টধর্ম্ম জ্ঞানের দিকে জগতের যে অবর্ণনীয় অনিষ্ট করিয়াছিল তাহার ফলেই নিজেরও দুর্গতি না হইয়া পারে নাই। রোম-সাম্রাজ্যে যে শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা ছিল তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইল। এথেন্সের দার্শনিক চর্চ্চা বাধা পাইয়া উঠিয়া গেল। সাধারণের পক্ষে গ্রন্থপাঠ নিষিদ্ধ হইল। বিজ্ঞানের অনুশীলন ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় বৈদ্য-বিদ্যা উঠিয়া গিয়া তাহার স্থানে পুরোহিত ও ভূতের ওঝা রোগ-নিবারণের ভার প্রাপ্ত হইল। এবং পৃথিবী যে গোল গ্রীশের এই শিক্ষা ধীকৃত হইল। সর্ব্বোপরি, শিল্পের দিকে জগতে অতুলনীয়—আবার জগৎ তাহা কোন কালে পাইবে কি না সন্দেহ, সেই গ্রীশ ও রোমের ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের নিদর্শনগুলিকে সৌন্দর্য্যজ্ঞানহীন এই পশুরা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিতেছিল। অন্যদিকে, অন্ধকারে যেমন সাদা কালা এক হইয়া যায় তেমনি খৃষ্টধর্ম্ম যে অজ্ঞানান্ধকার বিস্তার করিল তাহার ফলে সত্যাসত্যের জ্ঞান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল। প্রচারিত হইল, খৃষ্টধর্ম্ম পোষণের

জন্য জাল-জুয়াচুরী ("Pious fraud") সব ধর্ম্মসঙ্গত। নূতন শক্তি যখন প্রকাশিত হয় তখন উহা জগৎকে অগ্রসর করিয়া দেয়। কিন্তু দেখা যাইতেছে, খৃষ্টধর্ম্ম মানবজীবনের কোন বিভাগেরই উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই। কোনও ঐতিহাসিক খৃষ্টধর্ম্মের দোষ স্খালন করিতে যাইয়া বলেন, যে প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা অত্যন্ত স্থিতিশীল বলিয়াই এরূপ ঘটিয়াছে। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম স্থিতিতে গতি আনয়ন করিতে পারেন নাই, এ অভিযোগের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবেন না। সুতরাং একটা প্রাচীন সভ্যতার লীলাক্ষেত্র খৃষ্টধর্ম্ম-বিস্তারের পরেও সহস্রাধিক বৎসর অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া রহিল। গ্রীক্ ও রোমক শিক্ষার পুনরাবির্ভাবেই পাশ্চাত্য দেশে অন্ধকারের মধ্যে নব-সভ্যতার আলোক বিকীর্ণ হইল। লোকে ইহাকে খৃষ্টীয় সভ্যতা বলে। বাস্তবিক আধুনিক সভ্যতা খৃষ্টধর্ম্মকে পরাভূত করিয়াই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ঐতিহাসিকেরা বলিলেন—"It is not Christianity that has civilised Europe but Europe—the complex of political and culture forces—that has civilised Christianity". বর্ত্তমান যুগেও যে দিন পাশ্চাত্যগণ ভারতে প্রবেশ করেন সে দিনও ভারতমাতা সর্ব্ববিষয়েই ইয়োরোপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মানুষকে উন্নত করিবার শক্তি খৃষ্টধর্ম্মের এমনই প্রবল! কিন্তু যাক্ সে দুঃখের কাহিনী।

এতকাল খৃষ্টভূমিতে তবে কি চলিতেছিল? এক দিকে সাধারণ লোকেরা সেই প্রাচীন বাহ্যপূজা লইয়া সন্তুষ্ট, অন্যদিকে তথাকথিত দার্শনিকেরা নূতন ধর্ম্মমত (heresy) দমনের জন্য চুলচেরা বিচারে ব্যস্ত। নিশের সভায় (Council of Nicaea, 321) হাত তুলিয়া ঠিক হইল পুত্র পিতারই সমান। কনস্তান্তিনোপলের সভার (৩৮১) সিদ্ধান্ত—পুত্র মানুষই ছিলেন। কাজেই এফিসসে (৪৩১) গোঁজামিলের প্রয়োজন হইল, যে পুত্র ঈশ্বর ও পুত্র মানুষ একই। এ তো বড় জ্বালা। একই? বহুবাদীরা চটিয়া গেলেন। তাই ক্যাল্‌সেডনে (৪৮২) মীমাংসা হইল—এক হইলে কি হয়, ভিন্ন ভিন্নও বটে!*

* এক জন কলিকাতা বেড়াইয়া গিয়া পাড়াগাঁয়ে খুব গল্প জুড়িয়া দেয়। গাঁয়ের মোড়ল মুরুব্বিয়ানা দেখাইবার জন্য বলিল, কল্‌কাতা গিয়েছিলি যে, রাণী রাসমণিকে দেখেছিস্? সে উত্তর করিল, তা আর দেখি নাই? দুই কাণে তাঁর দুই মণ সোণার দুই দুল। তখন সকলে বলিয়া উঠিল, তবে যে কাণ ছিঁড়ে যাবে? সেও হটিবার পাত্র নয়, উত্তরে বলিল—দুই মণ সোণা হ'লে কি হয়, মধ্যে ফাঁপা।

'সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে', এই ন্যায় অনুসারে এ সব মীমাংসা। এই রূপেই খৃষ্ট-জীবনের খিচুড়ী পাকিয়া উঠিয়াছিল। মানুষই যে তার ঈশ্বর গড়িয়া ভাঙ্গে, ভাঙ্গিয়া গড়ে তাহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু সত্যিকার ঐতিহাসিক মানব চরিত্র সম্বন্ধে এমন ভাঙ্গা গড়া সম্ভব হয় কি? এখানে দেখিলাম, মানুষ তাহার উপাস্য দেবতা ভাঙ্গিতেছে ও গড়িতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান কালের একেশ্বরবাদী খৃষ্টানগণ যে বলিয়াছেন—যিশু ছিলেন একজন নৈতিক উপদেষ্টা মানুষ—যিনি 'শৈলবেদীর উপদেশ' ("The Sermon on the Mount") প্রদান করিয়াছিলেন, প্রাচীন ইতিহাসে সে মানুষ যিশুর কোনই খবর পাওয়া যায় না। রাজর্ষি রামমোহন যে উপদেশাবলি আবর্জ্জনা রাশির মধ্য হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছিলেন, এবং যে দুষ্কর্ম্মের (!) জন্য তাঁহাকে খৃষ্টানদের হাতে প্রভূত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, এই সময়ের খৃষ্টানগণ সেই উপদেশের কোন ধারই ধারিত না। তাহারা খৃষ্ট প্রকৃতির পূর্ব্বোক্ত চুলচেড়া সব অর্থ বাহির করিয়া নূতন পন্থার (heresy) সৃষ্টি করিত। এবং তাহা অন্যকে গ্রহণ করাইবার জন্য এমন কুকর্ম্ম ছিল না যাহা তাহারা করিতে পারিত না। পরস্পরের সঙ্গে কামড়া কামড়ি করিয়া মরিত, 'Like so many beasts.' আদি খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রভাবের মধ্যে নৈতিক জীবনের কোন স্থানই ছিল না। যিশু একজন নীতিমান্ ধর্ম্মোপদেষ্টা, ইহা বর্ত্তমান যুগের য়ুনিটেরিয়ান্‌দিগের আবিষ্কার। প্রাচীন খৃষ্টধর্ম্মে ইহার স্থান নাই। হায় রে শৈলবেদীর উপদেশ! এরূপ কথিত আছে, দয়াশীল ন্যায়পরায়ণ পৌত্তলিক সম্রাট্ জুলিয়ানের মৃত্যুর এক বৎসর পরে খৃষ্টান সম্রাট ভ্যালেন্‌সিয়ান্ নিজের সম্মুখেই বন্য ভল্লুকের মুখে দোষীদিগকে নিক্ষেপ করিত। তাহার ভ্রাতা ভ্যালেন্স ভিন্ন খৃষ্টীয় দলের আশিজন পুরোহিতকে জাহাজে আগুন লাগাইয়া দিয়া পুড়িয়া মারিয়াছিল। তাহাদের অপরাধ, তাহারা তাঁহার কাছে নিজ সম্প্রদায়ের অভাব অভিযোগের কথা জানাইতে আসিয়াছিল। এ কথা ঠিক্, নৈতিক জীবন প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বীদিগেরই উচ্চতর ছিল। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতেই হইবে—নৈতিক জীবনের যে একটা দিকের মহিমা খৃষ্টধর্ম্ম বাড়াইয়া তুলিয়াছিল তাহা যৌন সম্বন্ধের পবিত্রতা ও চিরকৌমার্য্য কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মানুসারে প্রতিক্রিয়ার ফলে উহা পরিণামে দুর্নীতিকেই নীতেতে পরিণত করিয়া ছিল। কেন না, এই দুয়ের প্রশংসার মধ্যেও যথেষ্ট পাগলামির পরিচয় পাওয়া যায়। যখন অসভ্যদিগের দ্বারা খৃষ্টীয় রোম সাম্রাজ্য লুণ্ঠিত হইতেছিল

যিশুর ঐতিহাসিকত্ব

সেই সময়কার কথা—একটী রোমক যুবতী কুমারীব্রত গ্রহণ করিলে ফাদার জেরোমি আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, যে আজ হইতে এই মহিলার মাতা প্রভু পরমেশ্বরের শাশুড়ী ("The mother-in-law of God") বলিয়া গণ্য হইলেন। আমি এ পর্য্যন্ত কোন গ্রন্থে খবর পাই নাই, আমাদের দেশে যেমন ন্যাটাই পাটাই পুখ্‌রাই প্রভৃতি পর্ব্ব উপলক্ষে বিশেষ পিঠা হয়, সেইরূপ যিশু-মাতার পূজার ন্যায় যিশু-শাশুড়ী পূজায় প্রদত্ত কোন বিশেষ পিষ্টক এই আদি খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারে ব্যবহৃত হইয়াছিল কি না। আসল কথা, খৃষ্টধর্ম্ম নীতিধর্ম্মের জোরে নয় কিন্তু মারামারি কাটাকাটি রক্তপাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। এবং এ রক্তপাতের অধিকাংশ আপনাদেরই মধ্যে কেবল মাত্র মত-বিরোধ-জাত। এক এক জন বিশপ নিযুক্ত করিতে যাইয়া রীতিমত এক একটী খণ্ড যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সহর গ্রাম পুড়াইয়া ছার খার করিয়া দিয়াছে। যাঁহারা বলেন খৃষ্টধর্ম্ম নৈতিক ধর্ম্ম, নীতির বলে জয়ী হইয়াছে, তাঁহারা ভ্রান্ত। অন্ধ-বিশ্বাসের ধর্ম্ম কখনও নৈতিক রস সঞ্চারিত করিতে সমর্থ নয়। পূর্ব্বেও পারে নাই এখনও পারিতেছে না। ধরা যাক্ খৃষ্ট-ধর্ম্মের মত-বিরোধের কথা (heresy)। ইহা তো চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু যে নূতন তত্ত্বের (heresy) গতি জ্ঞানের দিকে, নীতির দিকে, তাহা কখনও গৃহীত হয় নাই। এরিয়াসের ঝোঁক ছিল একেশ্বর বাদের দিকে, তিনি সফল-কাম হইলেন না। কিন্তু যাহারা মেরীকে দেবীত্ব প্রদান করিয়া পিঠা পায়েস্ দিয়া ভোগ লাগাইতে লাগিল—ঠিক প্রাচীন ধর্ম্মের দেবমাতা মহাদেবী সেবিলির পূজা, তাহারা সিদ্ধকাম হইল। এ পূজা গ্রহণ করিতে দেরী হইল না। অন্য দিকে, চতুর্থ শতাব্দীতে জোভিয়ান্ নামক এক সন্ন্যাসী এই মত প্রচার করিয়া কষাঘাতে জর্জ্জরিত হইলেন, যে মেরী সন্তান প্রসব করিয়া কুমারীত্ব হারাইয়াছেন। জীবন-গত ধর্ম্মের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে যাইয়া, ভিজিলিন্‌সিয়াস্ নামক এক জন ধর্ম্মাচার্য্যের জীবন সংশয় হইয়াছিল। তাঁর অপরাধ! সাধু-পূজা, ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যের আড়ম্বর, ব্রত উপবাস ও তীর্থ যাত্রা প্রভৃতিতে যে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয় না, তিনি সেই দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আসল কথা এই, অতি উচ্চ নৈতিক ধর্ম্মের দ্বারা "মহাজান" সম্প্রদায় গড়া যায় না। এই মহাকুসংস্কার আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, যে খৃষ্টধর্ম্ম শৈলবেদীর উপদেশের জোরে—যদিও শৈলবেদীর উপদেশেও সর্ব্বোচ্চ নীতিধর্ম্ম নাই—প্রচার কর্য্যে কৃতিত্ব

লাভ করিয়াছিল। ইতিহাস বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। কেন না, ধর্ম্মকে বিশ্ব-ধর্ম্ম (World religion) করিতে হইলে যাহা করিতে হয় খৃষ্টধর্ম্ম আদিতে তাহা করিয়াই বিশ্বধর্ম্মে পরিণত হইয়াছিল। যাঁহারা ইহা পারিবেন না—আপনাদের নৈতিক আদর্শ লইয়া গাছের আগায় বসিয়া থাকিবেন, সর্ব্ব সাধারণ কেন এই উচ্চ ধর্ম্ম গ্রহণ করিল না—তাঁহাদের এই কাতর ক্রন্দন অরণ্যে রোদন মাত্রে পর্য্যবসিত হইবেই। 'গাছেরও খাব তলারও কুড়াব'—দুইই হয় না। ধর্ম্ম-জগতে যাঁহারা উচ্চস্থানে থাকিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা সংখ্যায় অল্প না হইয়াই পারেন না। ঐতিহাসিক আলোচনায় প্রকাশিত হইয়াছে, যে খৃষ্টধর্ম্ম লোক-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্ব প্রকারেই উচ্চতা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। একটা কথা আছে—What doth it avail you if you gain the whole world but lose your soul ? খৃষ্টধর্ম্ম বাস্তবিকই স্বীয় বিশিষ্টতা বিসর্জ্জন দিয়া তৎকালীন ধর্ম্মের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া জগজ্জয়ী হইয়াছিল, যদি ইহাকে জয় বলা চলে।

খৃষ্টধর্ম্মের জয়লাভের অবান্তর কারণ

অন্যান্য যে সব বহুমুখীন অবান্তর কারণের সমবায়ে খৃষ্টধর্ম্ম জয়লাভ করিয়াছিল, তাহার গুটি কয়েক ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে (বিশেষভাবে ১৬৬ হইতে ১৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সেগুলির পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাহা হইতে বুঝা যাইবে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারের ইতিবৃত্তে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের নিতান্ত অসদ্ভাব। মধ্যে মধ্যে খৃষ্টীয় মণ্ডলীর মধ্যে শ্রদ্ধেয় লোকের আবির্ভাব হয় নাই, তা বলি না। পণ্ডিত লোকও আবির্ভূত হইয়া উহাকে সংশোধন করিতে ও উন্নত আকার দিতে যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহা সকল প্রাচীন ধর্ম্মেরই কথা, খৃষ্টধর্ম্মের বিশেষত্ব নহে। আমাদের এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এবং উহা আমরা পুনঃ পুনঃ জোরের সঙ্গেই বলিতে বাধ্য হইতেছি, যে খৃষ্টধর্ম্ম নৈতিক বলে প্রচারিত হইয়াছিল এই কুসংস্কার বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের সমূহ অনিষ্ট সম্পাদন করিতেছে। সত্যের অনুরোধেই ইহার হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া প্রয়োজন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পৌরাণিক ও বৈদান্তিক অবতার-তত্ত্ব

"Euckenএর অবতারতত্ত্ব বুঝাইতে যাইয়া Dr. Abel Jones বলিয়াছেন,—Eucken attempts to get at the inner meaning—the truth which the doctrine endeavours to express, and he finds this to consist in the fact of the ultimate union of the human and Divine, and this truth is one that we dare not renounce. He criticises the attempt that is made in Christianity to show that such union only obtained once in the course of history. Incarnation is not one historial event, but a spiritual process; not an article of belief, but a living experience of each spiritual personality." অয়কেন বৈদান্তিক অবতারবাদী, কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম পৌরাণিক, তাই তাঁহার সঙ্গে মিল হয় নাই। যাহা হউক, আসল বিষয়ের অবতারণা করা যাউক।

ব্রহ্ম বিন্দুতেও পূর্ণ, সিন্ধুতেও পূর্ণ। দেশে কালে আবদ্ধ এই সসীম জগৎ—ইহার অন্তর্ভূত যাবতীয় বস্তু ব্রহ্মের অবতার, কিন্তু কেহই ব্রহ্ম নহে। সকল বস্তুতে ব্রহ্মের আবির্ভাবও সমান নয়। কুকুরে যেমন প্রস্তরে তেমন নহে; আবার মানুষে যেমন, কুকুরে তেমন নয়, মহাপুরুষে যেমন সাধারণ মানুষে তেমন নহে। কিন্তু এই পার্থক্য অবতারের দিক্ হইতে, ব্রহ্মের দিক্ হইতে নয়; কেন না, ব্রহ্মের হ্রাস বৃদ্ধি নাই। তিনি বিন্দুতেও পূর্ণ, সিন্ধুতেও পূর্ণ—"জল স্থল শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।"

এখন দেখা যাক্, অবতারবাদের দিক্ হইতে এই সিদ্ধান্ত আমাদিগকে কোন্ পথ প্রদর্শন করে।

অবতার কথার অর্থ

সর্ব্বাগ্রে অবতার কথাটার অর্থনির্ণয় প্রয়োজন। ইহার অর্থ উপর হইতে নীচে নামিয়া আসা। এই ধাত্বর্থের উপরই প্রাচীন অবতারবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঈশ্বর স্বর্গে বাস করেন, প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য সময়ে সময়ে এই পৃথিবীতে নামিয়া আসেন। এই

জন্যই এই কার্য্যটীর নাম অবতার হইয়াছিল। আগে লোকে পৃথিবীটাকেই জগতের কেন্দ্র মনে করিত। ইহাই ছিল সৃষ্টির সর্ব্বপ্রধান স্থান। সুতরাং এ কথা তাঁহাদের বিশ্বাস করিতে কোনও সঙ্কোচ হয় নাই, যে যখন তখন ভগবান্ যে সে কাজের জন্য, এমন কি, মাছ কাছিম হইয়া ক্রমাগত এই পৃথিবীতে ছুটাছুটি করিয়াছেন। এই সময়কার অবতারবাদের শাস্ত্রে এরূপ দেখা যায়, যে অবতার কিছু বেশী দিন এই পৃথিবীতে রহিয়াছেন, সুতরাং স্বর্গবাসীদিগের দূত-স্বরূপ কেহ আসিয়া তাঁহাকে জানাইল—বৈকুণ্ঠ খালি পড়িয়া রহিয়াছে, আর বেশী দিন মর্ত্ত্যে থাকা উচিত নয়। একটী উপলক্ষ করিয়া অবতারলীলার সাঙ্গ হইল। ঠাকুর স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বৈকুণ্ঠেও তিনি দেহধারী ছিলেন, এখানেও দেহ ধারণ করিলেন। সে দিকে বড় বেশী কিছু অসুবিধা হইল না। তবে যত দিন অবতীর্ণ ছিলেন, তত দিন বৈকুণ্ঠের সে দেহটা কি অবস্থায় ছিল, তাহা অনুসন্ধানের বিষয় বটে! এই পৌরাণিক অবতারবদে ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব স্বীকৃত হয় না। অবতার কথাটার সঙ্গেই সর্ব্বব্যাপিত্বের একটা বিরোধ ভাব রহিয়াছে—যেখানে যে ছিল না, সেইখানে তার আগমন—উপর হইতে নীচে আগমন—সাকারই স্বীকার করি, আর নিরাকারই মানি, সর্ব্বব্যাপীর পক্ষে অবতারেরর কোন অর্থই নাই। যিনি ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী বলেন, তিনি এই অর্থে অবতার অঙ্গীকার করিতে পারেন না। সর্ব্বব্যাপী নহেন, এই জন্যই অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন হয়। স্কুলের বালকও বুঝিতে পারে, এরূপ অবতারবাদ স্বীকার করিতে হইলে গোড়াতেই ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্বের মতে জলাঞ্জলি দিতে হয়। ইহা বুঝিতে অভ্রান্ত গুরু বা শাস্ত্রের আদেশের প্রয়োজন হইবে না। যে বুদ্ধিতে বলিয়া দেয় দু'য়ে দু'য়ে পাঁচ হয় না, সেই বুদ্ধিই বলিয়া দেয় সর্ব্বব্যাপীর অবতার * হয় না। সুতরাং যিনি সর্ব্বব্যাপিত্বে বিশ্বাসী, তাঁহার সহজ বুদ্ধিই তাঁহাকে অবতার অস্বীকার

* কোন কোন পণ্ডিত প্রাচীন অর্থে অবতার সমর্থন করিতে অসমর্থ হইয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যে আমাদের অবতার পাশ্চাত্য দার্শনিকের Superman. মাছ কাছিম হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধ যিশু পর্য্যন্ত যাহার দৌড়, তাহার সম্বন্ধে যা তা বলা যাইতে পারে। তবে আমরা বিলাতী মতসমূহ কেমন হঠাৎ গলাধঃকরণ করিয়া ফেলি, ইহা তাহারই অন্যতম দৃষ্টান্ত। কিন্তু ইহার ফল বদহজমি ও দুর্গন্ধবাহী উদ্গার। আমাদের অবতার যে Superman, এই মত তাদৃশই একটা উদ্গার মাত্র। এই Superman এর সঙ্গে সঙ্গে Neitzchea অন্যান্য মতগুলি যদি আমাদের পণ্ডিত মহলে আদৃত হয়, তবে দেশের নির্ব্বাণ ও মুক্তি দুই-ই সদ্য সাধিত হইতে পারে।

করিতে উপদেশ দেয়। যিনি সর্ব্ব ঘটে সর্ব্বদা পূর্ণরূপে বর্ত্তমান ; কেন না, তিনি বিন্দুতেও পূর্ণ সিন্ধুতেও পূর্ণ—তাঁহার পক্ষে অবতার হওয়ার কল্পনা বন্ধ্যা-পুত্রবৎ অলীক। শঙ্করাচার্য্য নিশ্চয়ই এরূপ স্থলে আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিতেন : "অহোঽনুমানকৌশলং দর্শিতং অপুচ্ছশৃঙ্গৈস্তার্কিকবলীবর্দ্দৈঃ।" (বৃহ, ২।১।২০)। গীতাকার যেমন বলিয়াছেন—

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতোসম্প্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥

সর্ব্বত্র জল প্লাবিত হইলে যেমন কেহ চৌবাচ্চা কাটায় না, তেমনই ব্রহ্মজ্ঞের বেদের কোন প্রয়োজন হয় না। তেমনই সর্ব্বব্যাপিত্ব-বিশ্বাসী বলি-

সর্ব্বব্যাপিত্ব ও অবতরণ

বেন, যাঁহার সত্তায় সকল পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার নূতন করিয়া অবতরণের প্রয়োজনীয়তা নাই। তাঁহার অবতরণের স্থানই যে নাই! যেখানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করা যায়, দেখি, সেখানেই তিনি সমভাবে পূর্ণ-রূপে বর্ত্তমান ; অবতরণের অবসর কোথায়? ও কথাই যে উঠিতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্রের অবতার-তত্ত্বে অবতার পূর্ণব্রহ্ম নহেন, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর মানুষ। কোন ব্যক্তি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর মানুষ কিনা তাহা নির্ণয় করিতে হইলে পূর্ণ মানবত্বের আদর্শ আগে হইতেই জানা চাই। সুতরাং সে আদর্শ প্রকটিত করিবার জন্য ব্রহ্মের অবতীর্ণ হইবার কোন প্রয়োজনীয়তাই রহিল না। অন্য-দিকে, সেইরূপ একজন মানুষ সৃষ্টি করিলেই ত হয়, ভগবান্‌কে অবতীর্ণ হইবার কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে কেন? তাঁহার সৃষ্টিশক্তি লোপ পাইয়া গিয়াছে এরূপ মনে করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ পাওয়া যাইতেছে না। পরন্তু পূর্ণ ব্রহ্ম আর পূর্ণ মানব বেদান্তের দিক্ হইতে একই জিনিষ দাঁড়াইবে। যাহা হউক, অবতার স্বীকার করিলে কোন কোন বুদ্ধির কাছে সর্ব্বব্যাপিত্বের কোন হানি না হইলেও না হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বব্যাপিত্ব স্বীকার করিলে যে অবতারের "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিত" পরিমাণ স্থানও পাওয়া যায় না, এ কথার তো প্রত্যক্ষ ও অনুমান সকলেই এক বাক্যে সাক্ষ্য দিতেছে, ইহা যে জ্ঞান-বিজ্ঞান সকলকেই অনুমোদন করিতে হয়। সুতরাং ঈশ্বর সর্ব্বত্রই সমভাবে পূর্ণ-রূপে বর্ত্তমান, এই আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, যে ঈশ্বরের অবতার হয় নাই, হইবে না, হইতে পারে না। কেহ কেহ ভাবেন, জীবাত্মা সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত, এক অঙ্গে ঝোঁক দিলে যে অন্য অঙ্গ হইতে উঠিয়া আসে,

তাহা নহে। সেইরূপ, পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী হইলেও কোনও স্থানে বিশেষ প্রকাশে তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব বিনষ্ট হইবে কেন? এখানে একটী কথা প্রণিধান করিতে হইবে, যে জীবাত্মা দেহের সর্ব্বত্র আছেন বলিয়া যেমন দেহেই আবদ্ধ নহেন, দেহকে অতিক্রম করিয়াই দেহে অবস্থিত, তেমনই পরমাত্মা সমান ভাবে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকিলেও প্রকট বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন। অপ্রকাশ প্রকাশকে সর্ব্বদাই অতিক্রম করেন। যাহা হউক, এই যুক্তির প্রধান ভ্রান্তি যাহা, তাহা পরে অদ্বৈত-তত্ত্বের ব্যাখ্যায় প্রদর্শিত হইতেছে। এখানে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট, যে জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের যে বিভিন্নতা, তাহা নষ্ট না করিয়া এই উপমা গৃহীত হইতে পারে না। মানুষ যখন হস্তে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করে, তখন কেবল পায়ে সেই পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করে না, তাহা নহে, হয় তো পায়ের অস্তিত্বের কথাই সে ভুলিয়া যায়। আমি যখন এই প্রবন্ধলেখারূপ কার্য্যে বিশেষ মনেযোগ দিতেছি, তখন হয় তো জীবনের আর সমস্ত কথাই ভুলিয়া গিয়াছি। তাহাতে আমার জীবাত্মত্ব বিনিষ্ট হইতেছে না; কেন না, জীবাত্মাকে যে সব সময়ে সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান থাকিতে হইবে, এ কথা কেহ কখনও বলে নাই। এই দেহে জীবের স্বপ্ন জাগ্রৎ সুষুপ্তি নানা অবস্থা। কিন্তু ব্রহ্মের পক্ষে তাহা নহে। তিনি আজও যেমন, কালও তেমন, অনন্ত কাল এক ভাব। তিনি সকল সময়েই সর্ব্বত্র সমভাবে আছেন। ক'এ যেমন খ'এও তেমনই। যদি বলা যায় ক'এ তিনি বিশেষ ভাবে অবতীর্ণ, তাহা হইলে তাঁহার সম্বন্ধে খ অবিশেষ হইয়া পড়ে; সুতরাং তিনি যে বিন্দুতেও পূর্ণ, সিন্ধুতেও পূর্ণ, এই সত্য বাধিত হয়। বিশেষ অবিশেষ, কম বেশী জীবাত্মার পক্ষে খাঁটে, ব্রহ্মের দিক্ হইতে ইহার কোনই অর্থ নাই। সুতরাং বিশেষ আধারে ব্রহ্মের অবতার, ইহা ব্রহ্মের স্বরূপের বিরুদ্ধ। ইহা না বুঝিয়াও অনেকে নিরাকার-তত্ত্বের পাঠ সমাধা করেন এবং গোষ্পদ লইয়া মনে করেন, সমুদ্রকে ছাড়াইয়া উঠিলাম। যাহা হউক, ঈশ্বর সকল ব্যাপিয়া রহিয়াছেন (যে অর্থেই কেন গ্রহণ করা যাউক না), ইহা স্বীকার করিলে যে আর অবতারের স্থান থাকে না—কিরূপে এই সিদ্ধান্ত অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাওয়া যায়, তাহা আমাদের সহজ বুদ্ধির অগম্য। তবে এ কথা জানা আছে, মানুষের এমন অবস্থাও হয়, যখন পক্ষহীন হইয়াও সে আকাশে উড়িতে চেষ্টা করে, অথবা উড়িতেছে বলিয়া মনে করে। এরূপ আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের কথা

ফলের সঙ্গে ইতিহাসে লিখিত আছে। কিন্তু সে অবস্থা যখন যুক্তিতর্কের অতীত, তখন আমাদিগকে অক্ষমতা বশতঃই নিরস্ত হইতে হইল।

এতক্ষণ আলোচনা করিয়া দেখা গেল, ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব স্বীকৃত হইলে প্রাচীন বা পৌরাণিক অবতারবাদ অর্থহীন। এখন নবীন বা বৈদান্তিক অবতারতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। এখানে অবতার কথাটা ধাত্বর্থে গৃহীত হইতে পারে না, ভাবার্থে গ্রহণ করিতে হইবে। অদ্বৈততত্ত্বের আলোচনা ছাড়া বৈদান্তিক কোন তত্ত্বেরই মীমাংসা হইতে পারে না। সুতরাং সেই বিষয়ের একটু আলোচনা প্রয়োজন। তত্ত্বতঃ ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু। ঐ এক হইতেই বহু ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। জীব ও জড়, ঐ অদ্বৈত ব্রহ্মের প্রকাশ। জড় জীব হইতে স্বতন্ত্র শ্রেণীর পদার্থ নহে, জড়কে বিশ্লেষণ করিলে, প্রজ্ঞানেত্রে তাহার দিকে তাকাইলে, জড়ও চিৎবস্তুরূপে ধরা দিবে। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ আত্মবস্তু, সুতরাং তাঁহার প্রকাশ জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। ব্রহ্মই জীব ও জগৎ রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। প্রকাশে বহু বলিয়া মনে হইলেও মূলতঃ বস্তু এক ভিন্ন দুই নয়। অজ নিত্য শাশ্বত আত্মা এক, বহু হইতে পারেন না। আত্মা বহু হইলে, আত্মার আত্মত্ব, জ্ঞাতৃত্ব নষ্ট হইয়া যায়। যাহা জ্ঞাতা তাহাই আত্মা, যাহা জ্ঞাত তাহা আত্মা নহে। সুতরাং জ্ঞাতা "আমি" ছাড়া আর আত্মা থাকিতে পারে না। এই আত্মাই অদ্বৈত অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পুরুষ, আবেষ্টনের বহুত্বে বহু বলিয়া প্রতীয়মান হন। যাহা "আমি" "তুমি," "তিনি" বলিয়া লৌকিক জ্ঞানের নিকট বিবিধ ভাবে প্রকাশিত হয়, মূলতঃ তাহা এক ও অদ্বিতীয়। একই আত্মাকে বিষয়ের ভিন্নতায় ভিন্ন বলিয়া ভ্রম হয়। আত্মা বিষয় সমূহ হইতে স্বতন্ত্র নহে। বিষয়ী বিষয় সমূহের সঙ্গে জড়িত। বিষয় কিন্তু পরিণামে এক অখণ্ড যোগে আবদ্ধ হইলেও, বহু। এই বহু বিষয় বহু খণ্ড সমষ্টিতে (aggregates) বিভক্ত হইয়া জ্ঞানের অনন্ত বিষয়রূপে প্রতিভাত হইতেছে, কিন্তু ইহাতে জ্ঞাতার বহুত্ব সম্পাদিত হইতেছে না। এক মানুষ হইতে যে আর এক মানুষ ভিন্ন, তাহা কেবল বিষয়ের বিভিন্নতায়, আত্মার বিভিন্নতায় নহে। এক অদ্বৈত অখণ্ড আত্মাই সকলের মধ্যে জ্ঞাতারূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন। যেমন এক গোলকের (globe) কেন্দ্র হইতে বিবিধ ব্যাসার্দ্ধ লইয়া সমান অসমান কোটি কোটি বৃত্ত অঙ্কিত করা যাইতে পারে, সকলের কেন্দ্র এক হইলেও পরস্পর

বৈদান্তিক অবতার-তত্ত্ব

পরস্পর হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। জ্ঞাত বিষয় সমষ্টির বিভিন্নতায় এক মানুষ অন্য মানুষ হইতে বিভিন্ন, উভয়ের আত্মা এক। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কি জড় কি জীব, সকলেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ আত্মার প্রকাশ মাত্র। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঐ আত্মার দেহ, আত্মা দেহী। একই আত্মা সকলের প্রাণ ও পরিচালক। এক কেন্দ্র হইতে শক্তি উৎসারিত হইয়া এই বিশ্ব সংসারের সকলকে চালিত ও নিয়মিত করিতেছে। কিন্তু ব্রহ্ম এই সকলের কেবল মাত্র সমষ্টি নহেন। বিশ্বরূপ পরব্রহ্মের এক অংশ মাত্র। তিনি এই প্রকট বিশ্বকে অনন্ত গুণে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। সমস্ত জগৎ ব্রহ্মকে কতটুকুই বা প্রকাশ করিতে পারে? সেই জন্যই গীতা বলিয়াছেন—

ব্রহ্ম বিশ্বাতীত

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।

যিনি ক'এর সঙ্গে খ'কে যোগ করিবেন, তাঁহাকে ক ও খ উভয়কেই অতিক্রম করিয়া থাকিতে হইবে, নতুবা জীব ও জগতের একত্ব সম্পাদিত হইবে না। অথচ বহুত্বও যেমন খাঁটি বস্তু, একত্বও তাই। একত্ব ছাড়া বহুত্বের ব্যাখ্যা হয় না, বহুত্ব ছাড়াও আবার একত্বের ব্যাখ্যা নাই। প্রত্যেক জীবাত্মার কথা ভাবিয়া দেখি। কোন আত্মাই নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত নহে। আমি এখন যাহা ভাবিতেছি, তাহা আমার আত্মত্বের এক অধ্যায়। এইরূপ বিবিধ সময়ের ভাবনা বিবিধ অধ্যায় প্রদান করিবে। আবার জাগ্রৎকালের ও স্বপ্ন-কালের আত্মা যেন দুইটি আত্মা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু উহারা একই আত্মারই দুই অধ্যায়। এইরূপ খণ্ড আত্মা সমূহের সমষ্টিই যেন আমার এই অখণ্ড 'আমি'। কিন্তু সমষ্টি ব্যষ্টির কেবল সংগ্রহ নহে। প্রতি ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টি বর্ত্তমান। তবে জীবাত্মার পক্ষে সজ্ঞানে এই বর্ত্তমানতা সম্পাদিত হয় না —এই অপূর্ণতাই জীবের জীবত্ব। কিন্তু ব্রহ্মের পক্ষে তাহা নহে। তিনি প্রতি খণ্ডের সঙ্গে পূর্ণ জ্ঞানের সহিত বর্ত্তমান রহিয়াছেন, এবং জীবের অপূর্ণতাকে পূর্ণতা প্রদান করিতেছেন। জীব স্বীয় অধ্যায়গুলিকে একটীর পর একটী আনিয়া যোগ করে, একটীকে আনিতে গেলে হয় তো আর একটী পলাইয়া যায়, সুতরাং জীব অপূর্ণই থাকে। কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বদাই সকলকে একত্র করিয়া অখণ্ড অদ্বৈত রূপে বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং ব্রহ্ম যেমন এক দিকে অখণ্ডভাবে সমস্ত বিষয়কে গ্রহণ করিতেছেন—ইহাই তাঁহার একত্বের দিক্; অন্যদিকে তেমনই আবার এই সমষ্টিকে খণ্ড খণ্ড করিয়াও দেখিতেছেন

—ইহাই তাঁহার বহুত্বের দিক্—"সঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্"। ঐ যে বিশেষ বিশেষ বিষয়-সমষ্টি লইয়া বিশ্বগোলকের বৃত্তসমূহ, উহারাই জীব। ব্রহ্ম প্রত্যেকেরই কেন্দ্র বা আত্মা, অর্থাৎ ঐ বৃত্তকে দেহ ধরিলে সসীম দেহধারী ব্রহ্মই জীব। এই সসীমত্বই জীবত্ব, যেহেতু চৈতন্যত্বে বা আত্মত্বে কোন বিভিন্নতা নাই। আত্মা বা চৈতন্য এক বই দুই হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম যখন অসীম অনন্ত জগৎ ছাড়িয়া খণ্ড বিষয় সমষ্টিতে মনঃসংযোগ করিলেন, (ইহা যে পূর্ব্বে ছিল না পরে হইল তাহা নহে) সমগ্র সৃষ্টি ছাড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে খণ্ড খণ্ড ভাবে জগৎকে দেখিলেন, তখনই জীবের উৎপত্তি হইল। ইহাই ব্রহ্মের অবতার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহার দেহ, তিনি দেহী। এই দেহীই ব্রহ্ম। এখন দেখা গেল, এই ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র সসীম অংশ দেহ, জীবাত্মা দেহী। এই জীবাত্মাই ব্রহ্মের অবতার সুতরাং পূর্ণব্রহ্মের অবতার হইতেই পারে না। তিনি চিরদিনই বিশ্বকে অতিক্রম (transcend) করিয়া থাকেন। বিশ্ব যাঁহার দেহ, তাহাকে ক্ষুদ্র দেহের সঙ্গে যুক্ত করিয়া ভাবা যায় না। তবে যদি কেহ বলেন, যে তিনি সব টুকুই অবতীর্ণ হইয়াছেন, (অবতরণ কালের ঘটনা, সুতরাং অনন্তকে অবতীর্ণ হইতে হইলে অনন্তকাল লাগিবে।) তবে মানিতে হইবে ব্রহ্ম আত্মহত্যা করিয়াছেন, কেবল অবতার মাত্র আছে। মানুষের যে ব্রহ্মৈকত্ব বোধ, জীবের দিক্ হইতে ইহাই বৈদান্তিক অবতার-তত্ত্বের মূল কথা। ইহা কোন **এক** বিশেষ কালেও ঘটে না, এবং কোন **এক** ব্যক্তিবিশেষের জীবনের ঘটনাও নয়। ইহা অনন্ত-উন্নতিশীল মানব-জীবনের নিত্যকালের ব্যাপার এবং ধর্ম্ম-জীবনে অগ্রসর প্রত্যেক ব্যক্তির অপরোক্ষানুভূতিগম্য)।

অনেকে গ্রীক্ লগস্ (Logos) তত্ত্বের সাহায্যে যিশুর অবতারতত্ত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা নিতান্তই বস্তুসত্তা নিরপেক্ষ চিন্তার (abstract thinkingএর) ফল। ব্রহ্মের যে ভাব জগৎরূপে অবতীর্ণ, তাহাই লগস্। সুতরাং এই জগতে আবার লগসের অবতার বস্তুসংস্পর্শশূন্য চিন্তার কল্পনা মাত্র। আমরা এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি, তাহাতেই এই ভ্রান্ত মত নিরাকৃত হইয়াছে পরমেশ্বর মানুষকে এমন প্রেম করিলেন, যে তিনি আপনার একজাত পুত্রকেই দিয়া ফেলিলেন, এমন কি আপনার সর্ব্বস্ব ধন লগস্‌কে (Logos) এই পৃথিবীতেই পাঠাইলেন। এ সকল কল্পনা একটা মস্ত অজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছিল। মানুষ মনে করিত, পৃথিবীটাই ভগবানের সৃষ্টি, রবি চন্দ্র তারা পৃথিবীঘরের বাতি, মানুষই তাঁহার সৃষ্টির চরম সীমা আর যা কিছু মানুষেরই জন্য। তাই এই সব অজ্ঞান-কল্পনা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু যখন প্রমাণ হইল, একটী সূর্য্য-কিরণের মধ্যে যে অসংখ্য ধূলিকণা দৃষ্ট হয়, এ ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবী তুলনায় তার একটী অপেক্ষাও নগণ্য, তখন মানুষের এই আত্মম্ভরিতা ভাসিয়া গেল। পৃথিবী অপেক্ষা যে কোটী কোটী গুণে বৃহৎ জগৎ আছে, তাহাদের রক্ষণ পালনে যে আরও কোটী কোটী কত বড় Logos ও Son of God দরকার হইবে, তাহা মিলিবে কোথায়? অজ্ঞানতা দূর হইয়াছে। কিন্তু তাহার জের চলিতেছে, তাই অবতারের ওজর এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। পুরাতন পাতক (Old Adam) মানব সমাজকে ছাড়িয়াও ছাড়ে না। আবার এরূপ যুক্তিরও অবতারণা করা হয়, যে দেহধারী হইয়াও যখন জীবাত্মা স্বেচ্ছাধীন, তখন ইচ্ছাময় সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মা দেহ ধারণ করিয়াও দেহের অতীত থাকিতে পারিবেন না কেন? এই যুক্তিটী পাঠ করিয়া আমাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে, যে কোনও মতের সমর্থনের জন্যে তর্কে প্রবৃত্ত হইলে মানুষের বিচারান্ধতা জন্মে। চোখে ছানি পড়িলে যেমন চক্ষু নষ্ট না হইয়াও দৃষ্টিহীনতা জন্মে, ইহাও তদ্রূপ। বিচার-শক্তি যে নাই, তাহা নহে; কিন্তু কোন কোন বিষয় দেখিবার শক্তি একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। নতুবা বেদান্তদর্শনের আলোচনার ভানের সঙ্গে সঙ্গে এই যুক্তিটী কখনও আসিতে পারে না। জীবাত্মাকে যখন স্বাধীন বলা হয়, তখন এ কথা কখনও বলা হয় না, যে তাহার দেহটা মাধ্যাকর্ষণ-নিয়মের অতীত। যিনিই দেহ ধারণ করুন না কেন, তাহাকে বাধ্য হইয়া কতকগুলি জড়ীয় নিয়মের অধীন হইতেই হইবে, যোগবলের বুজরুকী এখানে খাটিবে না। Miracleএর যুগ বহুদিন অতীত হইয়াছে। জীবাত্মা বিশেষ অর্থে স্বাধীন বলিয়া—আধ্যাত্মিক ভাবে স্বাধীন বলিয়া—সে যে সর্ব্বভাবে স্বাধীন, এ কথা বাতুল ভিন্ন আর কেহ বলেও না, ভাবেও না। দেহাধীনতা তাহার থাকিবেই; কেন না, আত্মার জীবত্ব দেহাধীনতাতে, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং যোগমায়া-বলে দেহ ধারণ করিলেও এই অধীনতা থাকিয়া যাইবে। না থাকিলে সেটা কাঁঠালের আমসত্ত্ব হইবে। দেহের যদি দেহত্ব না থাকে, তবে তাহাকে দেহ বলা যায় কি? জীব কোন বিষয়ে স্বাধীন হইয়া কোন বিষয়ে অধীন

জগতেই ব্রহ্মের অভি-ব্যক্তির শেষ নহে

হইলে তাহার জীবত্ব যায় না; কেন না, তাহাই তাহার জীবত্ব; কিন্তু জীবের উপমায় পরমকে এই কোঠায় আবদ্ধ করিলে তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি অনিবার্য্য। মায়ার আশ্রয় ব্যতীত দেহধারণ হয় না, এ কথা স্বীকার করিয়াও কিরূপে বলা যায়, যে ব্রহ্মের এই ভাব (দেহধারণ) সকলের অতীত, পূর্ণ, স্বাধীন, তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। এরূপ ভ্রান্তি বিশেষ মতান্ধতার অপরিহার্য্য পরিণাম। দেহধারণেই আত্মার জীবত্ব-প্রাপ্তি, এই কথাটা স্বীকার করিয়া সর্ব্বদা মনে রাখিতে না পারায়, এই সব ভ্রান্ত যুক্তির অবতারণা অবশ্যম্ভাবী হয়। যেখানে দেহ স্বীকার করাই দৈহিক নিয়মের অধীনতা গ্রহণ, সেখানে দেহ স্বীকার করিয়াও দেহের অতীত থাকিবার কল্পনায় কল্পনার মাত্রাটা এতই বেশী, যে এখানে ভাবুকতা আসিয়া দার্শনিক আলোচনার স্থান জবর দখল করিয়াছে। তখনই এই সকল বিড়ম্বনায় পড়িতে হয়, যখন কোনও মতের দাসত্বকে সত্যানুসন্ধান বলিয়া ভ্রম হয়, অথবা একটা খেয়ালকে সমাধিলব্ধ তত্ত্ব বলিয়া মনে হয়।

দেহ ও দেহস্বামী

কেহ কেহ বলেন, তিনি যখন আমাদের দেহপুরে পুরস্বামী হইয়াও—জীবরূপে প্রকাশিত হইয়াও স্বরূপ-বিচ্যুত হন না, তখন অবতার গ্রহণ করিলে তাঁহার স্বরূপ-বিচ্যুতি ঘটিবে কেন? এই যুক্তিতে বিশেষ ভাবে চিন্তাবিভ্রম (Confusion of thoughts) প্রকাশিত হইয়াছে। দেহ-পুরের পুরস্বামী কে? পরম নহেন, জীব। ব্রহ্ম জীবের অন্তর্য্যামীরূপে তাহার সঙ্গে নিত্যযোগে আবদ্ধ, দেহস্বামীরূপে নহেন। তাঁহার এই বিশ্বাতীত ভাবের (transcendental aspect এর) সঙ্গে দেহের তত টুকুই সম্বন্ধ, যত টুকু তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব হইতে উপলব্ধ হয়। তার পর এই জীবই তো দেহধারী ব্রহ্ম, আবার ব্রহ্ম দেহ ধারণ করিবেন কি, বা অবতার গ্রহণ করিবেন কোথায়? যদি কেহ বলেন, যে তাঁহার তত্ত্বব্যাখ্যার খাতিরে ব্রহ্ম দেহ ধারণ করিবেনই, তবে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহা ব্রহ্মের আত্মহত্যা, সুতরাং জীবাত্মারও স্বর্গপ্রাপ্তি। দেহের বিকার (আমি আপত্তিকারী-দিগের ভাষাই ব্যবহার করিতেছি) ব্রহ্মকে স্পর্শ না করিলে, জীবের ধর্ম্ম যে সসীমত্ব তাহা ব্রহ্ম স্বীকার না করিলে, জীবের উৎপত্তিই অসম্ভব। সুতরাং দেহপুরে বাস করিয়া বা জীবরূপে প্রকাশিত হইয়া (অবশ্য বিশেষ অর্থে) ব্রহ্ম বিকারগ্রস্ত হন না অর্থাৎ বিবর্ত্তিত হন না, ইহা স্ববিরোধী। ইহা বলিলে এই বুঝায়, যে অদ্বৈততত্ত্বের প্রথম পাঠই অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। আসল কথা এই,

যে তত্ত্বের আলোচনা তাহার তিলমাত্রও ধারণার চেষ্টা না করিলে দর্শনের নামে কাব্যের সৃষ্টি অনিবার্য্য।

যাহা হউক, এই কথাটাই বেদান্তের ভাষায় বলিলে দাঁড়ায় এই—মায়ার * অতীত চৈতন্যই ব্রহ্ম, মায়োপহিত চৈতন্য জীব। মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি। তিনি এই শক্তির অতীত। এক হইয়াও এই শক্তি প্রভাবেই তিনি আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করেন। সুতরাং একটা অবস্থা মায়ার অতীত—ইহাই পরম বা কূটস্থ চৈতন্য; আর একটা মায়োপহিত অবস্থা, ইহাই জীব ও জগৎ। তৃতীয়ের স্থানাভাব। ব্রহ্ম যে এই মায়াশক্তি আশ্রয় করিয়া আপনাকে সৃজন করেন, তাহা যদি এক অর্থে অবতার হয়, তবে অবতারের অন্য অর্থ কোথায় মিলিবে? ব্রহ্মের যদি এমন মাথা ব্যথা হয়, যে তিনি বিশেষ ক্ষেত্রে, বিশেষ আধারে, বিশেষ ভাবে আবির্ভূত হন, তবে তাহাও তো অবতারই হইবে, অন্য কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই। আর, এই বিশেষ আধারই বা আসিল কোথা হইতে। উহাও তো মায়ারই কার্য্য, সুতরাং অবতার। এই অবতারের মধ্যে অবতার প্রবেশ করে কি রূপে? অবতারের গর্ভে অবতার, তার গর্ভে অবতার, এই অবতার-গড্ডলিকা-প্রবাহের প্রহেলিকা আমরা ধারণা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ব্রহ্ম ও তাঁহার মায়ার খেলা, ইহার মাঝখানে আর তো কিছুই নাই, তবে এই গোটাকতক বিশেষের অর্থ কি? সম্ভব হইলে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ ব্যাসার্দ্ধ লইয়া বৃত্ত অঙ্কিত কর, তাহাও অবতার, ব্রহ্ম নহে। সুতরাং যোগমায়ার আশ্রয় লইয়া বিশেষ আধারে আবির্ভূত হইলেও, নদিয়ার নিমাই আর জুডিয়ার যিশু, আশি বছরের বুড়া আর পাঁচ বছরের শিশু, সকলেই অবতার মাত্র, জাতিতে এক। পরিমাণে

মায়াতীত ও মায়োপহিত

* মায়াশক্তির কার্য্য প্রচলিত মতানুসারেই বিবৃত হইল। কিন্তু জগৎব্যাপার নিতান্তই 'অঘটন ঘটন' না অবশ্যম্ভাবী ঘটনা—যাহা অস্বীকার করিয়া ব্রহ্মের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না—সে বিচার এখানে অপ্রাসঙ্গিক। মায়াতত্ত্বের মূল কথা এই, যে ব্রহ্মাস্তিত্ব জগৎব্যাপার নিরপেক্ষ। আগে তাঁহার অস্তিত্ব সাব্যস্ত করিয়া পরে মায়া-সাহায্যে জগৎব্যাপার নিরূপণ করিতে হইবে এবং দরকার হইলে উহা সম্পূর্ণ উড়াইয়া দিতে হইবে। ইহা বস্তুতন্ত্রবিহীন চিন্তার (abstract thinking এর) ফল। কাজেই এই শ্রেণীর দর্শন-শাস্ত্র পরিণামে শূন্যবাদ প্রসব করিয়াছে। বর্ত্তমান কালের চিন্তা হুবহু এই মায়াতত্ত্ব সমর্থন করিতে অসমর্থ। জগতের চিন্তাপ্রবাহ থামিয়া যায় নাই—অগ্রসর হইতেছে। ইহা ভুলিয়া গেলেও চলিবে না।

পার্থক্য যতই থাকুক্ না কেন—তাহা থাকিবেই—গুণগত (qualitative) বিভিন্নতা মাত্র নাই। সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ দার্শনিক হেগেল অবতারের একটা বিকল্প ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা আমাদের দেশেরই সাকারবাদ প্রভৃতির ব্যবস্থার ন্যায়। অজ্ঞ লোকেরা উচ্চ কিছুরই ধারণা যদি না করিতে পারে, তবে সাকারাদি লইয়াই সন্তুষ্ট থাকুক্। হেগেলের মতে সব মানুষই ভগবানের অবতার। কিন্তু প্রাকৃত জন, (Man in general) যাহারা চিন্তারাজ্যের উচ্চ গ্রামে (Height of speculative thoughtএ) আরোহণ করিতে অসমর্থ, তাহারা এ তত্ত্ব সম্যগ্ ধারণা করিতে পারে না। অতএব তাহারা ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে এই তত্ত্বের মর্ম্ম অবগত হইতে চেষ্টা করুক। যে কোন ব্যক্তির দ্বারাই যখন এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে, তবে যিশুর দ্বারাই বা হইবে না কেন? বিশেষতঃ, এ বিষয়ে যিশুর উপযোগিতাও রহিয়াছে। তিনি নিজে সে গুলিকে উচ্চ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন কি না, তাহা না জানা থাকিলেও তাঁহার উক্তির মধ্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব-বোধক কথা রহিয়াছে। সুতরাং অজ্ঞলোকেরা যিশুর মধ্যে অবতার ভাবনা করিতে পারে। কিন্তু ইহা প্রাকৃত জনের কথা? আমরা তো আর প্রাকৃত জন নহি? আমরা ঐ "Height of speculative thought"ও অনেকটা ছাড়াইয়া গিয়াছি! যাঁহারা ক্যাণ্ট হেগেল্ ঘাটেন, আর শঙ্কর রামানুজ ও বৈষ্ণব বেদান্তের পার দর্শন করিয়া জগতের কোন্ পথে চলা উচিত তাহা দেখাইয়া দেন; তাঁহারা যখন অবতার বা পৌত্তলিকতার মায়ায় এই প্রাকৃত জনেরই সঙ্গে আপনাদিগকে এক করিয়া ভাবেন, তখন কি নির্ব্বিকার যোগী সন্ন্যাসীর পক্ষেও নাসিকা-কুঞ্চন সম্বরণ করা অসাধ্য হইয়া উঠে না?

জীব-চৈতন্য ও ব্রহ্ম-চৈতন্য

কেহ কেহ আবার অবতার (বিশেষ অর্থে—তাহা সহজেই বোধগম্য!) সমর্থনের জন্য বলিয়া থাকেন, যে জীবাত্মা যখন দেহ ধারণ করে, তখন তাহার নিরাকারত্ব ও চৈতনত্ব নষ্ট হয় না, তখন পরমাত্মা দেহ ধারণ করিলে তাঁহার নিরাকারত্ব ও চৈতন্যত্ব বিনষ্ট হইবে কেন? জীবই হউক আর পরমই হউক, আত্মা নিরাকার,—ইহা সাধারণ অর্থ। কিন্তু বিশেষ অর্থে জীব নিরাকার নহে—সে অর্থে সাকার অর্থ সীমা। জীব সীমাবদ্ধ সুতরাং তাহাকে ধারণা করিতে গেলে কোন না কোন প্রকারে মনে একটা আকারের ভাব আসে—এই আকার সে কিছুতেই নিরাকৃত করিতে পারে না। জীব যতই

বড় হউক না কেন, তাহার সীমা থাকিবেই। বেদান্তসূত্র বলেন, জীব কখনও সৃষ্টিশক্তি লাভ করিবে না,—"জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতাচ্চ।" সুতরাং ব্রহ্ম দেহ ধারণ করিলে স্বরূপ ভ্রষ্ট হইবেন ; কেন না, ব্রহ্মের দেহ ধারণেই জীবের উৎপত্তি। চৈতন্যত্বের দৃষ্টান্ত অপ্রাসঙ্গিক। কাষ্ঠলোষ্ট্র-পূজার বেলায় এই চৈতন্যত্ব অচৈতন্যত্বের যুক্তি আসে, অবতারের বেলায় নয়। সুতরাং এখানে যুক্তি গুলাইয়া দিয়া প্রতিপক্ষের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইয়াছে। কিন্তু উদ্ধৃত যুক্তিটীর মাহাত্ম্য এই খানেই শেষ হয় নাই। জীব-ও ব্রহ্ম-চৈতন্যের একত্ব, অদ্বৈত তত্ত্বের গোড়ার কথা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে—কেন না, ব্রহ্মই জীবরূপে প্রকাশিত। সুতরাং চৈতন্য বিষয়ে জীবকে ব্রহ্মের প্রমাণরূপে উপস্থিত করিলে 'সেই বিষয় দ্বারাই সেই বিষয়কে প্রমাণ করা' রূপ কি হেত্বাভাস (fallacy) হয়, তাহা আজকালকার স্কুলের বালকেও জানে। কাজেই, সে বিষয় বর্ণনা করিতে যাইয়া আমরা (*a priori*) আগে হইতেই পাঠকের বুদ্ধিতে স্থূলতা-দোষ আরোপ করিব না। কিন্তু এই কয়েকটী মাত্র কথার পরিসরের মধ্যে যদি হেত্বাভাসও মাত্র একটীই থাকিত, তবে অনুমান-কৌশলের তীক্ষ্ণতাও তেমন প্রদর্শিত হইত না, (আচার্য্য শঙ্করকেই আবার মনে পড়িতেছে !) আর তার্কিকের যুক্তিশাস্ত্রের বিদ্যার হাঁড়ি এমন করিয়া হাটের মাঝখানে ভাঙ্গিয়া পড়িবারও সুযোগ পাইত না। প্রথমেই স্বীকার করা হইয়াছে, পরমাত্মা মায়াবলে দেহ (দেহ এখানে স্থূল সূক্ষ্ম মধ্যম—সকল অর্থেই গৃহীত হইবে) ধারণ করিয়া জীবাত্মারূপে প্রকাশিত হন, তার পরে জীবাত্মা আবার দেহ খুঁজিতে বাহির হইলে দেহের স্থান সঙ্কুলন হইবে কোথায় ? সুতরাং এখন যদি জীবাত্মা ও পরমাত্মায় নিতান্ত অজ্ঞানতা-প্রসূত একটা প্রভেদ কল্পনা করিয়া বলা হয়, যে জীবাত্মা দেহ ধারণ করিলে যখন 'ইহা' হয় না, তখন পরমাত্মা দেহ ধারণ করিলে 'ইহা হইবে কেন', তাহা হইলে এই যুক্তির মধ্যে যে একটা হেত্বাভাস আসিয়া পড়ে, তাহা তার্কিকগণ অবধারণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পরমাত্মাকে মায়ার আবরণ দিয়া জীবাত্মারূপে আমাদের কাছে উপনীত করা হইল—কেন না, ব্রহ্মই জীবরূপে প্রকাশিত, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সে কথা ভুলিয়া গিয়া কত তত্ত্বের অভিনয় !

ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব না মানিলে পৌরাণিক অর্থে অবতার না হয় গ্রহণ করা যায় ! বৈদান্তিক অর্থে জীব ব্রহ্মের অবতার, তাহাও স্বীকৃত। কিন্তু

বৈদান্তিক ও পৌরাণিক মিলাইয়া যে অবতারের খিচুড়ী, তাহা যুক্তিও প্রমাণ করে না, ইতিহাসও স্বীকার করে না,—ফল তার অতি ভীষণ। বিকৃত অদ্বৈতবাদে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে—যাহার হস্ত হইতে দেশ এখনও নিষ্কৃতি পায় নাই—এই অবতারবাদ তাহা অপেক্ষা শত গুণ বেশী অনিষ্ট করিতে সমর্থ। ইহা 'গণ্ডোপরি পিণ্ডক" রূপে দেশের মহা সর্ব্বনাশ সাধন করিবে, মানব সমাজকে উৎসন্নের পথে লইয়া যাইবে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি,—কৃষ্ণতত্ত্বের সার রাসলীলা শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিলেন, যিনি ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ("বিশেষ আধারে"?) অবতীর্ণ,

অবতারবাদের অনিষ্টকারিতা

স কথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্ব্রহ্মণ্ পরদারাভিমর্ষণম্ ॥ ১০।৩২।২১, ভাগবত,

তিনি পরদারাভিমর্ষণ করিলেন কেন? শুকদেব দুইটি যুক্তির দ্বারা এই পরদারাভিমর্ষণ সমর্থন করিলেন। একটি যুক্তি, তেজীয়ান্ ব্যক্তির কোন অপকর্ম্মে দোষ হয় না,—এই যুক্তির সঙ্গে এখানে আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই, ইতিপূর্ব্বেই কৃষ্ণ-তত্ত্বের আলোচনায় উহার বিচার করিয়াছি (১১৭ পৃঃ)। এক যুক্তিই যথেষ্ট। একা রামে রক্ষা নাই, স্বগ্রীব দোসরের আর প্রয়োজন কি? দ্বিতীয় যুক্তি পৌরাণিক ও বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের খিচুড়ী—

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহীনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্ ॥*

তিনিই তো গোপীগণের স্বামীদিগেরও অন্তর্য্যামী পুরুষ, ক্রীড়ার জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে দেহ ধারণ করিয়াছেন বৈ ত নয়? তবে আর কি দোষ হইল? যিনি বলিতেছেন—বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ—তাঁহাকে কোনও বিশেষ আধারের সঙ্গে একীভূত (identified) করা চলে না। বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেব-তনয় যদি এই অর্থে বলেন "আমিই তিনি" তবে রাম হরি যদু সকলেই ঐ দাবী করিবে। কেন না, শ্রীকৃষ্ণের গুণগত (qualitative) দাবী যে দলীলের জোরে, সে দলীল প্রত্যেক জীবাত্মারই

* এ যুক্তিটির আবিষ্কর্ত্তা বিষ্ণুপুরাণকার—

তন্ভর্ত্তৃষু তথা তাসু সর্ব্বভূতেষু চেশ্বর।
আত্মস্বরূপোঽসৌ ব্যাপ্য সর্ব্বমবস্থিতঃ ॥ ৫।১৩।৬

নিজস্ব সম্পত্তি। যদি বলা যায়, সাধনবলে যাঁহার ব্রহ্মৈকত্বের অনুভূতি হইয়াছে, এবং যিনি কখনও যোগবিচ্যুত হন না, তাঁহার দাবী বেশী হইবে না কেন? তাহার উত্তর এই, যে এই বেশীত্বও পরিমাণগত, গুণগত নহে। ব্রহ্মের আত্মজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ নিত্যবস্তু, আর জীবের ব্রহ্মৈকত্ব-জ্ঞান তপোলব্ধ কালের ঘটনা, এই দুই কখনও এক হয় নাই, হইবে না, হইতে পারে না। এই দুই এক করিলে, মানব সমাজের সমূহ অকল্যাণ, মানব সমাজের ভিত্তিমূল ইহা দ্বারা উৎপাটিত হইয়া যাইবে। সুতরাং নিরাকারতত্ত্ব বুঝিয়াই হউক আর না বুঝিয়াই হউক, অবতারবাদ সমর্থন করা নিতান্তই অজ্ঞান-কল্পনা মাত্র। নিরাকারতত্ত্ব যতই বুঝা যায়, অবতারবাদের বিভীষিকা ততই বাড়িয়া যায়; কেন না, নিরাকার তত্ত্বের উপর যে অবতারবাদ প্রতিষ্ঠিত, তাহা মানব সমাজকে বিনাশের পথে লইয়া যায়। *

এখন আর দুটি মাত্র কথা বলিয়া উপসংহার করিতেছি। আমি বিশেষ

* পুরীর রাজার কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। মন্দিরে দারুব্রহ্ম, আর রাজবাড়ীতে "চলন্তী বিষ্ণু" (সচল ব্রহ্ম)। রাণী কখনও মন্দিরে যাইতে পান না, কেন না, সেখানে ভাশুর বলরাম রহিয়াছেন। বিষ্ণুত্ব যখন এমন পাকা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন তিনি যে সকল রমণীর স্বামীদিগের অন্তরাত্মা, তাহা বলাই বাহুল্য! সুতরাং—সুতরাং—সুতরাং !!! ব্রহ্ম যদি মায়াশক্তির প্রভাবে গোকুলের কাণুরূপে অবতীর্ণ হইতে পারেন, তবে যে তিনি পুরীতে রাজারূপে অবতীর্ণ হইতে পারিবেন না, এমন কথা শাস্ত্রে লেখে না। বিশেষ আধার, বিশেষ ক্ষেত্র, বিশেষ ভাব—কিছুরই অভাব নাই।

এক বিধবা বিগ্রহ স্থাপন করিয়া নাম রাখিলেন গোপাল এবং পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেন, তাহারও নাম রাখিলেন গোপাল। দুই গোপালে মিলিয়া গেল। তাঁহার হৃদয়ে গোপালের প্রতি ভক্তি না জন্মিয়া বাৎসল্যের ভাব আবির্ভূত হইল। তিনি নিজেকে যশোদা মনে করিতে লাগিলেন। স্বামীর নাম লইতে তাঁহার আপত্তি নাই, কিন্তু 'নন্দ' নাম গ্রহণ করেন না। এইরূপ যদি আর এক ব্যক্তি প্রদ্যুম্ন-বিগ্রহ স্থাপন করিয়া নিজেকে কৃষ্ণ ভাবিতে আরম্ভ করে, তবে নিশ্চয়ই তিনিও সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইবেন। সু—ত—রাং—। তাহাতে দোষই বা কি? ভক্তেরা বলিবেন, "গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ" ইত্যাদি। দাক্ষিণাত্যের বল্লভাচার্য্যদলের মহারাজদিগের কথা আর উল্লেখ না করাই ভাল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কর্ষনদাস মূলজীর (Mr. Karsandas Mulji এর) বিরুদ্ধে যে libel case হয়, তাহাতেই সব বিদিত আছে। পৌরাণিক অবতারবাদের সঙ্গে বৈদান্তিক অবতারবাদ মিশাইয়া মনুষ্য-সমাজ যে অধোগতির কোন্ চরম সীমায় যাইয়া নামে, ইহা তাহারই দৃষ্টান্ত। কোন নিম্নতম অসভ্যও বোধ হয় এত দুর্গতিতে পড়ে নাই।

অর্থে অবতার অস্বীকার করিয়াছি বলিয়া ইতিহাসে ভগবানের লীলা অস্বীকার করি নাই। যুগে যুগে যাঁহারা নূতন বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মানবজাতির অগ্রজ ভ্রাতা বলিয়া তাঁহাদের চরণে মস্তক অবনত করি, কিন্তু তাঁহাদিগকে পিতা বলিয়া গ্রহণ করি না, এইমাত্র পার্থক্য। তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য গুণগত নহে, পরিমাণগত। পার্থক্যটা প্রত্যক্ষ, কেহ তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারে না। যদি পার্থক্য গুণগত হইত, তবে আমরা তাঁহাদের চরিত্র অধ্যয়ন করিতে পারিতাম না—কুকুর মানুষের চরিত্র অধ্যয়ন করিতে পারে না—সুতরাং বার্ত্তাই (Message) অর্থশূন্য হইয়া পড়িত—অবতীর্ণ হইবার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইত। গীতার বিভূতিতত্ত্ব ও মহাপুরুষবাদ আমরা স্বীকার করি। তবে শাস্ত্রে যে দেখা যায়, মানুষ আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, তাহা কি প্রবঞ্চনা? কখনই না! রাজা রামমোহন রায় স্পষ্ট বলিয়াছেন, বিশেষ অবস্থায় প্রত্যেক মানুষ আপনাকে 'আমি ব্রহ্ম' এই কথা বলিবার অধিকারী। উপনিষদাদিতে ইহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। এই ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিয়া মানুষ যাহা বলে, তাহা ব্রহ্মের উক্তিরূপেই প্রদত্ত হয়। গীতা এই উপনিষদ ভাবেরই অভিব্যক্তি মাত্র। (গীতার অভিমত, ১৩৮-৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই অবস্থাতেও জীবের জীবত্ব বিনাশ পায় না, সে ব্রহ্মের সঙ্গে সর্ব্বাংশে একীভূত হয় না। ব্যক্ত কিছু ব্যক্তাব্যক্তের স্থান অধিকার করিতে পারে না। অবতার ব্যক্ত, 'ব্যক্তাব্যক্ত' অবতার স্ববিরোধী কথা। সুতরাং অবতার কখনও পূর্ণব্রহ্ম নহে। এই যে 'ব্রহ্মাস্মি' জ্ঞান, ইহা কাহার জ্ঞান? ব্রহ্মের নয়, সুতরাং জীবের। যে জ্ঞানের আধার জীব, জীব সেই জ্ঞান লাভ করিয়া লুপ্ত হইতেও পারে না, ব্রহ্মেও পরিণত হয় না। কাজেই, যে কোন অবস্থাই কেন কল্পনা করি না, মহাপুরুষগণ নমস্য হইয়াও কখনই ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হইতে পারেন না। উহা যুক্তি ও প্রত্যক্ষ উভয়-বিরুদ্ধ।

দ্বিতীয় কথা, মানুষ যখন প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে ব্রহ্মকে নিকটে পায় নাই, তাঁহার সঙ্গে যোগ-সাধনের জন্য, তাঁহার লীলা সম্ভোগের জন্য অবতারের কল্পনা প্রয়োজন বোধ করিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজ যে উপাসনাপ্রণালী প্রচার করিয়াছেন; তাহাতে জীবব্রহ্মের অন্তরে বাহিরে নিত্যযোগের অবসর রহিয়াছে এবং অনেকে সেই যোগানন্দ সম্ভোগ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। জগতে তাঁহার ঐশ্বর্য্য, সমাজে পরিবারে তাঁহার

মাধুর্য্য উপভোগ করিয়া তাঁহারা সকল কল্পিত লীলার উপরে উঠিয়া গিয়াছেন। প্রতিদিন আমরা যে সকল সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেছি, তাহার মধ্যে মাধুর্য্য পর্য্যন্ত লীলাময়ের সকল রসই প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষ ছাড়িয়া লীলা আস্বাদন করিবার জন্য কোন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিই প্রাচীন ভ্রান্ত পথে যাইতে রাজী হইবেন না। ঐতিহাসিক সমালোচনা প্রাচীন অবতার সকলের সত্যতা সম্বন্ধেই সন্দেহ আনিয়া দিয়াছে। যেখানে মূলের সত্যতায় সন্দেহ নাই, সেখানেও কত কল্পিত কথার আরোপ ধরা পড়িয়াছে। তর্কের খাতিরে যদি স্বীকারই করা যায়, যে অবতার আসিয়াছিলেন ; তবে নিশ্চয়ই তিনি কোনও বিশেষ লীলা দেখাইবার জন্যই আসিয়াছিলেন। তদতিরিক্ত কিছু তাহার সঙ্গে যোগ করিলে খোদার উপর খোদগারি করা হয়। সুতরাং মিথ্যার আশ্রয় লইয়া বিনাশের পথে যাইবার সম্ভাবনা থাকে। এরূপ স্থলে ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্বন্ধের পন্থা উন্মুক্ত থাকিতে ঐ অন্ধকার পথে অগ্রসর হইবার জন্য যে প্ররোচনা, তাহাতে আমাদিগের প্রাচীন কবিকেই মনে পড়িতেছে—যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে।

ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব চ॥

শেষ কথা, অদ্বৈতাত্মক ধর্ম্মে এবং উহাই কেবল বর্ত্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানালোকিত মনের সন্তোষ সম্পাদনে সমর্থ,—অবতার কেবল অনাবশ্যক নহে, অনিষ্টকারীও বটে। ইতিহাসের বোঝায় মানুষের মনকে নিষ্পেষিত করিয়া দিলে সে প্রকৃত অধ্যাত্ম সম্পদ্ লাভে বঞ্চিত হইবে। সুতরাং অবতারবাদের আলোচনা কেবল ঐতিহাসিক দিক্ হইতে নহে, কিন্তু দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক দিক্ হইতেও নিতান্ত আবশ্যক। অনেক সময়ে দেখা যায়, অবতারে হস্তপদ বদ্ধ থাকে বলিয়া মানুষ প্রকৃত অধ্যাত্ম জীবনে অগ্রসর হইতে পারে না। খৃষ্টীয় জগতে ইহা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। এই বন্ধন হইতে মানুষকে মুক্ত হইতেই হইবে। প্রাকৃতিক ঘটনাবলির মধ্যে ও মানবেতিহাসে লীলাময় ভগবান সতত লীলারত রহিয়াছেন; মানুষ যে পরিমাণে ইহার উপর আপনার ধর্ম্মজীবনকে গঠন করিবে ও ভগবানের প্রত্যক্ষ লীলারসে আপনাকে অভিষিক্ত করিবে সেই পরিমাণে সে ধর্ম্মজীবনে কৃতার্থ ও বন্ধনমুক্ত হইবে। ইতিহাসে যে দেবতা আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন; তিনি কখনও ইহা চাহেন না, যে ইতিহাসের কোন এক পৃষ্ঠায় তিনি আবদ্ধ হইয়া থাকেন।

সপ্তম অধ্যায়

মায়াবাদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

তত্ত্ব

ধর্ম্ম যখন সকল ছাড়িয়া আপনার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়, ধর্ম্মের যে অবস্থায় অন্য সকল প্রকার সম্বন্ধ জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্বন্ধের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়, তখনই উহা তত্ত্বের দিকে মায়াবাদের আকার ধারণ করে। জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্বন্ধকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, মানুষ আপনার সসীমতা সর্ব্বদাই অনুভব করিতেছে। কিন্তু সে যে এই নানার্থযুক্ত বিচিত্র জগতের অঙ্গীভূত, তাহাও সে জানে। যিনি তাহাকে এই সমষ্টির সঙ্গে এক করিয়া সকলের একতা সম্পাদন করিতেছেন এবং সেতুস্বরূপ হইয়া স্থিতি করিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে যে যোগ তাহাই জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের জ্ঞান যে তাহার মধ্যে প্রথম হইতেই স্পষ্ট রহিয়াছে অথবা এই জ্ঞান তাহার জাগ্রত জীবনকে পরিচালিত করিতেছে, তাহা নহে। কিন্তু এই জ্ঞান যে অজ্ঞাতসারে তাহার জীবনকে পরিচালিত করিতেছে তাহা অস্বীকার করিলে জীবনের কোন অর্থ মিলিবে না। জগৎ সম্বন্ধে ও আমাদিগের নিজেদের সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তাহার মধ্যে এই জ্ঞান অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। একটু ধ্যানের চক্ষে জগৎ ও আত্মার উপর দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে, যে এই সূত্রাত্মা যিনি সকলকে একীভূত করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহার জ্ঞান ছাড়া, না হয় আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের কোন অর্থ, না হয় এই বুদ্ধিগ্রাহ্য জগতের কোন মীমাংসা। অধিকন্তু, ধর্ম্মের উৎপত্তি এই সম্বন্ধের জ্ঞান হইতে। এই সম্বন্ধজ্ঞান অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় আমাদের জীবনের তলায় প্রবাহিত বলিয়াই আমরা বাহিরের কোন সসীম বস্তু বা বস্তু-সমষ্টিকে গ্রহণ করিয়া 'সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ' বলিয়া তৃপ্ত হইয়া থাকিতে পারি না। অন্য দিকে আবার এই কারণেই, ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে প্রবেশ করতঃ তাহার কোন ভাব বা ভাবসমষ্টিকে চরিতার্থ দিয়াই জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত

মায়াবাদের নিদান

হইল বলিয়া মনে করিতে পারি না। আসল কথা, 'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি,' এই তত্ত্ব অবিনশ্বর অক্ষরে হৃদিকন্দরে খোদিত হইয়া রহিয়াছে এবং জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে জীবনকে পরিচালিত করিতেছে। তাই, অনন্তের সঙ্গে যুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আত্মার তৃপ্তি নাই। জ্ঞাতসারে এই অনন্তের অন্বেষণই ধর্ম্মসাধন এবং তাঁহার সঙ্গে যোগেই সাধনার সিদ্ধি। ইহারই তাড়নায় অতি বর্ব্বরতম অসভ্যও আপনার পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র বস্তুতে জীবনের তৃপ্তি না পাইয়া কত অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের জালে আপনাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। যেখানে জ্ঞানের উন্মেষ হইয়াছে, অথচ কল্পনা জ্ঞানকে ছাড়াইয়া যাইতেছে, সেখানে বস্তুবিশেষে বা ব্যক্তিবিশেষে অলৌকিক শক্তির আরোপ করিয়া মানুষ অসীমের সীমা পাইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছে ও কত শত পুরাণের জন্ম দিয়াছে। কিন্তু মানুষ চিরদিন এই বাহিরের ভয় ও আশা-চালিত ধর্ম্ম লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে নাই। তাই সে ভিতরে গিয়াছে। সে দৃষ্টিকে ভিতরে লইয়া গিয়া ইষ্টদেবতার এমন রূপ দেখিল যাহার সঙ্গে স্বর্গ-মর্ত্ত্য পাতাল কোথায়ও কিছুর উপমা মিলে না :—

নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ॥ শ্বেত, ৪।১৯

তিনি সর্ব্ববিযুক্ত, 'স্বে মহিম্নি' আত্মমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। এইখান হইতেই আমাদিগকে যে কোন এক পথ ধরিতে হইবে যাহার গতি হয় মায়াবাদের দিকে, না হয় অধ্যাত্মবাদের দিকে। ঈশ্বর ও ঈশ্বরের মহিমা এক অখণ্ড বস্তু, না স্বতন্ত্র? এক অখণ্ড বস্তু ভাবিলে আধ্যাত্মবাদের (Absolute Idealismএর) জন্ম হয়। কিন্তু স্বতন্ত্র কল্পনা করিলে মায়াবাদের পথে চলিতে হইবে। উপনিষদই এই পথে যাত্রা সুরু করিয়া দিয়াছেন; 'স্বে মহিম্নি' বলিয়াই আবার বলিতেছেন, "যদি বা ন মহিম্নীতি" (ছান্দোগ্য, ৭।২৪।১)। আচার্য্য শঙ্কর ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—ব্রহ্ম যখন অপ্রতিষ্ঠ তখন তাঁহাকে পরমার্থতঃ স্ব-মহিমায়ও প্রতিষ্ঠিত বলা চলে না, অর্থাৎ কোন ভাবাত্মক সংজ্ঞা ব্রহ্মে দেওয়া যায় না। এই রূপে জল স্থল শূন্য হইতে সরাইয়া লইয়া কেবল সত্তা বা জ্ঞানমাত্রে পর্য্যবসিত যাঁহাকে পাওয়া গেল, মায়াবাদী তাঁহাকে 'নেতি', 'নেতি' ছাড়া আর কিছু দিয়া বর্ণনা করিতে পারেন নাই। তিনি কি তা বলা চলে না, তিনি কি নহেন তাহাই মাত্র নির্দ্দেশ করা যায়। অর্থাৎ "নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞং। অদৃষ্টম-

ব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্" যে আত্মা তাহাই মায়াবাদীর অভীষ্ট বস্তু। এই সমস্ত লক্ষণ ব্রহ্মের পূর্ণতার এক কণিকাও আমাদিগকে প্রদান করিতেছে না। সৃষ্টির কোন বস্তুর সঙ্গেই তাঁহার বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নাই ("সর্ব্বসংসার-ধর্ম্মাতীত-ব্রহ্মস্বরূপত্বমেব"—শঙ্কর) ইহা প্রদর্শন করাই এই লক্ষণগুলির উদ্দেশ্য। যিনি সকল হইতে বিচ্ছিন্ন, আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ, যাঁর জ্ঞানের জন্য জ্ঞেয়েরও প্রয়োজন নাই, তাঁহাকে বাক্যেও যাহাতে জীব ও জগতের সঙ্গে সম্বন্ধে আসিতে না হয়, তাহার আয়োজন সর্ব্বতোভাবে করিতে হইবে। এই অনর্থ নিবারণের জন্য যদি জীব ও জগৎকে একেবারে উড়াইয়া দিতে হয় তাহাতেও মায়াবাদীর আপত্তি নাই। জীব ও জগতের ব্যাখ্যায় ব্রহ্মের প্রয়োজন। যদি ব্রহ্মরূপ রজ্জু না থাকিত তবে জগৎরূপ সর্পভ্রান্তি আসিতই না। আর জীব তো ব্রহ্মই, তবে কি না অবিদ্যাজ্বরগ্রস্ত। এই জ্বর যখন ছাড়ে, জীব ও জগৎ সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় তিরোহিত হয়, ব্রহ্মমাত্র অবিশিষ্ট থাকেন; অর্থাৎ উপনিষদের ভাষায়—যদাতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি

ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ। শ্বেত, ৪।১৮

জীব ও জগতের পক্ষে ব্রহ্মকে চাই, কিন্তু ব্রহ্ম স্বতন্ত্র, নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত। তাঁহার মধ্যে জগৎ ও জীবের স্থান নাই। মূল কথা এই, যে জীব ও জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধ আছে, কিন্তু ব্রহ্ম জগৎ ও জীবের কোন খবরই রাখেন না, তাঁর কাছে এতদুভয়ের কোন বাস্তব সত্তাই নাই—ইহাই মায়াবাদের আদি কথা, ইহাই মায়াবাদের মধ্য কথা, ইহাই মায়াবাদের শেষ কথা। ইহার জন্যই তো উপনিষদের "যমেবৈষ বৃণুতে" শ্লোক লইয়া আচার্য্য শঙ্কর এত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। শ্লোকটির সরল অর্থ "ব্রহ্ম যে সাধককে বরণ করেন, তিনি তাঁহা কর্ত্তৃকই লভ্য। এই সাধকের নিকটেই ব্রহ্ম স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন।" পূর্ব্বের দুই পাদের সঙ্গে সংলগ্ন করিলেও ইহাই একমাত্র সঙ্গত অর্থ হয়। কিন্তু শঙ্কর এ অর্থ গ্রহণ করিতেই পারেন না। মায়াবাদ-সৌধের উপর ইহা বজ্রাঘাত। সৌধের সব কটি স্তম্ভই ভাঙ্গিয়া পড়ে। ব্রহ্মের কাছে যে জীবের কোন অস্তিত্বই নাই তাকে তিনি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, মোক্ষপথ দেখাইতেছেন এবং সে পথে চলিলে সাধকের কাছে আপনাকে প্রকাশিতও করিতেছেন। কি সর্ব্বনাশ! ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয়তা নির্লিপ্ততা সব বিনষ্ট হইল। সাধনপথে

মায়াবাদের যুক্তি-প্রণালী

সাধক অপেক্ষা সাধ্যের কার্য্যভারই বাড়িল। দেবপ্রসাদে আত্মপ্রভাব চাপা পড়িল। মায়াবাদী সাধনক্ষেত্রে পূরাপূরি বৌদ্ধ আত্মপ্রভাববাদী। মায়াবাদীর সাধনচতুষ্টয় সাধকের আধ্যাত্মিক কস্রৎ, সাধ্যের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নাই। আধ্যাত্মিক জিম্‌ন্যাষ্টিকরূপে উপাসনাও করিতে পারেন, প্রার্থনার কোনই স্থান নাই। অথচ উক্ত শ্লোক দেবপ্রসাদকেই মানুষের মোক্ষসাধনের পথে প্রধানরূপে স্থাপন করিতেছে। সাধনক্ষেত্রে দেবপ্রসাদ আসিলেই ভক্তির জন্ম হয়। ভক্তিধারা তাঁহার মায়াবাদক্ষেত্রকে ডুবাইয়া দেয় দেখিয়া আচার্য্য অতি সন্তর্পণে ক্ষেত্রের চারিদিকে আল বাঁধিয়া দিতেছেন। তিনি এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন, "যমেব স্বমাত্মানমেষ সাধকো বৃণুতে প্রার্থয়তে তৈনৈবাত্মনা বরিত্রা স্বয়মাত্মা লভ্যো জ্ঞায়তে" (কঠ, ২।২৩)। অর্থাৎ সাধক যদি আত্মাকে চান তবে তিনি তাহা জানিতে পারেন। এই ব্যাখ্যায় মায়াবাদ রক্ষা পাইয়াছে, কিন্তু ভক্তিধর্ম্মেরও উৎস যে উপনিষদ্ তাহা রক্ষা পায় নাই। তবে সে কথাটা অবান্তর। আরও একটা অবান্তর কথা বলিব। অনেকে রাজর্ষি রামমোহনকে মায়াবাদী বলিয়া নিন্দবাদ (?) করিতেছেন। রাজর্ষি শঙ্করশিষ্য সুতরাং মায়াবাদী, ইহাই সহজ মীমাংসা। তাঁহারা জানেন না, যে শিষ্য গুরুকে কত দূর অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। রাজা প্রার্থনাবাদী এবং মানবের মোক্ষসাধনে দেবপ্রসাদকেই প্রধান স্থান দিয়াছেন। সাধারণতঃ লোক মনে করে, অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। রাজা বলিতেছেন, 'মানুষ পাপ করিয়া যদি অনুতপ্ত হয় তবে ঈশ্বর কৃপা করিয়া তাহার পাপ ক্ষমা করেন।' যাঁহারা রাজাকে হুবহু শঙ্করপন্থী মায়াবাদী মনে করেন তাঁহারা হয় রাজাকে জানেন না হয় শঙ্করের মায়াবাদ কি বুঝেন না, অথবা উভয় সম্বন্ধেই অনভিজ্ঞ।

'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিটি ব্রাহ্মসমাজ আরাধনার মন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সাধক ইহার মধ্যে ব্রহ্মের যে কত বিভূতির সন্ধান পাইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। শঙ্কর কিন্তু সার নিষ্কাশন করিয়া ইহার মধ্যেও 'নেতি'ই দেখিয়াছেন। "তদেবং সত্যাদি শব্দৈর্মিথ্যাত্ব জাড্যপরিচ্ছে-দেভ্যো ব্যাবর্ত্তিতং তদ্ব্রহ্মেতি বাক্যার্থঃ সম্পদ্যতে।" অর্থাৎ ব্রহ্ম 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং'—ইহার অর্থ, তিনি অসত্য নন, অজ্ঞান নন, সান্ত নন। বুঝিলামও অনেক খানি, পাইলামও অনেকখানি। আমরা এই শ্রুত্যংশের শাঙ্কর ভাষ্য অনুসরণ করিয়া দেখিব মায়াবাদীর মনের গতি কোন্ দিকে। যে বস্তুকে

যেরূপে একবার গ্রহণ করা গিয়াছে, সে রূপের যদি পরিবর্ত্তন না হয় তবে তাহাই সত্য। যাহা বিকারপ্রাপ্ত হয়, তাহা অসত্য! শ্রুতি ঠিকই বলিয়াছেন—"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"—ঘটাদি বিকারমাত্র, মৃত্তিকাই সত্য। মৃত্তিকার উপমা হইতে যদি মনে কর মৃত্তিকার ন্যায় ব্রহ্মের কারকত্ব আছে এবং মৃত্তিকার ন্যায় অচিৎ সেই জন্য বলা হইল 'জ্ঞানং'। ব্রহ্ম যদি জ্ঞানকার্য্যের কর্ত্তা অর্থাৎ জ্ঞাতা হইতেন তবে তিনি সত্য ও অনন্ত হইতেন না। কেননা, জ্ঞান-কার্য্যের কর্ত্তৃত্বে পরিবর্ত্তন বুঝায় এবং ব্রহ্ম যদি জ্ঞাতা হইতেন তবে জ্ঞেয় ও জ্ঞানকর্ম্ম হইতে বিশিষ্ট হইয়া পড়িতেন। যে হেতু শ্রুতি বলেন "যত্র নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা"। যদি প্রশ্ন হয়, জানিতে হইলে অন্য কিছু জানিতে হইবে কেন, নিজেকেও তো জানা যায়? তাহার উত্তর এই, যে ব্রহ্মে দ্বৈতাভাব, সুতরাং কে কাহাকে জানিবে? জ্ঞাতা হইলে, জ্ঞেয়াভাব এবং জ্ঞেয় হইলে জ্ঞাতাভাব। ব্রহ্ম জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা দুইই হইতে পারেন না এই জন্য যে তাঁহার মধ্যে ভেদ নাই। তিনি অবিভাজ্য। সুতরাং ব্রহ্মকে জ্ঞাতা বলিলে একদিকে তাঁহার অনন্তত্ব বিনষ্ট হয়, অন্যদিকে জ্ঞাতা হইবার জন্য কতকগুলি বিশেষ নিয়মের অধীন হইয়া ব্রহ্ম বিকারগ্রস্ত হন ও আপনার সত্যতা হারাইয়া ফেলেন। তাই ব্রহ্ম বিষয়-বিষয়ীর ভেদরহিত কেবল "জ্ঞানম্"। এই বিচার হইতে আমরা পাইতেছি, যে মানুষকে ব্রহ্মজ্ঞানে পৌছিতে হইলে তাহাকে মানবীয় বিশেষত্ব পরিহার করিয়া নিঃসঙ্গ রিক্তহস্ত হইতে হইবে। মানববুদ্ধি জড়ের যে সমস্ত গুণ দেখে, দেশকালের নিয়মে যাহা পায়, তাহার সঙ্গে ব্রহ্মের কোন সম্বন্ধই হইতে পারে না। তাঁহাকে নিতা অবিভাজ্য অপরিবর্ত্তনীয় সত্তারূপে ধরিতে হইবে, যিনি সর্ব্বদা নিজের সঙ্গে এক। চিন্তাতেও তাঁহার মধ্যে কোন ক্রিয়া আরোপ করা চলিবে না। তবে তিনি 'জ্ঞানং' বটেন। যে জ্ঞানে এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ের ভেদ আছে, সে জ্ঞান তো নহেই, যে জ্ঞান জ্ঞাতা হইতে জ্ঞেয়কে ভিন্ন করে তাহাও নহে। এমন কি, এই জ্ঞাতা-জ্ঞেয় সম্বন্ধ আত্মগত হইলেও হইবে না। সে জ্ঞান বিষয়-বিষয়ীর ভেদরহিত জ্ঞান—আমি আমাকে আমার নিজের জ্ঞানের বিষয় করিলেও নীচেই পড়িয়া রহিলাম, তত উপরে উঠিলাম না, যেখানে উঠিতে হইবে। সুতরাং সেখানে 'আমি ব্রহ্ম' 'আমি আছি'ও আমাদের হাতছাড়া হইয়া পড়িবে।

'তবে জীব কিরূপে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিবে? অবশ্য যুক্তিতর্কের

দ্বারা নয়—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।" যে অবস্থায় আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত ("প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ") হয়, পাশ্চাত্য মায়াবাদী ফাইলো, প্লতিনাস্ প্রভৃতি যাহার নাম দিয়াছে—ভাবাবেশ (Ecstacy), সে অবস্থায় আত্মজ্ঞানের দীপ পর্য্যন্ত নিবিয়া যায় (The light of self-consciousness is extinguished)—'নাথ, তুমি প্রকাশিত হ'লে জীবের আত্মজ্ঞান জ্যোতিঃ হারায়' (ব্র, স,)। বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য ইহাকে সুষুপ্তির অবস্থা বলিয়াছেন। এই অবস্থায় বাহ্য কি আন্তর কোন জ্ঞানই থাকে না (ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্ বৃহ ৪।৩)। ব্রহ্মীভূত হইয়াই জীব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে। উপনিষদের "স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" শ্রুতিটিকে যদি "যিনি ব্রহ্ম হন, তিনি পরম ব্রহ্মকে জানেন" এই ভাবে অন্বয় করা যায় তবে মায়াবাদীর ব্রহ্মদর্শনের সঙ্গে মিলে। কেন না, জীব তো ব্রহ্মই, কেবল অবিদ্যার মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে বই তো নয়? যখন সাধনের বাতাসে এই মেঘ উড়িয়া যায়, তখন ব্রহ্মই প্রকাশিত থাকেন। তবে অবস্থাটা বর্ণনা করা মুস্কিল। 'সোহমস্মি'ও এখানে 'ইহ বাহ্যের মধ্যে। কেন না, এখানে অনেকখানি দ্বৈতের গন্ধ থাকিয়া যায়। "সর্ব্বগতং যদদ্বয়ং তদেব চাহং সততং বিমুক্তম্" (বেদান্তসার, ৭৮)। ইহাও নির্ব্বিকল্প সমাধি নহে। ইহারও উপরে যাইতে হইবে; সুতরাং বাক্য চিন্তা সব বন্ধ। ইহাই মায়াবাদের বিপত্তি। ব্রহ্মলোকবাসী জীবের বর্ণনায় ঋষি বলেন, "তন্ন পশ্যতি, পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি।" মায়াবাদীর বিপদ—তিনি সকলই প্রকাশ করিতে চান 'নেতি'র ভিতর দিয়া। কিন্তু তিনিও জানেন, ভাবাত্মক জ্ঞান ছাড়া অভাবাত্মক জ্ঞান হয় না। অভাবাত্মক জ্ঞানও ভাবাত্মক সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে দুই বস্তুর মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই, মিলনভূমি নাই, তাহাদের মধ্যে অভাবাত্মক সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। তাই 'না' বলিয়াই আবার তাহারও 'না'র প্রয়োজন হয়। 'দেখে না'র না হয়, দেখে; আবার তার না হয়, দেখে না—এই অনন্ত 'নেতি' প্রবাহের উপর দিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে হয়! এইরূপে ভাসিয়া মায়াবাদ এমন জায়গায় আসিয়া পৌছে যেখানে, "ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ" "অন্যদেব তদ্বিদিতাদাথো অবিদিতাদধি," (Beyond being, beyond knowledge—Plato), "যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ," প্রভৃতি বাক্য বাহির হইয়া পড়ে, এবং মনে হয় বুঝি তার সঙ্গে অজ্ঞেয়বাদের

কোলাকোলি। মনে রাখিতে হইবে, মায়াবাদ ও অজ্ঞেয়বাদ বিপরীত মার্গগামী এবং ইহাদের মিলন বিপরীতমার্গগামী বস্তুদ্বয়ের সম্মিলন। তাই অজ্ঞলোকে মায়াবাদীর 'ন বিদ্মো ন বিজানীমো' দেখিয়া ভাবে ইহা অজ্ঞেয়বাদের কথা! আশা করি কেহ ঋষিদিগকে অজ্ঞেয়বাদী মনে করিয়া এই উভয় মত সম্বন্ধেই অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিবেন না। মায়াবাদী উপরে উঠিয়াছেন, তিনি নীচে নামিতে চান না, অজ্ঞেয়বাদী কখনও উপরে উঠেন নাই। মায়াবাদীর কথা শুনিয়া বেশ মনে হয়, তিনি যেন কি দেখিয়াছেন কিন্তু বলিয়া উঠিতে পারিতেছেন না; কি যেন দেখিয়া তাঁহার চোখ ঝল্‌সিয়া গিয়াছে। অজ্ঞেয়বাদী জন্মান্ধ। ব্রহ্মবস্তু অবন্তীনগরের ঢাল—এক দিকে সোণা, এক দিকে রূপা। মায়াবাদী সোণার রূপ দেখিয়া রূপার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। অথবা রূপার কথা বলিলে সোণার গৌরব হানি হয়, তাই সোণা ছাড়া আর কিছুই বলেন না। অজ্ঞেয়বাদী সোণা দেখেনও নাই, চিনেনও না।

নিম্ন আমি ও উচ্চ আমি

যাহা হউক, আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, যে জীব ব্রহ্মীভূত হইয়াই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে। এক অর্থে এই কথা অতীব সত্য। নিম্নতর আমির বিনাশ না হইলে উচ্চতর 'আমি' যে ব্রহ্ম, তাঁহার সঙ্গে যোগ হয় না। কিন্তু মায়াবাদীর অর্থে জীব তাহার জীবত্ব, সসীমত্ব পরিহার করিয়া অসীমে ডুবিয়া যায়, এরূপ ব্রহ্ম-প্রাপ্তি সসীমের অসীমপ্রাপ্তি নয়, ব্রহ্মের ব্রহ্মপ্রাপ্তি—একটা কথার কথা মাত্র। জীবের জীবত্ব, তার সসীমত্ব, এমন একটা সত্য বস্তু, যে তাহা ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব, তাঁর অসীমত্ব অপেক্ষা মূলতঃ কোন অংশেই হীন নহে, সুতরাং তাহা অসীমেরই ন্যায় অবিনাশী। ইহা কোন কল্পিত উচ্চাবস্থার জন্য বিনষ্ট হইতে পারে না। জীবত্বকে নির্ব্বাসিত করিয়া আমার জীবনের সার্থকতা নাই, কিন্তু মহাপ্রাণের প্রাণস্রোতকে আমার জীবনরূপে প্রবাহিত হইতে দিবার সুযোগ করিয়া দিয়াই আমার জীবনের সার্থকতা। আমার জীবত্ব মহাপ্রাণের স্পন্দন। সুতরাং আমার জীব-স্বভাবের অনন্ত অভিব্যক্তিতেই আমার জীবনের পূর্ণতা, আমার আত্মা যে সকল শক্তি লইয়া জন্মিয়াছে তাহাদের পূর্ণ বিকাশেই আমার জীবনের সার্থকতা; নতুবা যেখানে যাইতে হইলে আমাকে আমার আত্মজ্ঞান বিসর্জ্জন দিতে হইবে, সেই অবোধ্য অবস্থার পশ্চাতে ছুটিয়া জীবন সার্থক হইবে না। জীবের জীবত্ব, তার বিশেষত্ব খাঁটি সত্য বস্তু। কেননা, উহা ব্রহ্মেরই প্রকাশ। সুতরাং

জীবত্বের বিনাশে নহে কিন্তু অনন্ত বিকাশেই তার ব্রহ্মপ্রাপ্তি। যেহেতু, "ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্"। মায়াবাদী তাঁর ব্রহ্মকে 'নেতি নেতি'র অস্ত্রাঘাতে প্রায় নির্ম্মূল করিয়া আনিয়াছেন, ধরা ছোঁয়া যায় না। গীতার "ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব"এর মধ্যেও মায়াবাদের গন্ধ রহিয়াছে, পূর্ব্বার্দ্ধের "মত্তঃ পরতরং" দোষটাকে কিঞ্চিৎ পরিহার করিতেছে মাত্র। আসল কথা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," "রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ"। মালার সবটাই ব্রহ্ম, কেবল ঐ সূত্রটা নহে। প্রত্যেকটা মণির একত্ব, তার মণিত্বও তিনি। তিনি প্রত্যেকটা মণির প্রাণ না হইলে বাহির হইতে আসিয়া তাহাদের লইয়া মালা গাঁথিতে পারিতেন না, এবং মায়াবাদী মণি পরিত্যাগ করিয়া সূত্র ধরিয়াও ব্রহ্মের অনন্তত্ব অব্যাহত রাখিতে পারিতেন না, তিনি যাহাই মনে করুন না কেন। মণি যদি মিথ্যা হয়, তবে ঐ মণির মধ্য দিয়া গিয়া যে সূত্র মালা প্রস্তুত করিয়াছে তাহাও মিথ্যা। মণি মিথ্যা নয়। মণি ব্রহ্মসত্তায় পরিপূর্ণ—তিনি কেবল 'বিগত বিশেষং' নহেন, 'জনিতাশেষম্'। এই বিশেষের মধ্য দিয়াই নির্ব্বিশেষের স্ফূর্ত্তি, এই মণির মধ্য দিয়াই সূত্রের আবির্ভাব। মায়াবাদী এই বিশেষ, এই মণি, ছাড়িয়াছেন বলিয়া তাঁর ঐ নির্ব্বিশেষ সূত্রও যেন হাতছাড়া হইয়া পড়িয়াছে। এই যে মণি-সকলের প্রত্যেকের বিশেষত্ব, এই বিশেষত্বগুলির পূর্ণতাতেই পূর্ণব্রহ্মের অভিব্যক্তি। সুতরাং, আবার বলি, জীবের জীবত্ব, তার সসীমত্ব, বিসর্জ্জন দিয়া তাহাকে ব্রহ্মলাভ করিতে হইবে না, বরং প্রকৃত ব্রহ্মলাভের জন্য তাহাকে তার এই সসীমতাকে প্রাণপণে আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে। তার জীবনের পূর্ণতা সার্থকতা এই পথে। অন্য পথে লাভ হইবে শূন্যতা। সে পথের ব্রহ্মও শূন্য, জীবও শূন্য, মুক্তিও শূন্য।

ধর্ম্মে মায়াবাদের দাবী

তবুও বলি, ধর্ম্মজগতে মায়াবাদীর ঋণ অপরিশোধ্য। মায়াবাদের ইতিহাস কি? আমরা যে একত্বের অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিলাম, সজ্ঞানে যে একত্বের ধারণা ছাড়া ধর্ম্ম হয় না, সে একত্ব নির্ব্বিশেষ একত্ব নয়, সত্য; আমরা সকলের একত্ব চাহিয়াছিলাম, মায়াবাদী 'সকল' ছাড়া ঐ একত্ব-বন্ধনের সূত্রকেই মাত্র আমাদের হাতে দিয়াছেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু কে ঐ একত্বের জ্ঞান মানুষের মনে এমন পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছে? মানুষ বহির্জ্জগতেই আপনার ইষ্টদেবতা খুঁজিয়াছিল; ইষ্টদেবতা বিষয়-জগতের অন্তর্ভুক্তই হউন বা নির্ব্বিষয়

বিষয়ী আত্মাই হউন, এ দুই প্রায় এক কোঠা-ভুক্ত হইলেও ইষ্টদেবতা যে আত্মস্বরূপ, এ কথা আমাদিগকে এমন উজ্জ্বল ভাবে কে শিখাইয়াছেন ? ব্রত নিয়মাদি বাহিরের অনুষ্ঠানের অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, কিন্তু মানুষ যখন ঐ গুলিকেই সর্ব্বস্ব মনে করিয়াছিল, তখন কে শমদম ধ্যানধারণাদি তপস্যায় মানুষকে সবলে টানিয়া লইয়া গিয়াছিলেন ? ধর্ম্ম মানব-জীবনের সর্ব্বাঙ্গব্যাপী, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কর্ম্মই ধর্ম্ম, জীবনের সকল সম্বন্ধই ধর্ম্ম সম্বন্ধ, সত্য ; কিন্তু মানুষ যখন ধর্ম্মকে দশটা বহির্ব্বিষয়ের একটা মনে করিয়া ধর্ম্মের গৌরব এতটুকুও ধারণা করিতে পারে নাই, তখন আর সকলের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া অথবা তাহাদিগকে অধঃকৃত করিয়া কেবল ধর্ম্মের জন্য সকল বিসর্জ্জন দিয়া কে এমন করিয়া ধর্ম্মের মহিমা মানব অন্তরে খোদিত করিয়া দিয়াছেন ? সকল প্রশ্নের উত্তরেই বলিতে হয় **মায়াবাদী**। আরও বলিতে হয়, যিনি মায়াবাদের পূতসলিলে একবার অবগাহন করিয়া উঠেন নাই, ধর্ম্ম তাঁহার কাছে কখনও বাস্তব সত্য (Stern reality) হইতে পারিবে না। মায়াবাদের ঋণ শোধ করিতে পারি না। পৌত্তলিকতার ঋণই শোধ করিতে পারি নাই। যে কারণে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়াও ইষ্টদেবতাকে হস্ত, চরণ, মুখ হইতে বঞ্চিত করি নাই, তাহা অপেক্ষা গুরুতর কারণেই উপাসনায় মায়াবাদীর ভাষা ব্যবহার করিতে হয়। কেননা, ধর্ম্মজীবন পথে মায়াবাদরূপ পান্থনিবাসে বাস করিতে হইয়াছে। কিন্তু পান্থনিবাসে বসিয়া থাকিলে গন্তব্য স্থানে পৌছান যাইবে না।

হে পরমেশ্বর, এই অনন্ত জীবন-পথে তুমি আমাদিগকে হাত ধরিয়া অগ্রসর কর। বিশ্রাম কোথায় তুমিই জান, আমরা জানি না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জগৎ

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ" ॥

"কোটি গ্রন্থে যাহার বর্ণনা হইয়াছে এক কথায় তাহা এই,—সত্তা (Reality) একমাত্র ব্রহ্মের। ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় জ্ঞান, অনন্ত, নির্ব্বিশেষ। সুতরাং সান্ত এবং বিশেষত্বপূর্ণ এই জড়জগৎ মিথ্যা। জীব ব্রহ্ম ছাড়া অপর কিছু নয়।" কিন্তু জীবের জ্ঞান বিশেষত্ব-দোষদুষ্ট, ভেদাত্মক। তাহার মধ্যে কেবল বিষয়-বিষয়ীর ভেদ আছে তাহা নয়, এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ের ভেদ আছে। এই ভেদ অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিয়া গেলেই জীব ব্রহ্ম। এই অভেদাত্মক জ্ঞানই "ব্রহ্মৈব নাপরঃ"। সুতরাং নীচে যা কিছু সব মায়ার খেলা, মিথ্যা। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে এই মিথ্যাই ব্রহ্মের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া মায়াবাদীকে নাকে দড়ী দিয়া টানিয়া লইয়া দ্বাদশ শতাব্দী ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তাহার উত্তর না দিলে কোন দর্শনশাস্ত্রই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ব্রহ্মই তো একমাত্র বস্তু, তবে মিথ্যা আসিল কোথা হইতে? হাজার হইলেও মিথ্যার অস্তিত্ব তো স্বীকার করিলে; সুতরাং ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব টিঁকিল কৈ? সত্য হইতে মিথ্যাকে বিভিন্ন করে কে? যে করে সে তো সত্য ও মিথ্যা উভয়কে অতিক্রম করিতেছে। সে ব্রহ্ম হইতেও উচ্চ গ্রামে অবস্থিত। এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য মায়াবাদী যা কিছু উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে বিপদ্ দূরীভূত না হইয়া কেবল ঘনীভূতই হইয়াছে। এ বিপদে মায়াবাদী সেই লোকপ্রসিদ্ধ 'তৃণে'র আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সে তৃণ অঘটন-ঘটন-পটিয়সী অনির্ব্বচনীয়া মায়াশক্তি—তা বস্তুও নয় অবস্তুও নয়, আছে কি নাই তার নিরূপণ হয় না—'তত্ত্ব-অন্যত্ব-নিরূপণস্য অশক্যত্বাৎ' (সূত্রভাষ্য, ১।৪।৩) এই অনির্ব্বচনীয়া মায়া বা অবিদ্যাই মিথ্যা-জগতের কারণ—'অবিদ্যা-কল্পিতে নামরূপে তত্ত্ব-অন্যত্বাভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়ে সংসারপ্রপঞ্চবীজভূতে' (২।১।১৪)। যা আছে কি নাই তারই ঠিকানা নাই, তাহাই এই জগতের কারণ। নিতান্ত দায়ে না

পড়িলে মানুষ এরূপ অদ্ভুত অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করে না। জগতের ব্যাখ্যা না করিলে দর্শনশাস্ত্র হয় না। ব্রহ্ম যদি কারণ হন তবে মায়াবাদীর অভীষ্ট ব্রহ্ম টেঁকেন না। তাই নিমজ্জমান ব্যক্তির তৃণখণ্ড গ্রহণের ন্যায় মায়াবাদী মায়ার শরণ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। এক দিকে মায়াবাদী আত্মাকে কাটিয়া ছাটিয়া একেবারে প্রায় শূন্যের কাছাকাছি লইয়া গিয়াছেন, এবং অন্য দিকে এই শূন্যের শূন্যত্ব রক্ষার উৎসাহে যে দ্বৈত আসিয়া গিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। শঙ্কর ও তৎপরবর্ত্তী মায়াবাদিগণের উপর এক দিকে শূন্যবাদী বৌদ্ধগণের, অন্য দিকে দ্বৈতবাদী সাংখ্যের প্রভাব সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। মায়া যদি বস্তু হয়, তবে তো দ্বৈত এক কথায়ই আসিয়া গেল। ইহা অপেক্ষা জগতের সত্তা স্বীকার করা ছিল সহস্রগুণে ভাল। না করিয়া মায়াবাদীর পক্ষে উত্তপ্ত কটাহ হইতে প্রদীপ্ত চুল্লীতে প্রবেশ ঘটিয়াছে। মোক্ষমূলর যে বলিয়াছেন, ওরূপ খুঁৎ সকল দর্শনেই অল্প বিস্তর আছে, ('There is a point in every system of philosophy where a confession of ignorance is inevitable') তাহাতে মায়াবাদীর লাভ নাই। কেন না, এ খুঁৎ যে একেবারে যাকে বলে 'গোড়ায় গলদ্'। যাহা রক্ষা করিতে চাহিতেছি, তাহারই বিনাশ? ব্রহ্মও অনাদি স্বতঃসিদ্ধ, মায়াও অনাদি স্বতঃসিদ্ধ। অদ্বৈততত্ত্ব প্রমাণ করিবার জন্য এই দুই লইয়া মায়াবাদের আরম্ভ। যিনি সর্ব্বপ্রথমকার এই ধাপ্পা সাম্‌লাইতে পারিলেন না, তাঁহাকে মায়াবাদী সাত ঘাটের জল না খাওয়াইয়া ছাড়িবেন না। তাঁহার পক্ষে মায়াবাদের যুক্তি অকাট্য হইয়া উঠিবে। প্রথমে মায়ার অস্তিত্ব ধরিয়া লইয়া পরে তাহাকে অবস্তু বলিয়া তাহার ক্রিয়া (ক্রিয়া থাকিলে যদিও অবস্তু বলা মুখের কথা মাত্র) জীব ও জগৎকে উড়াইয়া দিয়া ব্রহ্মের একরস অদ্বৈতত্ব প্রতিষ্ঠা করা অতি সহজ।

মায়াবাদের গোড়ায় ভুল

যদিও শঙ্কর বলিয়াছেন মায়া অবস্তু, তাহার ধর্ম্ম ব্রহ্মকে স্পর্শ করে না,— 'অবস্তুত্বাৎ এবং পরমাত্মাপি সংসারমায়য়া ন সংস্পৃশ্যতে' (২।১।৯), কিন্তু তিনি ও তাঁহার শিষ্যগণ মায়ার যে সকল কার্য্য ও প্রভাব স্বীকার করিয়াছেন তাহাতে অবস্তু বলা তর্কের খাতিরে। যা বাস্তবিকই নাই, তাকে কি কেউ অবস্তু বলিতে যায়? মায়া একটা কার্য্য—জগৎ—উৎপন্ন করিয়াছে, তাই বলা হইতেছে অবস্তু-মায়ার এই কার্য্য—জগৎ—ও অবস্তু। তলাইয়া দেখিলে দেখা

যাইবে, একটা বস্তু কোথায়ও স্বীকার না করিয়া অবস্তুর প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কার কাছে জগৎ প্রকাশিত? যদি বল জীবের মায়াবশতঃ এই জগতের উৎপত্তি। তবে সাংখ্যের দ্বৈতবাদ আসিল, অদ্বৈতবাদ টিঁকিল না। যদি বল ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই, তখন বলিতে হইবে—এ জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং তাঁহাতেই স্থিত। কিন্তু নির্লিপ্ত ব্রহ্মে জগৎ আরোপিত হইতে পারে না, উহা অবস্তু মায়ার অবস্তু কার্য্য। এই কার্য্যের কর্ত্তা যিনি তিনি যদি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হন, তবে তো মায়া কেবল ঐন্দ্রজালিকের অবিদ্যা নয়, মায়াবী স্বয়ং, যিনি ভেল্‌কি বাজীর দ্বারা সেই সংসার বৃক্ষের অভিনয় প্রদর্শন করিতেছেন, শ্রুতি স্মৃতি যে বৃক্ষের পত্র (এই শ্রুতি হইতেই ভূরিভূরি শ্লোক তুলিয়া মায়াবাদ সমর্থন করা হইতেছে। ইহাতে কি চক্রক হেত্বাভাস *petitio principii* হইল না? "শ্রুতিস্মৃতিন্যায়বিদ্যোপদেশ-পলাশঃ", কঠভাষ্য, ৬।১), এবং ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল পক্ষীরা যে বৃক্ষে বাসা বাঁধিয়া মহা চেঁচামেচি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এ ব্যাখ্যায় জগৎটা হয় সয়তানের খেলা এবং আমরা খৃষ্টীয় নষ্টিক্ (Gnostic) দের সৃষ্টিতত্ত্বের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছি। আর যদি মায়া ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হয়, তাহা হইলে, হয় মায়া ব্রহ্মেরই শক্তিবিশেষ,—সুতরাং ব্রহ্মশক্তিতে উৎপন্ন ও ধৃত জগৎ ব্রহ্মকেও মিথ্যা না করিয়া নিজে মিথ্যা হইবে না; না হয়, ব্রহ্ম অবস্তু মায়া দ্বারা অভিভূত হইয়া এই অবস্তু জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্ম মায়াস্পৃষ্ট নহেন এ কথা বলা চলিবে না; এবং মায়াবাদী সে কথা বেশী দিন বলেনও নাই। 'পঞ্চদশী'কার স্বীকারই করিয়াছেন, যে মায়াপ্রভাবে ব্রহ্মই জীবরূপে সুখদুঃখাদি ভোগ করিতেছেন। শঙ্করশিষ্য সুরেশ্বর 'তৈত্তিরীয়' বার্ত্তিকে (২।৭।৬৯—৭২) বলিয়াছেন, যাঁহাকে জানিলে সকল ভয় চলিয়া যায় সেই ব্রহ্মও অবিদ্যাভয়ে সর্ব্বদা ভীত! অদ্বৈততত্ত্ব ও নির্লিপ্তত্ব রক্ষা করিতে যাইয়া মায়াবাদের হাতে ব্রহ্মের কি দশা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আপনারা 'কেহ হাস্‌ছেন, কেহ কাঁদ্‌ছেন কেহ দিচ্ছেন গা'ল', মায়াবাদী কিন্তু গোঁফে চাড়া দিয়া বলিতেছেন, ("দুর্ঘটৈকবিধায়িন্যাং মায়ায়াং কিং চমৎকৃতি" পঞ্চদশী, ৬।১।৩৪), অঘটনঘটনপটিয়সী মায়ার পক্ষে এ আবার আশ্চর্য্য কথা! আমরা দেখিতেছি সাংখ্যের প্রকৃতিপুরুষবাদ ক্রমেই কেমন জাল বিস্তার করিয়া বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্বকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। অথচ অজ্ঞলোকে মনে করিতেছে, যে আমরা খাঁটি বেদান্ততত্ত্বই লাভ করিতেছি। তারপর, ইহা প্রথমে তন্ত্র, পরে তন্ত্রপ্রভাবিত

বৈষ্ণবধর্ম্মের শাখাবিশেষের মধ্য দিয়া দেশে যে আবর্জ্জনারাশি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, সে তো নরক-কুণ্ড! তাহা ঘাঁটিলে দুর্গন্ধই সার।

মায়াবাদীর ভ্রান্তি এই, তিনি দেখিতে পান না, যে 'না' বলিলে তাহার মধ্য হইতে একটা 'হাঁ' উঁকি মারিয়া বাহির হয়। একান্ত অভাবের, অনস্তিত্বের সম্বন্ধে হাঁ-না কিছুই বলা চলে না। অভাবাত্মক জ্ঞানও সম্বন্ধ সূচনা করে, এবং দুই 'না'র মধ্যে কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। যা আছে তারই অভাব কল্পনা করি—যা নাই, তার সম্বন্ধে ভাব অভাব দুই-ই অপ্রযোজ্য। অভাবের অভাবের দ্বারা যাহা সংজ্ঞিত হয় তাহা পূর্ব্ব হইতে না থাকিলে তাহার সম্বন্ধে কোন চিন্তাই সম্ভব নয়। তাই মায়াবাদী যত বেশী মায়ার মায়া কাটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তত বেশী মায়ার বন্ধনে পড়িয়াছেন—যতই তিনি মায়ার অনস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, ততই তাহা একটা বিরাট্ বস্তুর আকার ধারণ করিয়া তাঁহার ব্রহ্মকেও আচ্ছাদিত করিয়া বসিয়াছে। যা নাই, তা কখনও জ্ঞানের বিষয় হয় না। যাহার বিষয়ে বড় বড় গ্রন্থ লেখা হইয়াছে, তাহা আর কত দিন অবিষয় থাকিবে? মায়াবাদী যে কখনও মায়াকে অবিষয় ভাবেন নাই তাহার প্রমাণ হাতে হাতে। কেহ কখনও অবস্তুকে ভয় করে না। সুতরাং তাঁহার ভয় তাঁহার ব্রহ্মে বর্ত্তিয়াছে। মায়ায় ব্রহ্মই ঢাকা পড়িয়া গেলেন। আমার সম্মুখের এই পুস্তকখানি বস্তু, কোন 'কিছু না'র দ্বারা ইহার ঢাকা পড়িবার সম্ভাবনা নাই। স্বতঃসিদ্ধ স্বপ্রকাশ অনাদি অনন্ত আনন্দস্বরূপ নির্ব্বিকার ব্রহ্ম কেবলমাত্র 'কিছু না'র দ্বারা ঢাকা পড়িয়া সান্ত সসীম জীবরূপে সুখদুঃখের দ্বারা আলোড়িত হইতেছেন, ইহা পণ্ডিতেরা (?) ছাড়া আর কেহ বিশ্বাস করিবে বলিয়া মনে হয় না। মায়াবাদী প্রমাণ করিয়াছেন, যে 'কিছু না' লইয়া অনেক কথা বলিতে গেলে সে শেষে একটা মস্ত 'হাঁ' হইয়া সকল গ্রাস করে। তার পর, মায়াবাদী যতই মায়া হইতে জগতের উৎপত্তির কথা বলুন না কেন, পরিণামে জগৎকে কোনও রকমে ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাহা না হইলে এক দিকে যেমন ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব বজায় থাকে না, অন্য দিকে ধর্ম্ম যে চায় তার ইষ্টদেবকে সর্ব্বময়রূপে দেখিতে তাহাও পাওয়া যায় না। তার পর, কথায় অকথায় যে শ্রুতি প্রমাণরূপে গৃহীত তাহা তো প্রতিপদেই ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব স্বীকার করিতেছে। তাই 'সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে' এইরূপ এক যুক্তিপ্রণালী তিনি অবলম্বন করিয়াছেন। মায়াবাদী এক এক করিয়া জগৎ ও জীবধর্ম্মকে

বিদায় দিয়া যে যুক্তি-অস্ত্রে ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব প্রভৃতি প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এক দিক্ দিয়া তাহার গতি অপ্রতিহত। কিন্তু ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ দেখাইতে যাইয়া তিনি স্বীয় অস্ত্রের ধার আদৌ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। বলিতে গেলে সেখানে যুক্তি বড় নাই। কুযুক্তি অনেক আছে, তার মধ্যে শ্রুতি-বাক্যের স্বমতপোষক ব্যাখ্যা একটি। আর আছে কয়েকটি উপমা। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম তাহার অন্যতম। তবে ভ্রমটা কাহার তাহা লইয়া চাপিয়া ধরিলে, যত কিছু পাপ ঐ নরোত্তমেই চাপিয়া বসিবে। যদি বল ভ্রম জীবের, তবে চক্রকের (*Petitio principii*) ভয় আছে। এক দিকে ব্রহ্মরূপ রজ্জু, অন্য দিকে জগৎরূপ সর্প, মাঝখানে মায়ার সেতু গড়িলেই ব্যবধান দূর হইল না। ব্রহ্ম তো রজ্জু, ভ্রম তাঁহার নহে। ভ্রম জীবের। সুতরাং জীবই জগৎরূপ সর্পের জন্মদাতা, মায়ার প্রভাবে। আমরা বিজ্ঞানবাদে (**Subjective Idealism**এ) পৌঁছিলাম, ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের কোন যোগ পাইলাম না, যা আমরা চাই। রজ্জু ও সর্প দুই পরস্পরের বাহিরে। উভয়ের মধ্যে কোনই আভ্যন্তরীণ যোগ স্থাপিত হইল না। অন্য দিকে চক্রক; কেন না, মায়াদ্বারা জগৎসৃষ্টি না হইলে জীব আসেই না। আর যদি বলা যায়, বাজীকর নিজের মায়ায় অভিভূত না হইয়াই জগৎ প্রদর্শন করিতেছেন, তবে এক দিকে ব্রহ্ম বুজরুকের আসনে নামিয়া পড়িলেন। আর যদি এই ক্রিয়া অনাদিকাল হইতেই চলিয়া থাকে ইহাকে ব্রহ্মের স্বভাব বলিলেই তো চুকিয়া যায়, মায়াবীর মায়া, রজ্জুতে সর্পভ্রম প্রভৃতি আজগুবী তত্ত্ব উদ্ভাবনেরই বা প্রয়োজন কি? স্বভাবই হউক, আর মায়াবীর মায়াই হউক, মায়াবাদীর অর্থে যে কোন দিক্ দিয়াই ব্রহ্মের নির্লিপ্তত্ব নির্গুণত্ব সবই চলিয়া যাইবে। বাস্তবিক, মায়াবাদী সে সঙ্কটে পড়িয়াছেন তাহা তাঁহার স্বখাত-সলিলে ডুবে মরা। তাঁহার দিক্ হইতে ইহার সমাধান নাই। তিনি ব্রহ্ম ও জগৎকে সুরুতেই এমন দুই কোটিতে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, যে উভয়ের মধ্যের ব্যবধান আর কিছুতেই তিরোহিত হইবার নহে। মায়ার সেতুবন্ধনেও নহে। উপনিষদের মধ্যে উপায় ছিল, কিন্তু মায়াবাদী সে পথে যান নাই। উপনিষদের শ্লোক অবোধ্য নহে, তাহার পনর আনা সহজ ব্রহ্ম-বাদের পথই দেখাইয়া দেয়। আচার্য্য শঙ্কর ভাষ্যের অন্তর-টিপ্পনীর (**Interpolation**এর) সাহায্যে বেদান্তকে মায়াবাদের শাস্ত্র করিয়া গড়িয়াছেন।

মায়াবাদের ভ্রান্তি স্বকৃত

উপনিষদ্ বলিতেছেন —

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিল্লোঁকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। কঠ, ৬।১

ঊর্দ্ধমূল (অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন) সুতরাং নিম্নগামী শাখাযুক্ত এই সনাতন অশ্বত্থ (অর্থাৎ সংসার-বৃক্ষ)। ইহার মূল যিনি তিনিই জ্যোতির্ম্ময় অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম। পৃথীব্যাদি সমস্ত লোক তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।

যে মায়াবাদীর সামান্য তৃণখণ্ডে (স্তম্ব) বিকার উৎপন্ন হয়, তাঁহার পক্ষে আস্ত বটগাছ হজম করা সম্ভব নয়। তাহাতে আবার আচার্য্য ইহাকে ডাল পালা দিয়া এক বিরাট কারখানায় পরিণত করিয়াছেন। শঙ্কর কত বড় কবি ছিলেন, এই শ্রুতির ভাষ্য পাঠ করিয়া তাহা সকলকে জানিতে অনুরোধ করি। আমরা কেবল দার্শনিকের অনুসরণ করিব। এখানে মায়াবাদীর মস্ত বিপদ, যে, যার দ্ব্যর্থ হয় না এমন স্পষ্ট ভাষায় ব্রহ্মকে কেবল জগৎকারণ বলিতেছেন না, আশ্রয়ও বলিতেছেন। সুতরাং অন্তর-টিপ্পনী ছাড়া ইহার মধ্যে মায়াবাদের স্থান হইতে পারে না। ইহা সুস্পষ্ট ব্রহ্মবাদ—ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মেই স্থিতি করিতেছে, এক কণিকাও তাঁহার বাহিরে নহে। কোথায়ও ফাঁক নাই, যে আর কিছুর স্থান হইতে পারে। আশ্চর্য্যের বিষয়, আচার্য্য এরূপ নিরেট অদ্বৈতের মধ্যেও অন্য তত্ত্ব (Principle) ঢুকাইবার স্থান করিয়া লইয়া স্ববিরোধ উৎপাদন করিয়াছেন। এরূপ স্পষ্ট বাক্যের পরে ব্রহ্মই যে জগতের মূল—'পরব্রহ্মমূলসারঃ'—তা যেমন অস্বীকার করা চলে না, সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কর্ত্তাও যে তিনি—'শ্রিতা আশ্রিতা সর্ব্বে সমস্তা উৎপত্তি-স্থিতিলয়েষু' তাহাও অনিবার্য্য হইয়া উঠে। কিন্তু মায়ার স্থান যে রকমেই হউক করিয়া লইতে হইবে, 'delenda est Carthago', কার্থেজের বিনাশ সাধন করিতেই হইবে, তার পক্ষে যতই বলিবার থাকুক না কেন—ব্রহ্ম তার মূল এ কথা শ্রুতি বলিলে কি হইবে? জগৎকে উড়াইয়া দিতে হইবেই। তাই ব্রহ্ম যদিও ইহার মূল, সৃষ্টিস্থিতি লয়ের কর্ত্তা, ব্রহ্ম হইতেই রস আকর্ষণ করিয়া ইহা বাঁচিয়া আছে, কিন্তু ইহার বীজ হচ্ছেন মায়া—'অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মাব্যক্ত-বীজপ্রভবঃ'—সাংখ্য কোথায় লাগেন, শঙ্করের মধ্যে কপিল ধরা পড়িতেছেন এই বীজ যখন অঙ্কুরিত হইল, তখন আমরা পাইলাম মায়োপহিত ব্রহ্ম অর্থাৎ অপর ব্রহ্ম। 'ব্রহ্ম' শব্দটি পর ও অপর এই দুই অর্থে ব্যবহৃত করিবার

সুযোগ থাকায় মায়াবাদীর হাতে ইহা শাঁখের করাত হইয়াছে, দুই দিকেই কাটে। শ্রুতিব্যাখ্যায় এই অস্ত্রপ্রভাবে শঙ্কর যাহা জঞ্জাল মনে করেন তাহা অপসারণ করিবার সুবিধা পাইয়াছেন। যখনি দেখেন শ্রুতি ব্রহ্মে কার্য্য আরোপ করিতেছেন অমনি বলিতে হইবে উহা অপরব্রহ্ম! 'অপরব্রহ্ম-বিজ্ঞানক্রিয়াশক্তিদ্বয়াত্মক-হিরণ্য গর্ভাঙ্কুরঃ'—অঙ্কুর যখন পাওয়া গেল তখন বৃক্ষ হইতে আর কতক্ষণ! হিরণ্য গর্ভ-রূপ সৃষ্টিকর্ত্তা যখন পাওয়া গেল, পরব্রহ্ম তখন শূন্যে মিলাইয়া গেলেন। আচার্য্যের কবিত্ব তখন ছুটিল, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হায়! হায়! উপনিষদ্ যে পরব্রহ্মকে জগতের রসরূপে, প্রাণশক্তিরূপে, আমাদের এত কাছে আনিয়া দিয়াছিলেন, শঙ্কর তাঁহাকে মায়ার আবরণে আবৃত করিয়া দূরে সরাইয়া দিলেন। শূন্যে এক বীজ বপন করিয়া হিরণ্যগর্ভরূপ মায়াদণ্ডের (**Magician's wand**এর) আঘাতে ডালপালা-ফলফুল শোভিত এক বিরাট্ বৃক্ষ উৎপাদন করিলেন। আবার ঠিক বাজীকরের ন্যায় বলিয়া দিলেন, ঐ দেখ! মায়া-মরীচিকার ন্যায় এ সব মিথ্যা, পরমার্থদর্শনে গন্ধর্ব্বনগরীর ন্যায় উহা শূন্যে মিলাইয়া গেল! জগৎকর্ত্তা মায়াবী নহেন! মায়াবীর খেলা শঙ্কর নিজেই খেলিতেছেন। আমরা এ কথা স্বীকার করিতে পারি, যে মানুষ চিন্তাবিহীন ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া জগৎকে যে ভাবে দেখে, পরমার্থ অবগত হইলে সে ভাবের পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু পরমার্থ সত্যে যে পৃথিব্যাদি লোকসকল প্রতিষ্ঠিত, তাহারা যে "গন্ধর্ব্বনগর-মরীচ্যুদকমায়াসমাঃ পরমার্থদর্শনাভাবাবগম্যমানাঃ" তাহা উপনিষদের ত্রিসীমায় কোথায়ও আছে কি? উপনিষদ্ জগতের মূল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার দ্ব্যর্থ নাই। আচার্য্য নিজেই ভাষ্য করিয়াছেন,—'যদস্য সংসারবৃক্ষস্য মূলং, তদেব শুক্রং শুভ্রং শুদ্ধং জ্যোতিষ্মৎ চৈতন্যাত্মজ্যোতিঃ-স্বভাবং, তদেব ব্রহ্ম সর্ব্বমহত্ত্বাৎ, তদেবামৃতম্ অবিনাশস্বভাবমুচ্যতে কথ্যতে সত্যত্বাৎ'—সুতরাং এই 'সর্ব্ব মহতের' মধ্যে বা বাহিরে ফাঁক্ কোথায় যে মায়ারূপ বীজ স্থাপন করিয়া হিরণ্যগর্ভরূপ অঙ্কুর উৎপাদন করা চলে? চলিত—স্বগত ভেদ স্বীকার করিলে। কিন্তু আচার্য্যের পক্ষে সে পথ রুদ্ধ। তার পর, ব্রহ্ম বস্তু, জগৎ অবস্তু; একের গুণ অন্যের মধ্যে নাই। ইহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। সংসারবৃক্ষ যখন সনাতন, তখন তো জগৎ অনাদি কাল হইতেই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং মায়াবীজ বপন করিবারও কালাভাব। তাই

উপনিষদের সঙ্গে স্বীয় মায়াবাদ জোড়াতাড়া দিতে যাইয়া তিনি স্ববিরোধের উপর স্ববিরোধ চাপাইয়া পুঁথি ভারী করিয়া ফেলিয়াছেন। উপনিষদ্ স্বগত ভেদ অস্বীকার করেন নাই, এবং তাহাই ছিল সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যার একমাত্র সুষ্ঠু পন্থা, যে কোন শ্লোক গ্রহণ করিয়া উহা প্রমাণ করা যায়। যথা,—

অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ।

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা ইতি॥ প্রশ্ন, ৬।৬

রথচক্রের নাভিতে অরসমূহ যেমন অবস্থিত থাকে, সেইরূপ কলাসমূহ তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সেই জ্ঞাতব্য পুরুষকে জানিলে মৃত্যু তোমাদিগকে ব্যথা দিতে পারিবে না। কলাসমূহের যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে আর বাকি থাকে না, ষোড়শ কলা এই বিশ্বপ্রপঞ্চ (Differentiated Universe), অথচ যে পুরুষে এই কলা সকল প্রতিষ্ঠিত তাঁহাকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয়, সুতরাং অপরব্রহ্ম বলিয়া তাঁহাকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। তাই নানা কারুগিরির পর এই ষোড়শকল-পুরুষের ব্যাখ্যায় আচার্য্য শঙ্কর বলিতে বাধ্য হইয়াছেন,—"তদুপাধি কলাধ্যারোপাপনয়নেন বিদ্যয়া সঃ পুরুষঃ কেবলো দর্শয়িতব্যঃ (প্রশ্ন, ৬।২)। ব্রহ্ম তো নির্ব্বিশেষ, তাঁর মধ্যে তো "কলা" নাই। কিন্তু বিশেষত্বের সহযোগ না হইলে নির্ব্বিশেষকে বুঝা যায় না। তাই ব্রহ্মে বিশেষত্বের আরোপ হইল। কেন না, এই বিশেষত্বের অপনয়নের দ্বারা তাঁহার নির্ব্বিশেষত্ব, কেবলত্ব প্রদর্শিত হইবে। অর্থাৎ নির্ব্বিশেষকে জানিতে হইলে তাঁহাকে বিশিষ্ট না করিয়া জানিবার উপায় নাই—বিশেষের জ্ঞানের সঙ্গে নির্ব্বিশেষের জ্ঞান অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত। এই স্বীকারোক্তি যে শঙ্কর এক জায়গায় করিয়াছেন তাহা নহে, বহু জায়গায়—"ভেদদর্শনাপবাদাচ্চ সৃষ্ট্যাদিবাক্যানাম্ আত্মৈকত্বদর্শনার্থপরত্বোপপত্তিঃ" (বৃহ, ১।৪।৭)। অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি বহুত্বের যোগেই কেবল আত্মার একত্ব উপলব্ধ হইতে পারে। সূত্রভাষ্যেও ঐ কথাই বলা হইয়াছে—"তাসাং একত্বপ্রতিপাদন পরত্বাৎ (৪।৩।১৪)। গীতাভাষ্যে বলিয়াছেন, "অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যতে" (১৩।১৩)। অর্থাৎ গুণের আরোপ না করিলে নির্গুণত্ব প্রতিপন্ন হইবে না। আর দৃষ্টান্ত বাড়াইব না। এ সকল স্থলে শঙ্কর একই কথা বলিতেছেন। তিনি যে এক ও বহু, ভেদ ও অভেদ, নির্গুণ ও সগুণ, বিশেষ ও নির্ব্বিশেষকে দুই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কোটিতে বিভক্ত করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ তাহারা সেরূপ নহে। ইহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া জ্ঞান সম্ভব নহে।

আচার্য্য জগতের ব্যাখ্যায় যে অসুবিধা বোধ করিয়াছেন, এই স্বীকারোক্তিকে ন্যায়সঙ্গত পরিণতি (Logical conclusion) প্রদান করিলেই সে অসুবিধা তিরোহিত হইতে পারিত। ইহার পরিণতি ভেদাভেদযুক্ত ব্রহ্মদর্শনে। ঋষি তো সেই কথাই বলিয়াছেন। ঐ "কলা" আর কিছুই নহে, ব্রহ্মের স্বগত ভেদ (Internal differentiations)। এই ভেদকে অস্বীকার করিয়া যে এক, তাহা কল্পিত একত্ব (Abstract Unity), তাহা জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। যে এক নিজকে বহুর মধ্যে প্রকাশ করে না, নিজে বহুত্বযুক্ত হয় না, শঙ্কর নিজেই স্বীকার করিয়াছেন তাহার ধারণা হয় না। যাহা নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় তাহারই কেবল পরিবর্ত্তন হইতে পারে। অর্থাৎ যাহাকে অনিত্য বলি তাহা নিত্যেরই অবস্থাভেদ। নতুবা পরিবর্ত্তনের কোন অর্থ থাকে না। অনিত্যকে অনিত্য হইতে হইলেও তাকে নিত্যত্বের ভূমিতে দাঁড়াইতে হয়। সুতরাং ইহার একটি বস্তু আর অন্যটি অবস্তু হইতে পারে না। আমাদের আক্ষেপ এই, যে আচার্য্য যে সত্যের ইঙ্গিতমাত্র করিয়াছেন, মায়াবাদের ঝোঁকে তাহাকে পরিণতি দিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু ইহারই মধ্যে ছিল সকল সমস্যার সমাধান। এক ও বহু, সসীম ও অসীম, নিত্য ও অনিত্য প্রভৃতি দ্বন্দ্বের দুই দিক্ যদি সম্পূর্ণ পরস্পর নিরপেক্ষ ধরা যায় এবং সমস্ত সত্তাকে (Reality) এই দুই কোটিতে বিভক্ত করা হয় তবে তাঁহাদিগকে একত্র করা অসম্ভব। একত্র করিবার জন্য যে তৃতীয় কিছু (*tertium quid*) চাই তাহাকে উভয়ের গুণযুক্ত হইতে হইবে। কেন না, উহারা পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া একের গুণযুক্ত যে, সে বহুকে ধরিতে পারিবে না; বহুর গুণযুক্ত যে, সে একেকে গ্রহণ করিতে পারিবে না। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে এই রূপে সম্পূর্ণ বিপরীত দুই কক্ষাভুক্ত করিয়া গীতার ত্রয়োদশাধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ববিচারে আচার্য্য মহা সমস্যায় পড়িয়া গিয়াছেন। অবিদ্যাই জ্ঞেয়, তাহা জ্ঞাতা হইতে স্বতন্ত্র, জ্ঞেয়ের দোষগুণ জ্ঞাতায় সুতরাং বর্ত্তিবে না। যদি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাও, তবে সেই সম্বন্ধের জ্ঞাতা চাই। আবার এই জ্ঞাতা ও তাহার সম্বন্ধ-জ্ঞানের আশ্রয়ভূত আর একটি জ্ঞাতা চাই, এইরূপে অনাবস্থা দোষ (fallacy of eternal regress) আসিয়া পড়ে। বাস্তবিকই, যে দুই পক্ষ (opposites) একই বস্তুর দুই দিক্ (counterparts), তাহাদিগকে একান্ত ভিন্ন কল্পনা করিয়া লইয়া কোন রকমে তাহাদের সম্বন্ধ দেখাইতে গেলে অনবস্থা

ভেদাভেদযুক্ত ব্রহ্মই খাঁটি সত্য

দোষ অনিবার্য্য। ব্রহ্ম ও জগৎ যদি দুই কোটীতে অবস্থিত হয় ও উভয়ের মধ্যে যদি যোগ স্থাপন প্রয়োজন হয়—যে প্রয়োজনীয়তা মায়াবাদীও, মুখে যাহাই বলুন, এড়াইতে পারেন নাই; যেহেতু, ব্রহ্মকে সর্ব্বরূপে দেখার আকাঙ্ক্ষা মানবের পক্ষে সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের দাবী—তাহা হইলে যোগস্থাপনের যে সেতু (*tertium quid*) তাহা হয় ব্রহ্মগুণাবলম্বী না হয় জগদ্ধর্ম্মাবলম্বী হইবে; সুতরাং এটি বা অন্যটির সঙ্গে তাহার বিরোধ থাকিয়াই গেল, যে বিরোধ ভঞ্জনের জন্য অন্য সেতু চাই। কাজেই সেতুবন্ধও শেষ হইবে না, যোগও স্থাপিত হইবে না। তাই তো জগদ্ধর্ম্মী বলিয়া মায়া জোড়াতাড়া সত্ত্বেও ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের সেরূপ কোন যুক্তিসঙ্গত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই, যাহাতে আত্মার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হইতে পারে। আর যদি সেতু উভয়ধর্ম্মী বলিয়া কল্পিত হয়, তবে মায়াবাদীর দিক্ হইতে উহার নিজের মধ্যেই স্ববিরোধ থাকিবে এবং তাহা নিরাকরণ করিবার জন্য ঐ অনবস্থা-দোষ ঘটিবে। খৃষ্টধর্ম্মেও ঠিক এই বিপদ্ ঘটিয়াছে। মানুষ পাপ করিয়া ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন, সম্মিলন হয় কিসে? দেব-মানবধর্ম্মী যিশুর মধ্যবর্ত্তিতায়! যিশুর মধ্যে দেবমানবের সম্মিলন ঘটিল কিসের জোরে? যে শক্তি যিশুর মধ্যে দেবমানবের যোগ সাধন করিল সে তো প্রত্যেক মানুষেই তা পারে। তা যদি না পারে তবে অনবস্থা-দোষ। দোষ যায়, যদি সেই আদির উৎকট কল্পনা—যাহাতে দ্বন্দ্বের দুই দিকের মধ্যে একান্ত পার্থক্য স্থাপিত হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করা হয়। এক বহু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলে তার একত্বও থাকে না, একক বহুসমন্বিত করিয়া দেখিলেই তার অস্তিত্ব জ্ঞানগোচর হয়। এ কথা আচার্য্য স্বীকার করিয়াও গ্রহণ করেন নাই। কারণ, মায়াবাদের দিক্ হইতে স্বীকার করিবারই অবসর নাই—মায়াবাদীর কল্পিত এক বহু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। যে একক **জানিতে** বহু চাই, তাহার **অস্তিত্বের** জন্যও বহু চাই, ব্রহ্মের (Absolute) বেলায় জ্ঞান (Knowing) ও সত্তা (Being) একই। যে বহুকে দায়ে পড়িয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। যদি এক ও বহুর জ্ঞানধৃত অবশ্যম্ভাবী ভেদ স্বীকার করিয়া থাক, তবে উভয়ের সত্তাগত নিশ্চিত একত্ব গ্রহণ করিতেই হইবে। কেন না, যে দুইটি বস্তুর মধ্যে ভেদ, তাহাদের মধ্যে কোন রকম সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে তাঁহাদের বিভিন্নতার জ্ঞানও সম্ভব হইবে না। সুতরাং এক ও বহুকে যোগ করিবার সেতু মায়া নয়, কিন্তু সেই বহুমুখী **এক** (Unity in Multiplicity) যাঁহার

মধ্যে প্রপঞ্চ স্বগতভেদ রূপে অবস্থিত। আমরা দেখিয়াছি উভয়কে ভিন্ন কোটিতে স্থাপন করিয়া শঙ্কর জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ লইয়া কিছু মুস্কিলে পড়িয়াছেন। কিন্তু মুস্কিলের আসান জ্ঞাতার মধ্যে জ্ঞেয়কে দেখা, জ্ঞেয়ের মধ্যে জ্ঞাতাকে দেখা। উভয়ের মধ্যে যে বিভিন্নতা তাহা উহাদের একত্বের জ্ঞাপক—জ্ঞাতা ছাড়া জ্ঞেয় হয় না, জ্ঞেয় ছাড়া জ্ঞাতা হয় না। স্থতরাং এই বস্তু জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় দুই-ই না হইলে জ্ঞানক্রিয়া সম্ভব নয়। ব্রহ্ম জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়সমন্বিত এক অদ্বিতীয় বিরাট্ বস্তু—যাঁহার বাহিরে কিছুই নাই—তাঁহার বাহির বলিয়াই কিছু নাই। এই বহুত্বপূর্ণ জগৎ তাঁহারই প্রকাশ, এ জগৎ তাঁহারই মধ্যে—ইহা মায়া নয়, মরীচিকা নয়—তাঁহারই লীলা। তিনি 'একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।' ইহা তাঁহারই রূপ, পরমার্থদর্শনে ইহা গন্ধর্ব্বনগরীর ন্যায় শূন্যে মিলাইয়া যাইবে না, ইহাতে বিশিষ্টতার মাহাত্ম্য দিন দিন আরও উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে। আসল কথা, ব্রহ্ম যদি জগৎরূপে নিজেকে প্রকাশ না করিতেন, তবে তিনি ব্রহ্মই হইতেন না। ইহা তাঁহার স্বভাব। ইহা তাঁহার ধর্ম্ম। মায়াবাদী যে ব্রহ্ম জগতের সংস্পর্শে আসিলে তিনি কলুষিত হইবেন এই ভাবিয়া তাঁহাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছেন, এ আশঙ্কা স্থতরাং অলীক। স্ব-ভাব কাহাকেও কলুষিত করে না। জগৎরূপে আপনাকে বিকশিত (manifest) না করিলেই তিনি কলুষিত হইতেন। কেন না, তাহাতেই তাঁহার স্ব-ভাব হইতে বিচ্যুতি ঘটিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জীব

ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্ম ও জগৎ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহাতেই **জীব**-বিষয়ে কথা অনেক সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে। সংসারী সুতরাং বদ্ধ জীবের সম্বন্ধে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, যে তাহার বুদ্ধি-ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় সকল মায়া-কল্পিত, তাহার শ্রুতিস্মৃতি, জপতপ, সুখদুঃখ, তৃষ্ণাবাসনা, নৃত্যগীত, হাস্যরোদন কাম ও কর্ম্ম, স্বর্গ ও নরক সকলই অবিদ্যাবিজৃম্ভিত। এই সকলের দ্বারা অভিভূত হইয়া সে 'হায় হায়! ছাড় ছাড়!' ইত্যাকার মহারবে সংসারকে কোলাহলপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ইহা তাহার প্রকৃতি নহে। স্বভাবে সে ব্রহ্মই, কেবল অবিদ্যা-বিধ্বস্ত হইয়া এরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত হইলেই তাহার এ দুর্দ্দশা বিলয় প্রাপ্ত হইবে। বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার বিনাশ করিয়া পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করা চাই—'অবিদ্যাকৃতং কার্য্যপ্রপঞ্চং বিদ্যয়া প্রবিলাপয়ন্তস্তমেবৈকং জানীথ' (সূত্রভাষ্য ১।৩।১)। বিদ্যালাভের উপায়ও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম", "তৎ সত্যং" "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি উপদেশের দ্বারা "বিদ্যা স্বয়মেবোৎপদ্যতে তয়া চ অবিদ্যা বাধ্যতে" (সূ-ভাঃ, ৩।২।২১), "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"—ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মে ভেদ নাই। কিন্তু শঙ্কর বলেন, যাঁহারা জীবই ব্রহ্ম ইহা স্বীকার করেন না, তাঁহারা ("শ্রেয়োদ্বারং সম্যগ্দর্শনমেব বাধন্তে" ১।৪।২২) মুক্তিপথ রুদ্ধ করেন। কিন্তু কথা এই, গোড়াতেই যদি জীবকে হুবহু ব্রহ্ম বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়, তবে বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যা তিরোহিত হইলে ব্রহ্মদর্শন হইবে বা ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্ম হইবেন, এ সকল কথা কি স্ববিরোধী হয় না? যখন ব্রহ্ম-জ্ঞানের উপদেশের প্রস্তাবনা রহিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই স্বীকার করা হইতেছে, যে একটা বদ্ধাবস্থা আছে, তাহা হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা হইতেছে। বদ্ধজীব মানুষের জন্যই উপদেশ, মুক্তাত্মা ব্রহ্মের জন্য নহে। আমরা স্বীকার করি, জীব-ব্রহ্মের একান্ত ভেদে মুক্তির পথে বাধা উৎপন্ন হয়। কেন? সে কথা পরে বলিতেছি। কিন্তু জীবব্রহ্মের একান্ত অভেদ কল্পনা করিলে মোক্ষ বিষয়ক উপদেশের প্রসঙ্গই উঠিতে পারে না, সে কথাও স্বীকার করিতে হইবে।

একান্ত ভেদদৃষ্টিতে মুক্তি নাই

মায়াবাদী বলিবেন, জীব তো ব্রহ্মই, তার উপর যে মায়ার আবরণ পড়িয়াছে তাহা দূর কর, ব্রহ্মই প্রকাশিত হইবেন। কিন্তু মায়াবাদী কি সে পথ খোলা রাখিয়াছেন? টেবিলটী শ্বেতকৃষ্ণ লালনীল ত্রিকোণ চতুষ্কোণ কাষ্ঠ বা লোষ্ট্রে নির্ম্মিত হইতে পারে। এক এক করিয়া গুণগুলি সরাইয়া লও, পড়িয়া রহিবে একটি শূন্য। এই মায়াকল্পিত সংসারের আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সবই মিথ্যা। জীব সেই সংসারেরই এক জন। তার উপর সুখদুঃখ বাসনা-কামনার যে সব আবরণ পড়িয়াছে, এক এক করিয়া সব সরাইয়া দাও। যখন মায়া একেবারে নিঃশেষিত হইল তখন পড়িয়া রহিল একটা মস্ত বড় 'কিছু না'! ব্রহ্ম কোথায়? মায়াবাদীর মুক্তিপ্রণালীতে জীবের বিনাশ। আচার্য্য স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া রাখিয়াছেন, "পরমাত্মা হি সংসারমায়য়া ন সংস্পৃশ্যতে" (২।১।৯)। "পরমাত্মা সংসার মায়াদ্বারা স্পৃষ্ট হন না", অর্থাৎ মুক্ত ব্রহ্ম আর বদ্ধ জীব সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সুতরাং জীবের গায়ের কাপড় চোপড়, এমন কি তার হাড়মাঁস সব সরাইয়া দিয়া তাকে নিঃশেষিত করিলেও সেখানে ব্রহ্মের আবির্ভাবের কোন সম্ভাবনা নাই। যদি কেহ বলেন 'ঐ দেখ ব্রহ্ম', তবে তাহাকে ভেল্কীবাজ ছাড়া আর কিছু বলিব না। মায়াবাদী মুক্তব্রহ্ম ও বদ্ধজীব, ব্রহ্মলোক ও সংসার এমন একান্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া কল্পনা করিয়াছেন, যে একটি হইতে অন্যটিতে প্রবেশ একেবারে অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন। জীব-ব্রহ্মের একান্ত ভেদে কেন মোক্ষ-পথ পাওয়া যাইতে পারে না, এখন তাহাই একটু স্পষ্ট করিয়া বলিব। মায়াবাদীর জীব একটি রাজপুত্র, জ্ঞানোন্মেষের পূর্ব্ব হইতেই অনাথাশ্রমে পালিত। যদি এরূপ হয়, যে রাজগৃহের কাহারও অনাথাশ্রমের খবর নাই, অনাথাশ্রমের কেহই রাজগৃহের কথা কিছু জানে না; তাহা হইলে যেমন রাজপুত্রের আর স্বীয়াবাসে ফিরিয়া যাইবার কোনই সম্ভাবনা থাকে না; তেমনই, মায়াবাদী সংসারের জীবের পক্ষে ব্রহ্মলোকে পৌঁছিবার কোনই পথ খোলা রাখেন নাই, খুলিবার তাঁহার কোন সাধ্যই নাই। **জীবব্রহ্মের একান্ত ভেদে জীবের মোক্ষ নাই।** মায়াবাদী জীবকে সংসার-কারগারে বদ্ধ করিয়াছেন, তাহার উদ্ধারের কোন পথ করেন নাই। দুস্তর ভব-জলধি —এ পারে ব্রহ্ম, ও পারে জীব। জীব এ পারে আসিতে পারে না, ব্রহ্ম ও পারে যাইতে পারেন না। ব্রহ্ম জীবের কোন উপকারেই লাগিতেছেন না। Pragmatist বলিবেন 'সুতরাং ব্রহ্ম নাই।' শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় দেবকীর উদরে জন্মগ্রহণ করিলেন। জন্মমাত্র জ্ঞানোন্মেষের পূর্ব্বেই বৃন্দাবনে যশোদানন্দন

বলিয়া পরিচিত হইলেন। রাখালরাজ কিন্তু মথুরায় আসিয়া আধিপত্য করিতে লাগিলেন। কিরূপে তাহা সম্ভব হইল? অক্রূর-সেতু বৃন্দাবন ও মথুরাকে এক করিয়া দিয়াছিল। তাই রাজপুত্র অনাথাশ্রম ছাড়িয়া রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অক্রূরই বৃন্দাবন ও মথুরাকে এক করিলেন। সেই মধ্যবর্ত্তী চাই যার মধ্যে রাজগৃহ ও অনাথাশ্রম দু'এরই জ্ঞান বিদ্যমান আছে; তিনিই কেবল অনাথবৎ ভ্রাম্যমাণ রাজপুত্রকে রাজপুত্রত্বের জ্ঞান দিয়া স্বীয় রাজতক্তে রাজপুত্ররূপে বসাইয়া দিতে পারেন। তিনিই কেবল পারেন সংসারাবদ্ধ জীবকে মুক্তি দিয়া ব্রহ্মলোকে স্থাপন করিতে যাঁহার মধ্যে সংসার ও ব্রহ্মলোক এক হইয়া রহিয়াছে। নান্যঃ পন্থা, অন্য পথ নাই। কিন্তু মায়াবাদীর ব্রহ্ম ও বদ্ধজীব, ব্রহ্মলোক ও সংসার, দুই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন বস্তু। উভয়ের মধ্যে কোন সেতু নাই। তবে কিরূপে মায়াবাদীরা সাধন ভজনের দ্বারা ব্রহ্মলাভ করেন? উত্তর এই, যে তাঁহারা মতে যাহা এত পাকাইয়া তুলিয়াছেন, কার্য্যে তাহার শতাংশও আচরণ করেন নাই বা করেন না। যে ন্যায়ানুসারে তাঁহারা আপনাদের মত খাড়া করিয়াছেন, সেই ন্যায়কে কার্য্যে পরিণত করিলে তাঁহাদের মতগত ব্রহ্মেরই ন্যায় আপনাদিগকে নিষ্ক্রিয় হইতে হয়, কিন্তু তাহা তাঁহারা হইতে পারেন নাই। তাঁহারা মতে সংসার হইতে বাহির হইবার পথ রুদ্ধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ খোলাই রাখিয়াছেন। তা যদি না হইত তবে বন্ধন-মোক্ষের প্রশ্নই উঠিতে পারিত না। যে কেবলই বদ্ধ, বদ্ধতার জ্ঞানই তাহার হইবে না, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আসিবে কোথা হইতে? যে অন্ধ তার অন্ধকারের জ্ঞানই নাই, আলোকের আকাঙ্ক্ষাও তার হয় না। জীব বদ্ধ হইলেও তারই মধ্যে মোক্ষরাজ্যই বল, স্বর্গরাজ্যই বল, ব্রহ্মলোকই বল, সব রহিয়াছে। সেই আলোকেই সে আপনার বদ্ধ দশা বুঝিতেছে ও মুক্তির জন্য প্রয়াস করিতেছে। এই প্রয়াসই প্রমাণ করিতেছে, যে বদ্ধ হইলেও সে একান্ত বদ্ধ নহে। সুতরাং মায়াবাদীর মতের দিক্ হইতে বন্ধনমোক্ষের কোন আলোচনা হইতে পারে না। দ্বন্দ্বের একটি অন্যটিকে অপেক্ষা করে—কিন্তু মায়াবাদীর কাছে তারা বিচ্ছিন্ন। **এক দিকে**, নিজের দিক্ হইতে অবশ্য, মায়াবাদীর সাধন ভজন কিছুই সম্ভব নয়। আচার্য্য শঙ্কর বলেন, মোক্ষসাধন-সামগ্রীর মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু "স্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে" (বিবেকচূড়ামণি)। পরমাত্মা সংসারে নাই, সুতরাং মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে অনুসন্ধানের হেত্বভাব,

একান্ত অভেদেও মুক্তির কথা আসে না

মুক্তজীবের তো অনুসন্ধানের প্রয়োজনই নাই। তার পর, 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহা-বাক্যের সাহায্যে যে বিদ্যার আরাধনা, তাহার সে অবসরও নাই। শ্রুতি তো সংসার-বৃক্ষেরই পত্র। সুতরাং সে পত্র চিবাইলে বিদ্যা আসিবে কেন? অবিদ্যাই তো বাড়িবার কথা। তার জপতপ! তাও তো অবিদ্যা। যদি বল একেবারে কর্ম্মত্যাগ—তাও তো মায়াবন্ধেরই কার্য্য। সংসারের কর্ম্ম অকর্ম্ম বিকর্ম্ম সকলই তো মায়ার কাজ—অবিদ্যা। অবিদ্যা দিয়া বিদ্যালাভ সম্ভব কি? যদি বল সম্ভব, তবে স্বীকার করিতে হইবে সংসারেও বিদ্যা আছে। তা হইলে মূল মতই ত্যাগ করিতে হইল। মানুষ নিজের স্কন্ধে চড়িয়া যেমন উর্দ্ধে উঠিতে পারে না, নৌকায় বসিয়া গুণ টানিয়া অগ্রসর হইতে পারে না—মায়াবাদীর বদ্ধ জীবও তেমনই যেখানে আছে সেই খানেই থাকিবে, নড়িতে পাইবে না। সংসারী জীবের নিজের চেষ্টায় সংসারের বাহির হইবার উপায় নাই। **অন্য দিকে**, পরমাত্মাও আসিয়া সাহায্য করিতে পারেন না। উপনিষদ্ যে বলিয়াছেন "যমেবৈষ বৃণুতে" শঙ্কর তাতেও রাজী নন। সুতরাং চিরবন্ধন! তবে যে তিনি আপনার তপস্যা ও উন্নত জীবনের দ্বারা আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করেন, সে তাঁহার মতকে অতিক্রম করিয়া। মায়াবাদীর মতকে অতিক্রম করিতেই হইবে। ব্রহ্ম আমাদিগকে সংসারে ছাড়িয়া দিয়া ব্রহ্মলোকে বসিয়া নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে মগ্ন নহেন। তিনি যে আমাদেরই মধ্যে আমাদিগকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রান্ হইতেছেন। 'ভীম ভবার্ণব ভেলক হে' বলিয়া তাঁহারই চরণ ধরিতে হইবে। জীব-ব্রহ্মের একান্ত অভেদে ধর্ম্ম হয় না, একান্ত ভেদেও হয় না। মানুষের দিকে দেখ সে একান্ত মানুষ নয়, নর-হরি। ব্রহ্মের দিকে দেখ তিনি একান্ত ব্রহ্ম নন, নর-নারায়ণ। অসীম ও সসীম দুই স্বতন্ত্র বস্তু নহে—এক অখণ্ড বিরাট্ বস্তুর দুই দিক্—একটিকে ছাড়িয়া অন্যটির অস্তিত্ব থাকে না। জীবের মধ্যে ব্রহ্ম নিত্যলীলাময়, ব্রহ্মের মধ্যে জীব চিরবর্ত্তমান, এ সংসার-বৃক্ষ অনাদি। এই জীবব্রহ্মের মৌলিক ভেদাভেদ—ইহারই মধ্যে জ্ঞান ও ধর্ম্ম, সাধন ও ভজন, যোগ ও ভক্তি, বন্ধন ও মোক্ষ। ইহার বাহিরে কিছু নাই। জীব হাত বাড়াইয়া ব্রহ্মলোক ধরিয়া রহিয়াছে, ব্রহ্ম পা দিয়া সংসারকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সংসার ও ধর্ম্ম দুই স্বতন্ত্র বস্তু নহে। যে সমস্ত সম্বন্ধ লইয়া সংসার, তাহারই অণুতে অণুতে ধর্ম্ম প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত সম্বন্ধকে এক এক করিয়া বর্জ্জন করতঃ ধর্ম্মলাভ, আর বাঁধাকপির একটি একটি

পত্র খুলিয়া ফেলিয়া সেই সন্ন্যাসীর বাঁধাকপি ভক্ষণ, একই শ্রেণীর কার্য্য। যাহাকে জঞ্জাল বলিয়া ফেলিয়া দিলে সেই এক একটি পত্রই রাঁধিতে জানিলে সুমিষ্ট ব্যঞ্জন। সংসারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া আমাদিগকে ধর্ম্মের অনুসন্ধানে বাহির হইতে হইবে না, 'ধত্তর ছাই!' মায়ার বন্ধন হইতে নিস্তার পাইবার জন্য ব্রহ্মলোকের অনুসন্ধান করিব না। এই সংসারেই ব্রহ্মলোক খুঁজিতে হইবে। ছোট বড় যা কিছু লইয়া এই সংসার, ইহার মুখ ব্রহ্মের দিকে ফিরাইয়া দিলেই উহা ব্রহ্মলোক হইল। এই দৃষ্টিতে সংসারের দিকে দেখিবার চোখটা খুলিয়া যাওয়া চাই। আমাদের মুক্তিবাদের ভাষা—ধর্ম্ম ও সংসারে মিলন, সংসারে ব্রহ্মলোক স্থাপন, মানুষ ও সংসারকে ব্রহ্মের আত্মপ্রকাশের যন্ত্ররূপে পরিণত করণ। এ মোক্ষপথে জীবকে অন্নময় প্রভৃতি আবরণ হইতে উন্মুক্ত হইয়া "পঞ্চকোষ-বিলক্ষণ" হইতে হইবে না, কিন্তু নীচেরটিকে উপরেরটি দ্বারা বিশোধিত করতঃ আনন্দময়ে অবস্থিত হইয়া সকলেরই প্রাণ অবস্থাত্রয়-সাক্ষী পরব্রহ্ম হইতে রস আকর্ষণ করতঃ জীবন ধারণ করিতে হইবে। সুতরাং সংসারসাগর পার, পরিত্রাণ, মুক্তি প্রভৃতি মায়াবাদীর কথা আমাদিগকে সেই ভাবেই ব্যবহার করিতে হইবে যে ভাবে এখনও বলি সূর্য্য উঠে বা অস্ত যায়, যে ভাবে এখনও ঈশ্বরে হাত পা মুখ আরোপ করি।

জীবব্রহ্মের এই মাখামাখি মায়াবাদী ভালবাসেন না এই জন্য, যে ইহাতে ব্রহ্মের অসীমত্ব টিঁকিবে না। আমরা দেখিয়াছি, সসীমকে গ্রহণ না করিলেই ব্রহ্মের অসীমত্বের হানি হইবে। সসীম অসীমের যোগ ব্রহ্মের স্বভাব। ব্রহ্ম-বস্তুর অর্থ সসীম-অসীমের অনন্ত যোগ। জীবের মধ্য দিয়া ব্রহ্মের আসল প্রকাশ—জীবসমষ্টির মধ্য দিয়াই পূর্ণব্রহ্ম অবতীর্ণ।

পূর্ণ ব্রহ্ম ও জীবের অপূর্ণতা

এক একটি জীব তাঁহার বিভূতি এবং সকলকে লইয়াই ব্রহ্মধাম। জীবসকলের ব্যক্তিগত অপূর্ণতা তাঁহাকে স্পর্শ করে না। মানুষ আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জীব। সে পূর্ণ নয় কেন? তাহাকে পূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করা হয় নাই কেন? তাহা না হওয়ায় ব্রহ্মের অপূর্ণতা লক্ষিত হইতেছে—এই সকল প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। এক খানি গৃহ যে ভাবে নিখুঁৎ পূর্ণাঙ্গ করিয়া গড়া যায়, আত্মজ্ঞ জীব মানুষকে বা মানবসমষ্টি যে সমাজ তাহা সেই ভাবে গড়া যায় না—গড়িলে তার বিশেষত্ব নষ্ট হইয়া যায়—গড়া না গড়া সমান হইয়া পড়ে। বাহির হইতে কোন শক্তিপ্রভাবে তাকে পূর্ণ করিয়া গড়িলে মানুষের মনুষ্যত্বই নষ্ট হইয়া গেল। পূর্ণতা হবে কবে?

আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জীব মানুষের পূর্ণতা অপূর্ণতা নির্ভর করে তার আত্মকর্ত্তৃত্বের (Self-determinationএর) উপর। বাহির হইতে সেটা গড়িয়া দেওয়া চলে না। অপূর্ণতা সসীমতার অঙ্গ এবং সসীমতা-অসীমতা মিলিয়া ব্রহ্ম-বস্তু। সুতরাং ঈশ্বর কেন মানুষকে পূর্ণ করিলেন না, ইহার উত্তর এই যে, মানুষ প্রথম হইতেই পূর্ণ হইয়া জন্মিতে পারে না। দু'য়ে দু'য়ে পাঁচ হইতে পারে না কেন? ইহাতে যতটা অক্ষমতা প্রকাশ পায়, মানুষ কেন পূর্ণ নয় তাহাতেও ততটাই অক্ষমতা প্রকাশ পাইতেছে, একটুও বেশী নয়। মানুষের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে, ব্রহ্ম তাহার মধ্যে আত্মপ্রকাশের জন্য শত চেষ্টা করিতেছেন। আত্মেচ্ছার পরিচালনা দ্বারা আমাদিগকে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। "হরি হে আপনি নাচ, আপনি গাও, আপনি বাজাও তালে তালে," তা সত্য, কিন্তু কেবলই মানুষ 'সাক্ষীগোপাল' নহে, এই গঠনকার্য্যে ব্রহ্মের সহকর্ম্মী। ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্যের কথা আর কি আছে, যে আমার মোক্ষপক্ষে আমার ঠাকুর আগে আগে চলিতেছেন। হায়! মায়াবাদী ইহা দেখিলেন না। মায়াবাদের বিষম ভ্রান্তি এই, যে জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তির গতিকে উর্দ্ধগতি বা পূর্ণতার দিকে গমন না করিয়া 'নেতিনেতি'র মধ্য দিয়া শূন্যের দিকে অভিসাররূপে উপস্থিত করা হইয়াছে। 'নেতি নেতি' নাই তা বলিতেছি না। কিন্তু একটা না ধরিয়া আগেরটা ছাড়িলে আশ্রয় মিলিবে না। উর্দ্ধগতি কেবলই পরিবর্জ্জনের দ্বারা সম্ভব নয়। জীব লোকের বসন ভূষণ পরিহার করিলেই যে আমরা ব্রহ্মলোকের সাজ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া উঠিব, তাহা নহে। এবং মায়াবাদীর ব্রহ্মলোকে এমন কোন সাজ সজ্জা থাকিবার সম্ভাবনাও নাই, তাহা শূন্যগর্ভ! আসল কথা, মোক্ষ একটা শূন্যগর্ভ পদার্থ নহে। অর্থাৎ ব্রহ্মলোককে সংসার হইতে একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া কল্পনা করিতে হইবে না, কিন্তু দৃষ্টি ফিরিয়া গেলে আদর্শের আলোকে এই সংসারই ব্রহ্মলোক রূপে প্রতিভাত হইবে। ব্রহ্মলোক ও সংসার, এই দুইকে একান্ত ভিন্ন করিয়া মায়াবাদী যে ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন, দুইকে এক করিয়াই কেবল সে ভ্রান্তির নিরসন হইতে পারে। ধর্ম্ম দিয়া সংসার গড়িতে হইবে। তাহা না করিয়া মায়াবাদ এমন একটী ধর্ম্ম দিতেছে, যাহা মানবজীবনের সকল সম্বন্ধ বিনষ্ট করিয়া তাহার স্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। সুতরাং এই ধর্ম্মের দ্বারা মানবের জ্ঞান ভাব ইচ্ছা কিছুই ব্রহ্মচরণে উৎসৃষ্ট হইতেছে না, ইহার ধর্ম্ম নামই নিরর্থক হইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু একটা কথা! ভক্তিপন্থী যে আজ সুগঠিত সুবিশাল ভক্তি-বৃক্ষের তলায় আশ্রয় লাভ করিয়াছেন, তাহার মূলে অজ্ঞাতসারে কে জল সিঞ্চন করিয়া তাহাকে বর্দ্ধিত হইবার সাহায্য করিয়াছে? মায়াবাদীর দান কৃতজ্ঞতাবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে। যাহা উপার্জ্জন করিতে পরিশ্রম লাগে না, মানুষের কাছে তার মূল্য কম। বিশেষতঃ অধ্যাত্মজগতে। যে আদর্শ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সংগ্রাম, সমস্যা ও দ্বন্দ্বের পরিচয় না লইয়া ও তাহাদের সামঞ্জস্যের পন্থা উদ্ভাবন না করিয়াই গঠিত, তাহা আমাদের জীবনপথে বেশী উপকারে আসে না। আমরা কি এই সংগ্রাম ও সমস্যাগুলিকে আল্‌গোছে এড়াইয়া সুখে সংসারপথে চলিতে চাই না? মায়াবাদীই কত ত্যাগ স্বীকার করিয়া এই সংগ্রাম ও সমস্যাগুলিকে প্রতিদিন উজ্জ্বলভাবে আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধরিতেছেন, অধ্যাত্ম-জীবন কি উচ্চ জিনিষ তাহার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। আমাদের জীবন আদর্শ হইতে কত দূরে, সংসার করিতে যাইয়া ধর্ম্মকে ভুলিয়া মন কোথায় সংসারিকতায় ডুবিয়া যায়, আমাদের সংসার ও ব্রহ্মলোকের মধ্যে দূরত্ব কত, সংসারে ব্রহ্মলোক প্রতিষ্ঠার আদর্শ হইতে আমরা কত দূরে, এই দ্বন্দ্ব-গুলির ভেদের দিক্‌কে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়া তাহা আমাদিগকে কে শিখাইতে-ছেন? জগতের অন্তর্নিহিত রহস্য উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা না করিয়াই এক রকমের সহজ অদ্বৈতবাদে উপনীত হওয়া যায়, তাহা যেমন প্রকৃত জগত্তত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইবার পথের কণ্টক, তেমনই জীবব্রহ্মের মৌলিক অভেদ তত্ত্বকে "জীব তো ব্রহ্ম আছেই" বলিয়া ধরিয়া লইলে প্রকৃত অদ্বৈততত্ত্বের বিনাশ হয় এবং অনেক অনর্থ উৎপন্ন হয়—সে অনর্থ হইতে দেশ কম ভুগে নাই। আমাদিগকে দুই দিকের বিপদ্ এড়াইয়া চলিতে হইবে। যে ত্যাগ, যে সংযম, যে সংগ্রামের দ্বারা বদ্ধজীব আমাকে ঐ আদর্শস্থানীয় (Potential) "জীব ব্রহ্মৈব" গড়িয়া উঠিতে হইবে, তাহা মায়াবাদের ঐ অপূর্ণতাই কি উজ্জ্বলভাবে আমাদের সম্মুখে ধরে নাই? মায়াবাদী এক দিকে কঠোর নৈতিক সাধন, অন্য দিকে জ্ঞানে গভীরতা আমাদিগের নিকট দাবী করিতেছেন। ধর্ম্মসাধনে জ্ঞানালোচনার যে একান্ত আবশ্যকতা আছে, যাহা না হইলে ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে কেবল কুসংস্কারের আবর্জ্জনা-রাশিতেই পূর্ণ হইয়া উঠে, তাহা আমাদিগকে কে শিখাইল? মায়াবাদ অভাবাত্মক ত্যাগের দিকেই ঝোঁক্ দিয়াছেন, সত্য; আমরা যে আবার বিপরীত গতিতে জীবনগঠনে ত্যাগের কথা একেবারেই ভুলিয়া যাইবার পথে পড়িয়াছি,

মায়াবাদের ঋণ অপরিশোধ্য

সে কথাও কি সত্য নয় ? এ সময়ে কে আমাদিগকে টানিয়া সুপথে আনিতে পারে ? আমরা সুখবাদকে জীবনের আদর্শ করি নাই বটে, কিন্তু আত্মবিকাশের ওজুহাতে আত্মত্যাগের কথা প্রায় ভোলা ভোলার মধ্যে। আমরা যখন 'ঈশ্বর সর্ব্বময়' ভাবিতে যাইয়া জগতের মধ্যে ঈশ্বরকে মিশাইয়া দি, তখন কে জগদ-তীতের কথা বলিয়া আমাদিগকে তুলিয়া দেন ? তিনিই সকলের মধ্যে বলিয়া যখন এককে বহুর মধ্যে হারাইয়া ফেলি, তখন কে সর্ব্বনিরপেক্ষ একের কথায় আমাদের সুপ্ত মনকে জাগ্রত করেন ? সংসারেই ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে বলিয়া যদি আমি কেবল সংসারই করি, তখন কে ধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্যের আহ্বানে আমার সুপ্ত আত্মাকে জাগ্রত করেন ? মায়াবাদী যদি জীবনের সমস্যাগুলিকে স্পষ্ট করিয়া চক্ষের সম্মুখে না ধরিতেন, তবে ইহাদের সামঞ্জস্যে যে সুগঠিত ভক্তিধর্ম্মের কথা বলিয়াছি, তাহা আমরা পাইতাম না। মায়াবাদী সব দিকেই আত্মত্যাগের কথা বলিয়াছেন, আমরা আত্মবিকাশের কথা বলিতেছি। কিন্তু আত্মত্যাগেই আত্মবিকাশ। আত্মত্যাগেই ব্রহ্মলাভ। "ছাড় আপনারে, প্রেমে পাবে তাঁরে।" "যে তোমার আত্মারূপে প্রকাশ সেই ব্যাপ্ত চরাচরে"—ব্রহ্মকে যদি আমার আত্মারূপে পাইতে চাই, তাহা হইলে "আমি"কে সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার চরণে সমর্পণ করিতে হইবে। "সচ্চিদানন্দঃ শিবোঽহম্", সত্যই তাই ! কিন্তু কখন ? তাঁহারই হস্তের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য যখন জগতের মঙ্গলার্থ আমি আমাকে তাঁহার চরণে উৎসর্গ করি, তখনই তো **তাঁর** জ্ঞান, **তাঁর** প্রেম, **তাঁর** পুণ্য আমার মধ্য দিয়া জগতে ব্যাপ্ত হইবে। সুতরাং যাঁহারা আমার বদ্ধ আত্মা ও মুক্ত ব্রহ্ম, প্রাকৃত জীবন ও ব্রহ্মলোকের বিরুদ্ধভাব স্বতঃ পরতঃ আমার সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের চরণে শতবার নমস্কার করি। মায়াবাদীদিগের গুরু ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের চরণে প্রণাম। ওঁ নমঃ পরিমঋষিভ্যঃ।

অষ্টম অধ্যায়

মায়াবাদে

শঙ্কর ও রামমোহন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম প্রচারক রাজর্ষি রামমোহন রায়ের

ব্রহ্ম

আর কিছু হউন বা না হউন, তিনি উপাস্য, এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। কেন না, ঐহিক পারত্রিক কল্যাণের নিমিত্ত একমাত্র সদ্রূপ, সর্ব্বসাক্ষী, স্রষ্টা, পাতা, সংহর্ত্তা 'পরব্রহ্ম'এর সাক্ষাৎ উপাসনা প্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁহার অভ্যুত্থান। আর যাহা কিছু এই উপাসনার আনুষঙ্গিকমাত্র। রামমোহনের উপাসনা পারমার্থিক, ব্যাবহারিক নহে। এ কথা না বুঝিলে রামমোহনকে বুঝা হইল না। সঙ্গীতে, ষট্পদীতে সাধক রামমোহন যাঁহার গুণ গান করিয়াছেন, তিনি সগুণ নির্গুণ দুই-ই—তিনি

নিত্য নিরঞ্জন নিখিল কারণ, বিভু বিশ্বনিকেতন,
বিকারবিহীন কামক্রোধহীন, নির্ব্বিশেষ সনাতন। (ব্রঃ সঃ)
বিগত বিশেষং জনিতাশেষম্
সচ্চিচ্ছুখপরিপূর্ণম্। (ষট্পদী)

শঙ্করের 'ব্যাবহারিক' কথাটার অর্থ মিথ্যা—পরব্রহ্মের দিক্ হইতে বা জ্ঞানোদয়ে তাহা অবস্তু। জীব ও জগৎ ব্রহ্মজ্ঞানের নিকট অলীক। জ্ঞানের উদয়ে যাহাকে সাধারণ ভাষায় বলি মুক্তি—তাহাতে জীব ও জগতের বিনাশ। কেন না, জীব ও জগৎ অজ্ঞানতাপ্রসূত। ব্রহ্মে অজ্ঞানতা নাই, সুতরাং উপাসনাদি অজ্ঞানতার অধিকারে। জ্ঞানোদয়ে যখন মুক্তি আসিল, অজ্ঞানতার কার্য্য থামিল, উপাসনাও শেষ হইল। সেইজন্যই মায়াবাদের দিক্ হইতে ভট্টাচার্য্য যখন তর্ক তুলিয়াছিলেন, যে উপাসনামাত্রই যখন ভ্রমাত্মক তখন সাকারোপাসনায় দোষ কি? রাজা প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,—"দেবতার উপাসনাকে যে ভ্রমাত্মক কহিয়াছেন তাহাতে আমাদিগের হানি নাই। কিন্তু উপাসনামাত্রকে ভ্রমাত্মক কহিয়া ব্রহ্মোপাসনা হইতে জীবকে বহির্ম্মুখ করিবার

চেষ্টা করেন। ইহাতে আমাদিগের আর অনেকের সুতরাং হানি আছে। যেহেতু ব্রহ্মের উপাসনাই মুখ্য হয়, তদ্ভিন্ন মুক্তির কোন উপায় নাই।" রামমোহনের ব্রহ্ম একই বস্তু—সগুণ ও নির্গুণ। উপাসনা সগুণে আরম্ভ—জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের দ্বারা পরমাত্মার সত্তাতে নিশ্চয় করিয়া, আত্মাই সত্য এই ধারণা, তিনিই সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গের কর্ত্তা এই চিন্তা সগুণোপাসনা বা পরম্পরা উপাসনা। "Should adoration imply the elevation of the mind to the conviction of the existence of the omnipresent Deity ("an Almighty superintendent of the universe") as testified by His wise and wonderful world, and continual contemplation of His power, as so displayed, together with a constant sense of the gratitude which we naturally owe Him, for our existence, sensation and comfort,—I never will hesitate to assent that His adoration is not only possible, and practicable but even incumbent upon every rational creature" (*Second Defence of Hindu Theism*). এই আরাধনার সঙ্গে রাজা প্রার্থনা করিতেছেন,—"May God speedily purify the minds of my countrymen and lead their hearts to that pure morality which is inseparable from the true worship of Him"(Ibid)। পর পর নিরবচ্ছিন্ন উন্নতিমার্গে উপাসনার পরিপাক নির্গুণে—"পশ্চাৎ অভ্যাসদ্বারা সেই সত্তাকে সাক্ষাৎকার করিবে" (বেদান্ত সার); "শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থিতি করিবে" (গায়ত্রীর অর্থ)। স্বরূপে অবস্থিতি দুই রকমে হয়—(১) 'নেতি' 'নেতি'র ব্যতিরেকী প্রণালীতে (Transcendent)—"অভ্যাসবশতঃ প্রপঞ্চময় বিশ্বের প্রতীতির নাশ হইয়া কেবল ব্রহ্মসত্তামাত্রের স্ফূর্ত্তি থাকে, তাহাকেই আত্মসাক্ষাৎকার কহি" (ভট্টা:); (২) অন্বয়ী প্রণালীতে সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন (Immanent)—"সমাধি-বিষয় ক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ব্রহ্মময় এমত রূপে সেই ব্রহ্ম সাধনীয় হয়েন" (বেঃ ভাঃ ভূঃ)। সগুণ নির্গুণ দুই স্বতন্ত্র বস্তু নহে। শিক্ষা (Culture), সঙ্গ (Association) ও মনের স্বাভাবিক প্রবণতা (Temperament) অনুসারে সাধকের যে দিকে জোর (Emphasis) পড়িবে, তদনুসারেই ইহাদের সমবায়ে সাধনপন্থা

নির্ব্বাচিত হইবে। উপাসনার শেষ কিন্তু কোথায়ও নাই। কেন না, "জীবন্মুক্ত হইলেও উপাসনা করিবেক" (বেঃ, সাঃ,)। "Even then not forsake His adoration" (Abr. of V.)। আচার্য্য শঙ্করের সঙ্গে যে পার্থক্য এখানে লক্ষিত হইতেছে, এই পার্থক্য কোথায়ও শেষ হয় নাই। সে তত্ত্ব সপ্তম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। কর্ম্মত্যাগী পরিব্রাজকাচার্য্য

শঙ্করের মায়াবাদ

ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক, অপরব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম এতদ্দ্বয়ের মধ্যে একান্ত ভেদকল্পনারূপ ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত। ইহার একটী পূর্ণমিথ্যা, আরটী পূর্ণসত্য—একটীর মধ্যে অন্যটীর প্রবেশ করিবার উপায় নাই। তিনি ব্রহ্ম ও মায়া (অর্থাৎ মায়ার কার্য্য জীব ও জগৎ) এই দুইএর মধ্যে রেখা টানিয়া উভয়কে সম্পূর্ণরূপে ভাগ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু কর্ম্মবীরাগ্রগণ্য গৃহস্থপ্রবর

রাজর্ষি রামমোহনের ব্রহ্মবাদ

এই রেখার কেবল স্থান করিতে পারে নাই, তাহা নহে, ইহার তীব্র প্রতিবাদ রূপেই অবতীর্ণ হইয়াছে। রাজর্ষি রামমোহন শঙ্করের মায়াবাদ ও স্বগতভেদ-বিহীন শুদ্ধাদ্বৈতবাদ নীরবে বর্জ্জন করিয়াছেন। রাজা যে বলিয়াছেন, শঙ্করকে মানি না, তাহা নহে। এরূপ ভাবে প্রাচীন ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। বরং ঐ ধারার সঙ্গে পূর্ণযোগ যাহাতে রক্ষিত হয়, সেই চেষ্টাই প্রাণপণে করিয়াছেন। এই জন্য নিজেকে সংস্কারক বলিতেও সঙ্কুচিত হইতেন। তিনি বলিয়াছেন: "In none of my writings, nor in any verbal discussion, have I even pretended to reform or to discover the doctrines of the unity of God, nor have I ever assumed the title of reformer or discoverer (*A Defence of Hindu Theism*)। তিনি তো অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকই—তাঁহার ব্যাখ্যা শঙ্কর হইতে যতই বিভিন্ন হউক না কেন, যোগরক্ষার জন্য তিনি শঙ্করের শিষ্য বলিয়া নিজেকে পরিচয় দিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? গোস্বামীর সহিত বিচারে আচার্য্য শঙ্করকে গুরু বলিয়া মান্য করিবার জন্য বঙ্গীয় বৈষ্ণবদিগকেও উপদেশ দিয়াছেন। বিভিন্নতা হইলেই যোগ কাটিবার প্রয়োজন নাই—নূতন ব্যাখ্যার দ্বারা অনুবর্ত্তীর পক্ষে পূর্ব্ববর্ত্তীকে সংশোধিত করিয়া লওয়াই প্রকৃত পথ। রাজা রামমোহন রায় শাস্ত্রীয়

বিচারে এই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। যেমন কেবল শাস্ত্র অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী-দিগের অভিজ্ঞতার হস্তে নিজেকে ছাড়িয়া দিতে রাজি হন নাই, তেমনি তিনি যোগ কাটিয়া একমাত্র নিজের বিচারবুদ্ধির উপর দাঁড়াইতেও সাহস করেন নাই। উভয়ের সামঞ্জস্যের দিকে দৃষ্টি ছিল। তাই প্রাচীন ধারাকে পরিপুষ্ট করিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। তিনি মায়াবাদের ভাষাই (Terminology) ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু নিজের অর্থ উহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন। নামরূপ সব মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা—মায়াবাদের এই সব ভাষা তাঁহার আলোচনায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু অর্থ স্বতন্ত্র। ইহার অর্থ—জগতের ব্রহ্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্মসত্তায় জগতের সত্তা। দ্বৈতজ্ঞান করিলেই জগৎ মিথ্যা—"এই নামরূপময় জগৎ কেবল সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে" (মাণ্ডুক্য ভূমিকা)। যার স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা আছে তাই সত্য—জগৎ আপেক্ষিক সত্য, অতএব 'সত্যের ন্যায়'। অন্যত্র, "এই প্রপঞ্চময় জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সকল কেবল সদ্রূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে" এবং সেই "ব্রহ্মসত্তাকে আশ্রয় করিয়া লৌকিক যে যে বস্তু যে যে প্রকারে প্রকাশ পায় তাহাকে সেই সেই রূপে ব্যবহার করিতে হয়" (ভট্টাঃ, বিঃ)। এই আশ্রয় হইতে বিচ্যুত করিয়া ভাবিলেই ইহা মিথ্যা। প্রকৃত অস্তিত্ব কেবল ব্রহ্মের। "Existence in reality belongs to God alone." "Nothing else can bear the name of true existence" (*Brahmunical Magazine*)। "যাবৎ সংসার এই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছে, তাঁহার সত্তাকে আশ্রয় না করিয়া পৃথক্ রূপে কেহ প্রকাশ পায় না" (কঠভাষ্য). "He is the only true existence amidst all dependent existences." "Nothing bears real existence except by the volition of God." (*Second Defence of Hindu Theism*)। সুতরাং পাওয়া গেল—(১) নিরপেক্ষ সত্তা নয়, তাই জগৎ মিথ্যা; (২) স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা ভাবিলে, মিথ্যা; ব্রহ্মের ইচ্ছায় উৎপন্ন ভাবিলে কিন্তু সত্য ("Real existence")। শঙ্কর সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন। আচার্য্য কোন জন্মে ব্রহ্মে "volition" আরোপ করিবেন না। রাজার রজ্জুসর্প উপমার অর্থও ইহাই—রজ্জুর সত্তাকে অবলম্বন করিয়াই যেমন সর্পজ্ঞান উপস্থিত হয়, সর্পের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তেমনই জগতেরও নিরপেক্ষ সত্তা নাই, পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়াই জগৎ সত্তাবিশিষ্ট হয়

(ব্রাহ্মণ সেবধি). "The world like the supposed snake has no independent existence from the Supreme Being" (Br. Mag.) উপমার ইহাই নিকৃষ্টার্থ—ইহার মধ্য হইতে অন্য সাদৃশ্য বাহির করিলে ভুল হইবে। রাজা বলিতেছেন, ব্যাঘ্র বা সিংহের সঙ্গে কোন মানুষের উপমা দিলে উক্ত জীবের পরাক্রমই কেবল বুঝাইবে, আকৃতি ইত্যাদি গ্রহণ করিতে হইবে না। ব্রহ্মকে সরাইয়া রাখিয়া হিরণ্যগর্ভ, অভিমানী দেবতা প্রভৃতি মধ্যবর্ত্তীদ্বারা যে জগৎব্যাখ্যার প্রয়াস—আচার্য্যের মতে পরমাত্মা সংসার দ্বারা স্পৃষ্ট হইতে পারেন না, সুতরাং অবিদ্যাবীজপ্রভব হিরণ্যগর্ভাদি দ্বারা যে জগতের ব্যাখ্যা—তাহাও রাজা নিরসন করিয়াছেন (বেঃ ভাঃ ১।২।১৭ ও ৩।৩।১৮)। উপনিষদের ভাষ্যে রাজা আচার্য্যের অনুগ সর্ব্বত্র অনুসরণ করিয়াছেন। কঠের 'ঊর্দ্ধ-মূলো' শ্রুতির ব্যাখ্যায় শঙ্কর হিরণ্যগর্ভের গোঁজামিল দিয়া যে মহা আড়ম্বর করিয়াছেন, রামমোহন সে দিক্ দিয়াই যান নাই। শঙ্কর মায়া বা অবিদ্যা দ্বারা জগতের ব্যাখ্যা করেন। সে মায়া অনির্ব্বচনীয়া, ইহার 'কি বা কেন' বুঝিবার উপায় নাই। মায়া তো অজ্ঞানতা, ব্রহ্মে অজ্ঞানতা নাই, সুতরাং এই অজ্ঞানতার কার্য্য যে জীব ও জগৎ তার সঙ্গে ব্রহ্মের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। পরমাত্মা সংসারদ্বারা অসংস্পৃষ্ট। সুতরাং রামমোহন যে গাহিয়াছেন—"ব্যাপ্যাশেষং স্থিতমবিশেষম্" (ষট্পদী), "সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বত্র সমান, ব্যাপ্ত সর্ব্ব চরাচর", "সর্ব্বজনস্থিত, ধ্রুবসত্য সর্ব্বাশ্রয়", "সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বসাক্ষী", "জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে" ইত্যাদি (ব্রঃ সং) উহা শঙ্করের ব্রহ্মে একেবারেই প্রযুজ্য নহে। কেন না, "সর্ব্ব" অবস্তু, সম্পূর্ণ অলীক। শঙ্করের ব্রহ্ম 'বহু'র স্থান করিতে অসমর্থ। অজ্ঞানতার কার্য্য এই জগৎ ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় কি রূপে হইতে পারে? যাহার কোন খবর নাই তাহা অবস্তু—অবস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান কোন মীমাংসা দিতে পারে না। তাই শঙ্কর-শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্য ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন, যাঁহারা যুক্তির দ্বারা অবিদ্যা-বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতে যান তাঁহারা বাতি দ্বারা পর্ব্বতগহ্বরের অন্ধকার নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন। (তৈত্তিরীয় বার্ত্তিক, ৯।১৭৬—৭৭)।

জগৎ

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা যে মায়ার দ্বারা জগৎ সৃষ্টির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অবস্তুও নয়, অনির্ব্বচনীয়ও নয়। ইহা খাঁটি সদ্বস্তু—ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি। ব্রহ্মও যেমন সৎ, রামমোহনের

মায়াও তেমনই সৎ। কখনও বলিয়াছেন সৃষ্টিশক্তি: "Ma'ya' is the creating power of the eternal God" (Br. M.)." "মায়া শব্দের প্রয়োগ মুখ্যরূপে ঈশ্বরের জগৎ-কারণ শক্তিতে, গৌণরূপে এ শক্তির কার্য্যেতে হয়" (ব্রাঃ সেঃ)। এই সৃষ্টিকার্য্যকে কোথায়ও আবার লীলাও বলিয়াছেন (স্মঃ, ভাঃ, ২।১।৩), ইহাকে তাঁহার ইচ্ছাশক্তিরূপেও অভিহিত করিয়াছেন—'the will of God' (Br. M.). এই সৃষ্টিলীলা, ইচ্ছাশক্তির কার্য্য নিত্যকাল চলিতেছে। শক্তিমান্‌কে শক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। গুণ ও গুণীর অর্থাৎ বিষয় ও বিষয়ীর সম্বন্ধ নিত্য। কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে কর্ত্তা শব্দ প্রয়োগ হয় না (ব্রাঃ সেঃ)। "No being can be called an agent unless an action be found in him" (Br. M.)। অন্যত্র, "God is the wil-ful agent of all that can have existence" (Abr. of V.)। তিনি নিত্য ক্রিয়াশীল। "বস্তু সকল পৃথক্ পৃথক্ কালে উৎপন্ন হইলে ইচ্ছার নিত্যত্বে দোষ পড়ে না। যেহেতু, পরমেশ্বর কালাতীত, বস্তু সকল কালিক; যে কালে যাহার উৎপত্তি তাঁহার নিত্যেচ্ছায় হয়, সেই কালে সেই বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে" (ব্রাঃ সেঃ)। তাঁহার লীলার স্রোত সুতরাং অনাদি অনন্ত কাল ধরিয়াই চলিবে। ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি নিত্য, সুতরাং তাঁর কার্য্য নিত্য না হইয়া পারে না। সৃষ্টিশক্তি, ইচ্ছাশক্তিও কাজেই নিত্য। ঈশ্বরকে নিত্য বলি, কালাতীত বলি। কাল না থাকিলে কালাতীত কথাটা অর্থহীন। "নিত্য কাল না থাকিলে ঈশ্বর নিত্য হয়েন না, ঈশ্বরের নিত্যত্বের জ্ঞান কালের জ্ঞান সাপেক্ষ" (ব্রাঃ সেঃ)। সুতরাং কালও নিত্য, এই সৃষ্টি কাজেই আদিঅন্তবিহীন নিত্য কালের। শঙ্কর যে বলিয়াছেন, বিদ্যার আবির্ভাবে মায়ামরীচিকা গন্ধর্ব্বনগরীর ন্যায় এই সৃষ্টি বিনষ্ট হইবে, রামমোহনের ব্রহ্মবাদ তাহা অঙ্গীকার করে নাই। রাজা গুণ ও গুণীর যে সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর এবং শাঙ্কর দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত। আচার্য্যের "সত্য" (Substance) একেবারে নির্ব্বিশেষাদ্বৈত, একরস (homogeneous), স্বগত-ভেদবিহীন—জ্ঞেয় যখন মিথ্যা তখন জ্ঞাতা জ্ঞেয়ের সম্বন্ধও সেখানে নাই। রাজর্ষির ব্রহ্মবাদ—আদি হইতেই যার উপর ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত—এরূপ একপেশে তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাঁহার মতে "Substance is as much dependent on the possession of

quality or qualities for its existence as a quality on some substance. It is impossibie eyen to imagine a substance diyested of qualities" (*Second Defence*)। ভেদ বা বহু এক বা অভেদেরই ন্যায় সত্য (Real), একটাকে ছাড়িয়া অন্যটা থাকিতেই পারে না। রাজার মতে গুণশূন্য গুণী, বিষয়শূন্য বিষয়ী—শঙ্করের শূন্যগর্ভ 'সত্যং', কল্পনাও করা যায় না, উহা শূন্য (non-entity) মাত্র। স্পষ্টতা ও গভীরতায় রামমোহনের এই উক্তিটিকে অতিক্রম করিতে পারে, এ দেশে বা বিদেশে, প্রাচীন কালে বা বর্ত্তমান সময়ে, এমন উক্তি অতি অল্পই আছে। আসল কথা, রাজা কেবল বৈদান্তিক ছিলেন না। তিনি ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতির সামঞ্জস্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সুতরাং সত্যের কোন এক দিকের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পথভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা তাঁহার ছিল না। তবুও তিনি নির্গুণ-প্রতিপাদিকা শ্রুতির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন (সূঃ ভাঃ, ৩৷২৷১৪)। কেবল বেদান্তে নহে, সাধারণ জ্ঞানেও "The superiority of substance over its qualities is acknowledged" (Br. M.). প্রাচীনের মান রাখিতে রাজা কখনও কৃপণতা করেন নাই। তবে এই উক্তি কেবল প্রাচীনের সম্মানরক্ষার জন্য নহে। সাকারবাদ ও পৌত্তলিকতার সঙ্গে লড়াই করিতে যাইয়া নির্গুণের উপর ঝোঁক সহজ ভাবেই আসিয়াছিল। তবে, কিছুই তাঁহাকে কেন্দ্রচ্যুত করিতে পারে নাই।

শঙ্করের সঙ্গে বিভিন্নতা প্রদর্শনের জন্য রামমোহনের জগত্তত্ত্বের আরও একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। তাঁহার মতে জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত—"যস্য বিবর্ত্তং বিশ্বাবর্ত্তম্" (ষট্পদী), "ব্রহ্ম বিবর্ত্তে অর্থাৎ স্বরূপের ধ্বংস না করিয়া প্রপঞ্চ স্বরূপ দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত জগদাকারে আত্মমায়াদ্বারা প্রকাশ পায়েন" (ভট্টাঃ বিঃ)। এই আত্মমায়া কি ? ব্রহ্মের সঙ্কল্প, "The supreme Being has by his sole intention created the universe" (Abr. of V.). "ব্রহ্ম সঙ্কল্পের দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন" (বেঃ ভাঃ)। "ব্রহ্ম আত্মসঙ্কল্পের দ্বারা আপনি আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত নামরূপের আশ্রয় হইতেছেন" (বেঃ সাঃ)। বেদান্তভাষ্যে, "বিবর্ত্ত শব্দের অর্থ এই, যে স্বরূপের নাশ না হইয়া কার্য্যান্তরকে স্বরূপ হইতে জন্মায়।" অর্থাৎ ব্রহ্ম ইচ্ছানুসারে এই জগৎ আপনার স্বরূপ হইতে বাহির করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রকৃতির কোন বিকৃতি ঘটে নাই।' তিনিই সুতরাং জগতের উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ। শঙ্কর

যে বলিয়াছেন, জগৎ মায়াবীজপ্রভব তাহা মিথ্যা দাঁড়াইতেছে। ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদান কারণ হন, "তবে এক ব্রহ্ম হইতে নানা প্রকার পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য কিরূপ হইতে পারে? ইহার উত্তর—এক বীজ হইতে যেমন নানা প্রকার পুষ্পফলাদি হয়, সেইরূপ এক ব্রহ্ম হইতে নানাপ্রকার কার্য্য প্রকাশ পায় (বেঃ ভাঃ, ২।১।২৩)। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর অভাব ("Nothing") হইতে কি জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন না? রাজা এই মত প্রত্যক্ষসিদ্ধযুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। কেন না, প্রত্যক্ষসিদ্ধ যুক্তিকে তুচ্ছ করিলে নাস্তিকের মতকে প্রবল করিয়া সর্ব্বধর্ম্ম নষ্ট করা হয় (ব্রাঃ সেঃ)। সুতরাং দাঁড়াইতেছে, এই বহুত্বপূর্ণ-জগৎ "একমেবাদ্বিতীয়ম্"এরই অভিব্যক্তি। যদি কেহ বলেন, তিনি স্বরূপতঃ একরস-ই, কিন্তু জগৎটা তাঁর স্বরূপের বিকার —ইহার উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে, যে স্বরূপের ধ্বংস না করিয়া ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি তর্ক তোলা যায়, সর্ব্বশক্তিমানের অসাধ্য কি আছে? ইহার উত্তরে রাজা যাহা বলিয়াছেন, তাহা নানাদিক্ হইতে স্মরণ রাখিবার জিনিষ—"জগতের সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ বটেন, কিন্তু তাঁহার আপনার স্বরূপের নাশ করিবার শক্তি তাঁহার আছে এ মত স্বীকার করিলে জগতের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের নাশ হওনের সম্ভাবনা। কিন্তু যাহার নাশ সম্ভব, সে ব্রহ্ম নহে। অতএব জগতের বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ হয়েন, আপনার স্বরূপের নাশে শক্তিমান্ নহেন" (ভট্টাঃ বিঃ)। এই জগৎ তাঁহার স্বরূপের বিকৃতি না জন্মাইয়াই তাঁহা হইতে উৎপন্ন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ সৃষ্টিকর্ত্তা, "God is an independent agent and the creator of the whole world" (Br. M.)। সৃষ্টি-বিষয়ে তাঁহার হাত ধরিবার কেহ নাই, অথচ তাঁহার মধ্যে খামখেয়ালিও কিছু থাকিতে পারে না। তিনি এই সৃষ্টি স্বীয় প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া স্বাধীনভাবেই করিয়াছেন। সুতরাং তখনই কেবল স্বাধীনতা খামখেয়ালি না হইয়া প্রকৃত স্ব-অধীনতা, যখন Necessity is the truth of freedom. "যদিও তাঁহারই ইচ্ছাতে তাবৎ সৃষ্ট্যাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে তবুও পরব্রহ্ম সর্ব্বদা এক অবস্থায়ই থাকেন।" (কবিতাকারের সহিত **বিচার**) তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেও নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়। সৃষ্টিও নিত্য, সুতরাং তিনিও নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়। তিনি এক, জগৎ বহু ও বহুত্বপূর্ণ। বহু জগতের মধ্য হইতে স্বাধীনভাবেই তিনি একটা নির্ব্বাচন করিয়া দেশকালের আবরণ দিয়া আপনার মধ্য হইতে আমাদের নিকট প্রকাশ করিতেছেন।

ইহা তাঁহার নিত্যলীলা বলিয়াই তাহার স্বরূপ অপ্রতিহত থাকিতেছে। তিনি সৃষ্টি করেন স্বাধীনভাবেই, কিন্তু আপনার প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া নহে। The world proceeds necessarily from the nature of God, এই মহাসত্যও প্রতিপন্ন হইতেছে। "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিসৃতম্"—এ জগৎ তাঁহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া তাঁহারই মধ্যে রমণ করিতেছে। তিনিই এক, তিনিই বহু—তিনি এক হইয়াও বহু; তাই বহুত্বপূর্ণ জগৎ তাঁহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া তাঁহাতে স্থিতি করিয়া তাঁহার প্রকৃতিকে বিকৃত করিতেছে না। সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ব্রহ্মে ছিল, সৃষ্টির পরেও এই কার্য্যরূপ জগৎ ব্রহ্মেই রহিয়াছে, তাঁহা হইতে বিভিন্ন নয় (বেঃ ভাঃ ২।১।১৬)। জগৎ ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন নহে। ব্রহ্ম সর্ব্বগন্ধ সর্ব্ব রস, ইহা দ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্বগতত্ব (Immanence) প্রতিপন্ন হয়, নানাবস্তুর স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন হয় না (বেঃ সাঃ)। কেননা, "God is at the same time quite different from what we see or feel" (Preface to Isa Up.)। ব্রহ্ম কেবল সর্ব্বগত (immanent) নন, সর্ব্বাতীতও (transcendent) বটেন। একটী অতি সূক্ষ্ম যুক্তিতে রাজা এই ভেদাভেদ (Unity-in-difference) প্রমাণ করিতেছেন। "জীবকে পরমাত্মার সহিত অভেদ জানিলে পরমাত্মাকেও সুতরাং জীবের সঙ্গে অভেদ জানিতে হয়, এমত নহে" (বেঃ ভাঃ ৩।৩।৩৭), "পরমেশ্বরে আর জীবে ভেদ আছে, যেহেতু জীবের সত্তা দ্বারা পরমেশ্বরের সত্তা না হয়, বরঞ্চ পরমেশ্বরের সত্তাতে জীবের সত্তা হয় (বেঃ ভাঃ ৩।৩।৫৫)। অর্থাৎ "পরমেশ্বরই জগৎ" যেহেতু পরমেশ্বরের সত্তাতে জগতের সত্তা (Immanence) এ কথা সত্য, তাই বলিয়া ইহার ব্যতীহার (Simple conversion) "জগৎই পরমেশ্বর" এ কথা সত্য হইবে না। ব্যতীহার হয় উভয়ের ব্যাপ্তির সমত্বে। "সকল মানবই মরণশীল" (All men are mortal) এই প্রতিজ্ঞায় মানুষ ও মরণশীল এ দুইএর সমান ব্যাপ্তি নাই বলিয়া ব্যতীহার "সকল মরণশীলই মানুষ" ইহা অসত্য। রামমোহন ব্যতীহার অগ্রাহ্য করিয়া ব্রহ্ম ও জগতের ব্যাপ্তির সমতা (Identity) অস্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্ম জগতে ব্যাপ্ত হইয়াও জগৎ হইতে বিভিন্ন, জগদতীতও (transcendent). এই দ্বৈতাদ্বৈত, ভেদাভেদ মত দৃঢ় করিতেছেন—"ইন্দ্রিয়ব্যাপ্য যে যে বস্তু ও বিভাগযোগ্য যে যে বস্তু সে সকল নশ্বর, অতএব তাহা হইতে ভিন্ন পরমেশ্বর

হয়েন” (চারি প্রশ্নের **উত্তর**)। তবে সাধকগণ যে ব্যতীহার প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার মীমাংসা কি? সিদ্ধপুরুষ রামমোহনের সিদ্ধান্ত এই—“যে আমি সেই ঈশ্বর” এ বাক্যের ফল এই, যে আমি সংসার হইতে নিবর্ত্ত, আর “যে ঈশ্বর সেই আমি” ইহার প্রয়োজন এই, যে ঈশ্বর আমার পরোক্ষ না হয়েন (বে: ভা: ৩।৩।৩৮)। ব্রহ্মসত্তায় জগতের সত্তা, সুতরাং ব্রহ্ম হইতে জগতের অভেদ (Immanence), কিন্তু জগতের সত্তায় তো আর ব্রহ্মসত্তা নয়, সুতরাং জগৎ হইতে ব্রহ্মের ভেদ আছে (Transcendence)। ব্রহ্ম বিশ্বগত বিশ্বাতীত দুই-ই। এক দিকে পরব্রহ্মকে সংসার হইতে সরাইয়া রাখা শাঙ্করীয় মায়াবাদ, অন্যদিকে জগতে ব্রহ্মকে গুলাইয়া দেওয়া বিকৃত জগৎ-ব্রহ্মবাদ (Pantheism)। এই দুইএর হস্ত হইতেই আত্মরক্ষা করিয়া রামমোহন আপনার ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই ভেদাভেদবাদই ব্রাহ্মধর্ম্মের দর্শন, ইহা কোন অর্ব্বাচীন মত নহে। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতার সময় হইতে এই তত্ত্ব চলিয়া আসিতেছে। শঙ্কর-মতের সম্পূর্ণ নিরসন ব্যতীত এ দেশে অন্য কোন ধর্ম্ম প্রচারিত হইতে পারে না। পথ পরিষ্কার করিবার জন্য রাজর্ষি রামমোহন ক্ষুরধার অস্ত্র রাখিয়া গিয়াছেন। কেহ তাহা ব্যবহার করিল না, তাই দেশে **ব্রাহ্মধর্ম্ম** প্রচারিত হয় নাই। কিন্তু প্রচার করিতেই হইবে।

নৈতিক জীবন

আচার্য্য শঙ্কর সংসারীকে জ্ঞানের অধিকারই দেন নাই। রামমোহন এই মত উল্টাইয়া নব-বিধান প্রবর্ত্তন করিলেন, যে সংসারীর জ্ঞানে কেবল অধিকার আছে তাহা নহে, কিন্তু “অনাশ্রমী জ্ঞানী হইতে আশ্রমী জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ” (বেদান্ত সার)। “উপাসনাতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নিতান্ত অপেক্ষা নাই, তথাপি বর্ণাশ্রমাচারত্যাগী যে উপাসক তাহা হইতে বর্ণাশ্রমাচারবিশিষ্ট উপাসক শ্রেষ্ঠ হয়” (মাণ্ডুঃ ভূঃ)। শঙ্কর সংসার ও মোক্ষধর্ম্মের মধ্যে যে অনতিক্রমণীয় ব্যবধান স্থাপনের জন্য প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন, রাজা সেই ব্যবধান উন্মূলনের জন্য আপনার বিরাট্ শক্তির সমগ্রটাই নিয়োগ করিয়াছিলেন। এমন বিচারগ্রন্থ কমই আছে, যেখানে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া ব্যবস্থা দেন নাই, যে গৃহস্থও মুক্তির অধিকারী। ইহা ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞানের ইতিহাসে এক অতি স্মরণীয় ঘটনা (Land mark). এই বিধান যেমন প্রাচীন সংস্কারে মহাবিপ্লব আনয়ন করিয়াছে, তেমনই প্রাচীন সমাজেরও ভিত্তিমূল আলোড়িত করিয়া দিয়াছে। সংসার-ধর্ম্মের সম্বন্ধে

যদি পরিণামে বলিতেই হইত "পূর্ব্বোক্ত কথা সকল মিথ্যা জানিবেন", তবে মহাজ্ঞানী রামমোহন সংসারের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য এমন করিয়া আত্মদান করিতে পারিতেন না। আসল কথা, তিনি ধর্ম্ম ও সংসারের ভেদ সম্পূর্ণ নিরসন করিয়া দিয়াছেন। আমাদের সামাজিক জীবনের বিধিনিষেধ সয়তানের খেলা, মায়াবীর ভোজবাজী বা মিথ্যার বিজৃম্ভণ নয়। রামমোহন সংসারে সর্ব্বত্রই—"তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী" (ব্রঃ সং)। "এই অনুভব সর্ব্বদা কর্ত্তব্য, যে যাহা করিতেছি, কহিতেছি, ভাবিতেছি তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে করিতেছি কহিতেছি ভাবিতেছি" (ব্রহ্মোপাসনা)। মোক্ষ-ধর্ম্মের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার, আর সংসারের বিধিনিষেধের কর্ত্তা জাগ্রত পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎভাবে জানিয়া সম্পূর্ণরূপে ঐ সকল নিয়মের বাধ্যতা স্বীকার করতঃ তাঁহার সঙ্গে মিলিত হওয়া, এই দুই এর মধ্যে রামমোহন কোন রেখা টানেন নাই। মুক্তির জন্যই কেবল ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইতে হইবে, কিন্তু ঐহিক মঙ্গলামঙ্গল আর এক জনের হাতে, তা নয়। "ব্রহ্মোপাসনা যেমন মুক্তি ফল দেন, সেইরূপ সকল অন্য ফল প্রদান করেন" (বেঃ সাঃ)। সংসারের কর্ত্তব্য সকল ধর্ম্মবোধেই করিতে হইবে। "পুত্রের সহিত পিতার ধর্ম্ম, পিতার সহিত পুত্রের ধর্ম্ম আচরণ করিতে হইবেক; যে হেতু, এ সকল নিয়মের কর্ত্তা ব্রহ্ম হয়েন" (বেঃ গ্রঃ ভূঃ)। "যে ব্যক্তি এমত নিশ্চয় রাখে, যে বিধিনিষেধের কর্ত্তা যে পরমেশ্বর তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বদ্রষ্টা, সকলের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে সুখদুঃখরূপ ফল দেন, সে ব্যক্তি ঐ সাক্ষাৎ বিদ্যমান পরমেশ্বরের ত্রাসপ্রযুক্ত তাঁহার কৃত নিয়মের রক্ষার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন অবশ্যই করিবেক" (ভট্টাঃ বিঃ)। "পরমার্থ-সাধন ও ঐহিক ব্যবহার অবশ্য কর্ত্তব্য হয়" (চাঃ প্রঃ উঃ)। তিনি এই দুইকে ভাগ করিয়া জীবনের এক ভাগে ঐহিক অন্য ভাগে পরমার্থের ব্যবস্থা করেন নাই। কেহ বলিতে পারেন, ঐহিক ব্যবস্থা অজ্ঞানীর জন্য, জ্ঞানোদয়ে এ সকলের প্রয়োজন নাই। রাজা প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন,—"ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তিরা জ্ঞানসাধনের সময় এবং **জ্ঞানোৎপত্তি হইলে পরেও** লৌকিক তাবৎ ব্যাপারকে যথাবিহিত সম্পন্ন, করিবেন অর্থাৎ গুরুলোকের তুষ্টি ও আত্মরক্ষা ও পরোপকার যথাসাধ্য করিবেন। ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল বলবান্ হইয়া যাহাতে আপনার ও পরের পীড়া জন্মাইতে না পারে, এমত যত্ন সর্ব্বদা করিবেন" (মাণ্ডুঃ ভূঃ)। যদি জ্ঞানোৎপত্তির ক্রমবিকাশের

আপত্তি উপস্থিত করা হয় তবে তার উত্তর এই, যে "নামরূপ সকলকে মায়ার কার্য্য করিয়া জানিলে কি আপন শরীর কি দেবাদি শরীর তাবতের মিথ্যাজ্ঞান এক কালেই হয়। অতএব আপন শরীরে ও দেব শরীরে মিথ্যাজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বাপরের সম্ভাবনা নাই" (ভট্টাঃ বিঃ)। অর্ব্বাচীন মায়াবাদের কথা কি, অতি প্রাচীন উপনিষদেও যেন অবস্থাবিশেষে নৈতিক বন অতিক্রম করিবার কথা আছে। কিন্তু রামমোহন বলেন, "ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পরেও শমদমাদি-বিশিষ্ট থাকিবেক" (বেঃ সাঃ)। রাজা অদ্বৈতবাদী ছিলেন, কিন্তু কোন অবস্থাতেই—মুক্তিতেও অদ্বৈতান্তর্গত দ্বৈত জ্ঞানের বিরাম অঙ্গীকার করেন নাই। এদেশের পক্ষে ইহা একটা বিশেষ কাজ।

জীব

মায়াবাদের মূলতত্ত্বে জীবের জন্য (অজ্ঞানতার অধিকারে) ব্রহ্মের প্রয়োজন হইলেও, ব্রহ্মের পক্ষে জীবের কোন প্রয়োজন নাই। জীবজ্ঞান অজ্ঞানতাপ্রসূত। ব্রহ্মে অজ্ঞানতা নাই। সুতরাং ব্রহ্মের কাছে জীব অবস্তু—ব্রহ্ম অবস্তুর অনুসন্ধানে বাহির হইবেন কি? অতএব জীবকে বরণ করা তাঁর হয় না। ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ থাকিলেও জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধ নাই। রামমোহন কিন্তু ব্রহ্মকে জীবের অন্বেষণে প্রেরণ করিয়াছেন—

"জড়মাত্র ছিলে, জ্ঞান যে দিল তোমায়,
সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়।" (ব্রঃ সঃ)

মানুষ ঘুমাইয়া পড়ে, ঈশ্বর তাকে জাগাইয়া দেন। "রেতে ঘুমালে হে, ও হৃদয়বিহারি, তুমি আপনি কর চৌকীদারী—এই ব্রহ্ম সঙ্গীতের মূল রামমোহনে রহিয়াছে: "সুষুপ্তি সময়ে সকল লয় হইলেও পুনরায় জীবকে পরমেশ্বর প্রবর্ত্ত করেন" (ব্রহ্মোপাসনা)। জীবের সঙ্গে ব্রহ্ম এমন মাখামাখি, যে হাত ধরিয়া তিনিই আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার উন্নতিমার্গে লইয়া চলিয়াছেন,—"Endeavour to improve our intellectual and moral faculties, relying on the goodness of the Almighty Power which *alone* enables us to attain that which we earnestly and diligently seek for" (*Introduction to Kena Upanishad*) আমরা "alone" কথাটার উপরে জোর দিয়াছি এই জন্য, যে অনেক সাধক দেখি, যাঁরা ভগবৎ-কৃপার উপর তত জোর দেন না, বৌদ্ধ ও মায়াবাদীর ন্যায় সাধন-ভজনের উপর যত জোর দেন। ভক্ত রামমোহনের মতে আমরা যতই ব্যাকুল

হই না কেন, যতই কোস্তাকুস্তি করি না কেন, দৃষ্টি রাখিতে হইবে তাঁর উপরে, তাঁর কৃপা ভিন্ন সিদ্ধি হয় না। কেননা, "জীবের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন" (বেঃ ভাঃ, ২।৩।৪২)। The soul is an inferior agent dependent in all its acts on the will of God." (Br. M.). শঙ্করের মতে ব্রহ্মে দয়া আরোপ করা চলিবে না; রাজার মতে "আমরা ঈশ্বরকে ইচ্ছাবিশিষ্ট দয়াবিশিষ্ট কহি" (ব্রাঃ সেঃ)। আমরা আস্থা রাখি, "in the mercy of that Being to whom the motives of our hearts are well-known (Pre. to K. Up.)। অনেক ব্রাহ্মও আছেন, তাঁহারা মনে করেন, যে পাপ করিয়া অনুতাপ করিলেই পাপের মার্জ্জনা হইল। কিন্তু রামমোহন আরও কিছু চান—"পাপী ব্যক্তি মনস্তাপ করিলে **ঈশ্বর করুণাশক্তির দ্বারা** মার্জ্জনা করেন।" ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধে আসেন, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয় প্রার্থনায়। রামমোহন প্রার্থনায় বিশ্বাসী ছিলেন। কেহ মনে করিতে পারেন, যে প্রার্থনা একটা একতরফা আধ্যাত্মিক কস্‌রৎ। যিনি বিশ্বাস করেন ভগবান্ প্রার্থনা শুনেন, তার উত্তর দেন, ফল প্রদান করেন, তাঁর সম্বন্ধে এই আপত্তি খাটিবে না। রাজা যে কেবল নিজের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা নহে, নির্জ্জনে পরের জন্যও করিয়াছেন—"হে পরমেশ্বর, কবিতাকারকে আত্মা ও অনাত্ম বিবেচনায় প্রবৃত্তি দাও।" আপনার সকল পরিশ্রমের ফলদাতা বলিয়া তিনি সর্ব্বদা ভগবানের দিকেই দৃষ্টিপাত করিতেন, অন্য কোন দিকে তাকাইতেন না—"Whatever men may say, I can not be deprived of this consolation : my motives are acceptable to that Being who beholds in secret and compensates openly" (Intro. to Abr. of V.)। তাই উপসংহারে আমরা জোড়হস্তে সেই দেবাদিদেবের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া আত্মার কল্যাণের জন্য রাজর্ষির সঙ্গে প্রার্থনা করি—

"হে অন্তর্য্যামিন্ পরমেশ্বর, আমাদিগকে আত্মার অন্বেষণ হইতে বহির্ম্মুখ না রাখিয়া যাহাতে তোমাকে এক অদ্বিতীয় অতীন্দ্রিয় সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বনিয়ন্তা করিয়া দৃঢ়রূপে আ-মরণান্ত জানি এমৎ অনুগ্রহ কর ইতি। ওঁ তৎ সৎ" (কঠোপনিষৎ ভূমিকা)।

পরিপূরক (ক)

(১৮৪২ শক, ১৬ই ভাদ্রের "তত্ত্বকৌমুদী"তে উপস্থাপিত প্রশ্নের উত্তর)

দার্শনিক আলোচনার কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা আছে। সে পথ যদি না ধরা যায় তবে যে আমাদিগকে তর্কের গোলক-ধাঁধায় পড়িয়া হয়রান্ হইতে হইবে, কোন সিদ্ধান্ত পাইব না, গম্যস্থলে পৌছিতে পারিব না, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এরূপ স্থলে তর্ককে অপ্রতিষ্ঠ বোধ হওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই নাই। লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধান না করিয়া সমালোচক যদি নিজের স্বকপোলকল্পিত একটা ব্যাখ্যা তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করেন, তবে এইরূপ একটি গোলক-ধাঁধা গড়িয়া উঠে। দৃষ্টান্ত দিতেছি;—আমি এক স্থানে বলিয়াছিলাম, ব্রহ্মের দিকে দেখ তিনি একান্ত ব্রহ্ম নন। পূর্ব্বাপর দেখিলেই কোন দ্বিধার কারণ থাকে না, কি অর্থে আমি উহা বলিয়াছি। স্বকপোলকল্পিত অর্থের কোন প্রয়োজন হয় না। এই স্থানের অর্থ—অসীম কেবল অসীম নন, সসীমও কেবল সসীম নয়; সসীম কেবল সসীম হইলে সে তার নিজের সসীমতাই বুঝিত না, অসীম কেবল অসীম হইলে তিনি হইতেন শূন্যগর্ভ। যাঁহারা শূন্য-বাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ঠিক্ ঐ পথেই গিয়াছিলেন—এ পথের পথিক সকলকেই শূন্যে পৌছিতে হয়, যদি একটু গভীর চিন্তাশীল হন। আমি তো আমার কথাটাকে স্পষ্ট করিয়াই দিয়াছিলাম, "জীবের মধ্যে ব্রহ্ম নিত্য লীলাময়, ব্রহ্মের মধ্যে জীব চির-বর্ত্তমান।" এই সত্যটীকেই কবিত্বের ভাষায় বলিয়াছিলাম, 'নর-নারায়ণ' বা 'নর-হরি (১২৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। পূজনীয় প্রশ্নকর্ত্তা কিন্তু এই সহজ সত্যটিকে এক মহা-বিভীষিকায় পরিণত করিয়া মহাতর্ক আরম্ভ করিয়াছেন—ব্রহ্ম তবে একান্ত জ্ঞান নহেন, একান্ত মঙ্গল নহেন ইত্যাদি। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, যে ইহাতে একটা বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে মাত্র। ব্রহ্ম যে জীবের অন্তরাত্মা রূপে বর্ত্তমান, এ কথা স্বীকার না করিলে ব্রহ্মোপাসনা হয় কিরূপে তাহা জানি না। আর, জীব ব্রহ্মে বর্ত্তমান—ইহা পূর্ব্বোক্ত উক্তির ভাষান্তরমাত্র। ব্রহ্ম পূর্ব্বে জীবের অন্তরাত্মা ছিলেন না, কোন বিশেষ কালে অন্তরাত্মা হইয়াছেন, ইহা যখন্ কোন দার্শনিকজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি স্বীকার করিবেন না—কেন না, জগৎ-ব্যাপারের আদিও নাই অন্তও নাই—তখন জীব ব্রহ্মে চিরবর্ত্তমান না থাকিলে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বও বজায় থাকিবে না, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। যাহা হউক, প্রশ্নকর্ত্তা

'ব্রহ্ম' বলিতে যে কোনও রকমের সূক্ষ্ম জড় বুঝেন তাহার আভাস দিয়াছেন—জ্ঞান মঙ্গল আনন্দের সমষ্টি করিয়া ব্রহ্মবস্তুর উৎপত্তি। খণ্ডের সমষ্টি করিয়া যাহার উৎপত্তি তাহা আমাদের দেশবোধের অন্তর্গত। ব্রহ্ম যদি তাঁহার তথাকথিত স্বরূপগুলির সমষ্টি হন, তবে তিনি কোনও সূক্ষ্ম জড়রূপেই কল্পিত হইতেছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মের সঙ্গে ব্রহ্মস্বরূপের সম্বন্ধ দেশের সঙ্গে দেশাংশের সম্বন্ধ নয়,—জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ, কর্ত্তা-ক্রিয়ার সম্বন্ধ। জ্ঞাতা জ্ঞেয়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়াই তাহার অস্তিত্ব বিধান করিয়াছেন, জ্ঞেয় জ্ঞাতার মধ্যে আছে বলিয়াই সে অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে। ইহারা দুই বস্তু নয়, একই বস্তুর দুই দিক্—একই জ্ঞাতা বহুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বহুর একত্ব বিধান করিয়াছেন। সুতরাং দ্বৈতত্ব বা বহুত্বের আশঙ্কা বৃথা। এখানে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। জ্ঞাতাকে ছাড়িয়া যদি জ্ঞেয় না থাকে, জ্ঞেয়কে ছাড়িয়া যদি জ্ঞাতা অর্থশূন্য হয় এবং জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের সম্বন্ধই যদি **জ্ঞান** হয়, তবে ব্রহ্ম যে কেবল শূন্যগর্ভ জ্ঞান নহেন, ইহা একটি খাঁটি সত্য হইয়া দাঁড়ায়। "জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া"—বহুপূর্ব্বে মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বলিয়া গিয়াছেন, "জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা যে **তিন** বলিয়া মনে হয়, তাহা মিথ্যা।" জ্ঞেয় পদার্থ ছাড়িয়া 'জ্ঞানং' মিথ্যা, মঙ্গল ঘটনা ছাড়িয়া 'শিবং' শূন্যমাত্র। সুতরাং এই অর্থে যদি আমরা কেবল জ্ঞান বা মঙ্গলের উপাসনা করি, তাহা শূন্যের উপাসনা—তাহার মধ্যে বাক্যচ্ছটা যাহাই থাকুক আর কল্পিত ভাবোচ্ছ্বাস যাহাই উঠুক। সৌভাগ্যের বিষয় আমরা শূন্যের উপাসনা করি না—জ্ঞানের বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া আমরা **কেবল** জ্ঞানকে লইয়া উপাসনা করি না। আমরা বলি,—"তুমি জলে, তুমি বায়ুতে, তুমি অগ্নিতে, তুমি বৃক্ষলতায়, তুমি চন্দ্রে, তুমি সূর্য্যে; অথবা অগ্নি তোমাতে, বায়ু তোমাতে, বৃক্ষলতা তোমাতে, চন্দ্রসূর্য্য তোমাতে।" ইহাতেই আমাদের উপাসনা শূন্য (abstract) না হইয়া বাস্তব হয়। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' ইহা তো আরাধনার সূত্রমাত্র। এই সূত্র জগৎ প্রপঞ্চকে টানিয়া আনিয়া আরাধনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেয়। প্রশ্নকর্ত্তা উপাসনার সময় কি ভাবেন বা কি বলেন তাহা ভুলিয়া গিয়া তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। নতুবা এ কথা বলিবেন কেন? আমরা যে বাস্তবিকই মৃত্তিকা জল বায়ু প্রভৃতির ব্যাখ্যা করিয়াই **আরাধনা** করিয়া থাকি। জ্ঞানের ব্যাখ্যায় কেবল জ্ঞাতাকে লইয়া থাকিলে কল্পনা হয়, জ্ঞেয় বিষয় আসিয়াই কেবল উহাকে সত্যতা দান করিতে পারে। এরূপণা হইয়াই

পারে না। কেন না, ব্রহ্মের মধ্যে জগৎপ্রপঞ্চ **স্বগত-ভেদ** রূপে অবস্থিত। স্বগতভেদের মূল কথা বিষয়-বিষয়ীর ভেদ, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের ভেদ। **ব্রহ্ম নিজেই নিজের বিষয়**। এই অর্থ ছাড়িয়া অবান্তর কথায় আলোচনাকে দিগ্‌ভ্রষ্ট করিলে ঐ আবার গোলক-ধাঁধায় প্রবেশ করিতে হইবে। এই প্রপঞ্চকে যখন ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় (এই বিষয় নাম—concept, রূপ—percepts, এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ব্রহ্মের Internal Differentiations রূপে ব্রহ্মে বর্ত্তমান) বলা হইতেছে, তখন এই প্রপঞ্চকে ধারণ করিয়া ব্রহ্ম জড় হইতেছেন না, কিন্তু জগৎটাই যে চৈতন্যাত্মক হইতেছে,—এ কথা বুঝিতে যদি আবার উত্তরের অপেক্ষা রাখে, তবে উত্তর না পাইলে দোষটা কেবল উত্তরদাতারই হয় না। যাঁহারা বলেন, এই প্রপঞ্চ চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানের বিষয়, সুতরাং চৈতন্যাত্মক, সাধারণ চিন্তাবিহীন মানুষ উহাকে বলে জড়—যাঁহারা তাহার প্রতি কণিকাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখান, যে তথাকথিত জড় বলিয়া কিছু নাই (এবং জড়-বিজ্ঞানও আপনার দিক্ হইতে তাহারই সায় দিতে আরম্ভ করিয়াছে) তাঁহাদের কাছে যদি এই প্রশ্ন লইয়া উপস্থিত হওয়া হয়, "প্রপঞ্চ—জড়—অচেতন, ব্রহ্ম জ্ঞানময়, এজন্য প্রপঞ্চ ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারে না, যাহা ব্রহ্মস্বরূপ রূপে গণনীয় হইতে পারে না, তাহাকে 'ব্রহ্মের স্বগতভেদরূপে অবস্থিত' বলিয়া কিরূপে স্বীকার করা যায়?" তাহা হইলে ন্যায়ের ফাঁকি (fallacy) সম্মুখে দাঁড়াইয়া রাস্তা বন্ধ করে, আর বিচার চলে না। বলিতেছি না, যে এই মত মানিয়া লইতে হইবে অথবা এ মত না মানিলে ব্রহ্মোপাসনা হয় না। কিন্তু ইহাই যাঁহাদের জগত্তত্ত্বের ব্যাখ্যা তাঁহাদের ব্রহ্ম যে বিশ্বপ্রপঞ্চকে আপনার মধ্যে ধারণ করিয়া "চেতন অচেতন সমন্বিত মিশ্রপদার্থ" হইয়া যান না বা এরূপ ব্রহ্মের উপাসনায় যে মিশ্রপদার্থের উপাসনা করিতে হইল বলিয়া 'হা হতোহস্মি' করিবার অবসর নাই, এ কথা স্বীকার না করিলে আর কথা চলে না। যদি বলা হয়, ও কথা বুঝাইয়া দাও—তবে তার উত্তর এই, যে অতি প্রাচীনতম উপনিষদ্ ও অতি প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিক পার্মিনাইদিস্ হইতে আরম্ভ করিয়া অধুনাতন ছোট বড়—নিতান্ত ছোটও নয়—এই মতবাদী যিনিই কলম ধরিতে জানেন, তিনিই ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যদি প্রশ্নকর্ত্তার তাহাতে তৃপ্তি না হইয়া থাকে তবে বুঝিতে হইবে, এই মত যাঁহারা পোষণ করেন প্রশ্নকর্ত্তাকে বুঝাইবার শক্তি তাঁহাদের নাই। সুতরাং এখানেও কথা বন্ধ, উভয় পক্ষের যে সাধারণ ভূমি থাকিলে বিচার চলে সে ভূমি নাই।

পরিপূরক (খ)

বৈশাখী পূর্ণিমা

(বুদ্ধ, শঙ্কর ও রামমোহন)

কবি বলিয়া গিয়াছেন, "পুণ্যদা পূর্ণিমা তিথি বৈশাখের মাসে।" বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথি পুণ্যদা কেন? সাধারণের উত্তর কি তা এখানে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। একটা বিশেষ অর্থও আছে। ভারত আধ্যাত্মিকতার জন্য জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার আধ্যাত্মিকতার ইতিহাসের এক অতি শ্রেষ্ঠ অংশ এই পূর্ণিমার সঙ্গে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। এই তিথিতেই শাক্যমুনি জন্মগ্রহণ করেন, এই তিথিতেই তাঁহার বুদ্ধত্ব লাভ হয়, এবং এই তিথিতেই বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। আবার গৌতম-বুদ্ধ যে নিশান ফেলিয়া গেলেন, সেই নিশান ধরিয়া তুলিয়া যিনি এ দেশে আধ্যাত্মিকতার মহাস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন (সংস্কার ও সংরক্ষণ, ১০৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য), সেই আচার্য্য শঙ্করেরও তিরোধানের তিথি এই বৈশাখী পূর্ণিমা। সুতরাং এ পূর্ণিমা যে পুণ্যদা তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। ইহার

নীতি ও ধর্ম্ম।

সঙ্গে বুদ্ধ ও শঙ্কর এই দুই যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষের পুণ্য স্মৃতি গ্রথিত। বুদ্ধদেব মানবাত্মাকে বাহ্য আচার নিয়মের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া সেই নৈতিক জীবনের স্বাধীন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যাহা না পাইলে ধর্ম্মজীবন, অধ্যাত্ম জীবন আরম্ভই হয় না। সম্পূর্ণরূপে ভগবানে আত্মসমর্পণই ধর্ম্ম (Religion), আর সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন আত্মপ্রতিষ্ঠাই নীতি (Morality)। নীতিতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে ধর্ম্ম আসে না। যার আত্মপ্রতিষ্ঠা নাই, তার আত্মসমর্পণ কবন্ধের শিরঃপীড়ার ন্যায় অলীক। বুদ্ধের মধ্য দিয়া না গেলে শঙ্করে পৌঁছান যায় না। কিন্তু উভয়ের সম্মিলন কোথায়? নীতি—স্বাধীন আত্মপ্রতিষ্ঠা (Free self-determination)—ইহাই বুদ্ধভাব; ধর্ম্ম—ব্রহ্মে সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ (Absolute self-abnegation in God)—ইহাই শাঙ্কর ভাব। সুতরাং বুদ্ধ যতক্ষণ আছেন, শঙ্কর আসিতে পারেন না। আবার শঙ্কর যখন আসিলেন, বুদ্ধকে সম্পূর্ণরূপেই তিরোহিত হইতে হইবে। তবে উভয়কে কি আমরা একসঙ্গে অভ্যর্থনা করিতে পারিব না? ইহার অর্থ কি এই, যে, মানবের নীতি ও

ধর্ম্ম, Morality ও Religion একসঙ্গে অবস্থিতি করিতে পারে না? এমন তত্ত্ব (Philosophy) কি নাই যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে বুদ্ধ ও শঙ্কর স্বতন্ত্রভাবে কেবল ইতিহাসের আলোচ্য না থাকিয়া একসঙ্গে আমাদের হৃদয়ের অর্ঘ্য গ্রহণ করিতে পারেন? সাধারণ চিন্তাবিহীন মানুষ ধর্ম্ম ও নীতিতে কোন অসামঞ্জস্য দেখে না। কেন না, নীতি তাহার কাছে কতকগুলি বাহ্যিক নিয়ম পালন, বুদ্ধদেব দুর্নীতি বলিয়া যাহা পরিহার করিয়াছিলেন। ধর্ম্মও সাধারণ মানুষের কাছে কতকগুলি নিয়ম পালন। সুতরাং দুই দফা নিয়ম পালনের মধ্যে একটা গুরুতর অসামঞ্জস্য কোন সময়েই তার চক্ষে পড়ে না। কিন্তু নীতি যদি হয় আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং ধর্ম্ম যদি হয় আত্মসম্বরণ (Self-surrender) তবে এক অন্যের বিধ্বংসী হইয়া দাঁড়ায়। উভয়ের সমন্বয় কোথায়? সে মহাতত্ত্ব কি যাহার সুশীতল ছায়ায় বুদ্ধ ও শঙ্কর উভয়েই সঞ্জীবিত হইয়া উঠেন, কেহ কাহাকে বাধা দেন না? এই পুণ্যদা পূর্ণিমা তিথিতে উভয়ের পুণ্যস্মৃতি আমাদের অন্তরে জাগ্রত হইয়াছে, আমরা আজ সেই তত্ত্বের অনুধ্যান করি যাহার সঞ্জীবন স্পর্শে বুদ্ধ ও শঙ্কর একসঙ্গে আমাদের অন্তরে পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠেন। বুদ্ধদেব যে আত্মাকে স্ব-প্রতিষ্ঠ করিয়াছেন, নিয়মের জাল হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন, এবং শঙ্কর যে আত্মার অনুসরণ করিতে যাইয়া আর যা কিছু সব মায়াসাগরে ডুবাইয়া দিয়াছেন— এই দুই এরই সত্তা স্বীকার করিয়া উভয়ের মৌলিক একত্বের (Fundamental unityর) সুস্পষ্ট ধারণাই সেই তত্ত্ব। আমরা সেই তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিব, যাহারই মধ্যে কেবল মানবাত্মার স্বাধীনতা (Free self-determination) ও তাহার ঈশ্বরাধীনতার (Self-surrender to God) সামঞ্জস্য। এই তত্ত্বই কেবল আমাদের বৈশাখী পূর্ণিমার উৎসবকে পূর্ণতা দান করিতে পারে, নতুবা বাহিরের উৎসব বাহিরে পড়িয়া থাকিবে, আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিবে না। উহা শঙ্কর ও বুদ্ধ উভয়েরই অবজ্ঞার বস্তু। এই তত্ত্বেই বুদ্ধ ও শঙ্করের মিলন ও মানবের আধ্যাত্মিক জীবনের সফলতা।

রামমোহনই বুদ্ধ ও শঙ্করের উত্তরাধিকারী

ভারতের আধ্যাত্মিকতার বিবর্ত্তনে যিনি একাধারে বুদ্ধ ও শঙ্করের সাধন-সম্পদের সমাবেশ লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনিও আজ স্বতঃই আমাদের স্মৃতিপথের পথিক না হইয়া প্যারিতেছেন না। তিনি বুদ্ধ ও শঙ্করের সম্মিলন-ভূমি। রামমোহন বুদ্ধনীতির সার কথা মানবাত্মার স্বাধীনতার

ধ্বজা লইয়াই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সে স্বাধীনতার সম্মুখে বাহ্য আচার-ব্যবহারের জাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। তিনি স্বীয় জীবনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে এমন মহিমাময় গৌরব-মুকুটে বিমণ্ডিত করিয়াছিলেন, যাহার নিকটে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজপুরুষও মাথা না নোয়াইয়া নিষ্কৃতি পান নাই। (ইহাই আধ্যাত্মিকতার বিবর্ত্তনে একদিক্‌কার স্থাপন (Thesis)। এই রামমোহনই কিন্তু—"কর অহঙ্কার খর্ব্ব, ত্যজ মন দ্বৈতগর্ব্ব, একাত্মা জানিবে সর্ব্ব অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডময়" বলিয়া পরমাত্মসাগরে সব বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। (ইহাই খণ্ডন Antithesis)। রামমোহনই আবার "যে তোমার আত্মারূপে প্রকাশ সেই ব্যাপ্ত চরাচরে" এই সূত্রে বুদ্ধাত্মা ও শঙ্করাত্মার মৌলিক একত্ব (সমীকরণ Synthesis) হৃদয়ে ধারণ করিয়া মানবের অধ্যাত্ম জীবনের পূর্ণ সফলতার আদর্শ দেখাইবার জন্য নবযুগের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং যে তিথিতে বুদ্ধ ও শঙ্করের তিরোভাব, সেই তিথির উৎসবে আমাদের মধ্যে রামমোহনের উপস্থিতির জল্পনায় ভাব-গত (লজিক্যাল্) পৌর্ব্বপর্য্যায়ের ক্রমভঙ্গ-দোষে দোষী হইব না। বরং ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইহাদ্বারা সে ক্রমের অভীষ্ট নিরবচ্ছিন্নতাই রক্ষিত হইল। তাই আজ রামমোহনকেও স্মরণ না করিয়া পারিতেছি না। * কিন্তু অদ্ভুত, অতি অদ্ভুত এই বাস্তব ইতিহাসের ঘটনা-পরম্পরার সন্নিপাত (Chronological coincidence) আমি যতদূর গণনা করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহাতে বৈশাখী পূর্ণিমা শ্রীরামমোহনের জন্ম-তিথি বলিয়া আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে। রাজার জন্মদিন সৌর জ্যৈষ্ঠমাসে। প্রতি তৃতীয় বর্ষে মলমাসের বৎসরে বৈশাখী পূর্ণিমা জ্যৈষ্ঠের প্রথমে যাইয়া পড়ে। পুরাতন পঞ্জিকার সাহায্যে গণনা করিয়া দেখিয়াছি রামমোহনের জন্ম-বৎসরে বৈশাখী পূর্ণিমা জ্যৈষ্ঠ মাসেই ঘটিয়াছিল। যে তিথিতে ভারতের ধর্ম্ম-বিবর্ত্তনের ইতিহাসের সর্ব্বপ্রধান ত্রিযুগাবতারের স্মৃতি এমন করিয়া একত্র সমাবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাহা যে পুণ্যদা সে কথা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং যাঁহারা রামমোহনের স্মৃতি রক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছেন, যদি তাঁহারা রাধানগরে রামমোহন-সরোবরের তীরে বৈশাখী পূর্ণিমায় রামমোহন-মেলা

* ১৩২৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমার কোন বিশেষ উপাসনার ভাব লইয়া যখন এই প্রবন্ধ রচিত হয় তখন কেবল আধ্যাত্মিক যোগের কথাই মনে হইয়াছিল। জ্যোতিষিক কৌতূহল পরে হইয়াছিল, যদিও অব্যবহিত পরেই।

বসাইতে পারেন তবে রাজার স্মৃতিরক্ষার সঙ্গে বৈশাখী-পূর্ণিমার সৌন্দর্য্যের দিক্‌ও (Picturesque side) বজায় থাকে।

এখন এই সৌন্দর্য্যের দিকের কথাই বলিব। যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত অধ্যাত্ম-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন না, তাঁহাদের কাছে কি এই পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-বিধৌত নীলাকাশের কোন সমাচার নাই? আজ লৌকিক ধর্ম্ম নিয়মে শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোলোৎসব। পুষ্প বাহ্যসৌন্দর্য্যের নিদর্শন। আজ বাহ্য-সৌন্দর্য্যে গা ঢালিয়া দিবার দিন—বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে কোলাকুলির দিন। মানবাত্মার উপর এই পূর্ণচন্দ্রের কি এক অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণী শক্তি আছে, যাহার হস্ত হইতে সাধুমহাত্মাগণও অব্যাহতি পান নাই। এরূপ কথিত আছে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পূর্ণচন্দ্রের দিকে তাকাইয়াই সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিয়াছিলেন। বাহ্য-প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্যকে আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। আমাদের সৌন্দর্য্যবোধের আরম্ভ এই বাহ্য-প্রকৃতিকে লইয়া। ইহাকে মায়ার বন্ধন, সয়তানের খেলা বলিয়া দূরে পরিহার করিবার উপায় নাই। এই বাহ্য-প্রকৃতিকেও আপনার করিয়া লইতে হইবে। যাহাতে আনন্দ পাই, তাহাকে আপনার করা কত সহজ। ঐ সুন্দর ফুলটিকে কত সহজে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আপনার করিয়া লই। এই বাহ্য-প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়াই সর্ব্বপ্রথম আমাদের সুন্দরের সঙ্গে যোগ হয়। সুতরাং এই প্রকৃতিও আমাদের অনুধ্যানের বিষয়। জাতীয় জীবনধারার অভিব্যক্তিতে (প্রাচীন ঋষিগণের উত্তরাধিকার সূত্রে) শঙ্কর 'সত্যং'এর, বুদ্ধ 'শিবং'এর আর কৃষ্ণ 'সুন্দরং'এর বিকাশ। রামমোহনে তিনেরই সমাবেশ। সুন্দরের উপাসনায় রাজা কাহারও পশ্চাতে নহেন। যাহা হউক, কৃষ্ণ নামের (Conceptএর) মধ্য দিয়া সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই অভিপ্রেত ছিল—বিশেষভাবে এই লৌকিক ধর্ম্মের। কিন্তু লৌকিক ধর্ম্ম আপনার সে উদ্দেশ্য (Mission) সুসম্পন্ন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সৌন্দর্য্যের জায়গায় তার উল্টাটাই বা সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছেন! এই অনাসৃষ্টির জন্য, জাতীয় জীবনের সৌন্দর্য্যবোধের ধারা যে অন্ততঃ কিছু পরিমাণে দায়ী, তাহা না স্বীকার করিলে অবিচার করা হইবে। বাহ্যপ্রকৃতিকে ধরিতে যাইয়া আমরা প্রতিপদেই তাহার অতীত হইয়া পড়ি। হয় মায়া বলিয়া উড়াইয়া দি, না হয় ব্রহ্মে লীন করি, না হয় তো এক অর্থ বাহির করিয়া বস্তুটাকে পশ্চাতে ফেলিয়া দি। ঠিক সেটাকে সেইটা বলিয়া কখনও ধরি না। এক কুৎসিৎ চেহারা গড়িয়া তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায়

বসিয়া যাই ; মানুষের ধড়ের উপর এক হাতীর মাথা বসাইয়া দিয়া যুগযুগান্ত ধরিয়া ফিলসফাইজ্ করিয়া আসিতেছি। ভুলিয়া গিয়াছি, সৌন্দর্য্যবোধ ফিলসফি নয়, আর্ট। সৌন্দর্য্য-রস-বেত্তা দার্শনিক নহেন, কলাবিৎ। চির-দিনই 'সুন্দরং'কে 'সত্যং' ও 'শিবং'এর চাপা দিয়া অগ্রসর হইয়াছি, তাই যত অনাসৃষ্টি জমা হইয়া উঠিয়াছে। এ কথা কেহ অস্বীকার করিবে না, সান্ত অনন্তেরই পাদপীঠ, অনন্তের প্রকাশরূপে সান্তকে না দেখিলে ভুল দেখা হইল। কিন্তু এ কথাও কি সত্য নয়, অনন্ত যে একটা বিশেষ আকারে নিজেকে প্রকট করিয়া ইহাকে মহিমান্বিত করিয়াছেন, তাহার সেই বিশেষত্ব-টিকে অন্য নিরপেক্ষভাবে উপলব্ধি না করিলে সেটাকে ভুল দেখা হইল। বিশেষের মধ্যে নির্ব্বিশেষকে দেখা হিন্দু-দৃষ্টি। বিশেষকে বিশেষরূপে দেখিয়া তাহার বিশেষত্বটিকেই পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবার চেষ্টা গ্রীক্ ভাব। এই গ্রীক্ ভাবের ভাবুক না হইলে যথার্থ সৌন্দর্য্যবোধ প্রকাশিত হয় না। যেখানেই সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে তাহা এই ভাবের দ্বারাই ফুটিয়াছে। আমরা প্রধানতঃ এই ভাবের অনুসরণ করি নাই। আমরা আমাদের দার্শনিকের দৃষ্টি লইয়াই অগ্রসর হইয়াছি। সে দৃষ্টি ছাড়িয়া জগতের উপর দৃষ্টিপাত করিতে পারি নাই। কাঠের পা দুখানিকে লম্বা করিয়া ও তদনুপাতে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গড়িয়া এক মানুষের ছবি আঁকিয়া বলিলাম ইনি বুদ্ধদেব, শরীরের অপচয়ে আত্মার উপচয় অর্থাৎ সৌন্দর্য্য সূচিত হইতেছে। কিন্তু এই সৌন্দর্য্যবোধের জন্য সভাষ্য ফিলসফি চাই, এক মল্লিনাথ অবশ্যই প্রায়োজন। এই শ্রেণীর সৌন্দর্য্যবোধকে আমি বলিয়াছি, সত্য ও মঙ্গলের দ্বারা সুন্দরকে আচ্ছাদন করা। সত্য ও মঙ্গলের ন্যায় যে সুন্দরেরও স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা আছে, তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। সুন্দরকে সত্য ও মঙ্গলের পাদপীঠরূপে স্বীকার করিলেই চলিবে না। ঐ ব্যাখ্যার দ্বারাই যদি বুদ্ধদেবের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে হয়, তবে তো এক খানা কেতাব লিখিলেই হইত, ছবি আঁকিবার বা মূর্ত্তি গড়িবার কি প্রয়োজন ছিল! দার্শনিক কলাবিদ্‌কে স্থানচ্যুত করিয়া কলার প্রাণ হরণ করিয়াছেন। আমরা দার্শনিকের চক্ষে জগৎ দেখি বলিয়া আমাদের কাব্যগুলিতেও এত দর্শন জমাট্ বাঁধিয়া গিয়াছে, যে অন্য দেশের দর্শনেও এত দর্শন আছে কি না সন্দেহ। অবশ্য, প্লেতোর Dialogues গুলি প্রধানতঃ কাব্য কি দর্শন সে বিষয়ে পণ্ডিতগণ মতদ্বৈধ প্রকাশ করিয়াছেন। Inge তাঁর Gifford

Lecturesএ, (1917—1918), প্লেতোর সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "No system can be had in his writings· He was a poet and prophet."। সুতরাং আমাদিগকে কলাবিদের দৃষ্টিতেই বাহ্য জগতের উপর দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। নতুবা সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিব না। আবার, এই সুসভ্য কলাবিদের দৃষ্টিই বাহ্য জগৎকে গ্রহণ করিবার একমাত্র পন্থা নহে। সেই জন্য, একটু পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা থাকিলেও, আমরা কত ভাবে বাহ্য জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারি, তাহারই একটু আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম-সাধন। প্রকৃতি সর্ব্বদা একরূপে অবস্থান করে না। হ্রাসবৃদ্ধি রহিয়াছে। আদিম মানব আদিতেও করিয়াছিল, এবং এখনও এই বৃদ্ধি ও অভ্যুদয়ের সময়ে (The season of exuberance in nature) আনন্দে আত্মহারা হইয়া প্রকৃতির মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া প্রকৃতিরই অঙ্গীভূত হইয়া তাহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করে। প্রকৃতিরই মধ্যে সে আত্মলাভ করে, প্রকৃতির এই উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়াই আপনাকে বিকশিত করে। সে আপনাকে প্রকৃতির সঙ্গে এক বলিয়া ধরিতে পারিয়াছিল, তাই তাহার মধ্যে বিশ্বপ্রীতি ফুটিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম আমাদিগকে সর্ব্বজীবে মৈত্রী শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনের বিশ্বমৈত্রীর ভাব আমরা আমাদের এই আর্য্যপূর্ব্ব আদি পিতৃপুরুষের নিকট পাইয়াছি। মানুষ যতই সভ্যতামার্গে অগ্রসর হইয়াছে, ততই সে প্রকৃতির ক্রোড়-ভ্রষ্ট হইয়া এই সৌন্দর্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। আবার স্রোতের আবর্ত্তনে সহরবাসী সুসভ্য মানব প্রকৃতির অনুকরণে সৌন্দর্য্যচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু আদিম মানবের দানের কথা ভুলিলে চলিবে কেন? এই যে আমাদের দোল হিন্দোল রাস পুষ্পদোল শারদোৎসব সকলই তো এই প্রকৃতির অভ্যুদয়কালীন আনন্দোচ্ছাস। কিন্তু আমরা এখন হইয়াছি ফিলজফার, তাই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় লাগিয়া গিয়াছি। বহিপ্রর্কৃতির সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ শকুন্তলার আশ্রম-ত্যাগকালীন পশুপক্ষী বৃক্ষলতাদির সঙ্গে যে সপ্রেম সম্ভাষণ, তাহা স্মরণ করিয়া ইটপাটকেল ও কতকগুলি অভ্যস্তকর্ম্ম-পিঞ্জরাবদ্ধ আমাদের সহরবাসী সুসভ্য আত্মাকে কি নিতান্তই খাট বলিয়া মনে হয় না?

দ্বিতীয়তঃ, মানুষ নিজেই নিজের বিশেষ অবস্থায় প্রকৃতির সঙ্গ লাভ করিবার জন্য লালায়িত হয়। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে এখনও প্রথা আছে, যে দীক্ষা গ্রহণের পর বনে প্রস্থান করে ও প্রকৃতির

সঙ্গসাধনে লিপ্ত হইয়া থাকে। উপনয়নের পর আমাদেরও ব্রাহ্মণ কিছু দিন প্রকৃতি-চর্চ্চায় নিযুক্ত হন; ইহা নিশ্চয়ই সেই আদিম পিতৃপুরুষগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

তৃতীয়তঃ, গ্রীকৃভাবে প্রকৃতি-সাধন। ইহার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। বিশেষকে বিশেষরূপে দেখিয়াই তাহার সঙ্গে একত্বসাধন, তাহার প্রাণ ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রবেশ ও তাহার উপলব্ধি। একটি ফুল লইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা তাহাকে গ্রহণ ও উহারই মত সুন্দর, উহারই মত কোমল হইয়া উঠিবার চেষ্টা। হিন্দুভাবের ন্যায় উহাকে সমগ্রের মধ্যে ডুবাইয়া দিবার প্রয়াস নহে। এমন যে প্লেতো যিনি পাশ্চাত্য অধ্যাত্মবাদের (Idealism) জনক, তাঁহারও আইডিয়া (Concept) গুলি যেন কাঁটাছাটা এক একটি বিশেষ (Particular), বিষয়-জগতের (Objective world) এক একটি অঙ্গ। বিশেষত্বনিষ্ঠ গ্রীক্ প্রকৃতির আওতায় (Environment) মধ্যে আর কিছুর আশা আমরা করিতেই পারি না। প্লেতো হিন্দু হইলে তাঁর দর্শন কখনও ঐ আকার ধরিত না।

চতুর্থতঃ, প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ও তাহাদের সম্বন্ধকে আমাদের অধ্যাত্ম জীবনের অভিব্যক্তির নিদর্শনরূপে দেখিতে পারি। যেমন সূর্য্যোদয়কে আত্মার উদ্বোধন স্বরূপ ধরা যাইতে পারে। এখানেও প্রকৃতির বস্তুগত-সত্তাকেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধ্যান করিতে হইবে, গ্রহণ করিতে হইবে, উপভোগ করিতে হইবে। আমরা জানি সূর্য্য উঠে, কিন্তু কয়দিন সূর্য্যোদয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি? পাহাড়ের পশ্চাদ্দেশ হইতে সূর্যোদয়ের মহামহিমা, সমুদ্রে সূর্য্যাস্তের বিষাদপূর্ণ গাম্ভীর্য্যের মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিক অভ্যুদয়-ব্যসনের উপলব্ধি সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, আগে এই ঘটনা-নিচয়ের সৌন্দর্য্য গ্রহণ করিবার শক্তি-সঞ্চয় চাই। অন্যদিকে, অধ্যাত্ম দৃষ্টিরও উদ্বোধন করিতে হইবে। কুজ্ঝটিকাবসানে কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্র গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সৌন্দর্য্য দর্শনে সপ্ততিপর বৃদ্ধকেও হাততালি দিয়া নৃত্য করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু সন্দেহ-কুয়াসা-মুক্ত আত্মা জ্ঞানের আলোক দেখিয়া যে এমনি আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিবে এই উপমায় কয়জন উক্ত পরিচিত স্বভাবের শোভার মধ্যে ডুবিয়া তাহা উপভোগ করিয়া থাকেন!

পঞ্চমতঃ, সমগ্র বাহ্য প্রকৃতিকে মহাপ্রাণের এক অখণ্ড লীলা বলিয়া

দর্শন। মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিয়া নহে, রজ্জুতে সর্পভ্রম বলিয়া নহে, জগৎকে ব্রহ্মে লীন করিয়া দিয়া নহে, কিন্তু ইহাকে এক জীবন্ত জাগ্রত মহাপ্রাণের বাস্তব খেলা, তাঁহার প্রাণের অভিব্যক্তি, প্রাণের তরঙ্গ বলিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। প্রতি স্পর্শে তাঁহারই স্পর্শ, প্রতি দর্শনে তাঁহারই দৃষ্টি, প্রতিকর্ণে তাঁহারই শ্রুতি। তিনি ইহারই মধ্যে পূর্ণরূপে আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন। ইহা তাঁহারই প্রাণের খেলা। পদ্মগন্ধে তাঁরই গাত্রগন্ধানুভূতি, দাবানল-দর্শনে 'ভগবানের বহ্ন্যুৎসব' বলিয়া হাত তালি দিয়া নৃত্যের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য তা কি অনির্ব্বচনীয় নহে? এইরূপে বাহ্য জগৎকে বাস্তব সত্তা রূপে গ্রহণ করিয়া, বিশেষকে উড়াইয়া না দিয়া কিন্তু তাহার বিশেষত্বকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া যদি আমরা অনন্তের অন্বেষণে ছুটি তবেই আমাদের তপস্যা আমাদিগকে পূর্ণ ব্রহ্মের চরণতলে উপনীত করিবে। অন্য কোন পথে যদি যাই, জাতীয় জীবন যাহার সাক্ষ্য একাধিকবার দিয়াছে—আমরা পৌছিব গিয়া মহা শূন্যতায়। তাই মনে রাখিতে হইবে, জগৎটা মায়ার খেলা নয়, প্রেমের লীলা।

প্রেমের গতি সৌন্দর্য্যের দিকে। তাই, প্রকৃতির গাত্রে, তার মুখচোখ দিয়া সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সেই পরম সুন্দর যে স্বহুস্তে আপনার চিত্র আপনি আঁকিয়া তুলিতেছেন! তাই জগৎ সুন্দর। প্রশ্ন এই, এই বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদে ও ফুলে কি কেহ সেই সুন্দরকে দেখিলেন না? কবি উত্তরে গাহিয়া উঠিলেন—

তুমি সুন্দর, তাই তোমার বিশ্ব সুন্দর শোভাময়।
তুমি উজ্জ্বল, তাই নিখিল দৃশ্য নন্দন-প্রভাময়।

নবম অধ্যায়

সর্ব্বব্রহ্মবাদে

শঙ্কর ও স্পিনোজা

শঙ্কর যাঁহাকে বলিয়াছেন 'সত্যম্, স্পিনোজার ব্রহ্ম (Substance) ঠিক তাঁহারই অনুরূপ। এই বস্তুতে স্থূলত্ব, সূক্ষ্মত্ব, বহুত্ব—কোন ভেদ আরোপিত হইতে পারে না। যাহা কিছু সান্ত সসীম আকারবিশিষ্ট তাহার পরিবর্জ্জনের দ্বারা ইহার একত্বে ও অনন্তত্বে উপনীত হইতে হইবে। যাহা বুঝিতে গেলে আর-কিছুর প্রয়োজন, ঐ 'আর-কিছু'র দ্বারা উহা সীমাবদ্ধ, পরিচ্ছিন্ন, পরিমিত (determined), সুতরাং উহা সান্ত। এই সান্তকে পরিহার করিতে পারিলেই অনন্ত বস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ হইবে। সুতরাং স্পিনোজার কাছেও 'নেতি'র দ্বার দিয়াই ব্রহ্ম-বস্তুতে উপনীত হইতে হইবে। আমরা যে এই-সব পরিমিত বস্তুজাত দেখিতেছি, ইহাদের সীমা তো কল্পনাপ্রসূত (আমরা প্রায় শঙ্করের মায়াবাদের কাছা কাছি আসিয়া পৌঁছিলাম)! এই মহাদেশের (Space) কথা ভাব না কেন,- ইহা এক অখণ্ড বস্তু। ইহার মধ্যে যে তোমরা অসংখ্য ঘট পট দেখিতেছ, যাহা এক আরকে সীমাবদ্ধ করিতেছে, তাহা তো তোমার কল্পনা (abstraction); এক দেশখণ্ড বাস্তবিক আর দেশখণ্ড হইতে কখনও পৃথক্ নহে, তাহাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই। সুতরাং ঘটপটাদি সসীম বস্তুসকল সব মিথ্যা। এই মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া ধরিতে পারিলেই সব ভেদ বিলুপ্ত হইবে, অভেদাত্মক সত্যবস্তুতে যাইয়া পৌঁছিবে। এবং সসীমের সীমা সরাইয়া দিলেই তো উহা অসীম হইল। স্পিনোজা এইরূপে পরিমিত যাহা কিছু লইয়া এই বিশ্বসংসার সকলই ব্রহ্মে বিলীন করিয়া দিয়া 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'এ পৌঁছিলেন। এই নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত যদিও অন্য কিছু দ্বারা বিশিষ্ট নহেন, কিন্তু সকল বিশেষত্বকে ইনিই জন্ম দিয়াছেন। সকল বিশেষত্বকে একে একে নির্ম্মূল করিয়া যে ভাবে তিনি নির্ব্বিশেষে উঠিয়া গিয়াছেন, সেখান হইতে বিশেষত্বের নিদানরূপে এই নির্ব্বিশেষে —আবার এই বিশিষ্ট জগতে—অবতরণ করিতে পারেন কি না, সে বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে স্পিনোজার ব্রহ্ম

অনন্ত স্বরূপে (Attributes) প্রকাশিত এবং প্রত্যেক স্বরূপের আবার অনন্ত প্রকার (Modes) ভেদ। আমরা আমাদের বুদ্ধি দ্বারা যাহা ব্রহ্ম-বস্তুর বস্তুত্ব (Essence) বলিয়া গ্রহণ করি তাহাই স্বরূপ। আমাদের কাছে তাঁর মাত্র দুইটি স্বরূপ—জীব (Thought) ও জগৎ (Extension) ধরা পড়িয়াছে। আর কত জগতে কত জীবের কাছে কত স্বরূপ অভিব্যক্ত, তাহা কে জানে? ব্রহ্ম এই স্বরূপগুলির সমষ্টি নহেন—কেন না, তাহা হইলে তো ব্রহ্মের মধ্যে অন্ততঃ স্বগতভেদই আসিয়া গেল। শঙ্করেরই ন্যায় স্পিনোজাও স্বগতভেদও মানেন না। প্রত্যেক স্বরূপই সমগ্র বস্তুকে প্রকাশ করিতেছে। জ্ঞান-জগৎ গুণে ও পরিমাণে যাহা প্রকাশ করে, বিষয়-জগৎও তাই। উহারা একই বস্তুকে দুই দিক্ হইতে দেখার ফল। সুতরাং যদি কিছু ভেদ ঘটে তাহা বস্তুর নয়, দ্রষ্টার দৃষ্টিভেদ। কিন্তু আমরা যে দৃষ্টি দিয়া দেখি তাহা তো জ্ঞানস্বরূপেরই একটি প্রকার মাত্র। সুতরাং স্বরূপ যদি আমাদের দৃষ্টিজনিত ভেদ হয়, তাহা হইলে এখানে অন্যোন্যাশ্রয় (*petitio principii*) হেত্বাভাস হইল না কি? স্পিনোজাকে চাপিয়া ধরিলে তাঁহার চিন্তাধারার বিশিষ্টতা রক্ষার জন্য তাঁহাকেও শঙ্করেরই ন্যায় এক 'মায়া'র আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। কিন্তু কেহ তাঁহাকে চাপিয়া ধরে নাই, তিনিও এতদূর উঠিয়া বা তলাইয়া দেখেন নাই। তাই তাঁর দর্শন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"বাদে পৌঁছিয়াছে এবং তাঁহার অদ্বৈতত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। যে পরিমিত বিষয় সকলের আপনার দিক্ হইতে কোন বাস্তব সত্তা নাই, তাহারা স্বয়ম্ভূ স্বপ্রতিষ্ঠ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহারই মত অনশ্বর হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, ইহাদের মধ্যেই তাঁহার স্থান। এক দিকে সকলই ব্রহ্মে বিলীন, অন্য দিকে ব্রহ্ম সকলে প্রকাশিত। ব্রহ্ম এই বিশ্বে অন্তর্নিবিষ্ট (Immanent), আবার এই বিশ্বচরাচর এই ব্রহ্মে অনুপ্রবিষ্ট। "সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং", কিন্তু ব্রহ্মও আবার বিশ্বের মন্দির—এ বিশ্ব তাঁর বাহিরে নহে। জগৎকে ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে তার অস্তিত্ব থাকে না সত্য, এই জগতে আপনাকে না রাখিলে ব্রহ্মও থাকেন না, এ কথাও তেমনই সত্য। যে চিন্তা-পরম্পরার সাহায্যে স্পিনোজা পরিমিত জগৎ ব্রহ্মে বিলীন করিয়া দিয়াছেন এবং যাহার সাহায্যে জগৎকে তিনি ব্রহ্ম হইতে পুনরায় বাহির করিয়াছেন, এ দুই ধারাই তাঁহার তত্ত্বের পক্ষে অপরিহার্য্য।

কিন্তু শঙ্করের তত্ত্বের দিক্ হইতে জগৎসমস্যার এই মীমাংসা সম্ভব ছিল না। আমাদের প্রাচীন দার্শনিকগণ তিন রকমে জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন। (১) ঘটের সঙ্গে মৃত্তিকার, (২) দধির সঙ্গে দুগ্ধের, ও (৩) সর্পের সঙ্গে রজ্জুর। মায়াবাদিগণ এই তৃতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। রজ্জু যেমন ভ্রমবশতঃ সর্প বলিয়া মনে হয়, মায়া-প্রভাবে ব্রহ্মকেই জগৎ বলিয়া মনে হইতেছে। এই মায়া কি পদার্থ তার ব্যাখ্যা নাই, এবং ইহা ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু বলিয়া এই মায়া বা অবিদ্যাস্পর্শে শঙ্করের শুদ্ধাদ্বৈত তত্ত্বের অদ্বৈতত্ব ব্যাহত হইয়াছে। এক দিকে জগৎ-ব্যাখ্যায় ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুর প্রয়োজন হইতেছে, অন্য দিকে এই 'কিছু' অবোধ্য (Irrational), সুতরাং জগৎ-কারণের একত্ব, জ্ঞানস্বরূপত্ব সকলই ব্যাহত হইতেছে। অবশ্য, প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিকশ্রেষ্ঠ প্লেতো ও এরিস্ততল্‌ও এই খুঁৎ-বিরহিত হইয়া জগৎ ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হন নাই। অবশ্য, তাহাতে শঙ্করের দোষ স্খালিত হইতেছে না। যাহা হউক, শঙ্কর এমন নির্ম্মমভাবে তাঁহার ব্রহ্মবস্তু হইতে সসীম ও পরিমিতকে বর্জ্জন করিয়াছেন, যে আর কোনরূপেই অসীমের মধ্যে সসীমের স্থান হইতে পারে না। তাঁহার 'এক' বহুর স্পর্শে বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং ব্রহ্মে ভেদ বা বহুত্বের স্থান নাই। "ব্রহ্মই বহুরূপে আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন"—কোন অর্থেই শঙ্করের তত্ত্বে ইহার স্থান নাই। সুতরাং এ একত্ব বহুর অণুপরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বহুকে এক করিবার একত্ব নহে, মণির মধ্যস্থিত সূত্রের একত্বও নহে, ইহা বহুকে অস্বীকার করিয়া বহুর বাহিরের এক কল্পিত (abstract) একত্ব। যদি কোনও রূপে ইহাকে জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত করা যায়, তবে তাহা বাহিরের নিদান রূপে—যেমন রজ্জু সর্পের নিদান—কিন্তু অন্তর্নিহিত বীজশক্তি বা কর্ত্তৃ-শক্তিরূপে নহে। মায়াবাদীর ব্রহ্ম যে জগতের কারণ তাহা কোন প্রকারের অন্তরঙ্গ যোগ নহে, কেবল একটা নিতান্ত বাহিরের সম্বন্ধ। ব্রহ্ম হইতেই এক অর্থে জগৎ উৎপন্ন হইতেছে বটে, জগতের ব্যাখ্যায় ব্রহ্মকে উল্লেখ করিতে হইবেই, সন্দেহ নাই; কিন্তু ব্রহ্মবস্তুর মধ্যে জগতের স্থান নাই। কোন অর্থেই তিনি জগৎকে আপনার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লইতে পারেন না। কি জীব, কি জগৎ—কেহই ব্রহ্মের বিভূতি (attribute) নহে। ব্রহ্মাতিরিক্ত সসীম সকল-কিছুরই অস্তিত্ব অবাস্তব, অথচ তাহা ব্রহ্মের অন্তর্ভূতও হইবে না। যাহা কিছু সত্তাবান্ তাহা ব্রহ্মের বাহিরে থাকিতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্ম

সর্ব্বব্যাপী। সর্ব্বব্যাপী হইয়াও তিনি সসীম বিশিষ্ট জগতের বাহিরে পড়িতেছেন, সুতরাং এই জগৎ যে একটা স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতেছে তাহা অস্বীকার করা যায় না—সে স্বাতন্ত্র্যটা যতই অকেজো হউক না কেন। এই অসামঞ্জস্য হইতে শাঙ্কর দর্শনের নিষ্কৃতি নাই। আর জীব! সে তো ব্রহ্মই। তবে যে পরিমাণে সে আপনার 'আমি-ব্রহ্ম'ত্ব প্রমাণ করিবার জন্য সকল ছাড়িতেছে, সাধন ভজন করিতেছে, সেই পরিমাণেই সে প্রমাণ করিতেছে, সে ব্রহ্ম নহে। এক দিকে দেখিতেছি, 'জীবো ব্রহ্মৈব কেবলম্,' অথচ ব্রহ্মের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধই নাই—সম্বন্ধ হইবে ঠিক যখন তার জীবত্ব নষ্ট হইবে অর্থাৎ যখন সম্বন্ধ স্থাপনের সম্ভাবনা থাকিবে না। আর ব্রহ্ম! যে জীব তাঁহা হইতেই আসিয়াছে সেই জীবের মধ্যে তাঁর স্থান নাই, তাহা হইতে তিনি চিরবিচ্ছিন্ন। জীবত্ব যখন কাটিয়া গেল তখন তো কেবল ব্রহ্ম। আগেও ব্রহ্ম পরেও ব্রহ্ম—মধ্যখানে একটা বিকট স্বপ্ন। স্বপ্নের কারণ মায়াফলভক্ষণজনিত বদ্‌হজ্‌মি। মায়া কি?……চুপ্! (পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়দ্বয় দ্রষ্টব্য)।

পরিপূরক (গ)

মায়াবাদ ও অদ্বৈত-তত্ত্ব

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন কর, ১৩২৮এর ভাদ্রের "নারায়ণে" আমার সমালোচনা করিয়াছেন। অবশ্য আমার ভ্রান্তি দেখানই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি যে সব প্রমাণাদি উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে আমি আমার কথার সমর্থন লাভ করিয়া হৃষ্ট হইয়াছি। আর সকলকে সে হর্ষের ভাগী করিতে হইলে তলাইয়া বিচার করিতে হইবে। কিন্তু বিচারগৃহের প্রবেশ-দ্বারে এক-গাদা fallacyতে আমি ঠেকিয়া পড়িলাম। সেগুলি সরাইতে হইবে।

প্রথম, *Argumentum ad populum*, আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির উপর তো দেশের এক শ্রেণীর লোক হাড়ে চটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং প্রতিপক্ষের মতটা প্রচলিত শিক্ষার কুফল বলিয়া প্রচার করিয়া দিলে অতি সুলভে যে একটা এক-তরফা ডিক্রি নির্ব্বিচারে বা অবিচারে পাওয়া যায়, উপেন্দ্রবাবু এ প্রলোভনটা সম্বরণ করিতে পারেন নাই, তা তিনি যতই সাধনভজনশীল ত্যাগী ও জড়বুদ্ধি-বিহীন (!) হউন না কেন। বিচারের শেষে কথাগুলি বলিলে না হয় একটা সার্থকতা পাওয়া যাইত। কিন্তু প্রথমেই ইহার অবতারণায় পাঠকবর্গকে

প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই। উপেন্দ্রবাবু ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যা ও দার্শনিক তত্ত্বভাণ্ডারকে এত শূন্যগর্ভ মনে করিলেন কেন, যে বিশেষ কোন অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ গ্রহণ না করিলেই সেখান হইতে আর কিছু গ্রহণ করিবার থাকিল না? শঙ্করের মায়াবাদ কি সে ভাণ্ডারের শতরত্নের একটী রত্ন নহে? দেশে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার বহুশতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই কি সেই ভাণ্ডারে মায়াবাদের শত প্রতিবাদ সঞ্চিত হইয়া নাই? বঙ্গদেশ তো মায়াবাদ ধার করিয়াছিল মাত্র। মায়াবাদের জন্মস্থানে ইহার তীব্র প্রতিবাদাত্মক বাদ-সকল পাশাপাশি বিরাজ করিতেছে না কি? সমালোচক মহাশয় কি খবর রাখেন না, যে দাক্ষিণাত্যে অদ্বৈতবাদী দ্বৈতবাদীর জল স্পর্শ করে না! যাঁহারা বলিয়াছিলেন, "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং * বুদ্ধমেব তৎ" তাঁহাদের মাথাও কি ইংরাজী শিক্ষায় বিকৃত হইয়া গিয়াছিল? উপেন্দ্রবাবু কি ভুলিয়া গিয়াছেন, যে এই বাঙ্গালাতেই সাত দিন বেদান্তের মায়াবাদী ব্যাখ্যা করিয়া কোন সাড়া না পাইয়া সার্ব্বভৌম যখন বলিলেন:

"তুমি শুনি শুনি রহ মৌনমাত্র ধরি॥
(ইহার উত্তরে) প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল॥
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
তুমি ভাষ্য কহ সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সংশয়চ্ছেদি বাক্যে চৈতন্যদেব উত্তর দিলেন:

"জীবনিস্তারের হেতু সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥

তারপর আরও আছে—

"আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর আজ্ঞা হৈল॥"
অতএব **কল্পনা** করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥" (চৈঃ চঃ)

আমরাই দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ কল্পনা শব্দটাকে বড় করিয়া দিলাম। আশা করি উপেন্দ্রবাবুও বোধ হয় এখন আর সাহস করিয়া বলিতে পারিবেন না, যে তাঁর

* বৌদ্ধ শূন্যবাদ হইতে কেমন করিয়া মায়াবাদ আসিয়াছিল তাহার ইতিহাস উদ্ঘাটন করিতে যাইয়া পণ্ডিতবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন, "বৈষ্ণবেরা শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে; কিন্তু শঙ্কর প্রচ্ছন্ন নয়, স্পষ্ট বৌদ্ধ ছিলেন।" (প্রবর্ত্তক, কার্ত্তিক, ১৩৩০)। উপেন্দ্রবাবু কি বলেন?

'নেতি' শাস্ত্র গ্রহণ করিতে না পারিলেই তাহা জড়বাদীর ধারণামাত্র হয়, অথবা চৈতন্যদেবও পাশ্চাত্য জড়বাদের প্রভাবে আত্মকেন্দ্রচ্যুত হইয়া মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। আর, পাশ্চাত্য শিক্ষাতেও যে মানুষ শ্রদ্ধাহীন হয় না, তার প্রমাণ তো উপেন্দ্রবাবু নিজেই। তবে এ স্ববিরোধ (Self-contradiction) তিনি করিলেন কেন? আমারও বিশ্বাস ও বন্ধুরাও তাই বলিয়া দিলেন, যে তিনি কোন অ-ইংরাজী টোলের অধ্যাপক নহেন। অথবা অনুমানেরও প্রয়োজন নাই। প্রত্যক্ষ প্রমাণই বর্ত্তমান। তিনি বিলাতে আপিল করিয়াছেন। সুতরাং ইংরাজীপ'ড়ো হইলেই যে শ্রদ্ধাহীন হইতে হয়, তিনি নিজেই তাঁর সে কথার মূর্ত্তিমন্ত প্রতিবাদ!

দ্বিতীয় fallacy, এই বিলাত আপিলটা। আমি এ কথা বলি না, যে আমাদের আলোচনায় স্বমতপোষক কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের যুক্তি আমরা ব্যবহার করিব না! কিন্তু এ আপিল তা নয়। ইহা স্বমতের স্বপক্ষে বিলাতী পণ্ডিতের প্রশংসাপত্র, যুক্তি নয়! কিন্তু উপেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁর একখানা সার্টিফিকেটের জায়গায় যদি আমি পাঁচখানা নিন্দাপত্র প্রকাশ করি, তাহ'লে কি তিনি পরাজয় স্বীকার করিয়া গৃহে ফিরিবেন? তা যখন নয়, তখন ইহার নাম দিলাম আমি বিলাত-আপিল-fallacy। এক শ্রেণীর পাঠকের অজ্ঞতাকে আলোচনা-বাণিজ্যের মূল ধন করা হয় বলিয়া ইহাকে *Argumentum ad ignorantiam* বলাও চলে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সার্টিফিকেটে ফল ফলিয়াছে বিপরীত! তিনি স্বমত-পোষক বলিয়া মোক্ষমূলরের শরণাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নজির তাঁহারই বিরুদ্ধ পক্ষ স্থাপন করিতেছে। তৃতীয় fallacy সুতরাং সোজাসুজি *Ignoratio elenchi.* আমি "জড়বুদ্ধি" বশতঃ বুঝিতে পারিলাম না, উপেন্দ্রবাবু এ উক্তিটি উদ্ধার করিলেন কেন? * পণ্ডিত-প্রবর মোক্ষমূলর প্রশংসা করিয়াছেন 'The True Vedánta Philosophy'র, বেদান্ত ফিলসফি মাত্রেরই নয়। আমরা দেখিয়াছি, চৈতন্যদেব নিজেকে বেদান্তবাদী বলিয়াও শঙ্কর-বেদান্তকে নাস্তিকতাদোষে দুষ্ট করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কোন্‌টা True Vedánta?

* It (*The True Vedánta Philosophy*) rests chiefly on the tremendous synthesis of the subject and object, the identification of cause and effect, of the "I" and the "It". উপেন্দ্রবাবু-ধৃত মোক্ষমূলরের বচনের কিয়দংশ।

একটা অবশ্যই false. কোন্‌টা true, তা পণ্ডিতবর স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিয়াছেন, অর্থাৎ যে বেদান্তে Subject ও Objectএর সমন্বয় আছে—'কার্য্য-কারণ' এবং 'অহং ইদং'এর একত্ব আছে। সমালোচক মহাশয় বুঝিতেই পারেন নাই, যে মোক্ষমূলর যাহাকে বলেন True Vedánta তাহা তাঁহার মায়াবাদ-বিধ্বংসী। এই জন্যই তো বলিয়াছি, উহা *ignoratio elenchi*. মোক্ষমূলর স্তুতি বা করিলেন কার, সে স্তুতি গ্রহণ বা করে কে? সে কালের সেই শীতলাবাহীরও এই ভ্রম ঘটিয়াছিল। এই ভ্রান্তিটিকে 'লম্বকর্ণ-ন্যায়' নাম দেওয়া যাইতে পারে। শঙ্কর-বেদান্তে Subject সৎ, Object অসৎ। 'অহং'এর স্থাপনা আছে, 'ইদং' নিরাকৃত। মায়াবাদের ব্রহ্ম কার্য্যও নহেন, কারণও নহেন। একটা 'হাঁ', একটা 'না', অথবা দুইটা 'না' একত্র যোগ করিলে একটা 'tremendous' শূন্য পাওয়া যাইবে না কি? Synthesis হ'ল উত্তম! সাধে কি শ্রীচৈতন্য মায়াবাদকে নাস্তিক্যবাদ বলিয়াছেন। তবে সে কথা পরে। আচার্য্য শঙ্কর আরম্ভও করিয়াছেন **এক** লইয়া, শেষও করিয়াছেন **একে**, দুই কোথায় যে Synthesis হইবে? তাঁর উপর Synthesis আরোপ করিতে গেলে, তাঁর মহনীয় বুদ্ধিমত্তার উপর যে একটা "tremendous" কটাক্ষ করা হয় তাহা কি উপেন্দ্রবাবু একবারও ভাবিয়া দেখিবার অবসর পান নাই? তবে তিনি নিজে যে একটা সমন্বয় গড়িয়াছেন, তাহা কতটা তাঁর নিজেরই মতের সঙ্গে সুসঙ্গত ও যুক্তিসহ তাহা যথাস্থানে বিচার করা যাইবে। চতুর্থ fallacy তাঁর *Argumentum ad baculinum*, "তর্কেতে অন্ততঃ সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো।" যুক্তির অভাব গালাগালি দিয়া পূরণ, অর্থাৎ 'No case, abuse the plaintiff's attorney'. নমুনা দেখুন—"আধুনিক জড়বাদের সুরসাল ফল ভক্ষণ" যেন প্রাচীনকালে চার্ব্বাক্ দর্শন হয় নাই। "অমার্জ্জিত বুদ্ধি" "স্থূলদর্শী" 'অবিদ্যার দাস''—উপেন্দ্রবাবু অবশ্য বিদ্যার পার দর্শন করিয়াছেন, নতুবা অন্যের অবিদ্যা ধরেন কিসের জোরে? আরও আছে—"পাশ্চাত্য জড়বাদের প্রভাবে আত্মকেন্দ্রচ্যুত" "মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাহীন" ইত্যাদি। ৫ম fallacy, *Argumentum ad verecundiam*. তিনি এক জায়গায় ধমক্ দিয়া বলিয়াছেন, জগন্মান্য ঋষিদিগের কথা না মানিয়া অবিদ্যার দাস তোমার কথা মানিব? আমি যেন এরূপ ধৃষ্টতার কাজ বাস্তবিকই করিয়াছি। যাঁহারা সকলের শ্রদ্ধার পাত্র আমি তাঁহাদেরই উপরে আপনাকে স্থাপন করিতে চাহিতেছি, এই ভাব শ্রোতৃবর্গের মনে উদ্রেক করিয়া দিতে পারিলে সহজেই যে আমার উপর

তাঁর জয়লাভের আশা আছে, এই অভিসন্ধি তাঁর "বিদ্যা"র ঠ্যালা খাইয়া মনের এক কোণে যাইয়া লুক্কায়িত যে নাই সে বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম না। উপেন্দ্রবাবু মনে রাখিবেন, এ দেশের বামাচারী তান্ত্রিকগণও উপনিষদের ঋষির দোহাই দিয়াই আপনাদের অনাচারগুলি চালাইয়া দিয়াছিল। উপনিষদ্ তো বে-ওয়ারিশ্ মাল। এ দেশের বিরুদ্ধ সম্প্রদায় সকলে একই শ্লোককে আপনাদের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা বা কু-ব্যাখ্যা করিয়া চিরদিন শ্রুতির সম্মান রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যের হুবহু দ্বৈতবাদ-পক্ষীয় ব্যাখ্যাও বহুদিন হইল চলিয়া আসিয়াছে। সকল সম্প্রদায় ইহাকে মহাবাক্যও বলে না ("তত্ত্বমসি জীবহেতু প্রাদেশিক বাক্য"—চৈঃ চঃ)। মায়াবাদীর ব্যাখ্যাই কি সকলে স্বীকার করে? চৈতন্যদেবের সাক্ষ্য গ্রহণ করুন—

"মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা!
অভিধা বৃত্তি ছাড়ি শব্দের করহ লক্ষণা॥
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যেই অর্থ কহে সেই সে প্রমাণ॥
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্য-মেঘে করে আচ্ছাদন॥ (চৈঃ চঃ)

এখন উপেন্দ্র বাবু বুঝুন, তিনি যে ভাষ্যাঞ্জন-স্পর্শে রাহু মুক্ত করিয়া পূর্ণ-চন্দ্র দেখার বাক্যচ্ছটা বিস্তার করিয়াছেন, চৈতন্যদেব সেই ভাষ্যকে সূর্য্যেরও আবরক মনে করেন। সুতরাং ভাবিয়া দেখুন, যুক্তি ছাড়িয়া authorityর উপর নির্ভর কতদূর নিরাপদ। শঙ্কর যে "সচ্চিদানন্দ" শব্দের তিন অংশে একার্থ আরোপ করিয়া স্বগতভেদও নিরসন করতঃ নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত তত্ত্ব স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন, বৈষ্ণব বেদান্ত কিন্তু সেই স্থানে তিনে-এক-একে-তিন-রূপ দ্বৈতাদ্বৈত প্রমাণ করেন—

স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
নিঃশক্তি করিয়া তাঁরে করহ নিশ্চয়॥
সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ॥ (চৈঃ চঃ)

সুতরাং উপনিষদকে স্বমতোপযোগী করিয়া ব্যাখ্যা করিলেই হইবে না, সে ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত কি না, তাহাই প্রধানভাবে দেখিতে হইবে। কেবল যে প্রাচীনেরাই মায়াবাদী ব্যাখ্যা স্বকপোল-কল্পিত বলিয়া দোষ দিয়াছেন, তাহা

নয়। নবীনেরাও এই অপবাদ দিতে বাধ্য হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বেদান্তরত্ন, যাঁহার শ্রৌত শাস্ত্রে প্রবেশ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই এবং যাঁহার কোন দর্শনটোলের বিশেষ মতামতের বিপক্ষতা বা পক্ষপাতিতা করিবারও গরজ্ বা বালাই নাই, জুলাই মাসের Modern Reviewতে "*Jiva'twan in the Brahma Sutras*" এই গ্রন্থের সমালোচনায় বলেন—"If primality and finality be attributed to the Sutras, S'ankara's Commentary will, we admit, appear in some places as forced and artificial. But if the Upanishads be accepted as primal and final, we must, in many places, charge Ba'dara'yana and S'ankara (both ?) with misrepresentations. The Vaishnava Theologians could not accept the absolute monism of the Upanishads and so had to depend upon Ba'dara'yana. If he did not suit them, they would fall back upon some other resources. সুতরাং বেওয়ারিশ্ মাল উপনিষদ্ ও তাহার ব্যাখ্যা লইয়া সম্প্রদায় সকলের মধ্যে যখন এমনি কাড়াকাড়ি (Scramble) তখন প্রতিপক্ষের প্রতি শ্রুতি-বাক্যের ধমক্ আজ কালকার দিনে কতটা সময়োপযোগী তা বলা কঠিন। তবে ধমক্ দিবার যোগ্যতা উপেন্দ্রবাবুর কত এবং আমার প্রতি ধমক্‌টা কিরূপ ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত, তা যথাস্থানে নির্দ্দেশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

সমালোচনা অতি অপ্রীতিকর কার্য্য, তা যদি আবার কোন পূজ্যপাদ ব্যক্তির সমালোচনা হয়। প্রাচীন কালের যাঁহাদের স্মৃতি মানুষ ধরিয়া রাখিয়াছে, তাঁহারা বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য আসিয়াছিলেন। আচার্য্য শঙ্কর আসিয়াছিলেন বৌদ্ধ-নাস্তিকতা দলনের জন্য। এক দিকে দ্বৈতবাদী সাংখ্য, অন্যদিকে শূন্যবাদী বৌদ্ধ—এ দু'এর সঙ্গে বিবাদে অদ্বৈত তত্ত্বের উপরে যে বিশেষ জোর (Emphasis) দিতে হইয়াছিল, অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন-সত্ত্বেও সেই ঝোঁকটাকে ধরিয়া রাখিতে গেলে জগদ্বিবর্ত্তনের বিরুদ্ধ মুখে চলিতে হয়। সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে আচার্য্য শঙ্কর যে আসনে বসিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহাকে সেই আসনেই বসাইয়া রাখিলে তাঁহার মধ্য হইতে জীবন বাহির করিয়া লইয়া তাঁহার কাষ্ঠমূর্ত্তির পূজা করা হইবে। মৃত গ্রহণ করে না, যেমন তেমনই থাকে। না হয় নষ্ট হইয়া যায়। জীবিতই

গ্রহণ করিতে ভয় পায় না। সে নূতন গ্রহণ করিয়া আবেষ্টনের উপযোগী হয় ও দিন দিন বড় হইয়া উঠে। আমরা মধ্যযুগে যাইয়া শঙ্করের পূজা করিব কেন? তাঁর দর্শনের উপর নূতন রং ফলাইয়া যুগোপযোগী করিতে পারি না কি? তাহাতেই উহার প্রাণের পরিচয় পাইব। নতুবা পুরাতন পুতুল কেহ গ্রহণ করিবে না। তবে এ কথাও ঠিক্, এই বিংশ শতাব্দীতেও দশম শতাব্দীর লোক বিচরণ করিতেছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিচয়ের পরিবর্ত্তনে নূতন তত্ত্বের (Data) আবির্ভাব হয়; তাহা স্বীয় অঙ্গীভূত করিয়া লইবার শক্তি যে systemএর নাই তাহা মৃত, জীবন্ত মানুষ বেশী দিন তাহা ব্যবহার করিতে পারে না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে Rationalismএর সঙ্গে বিবাদ করিতে যাইয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ এক রকম Agnosticismএর আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, আজ তাঁহারা সেই Rationalismকেই আত্মরক্ষার বর্ম্মরূপে গ্রহণ করিতেছেন। তাই বলিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর খৃষ্টান্ পাদ্রী এখন নাই তা কে সাহস করিয়া বলিবে? মহাত্মা গান্ধী বলেন, শঙ্কর ও চৈতন্য উভয়েরই প্রভাব দেশের উপর অসীম। অথচ এক জন আর এক জনকে বলিয়াছেন নাস্তিক। শুষ্ক তান্ত্রিক আচারে দেশ যখন মরুভূমি, ভক্তির বন্যা আসিয়া সব ভাসাইয়া দিল, আত্মা তৃপ্ত হইল। দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় যাহা চাই, পাইলাম। অন্য কোন দিকের বিচার উঠিল না। সে সকল দিকে দৃষ্টি এখনও ভাল করিয়া পড়ে নাই। অবস্থার বিবর্ত্তনে নূতন সমস্যার আবির্ভাবে আমরা যে ঐ-টুকুতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? দেশের লোক যখন না খাইতে পাইয়া মরিতেছে, খাইতে পাইবে সে আশাও করিতে পারিতেছে না, তখন মহাত্মা বলিলেন—আমার অনুসরণ কর, খাইতে পাইবে। অমনি সে কথা কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিল। দলে দলে লোক তাঁহার পশ্চাতে ছুটিল, কোথায় যাইতেছে ভাবিলও না। অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া দাও, ও ডাক কাণেও পৌঁছিবে না। তখনকার কাজ সে সময়কার জন্যই অক্ষয় হইয়া রহিল। যুগ পরিবর্ত্তনে মানুষের মনে যে আকাঙ্ক্ষা আসে, তার যে নূতন অভাব উপস্থিত হয়, তদনুসারে প্রয়োজন হইলে ডাকের উপকরণ ও প্রকরণ দুই-ই বদ্‌লাইতে না পারিলে সাড়া চিরদিনই মিলিবে না। বুদ্ধের ডাকে এক দিন যে সাড়া মিলিয়াছিল, আজ তা আছে কি? মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে যে Nationalism এর ডাকে য়ুরোপের জাতি সকল মাতিয়া উঠিত আজ তাহাতে ভাটা ধরি-

য়াছে। তাই বলিয়া এ সকলের কি স্থায়ী মূল্য নাই? আছে, যদি ইহাদিগকে নবতর, উচ্চতর synthesisএর অঙ্গীভূত করিয়া লইতে পার। মানুষ তার মতের অনেক উপরে উঠিতে পারে। আমরা আচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদের সমালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি বটে, কিন্তু আচার্য্যের কাছে ধর্ম্ম-জগতের ঋণ যে অপরিশোধ্য, যাহা ইতিপূর্ব্বেই (পৃঃ ২১১ ও ২৩০) লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহার পুনরুল্লেখ আর করিব না। মাত্র এই কথা বলিয়া বিচার-প্রবেশের পথ পরিষ্কার করিয়া লই, যে আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধায় আমি কাহারও অপেক্ষায় পশ্চাৎপদ তাহা স্বীকার করি না—অন্ধভক্তিকে আমি শ্রদ্ধা মনে করি না, অশ্রদ্ধারই প্রকারভেদ মনে করি। তবে যদি ভাষার ধরণে (styleএ) কোন দোষ ঘটিয়া থাকে তবে করজোড়ে পাঠকগণের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করি—মানুষ আপনার ছায়াকে অতিক্রম করিতে পারে না।

বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া উপেন্দ্রবাবু "শঙ্কর ও স্পিনোজা" হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বিচার করিবার পূর্ব্বেই সে সম্বন্ধে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সারিয়াছেন। সুতরাং টিপ্পনি নিষ্প্রয়োজন। তবে তিনি যে পাঁচটি পূর্ব্ব পক্ষ করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিলেই চলিবে।

(১) অদ্বৈততত্ত্ব ও মায়াবাদ যে পরস্পর-বিরুদ্ধ সে কথার উত্তর উপেন্দ্র-বাবু স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। মায়া কেবলমাত্র বিদ্যার অভাব নয়, কিন্তু আবরণী বীজশক্তি—তাঁহার এই স্বীকারোক্তি অদ্বৈতত্ব বিনাশ করিতেছে। মায়ার যখন সত্তা আছে, সে সত্তা ব্রহ্মের অন্তর্ভূত হইলে স্বগতভেদ আসে, বাহিরে হইলে দ্বৈত হয় ও ব্রহ্মের অনন্তত্বে ব্যাঘাত ঘটায়। এই মাত্র বলিলেন, মায়া কেবলমাত্র বিদ্যার অভাব নহে। সে নিশ্বাস শেষ না হইতেই সুর ধরিলেন, উহা 'সৎ' নহে। আবার সে নিশ্বাসও পড়িল না, বলিয়া উঠিলেন, "সদসৎ শব্দ দ্বারা অনির্ব্বাচ্য মায়াশক্তি।" শক্তি শব্দদ্বারা বাচ্য যখন তখন 'অনির্ব্বাচ্য' ও 'অসৎ' না হইয়াই যায় না! এমন না হইলে কি দর্শন-শাস্ত্র গড়া যায়! এক বার বাগ্‌বাজারের সুরসিকেরাও তর্ক-বিতর্কর পর মীমাংসা করিয়াছিল, "মাছেরা কি গরু না যে জলে আগুন লাগ্‌লে তারা গাছে উঠিবে"? উপেন্দ্রবাবু বলেন, অনাদি "মায়ার অন্ত আছে বলিয়া তাহা সৎ নহে। অতএব মায়াবাদ দ্বারা ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব কোনও রূপে ব্যাহত হয় না।" সমালোচক মহাশয় নিজের যুক্তিটিও তলাইয়া দেখেন নাই। এই যুক্তিতে অনাদিকাল হইতে 'অন্ত'

না হওয়া পর্য্যন্ত মায়াকে 'সৎ' বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল, এবং যতদিন না 'অন্ত' হয় ততদিন ব্রহ্মের অদ্বৈতত্বকে ব্যাহত করিতে তাহার কোন বাধা রহিল না। কোন সময়ে তার 'অন্ত' হইবে—এই উক্তিই প্রমাণ করিতেছে, যে মায়া আছে অর্থাৎ 'সৎ'। যা নাই তার সম্বন্ধে সে অনন্ত নয় এই কথা খাটে না। ততক্ষণ ইহার পারমার্থিক সত্তাই স্বীকার করিতেছ। সুতরাং জগৎ মিথ্যা নয়, নশ্বর। চৈতন্যদেবও এই কথাই বলিয়াছেন— "জগৎ যে মিথ্যা নহে নশ্বর মাত্র কয়।" এ সত্তা ব্যাবহারিক বলিতে পারিবেন না। কেন না, ব্যাবহারিক ভাবে সংসারবৃক্ষের 'অন্ত' নাই। লক্ষ লক্ষ অমুক্ত জীবের জন্য মায়াশক্তির কার্য্য অনন্ত কাল চলিবে। তাই জন্যই উপনিষদ্ বলিয়াছেন, "এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।" কথাটা আরও একটু বিশদ করিয়া বলি। ব্যাবহারিক সত্তার 'অন্ত' নাই, মায়ার 'অন্ত' আছে; (সুতরাং) মায়া ব্যাবহারিক, না হয় পারমার্থিক; কিন্তু মায়া ব্যাবহারিক নয়, সুতরাং মায়া পারমার্থিক। ইহাকেই বলে, উল্টা সমঝ্ লি, রাম! বলি, যার অস্তিত্বই নাই তা লইয়া এত বিব্রত কেন? মুখে যতই বলা হউক না কেন যে এই জগৎব্যাখ্যা কেবল ভ্রান্ত জীবের জন্য, পরমার্থতঃ কিছু নয়। কিন্তু পরমার্থতত্ত্বও ত জীবই জানিতে চায়। তাই, তার জ্ঞানের কাছে যা সত্য বলিয়া প্রকাশিত হয় তাকে মিথ্যা বলিলে, যাকে বল পরমার্থ সত্য তার সত্যতার প্রমাণ করিবে কিসের জোরে? তারও দাঁড়াবার স্থান থাক্‌বে না—সে abstract হয়ে' যাবে। সুতরাং জগৎকে একেবারে নাস্তির উপর বসান চলিল না। অথচ এক দিক্ রাখ্‌তে গেলে অন্য দিক্ থাকে না। সুতরাং পর পর সৎ ও অসৎ বলিতে বলিতে ডিগ্‌বাজী খাইয়া চলিতে হইতেছে। এ বিপদ যে উপেন্দ্রবাবুর নিজের, তা নয়। আচার্য্য শঙ্করকেই বাধ্য হইয়া মায়া সম্বন্ধে নানাস্থানে নানা মত দিতে হইয়াছে। (ক) সৎ কি অসৎ তাহা নিরূপণ করা যায় না (সূঃ ভাঃ ১।৪।৩; ২।১।১৪)। (খ) ইহা নিত্য-নিবৃত্তা (নৃসিংহ উত্তরতাপনীয় ভাষ্য, ৯ম খণ্ড)। (গ) সা চ মায়া ন বিদ্যতে (গৌরপাদীয় কারিকার ভাষ্য, ৬।৫৮)। এই দুর্দ্দৈবের কারণ যা তা সকল Dogmatic Philosophyতেই ঘটিয়াছে। জ্ঞানের জন্য ব্রহ্ম ও জগৎ দুই-ই চাই। শঙ্কর পূর্ব্ব হইতেই এই দুইকে দুই স্বতন্ত্র কোটিতে স্থাপন করিলেন। এই দুইএর সামঞ্জস্য ছাড়া জ্ঞান তৃপ্ত হয় না। অথচ দুইটিকে দুই প্রকৃতি দিয়া ভাগ করা হইতেছে—সামঞ্জস্য

চলে না। তাই ধর পাকড়। ডেকার্টেরও তাই হইয়াছিল। হাঙ্গামার পর হাঙ্গামা আসিল, স্পিনোজা এক করিলেন, কিন্তু কত খুঁৎ রহিয়া গেল। প্রাচীন Neo-Platonistগণ এই ব্যবধান দূর করিবার জন্য Emanationএর পর Emanation বাহির করিলেন, ব্যবধান গেল না। স্বরিরোধের উপর স্ববিরোধই কেবল পুঞ্জীকৃত হইল। আমাদেরও বাসুদেব, বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ বাহির হইলেন, কিন্তু ব্যবধান ঘুঁচিয়াছে কি? উপেন্দ্রবাবুও হা'লে পাণি না পেয়ে হাল্ ছেড়ে দিয়ে হতাশ ভাবে বসে পড়ে নাকে কাঁদিয়া—দার্শনিক জগতের 'বালানাং ক্রন্দনং বলম্'—বলেছেন, একটা অবোধ্য অনির্ব্বাচ্য মায়া না হ'লে কিছু বুঝা যায় না—সমন্বয় হয় না। খুব বুঝাতে এসেছেন কিন্তু! সমন্বয় কিসের? উপেন্দ্রবাবু না এই একটুখানি পূর্ব্বে 'নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ কি' এই প্রশ্নের সম্ভাবনাতেই হেসে একেবারে কূটপাট্ হয়েছিলেন! তিনি না বলেছেন, এরূপ সম্বন্ধের প্রশ্ন "বন্ধ্যার পুত্রবত্তা" প্রভৃতির ন্যায় হাস্যজনক! তবে কোন্ মুখে বলিলেন, 'ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা ও জগতের ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকার করিলে এবং এতদুভয়ের সমন্বয় করিতে হইলে মানুষের বোধশক্তি মায়াবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য", যেন মায়াবাদ ছাড়া জগতে আর কোন দর্শনশাস্ত্র রচিতই হয় নাই! কে বলিয়াছিল, আগে ব্রহ্মকে সৎ ও জগতকে অসৎ বলিয়া আরম্ভ কর, এবং পরে তাদের সামঞ্জস্যের জন্য একটা গোঁজামিল খুঁজিয়া হয়রান্ হও—এ যে 'স্বখাত সলিলে ডুবে মরি, শ্যামা'! সমন্বয় কি একটা সম্বন্ধ নয়, উভয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধ সংস্থাপন ছাড়া কি সমন্বয় সম্ভব? তবে যে সম্বন্ধের নামেই হেসে গড়াগড়ি, সেই সম্বন্ধের জন্য এখন এত দৌড়াদৌড়ি কেন? না হইলেই হবে না। এই কথাগুলি লিখিতে যাইয়া উপেন্দ্রবাবু নিশ্চয়ই মনে মনে খুব হেসেছিলেন? কেন না, ইহার মধ্যে যে স্ববিরোধের একান্তাভাব! ইহারই নাম দর্শনশাস্ত্র, ইহারই নাম ভারতীয় দর্শনতত্ত্বের মর্ম্মগ্রাহিতার পরিচয়! পরিচয় আছে কিন্তু আরও অনেকদূর পর্য্যন্ত। দুই বস্তুর মধ্যে সমন্বয় করিতে হইলে সমন্বয়কারী তৃতীয় বস্তু, *Tertium quid* চাই যাহাকে উভয়ের গুণান্বিত হইতে হইবে, অথচ উভয়কেই অতিক্রম করিতে হইবে। 'এপার' 'ওপার' এর সমন্বয়কারী সেতুকে উভয় পারব্যাপীই হইতে হয়! সুতরাং মায়া সদসদাত্মিকা কেন তা নিতান্তই অবোধ্য নয়। ঈশ্বর ও

মানবের মধ্যে এক অনতিক্রমণীয় বাধা খাড়া করিয়া তাহার যখন নিরসন দরকার হইল, তখন খৃষ্টীয় শাস্ত্র একাধারে দেবমানবধর্ম্মী পুত্রের কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই সমন্বয়কারী যে সমন্বিত দুইএর অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ, তাহা আদিতে স্পষ্ট না হইলেও logical consequence রূপে পরে শ্রেষ্ঠ হইয়াই দাঁড়ায়। তাই আজ যিশু ঈশ্বরকে স্থানচ্যুত করিয়া খৃষ্টীয় জগৎ জুড়িয়া বসিয়া আছেন। আমাদের দেশেও তো ঠিক তাহাই হইল! শঙ্কর-শিষ্য সুরেশ্বর তৈত্তিরীয় বার্ত্তিকে বলিয়াছেন, যাঁহাকে জানিলে সকল ভয় দূর হয় সেই ব্রহ্ম কিন্তু মায়ার ভয়ে ভীত (তৈঃ বাঃ, ২।৬৯ —৭২)। আর মায়াবাদী পৌরাণিক—তাঁর হাতে মায়া নানারূপে নানা আকারে সকলের উপরে উঠিয়া বসিয়াছেন, মহাব্রহ্মও তার বাচ্চা। "ছিল হাতি হ'ল তুল কাট্‌তে কাট্‌তে নির্ম্মূল।" জগৎকে ছাঁটিয়া ব্রহ্ম স্থাপন করিতে গেলে পরিণাম ফল ইহা ছাড়া অন্য কিছু হইতে পারে না।

(২) শঙ্করের অদ্বৈত তত্ত্ব কি সত্য সত্যই এক কল্পিত abstract একত্ব? বহু হইতে একেকে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহা সত্য সত্যই abstract. এক ও বহু আপেক্ষিক সত্য। বহুর ধারণাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিলে এক শূন্যেই পরিণত হয়। উপেন্দ্রবাবু তো আমাকে অনেক প্রশ্ন করিয়াছেন, আমি তাঁকে একটা প্রশ্ন করিতে পারি কি? 'নেতি' পথে বিষয়-জগতের 'সর্ব্ব' নিঃশেষ করিয়া দেখিয়াছেন কি পরিণামে কি পাওয়া যায়? আমি তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, যে, এ পথে যুগে যুগে যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহাদের পরিণাম যাহা হইয়াছে উপেন্দ্রবাবুরও তাহাই হইবে—পূর্ণচন্দ্র মিলিবে না, মিলিবে অমাবস্যার অন্ধকার। এত জোর করিয়া বলিতেছি এই জন্য, যে অজ্ঞাতসারে তিনি প্রতিপক্ষকে সাহায্য করিয়াছেন—আমি তাঁরই সায় পাইয়াছি। তিনি বলেন, তত্ত্বতঃ জগতের সত্তা নাই, ব্রহ্মই একমাত্র অনন্ত সর্ব্বব্যাপী সত্তা। জিজ্ঞাস্য এই, জগতের যদি সত্তা না থাকে তবে জগৎব্যাপীর সত্তাটা থাকে কি ব্যাপিয়া? 'সর্ব্ব'র যে পথে গতি সর্ব্বব্যাপীকেও সেই পথে মহাপ্রস্থান করিতে হয়, নান্যঃ পন্থা। সর্ব্ব যদি মিথ্যা হয়, সর্ব্বব্যাপী সত্য হইবেন কোন লজিক্ অনুসারে। সকল abstract thinking এরই পরিণতি এই, উপেন্দ্রবাবুর একার দোষ নয়। শঙ্করোত্তর মায়াবাদে (মায়াবাদের যা logical consequence) 'সচ্চিদানন্দ' শূন্যে পরিণত হইয়াছিলেন। তাই শ্রীচৈতন্য নাস্তিকতার অপবাদ দিয়াছেন। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া মায়াবাদের

যে নিন্দা তাহা ভিত্তিহীন নহে। "Vision of the one in the many" ইহাতেই একের মূল্য। এই দৃষ্টিই জগৎ আজ সকল বিভাগে খুঁজিতেছে—শূন্যগর্ভ একের দৃষ্টি নহে। বহুকে 'নস্যাৎ' করিলে একের কোন মূল্য থাকে না—এক তখন হয় শূন্য। বহুকে অস্বীকার করিয়া উপেন্দ্রবাবু তাঁর একক শূন্যই করিয়াছেন। সন্ন্যাসীকে খাইবার জন্য ভক্ত একটী বাঁধাকপি দিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী একটী একটী পাতা ফেলিয়া দিয়া 'নেতি' মার্গে কপি খুঁজিয়া হতাশ হইয়া বলিয়াছিলেন 'কপি মিলা নেই'! মায়াবাদীও সন্ন্যাসী। বাস্তবিক, এই abstraction আমাদের জাতীয় অধঃপতনের মূল কারণ।

(৩) আমি বলিয়াছি, মায়াবাদে জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের কোন সম্বন্ধ নাই। জগতের অন্য কারণ আছে কি না, এ প্রশ্ন আমার সঙ্গে বিচারে অপ্রাসঙ্গিক। যদিও আমার মতই তিনি পুনঃ পুনঃ সমর্থন করিয়াছেন, তবুও শেষকালে আবার ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সে বিভ্রাটের কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

(৪) শঙ্করের মায়াবাদ কি অবোধ্য, irrational? হাঁ কি না বিচার করিতে যাইয়া উপেন্দ্রবাবু নিজেই তো হা'ল ছাড়িয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। তিনি যেরূপ হতাশভাবে বলিয়াছেন, "সমন্বয় করিতে হইলে মানুষের বোধশক্তি মায়াবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য", তাহার অর্থ কি এই নহে, যে ওটা কিছু বুঝা যায় না। যা বুঝা যায় না তাই দিয়া আর কিছু বুঝাইতে যাওয়াটা কি খুবই rational? যা নিজে সৎ কি অসৎ তাই বুঝা যায় না, সেই Principle দিয়া জগৎ সৎ কি অসৎ, তাহার সত্তা আছে কিনা তাহা বুঝাইতে যাওয়া কেবল irrational তাহা নহে, আজগুবীও বটে! তাঁর এই অঘটন-ঘটন-পটিয়সী যুক্তি বলে না বুঝাইয়াই বুঝাইয়া দেওয়া যায় না এমন তত্ত্ব কি আছে? আমি যদি বলি, ব্রহ্ম এক নির্ব্বিশেষ স্বগত-ভেদ-হীন সত্তা হইয়াও এই বহুত্বপূর্ণ জগৎ সৃষ্টি করিয়া আপনার মধ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাহাতে যদি কেহ আপত্তি করেন, ইহাতে ব্রহ্মের একত্ব নষ্ট হইল। আমি বলি "অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তির অসাধ্য কি আছে?" "আপনার বেলায় মহাপ্রসাদ অন্যের বেলায় ভাত" বলিলে-চলিবে কেন? নিজেই অনির্ব্বাচ্য নাম দিয়াছেন, তার পর বল্‌ছেন অনির্ব্বাচ্য যখন তখন তো অবোধ্য বটেই! Question begging epithetটা একটা যুক্তি নয়! কে বলেছিল অনির্ব্বাচ্য

মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করতে? উপেন্দ্রবাবু বলেন, মানুষের বোধ শক্তি ঐ রকমই করে! জিজ্ঞাসা করি, এই বহুনিন্দিত মানববুদ্ধি ছাড়া আর কোন বুদ্ধি ধার মিলে কি যাহা দিয়া দর্শনশাস্ত্র গড়িতে হইবে? মুনি ঋষি হইতে চুণাপুঁঠি আমরা পর্য্যন্ত সকলকেই এই দুর্বৃত্ত বোধশক্তিটার উপরই নির্ভর করিতে হয়। মানববুদ্ধির নিন্দা "যে ডালে বাসা সেই ডাল কাটার" লঁজিক্। শেষে যদিও তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, অবোধ্য বলিতে চাও আপত্তি নাই! কিন্তু কোট বজায় রাখিবার জন্য সমাধান করিলেন, অতএব মায়াবাদ irrational নয়! কি যুক্তি-বলে? "জুতা মেরেছে মেরেছে কিন্তু অপমান তো করে নাই" ইতি ন্যায়াৎ বোধ হয়।

(৫) সাধন ভজন দ্বারা কি সত্য সত্যই জীব ও ব্রহ্মের এক-স্বরূপত্ব অপ্রমাণিত হয়? আমি বলিয়াছি, মানুষ যখন কিছু ছাড়িতেছে, সাধন ভজন করিতেছে—তখন কিরূপে বলিবে যে সে ব্রহ্ম? যে ব্রহ্ম জানে সেই ব্রহ্ম, এই তো যুক্তি? যখন জানে নাই, জানিবার জন্য প্রয়াস করিতেছে মাত্র—তার এই সাধন ভজন কি প্রমাণ করিতেছে না যে সে ব্রহ্ম নয়? আমার এই মহাপাপের জন্য আমার ঘাড়ে উপনিষদের ঋষিদিগকে চাপাইয়া দিয়া আমাকে নরকে পাঠাইবার চেষ্টা হইয়াছে। জান না, "ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ" ইহা ঋষিবাক্য? অবিদ্যার দাস, তুমি তা জান্‌বে কি করে? ও হরি! আমি কখন বল্লাম ত্যাগের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না? আমি না বলেছি, যে ত্যাগ করে সে ব্রহ্ম নয়। উপেন্‌বাবু গড়েছেন এক tremendous *ignoratio elenchi* "এখান থেকে মারলাম ছুরি লাগ্‌লো কলাগাছে, হাটু বেয়ে রক্ত পড়ে চোখ্ গেল রে বাপ্।" মনে পড়ছে এইরূপ এক প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইয়াই আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছিলেন—"অহোঽনুমানকৌশলং দর্শিতমপুচ্ছশৃঙ্গৈস্তার্কিকবলীবর্দ্দৈঃ"।

আগেও ব্রহ্ম পরেও ব্রহ্ম, মাঝখানে মায়ার স্বপ্ন—এটা যে আমার স্বকপোলকল্পিত নয় তা উপেন্দ্রবাবু নিজেই নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। যুক্তিও যে কম দিয়েছেন তা নয়। আচার্য্য শঙ্কর "ঊর্দ্ধমূলো" এই কঠশ্রুতির ভাষ্যের আরম্ভ করিয়াছেন ব্রহ্ম লইয়াই। কিন্তু সংসারবৃক্ষটা, যার আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত অতি সুন্দর কবিত্ব-পূর্ণ বর্ণনা আছে তাহা, অবিদ্যা-বীজ-প্রভাব। বিদ্যার আবির্ভাবে বাজীকরের বাজীর ন্যায় মিলাইয়া যায়। পরে যদি শূন্য না থাকে তবে ব্রহ্ম

ছাড়া আর কি থাকিবে? লাভ-ক্ষতি কাহার কিছু নাই। মায়াবাদী বলিবেন, জীবের মুক্তি। মুক্তি তো হয় বিদ্যার আবির্ভাবে। অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের কাছে বিদ্যা আসিবে না—পরমাত্মা হি সংসার মায়য়া ন সংস্পৃশ্যতে। অবিদ্যা দ্বারাও বিদ্যা লাভ হয় না। উপেন্দ্রবাবু বলেন, শ্রুতি-বাক্যের শ্রবণ মনন কর। পূর্ব্বোক্ত কঠভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়া রাখিয়াছেন, শ্রুতিও ঐ সংসার বৃক্ষের পত্র—শ্রুতি স্মৃতি-ন্যায়-বিদ্যোপদেশ-পলাশঃ—সুতরাং অবিদ্যার ফল। মায়াবাদের দিক্ হইতে সে পত্র চর্ব্বণে কি ফল হইবে? দাঁড়াইতেছে, যে মুক্ত নয় তার মুক্তির সম্ভাবনা নাই। উপেন্দ্র ধীরেন্দ্রই যে কেবল অবিদ্যার দাস, তাহা নহে, উপনিষদের ঋষিরাও সুতরাং অবিদ্যার উপরে নহেন। উপদেষ্টা ও উপদিষ্ট উভয়েই অবিদ্যার অধিকারে। অবিদ্যা অতিক্রম না করিলে অবিদ্যাকে অবিদ্যা বলিয়া জানিবার উপায় নাই। অতিক্রম করিলে তো নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত ব্রহ্ম—যেখানে বিদ্যা অবিদ্যার ভেদ নাই। সেখান হইতেও কোন উপদেশ আসিবে না, সুতরাং যেখানে আছেন সেইখানেই থাকুন। অর্থাৎ কি না **A consistent Máyávádi must be speechless** !

এখানে উপেন্ বাবুর চিন্তার ধারার একটু পরিচয় দিয়া উপসংহার করি। এক স্থানে বলিয়াছেন সুখদুঃখাদি দেহ-ধর্ম্ম অসৎ, অমার্জ্জিতবুদ্ধি স্থূলদর্শীরাই দেহধর্ম্ম সুখদুঃখাদিকে সত্য বলিয়া জানে। কিন্তু শেষ করিয়াছেন, "মায়াকে অলীক বলিয়া আমরা যতই পরিহাস করি না কেন, তাহার দুঃখদায়িনী শক্তি কি নিদারুণভাবে সত্য তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই অবগত আছেন।" মায়াকে অলীক তিনিই বলিয়াছেন, আবার সে জন্য আক্ষেপও তিনিই করিয়াছেন। সুখ দুঃখকে তিনিই উড়াইয়া দিয়াছিলেন, আবার তিনিই সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। ইহাকেই **abnormal Psychology**ওয়ালারা বলেন **Mental Dissociations.** উপেন্দ্রবাবু কার উপর গোসা করে এ নিদারুণ সত্যটা একেবারে বাইরে নিয়ে এলেন? আশা করি, ইহা আধুনিক জড়বাদের সুরসাল ফল-ভক্ষণ-হেতু বদহজ্মির উদ্গার নহে। আর বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন নাই, পাছে **Psychopathology** আসিয়া পড়ে। অতদূর যাব না।

দশম অধ্যায়

সর্ব্বাত্মবাদ

(Absolute Idealism)

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োৎআত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥ কঠ, ১।৩।১২

সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মান্ দার্শনিক ইমান্থয়েল্ ক্যাণ্টের বিশুদ্ধ জ্ঞান-বিষয়িণী আলোচনা প্রকাশিত হইবার পর দার্শনিক আলোচনার গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। বিষয়-বিষয়ীর সম্বন্ধ নিরূপণ অর্থাৎ আমাদের অভিজ্ঞতার উপকরণের (matter) সঙ্গে তাহার প্রকরণের (form) সম্বন্ধ নির্ণয়ই একমাত্র আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুতরাং এক অর্থে এখন জ্ঞান-বিষয়ক প্রায় সকল মতই অধ্যাত্মবাদে পরিণত হইয়াছে। অনেক পণ্ডিত আপন আপন মত অধ্যাত্মবাদ বলিয়াই প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে আমরা বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। কেন না, অধ্যাত্মবাদ শব্দটি এত বিভিন্ন রকমের অর্থে ব্যবহৃত হয়, যে যাঁহারা আপনাদিগকে অধ্যাত্মবাদী বলিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে যে কোনও এক সাধারণ বিষয়ে মতের ঐক্য ধরিয়া লইলে ভ্রান্তিজালে জড়িত হইতে হইবে। এমনও ঘটিয়াছে, যাঁহাদের দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে কোনই সামঞ্জস্য নাই, তাঁহাদের মতকে এক মনে করিয়া নানা গোলমালে পতিত হইতে হইয়াছে। সুতরাং যে সমস্ত বিভিন্ন অর্থে অধ্যাত্মবাদ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা প্রদর্শনের চেষ্টা করিলে যেমন একদিকে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নতা স্পষ্ট ধরা পড়িবে, অন্যদিকে অধ্যাত্মবাদের জ্ঞানতত্ত্ব বিচারের পথও পরিষ্কৃত হইবে।

প্লেতো

গ্রীক্ দার্শনিক প্লেতোই বোধ হয় প্রথম কথাটিকে দার্শনিকভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাছে প্রজ্ঞান (Idea) প্রধানতঃ বস্তুজগতের অন্তর্গত (objective)—বস্তু ও বস্তুর প্রজ্ঞান একই পদার্থ। প্রত্যেক বস্তুরই একটা স্বতন্ত্র প্রজ্ঞান আছে, তাহাই প্রকৃত সত্তা,

ইহাকে অবলম্বন করিয়াই আমাদের বস্তুর জ্ঞান জন্মে—আমাদের জ্ঞানে যে বস্তুর আবির্ভাব, আমাদের মনে যে বস্তুর ধারণা, ইহা গৌণ মাত্র। কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত মতই দর্শন-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইংরেজ দার্শনিক লক্ ও বার্কলির মতে, যদিও উভয়ের মধ্যে সিদ্ধান্তের পার্থক্য যথেষ্টই আছে—প্রজ্ঞান একটি মনের অবস্থা। বস্তুর অস্তিত্ব বস্তু-সম্বন্ধে মনের ধারণা হইতে স্বতন্ত্র নহে—এই মত দার্শনিক চিন্তাকে এমনই পাইয়া বসিয়াছে, যে সাধারণতঃ অধ্যাত্মবাদ বলিতে আমরা সেই দার্শনিক মতটিই বুঝি যাহাতে বস্তু অর্থে আমরা আমাদের জ্ঞানের পরিণামই (modification) বুঝি—তদতিরিক্ত কিছুই মানি না। সুতরাং বহির্জ্জগৎ বলিতে যদি কিছু থাকে তবে তাহা অনুমান মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। ইহাতে কিছুই আসিয়া যাইত না, যদি কোন কোন দার্শনিক অধ্যাত্মবাদ কথাটায় প্লেতোর ভাব যোগ করিয়া ব্যবহার না করিতেন। এই জন্যই দার্শনিক আলোচনায় সময়ে সময়ে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়।

ক্যাণ্ট্

জার্ম্মানিতে যে অধ্যাত্মবাদ বিকশিত হইয়াছে, তাহার ইতিহাসে এই গোলযোগ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ক্যাণ্ট্ প্রধানতঃ বলিয়াছেন, ব্যষ্টি-জগৎ আত্মার সমষ্টিকরণ-শক্তির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। ইহাতে এই বুঝা যায়, যে জগৎ ও আত্মা দুইটি স্বাধীন সত্তা, পরস্পর-সম্বদ্ধ। আত্মা স্বীয় সমন্বয়শক্তিতে ব্যষ্টিকে সমষ্টিতে পরিণত করিয়াছে। কিন্তু তিনি ইহাও বলিতেছেন—এই যে বস্তু-জগৎ যাহা আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত দেখিতেছি এবং যে আত্মায় সে প্রকাশিত হইতেছে, সেই আত্মার বাহিরে তাহার অস্তিত্ব নাই। এই যে আমাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ বহির্জ্জগৎ ইহার জ্ঞানাতীত স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে না; অথচ এই বহির্জ্জগতের সঙ্গে একটি খাঁটি বস্তু-জগতের (Things-in-themselves) অতিমাত্র বিভিন্নতা কল্পনা করিতে যাইয়া তিনি মানুষকে আপনার জ্ঞানের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ করতঃ বার্কলিরই মত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বস্তু-সম্পর্ক-বিরহিত করিয়াছেন। সুতরাং তিনি যে বার্কলির মতাবলম্বী নহেন, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক অবোধ্য তত্ত্বের অবতারণা করিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। যে যুক্তিতে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে তাহা এই,—আত্মজ্ঞানের সঙ্গে বিষয়জ্ঞান অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ। বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত

হইয়াই আমাদের আত্মজ্ঞান সম্ভব হয়। আত্মা ও বিষয়-জগৎ এই উভয়ের মধ্যে ভেদও আছে, একত্বও আছে। জগতের সঙ্গে ভেদস্থাপন করিয়া, কিন্তু একান্ত ভেদে কোন জ্ঞানই সম্ভব নয় বলিয়া, উহার সঙ্গে সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলেই আত্মা আপনাকে জানে। সুতরাং আত্মজ্ঞানও যেমন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, জগৎজ্ঞানও তেমনই। একটিকে অনুমানলব্ধ বলিলে অন্যটিও ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। যদি বলা যায়, যে আমরা আমাদের আত্মস্থিত প্রজ্ঞানগুলিকে প্রথমত প্রজ্ঞানরূপেই জানি, পরে তাহা হইতে জগৎ অনুমান করিয়া লই, তাহা হইলে আমাদের জ্ঞানক্রিয়াকে উল্টা করিয়া দেখা হয় এবং জ্ঞানের সম্বন্ধযুক্ত উপাদানদ্বয়কে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করা হয়। যদিও এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না, করিলে জ্ঞানের মূল প্রকৃতি সম্বন্ধেই অজ্ঞতা প্রকাশিত হইবে, যে বিষয়জ্ঞান মাত্রেরই সঙ্গে আত্মজ্ঞান জড়িত রহিয়াছে, উভয়কে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব—এক পত্রের দুই পৃষ্ঠার ন্যায় ইহারা অঙ্গাঙ্গীভাবে আবদ্ধ। তথাপি একথাও সত্য, যে আদিতঃ আমাদের জ্ঞান বিষয়ের দিকেই ধাবিত হয়—বিষয়-জগতের পর্য্যবেক্ষণ ও তাহার অর্থের অবধারণার চেষ্টার দ্বারাই আমরা জ্ঞানের প্রথম সোপানে পদার্পণ করি; পরে আত্মচিন্তা আসে, ও আত্মজ্ঞান স্পষ্টীকৃত হয়। উপনিষদ্ যে বলিয়াছেন—"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্"। কঠ, ২।১।১—পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়গণকে বহির্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাই মানুষ বিষয়কে দেখে, আত্মাকে দেখে না—এই কথা আমাদের জ্ঞানের বিকাশের ইতিহাসে একটি ধ্রুব সত্য। জ্ঞানের বিকাশে প্রথমে আসে বিষয়জ্ঞানের দিক্, পরে আত্মজ্ঞানের দিক্। কিন্তু অনেকের দৃষ্টি বিষয়ের মধ্যে এমনই আবদ্ধ হইয়া যায়, যে তাঁহারা বিষয়জ্ঞানকে আত্মজ্ঞান হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র করিয়া ফেলেন এবং আত্মজ্ঞানকে অনুমানমাত্র মনে করেন। ইহা স্থূল দৃষ্টির সাধারণ ভ্রান্তি। কেন না, চিন্তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়জ্ঞানের অপরিহার্য্য আশ্রয় আত্মজ্ঞান অবশ্যম্ভাবীরূপে আসিয়া উপস্থিত হইবেই। তাই ঋষি বলিয়াছেন, যদিও প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়গণ বিষয়েই আবদ্ধ থাকে, বিষয়ের আবরণমুক্ত চিন্তাশীলের চক্ষু আত্মাকে প্রত্যক্ষভাবেই দর্শন করে—"কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ"। আত্মার একত্বের উপরই বিষয়-জগৎ নির্ভর করে—ইহা আমাদের দেশের বেদান্ত স্বীকার করে। কিন্তু আত্মজ্ঞান যে

আত্মা ও বিষয়-জগৎ

এক অখণ্ড বস্তু ইহা সকল পণ্ডিত স্বীকার করেন নাই। মীমাংসক কুমারিল

বৈদান্তিক ও মীমাংসক

ভট্টের মতে জ্ঞান অর্থই বিষয়জ্ঞান, আত্মজ্ঞান একটি অনুমানমাত্র। জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়া আত্মজ্ঞান পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্যগণের মধ্যে কোমৎ ও জেম্‌স্‌ এই মতাবলম্বী। কিন্তু মুরারীমিশ্রের মার্গাবলম্বী মীমাংসকগণ আত্মজ্ঞানকে অনুমান বলেন না। তাঁহারা বলেন, জ্ঞানের আবির্ভাব বিষয়-জ্ঞানেই—আত্মজ্ঞান কিন্তু বিষয়জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া পরে আবির্ভূত হয়—পরে আসে বটে, কিন্তু অনুমান নয়, উহাও প্রত্যক্ষ। নৈয়ায়িকগণও প্রায় ঐ কথাই বলেন। সুতরাং ইঁহাদের সকলের মতেই আত্মজ্ঞান ছাড়াও জ্ঞান সম্ভব—জ্ঞানের অভিব্যক্তিতে এমন সময় আছে যখন আত্মজ্ঞান জন্মে নাই। মার্কীন্‌ পণ্ডিত রয়েস্‌ যদিও বলিয়াছেন, যে আত্মজ্ঞান সময়ে সময়ে অব্যক্ত (implicit) থাকে, কিন্তু তিনি বিষয়জ্ঞানের সঙ্গে আত্মজ্ঞানের নিত্য

রয়েস্‌

সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে পারেন নাই। অন্যদিকে, মীমাংসক প্রভাকরের মতে জ্ঞানমাত্রই আত্মজ্ঞান। ধরিতে গেলে ইহা বেদান্তেরই মত। পাশ্চাত্য গ্রীন্‌ কেয়ার্ড্‌ প্রভৃতি অধ্যাত্মবাদিগণ এই মতাবলম্বী। একটু বিচার করিয়া দেখিলেই এই মত যে সত্য তাহা উপলব্ধি করা যায়। প্রত্যেক জ্ঞানখণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে যদি আত্মজ্ঞানরূপ সূত্র বর্ত্তমান না থাকে, তবে খণ্ডসকলকে একত্রিত করিয়া জগৎরূপ সমষ্টিজ্ঞান জন্মিতেই পারে না। আমাদের বিষয়জ্ঞান অন্যোন্যবিশ্লিষ্ট একটা খণ্ডজ্ঞান নহে, ইহা বহুখণ্ডের সমষ্টি! আত্মজ্ঞানই সেই সূত্র যাহা বিভিন্ন কালে বিভিন্ন স্থানে সংগৃহীত খণ্ডসকলকে একীভূত করিয়া এক অখণ্ড জগতে পরিণত করে। যে খণ্ড এখন ক'এর "আমি"রূপ সূত্রে আবদ্ধ হইল না, তাহা পরে তাহার বিষয়-জগৎরূপে প্রতিভাত হইতে পারে না। এক খণ্ড জ্ঞান যদি কেবল বিষয়জ্ঞানই হয়, তবে তাহার উপর ক'এর "আমি", খ'এর "আমি, গ'এর "আমি" কাহারও দাবী নাই, অথবা সকলেরই সমান দাবী। সেটা বিশেষভাবে কাহারও জন্য জ্ঞানের অঙ্গীভূত হইল না। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের জগৎজ্ঞান তত্তৎ আত্মজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিষয়। ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন, যে আমরা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জগতের বিষয়ী। বিষয়জগৎ এক ও অখণ্ড। আমরা যে যে পরিমাণে ইন্দ্রিয়গণকে পরিপুষ্ট করিয়া এই এক ও অখণ্ড জগৎকে আয়ত্ত করিতেছি, সে সেই

পরিমাণে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিষয়ের অধিকারী হইতেছি। যেহেতু, আমাদের জ্ঞানের উন্নতি নূতন নূতন বিষয়ের সৃষ্টি করা নয়, কিন্তু একই সাধারণ বিষয়ের বেশী বেশী গ্রহণ করা। যাহাকে বলি বাহ্যজগৎ, তাহার সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য দেখিয়া যে হৃদয়ে আনন্দোচ্ছ্বাস হয় তাহাও জগৎ ছাড়া কিছু নয়, জগতেরই অংশ। যাহা হউক, যখনই কোনও একটা বিষয়-জ্ঞান হইল তখনই তাহা কোনও "আমি"রূপ সূত্রে গ্রথিত হইয়া বিষয়রূপে প্রকাশ পাইল। সুতরাং যাঁহারা বিষয়জ্ঞানের মূলে আত্মজ্ঞানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তাঁহারা বিষয়জ্ঞানকেই ভিত্তিহীন করেন। এই যে আত্মজ্ঞানবিরহিত তথা-কথিত বিষয়জ্ঞান, তাহা পণ্ডিতগণের আত্মপ্রতারণার ফল মাত্র। * ইহার পরিণাম জড়বাদ। বাস্তবিক জ্ঞানের এই দুই উপাদানকে এক মুহূর্ত্তের জন্য কল্পনাতেও বিচ্ছিন্ন করা চলে না। জ্ঞানগত জীবনেই হউক, আর কর্ম্মগত জীবনেই হউক, আমাদের অভিজ্ঞতার এমন অতি ক্ষুদ্রতম অংশও কল্পিত হইতে পারে না, যেখানে এই দুই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত নহে। সুতরাং যাহারা বলিবেন আত্মা ছাড়া জগৎ আছে তাঁহারা যেমন ভ্রান্ত, যাঁহারা বলিবেন জগৎছাড়া আত্মা আছে, তাঁহারাও তেমনই ভ্রান্ত। কেন না, আমাদের আত্মজ্ঞান কেবল জগৎজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিকশিত হইতে পারে। আত্মাকে ভোক্তা ও জগৎকে ভোগ্য, বিষয় বিষয়ীর এই পার্থক্য কল্পনা করিলে ভ্রান্তি আসিবেই। বিষয়ের দিক্ হইতে বিষয়ীর যে স্থান, বিষয়ীর দিক্ হইতে বিষয়েরও ঠিক্ সেই স্থান—উভয়ের মধ্যে কোন পৌর্ব্বপর্য্যায় কল্পনা বস্তুতত্ত্বের দিক্ হইতে নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক। সুতরাং বিষয়জগৎ পরিত্যাগ করিয়া আত্মার মধ্যে লুকাইবার চেষ্টা করিলে আত্ম-জ্ঞানও ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। ইহার পরিণাম বৌদ্ধ শূন্যবাদ। আবার যাঁহারা আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য মানিয়া লইয়াছেন, তাঁহারা অজ্ঞেয়-বাদের অন্ধকার-গর্ত্তের দিকে চলিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্যই স্পেন্সার ও তন্মতা-বলম্বিগণ বলেন, যে ব্যাবহারতঃ (phenomenally) জড় ও আত্মা উভয়ই সত্য, কিন্তু পারমার্থিকভাবে ইহাদের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং দুই স্বতন্ত্র এবং বিপরীত দিক্ হইতে জগতের দিকে দৃষ্টি করা চলে। উভয়ে স্ব স্ব দিক্ হইতে পূর্ণরূপে

স্পেন্সার

* যদি কোন বাঙ্গালী পাঠক এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিতে চান, তবে তিনি পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রণীত "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" পাঠ করুন।

জগৎকে গ্রাস করিতে চায়। হয় জগৎ অন্ধশক্তি সকলের সমষ্টি, না হয় মানসিক ভাবসমূহের একত্রাবস্থিতি। কিন্তু বিপদ এই, দুইটির একটিকেও পরিত্যাগ করা চলে না। যদি জড়বাদী হই, বলি আত্মা জড়ের পরিণাম ; আর যদি আত্মবাদী হই, বলিব জড় আত্মার গুণ। একটিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যটি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। অথচ প্রথম হইতেই একান্ত ভেদ কল্পনা করিলে উভয়কে গ্রথিত করিবার সূত্রও হারাইয়া যায়। হারাইয়া যায় বলিয়াই উভয়ের সমন্বয় অসম্ভব হইয়া উঠে। যদিও স্পেন্‌সার দায়ে পড়িয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, যে এক নিত্য বস্তুর অস্তিত্ব ছাড়া জ্ঞানের ব্যাখ্যা হয় না (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য), কিন্তু বুদ্ধির দোষে তাঁহা বুদ্ধির অগম্য স্থানে রাখিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এক দিক্ ছাড়িয়া আর এক দিক্ যেমন প্রতিষ্ঠিত হয় না, তেমনই সে সূত্রও তাঁহার মতে ধরাঁ-ছোঁয়া দেওয়ার অতীত যাহা দ্বারা উভয়কে গ্রথিত করা যাইতে পারে। ব্রহ্মবস্তুকে নাকি ভাবিতে গেলেই তিনি অব্রহ্ম হইয়া যান। এমন "স্বখাত সলিলে ডুবে মরা" দর্শন শাস্ত্র দ্বিতীয়টি নাই। তাই কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া স্পেন্‌সার বলিয়াছেন—"কি বিপদ ! জড়ের ব্যাখ্যা কেবল আত্মার সাহায্যেই হয়, এবং জড় ছাড়িয়াও আত্মার ব্যাখ্যা করিতে পারি না। আত্মার ব্যাখ্যা শেষ করিতে না করিতে ধাক্কা খাইয়া জড়ে যাইয়া পড়ি, জড়ের ব্যাখ্যা শেষ করিতে না করিতে আত্মাকে আশ্রয় করি। হায়রে মানুষের ভাগ্য !" দোষ ভাগ্যের নয়, বুদ্ধির। অখণ্ড বস্তুকে গায়ের জোরে খণ্ড করিয়া শেষে বুদ্ধির প্রাণ লইয়া টানাটানি। আমাদের নিত্যকার অভিজ্ঞতায় জড় ও আত্মা এক হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকে গায়ের জোরে ভিন্ন কল্পনা করিয়া এখন সম্বন্ধ খুঁজিয়া অস্থির—সেতু ভাঙ্গিয়া দিয়া নদীর দুই পারের যোগ দেখাইতে যাইয়া গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হইবে বই কি ! আমাদের অভিজ্ঞতায় যে জড় ও আত্মার একত্ব দেখি, স্পেন্‌সার দর্শনে তাহার ব্যাখ্যা নাই। তাঁহার মতে জড় ও আত্মা একান্তই ভিন্ন। বহুত্বপূর্ণ এই ব্যাবহারিক জগৎই আমাদের জ্ঞানের বিষয়, আমাদের জ্ঞান সুতরাং বহুত্বপূর্ণ, এখানে একত্ব নাই। অথচ একত্বের জ্ঞান ছাড়া জ্ঞানই হয় না। সুতরাং একটি একত্ব আছেই, সেটা পারমার্থিক; কিন্তু তাহা জ্ঞানের বিষয় নয়। এক দিকে বস্তুসম্পর্কবিরহিত একত্ব, অন্যদিকে 'একত্ববিহীন বহু। কেন না, একত্ব পারমার্থিক, কাজেই

জড় ও আত্মার লৌকিক ধারণা ভ্রান্ত

অজ্ঞেয়। বহু ব্যাবহারিক, এক মাত্র তাহাই জ্ঞানের বিষয়—কেন না পরস্পরের সম্বন্ধেই জ্ঞান এবং জ্ঞানমাত্রই সীমায় আবদ্ধ। সুতরাং এক ও বহু দুই বিভিন্ন কোটিতে অবস্থিত, অথচ এক অন্যের অপেক্ষা করিতেছে। বোধ হয়, এক সঙ্গে এত অসঙ্গতি আর কোন দর্শনে নাই। এক পারমার্থিকও অজ্ঞেয়, বহু ব্যাবহারিকও অজ্ঞেয়। কিন্তু এই ব্যারহারিক জগতের প্রত্যেক জ্ঞানখণ্ড ঐ অখণ্ড পারমার্থিক তত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের যে দৈনিক অভিজ্ঞতা ইহা তো ব্যাবহারিক, কিন্তু ইহাও জ্ঞান—অথচ ইহার মধ্যে যে একত্ব আছে তাহা প্রত্যক্ষ। এই পারমার্থিক একত্ব ও অভিজ্ঞতা বহুত্ব, ইহারা একান্ত স্বতন্ত্র দুই কোটি। এই যে স্ববিরোধ, ইহাকে স্পেন্‌সার মিলাইয়াছেন এইরূপে—একত্ব যে আছে তাহা নিশ্চয়, তা না থাকিলে চলেই না, যেহেতু তাহা প্রত্যক্ষ। তবে সেটা কি রকম জ্ঞান—তা সহজেই বুঝা যায়—সেটা কি না—অর্থাৎ **জানি না**। আমাদের দেশের এক পণ্ডিতও এই বিপত্তিতে পড়িয়াছিলেন—তিনি আবার যে সে নন, স্বয়ং কপিল মুনি—একুশ অবতারের একজন। তিনি মস্ত জহুরি কি না, তাই "আত্মারামের অস্থি"র এক আঘাতে জগৎটাকে একদম পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। তারপর মহা-বিভ্রাট্। জগতের তো ব্যাখ্যা চাই—পুরুষ প্রকৃতির মিলন ছাড়া তো জগৎ হয় না। তারা কিন্তু চক্রবাক্ মিথুনের ন্যায় এক অলঙ্ঘনীয় নদীর দুই পারে। সুতরাং সৃষ্টি হয় **দৈবাৎ** উভয়ের মিলনে। স্পেন্‌সার-দর্শনের মূলে এক বিরাট্ **জানি না**, আর সাংখ্য-দর্শনের মূলে এই বিকট **দৈবাৎ**। দ্বৈতবাদের পরিণাম ইহাই। বহু দেববাদীও এক দিন "হা'লে পাণি" না পাইয়া "নমো কর্ম্মেভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যো প্রভবতি" বলিয়া এক অবাচ্য অবোধ্য অদৃষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে ফুল ছড়াইয়া দিয়া হা'ল ছাড়িয়া বাড়ীতে গিয়া বসিয়াছিলেন।

এই যে আমরা দেখিলাম, জড়ের ধাক্কায় আত্মায় যাইয়া পড়া আর আত্মার ধাক্কায় জড়ে যাইয়া পড়া—ইহার কি কোন প্রতীকার নাই? আছে। এই যে এক ও বহু, ইহা বস্তুসম্পর্কবিহীন এক্ বা সম্বন্ধশূন্য বহু নহে। পণ্ডিতেরা এক অখণ্ড বস্তুকে খণ্ড করিয়া, আপনাদের কল্পনায় খণ্ডকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সত্তা দিয়া দর্শনশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। সুতরাং শত বাদ লইয়া লক্ষ বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। এক ও বহু—একই বস্তুর দুই দিক। জগৎ বাস্তব পদার্থ—

ইহাকে কোন বস্তুসম্পর্কবিহীন নির্গুণ সত্তার দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে গেলে—যেমন স্পেন্সার বা শঙ্কর (পাঠকগণ মাপ করিবেন—এ দুই নাম একত্র হইতে পারে না, তবে এক জায়গায় সাদৃশ্য আছে বলিয়াই এরূপ করিলাম) করিয়াছেন—তাহাতে ভ্রান্তি হইবেই। পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক, নির্গুণ ও সগুণ সত্তা যদি দুই স্বতন্ত্র কোটিতে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে এক অন্যের সঙ্গে কোন সম্বন্ধেই আবদ্ধ হইতে পারে না, এক অন্যকে ব্যাখ্যা করিতেই পারে না যতক্ষণ না তৃতীয় "কিছু" উভয়কে আপনার মধ্যে একত্র করিয়া দেয়। আমাদের অধ্যাত্মবাদ এই বিবাদের মীমাংসা করিতেছেন। অধ্যাত্মবাদ এক ও বহু আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে একান্ত পার্থক্য বা বিরোধ স্বীকার করেন না। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে যখন দুইএরই স্থান রহিয়াছে তখন দুইই সত্য। ভিন্ন বলিয়াই এক, এক বলিয়াই ভিন্ন। ভেদ না থাকিলে যেমন একত্ব অর্থহীন, তেমনই একত্ব না থাকিলে ভেদ অবোধ্য। ইহা না বুঝিয়াই স্পেন্সার প্রভৃতি ভেদ ও একত্বের মধ্যে অনতিক্রমণীয় পার্থক্য কল্পনা করতঃ একটিকে নিতান্ত ব্যাবহারিক অন্যটিকে নিতান্ত পারমার্থিক মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমাদের দেশের নির্গুণ-সগুণের বিবাদ চিরপ্রসিদ্ধ। সম্বন্ধ না থাকিলে যে ভেদ জ্ঞান হয় না, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। এক মণ ও এক মাইলের মধ্যে কে বড় কে ছোট, কে ভাল কে মন্দ, তাহা নির্ণীত হইতে পারে না এই জন্য, যে উভয়কে তুলনা করিবার মাপকাঠি নাই অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে একত্ব নাই। কিন্তু ক্ষুদ্র বালুকণার সঙ্গে ঐ প্রকাণ্ড সূর্য্যের পরিমাণগত পার্থক্য যতই বেশী হউক না, উভয়ের ভেদ বুঝিতে পারি, কেন না, উভয়ের মধ্যে একত্ব আছে—সম্বন্ধ আছে—এক স্থানে উভয়েই এক—এমন কিছু আছে যাহা উভয়কে এক করিয়াছে। যদি বলি ক ও খ পরিমাণে ভিন্ন, তাহা হইলে বলিতে হইবে ক ও খ এক অর্থাৎ সম্বন্ধযুক্ত। যে সেতু নদীর দুই পারকে একত্র করে, সে-ই যে আবার দুই পারের ভিন্নতাও সম্পাদন করিতেছে। সম্বন্ধ ছাড়া ভেদ নাই। সুতরাং যাহাকে বলি ব্যাবহারিক জগৎ তাহারই মধ্যে পারমার্থিক একত্ব রহিয়াছে। ব্যাবহারিক জগতে ভেদ দেখিয়া যদি তাহার কারণ খুঁজিতে যাই পারমার্থিক জগতে, নির্গুণকে ছাড়িয়া যদি সগুণ অবোধ্য হয়, তবে বুঝিতে হইবে পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক, সগুণ ও নির্গুণ একসূত্রে

এক ও বহু স্বতন্ত্র বস্তু নহে

গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে—এই উভয়ের মিলনে যে বস্তু সেই সমগ্র বস্তুটিই ব্রহ্মবস্তু। এই সমগ্র তত্ত্বটি লইয়াই অধ্যাত্মবাদ আপনার যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে, ইহাকে লইয়াই বিচার করিয়াছে, এবং ইহারই মধ্যে অধ্যাত্ম-বাদের গতি নিরস্ত হইয়াছে। সুতরাং জড় ও আত্মার মধ্যে, বহুত্ব ও একত্বের মধ্যে, যত বড় ভেদই কল্পনা করা যাক্ না কেন, কিছুরই মধ্যে ইহা বিভীষিকা দেখিতে পায় না। ইহার কাছে কিছুরই মধ্যে একান্ত বিরোধ নাই, সম্বন্ধবিহীন ভেদ নাই। যত কেন বিভিন্নতা থাকুক না, সকলে পরিণামে অনন্ত ব্রহ্মবস্তুতে একীভূত হইয়াছে। ব্রহ্মবস্তু জ্ঞানবস্তু; কাজেই, জ্ঞান-জগতের বাহিরে কোন অজ্ঞেয় জগৎ নাই। সুতরাং জগতের ব্যাখ্যায় "জানি না" বা "দৈবাৎ" প্রভৃতি দৈত্যদানবেরও আশ্রয় লইতে হয় না। একমাত্র ব্রহ্মই আশ্রয়। এমন কিছুই নাই যাহা জ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নহে। এই জ্ঞানবস্তু, ব্রহ্মবস্তুই বিচার্য্য ও জ্ঞাতব্য—"সঃ বিজ্ঞেয়ঃ" মাণ্ডুক্য,৭।

কিন্তু এই জ্ঞানবস্তুতে মানবচিন্তা হঠাৎ আসিয়া উপনীত হয় নাই। এক ও বহু, সম্বন্ধ ও ভেদ, আত্মা ও জড়—ইহাদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, একত্বও আছে—এই জ্ঞান প্রথম হইতেই মানবচিন্তার মধ্যে ছিল না। সাধারণ মানুষ চিন্তাবিহীন অবস্থায় জড় ও আত্মা একই বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল; ভেদবিহীন সম্বন্ধ ও সম্বন্ধবিহীন ভেদ স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। ক্ষুদ্র শিশু জড় ও আত্মার ভেদ জানে না; সে আছাড় খাইয়া উঠিয়া মাটিতে পদাঘাত করে, প্রতিশোধ লইবার জন্য। জ্ঞানের এই নিম্নতম সোপানে মানুষ বহুও স্বীকার করে, একও স্বীকার করে, কিন্তু উভয়কে একত্র করিতে না পারিলে যে অসঙ্গতি-দোষ ঘটিল তাহা সে বুঝিতে পারে না। জ্ঞানের এই অবস্থায় সহজভাবেই ভেদবিহীন সম্বন্ধ ও সম্বন্ধবিহীন ভেদ স্বীকৃত হয়, কিন্তু উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র কি তাহার জ্ঞান হয় না। এই যোগসূত্রের প্রয়োজনীয়তা আসে যখন উভয়ের পার্থক্যজ্ঞান স্পষ্টীকৃত হয়। ইহাই জ্ঞানের দ্বিতীয় সোপান। যখন এই জ্ঞান হয়, যে এক ও বহু, সম্বন্ধ ও ভেদ দুই স্বতন্ত্র বস্তু—তখন একটিকে স্বীকার করিলে অন্যটিকে পরিত্যাগ করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। বিষয় ও বিষয়ীর পার্থক্য এত সুস্পষ্ট যে উভয়কে এক কোটিতে গ্রহণ করা যায় না। যদি এক সত্য হয়, তবে "নেতি" "নেতি" করিয়া বহুকে পরিত্যাগ করতঃ একে উপনীত হইতে হইবে। বহুত্ববাদী বলিবেন, ঐ যে একের কথা বল, ও কিছু নয়, থাকিলেও সে

অজ্ঞেয়, উহা লইয়া মাথা ঘামান নিতান্ত পণ্ডশ্রম; একত্ববাদী বলিবেন, বহু লইয়া থাকা সে তো বিনাশের পথ—"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি,"২।১।১০। বস্তুতঃ একান্ত একত্ববাদ বা একান্ত বহুত্ববাদ বা জড়বাদ—উভয়েই বিনাশের পথে লইয়া যায়। বহুত্ববাদী জড়ে আবদ্ধ হইয়া আত্মজ্ঞান-বিহীন হইয়া পড়েন। তাঁহার কাছে আত্মা জড়ের সমষ্টি বা সূক্ষ্ম জড়ে পরিণত হয়। সুতরাং জ্ঞানের দিকে তিনি যেমন জড়বিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন উচ্চতত্ত্বের ধার ধারেন না, তেমনই কর্ম্মের দিকে ধর্ম্মাধর্ম্মবিবর্জ্জিত সুখবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মানুষকে পশুর পদবীতে অবনত করিয়া দেন। অন্যদিকে আবার, জ্ঞানের দিকে আত্মবাদী যেমন বহুত্বপূর্ণ বিষয়জগতের মধ্যে বিকার ও পরিবর্ত্তন দেখিয়া দেশকালের অতীত আত্মাকে খুঁজিতে খুঁজিতে শেষে শূন্যবাদ বা বিনাশবাদে উপনীত হন, তেমনই কর্ম্মের দিকে সংসারের মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন হইয়া পড়েন। পাখায় বাতাসের আঘাত লাগে বলিয়া পাখী যদি বায়ুমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাত স্থানে উড়িতে যায় তবে তাহার যে দশা হয়, বহুত্বপূর্ণ বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিশেষ একত্বের অন্বেষণকারীর দশা তাহা অপেক্ষা কম শোচনীয় নহে। যে-সমস্ত বিষয়ের সংস্পর্শে সুখ হয় তাহা পরিত্যাগ করিয়া "সুখ" "সুখ" করিয়া ছুটিলে কখনও সুখ হয় না। সেই জন্য ঋষি স্পষ্টই বলিযাছেন, যে এই দুইকে পৃথক্ করিয়া দেখা ঘোর অজ্ঞানতার ফল। কারণ-সম্পর্কবিহীন কার্য্য বা কার্য্যসম্পর্কবিহীন কারণ—প্রকৃতি-বিরহিত পুরুষ বা পুরুষবিচ্ছিন্ন প্রকৃতি—এ উভয়ই অজ্ঞানতার প্রসূতি—

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥" ঈশ, ১২

যাহারা [কেবল] অসম্ভূতি (অর্থাৎ প্রকৃতির) উপাসনা করে, তাহারা গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে। আর যাহারা [কেবল] সম্ভূতি (অর্থাৎ কারণাত্মক ব্রহ্মে) অনুরক্ত তাহারা তদপেক্ষাও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। তখনই কেবল মানুষ এই অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হয়, শোকদুঃখের অতীত হয়—"তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ", ঐ ৭—যখন সেই এককে দর্শন করে যিনি এই বহুত্বপূর্ণ জগৎকে পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিষয় বিষয়ীরূপে অবস্থিতি করিতেছেন তাহা নহে, কিন্তু সকল বহুত্বের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলকে এক করিতেছেন, সকল বহুত্ব যাঁহার মধ্যে একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে—

"তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ। ঈশ, ৫

এই ঋষিবাক্যের সার্থকতা আমরা একটু চিন্তা করিলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। যিনি সকলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলকে এক করিতেছেন তিনি এক এক করিয়া সকলের অতীত না হইয়া পারেন না। যিনি সূত্ররূপে ক ও খ'এর মধ্যে প্রবেশ করিয়া উভয়কে এক করিতেছেন, তিনি ক'এরও বাহিরে, খ'এরও বাহিরে। ইতিপূর্ব্বেই ইহা বলা হইয়াছে যে ক ও খ'এর ভেদজ্ঞান পাইতে হইলেই উভয়ের সম্বন্ধজ্ঞাপক অভেদসূত্রের জ্ঞান চাই, নতুবা ভেদজ্ঞান অর্থহীন হইবে। কাজেই জ্ঞানোন্নতি-মার্গে এই ভেদসোপানে বসিয়া থাকা চলে না। হয় পূর্ব্বের অভেদজ্ঞানে চলিয়া যাইতে হইবে, নতুবা ভেদের মধ্যে অভেদতত্ত্বকে আবিষ্কার করিতে হইবে। কেন না, একটু সূক্ষ্ম ভাবে চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে জ্ঞানের মধ্যে এক হইতে বহুকে, সম্বন্ধ হইতে ভেদকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। একান্ত ভেদ ভেদই নয়—যে বস্তুদ্বয়ের মধ্যে ভেদ কল্পিত হয়, উভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিতে না পারিলে ভেদজ্ঞানই সম্ভব নয় এবং সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিতে গেলেই এমন সূত্র চাই যাহা উভয়ের পক্ষে এক। এই সম্বন্ধযুক্ত ভেদই এক মাত্র ভেদ। এক বা সমগ্রের অর্থই এই, যে ইহা আপনাকে বহুখণ্ডে ছড়াইয়া দিয়া সূত্ররূপে বহুকে এক করিয়াছে এবং বহু খণ্ড বা অংশের অর্থই এই যে উহারা একের দ্বারা সংবদ্ধ হইয়া সমগ্রে পরিণত হইয়াছে। অংশ মানেই সমগ্রের খণ্ড—সুতরাং সমগ্র বহুখণ্ডে বিভক্ত না হইলে অংশ হয় না। কাজেই একদিকে যেমন একের সঙ্গে যুক্ত হওয়া চাই, তেমনই পরস্পরের সঙ্গে ভিন্ন হওয়া চাই—ইহারই নাম বহু। এক বলিলে যেমন এক ও বহু বুঝাইবে, তেমনই বহু বলিলে বহু ও এক বুঝাইবে। অংশ বলিলেই সমগ্র বুঝায়, সমগ্র বলিলেই অংশ বুঝায় এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ভেদ ছাড়া অংশের কোন অর্থই নাই। ইহা বুঝিলেই এক ও বহু, সম্বন্ধ ও ভেদের বিবাদ মিটিল। কেন না, এককে ছাড়িয়া বহু, বহুকে ছাড়িয়া এক, ভেদকে ছাড়িয়া সম্বন্ধ, সম্বন্ধকে ছাড়িয়া ভেদ কল্পনা মাত্র, ইহাদের বস্তুগত কোন অস্তিত্ব নাই। এরূপ কল্পনা আত্মঘাতী। এই যে ভেদগর্ভ অদ্বৈত ইহাই প্রকৃত বস্তু। সকল ভেদকে আত্মস্থ করিয়া রহিয়াছে যে অদ্বৈত, অথবা অদ্বৈত কর্ত্তৃক সমন্বিত হইতেছে যে ভেদ—ইহাদের প্রকৃতি লইয়া আলোচনা চলিতে পারে

সমগ্র ও অংশ

কিন্তু ইহাদের অস্তিত্ব বিচার বিতর্কের বাহিরে। আপনার ছায়াকে অতিক্রম করিবার চেষ্টাও যা, ইহাদের অস্তিত্বে সন্দেহ করাও তা। কেন না, ভেদ ও একত্ব কেবল অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য নহে, কিন্তু চিন্তারত জ্ঞানের পক্ষে অনতিক্রমণীয় মূলসূত্র। কোন এক অংশকে জানিতে হইলে অন্যান্য অংশের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ জানা চাই, কিন্তু সমগ্রের আলোক ছাড়া সে জ্ঞান হয় না। সমগ্রেরই উপরে আমরা পদভর ন্যস্ত করিয়া অগ্রসর হইতে পারি, কোন অংশের উপরে নহে। যতক্ষণ এই সমগ্রের জ্ঞান পরিস্ফুট না হয় ততক্ষণ কি আত্মজ্ঞান কি বিষয়জ্ঞান কিছুই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। আত্মজ্ঞান বিষয়জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে, বিষয়জ্ঞান আত্মজ্ঞানের উপর নির্ভর করে এবং উভয়ের জ্ঞান—ধর্ম্মজগতের ভাষায়—ব্রহ্মজ্ঞানের উপর নির্ভর করে।

জীব ও জড়ের ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই

আমরা দেখিলাম, সমগ্রকে ছাড়িয়া অংশ অর্থহীন। সুতরাং ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র করিলে জীব ও জগৎ মিথ্যা। সমগ্রের দুই দিক্—বিষয় ও বিষয়ী। এই বহুত্বপূর্ণ অংশের সমষ্টি বিষয়ের দিক্, আর এই বহুত্বকে যিনি একত্ব দিতেছেন তিনি বিষয়ীর দিক্। এই বিষয়-বিষয়ী-সমন্বিত সমগ্রই ব্রহ্ম। আর এই সমগ্রই যখন ব্রহ্ম, তখন বিষয়ও এক ছাড়া দুই নহে, বিষয়ীও এক ছাড়া দুই নহে, এবং উভয়ে মিলিয়া মূল এক-বস্তু। সুতরাং ব্যক্তি-গত জ্ঞানে আমরা যে বহু বিষয় ও বিষয়ীর কথা বলি তাহা সত্যকার পদার্থ হইলে ঐ মূল বিষয়-বিষয়ী হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না। স্বতন্ত্র বলিলেই মিথ্যা, মায়া হইয়া যাইবে। সুতরাং ব্যক্তিগত জীবনকে যদি সত্য পদার্থ বলিয়া পরিচয় দিতে হয় তবে তাহা ব্রহ্মপদার্থই—ব্রহ্মের অনুপ্রকাশ মাত্র। তাই রাজর্ষি রামমোহন যখন এই কথাটাকেই একটু জোর দিয়া বলেন, "যে তোমার আত্মারূপে প্রকাশ সেই ব্যাপ্ত চরাচরে" তখন আমাদের অন্তঃকরণ তাহাতে অবাধে সায় দিতে পারে। তিনি আরও বলিয়াছেন, "একাত্মা জানিবে সর্ব্ব অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডময়।"

এই অখণ্ড অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব আমাদের চিন্তার মধ্যে থাকিয়া আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞানকে পরিবর্ত্তিত করিতেছেন এবং বিষয়-বিষয়ীর ভেদের মূলে থাকিয়া তাহাদিগকে সমন্বিত করিতেছেন—তাহা বুঝাইয়া দেওয়াই যেমন দর্শনশাস্ত্রের প্রধান কাজ, তেমনই এই ব্রহ্মবস্তু আত্মারূপে, অন্তর্য্যামীরূপে আমার জীবনে প্রকাশিত থাকিয়া কিরূপে সকল সম্বন্ধের মধ্য দিয়া আমাকে নিয়মিত করিয়া

লইয়া চলিয়াছেন তাহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয় করিয়া দেওয়াতেই ধর্ম্মের সার্থকতা। ইহাই অধ্যাত্মবাদের শিক্ষা। তাই ঋষির সঙ্গে এককণ্ঠ হইয়া বলি—

যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ।

তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥ মুণ্ডক,২।২।৫

যাঁহাতে দ্যুলোক, ভূলোক ও আকাশ এবং সমুদায় প্রাণসহ মন ধৃত হইয়া রহিয়াছে, সেই ব্রহ্মবস্তুকেই জান, অন্য কথা পরিত্যাগ কর। অমৃতত্ব লাভের এই একমাত্র উপায়।

এই জ্ঞানভাবইচ্ছাসমন্বিত সত্যশিবসুন্দরস্বরূপ আত্মবস্তুই ত্রিজগতের মূল কারণ। বস্তু দুই নয়, এক। উপাদান ও নিমিত্তকারণ একই। এই

জীবাত্মা অমর

আত্মবস্তু, এই জ্ঞান-ভাব-ইচ্ছা-সমন্বিত সত্যশিবসুন্দর-স্বরূপ আত্মবস্তুই ত্রিজগতের মূল কারণ। বস্তু দুই নয়, এক। উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ একই। এই আত্ম-বস্তু নিজের শক্তিতেই অন্তর্নিহিত আদর্শকে দেশকালরূপ 'কাঠামো'র মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শক্তিশক্তিমতয়োরভেদত্বাৎ। আত্মার মধ্যে যে মঙ্গলরূপ আছে, তাহার আকৃতি গ্রহণ করিবার যে প্রচেষ্টা, তাহাই সৃষ্টিক্রিয়া। এই সৃষ্টিক্রিয়ার প্রকৃতিই এই, যে উহা এক দিনে হঠাৎ নিষ্পন্ন হইয়া যাইতে পারে না। স্রষ্টা ও সৃষ্টি একই বস্তুর দুই দিক্, একটী শেষ হইলে অন্যটিও শেষ হইয়া যায়। দেশকালের মধ্য দিয়া এই সৃষ্টি অনন্ত কাল চলিবেই। এবং যাহা কিছু ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে এবং ঘটিবে, সকলেরই অভিপ্রায় ঐ আত্মবস্তুতেই নিহিত রহিয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে স্ব-ইচ্ছা সম্ভূত শক্তির প্রয়োগে স্বীয় অভিপ্রায় সাধন করে। মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তির তাহাই সর্ব্বোচ্চ প্রকাশ যাহার সাহায্যে সে প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্ত্তন আনয়ন করতঃ আপনার শ্রেয়োমার্গে অগ্রসর হয়। সুতরাং সহজেই ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, যে প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তি কার্য্য করিতেছে তাহারও অভীষ্ট মঙ্গলই। এই মঙ্গল অভিপ্রায় প্রত্যেক মানুষের মধ্যে, জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, কার্য্য করিতেছে। মানুষের অনুভূতির পশ্চাতে থাকিয়া এই মঙ্গল ইচ্ছা তাহাকে দিয়া কাজ করাইয়া লইতেছে। ইহা কোনও মানুষের মন-গড়া নহে। এই মঙ্গল ভাবই সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সত্য বস্তু। সুতরাং জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা কোন মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আছে, এই জগৎ-ব্যাপারের অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ রূপেই আছে। উদ্দেশ্য

সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত উহা থাকিবেই। প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের যখন অবশ্যই একটা উদ্দেশ্য রহিয়াছে, তখন সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত, ইহকালেই হউক পরকালেই হউক, তাহার বিনাশ নাই। কিন্তু "সঃ চানন্ত্যায় কল্পতে" শ্বেত, ৫।৯। সুতরাং সে অনন্ত জীবনের অধিকারী হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। জগৎ যে আত্মবস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত মানব যখন সেই বস্তুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে অবস্থিত, তখন অনন্ত জীবনই তার আপন জীবন। এ **জীবন-প্রবাহের** শেষ নাই। যম নচিকেতার "যেয়ম্প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে কঠ, ১।১।২০।" প্রশ্নের উত্তরে কথাটার স্পষ্ট উত্তর দেন নাই, যেন গোঁজামিলই দিয়াছেন।

পরিপূরক (ঘ)

অদ্বৈত

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি। কঠ, ২।১।১১

যে দিন মানুষ জানিয়াছিল "সোঽহমস্মি", অথবা যে দিন সে বলিতে পারিয়াছিল "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো", সে দিন মানবাত্মার ঊর্দ্ধগমনের ইতিহাসে এক বিশেষ দিন। ইহার পরেও মানব কত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার জ্ঞান-ভাণ্ডারে কত রত্ন সঞ্চিত হইয়াছে, কিন্তু "আমি সেই" এই তত্ত্ব লাভ করার পর তাহার ঊর্দ্ধগমন স্থগিত হইয়াছে—আর উপরে সে উঠিতে পারে নাই। এক দিক্ দিয়া বলিতে গেলে ইহা ঠিক, যে উহা জানার পর তাহার আর কোনও জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট রহিল না। তাই যে দিন সেই মহাতত্ত্ব এই ক্ষুদ্র মানবাত্মার অধিগম্য হইয়াছিল, যে দিন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এই মানব-সন্তান সাহস করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল, "ঐ মহা জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যের মধ্যে যে পুরুষ সে আমারই আত্মা", তাহা মানবেতিহাসের মহাস্মরণীয় দিন। মাধ্যাকর্ষণ-আবিষ্কার অপেক্ষাও যে তাহার গুরুত্ব শতগুণ অধিক, তাহা বলাই বাহুল্য। সেই জন্যই ঋষিগণ মানবজাতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (First Begotten Children of God)। এই মহাসত্যে উপনীত হইতে তাঁহাদিগকে কত চিন্তা,

কত গবেষণা, কত ধ্যানধারণাব মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। কেন না, সহস্র সহস্র বৎসর পরেও আজ আমরা অতি অল্পই এই মহাসত্যের অনুসরণ করিতে সমর্থ হইতেছি। একটু ধরিতে যাইয়া উহাকে কত আবিলতার সঙ্গে জড়িত করিয়া ফেলিতেছি।

অজ নিত্য শাশ্বত আত্মা এক—বহু হইতে পারেন না; "বহু স্যাম্" বিষয়ের দিক্ হইতে আত্মা বহু হইলে তাহাব আত্মত্ব, জ্ঞাতৃত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়। যাহা জ্ঞাতা তাহাই আত্মা, যাহা জ্ঞাত তাহা আত্মা নহে। সুতরাং জ্ঞাতা "আমি" ছাড়া আর আত্মা থাকিতে পারে না, এই আত্মাই অদ্বৈত অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পুরুষ—আবেষ্টনের বহুত্বে বহু বলিয়া প্রতীয়মান হ'ন। যাহা "আমি" "তুমি" "তিনি" বলিয়া লৌকিক জ্ঞানের নিকট বিবিধ ভাবে প্রকাশিত হয়, মূলতঃ তাহা এক ও অদ্বিতীয়। একই আত্মাকে বিষযের বিভিন্নতায় ভিন্ন বলিযা ভ্রম হয। আত্মা বিষয়সমূহ হইতে স্বতন্ত্র নহে। বিষয়ী বিষয়সমূহের সঙ্গে জড়িত। বিষয় কিন্তু বহু, এবং এই বহু বিষয় বহু খণ্ডসমষ্টিতে (aggregates) বিভক্ত হইয়া জ্ঞানের অনন্ত বিষয়রূপে প্রতিভাত হইতেছে, কিন্তু ইহাতে জ্ঞাতার বহুত্ব সম্পাদিত হইতেছে না। এক মানুষ হইতে যে আর এক মানুষ বিভিন্ন, তাহা কেবল বিষয়ের বিভিন্নতায়, আত্মার বিভিন্নতায় নহে। এক অদ্বৈত অখণ্ড আত্মাই সকলেব মধ্যে জ্ঞাতারূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন। যেমন এক গোলকে (globe) কেন্দ্র হইতে বিবিধ ব্যাসার্দ্ধ লইয়া সমান অসমান কোটী কোটী বৃত্ত অঙ্কিত করা যাইতে পারে—সকলের কেন্দ্র এক হইলেও পরস্পর পরস্পর হইতে বিভিন্ন,—তেমনি এই জীবজগৎ একাত্মা হইয়াও পরস্পর হইতে বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিষয়-সমষ্টির বিভিন্নতায় এক মানুষ অন্য মানুষ হইতে বিভিন্ন, উভয়ের আত্মা এক। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কি জড় কি জীব সকলই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ আত্মার প্রকাশ মাত্র। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ঐ আত্মার দেহ, আত্মা দেহী। আমি যেমন আমার দেহেব বিভিন্ন অঙ্গ এক সময়ে সঞ্চালন করিতে পারি, একটির দ্বারা আর একটিকে আঘাত করিতে পারি, একটির বিরুদ্ধে আর একটিকে চালিত করিতে পারি, সে জন্য যেমন বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন আত্মার কল্পনা প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ এই বিশ্বদেহের খণ্ড বিষয়সমষ্টির পরিচালনের ব্যাখ্যার জন্য আত্মার বহুত্ব কল্পনা করিবার কোনই প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। একই আত্মা সকলের প্রাণ ও পরিচালক।

এক কেন্দ্র হইতে সকল শক্তি উৎসারিত হইয়া এই বিশ্বসংসারকে চালিত ও নিয়মিত করিতেছে। রাম একজন পুরুষ—পুত্রের পিতা, স্ত্রীর স্বামী, শিষ্যের গুরু, গ্রন্থের লেখক, বাজারে ব্যবসায়ী, সমাজে সংস্কারক ও রাষ্ট্রে রাজনৈতিক। পিতা স্বামী নন, গুরু গ্রন্থকার নন, সংস্কারক ব্যবসায়ী নয়। কিন্তু সকলেই রাম। সেইরূপ একই আত্মা রাম শ্যাম যদু হরি রূপে জগতে প্রকাশিত। যে আত্মা আমার "আমি" রূপে প্রকাশিত তাহাই বিশ্বের কেন্দ্র। এই আমির ভিতরেই আত্মার পরিচয়, আত্মার পরিচয়ের অন্য দ্বিতীয় পথ নাই। ইহারই নাম আত্মজ্ঞানেই ব্রহ্মজ্ঞান।

ঋষিগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম এই তত্ত্ব প্রচারিত হইবার পর ইহা জগতে কতবার আসিয়াছে, কতবার চলিয়া গিয়াছে। মানুষ ইহাকে বেশী দিন ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। কেন না, "ঐ সূর্য্যের ভিতরে যে পুরুষ সে পুরুষ আমিই" তত্ত্বের দিক্ হইতে কথাটা যতই সত্য হউক না, ব্যাবহারিক দিক্ হইতে ইহা এতই আস্পর্দ্ধার কথা বলিয়া মনে হয়, যে এ তত্ত্ব বেশী দিন লোকালয়ে তিষ্ঠিতে পারে না—অরণ্যে পলাইয়া যায়, তাই আরণ্যক ঋষিগণ যে তেজের সঙ্গে বলিয়াছিলেন—

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ। তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি। ঈশ, ১৬—

আমাদের সে সাহসে কুলায় না। ঋষিদিগের পরে আচার্য্য শঙ্কর আবার এই তত্ত্বের সন্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। এই তত্ত্ব বুঝাইতে যাইয়া তিনি যতই কেন ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়া থাকুন না, মালাবার উপকূলের দ্রাবিড়-জাতীয় সেই নাম্বুরী ব্রাহ্মণ এই অদ্বৈত বস্তুটিকে যেমন প্রাণ দিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং হৃদয় দিয়া ধরিয়াছিলেন, আর কেহ তেমন শক্ত করিয়া ধরিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। সেই অদ্বৈত-তত্ত্বদর্শী ও অদ্বৈত-তত্ত্বের উপাসক রামমোহন স্বদেশে বিদেশে একাল সেকালের সকল উপদেষ্টা ও আচার্য্যের সঙ্গে পরিচয় সত্ত্বেও শঙ্কর-শিষ্য বলিয়া নিজেকে প্রতিপক্ষ কর্ত্তৃক উপহসিত দেখিয়াও "আমাদিগকে আচার্য্য-শিষ্য বলিয়া যে শ্লেষ করা হইয়াছে তাহাও আমাদের শ্লাঘ্য হয়" বলিয়া সে উপহাস কেন শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন, তাহার অর্থ আমরা এইখানে প্রাপ্ত হইতেছি। রাজা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, শঙ্কর যেমন কথাটা গোড়ায় যাইয়া শক্ত হাতে ধরিয়াছিলেন, এমন আর কেহ পারেন নাই। আর সকলে ডালপালায় ঘুরিয়াছেন, তাই তিনি শঙ্করের

শিষ্যত্ব মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করাটা একটা শ্লাঘার বিষয় বলিয়া মনে করিলেন।

অদ্বৈত তত্ত্ব সকল তত্ত্বের সার।

অদ্বৈত তত্ত্বের প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে ধর্ম্ম-জগতে কত অঘটন ঘটিয়া গিয়াছে। প্রচলিত ধর্ম্মগুলি দ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মসাযুজ্য লাভের জন্য যখনই প্রকৃত ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা মানব অন্তরে জাগ্রত হয়, প্রাণে ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠে, দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে এই ব্যাকুলতার তোড়ে পড়িয়া মানুষ পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাতে যে জগতে কত দুর্নীতি আসিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অন্যদিকে, ব্রহ্ম লাভ করিতে যাইয়া প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে ব্যক্তিগত জীবনকে উহার সকল আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সমূলে উৎপাটিত করিবার অভিপ্রায়ে তাহারা প্রথমে মর্কট বৈরাগ্যের মরুভূমিতে দগ্ধ হন; পরে প্রতিক্রিয়ায় আবার দুর্নীতির সাগরে ডুবিয়া মরাই তাহাদের সার হয়।

ভ্রান্ত অদ্বৈত-তত্ত্ব অনিষ্টের জনক

বৈষ্ণব কবি ও রবীন্দ্রনাথ

বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণ-লীলায় বস্তুতান্ত্রিক (realist) হইবার আকাঙ্ক্ষায় ইন্দ্রিয়গণকে তৃপ্তি দিবার জন্য “সর্ব্ব অঙ্গ দিয়া সর্ব্ব অঙ্গের” রসাস্বাদনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাতে যে অনর্থ ঘটিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে রসাস্বাদনের ব্যবস্থার কোনই ত্রুটী নাই। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কি আকাশ পাতাল পার্থক্য! সমস্ত জগৎ এক অতীন্দ্রিয় সত্তার লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়া মানুষের সকল ইন্দ্রিয়ের কাছেই জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারে ব্রহ্মগ্রহণ, ইহাই ইহলোকে ব্রাহ্মী স্থিতি। এই জগতেই এবং এই সকল জাগতিক ব্যাপারের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মযোগ লাভ করা যাইতে পারে, ধর্ম্মসাধনার্থীর নিকট ইহার সুস্পষ্ট তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত উপস্থিত না থাকায় ধর্ম্মসাধনে নানা কাল্পনিক পন্থার অবতারণা হইয়াছে। মুখে যিনি যাহাই বলুন না কেন, সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, এ দেশের ধর্ম্ম-সাধন “জগৎটা মিথ্যা” মায়াবাদের এই টীকার (inoculation) প্রভাব কখনও সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া উঠিতে পারে নাই। পরিহার করিতে পারার ফলেই ব্রহ্ম-সঙ্গীতে **গীতাঞ্জলির** আবির্ভাব। এবং ব্রহ্মসঙ্গীতে **স্রষ্টা** কবি রবীন্দ্রনাথ একা নহেন।

পরিপূরক (ঙ)

ব্রহ্মবাদ—প্রাচীন ও নবীন

যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি ॥

প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞানের সংশোধন চাই

ভারতীয় ব্রহ্মবাদ অতি প্রাচীন বস্তু। "একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' বলিয়া ঋগ্বেদে যে একেশ্বরবাদের সূচনা হইয়াছিল তাহাই উপনিষদে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া অদ্বৈত ব্রহ্মবাদে পরিণত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ব্রহ্মতত্ত্ব আর কোথায়ও প্রচারিত হইয়াছে কি না জানি না। জ্ঞানবিজ্ঞানালোকিত এই সভ্যতার যুগে ব্রাহ্মসমাজ যে উপাসনা-পদ্ধতি প্রচার করিয়াছেন, তাহার মন্ত্রও এই উপনিষদ্-সকল হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর জিনিষ আর জগতের প্রচলিত শাস্ত্রভাণ্ডারে পাওয়া যায় নাই। তাই বলিয়া এই ব্রহ্মবাদের আনুষঙ্গিক যাহা কিছু সকলই যে আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা নহে। এই দুই তিন হাজার বৎসরে জ্ঞানবিজ্ঞানাদিতে যে মহা বিপ্লবকর উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমরা আজ সহসা সেই উপনিষদ্-যুগে যাইয়া উপনীত হইতে পারি না। তাহার মত অসম্ভব ব্যাপার আর কিছুই হইতে পারে না। উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানকেই বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী হইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। নতুবা তাহা কোনও কাজে লাগিবে না। মৃতজীবের কঙ্কাল যেমন যাদুঘরে থাকে, আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ ব্রহ্মজ্ঞানকে যদি আমরা তেমনি পুস্তকাগারের এক কোঠায় আবদ্ধ করিয়া না রাখিতে চাই, তাহা হইলে উহাকে জীবনে সাধন করিতে হইবে। তবেই উহা জীবন্ত হইয়া জগতের কাছে আত্ম-প্রকাশ করিবে। এই কার্য্যসাধনের পথে দুইটী বিঘ্ন আছে—বিঘ্ন দুইটী হইতেছে সন্ন্যাস ও দেববাদ—উভয়েই বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা দীক্ষার বিরোধী, উভয়কেই পরিহার করিতে হইবে।

ঋষিগণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে ইহার সঙ্গে

জাতিভেদের অহি-নকুল সম্বন্ধ—উভয়ে এক সঙ্গে থাকিতেই পারে না। পিতার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইলে ভ্রাতার সঙ্গে বাদ চলে না। গৃহে ব্রহ্মজ্ঞান আনিলে জাতিভেদ থাকে না। অথচ বর্ণাশ্রম ছাড়াও সমাজ চলে, এ জ্ঞান পরিপুষ্ট হইবার সুযোগও তখন হয় নাই, এবং বরাবর যাহা চলিয়া আসিয়াছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া নূতনের সম্মুখীন হইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষাও তখন জাগে নাই; তাই তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানকে সন্ন্যাসীর আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন। অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মজ্ঞান সাধন করিতে চাহেন, তাঁহাকে চতুর্থ আশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে। তখন দেখা গেল, ইহা বড়ই অসুবিধাজনক ব্যাপার। ব্রহ্মজ্ঞান উদয় হইলেই সব ছাড়িয়া ফকীর হইয়া যাইতে হইবে? এরূপ স্থলে হয় ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা হইতে বিরত থাকিতে হইবে; না হয়, গৃহে থাকিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। জাতীয় জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ যাহা, মানব-সভ্যতা ও সাধনার সর্ব্বোচ্চ বিকাশ যাহা—যাঁহারা এই বিকাশ লাভ করিতেন, তাঁহাদের সন্তানসন্ততিগণ সকলেই সেই সম্পদ লাভের চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবে, তাহা হইতেই পারে না। তাই তাঁহারা পরে নিয়ম করিয়াছিলেন, যতক্ষণ উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে বসিয়া উপাসনা করা হইবে ততক্ষণ কেহ জাতিভেদ মানিতে পারিবে না, মানিলে অধোগতি প্রাপ্ত হইবে। "ব্রহ্মচক্রে মহেশানি জাতিভেদং বিবর্জ্জয়েৎ" (**সংস্কার ও সংরক্ষণ** দ্রষ্টব্য)। কিন্তু চক্রের বাহিরে আসিলেই জাতিভেদের প্রভাব অক্ষুন্ন। অর্থাৎ স্কুলে গোল হইলেও পৃথিবীটা বাড়ীতে যে-চ্যাপ্টা সেই চ্যাপ্টা। ইহা নিতান্তই স্ববিরোধী ব্যবস্থা। এমন করিয়া মানবজীবন চলে না, অখণ্ড মানবজীবনকে এমন করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া অগ্রসর হওয়া যায় না। তাই, ব্রহ্মজ্ঞান স্ব-দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া গিয়াছিল। পুরীর মন্দিরের মধ্যে জাতিভেদ নাই। সব জাতি একত্র আহার করিতে পারে, না করিলেই অপরাধ। স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর মুখে শুনিয়াছি, পাপ হইবে এই ভয়ে ব্রাহ্মণ পাণ্ডার মুখে ভাত তুলিয়া দিলেন বটে, কিন্তু সমস্ত শরীর কম্পিত হইল, একবারের বেশী দু'বার হস্ত উঠিল না। এক জীবনে বিপরীত ব্যবস্থা চলে না।

ব্রহ্মজ্ঞানে জাতিভেদ অসম্ভব

আমাদের ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্রই তিনি রহিয়াছেন। আমাদের প্রতিচিন্তা, প্রতি-বাক্য, প্রতি-কার্য্য তাঁহারই সত্তাতে পরিপূর্ণ। আমরা বুঝিতে

পারিয়াছি, "যৎ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ"—আমাদের সমস্ত কার্য্যই তাঁহার উপাসনা, সুতরাং আমাদের ব্রহ্মচক্র পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রকে আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং জাতিভেদ অনুশীলন করিবার অবসরই থাকিতেছে না। অন্যদিকে আবার এই ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার হিন্দুর ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট মিশন্। আমরা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম জগৎকে বিলাইতে যাইতে পারি না। যে ধর্ম্ম আমরা নিজেরাই ঘরের বাহির করিয়া দিয়াছি, তাহা জগৎকে বিলাইতে যাইব কোন্ লজ্জায়? তাহারা যখন জিজ্ঞাসা করিবে, এ ধর্ম্ম তোমার কি উপকারে আসিয়াছে তখন কি চক্ষুস্থির হইবে না? বিশেষতঃ যাহারা সংসারে থাকিয়া পাপতাপের সহিত সংগ্রাম করিবে, ব্রহ্মজ্ঞান কি তাহাদেরই বেশী উপকারে আসিবে না? ইহা সন্ন্যাসীর ভোগ্য হইতে পারে, কিন্তু সংসারীর অত্যাবশ্যকীয়, নিত্য অবলম্বনীয় বস্তু। ইহা না বুঝিয়াই আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের মহা সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলিয়াছি। আমরা আর এখন সন্ন্যাসীদিগকে আমাদের জীবনের সার বস্তু হরণ করিয়া জঙ্গলে পলাইয়া যাইতে দিতে রাজী নহি।

ব্রহ্মজ্ঞান গৃহীর অন্নপান

সকলেই জানেন, স্পেন্ এক সময়ে কেমন প্রবল পরাক্রান্ত জাতি হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ যেন নিভিয়া গেল। কেন? সুপ্রসিদ্ধ মানবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত গ্যাল্টন বলেন, যে Inquisition তাহার কারণ। হুকুম হইল, যিনি প্রাচীন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নবধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন তাহাকেই হত্যা করা হইবে। এই আদেশ কার্য্যে পরিণত হইবার ফল এই—যাহারা প্রাণের মায়া ছাড়িতে পারিল না, তাহারা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রাণরক্ষা করিল। ইহাদের দ্বারা যে-সমাজ গঠিত হইল তাহা যে অবনতির দিকে যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাহারা ধর্ম্ম ছাড়িল না, তাহারা হয় দেশত্যাগ করিল না হয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিল। এইরূপে মহত্ত্বকে উপড়াইয়া ফেলিলে সমাজ যে কেবল আগাছার জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে, তাহাতে কি কোন সংশয় থাকিতে পারে? যুগযুগান্ত ধরিয়া আমাদের সমাজের এই দশাই ঘটিয়াছে। যিনিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন, অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন—হয়, তিনি তাহা লইয়া বাহির হইয়া গেলেন; না হয়, সংসারের খাতিরে তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। যদি চলিয়া গেলেন, তো শিক্ষা ও বংশানুক্রম দুই দিক্ হইতেই সমাজ এই উচ্চ

সাধনার সুফল হইতে বঞ্চিত হইলেন। আর যদি থাকিয়া গেলেন, তবে তিনি বুঝিলেন এবং বুঝাইলেন উচ্চ ধর্ম্ম সংসারীর জন্য নহে। ইহার বিষময় ফল সমাজের উপর বিশেষ ভাবেই ফুটিয়াছে। কোন উচ্চনীতির কথাও শুনিলে লোকে বলে, সংসারে থাকিয়া ও সব চলে না। ধর্ম্ম ও সংসার এই দুইএর মধ্যে একান্ত বিরোধ ঘটাইয়া মানবজাতির যে অনিষ্ট হইয়াছে, এরূপ অনিষ্ট আর কোনও একটী বিষয়ের দ্বারা হইয়াছে কি না সন্দেহ। জাতীয় জীবনের যাঁহারা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা আর এই অমঙ্গলের পথ অবরোধ না করিয়া পারেন না। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের সম্যক্ সাধনা এই গৃহেই করিতে হইবে। অতএব জাতিভেদের অবসর গ্রহণ অনিবার্য্য।

দ্বিতীয় কথা, দেববাদ। উপনিষদের সময়ে পৌত্তলিকতা ছিল না। মূর্ত্তিপূজা ভারতীয় ধর্ম্মে বৌদ্ধধর্ম্মের মৃত্যুকালীন দান। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে ব্রহ্মবাদীর ব্রহ্মও এত সূক্ষ্ম ও নির্গুণ হইয়া উঠিয়াছিলেন, যে উপাসনার জন্য মূর্ত্তিপূজা অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল! বৌদ্ধ ধর্ম্ম বুঝি বা উপাস্য বাদ দিয়াই আরম্ভ হইয়াছিল। পরে যখন উপাস্য গৃহীত হইলেন, তখন বহু মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। উপাসনার প্রথমেই তাঁহারা মূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন। কেন না, অমূর্ত্তের সঙ্গে আদিতেই যাহাদের পরিচয় নাই পরিণামে ভগ্নদশায় তাহারা তাঁহাকে পাইবে কোথা হইতে? ইহাই এদেশে মূর্ত্তিপূজার ইতিহাস। এই স্থানে প্রসঙ্গক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের শিক্ষার কথা উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বরোপাসনা বাদ দিয়া মানুষকে তাহার নিজশক্তির উপর দাঁড় করাইয়া ধর্ম্ম গড়িতে যাইলে যে কি বিষময় ফল ফলিতে পারে, বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ। কত বড় উচ্চ নীতিতত্ত্বের উপরে উহার ভিত্তি? বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা ও সভ্যতার দিনে আবির্ভূত হইয়া যেরূপ পূজা আর কোন মানুষই পাইতে পারে না, সেইরূপ পূজার অধিকারী বিরাট্ পুরুষ বুদ্ধদেব যাহার নেতা এবং অশোকের বিশাল সাম্রাজ্যের সমগ্র শক্তি যাহার রক্ষা ও পরিপোষণে ব্যয়িত, সেই ধর্ম্ম ভীষণ তান্ত্রিক বামাচারে দেশকে ডুবাইয়া অন্তর্হিত হইল, সেকথা ভাবিতেও প্রাণ শোকে দুঃখে মুহ্যমান হয়। এই সাক্ষ্য পাইয়াও যাহারা আবার ঈশ্বরবিহীন নীতির উপরে মানব-সমাজ গড়িতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিজেরাও বিনাশকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন আর সমাজকেও বিনাশের পথে ঠেলিয়া দিতেছেন। যাহা হউক, ঋষিগণ দেবতাদের অস্তিত্ব মানিতেন এবং তাঁহাদের

পরিণত ব্রহ্মজ্ঞানে দেববাদ ও পৌত্তলিকতার স্থান নাই

পূজারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারা যেরূপভাবে এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে ব্রহ্মবাদের কোনও হানি হয় না। তাঁহারা দেবতাদের ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তা মানিতেন না। দেবতার শক্তি ব্রহ্মশক্তিরই প্রকাশ। উপনিষদে ব্রহ্ম-বিদ্যার আখ্যায়িকার দ্বারা ইহাই প্রকাশ পাইতেছে, যে, মানুষ আগে যাহাই মনে করুক না কেন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে বুঝিতে পারে দেবতাদের ব্রহ্মাতি-রিক্ত কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। সুতরাং মানুষের ব্যক্তিত্বে যদি ব্রহ্মবাদের কোনও হানি না হয়, তবে মানুষের অপেক্ষা কোনও উচ্চশ্রেণীর জীবের অস্তিত্বে ব্রহ্মবাদের হানি হইবে কেন? আর, দেব-পূজার যে ব্যবস্থা, সেরূপ পূজা উচ্চ শ্রেণীর জীবকে আমরাও করিয়া থাকি। লাট্ বড়লাট্ রাজ্-রাজ্ড়ারা কোন উপকার করিলে আমরা কি তাঁহাদের স্তুতিবাদ করি না? না, প্রত্যুপকারের আশায় উপঢৌকনাদি দেই না? মানুষের দ্বারা যে দেবতার পূজা, তাহাও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। দেবতারা জলবৃষ্টি দ্বারা তোমাদের শস্য উৎপাদন করিয়া দিতেছেন, তোমরা যজ্ঞধূমের দ্বারা তাঁহাদের অভ্যর্থনা কর, নতুবা দান গ্রহণ করিয়া প্রতিদান না করার জন্য প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে। নিতান্ত চোরের ন্যায় তাহাদের দান গ্রহণ করিও না ঃ—

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥ ৩।১১
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুংক্তে স্তেন এব সঃ॥ ৩।১২, গীতা।

এ পূজা উপাসনা নহে। দেবোপাসককে ঋষি দেবতার পশু বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন—"পশুরেব স দেবানাম্", বৃহ, ১।৪।১০। যাহা হউক, তাঁহাদের এই দেববাদের মধ্যে মানবজাতির শৈশবের পরিচয় মাত্র পাই। শিশু যেমন সকল বস্তুকেই স্বানুরূপ ব্যক্তিত্বের আরোপ দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করে, মানব জাতি শৈশবেও তাহাই করিয়াছে। কেন এরূপ হইয়াছিল তাহাও বুঝিতে দেরী হয় না। আমরা এই প্রাকৃতিক শক্তিসঙ্ঘের কাছে যেরূপ অসহায়, তাঁহারা ইহা অপেক্ষা সহস্রগুণ বেশী অসহায় ছিলেন। এক দিকে হঠাৎ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়া সব বিনাশ করিয়া দিল, আবার কাজের বেলায় সাধ্য সাধনা করিয়াও পাওয়া গেল না। তখন উপহার লইয়া উপস্থিত হওয়ার মত স্বাভাবিক আর কি আছে? এখনকার পণ্ডিতেরা ইহাকে pragmatic

প্রাকৃতিক শক্তি-বিষয়ে অজ্ঞানতার ফল—দেববাদ

বিশ্বাস, কার্য্যসাধিকা বুদ্ধি বলিবেন। আমরা জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া এই শক্তিসমূহ কার্য্যে লাগাইতেছি। সুতরাং আমাদের কাছে দেবতাদের নিকট উপঢৌকন লইয়া উপস্থিত হইবার প্রয়োজনীয়তা চলিয়া গিয়াছে। আমরা শারীর-বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝিতে পারিয়াছি, যে জীব-শরীর (Organism) ছাড়া কোনও পরিমিত ব্যক্তিত্ব বাস করিতে পারে না, এবং কোনও বৈজ্ঞানিক চাতুরীর দ্বারা জল বায়ু অগ্নিকে দেহযন্ত্র বলিয়া প্রমাণ করা যায় না। সুতরাং বর্ত্তমান যুগের ব্রহ্মবাদীর নিকট হইতে দেবতাগণ কাজেই সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, প্রাচীন ঋষিরা দেবতা মানিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রতি অল্পই নৈতিক শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। এবং দেবোপাসকদের ধর্ম্মভাবের প্রতিও বিশেষ সমীহা করিতেন না। উভয় দলের মধ্যে বিশেষ প্রীতির বন্ধন ছিল না। ঐ তো বৃহদারণ্যক উপনিষদের ঋষি বলিতেছেন, যে, যিনি দেবতার উপাসনা করেন তিনি দেবতার পশু। মানুষ যেমন চায় না তাহার পশুর সংখ্যা কমুক, তেমনি দেবতারাও চায় না যে মানুষ ব্রহ্মজ্ঞানী হউক। কেননা, তাহাতে দেবতার পশুর সংখ্যা কমিয়া যায়। ঋষিরা দেবতা ও দেবোপাসক উভয়কেই নিতান্ত কৃপার পাত্র মনে করিতেন। ঋষিরা দেবতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা বরং তাঁহাদের উপহাসেরই বস্তু ছিলেন—কোন কাজেও আসিতেন না, কোন বাধাও দিতেন না। যেন বিশ্বাস করিতে হয় বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন, কোন প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য নহে। এ বিশ্বাস যেন ছিল কতকটা প্রাচীনকালের স্মৃতির প্রতি সম্মান-প্রদর্শন। তাঁহাদের কাছে দেবতার অস্তিত্ব কার্য্যতঃ অনস্তিত্বের কোঠায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। সুতরাং যখন পূর্ব্বমীমাংসাকার তর্ক তুলিলেন, ইন্দ্র বলিয়া যদি কোন দেবতা বাস্তবিকই থাকিবেন তবে তোমাদের আহ্বানে তিনি ঐরাবত সহ ঘটের উপর অধিষ্ঠিত হইলে ঘট তো চুরমার হইয়া যাইবার কথা; তাহা যখন হয় না, তখন বুঝিতে হইবে দেবতার অস্তিত্ব কল্পনা মাত্র। তখন দেবতাদের মহাপ্রস্থানের ঘণ্টা পড়িল। তিনি দেবতা বাদ দিয়া যজ্ঞ রাখিলেন। কিন্তু উত্তরমীমাংসা দেবতা রাখিয়া যজ্ঞের হীনতা সম্পাদন করিলেন। সুতরাং দুই মীমাংসার অধিকারী আমাদের কাছে যজ্ঞ ও দেবতা উভয়েই বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। ভারতীয় ধর্ম্মের বিকাশের ইতিহাসে ইহা একটী ছিন্নপত্র মাত্র। আজ যে ব্রহ্মবাদীর নিকট হইতে দেবতারা চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা এই ঋষিনির্দ্দিষ্ট বিবর্ত্তন-পথেই হইতেছে। কিন্তু বিদায় দিবার পূর্ব্বে প্রাচীন

ব্রহ্মবাদিগণ এই দেবতাবর্গকে কম নাস্তানাবুদ করেন নাই। তাঁহারা আদেশ করিয়াছিলেন, যে দেবতারা ব্রহ্মোপাসকের পূজা অর্চ্চনা করিবেন,—"সর্ব্বে দেবাস্তং বলিমাহরন্তি"। তাই নবীন ব্রহ্মোপাসক দেবতাদিগকে আপনার উপাসনার উপকরণের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পূর্ণচন্দ্রের দিকে তাকাইয়া সমস্ত রজনী কাটাইয়া দিতেন; দাবানলে ভগবানের বহ্ন্যুৎসব দেখিয়া আনন্দে হাততালি দিয়া নৃত্য করিতেন; আবার বাত্যা-তাড়িত সমুদ্রের সেই ভীষণ গর্জ্জনকে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতমে"র চরণে উপহার দিতেন। সাধারণ জীব যেখানে ভয়ে ভীত হইয়া দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়, ব্রহ্মবাদী সেখানে "দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতমে"র লীলা দর্শন করিয়া আনন্দে বিহ্বল হন। কেননা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি, "সর্ব্বে দেবাস্তং বলিমাহরন্তি"।

কে পারে লঙ্ঘিতে শাসন তোমার?
অনন্ত রহস্য মাঝে ইচ্ছা তব আছে লুক্কায়িত!
ব্যক্ত কর যবে, স্বর্গে মর্ত্ত্যে হয় তাহা প্রকাশিত।
আজ্ঞা যদি দাও জলধিরে,
পালে নাকি জলধি সে কথা?
ঘোর প্রভঞ্জন হয় শান্ত
তবাদেশ শিরে ধরি!
মন্দ্রদেব! ঘুরি ফিরি ইফ্রিতিশ চলেছে আপন পথে,
আদেশিলে তুমি থামি যায় গতি তার উত্তাল তরঙ্গ সহ।
প্রভু, পুণ্যময় তুমি,
কোথায় উপমা তব।
যথায় দেবতাগণ গর্ব্ব করি আপনা বাখানে,
সেখানেও সর্ব্বোপরি আছে প্রতিষ্ঠিত তব সিংহাসন।

[বলিয়াছি ভারতীয় ব্রহ্মবাদ প্রাচীন। এই স্তোত্রটি কিন্তু আকেডীয়ন্ (Accadian), খৃষ্ট-পূর্ব্ব তিন সহস্র বৎসরের প্রাচীন বলিয়া কথিত। দেখা যাইবে, যে আকেডীয় ঋষি কেবল ভাবে নয়, উপনিষদের ভাষাতেই স্বীয় ইষ্ট দেবতার স্তব করিয়াছেন। ইংরাজীতে দেবতার নাম দেওয়া হইয়াছে Merodach—আমি মন্দ্রদেব করিলাম। *International Library of Famous Literature* এ প্রকাশিত ইংরাজী কবিতা হইতে সঙ্কলিত। প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩১৭]

দ্বিতীয় স্কন্ধ

সাধন-প্রসঙ্গ

মদ্‌গুণং শ্রুতিমাগত্য ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ।
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্‌॥ ভাগবত

একাদশ অধ্যায়

ব্রহ্ম-সাধন

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্চিন্দন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্যকর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥ ভাগবত

ক। সাধনের আয়োজন

যৎ করোমি জগন্মাতঃ! তদস্তু তব পূজনম্‌।

যে দিন রাজকুমার শুদ্ধোদন-তনয় সিদ্ধার্থ মানব-জীবনের চরিতার্থতালাভে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অসারতা উপলব্ধি করিয়া সিংহাসন পশ্চাতে রাখিয়া মোক্ষান্বেষণের জন্য উধাও হইয়া বাহির হইলেন, সেদিন ভারতের কেন জগতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হইল। শাস্ত্রাদেশানুযায়ী কর্ম্মকাণ্ডের জাল হইতে মুক্ত হইয়া মানবাত্মার পক্ষে স্বাধীন স্বতন্ত্র মার্গে জীবনের সফলতা খুঁজিবার চেষ্টা মানবজাতির ইতিহাসে এই প্রথম। মানব-শিশুকে বহিরাগত শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট নিয়মশৃঙ্খল হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া দেওয়াতেই বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষত্ব, প্রবৃত্তি-পরায়ণ জীবহিংসানিরত স্বর্গফলকামী যজ্ঞরূপ কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিবাদে নহে। শেষোক্ত বিষয়ে বাস্তবিকই বৌদ্ধধর্ম্মের কোনই বিশেষত্ব দাবী করিবার নাই। কেন না, বেদনিষ্ঠ ঋষিগণই "তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদো" বা "প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়াঃ" বলিয়া এবং গীতায় "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচঃ" বলিয়া বৈদিক সকাম কর্ম্মকাণ্ডের উপর বুদ্ধেরই ন্যায় খড়্গ-

হস্ত ছিলেন। বাস্তবিক, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, যে এই আর্য ও বৌদ্ধ প্রতিবাদ দুইটী স্বতন্ত্র বস্তু নহে, একই বৃহৎ স্রোতের দুইটী শাখা মাত্র। উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড হইতে ধর্ম্মজীবনকে মুক্ত করা। প্রকাশ্য বেদ পরিত্যাগেই বুদ্ধের বিভিন্নতা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। * নতুবা বুদ্ধ যে মত প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে স্বদেশে এমন করিয়া বিদেশী হইতে হইত না।

বুদ্ধদেব ও উপনিষদের ঋষি

সাংখ্যকার বেদ মানিয়া ঈশ্বর না মানিয়াও অর্থদক্ষ (orthodox) শ্রেণীভুক্ত রহিয়া গিয়াছেন। আর ব্রহ্মের অস্তিত্ব অস্বীকার না করিলেও বেদ না মানিয়া বুদ্ধদেব নাস্তিকাগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচিত হইলেন। আমার বিশ্বাস বুদ্ধদেব তো উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব অস্বীকার করেনই নাই, প্রকারন্তরে তাহা প্রচারই করিয়াছিলেন। তিনি একটা নূতন নামে তাহা প্রচার করাতেই যত বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছে। কোন কোন উপনিষদের নির্গুণ-ব্রহ্মবাদ ও বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-মতের মধ্যে নাম-বৈসাদৃশ্য ছাড়া আর কোনও পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। এমন কি অনেক সময় সাদৃশ্য দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। যিশুকে ইহুদীবিরোধী (Anti-Jew) করিয়া চিত্রিত করিবার কারসাজিটা বুদ্ধদেবের ভাগ্যেও ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। নতুবা ঔপনিষদ-ধর্ম্মের এক শাখার সঙ্গে এমন একত্ব সত্ত্বেও তাঁহাকে দেশ এমন করিয়া নির্য্যাতন করিল কেন? অথচ ঐ উপনিষদ্‌গুলি এ জাতি বুকে করিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। বুদ্ধদেব যেখানে যেখানে নির্ব্বাণতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সে সব স্থলেই "নির্ব্বাণ" কথার পরিবর্ত্তে 'ব্রহ্ম'-শব্দ ব্যবহার করিলে ঔপনিষদ-ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের পার্থক্য যেন দূরীভূত হইয়া যায়। বুদ্ধের উক্তি-সকল পালি-ভাষায় নিবদ্ধ রহিয়াছে, সে ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞানের বিস্তার ব্যতীত এ তত্ত্বের মীমাংসা হইবে না। † শুনা কথার উপর নির্ভর করিয়া আমাদিগকে গোলক-ধাঁধায় পড়িয়া যাইতে

* বিভিন্নতার অন্য কারণ বুদ্ধের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। এ বিষয়ে কোন ঋষিই তাঁহার সমীপবর্ত্তী নহেন। আর এক কারণ হয়তো প্রাকৃত ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার।

† শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বেদান্তরত্ন মহাশয় 'প্রবাসী' প্রভৃতি মাসিকে এ সম্বন্ধে যে সকল নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতি মূল্যবান্‌।

হইয়াছে। মুণ্ডকোপনিষদে এরূপ কথিত হইয়াছে, যে যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা সেই "অকৃত" ব্রহ্মকে লাভ করা যায় না, "নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন"। বুদ্ধদেব নির্ব্বাণকেও "অকৃত" বলিয়াছেন। ঋষিগণ যেমন বলিয়াছেন ব্রহ্মকে লাভ করিতে হইবে, বুদ্ধও তেমনই বলিয়াছেন, নির্ব্বাণ লাভ করিতে হইবে। সাধনের দ্বারা নির্ব্বাণ গড়া যায় না, কেন না, উহা "অকৃত"। অবশ্য, বৌদ্ধ-দর্শন পরে শূন্যবাদে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল। নির্গুণ ব্রহ্মবাদেরও পরিণতি তো শূন্যবাদে। সকল উপনিষদ্ নির্গুণবাদী নহেন, তাহা সত্য। কিন্তু কোন কোনটির ঝোঁক্ যে বিশেষভাবে নির্গুণের দিকে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। সেই জন্য বেদান্তদর্শনের এক শাখা, মুখে স্পষ্ট স্বীকৃত না হইলেও যে শূন্যবাদে আসিয়াই উপনীত হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতেই হয়। বস্তুতঃ, বিশেষের প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টিশূন্য হইলে দর্শনের দিক্ দিয়াই হউক, আর সাধনের দিক্ দিয়াই হউক, নির্ব্বিশেষ শূন্যে পরিণত না হইয়াই পারে না। এই শূন্যবাদ নির্গুণবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। সুতরাং বেদান্ত-দর্শনের বামমার্গ আর বৌদ্ধদর্শন মূলতঃ একই। তাই শঙ্করের মায়াবাদ যখন তদীয় শিষ্যবর্গের হস্তে প্রকাশ্যই শূন্যবাদের নিকটবর্ত্তী হইল তখন বেদান্তের এই শাখার সঙ্গে বৌদ্ধদর্শনের কোন পার্থক্য দেশের লোক বুঝিতে পারিল না। তাই তাহারা বলেন,—"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বুদ্ধ-মেব তৎ"। কিন্তু সকল উপনিষদ্-ই নির্গুণবাদ প্রচার করেন নাই, তাই ভারতীয় ধর্ম্মের পরিণতি শূন্যবাদে না হইয়া ব্রহ্মবাদে হইয়াছে। সুতরাং ভারতীয় ধর্ম্মের পরিণতি বৌদ্ধধর্ম্ম নহে, ব্রাহ্মধর্ম্ম। উপাস্য শূন্য নহেন—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। শান্তং শিবমদ্বৈতং শুদ্ধম-পাপবিদ্ধং। ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশম্।

বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও বেদান্তের বামমার্গ এক

দর্শনে যেমন বৌদ্ধধর্ম্মের স্বাভাবিক পরিণতি হইয়াছে শূন্যবাদে, সাধনেও তেমনই ইহার পরিণতি হইয়াছে অভাবাত্মক ত্যাগে। ত্যাগের জন্যই ত্যাগ, কোন উচ্চতর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নহে। নির্গুণ ব্রহ্মবাদেরও পরিণতি হইয়াছিল সমাজবিধ্বংসী সন্ন্যাসে। ব্রহ্ম-বাদীও ত্যাগের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন—ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ। কিন্তু এই ত্যাগই জীবনের শেষ লক্ষ্য নহে। ইহা উপলক্ষ্য মাত্র। ব্রহ্ম-লাভই মূল লক্ষ্য। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। আত্মত্যাগের ঘরে জীবনের গতিকে

শূন্যবাদ ও সন্ন্যাস

নিরুদ্ধ করা বৌদ্ধধর্ম্ম। কিন্তু আত্মত্যাগের দরজা দিয়া ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করতঃ জগদাত্মাকে স্বীয় আত্মারূপে উপলব্ধি করাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। সুতরাং যে বৌদ্ধ হয় নাই, তাহার ব্রাহ্ম হইবার অধিকার জন্মে নাই। যে ক্ষুদ্র 'আমি'কে নির্ব্বাণ-সাগরে বিসর্জ্জন দিতে সমর্থ হয় নাই, সে কোথায়ও ব্রহ্মকে খুঁজিয়া পাইবে না। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, "যথার্থ বৌদ্ধ-জীবন ধারণ কর, সমস্ত নির্ব্বাণ কর, কিছুই যেন মনেতে না আসে। শেষে আপনি থাকিবে, তাহাকেও হাত ধরিয়া বিদায় করিয়া দিবে। যদি 'ঈশ্বর আছেন' যোগের এই কথা সিদ্ধান্ত করিতে চাও, তবে 'আমি নাই', ইহা সিদ্ধান্ত কর। জীবাত্মার বিয়োগ, পরমাত্মার আবির্ভাব।" (ব্রহ্মগীতোপনিষৎ)।

খ। সাধনের ত্রিবিধ অবস্থা

মানুষ সর্ব্বপ্রথমে বহির্জ্জগতেই তাহার ইষ্টদেবের সঙ্গে পরিচিত হয়। সে বজ্র-ভয়ে ভীত হইয়া বজ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্রের শরণাপন্ন হয়, ভীষণ বাত্যাতাড়িত হইয়া পবনদেবের সন্তোষবিধানের জন্য যত্নবান্ হয়, আবার প্রবল জলপ্লাবনে যখন তাহার ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া যায়, তখন সে বরুণদেবের স্তব আরম্ভ করে; আগুনে যখন সে পুড়িয়া মরে বা অগ্নির অভাবে চারিদিক্ অন্ধকার দেখে, তখন সে দেবাদিদেব হুতাসনের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়। দেবতা যখন বাহিরে, পূজা-অর্চ্চনাও সুতরাং বাহিরের—বাহ্য যাগ-যজ্ঞাদিই এ অবস্থার একমাত্র অবলম্বন।

দেবতা বহির্জ্জগতে

সে প্রকৃতির দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া দেবতার শরণ লয়, দুঃখ নিবারণ ও সুখলাভই তাহার পূজার নিয়ামক। আত্মসুখান্বেষণ ছাড়া কার্য্যের নিয়ামক অন্য কোনও উচ্চতর আদর্শ নাই। তাই সে দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতে কুণ্ঠিত হয় না,—"হে ইন্দ্র তুমি 'কালা আদ্‌মি'দিগকে মারিয়া ফেল।" তাহার একার সুখের জন্য লক্ষ লক্ষ কালা-আদ্‌মি মরুক্, তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

বহু-দেব ও বাহ্যপূজা

ক্রমে বহুদেববাদ একদেববাদে পরিণত হয়। দেবতা এখন সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি ঐ শক্তি-প্রভাবে বাহির হইতেই জগৎ চালান। নিজে জগতের অতীত কোনও অনির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত। সাধক বিশেষ বিশেষ আকস্মিক ঘটনায় দেবতার পরিচয় পাইয়া ভয়ে, বিস্ময়ে

এক-দেব

বা ভক্তিতে অভিভূত হয়। দেবতা এখন তাহার জীবনেরও বিধাতা, কিন্তু বাহির হইতে। তিনি স্রষ্টা, পাতা, বিধাতা, কিন্তু সকলই বাহিরের ব্যাপার। দেবতার সঙ্গে যে সাধকের সম্বন্ধ তাহা বাহিরের জগৎ-ব্যাপারেই নিঃশেষিত, আর কোনও ঘনিষ্ঠ যোগ নাই। এই অবস্থায় সাধক যত কেন উন্নত পদবীতে আরূঢ় হন না, ইষ্টদেবতার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় হয় না, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা ও বিধাতা বলিয়া ধারণা হয় মাত্র। ইহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া সাধক যখন ইষ্টদেবতার আত্মপরিচয়লাভের জন্য ব্যাকুল হন, তখন তাঁহার চক্ষু বাহির হইতে ভিতরের দিকে যায়, তখন তিনি ইষ্টদেবতাকে আত্মার আত্মারূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাঁহার স্বরূপের পরিচয় পাইয়া কৃতার্থ হন। বহির্জ্জগতে কিছুতেই ব্রহ্মের স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি যতক্ষণ না তাঁহাকে আমার আত্মারূপে দেখিতে পাই, ততক্ষণ সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শন হয় না, ততক্ষণ ব্রহ্মের অস্তিত্ব অনুমানলব্ধ,—"কার্য্য দেখে কর্ত্তা মান,"—উপাসনাদিও বাহিরের সৃষ্টিকার্য্যাদির আলোচনা মাত্র। এ অবস্থায় যে সাধকের ভগবানে নির্ভর তাহা আত্ম-সুখান্বেষণ-সম্ভূত, আত্ম-সমর্পণোদ্ভূত নহে। তাহা কেবল "আর আপন ভাবনা পারি না ভাবিতে তুমি লও মোর ভার।" কিন্তু যখন আত্মদৃষ্টি খুলিল, ভিতরের ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইল, তখন স্বতঃই বাহিরের সঙ্গে একটা বিবাদ উপস্থিত হইল। 'নেতি' 'নেতি'র ধ্বনি উত্থিত হইল। আগে দেবতা কেবল জগতেই ছিলেন, এখন জগৎটা সাধক ও দেবতার মধ্যে প্রাচীররূপে দণ্ডায়মান হইল, জগৎটাকে "মায়া" বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া আর সাধক তৃপ্ত হইলেন না। আমার

দেবতা প্রাণে

দেবতা আমার প্রাণের মধ্যে, জগৎটা শত্রুতা করিয়া আমাকে দেবমন্দির হইতে বাহিরে টানিয়া লইয়া আইসে। সুতরাং বাহিরের যাহা কিছু সবই আমার সাধনের পরিপন্থী, সব পরিত্যাগ কর, সন্ন্যাসী হও, সংসারের সংস্পর্শমাত্রই কলুষিত-জ্ঞানে বর্জ্জন কর। পূর্ব্বে দেবতাও বাহিরে ছিলেন, শত্রুরাও বাহিরে ছিল, বরং বাহিরের শত্রুগণের ভয়ে ভীত হইয়াই দেবতার আশ্রয় লইয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেবতাও ভিতরে, শত্রুগণও ভিতরে— এখন "বাহিরের শত্রুগণ আমার কিছুই করিতে পারে না, যদি আমি ভিতরের শত্রুগণকে বশে রাখিতে পারি"। এখন শত্রু অগ্নি জল বায়ু নহে, যাহারা আমার সুখ নষ্ট করে, কিন্তু কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি রিপু যাহারা আমার মনকে ইষ্টদেবে নিমগ্ন হইতে দেয় না, বাহিরের দিকে লইয়া যায়। এখন

সুখান্বেষণে সুখ নাই, সুখস্পৃহার দমনেই সুখ। সকল দুঃখের মূল যে "বাসনা" তাহার নিবৃত্তিই পরম সাধন। ইহাই সাধকের জীবনের বৌদ্ধভাব। নির্ব্বাণে ইহার পরিসমাপ্তি। এখন সাধক "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ"। এখন দুঃখও তাঁহাকে উদ্বেগ দিতে পারে না, সুখও তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না, উভয়কে দমনে রাখাই তাঁহার সাধন। কিন্তু এইযে মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির উন্মূলন, ইহার সাধন অনন্তকাল চলিতে পারে না। সাধক দেখিতে পান, যে তাঁহার বাসনার মূল আত্মায় নিহিত, মূল বিনষ্ট না হইলে সিদ্ধি নাই, সুতরাং আত্মার ঐকান্তিক নির্ব্বাণই চরম সিদ্ধাবস্থা। ইহাই বৌদ্ধভাবের শেষ পরিণতি।

আবার অন্যদিকে, বহির্জ্জগৎ হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া যে অন্তর্জ্জগতে প্রবেশ করিলাম, সে অন্তর্জ্জগতের স্থায়িত্ব কতকাল? পদে পদেই দেখি আমার অন্তর্জ্জগৎ বহির্জ্জগতেরই প্রতিকৃতি, বহির্জ্জগৎ যদি মায়া হয় অন্তর্জ্জগৎও তাই, বহির্জ্জগৎকে ছাড়িয়া অন্তর্জ্জগৎও ভিত্তিশূন্য। বহির্জ্জগৎ ছাড়িয়া দিলে আত্মাও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং আমি যে আমার আত্মার আত্মাবাসে জ্ঞান প্রেম পুণ্যের আধারকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তিনি এখন কোথায়? যদি একেবারে বৌদ্ধের শূন্যবাদে যাইয়া না পৌছাই তাহা হইলেও নির্গুণ সত্তা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং সাধক তখন ভিতরে যে জ্ঞান প্রেম পুণ্যের আধারের সন্দর্শন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে লইয়া আবার বহির্জ্জগতে ফিরিয়া আসেন। বহির্জ্জগৎ আর এখন সে বহির্জ্জগৎ নাই। এখন আর বহির্জ্জগৎ অনুমান-ক্ষেত্র নহে, ভগবানের সাক্ষাৎ লীলাক্ষেত্র। আমরা যে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করি তাহা আংশিক দর্শন মাত্র। কেন না, আমার ব্যক্তিগত জীবন এই জগতের অতি সামান্য অংশ মাত্র, আমার ব্যক্তিগত জীবনে যে ভগবানের প্রকাশ তাহা তাঁহার পূর্ণ প্রকাশ হইতে পারে না। সুতরাং পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ দেখিতে হইলে আমাদিগকে বহির্জ্জগতে ও মানব-সমাজে প্রবেশ করিতে হইবে। এখন আর ভিতর বাহির নাই, সব একাকার। ইষ্টদেবতা সর্ব্বত্র, ইষ্টদেবতা সকল কাজে, ইষ্টদেবতা সকল ঘটনায়। জল, স্থল, শূন্য তাঁহারই লীলায় পরিপূর্ণ। মানবসমাজ, মানব-পরিবার তাঁহার লীলাক্ষেত্র। কোন কাজ নাই যাহা হইতে আমি নিবৃত্ত

বাহির ও ভিতরের বিরোধে শূন্যতার জন্ম

হইতে পারি। ধর্ম্ম ও সংসার এক। ধর্ম্ম ছাড়া সংসার বলিয়া কিছু নাই, সংসার ছাড়িয়া ধর্ম্ম বলিয়া কিছু নাই। সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা, শিল্প-বাণিজ্য যাহা কিছু সকলেই ধর্ম্ম; কেন না, সকলেই ভগবানের আত্মপ্রকাশক্ষেত্র, সকলেই ভগবানের লীলাক্ষেত্র। আমি যে পরিমাণে কোন এক ক্ষেত্র হইতে দূরে পলায়ন করি, সেই পরিমাণে আমার মধ্যে ভগবানের আত্মপ্রকাশে বাধা জন্মাই, আমি সেই পরিমাণে ভগবানের লীলার অন্তরায় হই, এক কথায় আমি "ব্রহ্ম"হত্যা-পাতকে লিপ্ত হই।

সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম

সাধক এখন ভগবানের লীলাক্ষেত্র মাত্র। তিনি তাঁহার ইষ্টদেব হইতে স্বতন্ত্র কিছুই নহেন। তিনি ইষ্টদেবের সঙ্গে একীভূত হইয়া গিয়াছেন। এ অবস্থায় "আর আপন ভাবনা পারি না ভাবিতে তুমি লও মোর ভার" অর্থশূন্য। এখানে আত্ম-ভাবনা ও ইষ্টদেবে নির্ভর একই কথা। সাধক এই অবস্থায় যখন উপনীত হন, তখন তিনি দ্বন্দ্বাতীত। সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, সম্পদ্ বিপদ, নিন্দা প্রশংসা, মান অপমান, লাভ ক্ষতি কিছুতেই তাঁহার যোগ ভঙ্গ হয় না। "সুখদুঃখে সমে ভূত্বা"—তাঁহার সুখ দুঃখ সমান হইয়া গিয়াছে। সুখও তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে, দুঃখও তাহাই। সর্ব্বাবস্থায় সকল ঘটনায় এখন সাধক কেবল বলেন "তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" "সর্ব্বে দেবা তং বলিমাহরন্তি।" জল স্থল শূন্য, অন্তর বাহির, বাহ্যজগৎ ও মানব-সমাজ সকলেই তাঁহার পূজার উপকরণ বহন করিতেছে। সাধক যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, যে ঘটনাই ঘটুক না কেন, যে কার্য্যই কৃত হউক না কেন, সকলেরই মধ্যে তিনি ভগবানের মঙ্গলভাব দর্শন করিয়া শান্ত সমাহিত, নিশ্চিন্ত ও যোগযুক্ত। উত্থান-পতন, জন্ম-মৃত্যু সকলই তাঁহার পূজার ফুল। স্বপ্ন জাগ্রৎ সুষুপ্তি সকল অবস্থাতেই তিনি পূজানিরত মৌন বা কথোপকথন সকলই তাঁহার পূজার অবস্থা। নিমীলিতচক্ষু তিনি পূজায় ব্যাপৃত, উন্মীলিতচক্ষু তিনি পূজায় নিমগ্ন। জীবন পূজাময়। তাই বোধসার (লয়তত্ত্ব) বলেন :

জন্মৈব পরমা পূজা অবতারো হরের্হি সঃ।
মরণন্তু পরা পূজা নির্ম্মাল্যত্যাগরূপিণী।
দুঃখমেব পরা পূজা দুঃখমুদ্বর্ত্তনং যথা॥
রোগ এব পরা পূজা রোগৈঃ পাপক্ষয়ো যতঃ।
আরোগ্যং পরমা পূজা আরোগ্যং মোক্ষসাধনম্॥
ক্রিয়া তু পরমা পূজা তদর্থং ক্রিয়তেঽখিলং।

অক্রিয়ৈব পরা পূজা নিশ্চলা ধ্যানরূপিণী ॥
সৎসঙ্গঃ পরমা পূজা সৎসঙ্গং মুক্তিসাধনং।
অসৎসঙ্গঃ পরা পূজা যত্র মোহঃ পরীক্ষ্যতে ॥
স্তুতিরেব পরা পূজা স্তুতৌ দেবঃ প্রসীদতি।
নিন্দৈব পরমা পূজা সুহৃদাং গালয়ো যথা ॥
ভাষণং পরমা পূজা জপস্তুতিময়ী হরেঃ।
মৌনং হি পরমা পূজা মৌনং ব্যাখ্যানমস্ত যৎ ॥
লাভ এব পরা পূজা লাভঃ সন্তোষকারণং।
হানিরেব পরা পূজা তস্মাদেব বিমুচ্যতে ॥
জাগরঃ পরমা পূজা বিশ্বরূপস্য দর্শনং।
স্বপ্নস্ত পরমা পূজা পরমং প্রেক্ষণীয়কঃ ॥
সুষুপ্তিঃ পরমা পূজা সমাধির্যোগিণাং হি সা।
তুরীয়ং পরমা পূজা সাক্ষাৎকারস্বরূপিণী ॥ (সংগ্রথিত)

গ। সাধকের আকাঙ্ক্ষার তারতম্য

ভগবদ্গীতায় ১০।৯-১০আছে—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

যাহারা মচ্চিত্ত ও মদ্গতপ্রাণ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আমার কথা বুঝাইয়া আমার জ্ঞান লাভ করে এবং আমার গুণ কীর্ত্তন করিয়া নিত্য তুষ্ট নিবৃত্তি লাভ করিয়া থাকেন, সেই সকল মদ্গতচিত্ত ও ভজনশীল ব্যক্তিদিগকে আমি এরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্দ্বারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়।

এই শ্লোকদ্বয়ে যে সাধনের সঙ্কেত নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয়। কেন না, ইহার মধ্যে দুই রকম সাধন-পন্থার প্রতিবাদ নিহিত আছে, এবং চারি রকম সাধন-গতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রথম,—এক শ্রেণীর সাধক

আছেন, যাঁহারা 'নেতি, নেতি' পথ ধরিয়া ব্রহ্মকে সর্ব্ব বিশেষত্ব বর্জ্জিত করতঃ শূন্য-ব্রহ্মে যাইয়া উপনীত হন এবং ইহাই তাঁহাদের নিকট মোক্ষ। সুতরাং মোক্ষপথে আমাকে একাই চলিতে হইবে। অন্যের সহায়তা চাই না। 'বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্' তাঁহাদের মোক্ষর পথে অন্তরায়। তাঁহাদের ব্রহ্ম একরস (Homogeneous)। পরস্পরের অভিজ্ঞতা একত্রিত করিলে যে বহুত্ব-সম্পন্ন একত্বের আবির্ভাব হইবে তাহা ইঁহাদের কাছে মোক্ষের সাধন না হইয়া তাহার পরপন্থী হইবে। কিন্তু গীতাকার পরস্পরের সাহায্যকে মোক্ষসাধনের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করতঃ এই পন্থার প্রতিবাদই করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজও "একাকী যাইলে পথে নাহি পরিত্রাণ" ঘোষণা করিয়াছেন। **দ্বিতীয়তঃ,**

ভজনের আনন্দই শেষ নয়

—আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা সকলে মিলিয়া ভগবানের নামকীর্ত্তনাদিতে যে ভাবোদ্রেক হয়, আনন্দ হয়, তাহাকেই ধর্ম্মসাধনের চরম বলিয়া মনে করেন। তদতিরিক্ত আর কিছুর খবরও তাঁহাদের নাই, আর কিছুর আকাঙ্ক্ষাও তাঁহারা করেন না। ইঁহাদিগকে ধর্ম্ম-জগতের বিলাসী (Epicurean) বলা যাইতে পারে। **তৃতীয়** শ্রেণীর সাধক আরও উপরে উঠেন। তাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক ভগবানের ভজনে নিযুক্ত থাকেন। কিন্তু গীতাকার স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে ইহা পন্থা বা পাথেয়, গন্তব্য বহুদূরে। 'তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ' জীবনের চরম সার্থকতা নহে। কেন না, এইরূপে ভগবানের নাম-গুন-গান ও পরস্পরের তত্ত্ব কথার দ্বারা পরস্পরকে সাহায্য করিয়া যে ভজনা হয়, তাহার সুযোগে ভগবান্ মানুষকে যে জ্ঞান প্রদান করেন, তাহাদ্বারাই মানুষ তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। ইহাই মানবজীবনের চরিতার্থতা। ইহাই **চতুর্থ** গতি। এই যে "বোধয়ন্ত, পরস্পরম্" কথাটা, ইহা যে কি তাহা মধুসূদন সরস্বতী অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাঁহারা ধর্ম্ম-জগতে বিলাসী, যাঁহারা 'তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ' লইয়াই শেষ করেন, তাঁহাদের কাছে অবশ্য উহা 'ঢেঁকির কচ্‌কচি' মনে হইবে। কিন্তু পথ উহাই। তিনি ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—"বিদ্বদ্‌গোষ্ঠীষু পরস্পরমন্যোন্যং শ্রুতিভির্যুক্তিভিশ্চ মামেব বোধয়ন্তঃ তত্ত্ববুভুৎসুকথয়া জ্ঞাপয়ন্তঃ'—শাস্ত্র ও স্বানুভূতিদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব পরস্পরকে বুঝাইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। তবে তো সেই বুদ্ধিযোগ লাভ হইবে যাহাদ্বারা ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। এই 'পাওয়া যাওয়া' কি তাহাও আচার্য্য শঙ্করের কথায়ই ব্যক্ত আছে,—সে বুদ্ধিযোগটা কি না "যেন বুদ্ধিযোগেন সম্যগ্‌দর্শনলক্ষণেন মাং পরমেশ্বরা-

ত্মভূতং আত্মত্বেনোপযান্তি”—পরমেশ্বরকে আপনার আত্মারূপে জানাই তাঁহাকে পাওয়া। ইহাই কাষ্ঠা, ইহাই পরাগতি। ইহার কমে হইবে না, ইহার অতীতও কিছু নাই। এইখানে আমরা ‘বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্’ কথাটার সার্থকতা বুঝিতেছি। ভগবান্ এই বিচিত্র জগৎ সৃজন করিয়াছেন। ইহার বিচিত্রতা তাঁহারই প্রকাশ। সুতরাং তাঁহাকে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে ‘নেতি নেতি’ করিয়া এই বিচিত্রতাকে পরিহার করিতে হইবে না। কিন্তু সকলকে আত্মস্থ করিয়া ব্রহ্মের অঙ্গীভূত করিয়া লইতে হইবে। আমাদের প্রত্যেকের যে ‘স্বানুভূতি’ তাহা একত্র করিয়াই প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্বে আমরা উপনীত হইতে পারি। সেইজন্য ধর্ম্মমণ্ডলী ‘বিদ্বদ্গোষ্ঠী’ চাই, যাঁহারা পরস্পরকে সাহায্য করিয়া বিচিত্র-স্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হইবার সুযোগ প্রদান করিবে। অবশ্য, ‘যেন মামুপযান্তি তে’ ইহা ভগবদ্‌কৃপা। তার উপর হাত নাই। তবে আমাদিগকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু প্রস্তুত হওয়ার পথে—যে দুই রকম সাধন প্রণালীর উল্লেখ করিলাম, গীতার এই শ্লোকদ্বয় যাহার প্রতিবাদ বলিয়া মনে করি—তাহারা ইহার পরিপন্থী। সতর্ক হইয়া—এই অন্তরায় দূরীভূত করিতে হইবে। ইহারা ভিতরের শত্রু। সেইজন্য বেশী মারাত্মক। প্রস্তুত হওয়ার সার্থকতা এই যে, আলো যখন আসিবে দরজা খোলা না পাইলে তাহা আমাকে স্পর্শ করিবে না। কৃষক ভূমি কর্ষণ করিয়া বসিয়া থাকিবে—বৃষ্টির উপরে তার দাবী নাই। আলো ও বৃষ্টি ভগবদ্‌কৃপা। তাঁর চরণে মাথা রাখিয়া বসিতে হইবে। যিনি তাঁর কৃপার উপর নির্ভর করেন তিনি কখনও নিরাশ হন না।

ধর্ম্মমণ্ডলী চাই

রাজা রামমোহন রায় সাধকদিগের যে শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন, তাহাতে, যাহারা ব্রহ্মের ধারণা করিতে অসমর্থ, সাকারোপাসনায় নিযুক্ত—তাহারা সাধক জগতের নিম্নাধিকারী। যাঁহারা ব্রহ্মের ধারণা করিতে সমর্থ, তাঁহারাও সবল ও দুর্ব্বল অধিকারী-ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যে সকল সাধক বিশেষ কোন অবলম্বন—যেমন ওঙ্কার—ব্যতীত ব্রহ্মে মন স্থির রাখিতে পারেন না, তাঁহারা দুর্ব্বলাধিকারী। সবলাধিকারীর সাধন দুই পথে—একটী অন্যটীর পরিপূরক। ব্যতিরেকী-পথে সাধন-মার্গের পরিণাম শূন্যবাদে, এ দেশের মায়াবাদিগণ এই পথে যাইয়া নানা অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। বিশ্বকে ছাড়িয়া বিশ্বাতীতকে ধরিতে গেলে

বুদ্ধিযোগ-লাভের পর

এ অনর্থ ঘটেই। আবার অন্বয়ী পথে, বিশ্বাতীতকে ভুলিয়া বিশ্বরূপ লইয়া মাতিলে, সাকারোপাসনা পৌত্তলিকতা প্রভৃতি দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়ই। তাই দুই দিকেই সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নতুবা, হয় পৌত্তলিকতা না হয় শূন্যবাদ আসিবেই। ব্যতিরেকী প্রণালীর সাধন—ব্রহ্মের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা অভ্যাস বশতঃ প্রপঞ্চময় বিশ্বের প্রতীতির নাশ হইয়া যখন ব্রহ্ম-সত্তা মাত্রের স্ফূর্ত্তি থাকে তাহারই নাম আত্ম-সাক্ষাৎকার। ইহাকেই সাধক কবি বলিয়াছেন, 'সাকার ডুবিয়া মরে নিরাকারে চুপে' (ব্রহ্মলীলা)।

এক বস্তুই নিগুর্ণ ও সগুণ রূপে সাধ্য

এ সাধন ব্রহ্মসত্তার, সত্যস্বরূপের দৃঢ় ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ব্রহ্ম তো কেবলই সত্তা মাত্র নহেন। গুণ কে ছাড়িয়া সত্তা মাত্রে মনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলে ধারণা শূন্যমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং সত্তার ধারণার সঙ্গে গুণের ধারণা যাহা অন্তর্নিহিত (implicit) থাকে, তাহাকে অন্বয়ী সাধনের দ্বারা স্পষ্টীকৃত (explicit) করিতে হয়। তাই, সমাধিবিষয় ক্ষমতাপন্ন হইলে ব্রহ্ম সর্ব্বময় এইরূপ ভাবে ব্রহ্ম সাধনীয় হয়েন। ইহাকেই ভক্ত কবি নিজস্ব ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন—"নিরাকার ফুটে উঠে সাকার রূপে"। ব্রহ্ম সর্ব্বময়, ইহাই বিশ্বরূপ। এই 'সর্ব্ব' আমাদের নিকট তিন মূর্ত্তিতে প্রকটিত—জড়জগৎ, চৈতন্য-প্রকৃতি ও মানবসমাজ। ভাগবতকার এই তিন দৃষ্টির তিনটি নাম দিয়াছেন—"ব্রহ্মেতি পরমাত্মেমতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।" বহির্জ্জগতে যে তত্ত্ব, তাহার নাম ব্রহ্ম—ইহা বৈদিক ভাব। অন্তর্জ্জগতে যে ধারণা উহা পরমাত্মা—ইহাই বৈদান্তিক ভাব। আর, মানব সমাজের স্থিতি ভঙ্গে যে তাঁর বিধাতৃরূপ তাহাই ভগবান্—ইহা পৌরাণিক ভাব। উপনিষদের ঋষি একটী মন্ত্রে এই ভাবত্রয় প্রকাশ করিয়াছেন—"নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্"। এই পরিবর্ত্তনশীল অনিত্য জড় জগতে তাঁহাকে আমরা নিত্যরূপে দর্শন করি। যদি কিছু নিত্য বলিয়া আমরা ধারণা করিতে না পারি, এই অনিত্য জগতের ধারণাই আমাদের হয় না। এই অনিত্য জগতের সংস্পর্শে আসিয়াই, এই অনিত্যকে অনিত্য বলিয়া জানিতে যাইয়াই আমাদের নিত্যতার জ্ঞান পরিস্ফুট হইয়া উঠে। *

* ব্রহ্মসাধক এখানে ব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রণীত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ইত্যাদি গ্রন্থ ও ডাক্তার হীরালাল হালদার কৃত Two Essays প্রভৃতি পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন।

এই অনিত্য জগৎই আমাদিগকে নিত্যের পরিচয় দেয়। আমাদের এই ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে যাহাকে বলি আমার আত্মা, আমার "আমি", তার আবির্ভাব তিরোভাব হ্রাস বৃদ্ধি জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি সকল ব্যাপারের ভিত্তি-স্বরূপ যিনি রহিয়াছেন, যাঁহাকে ছাড়িয়া এ জীবনের এক মুহূর্ত্তেরও ব্যাখ্যা হয় না, যিনি আছেন বলিয়াই আমি আছি, তিনিই পরমাত্মা। "নিদ্রিত নিদ্রিতে নারে জাগাতে কখন"—আমার এই ঘোর সুষুপ্তি-মগ্ন আত্মাকে 'আমি'র যিনি **আমি** তিনি ছাড়া আর কে রক্ষা করিতে পারে, জাগাতে পারে? আত্মার এই জাগ্রত প্রহরীরূপে পরমাত্মাকে আত্মায় ধরিতে হয়। এই সুষুপ্তি ও জাগরণের মধ্য দিয়া পরমাত্মতত্ত্ব—জীবাত্মা পরমাত্মার নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কেমন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ঋষি বলিয়াছেন, "স যথা সোম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে। এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে॥" (প্রশ্নোপনিষৎ, ৪।৭)। অনেকে হয়তো বলিবেন, স্বপ্ন-জাগরণের মত এমন নিত্য ঘটনার মধ্যে তিনি আমাদের সঙ্গে এত মাখামাখি হইয়া রহিয়াছেন, তবু কেন আমাদের দৃষ্টি পড়ে না তাঁর উপর? তা ঠিক, আমরা যে চক্ষু থাকিতে অন্ধ, তাতে সন্দেহ নাই। আমরা তো মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা আচ্ছন্নই রহিয়াছি। কিন্তু দৃষ্টির মধ্যে তাহা পড়ে নাই। একজন ঋষি ফল-পতনের মত একটী অতি সাধারণ ঘটনার সাহায্যে তাহা সকলের গোচরীভূত করিলেন। অধ্যাত্ম জগতের ঋষিরাও স্বপ্ন-জাগরণ-রূপ অতি সামান্য ঘটনার মধ্য দিয়াই ব্রহ্মকে আমাদের হাতে ধরাইয়া দিতেছেন। আবার, আমরা তো যে যার পথে চলিতেছি, যার যার স্বার্থ অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছি, তবে এমন সুশৃঙ্খল মানব সমাজের স্থিতি কিরূপে সম্ভব হইল? পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছি না কেন? আমরা বহু হইলে কি হয়? বহুর কামনার ফল-বিধান একের হাতে বলিয়াই, বহু কামনার ফল একসূত্রে গ্রথিত হইয়া সমাজ-স্থিতি সম্ভব হইতেছে। বহুর অন্তরালে এক রহিয়াছেন যিনি এই বহুকে সম্ভব করিতেছেন, এ সকল শূন্য একের সঙ্গে যুক্ত হইয়া মূল্যবান্ হইয়াছে—"স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়"। এই যে ব্রহ্মের তিন ভাব, ইহা তিনটি স্বতন্ত্র বস্তু নহে—এক অখণ্ড বস্তুকে তিন দিক্ হইতে দেখা। কিন্তু এই তিন দৃষ্টি যেখানে একীভূত সেই আত্মদৃষ্টি না খুলিলে সকলই বৃথা, সুখ শান্তি মিলিবে না—"তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্"। যদিও দেখিব তাঁহাকে জগতে,

আত্মায়, এবং মানব সমাজে, দেখিব কিন্তু 'আত্মস্থ'। আত্মবস্তু কি, ইহার সম্যক্ জ্ঞান ছাড়া সাধন বিফল। যখন বলি, 'এসো হে মম হৃদয়ে' তখন হৃদয় বলিতে কি বুঝি? যদি বুঝি আমার এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত 'আমি' তবে ব্রহ্মের জন্য বড়ই ক্ষুদ্র আসন পাতা হইল। সে আসনে বসাইয়া পূজা করিলে ক্ষুদ্র পরিমিত দেবতারই পূজা হইবে। আত্মা বলিতে সেই বস্তু বুঝিতে হইবে যাহা সর্ব্বব্যাপী যাহার বাহিরে কিছু নাই। তবেই না যিনি এই বিশ্বজোড়া তিনি আমার আত্মস্থ হইবেন। নতুবা তাঁহাকে আত্মস্থ করিবার চেষ্টা বৃথা। আত্মানাত্মবিবেক সাধন পথের প্রথম পাদক্ষেপ। আত্মতত্ত্বালোচনাকে যাঁহারা ঢেকির কচ্‌কচি মনে করিয়া পরিহাস করেন, তাঁহাদের ব্রহ্মসাধন কখনও পরিণতি প্রাপ্ত হয় না। অজ্ঞাতসারে আমরা সেই "সর্ব্বকে" আপনাদের "আমি"রূপে পোষণ করিতেছি এবং "বিহারশয্যাসনভোজনেষু" নানাপ্রকারে অবজ্ঞা করিতেছি। জ্ঞাতসারে এই তত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিলেই আনন্দে ঋষির সঙ্গে গাহিতে পারিব, "নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।" আত্মা বলিতে যদি আমার ক্ষুদ্র আমিকে বুঝি তবে ঋষির সঙ্গে সায় দিতে পারিব না। এবং উপনিষদের ঋষির সঙ্গে সায় দিতে না পারিলে, আর যা-ই হৌক্, ব্রহ্মসাধন কখনও পক্কতা লাভ করিবে না, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু ঋষির সঙ্গে সায় দিতে হইলে রামমোহনের সঙ্গে বলিতে হইবে—

"একাত্মা জানিবে সর্ব্ব অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডময়"।

"যে তোমার আত্মারূপে প্রকাশ সেই ব্যাপ্ত চরাচরে।"

ঘ। ধর্ম্ম ও সংসারের বিরোধ

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ

এখন ব্রহ্ম-সাধনের এক গুরুতর দিকে মনোনিবেশ করা যাক্। নৈমিত্তিক-ভাবে ধার্ম্মিক হওয়া খুবই সোজা। অথবা নিত্য দুই বেলা সন্ধ্যা-আহ্নিক, বন্দনা ও উপাসনার মধ্য দিয়া যে ধর্ম্ম, তাহাও সহজেই উপার্জ্জন করা চলে। সভ্য ভব্য সাজিয়া, চিন্তা ও ভাবকে তৎকালের জন্য সংযত ও অন্তর্ম্মুখীন করিয়া মন্দিরে, দেবালয়ে, গির্জ্জায়, মস্‌জিদে অভ্যস্ত ধর্ম্ম যাজনায় মনোনিবেশ যে খুবই একটা কঠিন কাজ, তাও নয়। মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি এইরূপ ভাসা ভাসা বলিয়া ধর্ম্ম পৃথিবীতে টিঁকিয়া রহিয়াছে। কেননা, সংসারের সকল কাজে, হাটে মাঠে ঘাটে, কাজ কর্ম্মে বেচা কেনায় যদি ধর্ম্মের খোঁজ লও, ধর্ম্ম উবিয়া যায়। এ কথা ঠিক্, নিতান্ত বর্ব্বরাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া মানুষ যখন নৈতিক জীবনে একটুখানি উপরে উঠিয়াছে, তখন তাহার কাছে ভজনালয়ে শান্তি ও গাম্ভীর্য্যের আশা করা যায়। কেহ কেহ বলেন, ভজনালয়ের অন্ততঃ এতটুকু সার্থকতা আছে, যে তৎকালের জন্য মানুষকে কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত রাখে। কিন্তু তারপর সমাজে, পরিবারে, ব্যবসায়ে বাণিজ্যে, কর্ম্মক্ষেত্রের সকল ঝঞ্ঝাটের মধ্যে সে শান্তি ও স্নিগ্ধতা কোথায়? তাই অনেকে "সংসারে শান্তির আশা মরীচিকায় যথা জল" ভাবিয়া সংসার ছাড়িয়া অরণ্যে যাইয়া ধর্ম্ম ও সংসারের বিবাদের মীমাংসা করিয়াছেন। আর যাঁহারা সংসারে রহিলেন, তাঁহারা সংসারের কাছে ধর্ম্মকে বলি দিয়া বিবাদ মিটাইলেন। তাঁহারা ধর্ম্মের ধার ধারিলেন না। কিন্তু এ মীমাংসা সকলের মনঃপূত নহে। তাহারা যতই সংসারাসক্ত হউক না কেন, পরকালটাকে একেবারে হাতছাড়া করিতে রাজী নহে। ইহারা দুইএর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করিয়া ফেলিয়াছে। দুই প্রভুর সেবা এক সঙ্গে না হউক পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে ইহারা করে। জীবনের একভাগে সংসার, শেষের দিকে ধর্ম্ম। অথবা দিনের একভাগে ধর্ম্ম, বাকীটুকু সংসার। রবিবারে উপাসনা, শাস্ত্রপাঠ, সৎপ্রসঙ্গ—আর ক'দিন নির্ব্বিঘ্নে সংসারাচরণ। ইহারা

নৈমিত্তিক ধর্ম্ম

জীবনের প্রথমে ধর্ম্ম, পরে সংসার

ধর্ম্মের ত্রুটি সংসারের দ্বারা ও সংসারের ত্রুটি ধর্ম্মের দ্বারা পূরণ করিয়া লয়। দানাদি পরোপকার প্রভৃতি সংসারীর ধর্ম্ম! আবার মানুষ সর্ব্বদাই সংসারের ত্রুটি ধর্ম্মের দ্বারা মার্জ্জনা করিয়া লইতে চেষ্টা করে। "গরু মে'রে ব্রাহ্মণকে জুতা দান" সেই জাতীয় ব্যবস্থা। সংসারের ত্রুটি "প্রার্থনার দ্বারা সারিয়া" লইবার প্রলোভন ব্রাহ্মসমাজেও নাকি কাহারও কাহারও মনে জাগিয়াছিল। কেহ কেহ আবার ধর্ম্মযাজকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভাবেন, সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং অন্যদের বলিবার সুবিধা হইয়াছে "ধর্ম্ম ধর্ম্ম" ওঁরাই করুন, আমাদের দরকারী অনেক কাজ রয়েছে। উঁহারা আবার ঐ দরকারী কাজগুলি সম্বন্ধে নাসিকা কুঞ্চন করিয়া ধর্ম্ম উপার্জ্জন করেন। এক পক্ষ "ধার্ম্মিক"দিগকে "হংস মধ্যে বকো যথা" ভাবেন; অপর পক্ষে ঠিক্ তার বিপরীত "যেমন হংসের দশা বকের সভায়" মনে করিয়া আত্ম-তৃপ্ত রহেন। হংস মানস-সরোবরের সুনির্ম্মল জলের প্রলোভন দেখায়, বকেরা "নাহি তথা বেঙ্গাচি শামুক" বলিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। এইরূপ একটা আপোষ বা আপোষে কলহ ধর্ম্ম ও সংসারের মধ্যে চলিতেছে।

মানুষ সংসারে পদ্মপত্রের জল

তৃতীয়তঃ—আর এক শ্রেণীর লোক পদ্মপত্রের জলের ন্যায় সংসারে থাকিবার উপদেশ দিয়াছেন। নিতান্ত এখানে এসে পড়েছি, থাক্‌তেই হবে। ছেড়ে গেলেও যেন অপরাধ হয় —ভগবান্‌ই তো এনেছেন। তাই কারাগারেও তো মানুষ থাকে—তথাকার নিয়ম সকল পালন করে, সেই ভাবে ইহারা সংসারে থাকে। সংসারও কর ধর্ম্মও কর—ধর্ম্ম-নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া সংসার করিও না। খুব নীতিমান্ হও এবং সাধন ভজন কর। সংসারের নিকট হইতে 'চুরি' করিয়া যতটা সময় নিয়ে ধর্ম্মে লাগাইতে পার ততই ভাল। দোকানে বসিয়া মালা জপ কর, রামায়ণ পাঠ কর। আবার ক্রেতা আসিলে উঠিয়া গিয়া জিনিষ দাও। অবশ্য, মালা জপ ও রামায়ণপাঠের অন্য নির্দ্দিষ্ট সময় তো আছেই—ইহাই সংসার ও ধর্ম্ম দুই-ই করার একটী স্থূল দৃষ্টান্ত। অপর পক্ষ সংসার করা 'ধর্ম্মের ঘরে চুরি' মনে করিয়াই সংসারে আছেন। খোলের চাটি শুনিয়া আফিসের কাগজ-পত্র ফেলিয়া কীর্ত্তনাঙ্গনে আসিয়া 'দশায়' পড়িলে ধর্ম্মের সঙ্গে দুর্নীতি মিশিয়া যাইবে কিনা তাহা নির্দ্ধারণ করা বড় শক্ত; বিশেষতঃ সমাজ-বিবর্ত্তনের বর্ত্তমান অবস্থায়। ছেলে মেয়েদের যত্নের ত্রুটি হইতেছে, অথচ মা উৎসবের সময় "অমুকের বক্তৃতা", "অমুকের সার্ম্মন্" বলিয়া দিনে পাঁচ বার মন্দিরে

ছুটিতেছেন—ইহার মধ্যে ধর্ম্ম কতখানি, আচার্য্যগণ নির্দ্ধারণ করিবেন। হাততালির মধ্যে কথাটা গুলিয়ে যাওয়া প্রার্থনীয় নহে।

চতুর্থতঃ কথা এই, ধর্ম্ম ও সংসার তেলে জলে না হইয়া জলে জলে কি মিশিয়া যাইতে পারে না? পারে। কিন্তু বাধা এই, যে স্থূল স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়াও ভগবান্‌কে এক সূক্ষ্ম-স্বর্গবাসী করিয়া রাখা হইয়াছে, যাঁহাকে সময়ে সময়ে, বা সময়ে অসময়ে ডাকিয়া (অবশ্য সূক্ষ্ম অর্থেই) মর্ত্ত্যধামে আনিতে হয়। পূজা লইয়া আবার তিনি স্বর্গেই যান। প্রকৃত ব্রহ্মবাদ ছাড়া প্রকৃত ব্রাহ্ম-জীবন হয় না। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইবে, পুনরুক্তি হয় হইবে। যুগ যুগান্ত ধরিয়া ব্রহ্মসাধন অথবা উচ্চ ধর্ম্ম-সাধন মাত্রই এ দেশে সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী-দলের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। রাজর্ষি রামমোহন ভীম বলে সে স্রোত ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করিয়াছেন। সংসারে থাকিয়া মোক্ষধর্ম্ম-সাধন শিক্ষা দিবার জন্য বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব। নতুবা জগতে ধর্ম্ম অনেক আছে, এবং ব্রহ্মজ্ঞানেরও অভাব ছিল না। রামমোহন যদি কৌপীন ধারণ করিয়া সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সকলকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী বৈরাগী দলপতি হইতে যাইতেন, তাহা হইলে আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া রচিত উপাখ্যানের জ্যোতিঃমণ্ডিত হইয়া বুদ্ধদেব আমাদের কাছে যে মূর্ত্তিতে আবির্ভূত রামমোহনের সেই মূর্ত্তি আমরা চর্ম্মচক্ষেই দেখিতে পাইতাম। বুদ্ধদেব পূর্ব্ব পূর্ব্ব চব্বিশ জন বুদ্ধের শিষ্য প্রশিষ্য সম্প্রদায় সকলের বৈরাগ্যের কঠোরতা কমাইয়া তাহাদিগকে পুনর্গঠিত ও একীভূত করিয়াই বিরাট্ বৌদ্ধসংঘের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। রামমোহন সম্পূর্ণ বিপরীত মার্গে চলিলেন। শঙ্করের শিষ্যত্বের অভিমান পূর্ণমাত্রায় মনে মনে পোষণ করিয়াও আচার্য্যের "বিরক্তস্য হি সংসারাৎ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানে-ঽধিকারো নান্যস্য", মতে ও জীবনব্যবস্থায় এই কথার প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ করিয়া এ দেশে কি অসীম সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, এই ব্রহ্মবাদীকে তাহা যদি বলিয়া বুঝাইতে হয় তবে না বলাই ভাল। কিন্তু কিরূপে ধর্ম্ম ও সংসারকে এক করা যায়, ইহাই সমস্যা. গোঁজা মিল দিয়া অগ্রসর হইলে ফল লাভের সম্ভাবনা নাই।

মোক্ষধর্ম্ম ও সংসার-ধর্ম্মের একত্ব-সাধন

রাজর্ষি রামমোহন যখন এ দেশে গৃহস্থের জন্যও ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন প্রশ্ন উঠিয়াছিল—বর্ণাশ্রম-বিহিত যে সমস্ত কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা পরিত্যাগ না করিলে কিরূপে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন চলিতে

পারে? তাহার শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট উত্তর—"যৎ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তৎ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।" সুতরাং যে কর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করা যায় না, তাহা অকর্ম্ম বা বিকর্ম্ম, তাহা কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। **শাস্ত্র ছাড়াও রাজা একটা উত্তর দিয়াছিলেন, সেটা তাঁহার জীবন।** তিনি দেখাইয়াছিলেন, যে সংসার ও ধর্ম্মের মধ্যে যে একটা একান্ত বিরোধ কল্পিত হইয়াছে, তাহা অস্বাভাবিক। মানুষ সংসারে থাকিয়াই ধর্ম্ম সাধন করিতে সমর্থ। জীবনটাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগে সংসার ও এক ভাগে ধর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই। সংসারকে এরূপ ভাবে নিয়মিত করিতে হইবে, যাহাতে সংসার ও ধর্ম্মের চিরন্তন বিবাদের মীমাংসা হইয়া যায়। ধর্ম্মবুদ্ধিতে ভগবানের আদেশরূপে জীবনের সকল কর্ত্তব্য পালন করিলেই তো সংসার ও ধর্ম্মের বিবাদ চুকিয়া যাইবে। জীবনের সকল কর্ম্মে আমরা আমাদের নিজেদের জয় পরাজয় না খুঁজিয়া যদি সত্য ন্যায় ও মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা দেখি, তাহা হইলেই তো সকল কলহ মিটিবার কথা। এই জন্যই ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব। নতুবা ব্রহ্মজ্ঞান এ দেশে নূতন নহে; সে সম্বন্ধে যে বেশী কিছু করিবার আছে তাহাও নহে। তবে তাহার গতি, তাহার মুখটা ফিরাইয়া নূতন পথে লইয়া যাইতে হইবে, তাহাকে নূতন ভাবের মধ্যে, নূতন কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্য দিয়া পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে।

প্রাচীন ও নবীন ব্রাহ্মধর্ম্মে মূলতঃ পার্থক্য তো এইখানেই। প্রাচীনকালে তাঁহারা বলিয়াছিলেন—এক সঙ্গে ধর্ম্ম ও সংসার চলে না, সুতরাং মানুষের জীবনকে দুইভাগে বিভক্ত কর। এক ভাগের উপর দাবী সংসারের, একভাগের উপর দাবী ধর্ম্মের। সংসারে যা কিছু কর্ত্তব্য তাহা পালন কর, যে সমস্ত ঋণ আছে তাহা শোধ কর—যাগ যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদের ঋণ, সন্তান-উৎপাদন দ্বারা পিতৃগণের ঋণ পরিশোধ কর, তখন সময় হইবে সংসার পরিত্যাগ করতঃ অরণ্যে যাইয়া ব্রহ্মসাধন করিবার। এ দুই একত্র চলিবে না। উত্তরে ব্রাহ্মসমাজ বলিয়াছেন, যে—এ দুইয়ের মধ্যে কোনও অসামঞ্জস্য নাই, সুতরাং এ দুই এক সঙ্গেই চলিতে পারিবে। এই দুইকে বিভিন্ন রাখিবার পক্ষে প্রাচীনদিগের কেবল মতলবগত নহে, কিন্তু কার্য্যগত একটা মস্ত আবশ্যকতা ছিল। তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান আবিষ্কার করিলেও তদানীন্তন সমাজ যজ্ঞের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। তারপর, তাঁহারা দেববাদ অতিক্রম করিলেন বটে, কিন্তু দেবতায় বিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই। এইজন্য

জগৎ পরিচালন কার্য্যে দেবতাদিগের সহায়তায় তাঁহারা অনেক পরিমাণে বিশ্বাস করিতেন। যাঁহারা বিশ্বাস করিতেন না, তাঁহারাও যজ্ঞ উড়াইয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। পূর্ব্ব-মীমাংসাকার দেবতা না মানিয়াও যাগ যজ্ঞাদির কার্য্যকারিতা স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং কার্য্যতঃই তাঁহাদের পক্ষে গার্হস্থ্য ও ব্রহ্মজ্ঞান একত্র করিবার সুবিধা হয় নাই। আমাদের সে অসুবিধা নাই। তাই আমরা বলিতেছি, ব্রহ্ম ও সংসার এক সঙ্গে থাকিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই আমরা ইহার গূঢ় অর্থ অনুধাবন করিয়া দেখি না। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বময়, তাঁহাকে তো আর কিছুর সঙ্গে রাখা যায় না। যখন তাঁহাকে ধরিব তখন যে আর সব ছাড়িয়া দিতেই হইবে। নতুবা ব্রহ্ম ব্রহ্মত্ব হইতে বিচ্যুত হইবেন। তিনি আর ব্রহ্ম থাকিবেন না। সেই জন্যই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জন্য ব্রহ্মজ্ঞান আদিষ্ট হইয়াছে, সংসারীর জন্য নহে। তবে আমরা কিরূপে সংসারে থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধন কবিতে পারি? সংসারে থাকিয়া কিরূপে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়া চলে? যদি বলি পদ্মপত্রের জলের ন্যায় থাকিব, তাহা হইলে ব্রহ্ম হইতে সংসারের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কল্পনা করা হইল। সুতরাং বাস্তবিক ব্রহ্মজ্ঞান হইল না। সংসার ("Mammon") ও ধর্ম্ম ("God") যদি দুই রহিল তাহা হইলে বস্তুতঃ সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম সাধন করিবার যে ওজুহাত দেখাইয়া সংসারে আসিলাম, তাহা কার্য্যে পরিণত হইল না। এ বিপত্তি হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র পন্থা **সংসারকে ধর্ম্মে পরিণত করিয়া দেওয়া**। সাংসারিক সমস্ত কর্ম্ম ভগবদুপাসনার ভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে—সমস্তই ধর্ম্ম হইয়া যাইবে। নতুবা ইহার অন্য মীমাংসা নাই। বাস্তবিক কথা এই, আমরা ধর্ম্মকে সংসারে আনিবার ভার লই নাই, কিন্তু সংসারকে ধর্ম্মে পরিণত করিয়া উভয়ের বিবাদ মিটাইবার ভার লইয়াছি। তাঁহারা সন্তান-প্রতিপালন, সামাজিক উন্নতির চেষ্টা প্রভৃতিকে ব্রহ্মসাধনের ব্যাঘাত মনে করিতেন—এগুলি সাংসারিক কর্ম্ম। সুতরাং এগুলি শেষ করিয়া যখন অরণ্যে গেলাম, তখনই বাস্তবিক ব্রহ্মসাধনের সময় আসিল। আমরাও যদি এগুলিকে সাংসারিক কর্ম্ম মনে করি, বড় জোর ধর্ম্মানুমোদিত সাংসারিক কর্ম্ম মনে করি, ইহাদিগকে অন্য কোনও উচ্চতর পদবীতে আরূঢ় করিতে না পারি, তবে প্রাচীনদিগের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য রহিল কোথায়? আমরাও যদি সাংসারিক কর্ম্মগুলিকে ঝঞ্ঝাট বলিয়া মনে করি, যদি ভাবি—এগুলি শেষ

করিয়া কতক্ষণে উপসনায় যাইব—যেমন প্রাচীন তন্ত্রের ধর্ম্ম-পিপাসু গৃহস্থ মনে করিতেন, কবে এ সব ছাড়িয়া বানপ্রস্থের আনন্দ লাভ করিব; যদি খোলের টোকা শুনিয়া সকল কর্ম্ম ভুলিয়া সঙ্কীর্ত্তনে মাতি—যেমন কত লোক পুত্র-কন্যাদিগকে নিরাশ্রয় করিয়া, তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্য ভুলিয়া ক্ষণিক ধর্ম্মোন্মত্ততায় মাতিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাইতেছে—আমাদের অবস্থাও যদি এই হয়, আমরাও যদি এই সমস্ত কর্ত্তব্যগুলিকে উচ্চতর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারি, আমরাও যদি ধর্ম্ম ও সংসারকে দুই দৃষ্টিতে দেখি—তবে আমাদের সঙ্গে প্রাচীনের বিভিন্নতা রহিল কোথায়? তাঁহারা সমগ্র জীবনটাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগে ধর্ম্ম ও একভাগে সংসার রাখিয়াছিলেন, আমরা দৈনিক জীবনকে দুই ভাগ করিতেছি। যখন সংসার করি তখন ধর্ম্ম করি না, যখন ধর্ম্ম করি তখন ভাবি সংসারের হাত হইতে মুক্ত হইলাম। এই ভাবে যখন দেখি, তখন প্রাচীনে নবীনে কোন বিভিন্নতাই দেখিতে পাই না। আর একটা আবরণের মধ্যে আমরা সেই পুরাতন জিনিষেরই উপাসনা করিতেছি। যে নূতনত্বের দাবী করিয়া উপস্থিত হইলাম তাহা কোথায়? আমাদের জীবন দেখিলে মনে হয়, আমরা সে কথা ভুলিয়াই গিয়াছি।

একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্—সংসার যখন আছে তখন অর্থোপার্জ্জন সকলেরই প্রয়োজন। কোন বিষয়-কর্ম্মের দ্বারাই অর্থোপার্জ্জন করিতে হইবে। যদি কাজটি নৈতিক হিসাবে অন্যায় না হয়, তবেই কিন্তু আর আমাদের কোনও আপত্তি থাকে না। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি, এ সম্বন্ধে আমাদের মনে বড় একটা কোন প্রশ্নও উঠে না। টাকা চাই, টাকা উপায় করি। কিন্তু কি কর্ম্মে শক্তি ক্ষয় করিয়া যে টাকা আনিতেছি, সে দিকে দৃষ্টি নাই। যে কাজ করিতেছি, তাহা কি টাকা উপায়ের জন্যই করিতেছি, না আমার **নিজের** ধর্ম্মানুমোদিত কাজ করিতেছি, অর্থটা উপলক্ষ্য মাত্র? যদি অর্থোপার্জ্জনই লক্ষ্য, তবে এই সময়টা কি সংসারে (Mammon-worshipএ) গেল না? তবে ধর্ম্ম ও সংসার এক হইল কোথায়? যাহাতে আমার জীবনের পূর্ণতা তাহা ছাড়া আমি যাহা কিছু করিতে যাইব, তাহাই ঘোর সাংসারিকতা। যে কাজে অধিক অর্থ, আমরা সেই কাজ খুঁজিয়া লই—যে কাজে আত্মার বিকাশ, সে কাজ খুঁজিয়া লই কি? আমরা অর্থোপার্জ্জন করি, তারপর যে সময়টুকু থাকে, তাহাদ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করি। অনেক সময় শুনিতে পাই, "আঃ, ৫০৲ টাকা তো মাইনে, যা কবি তার চাইতে

আর কি বেশী পরিশ্রম করিব ?" ইহাতে এই প্রমাণ হয়, যে, ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত জীবনের যে মহা মূল্যবান্ অংশ প্রতিদিন ব্যয় হইতেছে, তাহা ঐ অর্থের জন্য। কি সর্ব্বনাশ ! ইহার নাম কি সংসার ও ধর্ম্ম এক করা !! আমাদের জীবন "God" ও "Mammon" ভাগাভাগি করিয়া ভোগ করিতেছেন। "Mammon" এর অংশই খুব বেশী "God" এক টুকুরা মাত্র। ইহা অপেক্ষা কি প্রাচীন ভাগাভাগিটা ধর্ম্মের পক্ষে ভাল ছিল না ? বাস্তবিকই বিষয়-কর্ম্ম নির্ব্বাচনে আমরা ধর্ম্মের দাবী একেবারেই ভুলিয়া যাই। সকল মানুষকেই ভগবান্ বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা দিয়াছেন। সেই সেই ক্ষমতার বিকাশদ্বারা তন্নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইয়া মানুষ যদি জগতের উন্নতিতে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে এক দিকে যেমন বিধাতার আহ্বান অগ্রাহ্য করা হয় না, অন্যদিকে অন্ন-কষ্টও থাকে না। নতুবা উভয় দিকই নষ্ট হয়। বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাচন করিবার সময় বিশেষভাবে চিন্তা করিবার বিষয় এই, যে আমি যে ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিতেছি, তাহার প্রত্যেকটি কার্য্য ভগবানের সেবা বলিয়া মনে করিতে পারিব ; না, ভাবিতে হইবে, "না করিলে নয়, নইলে অর্থোপার্জ্জন হয় না, কি করিব ?" তাহা হইলেই সংসারের ভাগ বসিল। বিষয়-কর্ম্ম নির্ব্বাচনের সময় আমাদিগকে বিশেষভাবে ধর্ম্মবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা আমাদের পুত্র-কন্যাগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করি, তাহাতে কোন্ আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হই ? কিসে তাহাদের জীবনের পূর্ণতা হয় তাই ভাবি, না ভাবি, যখন ব্রাহ্ম হইয়াছি, তখন তো সংসার ও ধর্ম্ম এক হইয়াছে, এখন যাহাতে বেশী অর্থোপার্জ্জন হয়, তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা যে ভাবে চলিতেছি, তাহাতে নিশ্চয়ই আমাদের উচ্চ আদর্শ কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। প্রত্যেক কর্ম্মই ব্রহ্মোপাসনা—ইহাই হইল ধর্ম্ম ও সংসারকে এক করিবার সঙ্কেত। অন্য কোন দিকে দৃষ্টি করিতে গেলেই দো'টানায় ধর্ম্ম বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, এবং আদর্শ হস্তচ্যুত হইবে। 'ধর্ম্মরে সংসার সংসাররে ধর্ম্ম" এই দুইকে এক করিতে হইলে "যৎ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তৎ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ" এই মহাবাক্য সর্ব্বদা কার্য্যক্ষেত্রে সকলের মানস-চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত থাকা চাই। তাহা হইলে তাঁহারা আপনাদের প্রত্যেক কার্য্যেই ব্রহ্মে সমর্পণ করিবার অধিকারী এবং তাহা হইলেই তাঁহাদের জীবনের ব্রত উদযাপিত হইল বলিয়া ধরা যায়। জীবনের সকল বিভাগেই যদি আমরা এইরূপ ভাবে চলিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের এই নূতন পথে যাত্রা সফল হইতে পারে ; এবং তাহা

হইলেই ধর্ম্ম ও সংসার এক করার আদর্শ কথার কথা না থাকিয়া, কার্য্যে পরিণত হইতে পারে এবং আমাদের জীবনকে পূর্ণতা প্রদান করিতে পারে। সকলই ব্রহ্মময়—সংসারের অতি ক্ষুদ্র কাজও ব্রহ্মের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয়—এইভাবে জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে না পারিলে ধর্ম্ম ও সংসার এক হইবে না। সর্ব্বত্র জলপ্লাবিত হইলে ঘরের কোণে হাঁড়ি কল্‌সীতে একটু জল-সঞ্চয় প্রয়োজন হইবে না। ক্ষুদ্র ব্রহ্ম লইয়াও ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ লওয়া চলে; কিন্তু তাহাতে প্রকৃত ব্রাহ্ম হওয়া হয় না। ব্রহ্মনিষ্ঠতা—

যৎকরোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুস্ব মদর্পণম্॥

কেবল জপ-তপ টুকু নয়, জীবনের সবটুকুই ব্রহ্মে অর্পিত রহিয়াছে এই-ভাবে ব্রহ্মে অবস্থিতি। ব্রাহ্মধর্ম্ম কিছু কাড়িয়া লইতে চাহিতেছেন না, কেবল দৃষ্টিটা ফিরাইতে বলিতেছেন। এই বিষয়ে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের ইংরাজী 'যোগ' নামক পুস্তিকা পাঠ করিয়া সাধক মহোপকার লাভ করিবেন। ব্রহ্মগীতোপনিষদেও আছে, "সংসারীর পক্ষে সংসারের নানা প্রকার কার্য্য নিকৃষ্ট ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যোগীর চক্ষে সমুদায়ই ব্রহ্মের ব্যাপার"। তাই, ঝাড়ুদার যদি ভাবিতে পারে, ভগবান্ এখন এতটুকু শক্তিরূপেই আমার মধ্যে অবতীর্ণ, তবে তো সে স্বর্গের পথই পরিষ্কার করিতেছে। আর আচার্য্য যদি বেদীতে বসিয়া ভাবেন—তিনি কেমন বক্তা, লোকেরা নিশ্চয়ই তাঁর উপাসনায় উপকৃত হইতেছে, তবে তাঁর গতি কোন্ দিকে তাহা সহজেই অনুমেয়। শিক্ষক যদি তাঁর বেতনের কথাটা না ভাবিয়া ভাবেন—জ্ঞানস্বরূপ আমার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতেছেন, ডাক্তার তাঁর প্রাপ্যের কথাটা না ভাবিয়া যদি ভাবিতে পারেন—বৈদ্যনাথ তাঁর মধ্য দিয়া লোকদুঃখ নিবারণ করিতেছেন, যেমন দেখিয়াছি প্রাতঃস্মরণীয় দিনাজপুরের ঋষি ভুবনমোহনকে; ব্যবহারজীবী যদি আপনাকে বুঝাইতে পারেন—যে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর সত্যা-সত্য বিবেকরূপে তাঁর মধ্যে বর্ত্তমান, তিনিই তাঁকে যন্ত্রস্বরূপ ধরিয়া অসত্যের উপর সত্যকে, অন্যায়ের উপর ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, তাহা হইলে সংসার হইতে ধর্ম্ম দূরে থাকিবেন না। মুদী ভাই যখন সন্ধ্যাবেলা আপনার দিবসের কার্য্যের উপসংহার করেন, তখন টাকার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া—সেটা কেউ কাড়িয়া লইতেছে না—যদি একবার ভাবেন, হৌসওয়ালা

একটা নূতন দৃষ্টিতে ধর্ম্মকে দেখা—তাহাতেই বিরোধভঞ্জন

২৫ মণের কম বিক্রী করে না, যারা এক সের আধসের লইবে তারা তার কাছে চাউল পাইবে না, তাই ভগবান্ আজ আমার হাত দিয়া কত লোকের মুখে অন্ন তুলিয়া দিলেন,—কার্য্যকালে এরূপ ভাবিতে পারিলে আর বুঝিতে বাকী থাকে না, কিরূপে "ধর্ম্মরে সংসার, সংসাররে ধর্ম্ম দু'য়ে এক করে ফেলায়।" ইহাতে উপাসনার প্রয়োজন থাকিবে না, উপাসনার সময় মিলিবে না, তা নয়। বরং উপাসনা বস্তুনিরপেক্ষ কথামাত্রে পর্য্যবসিত না থাকিয়া গভীরতর মধুরতর হইবে।

কেবল শান্ত সমাহিত হইয়া চিত্তবৃত্তির নিরোধের দ্বারাই ভগবদুপাসনা হয়, তাহা নহে। কিন্তু স্ত্রী যখন স্বামীর হাত ধরেন, স্বামী যখন স্ত্রীকে সম্ভাষণ করেন, সন্তানগণ যখন পিতামাতার পার্শ্বে দাঁড়ায়, পিতামাতা যখন সন্তানকে আদর করেন, বন্ধু যখন বন্ধুকে গ্রহণ করেন, প্রভু ভৃত্যের মধ্যে যে আদান প্রদান হয়, অথবা অধ্যয়ন অধ্যাপনা করি, বৃক্ষলতাদিতে * জল সিঞ্চন করি, পশুপক্ষীকে আহার দিই, বাট্না বাটি কুট্না কুটি, অতিথিকে পাদ্যার্ঘ্য দিই, বা দস্যুতস্করকে লগুড় লইয়া অভ্যর্থনা করি—যৎ করোমি জগন্মাতঃ তদেব তব পূজনম্! মনে যে ভাব বদ্ধমূল হইলে জগতের প্রতি এই দৃষ্টি আসে সেই ভাব গড়িয়া তোলার জন্যই ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব। জানি, অভি-ব্যক্তির ধারায় মানব-জাতির বর্ত্তমান অবস্থায় এবং বর্ত্তমান অসম্পূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থায় প্রাকৃত জনের মনে এই ভাবের বিরুদ্ধে অনেক প্রশ্নের উদয় হইবে। কিন্তু এমন কি তত্ত্ব আছে প্রাকৃত জন তার নিম্ন ভূমি হইতে যার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিবে না? ঐ আপত্তি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। যাঁর দৃষ্টি খুলিয়াছে তাঁকে এ বাধা অতিক্রম করিতেই হইবে। অনধিকারীর আপত্তিতে বসিয়া থাকা আর বিড়ালের সঙ্গে বাদ করিয়া নিরামিষ খাওয়া একই কথা। এই ভাব জাগ্রত করিবার আয়োজনই সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। ইহাকে স্থায়ী ও সমাজগত করিতে হইলে ইহার ভিত্তিরূপে চাই এক সুগঠিত সুনিয়ন্ত্রিত ফিলসফি। অভিজ্ঞতা লব্ধ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এই ফিলসফি যদি ব্রাহ্মসমাজ যোগাইতে না পারেন, তবে তার কপালে ব্যর্থতা চিরতরে অঙ্কিত

* গাছও যে মানুষের সঙ্গে কথা বলে, সে কথা আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানাগারের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে কেন? "বল দেখি রে তরুলতা আমার জগৎ-জীবন আছেন কোথা" এ প্রশ্ন কেবল কবিত্বের অত্যুক্তি নহে!

হইয়া থাকিবে। সত্য, "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" যে দেশের অস্থিমজ্জাগত সে দেশে ইহা এক বিরাট্ সাধনা। কিন্তু সুপরিচালিত হইলে সিদ্ধি অসম্ভব মনে করি না। যে সমাজে জাত, সুখের কোলে লালিত, সম্মুখে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আনন্দ ও সম্মানের দ্বার উদ্ঘাটিত দেখিয়াও ৩৫ বৎসরের যুবক * মৃত্যু-শয্যায় শুভানুধ্যায়ীর "ভগবানের করুণায় এখন তুমি শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য লাভ কর" এই আশীর্ব্বাদের উত্তরে প্রাচীন ভক্ত দার্শনিকের "মরণন্তু পরা পূজা নির্ম্মাল্যত্যাগরূপিণী" এই কথাকে জীবনে সার্থকতা দিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে বলিতে পারে, "ভগবানের করুণা কি কেবল আরোগ্যেই প্রকাশ পায়, মৃত্যুতে কি পায় না?" সে সমাজে এই অসাধ্য সাধন করিবার শক্তি নিহিত আছে, এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে বলিয়াই এত কথা লিখিতে সাহসী হইলাম।

জীবনগত দৃষ্টান্তও আছে

(চ) পরিপূরক

কৌতুক-রস বা সখ্যভাব

দুই বন্ধু সাজিয়া গুজিয়া সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন দিল্লীর রাস্তায়। হঠাৎ কোথা হইতে এক ঝাপ্‌টা বাতাস ও সঙ্গে এক পস্‌লা বৃষ্টি আসিয়া অতর্কিতে কাপড় চোপড় রং বেরং করিয়া দিয়া গেল। এক বন্ধু সৃষ্টির মধ্যে নষ্টামির গন্ধ পাইয়া সৃষ্টি-বিধানের অপূর্ণতা দেখাইতে লাগিয়া গেলেন! দ্বিতীয় বন্ধু বাধা দিয়া বলিলেন—"Charity in all things"ই যদি চরিত্রের উৎকর্ষতা সূচনা করে, তবে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি সেই উদারতা প্রদর্শনে কৃপণতা করিলে অন্যদিকে নষ্টামি প্রকাশ পাইবে না কি? সৃষ্টিকর্ত্তা তোমার সঙ্গে নষ্টামি না করিয়া রসিকতা করিলেন ইহা ভাবিয়া লইলে কি কোন অপরাধের সম্ভাবনা আছে? তিনি তো রসস্বরূপ, তাঁহার মধ্যে রসিকতা থাকাটা একটা অসম্ভব ব্যাপার মনে করিবার কোনও কারণ বর্ত্তমান নাই। হোলির দিন বিশেষ সম্পর্কিত প্রিয়জন যদি এইরূপে কাদাজলে অভ্যর্থনা না করে, তা হ'লে তো সেইটাই তার পক্ষে একটা নষ্টামির চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হয়। ভগবান্ আমাদের সঙ্গে এই ফুরসুতে একটু হোলি খেলিয়া লইলেন, ইহা ভাবিয়া

---

* স্বর্গীয় সুকুমার রায় চৌধুরী, নব্যভারত, আশ্বিন, ১৩৩০

লইবার পক্ষে কোন অনতিক্রমণীয় বাধা আছে বলিয়া মনে হয় কি। এ দেশে হোলির মধ্য দিয়া আনন্দস্বরূপ আপনাকে অনেকখানি প্রকাশ করিয়াছেন, বাঙ্গালী আমরা হয়তো তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি না। একজন অতি সুপ্রাচীন শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মের মুখে শুনিয়াছি, এক দিন হাসিটাই ব্রাহ্মসমাজে পাপ বলিয়া ধরা হইত। এরূপ রুচিবিলাস (puritan) যদি এখনও কেহ থাকেন তাঁহার পক্ষে ভগবান্‌কে হাস্যরস-রসিক বলিয়া গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। তাঁহার পক্ষে ভগবান্ কথাটিই অপ্রযোজ্য। তাঁহার উপাস্য সর্ব্ব-সম্বন্ধ-বিরহিত মায়াবাদীর ব্রহ্ম। আমরা যখন ব্রহ্মকে পুরুষ (Person) রূপেই উপাসনা করি, কোনও Abstract Principle রূপে শিকায় তুলিয়া রাখিয়া দিই না—যখন তাঁহাকে সকল সম্বন্ধের মূল বলি, এই সৃষ্টির মধ্য দিয়া আমাদের সঙ্গে সর্ব্ব-প্রকার সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেছেন বলিয়া মনে করি, তখন এই বিশেষ মধুর সম্বন্ধটি হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিবার যথেষ্ট কারণ আমার কাছে বর্ত্তমান নাই। রসিকতার (Humourএর) অভাব মানব-চরিত্রের একটা অপূর্ণতা বলিয়াই আমরা মনে করি। আর জগৎকর্ত্তা যখন পুরুষ, তখন ইহার অভাব তাঁহার চরিত্রেরও অপূর্ণতা সূচিত করিবে। সুতরাং সৃষ্টিতে হাস্যরস আছে ইহা স্বীকার করিতেই হয়। জলহস্তীর আকৃতি, গাধার ডাক আর ছুঁচোর গায়ের গন্ধ জগৎস্রষ্টার পরিহাস-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা ছাড়া আর কিসে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে? (নরলোকেও কৌতুকরস ঢালিতে ভগবান্ কৃপণতা করেন নাই। তবে বিপরীত রসের আবির্ভাবের আশঙ্কায় তাহার উল্লেখ করা হইল না)। সৃষ্টির কত দুর্দ্দৈব (?) এইরূপে সহজেই ব্যাখ্যাত হইতে পারে। আমরা শিশুদিগকে কোলে লইয়া কোন নষ্টামি বুদ্ধিবশতঃ নয়—কিন্তু কেবল খেলারই জন্য খুব নাড়া দিয়া, ঝাঁকি দিয়া, তাহাকে কাঁদাইয়া বেশ আমোদ পাই। যদি বলা যায়, সৃষ্টিকর্ত্তাও ঝড়-ঝটিকা-ভূকম্পনের ঝাঁকি দিয়া মানব-শিশুদিগকে কাঁদাইয়া সেই খেলাই খেলেন, তবে সত্য হইতে দূরে যাইয়া পড়িব বলিয়া মনে হয় না। কিছু দিন পূর্ব্বে মাসিক পত্রে একটি "দুমুখো" বাছুরের ছবি বাহির হইয়াছিল, যেন একটি অন্যটিকে ঠেলিতেছে। একটী মেয়ে এক দিকের মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করিতেছে। ইহা বাস্তবের চিত্র না হইলে সহজেই বলা যাইত, ইহা একটী ব্যঙ্গ চিত্র। চিত্রটী দেখিয়াই আমার কেন মনে হইল, ভগবান্ অতি মস্ত বড় cartoonist. ইহা বর্ত্তমান সময়ের (তদানীন্তন) ইংলণ্ড-আয়র্লণ্ড ও লেডি আমেরিকার সম্পর্কে ব্যবহৃত হইতে পারে।

পরিপূরক (ছ)

সন্তান-পালন (বাৎসল্য-রস)

দার্শনিক কবি গাহিয়াছিলেন, "জন্মৈব পরমা পূজা অবতারো হরের্হি সঃ।" জন্ম যদি হরির অবতার হয়, তবে সন্তান-পালন উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্মসাধন বলিয়াই পরিগণিত হইবে। কিন্তু জন্ম যে হরির অবতার ইহা কোন কোন ধর্ম্মমত হইতে অনুমিত হইলেও মানুষ, এমন কি তথাকথিত ধার্ম্মিকেরাও, কার্য্যতঃ তাহা স্বীকার করেন নাই। ইহা যতক্ষণ না স্বীকৃত হইতেছে, ততক্ষণ মানুষ ধর্ম্ম ফেলিয়া ধর্ম্মের খোসার জন্যই ছুটাছুটি করিবে। কবির অন্তর্দ্দৃষ্টি কত সহজেই মানুষের এই খোসার জন্য ছুটাছুটি প্রকাশ করিয়া দিয়াছে—

কহিল গভীর রাত্রে সংসার বিরাগী—"গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি'।
কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে এখানে" ! দেবতা কহিলা "আমি" !—শুনিল না কানে।
সুপ্তিমগ্ন শিশুটীরে আকড়িয়া বুকে, প্রেয়সী শয্যার প্রান্তে ঘুমাইছে সুখে;
কহিল —"কে তোরা ওরে মায়ার ছলনা" ! দেবতা কহিল "আমি" ! কেহ শুনিল না।
ডাকিল শয়ান ছাড়ি—"তুমি কোথা প্রভু" ! দেবতা কহিল—"হেথা" ! শুনিল না তবু।
স্বপনে কাঁদিল শিশু জননীরে টানি'—দেবতা কহিলা "ফির" ! শুনিল না বাণী !
দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন—"হায়, আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়" !

এই দৃষ্টির অভাবে ধর্ম্ম সাধন পণ্ডশ্রমে পরিণত হইতেছে। সন্তান-পালন ধর্ম্মসাধনের অতি উচ্চগ্রামে অবস্থিত। ভগবান্ সন্তানরূপে অবতীর্ণ হন মানুষের সেবা গ্রহণের জন্য, মানুষের দ্বারা লালিত পালিত হইয়া বর্দ্ধিত হইবার জন্য, যেন এই পথে মানুষ মুক্তিধামে উপনীত হইতে পারে। সর্ব্বশক্তিমান্ নিতান্ত নিরাশ্রয়ভাবে মানুষের দ্বারে আশ্রয়ের ভিখারী, মানুষ কি আশ্রয় দানে কৃপণতা করিবে? পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলে তাঁহার সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষার অন্য কোন ব্যবস্থা করিতে পারিতেন না তাহা নয়। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে তাঁহার হাত ধরিবার কেহই তো নাই। কথিত আছে, বিশ্বামিত্র নারিকেল গাছে মানুষ জন্মাইবার আয়োজন করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র না পারুন, বিশ্বপতির হস্ত অনর্গল ছিল। সুতরাং তিনি যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় অভিপ্রায় আছে, কেবল জীব-প্রবাহ রক্ষাই উদ্দেশ্য নহে। কেন না, তিনি "নিহিতার্থো দধাতি।" সেই উদ্দেশ্যটী ধরিয়া অগ্রসর হওয়াই মানব-জীবনের সার্থকতা। সমাজরূপ দেবমন্দিরে পরিবাররূপ প্রকোষ্ঠে,

জন্মরূপ পরম পূজার দেবতা সন্তানরূপে আবির্ভূত হন। ব্রহ্ম বীজাকারে ইহার মধ্যে বর্ত্তমান, ইহার অনন্ত সম্ভাবনা। এই অনন্তকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এই মহাপূজার পূজারী পিতামাতা ভাইভগিনী আত্মীয়স্বজন ও পার্শ্ববর্ত্তী সকলেই। শিশুর কর্ণে যে শব্দটী শুনান হয়, শিশুর সম্মুখে যে কার্য্যটী করা হয়, তাহা সকলই ঐ পূজার ফল পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য! মনে রাখিতে হইবে অপবিত্র কিছু পূজায় লাগিবে না। এ পূজায় পূজাপরাধ পদে পদে। যে বাক্যটী শিশুর কর্ণে প্রবেশ করিয়া সুপ্ত ব্রহ্মকে জাগ্রত করে, তাহাই পূজার ফুল বলিয়া গণ্য হইবে। যে কার্য্যটী অনুকরণ করিয়া শিশু অনন্তের পথে অগ্রসর হইবে তাহাই সুগন্ধ দীপ। পার্শ্ববর্ত্তিগণের আচরণের আবহাওয়া অজ্ঞাতসারে শিশুকে বর্দ্ধিত করে। দেবমন্দিরে মানুষ যেমন সন্তর্পণে চলে, সন্তানপালনের ভার যাহাদিগের তাহাদিগকেও সেইরূপ সন্তর্পণে পবিত্রভাবে চলিতে হইবে। যাহাতে পূজার অঙ্গহানি না হয়, সে জন্য সর্ব্বদা জাগ্রত থাকা চাই। নতুবা প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। অন্যদিকে ত্যাগ ও সংযমের মধ্য দিয়া প্রেমের পরিপুষ্টি এই পূজার পূজারীর পারিতোষিক। এই জন্যই সন্তান-পালনের এই ব্যবস্থা। কেবল সন্তান বাড়িয়া উঠিতেছে, ইহা দেখিলেই হইবে না, পূজারীর কি দক্ষিণা মিলিতেছে, তাহাও গণনার মধ্যে রাখিতে হইবে। কেননা, জীবপ্রবাহরক্ষার ব্যবস্থা ভগবান্ অন্য উপায়েও করিতে পারিতেন—তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। পূজারীর মুক্তিও যে ইহার সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে তাহা ভুলিলে চলিবে না। এই পূজায় পিতামাতাই প্রধান পুরোহিত। তাঁহাদের কথাই বলি। সন্তানপালনে পিতামাতার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য—শিশুর মনে ধীরে ধীরে এই ভাবটী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করাইতে হইবে, যে প্রেম ও শাসন, এ দুই একই পদার্থ; দয়া ও মঙ্গল একই অখণ্ড বস্তুর দুই দিক্। ইচ্ছা হয়, বলিতে পার দক্ষিণ ও বাম মুখ। সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া খৃষ্টধর্ম্মের 'বানচাল্' হইয়াছিল। আমাদের দেশেও হরপার্ব্বতীর কোন্দল সুপ্রসিদ্ধ—একত্র হইলেই বিবাদ। মা'এর কোলে ফিরিতে হইলে রুদ্রকে ছাড়িয়াই আসিতে হয়। প্রেম ও দণ্ডের (Mercy and Justice) সামঞ্জস্যের ভার পিতামাতার হস্তে। যে পিতামাতা শিশুর মনে এ ভাব মুদ্রিত করিতে পারিলেন না, যে, দরকার হইলে তাঁহারা তাহার জন্য অবলীলায় প্রাণটা দিয়ে দিতে পারেন, তাঁহাদের সন্তান পালনের সকল শ্রম ব্যর্থ হইল। ধর্ম্ম-জগতে পিতামাতার উপমায় ঈশ্বরের

সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ উপদিষ্ট হয়; সুতরাং সন্তান বিশ্বাসী হইবে কি নাস্তিক হইবে তাহা পিতামাতার উপরেই নির্ভর করিতেছে। মানুষ জগতের আপাত অমঙ্গলের ঘটনা দেখিয়া নাস্তিক হয়। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কথা শুনিয়াছি, তিনি সন্তানের মৃত্যুতে নাস্তিক হইয়াছিলেন। যুক্তি এই, যে যদি জগতের অন্তরালে মঙ্গলময় থাকিবেন, তবে আমাকে এমন আঘাত দিলেন কেন? আঘাতের সঙ্গে মঙ্গল, শাসনের সঙ্গেও প্রেম থাকিতে পারে—এই ভাব জ্বলন্ত অক্ষরে সন্তানের মনে খোদিত করিয়া দিবার ভার পিতামাতার। সাধারণতঃ সকল সন্তানই এ ভাবটী পায়—"মা যদি সন্তানে মারে শিশু কাঁদে মা মা করে"—এ সঙ্গীতাংশটী তাহা ব্যক্ত করিতেছে। মা যত সন্তানকে মারেন, বাইরের কেহ কি তত মারে? তবুও সন্তান মার উপর বিশ্বাস হারায় না। কেন না, বাহির ছাড়িয়া দিয়া সে ভিতরের কিছু ধরিতে পারিয়াছে। এক দিন রাস্তায় যাইতে যাইতে দেখিলাম, মা সন্তানকে সঙ্গে আসিতে বারণ করিতেছেন এবং একটী যষ্টির ভয়ও দেখাইতেছেন। শিশু যষ্টির বাহিরে থাকিয়া মায়ের অনুসরণ করিতেছে। কিন্তু হঠাৎ একটী আগন্তুক ভয়ের কারণ উপস্থিত হইতেই শিশুটী যষ্টি ভুলিয়া ছুটিয়া গিয়া মায়ের অঞ্চলে মুখ লুক্কায়িত করিল। যে ভাব সর্ব্বসাধারণের মধ্যে লুক্কায়িত (implicit)ভাবে আছে, তাহাকেই স্পষ্ট প্রকটিত করিতে হইবে। যে মা 'মার ধর' করেন, সেই মা আবার অন্য সময়ে তার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত; সুতরাং 'মারধ'রে'র সঙ্গে প্রেম ও মঙ্গল ভাবের কোন বিরোধ নাই, ইহা যাহার নিকট পিতামাতার দৃষ্টান্তে প্রত্যক্ষ, তাহার পক্ষে জগতের আপাত অমঙ্গলকর ঘটনা দেখিয়া নাস্তিক হইবার সম্ভাবনা একেবারেই থাকিবে না। যে মা শিশুর ক্রন্দন নিবারণের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারেন, সেই মা-ই অন্য সময়ে যার মূল্য তৃণগাছও না, তারই জন্যে শিশুকে কাঁদান—ইহা দেখিয়া যে অভ্যস্ত, তাহাকে কি বিদ্যালয়ে কোন তার্কিক এই যুক্তিতে পদস্খলিত করিতে পারে, যে ঈশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান্ হন্ তো মঙ্গলময় নন, বা যদি মঙ্গলময় হন্ তো সর্ব্বশক্তিমান্ নন। এক এক করিয়া আচরণের দ্বারা এই সকল ভাব শিশুর মনে মুদ্রিত করিয়া দেওয়াই সন্তানপালন। নতুবা মাংসপিণ্ড জিয়াইয়া রাখা সন্তান-পালন নহে। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হয়, কেবল অশিক্ষিত পরিবারে নয়, অনেক শিক্ষিত পরিবারেই মাংসপিণ্ড জিয়াইয়া রাখা, বড় জোর অর্থোপার্জ্জনের উপযুক্ত কিছু শিক্ষা দেওয়াই সন্তান পালনের আদর্শ বলিয়া

গৃহীত। বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষা নাই বলিয়া আমরা কতই না আক্ষেপ করি, কিন্তু গৃহে যে শিক্ষা পাইলে বাহিরের শিক্ষার অভাব কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, সে শিক্ষার ব্যবস্থা আমরা কি করিতেছি? অনেক সময় একটা চিত্র আমার কল্পনা-নেত্রের নিকটে আসে তাহা এই—গৃহ-স্বামী প্রাতঃকালে উঠিয়া কাজকর্ম্মে ব্যস্ত। যখন হুঁস হইল, তিনি দেখিলেন স্নান করিয়া উপাসনা করা চলে বা খাওয়া চলে, কিন্তু সময়ে কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হইলে দুইই চলে না। তিনি স্নানান্তর উপাসনা-গৃহে গেলেন, এবং উপাসনা করিয়া যখন বাহির হইলেন তখন তাঁহার চোখে মুখে ব্রহ্মানন্দের আভাস ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তিনি যে চর্ব্ব্য-চোষ্য লেহ্য-পেয়ের আস্বাদ না পাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহার কোনও চিহ্ন পুত্রকন্যারা দেখিল না। যে গৃহের সন্তানেরা প্রত্যক্ষ দেখিল, রসনাতৃপ্তিকর খাদ্য অপেক্ষাও অধিকতর রসাল একটী বস্তুর উৎস মানব অন্তরে আছে; রূপ-রস-গন্ধের অন্তরালে অরূপ 'রসো বৈ সঃ' আছেন, ধর্ম্ম যে বাস্তব পদার্থ তাহা যাহারা এইরূপে প্রত্যক্ষ দেখিল—তাহাদের নিকট হইতে ধর্ম্মের বাস্তবতার বিশ্বাস কোন্ বেন্ মিল্ কোমৎ হরণ করিতে সমর্থ? ইহারই নাম সন্তানপালন-রূপ ধর্ম্মসাধন। এই আদর্শই আমাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে আয়ত্ত করিতে হইবে।

পরিপূরক (জ)

প্রভু-ভৃত্য-সম্বন্ধ (দাস্য-ভাব)

বৈষ্ণব আচার্য্যগণ ভক্তের সঙ্গে ভগবানের লীলা বর্ণনা করিতে যাইয়া যে সমস্ত রসের অবতারণা করিয়াছেন, দাস্যভাব তার মধ্যে অন্যতম। এই ভাবটি সাধন সিঁড়ির সর্ব্ব নিম্ন ধাপ। কেন না, শান্ত ভাবকে লীলার অন্তর্গত না করাই ভাল। ধ্যানস্থ হইয়া যোগী যে ভাবে ভগবান্‌কে দর্শন করেন, তাহা ভগবানের নিস্তরঙ্গ নিত্যত্বের দিক্, লীলার দিক্ নহে। শান্ত ভাবের মধ্যে নির্গুণ সত্তাই উপলব্ধির বিষয়, কোন বিশেষ সম্বন্ধ বা লীলা নহে। সত্তার উপলব্ধি ছাড়া লীলার রসাস্বাদন সম্ভব নহে, নির্গুণকে ছাড়িয়া সগুণের খেলা চলিতে পারে না, সত্তার ভিত্তির উপরই লীলা-সৌধ নির্ম্মিত হইতে পারে।

সত্তারূপ জলরাশিকে অবলম্বন করিয়াই কেবল লীলা রূপ তরঙ্গ উঠিতে পারে। তাই বোধ হয় ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সম্বন্ধ বর্ণনা করিতে যাইয়াও অসম্বন্ধ সত্তাকে একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। নির্গুণ ও সগুণকে জড়াইয়াই রাখিয়াছেন। আমাদের আরাধনার মধ্যেও ইহা স্পষ্ট রহিয়াছে। আরাধনা ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি। সত্তা স্বরূপ নহে। কিন্তু স্বরূপ কখনও সত্তাকে ছাড়িয়া থাকে না, ইহা নির্দ্দেশ করিবার জন্যই বোধ হয় আরাধনা মন্দিরের দ্বারদেশে "সত্যং" আপনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন। যাহা হউক, লীলার কথা বলিতে হইলে এই দাস্যভাব হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম চিরদিনই সন্ন্যাসের প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন। সংসারে থাকিয়াই ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে। সংসারীও উচ্চধর্ম্মের অধিকারী—কেবল ইহাই নহে, সংসারীই কেবল পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্মজীবন লাভের অধিকারী—ইহাই এ দেশে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিশেষ শিক্ষা। কিন্তু অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম সাধন জিনিষটা যে কি সে সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের ধারণা সুস্পষ্ট নহে। জিনিষটাকে এমন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহাতে এই বুঝায়, যে, আমরা সংসারেই থাকিব কিন্তু সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী যেমন নির্লিপ্ত থাকেন, আমরাও সংসারে তেমনি নির্লিপ্ত থাকিব। অর্থাৎ সন্ন্যাসী সংসারের ব্যাপারগুলিকে যেমন হেয় জ্ঞান করেন, আমরাও তেমনি হেয় জ্ঞান করিব। তবে সন্ন্যাসী এ গুলিকে ছাড়িয়া যান; কেন না, এ গুলি আসল বিষয় হইতে মনকে বিচলিত করিয়া দেয়; আমরা ইহার মধ্যেই থাকিয়া বিচলিত হইব না। তবেই, সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আমাদের এইমাত্র পার্থক্য রহিল, যে আমরা তাঁহাদের অপেক্ষা একটু বেশী দৃঢ়তা শিক্ষা করিব—সন্ন্যাসী অপেক্ষা আত্মসংযম বেশী হইবে এবং চিত্তবিক্ষেপ কম হইবে। সন্ন্যাসী মনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরকেও সংসার হইতে লইয়া যান, আমরা শরীরটাকে সংসারে রাখিব, মনকে সেখান হইতে লইয়া যাইব, এই মাত্র বিভিন্নতা। এ বিষয়ের একটী উপমা এই যে, পদ্মপত্রের উপর যেমন জল থাকে তার সঙ্গে মিশিয়া যায় না, ধার্ম্মিকও তেমনি পদ্মপত্রের জলের ন্যায় সংসারে নির্লিপ্ত থাকিবেন। আমার মনে হয়, এরূপ সংসার-ধর্ম্মে ও সন্ন্যাস-ধর্ম্মে বস্তুতঃ কোনই পার্থক্য নাই। উহারা একই জিনিষ—এ কথা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমি সংসার-ধর্ম্ম বলিতে এই বুঝি—যে সকল সম্বন্ধ লইয়া সংসার, সেই সকল সম্বন্ধের মধ্যে ভগবানকে দর্শন। এই সম্বন্ধ-গুলিকে ভগবানের লীলা-ক্ষেত্র বলিয়া উপলব্ধি করাই

সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম-সাধন। এই সম্বন্ধ-জনিত যে সমস্ত কর্ম্ম আমার নিকট উপস্থিত হয়, সে গুলিকে ঝঞ্ঝাট বলিয়া মনে না করিয়া, এমন কি সেগুলি আমার চিত্তের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য পরীক্ষারূপে আগমন করিয়াছে না ভাবিয়া, সে গুলিকে উপাসনার অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, সেগুলির মধ্যে ভগবানকে দর্শন করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে, সেগুলি আমার উপাসনার উপকরণ। এগুলি না থাকিলে আমার উপাসনা হইল না; ইহার একটিকে পরিত্যাগ করিলে, ইহার একটিকে এড়াইলে আমার সাধন অঙ্গহীন রহিয়া গেল। সংসারের প্রতি এইরূপে দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেই প্রকৃত সংসার-ধর্ম্ম হইতে পারে। নতুবা যিনি পিতা পুত্র, ভাই ভগিনী, স্বামী স্ত্রী, গুরু শিষ্য, প্রভু ভৃত্য প্রভৃতি সম্বন্ধের মধ্যে ভগবান্‌কে দেখিতে পান না, তাহার পক্ষে সংসার অপেক্ষা অরণ্য ধর্ম্ম-সাধনের অধিকতর উপযুক্ত স্থান। বাহিরের দিক্ হইতে বিচার করিলে সম্বন্ধগুলি ও তজ্জনিত কার্য্য যেমন সকলের কাছে আসে সাধকের কাছেও তেমনই আসিবে, সাধারণ সংসারী যেমন সকল কার্য্যই করিতেছেন, সাধকও তেমনই করিবেন; কেবল মাত্র এই বিভিন্নতা, যে, আগে যেখানে কেবল 'আমি' ছিলাম, সেখানে ভগবান্ প্রতিষ্ঠিত হইবেন; আগে যেখানে 'আমার' ভাবিতাম, এখন সেখানে 'তাঁহার' ভাবিব; আগে যেখানে মানুষ দেখিয়া ভূতের বেগার খাটিতেছিলাম, এখন সেখানে ভগবানের বিগ্রহ দেখিয়া মোক্ষপথে অগ্রসর হইতে থাকিব। বাহিরে কিছুরই পরিবর্ত্তন হইবে না, কিন্তু অন্তরে স্বর্গরাজ্যের আবির্ভাব হইবে।

"কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব" এই দৃষ্টি যখন খুলিয়া যায়, "আমার আমিত্ব অসার স্বামিত্ব" যখন ঘুচিয়া যায়, কেবল স্বর্গে নহে এই পৃথিবীতে যখন ভগবানের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন দেখা যাক্, প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজে কোন কোন সম্বন্ধ উচ্চ ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকিলেও প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ আশানুরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পাঁচ টাকায় একজন মানুষের মাথা কিনিয়া রাখিয়াছি, সাধারণ মানুষের এই অব্রাহ্মোচিত ভাবটি আমাদের কথায় বার্ত্তায় ও মনের ভাবে বড়ই সুস্পষ্ট বিদ্যমান থাকিয়া আমাদের উন্নত জীবনের অহঙ্কারকে যেন প্রতিপদে ধিক্কার দিতেছে। অন্ততঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এ বিষয়ে আপনার কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে মহাপুরুষগণের মধ্যেই দেবতার

অধিষ্ঠান স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই কথা ঘোষণা করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যে, সর্ব্বসাধারণ মানুষের মধ্যেও ঐ দেবতা বসবাস করিতেছেন। এই বার্ত্তা (message) বহন করিয়া যাহার জন্ম, প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ বিষয়ে তাহার যে কর্ত্তব্য ছিল তাহা সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে বটে, বাড়ীর চাকর কিন্তু চাকরই রহিয়াছে। প্রভু ভৃত্যকে সাহায্য করেন, এবং ভৃত্য তাহা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করে, ভগবানের দান বলিয়া গ্রহণ করে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এ সম্বন্ধে বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন, কেন না, এ ভাবটী সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভৃত্য যে প্রভুকে সাহায্য করে, সে সাহায্যও কৃতজ্ঞতা ভরে মস্তক অবনত করিয়া ভগবানের দান বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়, এ ভাবটি প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ঐ যে ভৃত্য আমার গৃহের সমস্ত কার্য্য করিয়া আমার শক্তি ও সময়কে উচ্চতর কার্য্যের জন্য মুক্ত রাখিতেছে, সে জন্য কি আমার কৃতজ্ঞ হইবার কিছুই নাই? আজ ভৃত্য আসে নাই, সুতরাং আমাকে স্বহস্তে অনেক কাজ করিতে হইতেছে; ধর্ম্ম বন্ধু আসিলেন, তাহার সঙ্গে সদালাপ করিতে পারিলাম না, গুরুর নিকট ধর্ম্মোপদেশ লইতে পারিলাম না, গ্রন্থ পাঠ করিয়া জ্ঞান আহরণ করিতে পারিলাম না, এমন কি উপাসনাও নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল না। এক দিন ভৃত্য আসে নাই, সুতরাং বুঝিতে পারিলাম, ভৃত্য আসিয়া আমার কি উপকার করে। যে এইরূপে আমার আত্মোন্নতির সহায়, আমার ভগবানের সহবাস লাভের সহায়, আমার স্বর্গ-রাজ্যের পথে অগ্রসর হইবার সহায়, তাহার প্রতি কি আমরা সর্ব্বদা উপযুক্ত ব্যবহার করি? ভদ্রতার খাতিরে ব্যবহার উপযুক্ত হইলেও, মনের ভাব যে উপযুক্ত নয় তাহা বলাই বাহুল্য। ভৃত্য যে দিন আসে না সে দিন আরও এক ভাবে, সে আমার স্বর্গের পথের সহায়তা করে। সে দিন আমাকে নিজ হস্তে সকল কার্য্য করিতে হয়, সুতরাং সে দিন আমার পরীক্ষার দিন। ব্রাহ্মসমাজ মধ্যবর্ত্তীবাদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। মহাপুরুষের রক্তের দ্বারা স্বর্গরাজ্য অধিকার করিবার সহজ পন্থা যেমন আমরা পরিত্যাগ করিয়াছি, তেমনি ভৃত্যের শক্তিতে সংসার-ধর্ম্ম সাধন করিবার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভৃত্যের মধ্যবর্ত্তিতায় আমার মুক্তি হইবে না, আমার ভৃত্য-ভাব সিদ্ধ হইবে না। আমাকে মাঝে মাঝে ভৃত্য সাজিয়া দেখিতে হইবে, কতটা সিদ্ধি লাভ করিতেছি। যে সমস্ত কাজ আমার

নিজের করা উচিত, তাহাই তো ভৃত্য করিতেছে, আমার হইয়াই তো আমার পরিবারের সেবা সে করিতেছে? আজ দেখি আমি সে কাজ গুলি কি ভাবে সম্পন্ন করিতে সমর্থ। এ গুলি যদি জঞ্জাল বলিয়া মনে হয়, তবে তো স্বর্গরাজ্য বহুদূরে। আমি যে আমার ভৃত্যের কাছে দাবী করি—পাণ হইতে চুণ টুকু খসিবে না—আমার প্রভুর এ দাবী আজ কি আমি রক্ষা করিতে পারিতেছি? আজ এ সকল কাজের মধ্যে আমাকে প্রভু দেখিতেছি-না. স্বয়ং ঈশ্বর এ গৃহের প্রভু, আমরা তাঁহার দাস দাসী? যদি এ দৃষ্টি খুলিয়া না থাকে তবে এই দৃষ্টির জন্য সাধন আরম্ভ করিতে হইবে, ভৃত্যের ঘাড়ে পা দিয়া স্বর্গ পাওয়া যাইবে না। ভৃত্য আজ না আসিয়া আমার এই উপকার করিল, আমি বুঝিলাম আমার সংসার ধর্ম্ম হইতেছে। যিনি আমার আধ্যাত্মিক জীবন লাভের এমন প্রবল সহায়, যাঁহার কৃপায় আমি ধর্ম্ম লাভে সমর্থ, তিনি কে? এ কি সেই যাহাকে আমরা সাধারণ ভাবে দাস বা ভৃত্য বলি, চাকর চাকরাণী বলিয়া অবজ্ঞা করি? এ কি সেই চাকর যার সামান্য ক্রটী কল্পনা করিয়া ক্রোধ-রিপুর বশবর্ত্তী হই? না, তিনি স্বয়ং ভগবান্ আমার সেবা করিবার জন্য, আমাকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিবার জন্য আমার গৃহে ভৃত্যরূপে অবতীর্ণ। ভৃত্য আর ভৃত্য নহে আমার সহায়। এই তাবে প্রভুভৃত্য-সম্বন্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে না পারিলে এ সম্বন্ধের উন্নয়ন সম্ভব হইবে না, এবং এ সম্বন্ধের উন্নয়ন না হইলে সংসারে ধর্ম্মসাধনের এক অঙ্গ বিকলই থাকিয়া যাইবে। সম্বন্ধগুলিকে এখন যে ভাবে দেখা হয়, তাহাতে সাধারণ ভাবে ভগবান্ এক দিক্ ও মানুষ এক-দিক্ যেমন পিতা ও পুত্রের সম্বন্ধ; স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ। ঈশ্বর কি কেবল পিতা বা স্বামী? ইহা বাস্তবিক সম্বন্ধগুলির পূর্ণ দৃষ্টি নহে। সম্বন্ধের দুই দিকেই ভগবান্‌কে দেখিবার সাধন আবশ্যক। তিনি কেবল প্রভুরূপে আমার সেবা চান তাহা নহে, ভৃত্যরূপে আবার আমার সেবাও করেন, সে ভাবেও না দেখিলে চলিবে না। তাহার মত সেবক কে? তিনি কেবল দাতা নন ভিখারীও বটেন। তাঁহার মত নাছোরবান্দা ভিখারী আর নাই। তাঁহাকে যতই দাও, হাত পাতিয়াই আছেন। ভগবান্‌কে যেমন পিতামাতা বলি, তেমনি পুত্রকন্যা ভাবেও দেখিতে হইবে। তাঁহাকে যেমন প্রভু বলি তেমনি ভৃত্যও বলিতে হইবে। নতুবা সংসারে ধর্ম্ম সাধন চিরদিন আধ্‌খানাই থাকিয়া যাইবে। উপনিষদ্ তাঁহাকে ভৃত্যও বলিয়াছেন। ভগবান্ করুন আমাদের এই পূর্ণদৃষ্টি খুলিয়া যাক্।

দ্বাদশ অধ্যায়

ধর্ম্ম-শিক্ষা

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।

অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ॥ কঠ, ১।২।৮

ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ে কথা বলিতে গেলে মনোবিজ্ঞানের (psychology) দিক্ হইতে শিক্ষার ভিত্তি কি তাহার আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজন। ইংরাজী শিক্ষা, লোকশিক্ষা ও জাতীয় শিক্ষার কথাও এই প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। তাই প্রথমে সেই সকল বিষয়েই কিছু কিছু বলা যাইবে।

ক। শিক্ষার ভিত্তি

সম্প্রতি পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মান্ পণ্ডিত রুডল্‌ফ অয়কেন (Rudolf Eucken) তাহার *Main Curents of Modern Thought* এ বলেন—যে শিক্ষাপদ্ধতি ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত সীমায় আবদ্ধ রাখিয়া বর্দ্ধিত করিতে চায়, তাহা সন্তোষকর নহে। বংশানুক্রমে সামাজিক ও নৈসর্গিক অবস্থানিচয় যে কেবল তাকে নানাপ্রকারে নিয়মিত করিতেছে তাহা নহে, কিন্তু ধরিতে গেলে সে এই সকল আবেষ্টনেরই ফল। ইহারা ব্যক্তিকে এমনভাবেই ঘিরিয়া রহিয়াছে, ধারে বা ভারে ("cunning or force") কিছুতেই সে ইহাদের বন্ধন কাটিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং সন্ন্যাসী যদিও মনে করিতে পারেন, তিনি সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহাদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা তাহার ভ্রান্তি। জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক এ সকলের শক্তি আত্মার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে এবং সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির পূর্ব্বে ইহাদের প্রভাব হইতে তাহার নির্ম্মুক্ত হইবার আশা নাই। নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাটার মধ্যেও ইহাদের কৃতকার্য্যতা বিদ্যমান রহিয়াছে। শিক্ষা এ সকলকে নিয়মিত করিয়া আত্মাকে এমন গতি প্রদান করিবে, যে সে সংসার হইতে বিরতির দুরাশায় মুসড়িয়া না গিয়া পূর্ণ সমাজ-জীবনের উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবে। মানুষ

শিক্ষার উদ্দেশ্য

যে সমস্ত শক্তির বীজ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে সেগুলিকে পূর্ণ বিকাশের দিকে লইয়া যাওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য, নিগ্রহের (repression) দ্বারা মানুষকে পঙ্গু করা উদ্দেশ্য নহে। এতকাল যে শিক্ষা প্রচলিত ছিল, তাহা যেন

বাহির হইতে চাপ দেওয়ার একটা নিষ্পেষণ-যন্ত্র, ভিতর হইতে ফুটাইয়া তুলিবার প্রেরণা নহে। সব এক ছাঁচে গড়ার চেষ্টা শিক্ষা নয়, অধিকাংশের পক্ষেই সেটা নিগ্রহ মাত্র। এই নিগ্রহ হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে হইবে। মানুষ যাহাতে সংসারের কাজে লাগে, তার শক্তিকে সমাজের সেবায় নিযুক্ত করিতে পারে, সেই শিক্ষা দিয়া তার আত্মাকে বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে। যখন শিক্ষা অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ থাকে, তখন শিক্ষা দ্বারা মানুষের পণ্ডিত বা ভদ্র আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াই সন্তুষ্ট থাকা চলে। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষা ডিমক্র্যাটিক্। আজ আর শিক্ষিতকে সমাজের শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকিলে চলিবে না, সমাজ-সেবার উপযোগী শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে। সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে টি কিয়া থাকিয়া যাহাতে পরিণামে সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারা যায়, সেই দিকে নজর রাখিয়া শিক্ষার্থীকে অগ্রসর হইতে হইবে। শিক্ষাপদ্ধতি এমন হইবে, যাহাতে শিক্ষার্থী বিদ্যার্থী হন, পাকচক্রে পুলীশ বাঁচাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করতঃ দুমুঠা খাইতে পাইয়া কোন রকমে দিন গুজ্‌রানোটাই জীবনের সিদ্ধির মাপকাঠি হইয়া না উঠে। সেই উদ্দেশ্যে দেহ মন আত্মা যাহাতে পরিপুষ্ট হয়, সর্ব্বদাই সেই দিকে নজর দিতে হইবে। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" মনে রাখিয়া শরীর-পোষণে মনোযোগ দেওয়া চাই। শরীর সুস্থ না থাকিলে সকল বিদ্যাই বৃথা। শিক্ষার দ্বারা আমাকে সমাজের সেবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে—এইটী মনে রাখিলে শারীরিক সুস্থতা যে কত প্রয়োজন তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমার যাহা কিছু শক্তি সামর্থ্য তাহা যতই কেন অকিঞ্চিৎকর হউক না, সমাজের হিতার্থে খাটাইতে আমি বাধ্য, ইহাই আমার ঋণ (**সংস্কার ও সংরক্ষণ** দ্রষ্টব্য), ইহা মনে রাখিয়াই আমাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। আমি যতই ক্ষুদ্র হই না কেন, এই বিরাট্ বিশ্বমানব-দেহের আমি অঙ্গ, আমার পুষ্টিতে এই বিরাটের পুষ্টি, আমার নাশে এই বিরাটের অঙ্গহানি। নিজের দিকে এই ভাবে দৃষ্টি করিলে ক্ষুদ্র বুদ্ধি তিরোহিত হইবে, শক্তি জাগিবে ; সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব বোধও জাগ্রত হইবে। কেবল ব্যক্তিত্ব লইয়া পড়িয়া থাকিবার বা ব্যক্তিগত মুক্তির লোভে সকল ছাড়িয়া জঙ্গলে পলাইবার বাসনা প্রবল হইবে না। আমার একার জন্য আমি নই।

শিক্ষা সার্ব্বজনীন

একটী জীবও অমুক্ত থাকিলে আমার নিজের পরা-মুক্তির প্রয়াস একটা দুর্নীতি মাত্র—বৌদ্ধশাস্ত্রকারগণ যে এই ইঙ্গিত করিয়াছেন,

উহাকে একটা প্রত্যক্ষ সামাজিক সত্যে পরিণত করিয়া তুলিতে হইবে। আমাদিগের স্বার্থপর হইবার অবসর নাই। আমি আমার গৃহখানিই কেবল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া তাহাতে নিরাময়ে বাস করিতে সমর্থ নই, যদি আমার পার্শ্ববর্ত্তীদিগের গৃহও তদ্রূপ না হয়। তাহাদিগের অপরিচ্ছন্নতা হইতে উৎপন্ন রোগ আমার গৃহে সংক্রামিত হইবেই। সুতরাং প্রতিবেশীর গৃহ পরিষ্কার করিবার জন্যও আমাকেই উদ্যোগী হইতে হইবে। ব্রাহ্মণ একদিন আর সকলকে শূদ্র বানাইয়া নিজের উচ্চতা বজায় রাখিতে গিয়াছিলেন। শূদ্রবেষ্টিত ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা পাইল না। আজ ব্রাহ্মণ শূদ্রের মধ্যে সীমা রেখাটা যে কোন্ খানে তাহা অতি তীক্ষ্ণ অনুবীক্ষণও নির্ণয় করিতে অসমর্থ। ব্রাহ্মণ যদি সকলকেই ব্রাহ্মণ করিয়া তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেন, তবে তিনিও ব্রাহ্মণত্বে আরও উন্নীত হইতেন, অধঃপতন হইত না। সকলের সঙ্গে আমার জীবন মরণ বাঁধা—শিক্ষার ব্যবস্থায় এইটিকেই মূলসূত্র রূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

শিক্ষক কে ?

শিক্ষা কখন আরম্ভ হইবে তাহা লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া এইটুকু স্মরণ রাখিতে হইবে যে কোন কোন মনস্তত্ত্ববিদ্ (Psycho-analyst) স্বীকার করেন, মানুষের স্মৃতি তার নিজের জন্মবিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিতে সমর্থ। সুতরাং অন্ততঃ জন্মকালেই মানুষ কিছু সংগ্রহ করিয়া লইয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হয়, সে নিতান্ত শূন্যস্থালী রূপে আসে না। কাজেই তাহাকে কিছু দিতে গেলে, তাহার যাহা আছে তার সঙ্গে ঠোকাঠুকি না লাগে, সে জন্য বেশ হুঁসিয়ার হইয়াই অগ্রসর হইতে হইবে এবং তাহা একেবারে আদি হইতেই। সুতরাং মানব মনের গতিবিধি বিষয়ে যিনি অনভিজ্ঞ তাঁর হাতে শিক্ষার ভার দিলে যে অনর্থ ঘটিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। আবার, অনর্থ যে আশে পাশে চারিদিকেই ঘটিতেছে তাহা তো প্রত্যক্ষ। মানুষ যাহা লইয়া আসে তাহা তাহাকে অজ্ঞাতসারে পরিচালিত করে। এমন কি, সে যাহা শিক্ষা করে তাহারও অধিকাংশ ঐ অজ্ঞাত রাজ্যেই অবস্থিতি করে এবং অভ্যাসাদি রূপে অনেক সময়ে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাহাকে চালায়। এক অর্থে ইহাই তাহার ব্যক্তিত্ব। মানুষ অন্য-দিকে আবার সামাজিক জীব। সুতরাং সামাজিক বিধিব্যবস্থার সঙ্গে তার মানসিক ক্ষেত্রে একটা সংগ্রামের সম্ভাবনা রহিয়াছে। তার ব্যক্তিত্ব তাকে এক দিক্ দিয়া গড়িয়া তুলিতে চায়, সমাজ যদি অন্যদিকে টানে, তাহা হইলে

ধস্তাধস্তি অনিবার্য্য। এইখানেই শিক্ষার সমস্যা। নিগ্রহের দ্বারা ব্যক্তিত্বকে কোণঠ্যাসা করিয়া সমাজ আপনার সুবিধামত মানুষ গড়িবে না, ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত বিরোধী শক্তির মুখ পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া সামাজিক হিতের জন্যই তাহাকে বাহিরেই টানিয়া আনিবে! ব্যক্তিত্বের শক্তি যে দিকে যাইতে চাহিয়াছিল সেদিকে গেল না বটে, কিন্তু অন্য দিকে রাস্তা পাইয়া সে আপনাকে সার্থক করিয়া তুলিল। কু-শিক্ষা-প্রণালীর দোষে কুশিক্ষকের হাতে পড়িয়া, যে শক্তি সুমহৎ সামাজিক মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ, তাহাই নিগৃহীত হইয়া উৎকট ব্যাধিরূপে মানব অন্তরে বিরাজ করে, যাহা হইতে মানব সমাজের মহা অনর্থ সকল উৎপাদিত হয়। ধর্ম্ম-জগতে যাহা এক সময়ে ভ্রান্ত মানুষের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল, এবং এই প্রশংসার ফলে যাহা স্থায়ী আকার ধারণ করিয়াছে, সেই ধর্ম্মান্ধতাজনিত পরপীড়ন ও আত্মনিগ্রহ—মধ্য-যুগীয় বিকৃত ধর্ম্ম-ভাবের যে জের সাম্‌লাইতে আমাদিগকে এখনও হিম্‌সিম্ খাইতে হইতেছে—তাহা কুশিক্ষায় আত্মার নির্য্যাতিত শক্তিরই বিপথে বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

বাহিরের সাহায্যে অন্তর্নিহিত বৃত্তি সকলের সম্প্রসারণই শিক্ষা

কেহ কেহ বলিয়াছেন, অভিজ্ঞতার হাতে মানুষকে শিক্ষিত হইবার জন্য ছাড়িয়া দাও, কার্য্যক্ষেত্রের উঠা-নামার মধ্য দিয়া সে গড়িয়া উঠিবে। সে কথা সত্য, কিন্তু সবটা যে সে তার ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে পাইতে পারে না, সে কথাও ভুলিলে চলিবে না। দশ জনের সঙ্গে বিদ্যালয়ে তাকে কতকগুলি জিনিষ আগে পাইতে হইবে। জ্ঞানার্জ্জন-শিক্ষা-প্রণালীর সঙ্গে, বিশেষতঃ অতীতের অর্জ্জিত জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে তাকে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নিকটেই পরিচিত হইতে হইবে। নতুবা সভ্য সমাজে জন্মগ্রহণ জনিত যে তার একটা বিশেষ অধিকার, তাহার ফল হইতে সে বঞ্চিত হইবে। একথা অতীব সত্য যে জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডার জাতির আত্মার বহিঃপ্রকাশ, জাতীয় জীবনস্রোতের উৎস। যে শিক্ষা ব্যক্তিকে জাতীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত করিয়া না দেয়, জাতীয় জীবনকে ব্যক্তির মধ্যে পুনর্জ্জন্ম না দেয় সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। অন্যদিকে আবার, সাহায্য-নিরপেক্ষ কার্য্যক্ষেত্রকে সর্ব্ববিষয়ে সুশিক্ষা মনে করিবারও হেতু নাই। কার্য্যক্ষেত্রের নানা অবস্থার সংঘর্ষ ও সমাবেশ হইতে সর্ব্বদা ভ্রান্তিকে পরিহার করিয়া সত্য সংগ্রহের সম্ভাবনা যে খুব বেশী, তাহা মনে হয় না। ক্রমাগত ঠেকিয়া ঠেকিয়া শিখিবার জন্য মানুষকে সংসারক্ষেত্রে ছাড়িয়া দেওয়াও

শিক্ষার সুব্যবস্থা নহে। ইহাতে বহুসময় বৃথা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। শিশু-মনের ক্রমবিকাশের অনুসরণ করিয়াই শিক্ষাপদ্ধতি গড়িতে হইবে। যে শিক্ষা-প্রণালীটা আমরা সংগ্রহ করিব শিশুর নিকট হইতে, শিক্ষা-বিষয়ক বুদ্ধিবিবেচনার অভাবে তাহা না করিয়া, তাহার ঘাড়ে একটা বাহিরের বোঝা চাপাইয়া দেই। তার মনের গতি ও প্রবণতা নির্দ্ধারণ না করিয়া কতকগুলি ধরাবাঁধা গৎ পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া তাহাকে দিয়া মুখস্ত করাইয়া লইলে যে শিক্ষা হয়, তাহার ফলভোগ আরও বহুদিন চলিবে। বিবর্ত্তনের ক্রমকে অনুসরণ না করিয়া যে শিক্ষা, তাহা দেহের মাপে জামা না কাটিয়া জাঁতা দিয়া দেহকে জামার মধ্যে ভরিয়া দেওয়া। কেবল শিশু-শিক্ষার মধ্যে কিণ্ডারগার্টেন-প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা কোন কোন স্থানে হইয়াছে। কিন্তু শিশু তো চিরদিন শিশুই থাকিবে না এবং শিশুত্বেই জীবলীলা শেষ হইবে না। সুতরাং তার বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তদুপযোগী শিক্ষার একমাত্র বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী এই "কিণ্ডারগার্টেন" সর্ব্বাবস্থাতেই প্রয়োগ করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়ম সকলের অনুবর্ত্তন করিয়া ক্রম-বিকাশের বিশেষ বিশেষ স্তরে ক্ষেত্র-বিশেষের নিজেরই মধ্য হইতে বিকাশ ও বিবর্দ্ধনের যে ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে, তাহারই নির্দ্দেশে আত্মচেষ্টার পথে আত্মবিকাশ ("Seek through self-activity to lead him to self-knowledge", Froebel)। অপর পক্ষে, অন্তর্নিহিত যে পাথরে আত্মবিকাশের স্রোত আটকাইয়া গিয়াছে সেই মানসিক ব্যাধিরূপ পাথর (Neurosis), যাহা মনের অন্তরাল হইতে বাধা প্রদান করে তাহা না সরাইয়া শিক্ষক যতই সদুপদেশ ও উৎসাহ প্রদান করুন না কেন, সকলই ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিষ্ফল।

খ। রাজর্ষি রামমোহন ও ইংরাজী শিক্ষা

রাজা রামমোহন রায় ইংরাজী শিক্ষার প্রতিষ্ঠাতা। সুতরাং তিনি ইংরাজী শিক্ষার ফল, এইরূপ যুক্তি কাহারও কাহারও মনে আসিয়াছে। কিন্তু ইহা নিতান্ত অজ্ঞতা-প্রসূত। এই মীমাংসার মধ্যে গড্ডলিকা-প্রবাহের প্রভাব পরিলক্ষিত

হয়। ইংরাজী শিক্ষার ফল হইলে যে কোন দোষ হয়, সে কথা উঠিতেছে না। কিন্তু ইতিহাসের অপলাপে যে প্রত্যবায় আছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এবং ইতিহাস বলেন, ইংরাজী বর্ণমালার সঙ্গে পরিচিত হইবার পূর্ব্বেই রাজা তাঁহার ধর্ম্মসংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই অতি সহজ সত্য কথাটা না জানা থাকায় যত গোল হইয়াছে। রাজা অতি বাল্যেই আরবি ফার্সী অধ্যয়নের জন্য পাটনা গিয়াছিলেন। সে সময়ে আরবি ফার্সী বর্ত্তমান কালের ইংরাজীর স্থান অধিকার করিত। এখন ইংরাজীর সাহায্যে রাজকার্য্য পরিচালিত হয়, তখন আরবি ফার্সীর সাহায্যে সে কার্য্য সম্পাদিত হইত। এই অতিবাল্যেই রামমোহন স্থফী মোতাজালা মোহাদ্দী এবং সত্যবাদী ভ্রাতৃসম্প্রদায় (Sincere Brethren), যাহাদিগকে দশম শতাব্দীর বিশ্বসাধক (Encyclopeadists) নামে অভিহিত করা হইয়াছে সেই সব স্বাধীন মতাবলম্বী (Heterodox) মুসলমান সম্প্রদায় সকলের গ্রন্থাবলীর সঙ্গে পরিচিত হন। তখন ইংরাজীর নাম গন্ধও তিনি জানিতেন না। এই সময়েই তিনি কোরান ও সরিয়াৎ আয়ত্ত করেন। এই কোরান ও সরিয়াৎ এরিস্ততলের চিন্তা প্রণালীর ছাঁচে (Logical mould) ঢালা। তর্কযুদ্ধে এই চিন্তাপ্রণালীর শ্রেষ্ঠতা কোরাণ পাঠ করিয়াই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। রাজা যে তর্কযুদ্ধে অজেয় ছিলেন অতিবাল্যে এই চিন্তাপ্রণালীর সঙ্গে পরিচয় তাহার অন্যতম কারণ। উল্লিখিত মহম্মদীয় সম্প্রদায় সকলের স্বাধীন ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রথম পুস্তিকা প্রচার করেন। একটি কুসংস্কার আছে এবং প্রবাদ বলে, 'কুসংস্কার সহজে মরে না', যে এই পুস্তিকা বাংলা ভাষায় লিখিত। আসল কথা, পারস্য ভাষায় ইহা লিখিত হইয়াছিল। এই পুস্তিকা লিখিয়া তিনি পিতা কর্ত্তৃক গৃহ বহিষ্কৃত হন। শাপে বর হইল। দেশ-পর্য্যটনের স্থযোগ পাইলেন। বিস্তৃতভাবে ভারতবর্ষ ও তাহার সীমার বাহিরে ভ্রমণ করিয়া অমূল্য অভিজ্ঞতা সমূহ অর্জ্জন করিয়া গৃহে ফিরিলেন। ইতিমধ্যে পিতা অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। রামমোহনের গৃহ পরিত্যাগকে তিনি দ্বিতীয় রাম-বনবাস বলিয়া আক্ষেপ করিতেন। স্থতরাং প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি পিতা-কর্ত্তৃক পুনর্গৃহীত হইলেন। এইবার হিন্দু শাস্ত্র, বিশেষ ভাবে হিন্দু দর্শন অধ্যয়নের জন্য কাশীতে তিনি প্রেরিত হইলেন। এখনও ইংরাজী

রাজর্ষি ইংরাজী শিক্ষার ফল নহেন

শিক্ষার কথাই উঠে নাই। কাশীতে রাজা ষড়দর্শন আয়ত্ত করিলেন। ষড়দর্শনে তিনি এমনই ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, যে, খৃষ্টীয় প্রচারকদিগের সঙ্গে বিচারে তিনি এই সকলের যে সমন্বয় দাঁড় করাইয়াছেন, তাহা দার্শনিক তত্ত্ব-বিচারে বাস্তবিকই অতুলনীয়। হিন্দুর শাস্ত্রীয় বিচারে তার পরম্পরাগত একটা বিচার-প্রণালী আছে, যার সাহায্যে হিন্দুর শিক্ষা ও সভ্যতার সনাতনত্ব চিরদিন বজায় রহিয়াছে। যাঁহারা ভাবেন—হিন্দুসমাজ অচলায়তন, ইহা চিরদিন যেমন তেমনটাই আছে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, পরিবর্ত্তন কেবল এখনি হইতেছে সুতরাং সেই অপরিবর্ত্তনীয় প্রাচীনে প্রত্যাবর্ত্তন কর—তাঁহারা হিন্দুর ইতিহাস একেবারেই বুঝেন না। হয় তো জানেনই না। নিজের গুটিকতক সংকীর্ণ সংস্কারকেই হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম মনে করেন। শাস্ত্রকে সনাতন বলিয়া ধরিয়া লইয়া অবস্থানুযায়ী যুগে যুগে তাহার নব নব ব্যাখ্যা দ্বারা নূতন রীতির প্রবর্ত্তনা করিলে সনাতনত্বের কোন হানিই হয় না। ইহাই এই ব্যাখ্যা-প্রণালীর মূল তত্ত্ব। শাস্ত্রকারগণ 'সনাতন' শব্দের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে বর্ত্তমান 'সনাতনী'দের কোন সম্বন্ধ নাই। ব্যাস বলেন—সত্যং দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষো হ্রীঃ ক্ষমার্জ্জবম্।

জ্ঞানং শমো দয়া ধ্যানমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥

অর্থাৎ যাহা মানব সাধারণের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম, তাহাই সনাতন ধর্ম্ম—ইহাই বিজ্ঞান-সম্মত মত। এই মতানুসারে ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, ক্ষত্রিয় রাজা তাহা চালাইয়াছিলেন। যে ব্যবস্থাপকের (Legislator এর) পশ্চাতে কার্য্যনির্ব্বাহক (Executive) নাই সে ব্যবস্থাপকের কোন মূল্য নাই। তাহার কথা কেহ শুনিবে না এক দিন এমন ব্যবস্থাপকের ব্যবস্থাও রাজশক্তির সাহায্যে চলিয়া গিয়াছে রামমোহনের পাদুকা বহনেরও যাহার যোগ্যতা নাই। কিন্তু আজ অধমাধম শূদ্রও রামমোহনের কথা বিনা বিচারে গ্রহণ করিতে চায় না। এইখানেই দেশের সমাজ-জীবনের ঘোর পরিবর্ত্তন ধরা পড়িতেছে। এ সম্বন্ধে '**সংস্কার ও সংরক্ষণ**' গ্রন্থে বিশেষ আলোচনা করা গিয়াছে। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই রামমোহন শাস্ত্রীয় বিচারে অপরাজেয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহাই প্রাচীনের রক্ষণশীলতার সঙ্গে নবীনের উন্নতিপ্রিয়তার সামঞ্জস্য। যাঁহারা 'যা আছে তাই সনাতন' এই মত লইয়া রামমোহনের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের 'সনাতনে'র উপর

সংস্কার ও সংরক্ষণের সামঞ্জস্য

দাঁড়াইয়া থাকিবার ভূমিই ছিল না। সমগ্রের একটা বিশেষ অংশকে তাঁরা সমগ্র বলিয়া ধরিয়া ভ্রান্তিতে পড়িয়াছিলেন বা পড়িয়া রহিয়াছেন। এই খানেই প্রতিক্রিয়াবাদীদের দুর্ব্বলতা। কিন্তু রামমোহন প্রাচীনকে নবীনের আলোকে সংশোধন ও নবীনকে প্রাচীনের দ্বারা পরিপূরণ করিয়া লইয়াছিলেন। বাহ্যাচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য আমরা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক শিক্ষারূপ যে অস্ত্র পাইয়াছি, রামমোহনের এই অস্ত্র উহা অপেক্ষা শতগুণে বেশী ধারাল। এই শিক্ষার উপরেই তাঁহার ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের ভিত্তি। তিনি ইংরাজী শিখিলেন ইহার পরে, এবং শ্রীরামপুরের পাদ্রীদিগের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া গ্রীক্ হিব্রু প্রভৃতি আয়ত্ত করিলেন। কেন না, মূল না ধরিয়া ডাল পালায় বিচরণ ছিল তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ—ইহা সত্যান্বেষী ব্যক্তিমাত্রেরই প্রকৃতিবিরুদ্ধ। যাঁরা ভাবেন, রাজা ইংরাজী শিক্ষার ফল, তাঁদের অজ্ঞতার পরিমাণ এইখানেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহাদের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই, যে শঙ্কর-রামনুজ-দর্শনের সমন্বয়ে তিনি যে নিজস্ব বেদান্তের ব্যাখ্যা দিয়াছেন (৮ম অঃ দ্রষ্টব্য) তাহাতে হিন্দুদর্শনের অভিব্যক্তির ধারায় রাজর্ষি রামমোহনের স্থান শঙ্কর বা রামানুজের নিম্নে নহে। যাঁহারা যুগে যুগে হিন্দুর শিক্ষা ও সভ্যতাকে নবীভূত করিয়া ঋষি আখ্যা লাভ করিয়া গিয়াছেন, রামমোহন তাঁহাদেরই এক জন। তিনি মৃতের সঙ্গে মিশিয়া যান নাই, মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিয়াছেন। মৃতদেহকে সাজাইয়া গুজাইয়া ঠেকা দিয়া লোক চক্ষুর কাছে যাঁরা দাঁড় করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ মৃতদেহের মধ্যে জীবন সঞ্চার করা যদি দোষের হয় তবে সে দোষ তিনি করিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তিনি যে প্রাচীনের নিজ বিশেষত্বটা সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়াই ইহাকে নূতনের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন, হিন্দুর প্রাচীন জিনিষটা যে কি সে জ্ঞান যাঁদের নাই, উপকথার গল্পের মত একটা প্রবাদ মাত্র জানা আছে, তাঁরা এই মহাকার্য্যের কোন ধারণা করিতে সমর্থ নহেন। আসল কথা, রাজা রামমোহন রায় অতীতকে পুনর্গঠন করিয়াছেন, অতীতের সঙ্গে যে যোগ অজ্ঞানান্ধকারে কাটিয়া গিয়াছিল, তাহার পুনর্স্থাপনা করিয়াছেন। যাঁরা ভাবেন তিনি অতীতকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁদের মত ভ্রান্ত আর কেহ নাই। তাঁদের ভ্রান্তির কারণ ভারতের অতীত সম্বন্ধে তাঁদের পূর্ণ অনভিজ্ঞতা। তাঁরা সত্যভ্রষ্ট হইয়া

কল্পনার রথে উড়িয়া বেড়ান। রাজা রামমোহন রায় যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা তদানীন্তন টোল চতুষ্পাঠীর বিরোধী। কিন্তু যে শিক্ষার উপরে প্রাচীন ভারতের গৌরব প্রতিষ্ঠিত ছিল, উহা সর্ব্বাংশে তাহারই অনুকূল (পরবর্ত্তী পৃঃ দ্রষ্টব্য)। যারা টোল চতুষ্পাঠীর শিক্ষাকে ভারতীয় জাতি গঠনের শিক্ষা মনে করিয়াছিলেন, তারা নিতান্তই ভ্রান্ত। টোল চতুষ্পাঠীর শিক্ষা প্রাচীন পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া নিতান্ত বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। নবজীবন গঠন বিষয়ে ইহার অকর্ম্মণ্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই তিনি ইহার বিরোধী হইয়াছিলেন। যে নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহিতেছিল তাহা প্রাচীনের নব-কলেবর বলিয়া, অথবা সুপরিচালিত করিয়া ইহাকে প্রাচীন পদ্ধতির নূতন কলেবরে পরিণত করিবার জন্যই তিনি ইহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি এইটি গ্রহণ করিলেন এবং ইহার সঙ্গে আত্মবিদ্যা যোগ করিয়া দিয়া ইহার মধ্যে প্রাচীনের পূর্ণরূপ প্রাপ্ত হইলেন বলিয়াই ইহার জন্য এত লড়িলেন। সাধারণ মানুষ নিজের রূপই বাহিরে খুঁজিয়া বেড়ায়। যার মধ্যে আছে কেবল কাঁচ সে বাহির হইতে কাঞ্চন আহরণ করিতে পারে না। তাই প্রতিক্রিয়াবাদীরা (Reactionists) রামমোহনের

প্রতিক্রিয়া-বাদীর ভ্রান্তি

প্রকৃত স্বরূপটি কখনও ধরিতে পারেন নাই, এখনও তাঁহাকে চিনিতে পারেন না। যাঁরা আজ কালকার প্রতিক্রিয়াবাদী তাঁরাই বাস্তবিক ইংরাজী শিক্ষার ফল, আপনাদের অজ্ঞাতসারে পাশ্চাত্য আদর্শের মোহে মুগ্ধ। তাঁরা যাকে বলেন প্রাচীনভারত, যার নামে অজ্ঞলোকের ভ্রান্তি উৎপন্ন করেন, তাহাও হয় তো কোন পাশ্চাত্য আদর্শের ঝাপ্‌সা দৃষ্টিজনিত বিকৃতরূপ। প্রাচীন ভারত বিষয়ে জ্ঞানের অভাবে উহাকেই প্রাচীন ভারত বলিয়া মনে করেন। এই Re-actionistগণ কখনও রামমোহনকে পাইলেন না। যেহেতু ঋষিরা Re-actionist হইতে পারেন না—তাঁহারা অতীতের উচ্চশেখরে সমাসীন ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা এবং বর্ত্তমানের দৃঢ় ভূমিতে দণ্ডায়মান ভবিষ্যচ্ছ্রষ্টা। ঋষিদের দৃষ্টি পশ্চাতে নয়, ভূতে নয়। যাঁহারা রাজর্ষির উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবের দোষ কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা বর্ত্তমান যুগের উচ্চতম গ্রামের চিন্তা ও ভাব ধারা সম্বন্ধে আপনাদের অজ্ঞতাই প্রতিষ্ঠিত করেন। Dr Sten Konow ঠিকই বলিয়াছেন : "It is well for India that a man like Rammohun became the leader of the

modern development, when the influence of the West began to make itself felt in Indian thinking. He was too great a personality to be blinded by appearances, and he was too deeply imbued with Indian religiosity to become dazzled by the apparently more modern tenets of Christianity as preached in the 19th century. *I am not sure that* Rammohun's *importance has always been realised in India.* I have been told that some people have found fault with him because he had come under the influence of European thought. Such critics, however, overlook the fact that religious ideas are not mathematical formulœ, with a meaning which has the same value at all times. There is progress and development in human civilization, in which progress all the civilised peoples of the world have their share. And religious ideas have also their life and their growth. The same formula does not mean the same thing to us as to our ancestors. Modern man is a child of his time, and his mental horizon can no longer be entirely shaped by the development within one single country" সুতরাং যাঁহারা স্বীয় গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া দূর-দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত তাঁহাদিগকে কৃপা-পাত্র মনে করিতে হয়। একজন মানুষ কেন জনপ্রিয় হয় তাহা বুঝিতে হইলে সজ্যমনস্তত্ত্বের এক অধ্যায় উদ্ঘাটন করিতে হইবে। সংক্ষেপে এই, যে কোনও নূতন ভাবকে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী হইতে হইলে তাহাকে সর্ব্বতোভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে হয়। যদি ইহা কোন উচ্চ দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হয়, তবে তো কথাই নাই। সাধারণের বুদ্ধির উপযোগী হইতে হইলে ইহাদিগকে অনেক নীচে নামিয়া আসিতে হয়। জাতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার অনুপাতে ইহার তারতম্য হইতে পারে, কিন্তু সত্যকে সাধারণের উপযোগী করিতে যাইয়া উহার গুরুত্ব কমাইয়া ফেলিতে হয়। আদিতঃ তত্ত্বটি যতই মহৎ ও উচ্চ থাকুক্ না, সর্ব্বসাধারণ উহাকে গ্রহণ করিবার সময়, অথবা সর্ব্বসাধারণকে উহা দ্বারা প্রভাবিত করিতে হইলে, উহার মহত্ত্বের আংশিক খর্ব্বতা না হইয়াই পারে না।

অন্যদিকে, উচ্চভাবচ্যুত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া ঐ তত্ত্ব যখন সাধারণের মধ্যে প্রবেশ করে, তখনও যতক্ষণ না অভ্যস্ত ভাবে পরিণত হয়, উহা আপন প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং অনেক সময় লাগে। কোন উচ্চভাবের দ্বারা হঠাৎ জনমণ্ডলীকে উত্তেজিত করিয়া তোলা সম্ভব নহে। এরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি হইলে বুঝিতে হইবে, কোন অনির্ব্বচনীয় নিম্ন আদর্শের দ্বারাই মানুষ পরিচালিত হইতেছে। কোন উচ্চভাব মানব জীবনের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া যাইতে অনেক সময় লাগে বলিয়াই সাধারণ মানবমণ্ডলী মহাপুরুষদিগের অনেক বর্ষ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। সুতরাং যখন দেখা যায়, লোকেরা গোলে 'হরিবোল' দিয়া কাহারও পশ্চাতে ছুটিতেছে, তখন বুঝিতে হইবে—হয়, উহারা কিছুই বুঝিতে পারে নাই; না হয়, কোন গুপ্ত ক্ষুদ্র অভিসন্ধির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। সর্ব্ব যুগেই গুটিকয়েক মাত্র লোক পাওয়া যাইবে যাঁহারা অন্য সকলের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করেন এবং যাঁহাদিগকে অজ্ঞ জনসাধারণ অনুকরণ করিতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের মত রূপে পরিণত হইতে হইবে বলিয়া ইঁহাদের মতকে সম্পূর্ণ বিপরীত মার্গাবলম্বী হইলে চলিবে না। সত্যের জন্য সর্ব্বত্যাগী লোকের বাহুল্য কোন দেশে কোন কালেই বেশী নহে—আমাদের আধ্যাত্মিক দেশই হউক বা সে কালের সত্য-যুগই হউক। এইরূপ বিভিন্নতা বর্ত্তমান থাকিলে অনুকরণ ও অনুসরণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়; সুতরাং এরূপ মত জনসাধারণকে তৎক্ষণাৎ প্রভাবিত করিতে সমর্থ হয় না। সেই জন্যই রামমোহনের ন্যায় অসাধারণ মহাপুরুষেরা বহুদিন ধরিয়া জনমণ্ডলীর উপর সাধারণতঃ তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই। উহাতেই অজ্ঞ লোকেরা ইঁহাদের মহত্ত্বের ধারণা করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। অল্পদৃষ্টি বাহিরের ঘটার উপরেই আবদ্ধ।

রাজর্ষির শিক্ষার আদর্শ সর্ব্বতোমুখী

রাজা যে শিক্ষা প্রচলন করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং আপনার জীবনে গড়িয়া দেখাইলেন, তাহারই উপর কেবল আত্মার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তিনি বুদ্ধের ন্যায় আত্মাকে পূর্ণ স্বাধীনতার ভূমিতে বসাইতে চাহিলেন। তাঁহার সকল শিক্ষার উদ্দেশ্য ঐ এক মুখে। উহা মানবজীবনকে খণ্ডভাবে গ্রহণ না করিয়া সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। রাজা মানুষকে অর্থনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক, সামাজিক সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এ প্রয়াস কোন

ব্যক্তি-বিশেষ, সম্প্রদায়-বিশেষ অথবা ক্ষেত্র-বিশেষে আবদ্ধ ছিল না। নর-নারী-নির্ব্বিশেষে, ছোট-বড়-নির্ব্বিশেষে সকলের মুক্তিই তিনি কামনা করিয়াছিলেন। দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্যও সর্ব্ব প্রথম তিনিই সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা ক্ষেত্র-বিশেষের স্বাধীনতার জন্য আপনাদের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিতেছেন, তাঁহাদের সে চেষ্টার মধ্যে নিন্দনীয় কিছুই নাই স্বীকার করিয়াও দুঃখের সঙ্গে বলিতে বাধ্য হইতেছি, যে উহা পণ্ডশ্রম মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে, যদি মানব আত্মার পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করা না হয়। সিংহ বনের এক পার্শ্বে মেষ শিশুর ও অন্য পার্শ্বে শ্বাপদের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চলিতে পারে না (পরবর্ত্তী ঘ দ্রষ্টব্য)। সমাজে, পরিবারে, ধর্ম্মনিয়মের মধ্যে (slave-mentality) দাসসুলভ মনোবৃত্তি গড়িবার শত আয়োজনকে অটুট রাখিয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিলেও আত্মা স্বরাট্ হইবে না, রাজর্ষি রামমোহনের জীবনের এইশিক্ষা—ইহাই যুগধর্ম্ম। ইহা অগ্রাহ্য করিয়া মানুষ মানুষ হইবে না। আর কিছু হইয়া কি লাভ!

গ। জাতীয় শিক্ষা

জাতীয় শিক্ষা বলিয়া একটা কলরব অনেক সময়ে শুনিতে পাই, কিন্তু ইহার অর্থ যে কি তাহা স্পষ্ট করিয়া কাহারও নিকট পাই না। ইহা কি আরণ্যক ঋষির আশ্রম, না ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর বিহারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা? ইহা কি সিন্দুর-চর্চ্চিত গ্রাম্য বটবৃক্ষের উদ্বোধন না গিরিগহ্বরের অন্ধকারের আবাহন? এ শিক্ষা কি মন্ত্রের মৌখিক উচ্চারণ, পরম্পরাগত বাক্যের শ্রবণ ও স্মরণ এবং অভ্রান্ত শাস্ত্র ও গুরুর চরণে আত্মনিবেদন? প্রাচীনের এরূপ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

ভারতীয় শিক্ষা সমন্বয়-জাত

সম্ভব হইলেও সময়োপযোগী হইবে না। চেষ্টা বিফল হইবে। যুগোপযোগী করিয়া নিজেকে গড়িয়া তোলাই ভারতের বিশেষ প্রকৃতি। তাঁর কপালে অসামঞ্জস্য লেখা নাই। ভারত যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতনের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া চলিয়াছেন, যুগে যুগে নব কলেবর লাভ করিয়াছেন। পারসিক কি গ্রীক্, সেমেতিক্ কি সিদিয়ান্, তুর্কী কি খৃষ্টান, যুগে যুগে যিনিই হিমাদ্রি-কিরীট

মহাসিন্ধুবিধৌত এই মহাদেশে আসিয়া বসবাস স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাকেই এই প্রকৃতি মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছে। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতে যে সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে, সমন্বয়ের উপর তাহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। আরম্ভ হইয়াছিল কোন্ প্রাগৈতিহাসিক যুগে কোন্ গোত্রের মানুষ লইয়া তার তো কোন খোঁজই নাই। তবুও সে আদিমানবের পদচিহ্ন আজও আমরা বক্ষে ধারণ করিতেছি। তারপর কোলারীয় দ্রাবিড়ীয়,—তাও তো বিস্মৃতির গর্ভে। আর আজ-কালকার খৃষ্টান মুসলমান—এ সকল লইয়া সমন্বয় আজও চলিতেছে। এই সমন্বয়ের মধ্যে বাহ্যপ্রকৃতি মানবপ্রকৃতির আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ—এই বিশ্বে যেখানে প্রাণের সাড়া আছে, মানবপ্রাণ মস্তক নত করিয়া তাহারই সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে এবং ব্যক্তি সমষ্টিগত জ্ঞান হইতেই আপনার পরিপুষ্টির মালমস্‌লা সংগ্রহ করিয়া সঞ্জীবিত হইয়াছে। ভারতের এই বিশেষ প্রকৃতি হইতে যে শিক্ষার উৎস উৎসারিত হইয়াছিল তাহা প্রাচীন গ্রীসের বা নব্য য়ুরোপের শিক্ষাপ্রণালী হইতে কোন অংশেই হীন নহে। ভারতীয় শিক্ষার নিজস্ব উপাদানের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—(১) বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তপ্র্কৃতির ঘনিষ্ঠ যোগ-রক্ষা। বিস্তীর্ণ বটবৃক্ষতলে গুরুশিষ্য-সমাগম, শিক্ষা-ব্যয়ের প্রায় সমস্ত টাকাটা হর্ম্ম্যনির্ম্মাণে ব্যয় করিবার সুযোগ না থাকার ফল নহে। ইট্-পাটকেলের পিঞ্জরে আবদ্ধ জীবন অপেক্ষা পশুপক্ষী ও বৃক্ষলতার সঙ্গে সহানুভূতিসূত্রে আবদ্ধ জীবন কত উচ্চ, কত সুন্দর! (২) অতি বাল্যেই পারিবারিক জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া গুরুগৃহের বিস্তৃততর পরিবারের অঙ্গীভূত হইয়া বহির্জ্জগতের দশজনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে মিশিয়া যাওয়ার অধিকার। এক কথায় নাগরিক (Citizen) হইবার যোগ্যতালাভ। (৩) সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, সকল আকর্ষণ হইতে দূরে থাকিয়া জ্ঞানানুশীলনের সুদীর্ঘ অবসর। এবং (৪) সর্ব্বোপরি ব্রহ্ম-চর্য্যের নিয়মানুসরণ। কেবল পুঁথিগত বিদ্যা নয়, কিন্তু বিদ্যার্থীরূপে শিক্ষাশালায় যাহা স্বীকার করিলাম কার্য্যগত জীবনে তাহা পালন।

ইহার উপাদান

চরিত্রগঠন না হইলে কোন শিক্ষাই শিক্ষা নয় এবং যাহা শিখিলাম তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার অভ্যাস না হইলে চরিত্রও গঠিত হইল না। যাহা শুভ তাহার আচরণের নাম অভ্যাস এবং যাহা অশুভ তাহা হইতে নিবৃত্তির নাম বৈরাগ্য—এই দুইটিই চরিত্র

চরিত্র-গঠন

গঠনের প্রধান সাধন। চরিত্র-গঠনে প্রাচীন ভারতের ছাত্রজীবনের ত্রি-ব্রত —পবিত্রতাব্রত, দারিদ্র্যব্রত ও শ্রমব্রত—অবশ্য গ্রহণীয় ও অনুষ্ঠেয়। কায়-মনোবাক্যের সংযম বা চিত্তচাঞ্চল্য ও ভোগাসক্তি পরিত্যাগই পবিত্রতার একমাত্র সাধন ছিল, তাহা নহে, প্রাণপণে সত্যানুসরণ ছিল ইহার প্রধান অঙ্গ। ইহারই নাম ঋত। যে সময়ে অর্থোপার্জ্জনই বিদ্যার্থীর চরম লক্ষ্য, দারিদ্র্যব্রতের প্রয়োজনীয়তা সে সময়ে কত তা বলাই বাহুল্য। অর্থগৃধ্নুতা ও অর্থলালসা পরিহার করিতে হইত এমনভাবে, যে অর্থবিষয়ে রাজপুত্র ও ফকীরের পুত্রকে সমান পদবীতে দাঁড়াইতে হইত। আজকালকার একই ছাত্রাবাসে বাস করিয়া যেমন ধনীপুত্রের এক ব্যবস্থা আর গরীবের ছেলের অন্যরূপ,সেখানে তাহা হইতে পারিত না। শারীরিক পরিশ্রমটা 'ছোট-লোকে'র কাজ বলিয়া যে সব 'ভদ্রলোকে'র ধারণা তাদের বিদ্যার্থী হইবার অধিকার ছিল না। দৈহিক শ্রমের মর্য্যাদা স্বীকার করিয়াই গুরুগৃহে প্রবেশ করিতে হইত। কেবল গুরুর নয়, শিষ্য-ভ্রাতৃমণ্ডলীর সর্ব্বপ্রকার শারীরিক সেবার ভার বহনে প্রস্তুত থাকিতে হইত। তাহাতে ধনী ও দরিদ্র, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিচার ছিল না। ইংলণ্ডের রাজপুত্রকে যদি ইটন্-স্কুলে ভর্ত্তি হইতে হয় তবে সহাধ্যায়ীর জুতা পরিষ্কারটা অসম্মানের কাজ বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিলে চলে না। সেকালের বিদ্যার্থীকে কেবল গৃহনির্ম্মাণে নয়, গৃহ-সম্মার্জ্জনেও রাজী হইতে হইত এবং গুরুকুলের অন্ন-সংস্থানের জন্য রাজপুত্রের ভিক্ষায় বহির্গত হওয়া অসম্মানের কাজ ছিল না। আমরা "ডিমক্র্যাসী" "ডিমক্র্যাসী" বলিয়া চীৎকারই কেবল করিতেছি; হাতে-কলমে তার শিক্ষার ব্যবস্থা কি করিয়াছি? পরিবারে, সামাজিক জীবনে, শিক্ষা-ক্ষেত্রে তো তার বিপরীত আচরণই লক্ষিত হইতেছে। যখন দেখি ছাত্রাবাসে বিভিন্নবর্ণের ছাত্রগণ আপনাদের বর্ণমর্য্যাদা রক্ষা করিতে যাইয়া নিতান্ত ঘৃণ্য বিবাদে প্রবৃত্ত, তখন ডিমক্র্যাসীর সকল আশায় জলাঞ্জলিই দিতে হয়। জাতিভেদের প্রকোপকালেও তো ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য গুরুকুলে ভ্রাতৃভাবে একত্র বাস করিয়াছে। আমরা যে বৈদিক যুগে ফিরিয়া যাইতে চাই, কোথায় যাইব তাহা কি ঠিক করিয়াছি?

যাহা হউক, প্রাচীন কালের শিক্ষার আদর্শ দুইভাগে বিভক্ত ছিল—ব্যক্তি-গত ও সমষ্টিগত। ব্যক্তিগত দিকের শিক্ষা আত্মবিদ্যা—মানুষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া দিন দিন মোক্ষপথে অগ্রসর হইবে। মানুষ জন্মমাত্র যে সকল ঋণে আবদ্ধ হয়, ঋষি-ঋণ তার অন্যতম।

ব্যক্তিগত শিক্ষা—আত্মবিদ্যা

জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডারে পূর্ব্ব পুরুষদিগের সঞ্চিত যে-সকল কলা ও বিদ্যা রহিয়াছে, পুরুষপরম্পরায় যে-সকল শিক্ষা ও সাধনা চলিয়া আসিতেছে, তাহা আয়ত্ত করিয়া ভবিষ্যদ্ বংশীয়দিগের জন্য সংরক্ষণ, ঐ ঋষি-ঋণ-শোধের পন্থা। ইহাই শিক্ষার সমষ্টিগত দিক্। সমষ্টিগত জীবনে ব্যক্তির যে স্থান, শিক্ষাটা তাহার অবিচ্ছিন্ন অঙ্গরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অবশ্যগ্রহণীয় উচ্চশিক্ষার এবং পল্লীসংঘসমূহের একরূপ সার্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এই প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ কেম্ব্রিজ হইতে কলিকাতায় আসে নাই, মান্দ্রাজ হইতেই ম্যাঞ্চেষ্টরে গিয়াছিল। শিক্ষায় সর্ব্ব-সাধারণের সমান অধিকার ছিল। শিক্ষা পুঁথিগত ছিল না, বিদ্যা ও কলার সাহায্যে কার্য্যকরী করা হইয়াছিল।

সমষ্টিগত শিক্ষা—ঋষি-ঋণ

আধুনিক টোল ও চতুষ্পাঠীতে এ সম্বন্ধে ব্যভিচার ঘটিয়াছিল বলিয়াই রাজা রামমোহন রায় ইহাদের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। তিনি যখন দেখিলেন, টোল-চতুষ্পাঠীর শিক্ষা-প্রণালী ও আদর্শ হইতে কলা ও বিদ্যা তিরোহিত হইয়াছে, আছে কেবল পরম্পরাগত অর্থশূন্য কতকগুলি বাঁধি গতের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ, তখন তিনি একদিকে নূতন করিয়া Art ও Scienceএর প্রতিষ্ঠা ও অন্যদিকে বেদান্ত-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া আত্মবিদ্যার অনুশীলন—জাতীয় শিক্ষাধারার এই দুই বিচ্ছিন্ন ও বিনষ্টপ্রায় দিক্ পুনরুজ্জীবিত করিয়া ইহার সংরক্ষণ ও ইহার সঙ্গে নবীনের যোগ স্থাপনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এই দুই দিকের পূর্ণ সম্মিলন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছাড়া কেবল অর্থকরী বিদ্যা বা কার্য্যকরী শিক্ষার (vocational training) পশ্চাতে ছুটিলে যাহা বাস্তবিক স্বদেশী বস্তু—আমাদের জাতীয় শিক্ষা, তাহা লাভ হইবে না। পুঁথিগত বিদ্যায় কোনও কাজ হয় না। আমাদের এই যে জাতীয় শিক্ষা-যন্ত্র ইহার কাছে বর্ত্তমান কালের শিক্ষামন্দির-সকলের শিখিবার অনেক রহিয়াছে। আমাদের শিক্ষাসৌধ এই জাতীয় ভিত্তির উপরই গড়িতে হইবে। বর্ত্তমান যুগের পরিবর্ত্তিত অবস্থার প্রয়োজন বুঝিয়া, বর্ত্তমান জটিল সার্ব্বভৌমিক শিক্ষার ও সাধনার দাবী স্বীকার করিয়া সে ভিত্তিকে গভীরতর ও বিস্তৃততর করা যাইতে পারে। কিন্তু নির্ম্মাণকার্য্য এই ভিত্তির উপরেই আরম্ভ করিতে হইবে।

রামমোহনের কার্য্য

তবে, আজ যে এক জাতীয় শিক্ষার কথা শুনিতেছি, তাহা 'খোল-নলচে'

বাদ একটি হুঁকো। তাহা না শিক্ষা, না জাতীয়। ইহা, পাছে বৈদেশিক হাওয়া ঘরে প্রবেশ করে এই ভয়ে ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলা। ইহা ভারতের আত্ম-ধর্ম্মের বিরোধী। ভারত কখনও বাহিরকে প্রত্যাখ্যান করেন নাই—যাহা সত্য, যাহা শিব, যাহা সুন্দর তাহা সর্ব্বত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছেন ও সর্ব্বত্র বিলাইয়াছেন। কিন্তু আজ এ কি দেখি! যাহাকে বলি বৈদেশিক শিক্ষা তাহারই শিক্ষাশালা হইতে জনকতক ছাত্র ভাগাইয়া লইয়া পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলাম, আর নাম হইল জাতীয় বিদ্যাপীঠ। এ যেন (উল্টাদিকে অবশ্য) নামাবলী দিয়া পেণ্টুলান গড়িয়া নাম দিলাম জাতীয় পরিচ্ছদ। উলঙ্গ হইয়া উলঙ্গ প্রকৃতির কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেই কি ভারতের এতকালকার সাধনার সিদ্ধি! শেষ কালে কি সব ছাড়িয়া হিন্দী ও চর্‌কার চর্চ্চাই এ জাতির পিতৃ-পুরুষ পূজ্যপাদ ঋষিগণের ঋণশোধের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে? হায়! ঋষিগণের যুগযুগান্তের তপশ্চর্য্যার কি এই পরিণাম! ইহারই নাম 'আমার বুদ্ধি শোন্, ঘর দোর ভেঙ্গে ফেলে নটে' শাক্ বোন্!" যদি নটে শাক বোনা এতই প্রয়োজনীয় হয়, তবে ঘর দোর ভাঙ্গিতেই হইবে এমন কি কথা আছে? যে জাতীয় শিক্ষা বিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা ও বৈদেশিক সংস্রব পরিত্যাগ করে, তাহা আর যাহাই হউক, ভারতীয় নয়, ইহা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিতে হইবে। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় বৈদেশিক যান্ত্রিক, রাসায়নিক ও ধাতুবিদ্যাবিদের জন্য যেমন উন্মুক্ত ছিল, জগতের বাজারে ভারতও অন্যান্য পণ্যের ন্যায় বিদ্যা-বাণিজ্যের আদানপ্রদানের দাবী কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। ইহারই ফলে ভারতে নীল, পাকা রং ও ইস্পাতের উদ্ভব—যাহারা একদিন ভারতমাতাকে মধ্যএশিয়ার কর্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ভারত-মাতা যে একদিন সহস্রাধিক বর্ষ ধরিয়া প্রাচ্য-প্রতীচ্যের শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী রূপে বিরাজ করিয়াছিলেন, জগতের জাতিসকল যে সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে তাঁহার প্রাধান্য নির্ব্বিবাদে মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা কেবল তাঁহার জঙ্গলের চন্দনকাষ্ঠ ও সুগন্ধি মশ্‌লা-সম্ভার, আকরের হীরা আর জলের মুক্তার মহিমায় নয়। তাঁর মানুষগুলিরও কিছু কিম্মত উহার মধ্যে ছিল। সুতরাং প্রাচীনের দিকে কেবল মুখ ফিরাইলেই আমাদের সকল দুর্গতির অবসান হইবে না। আমাদিগকে যদি বাস্তব জাতীয়তা লাভ

বর্ত্তমান আন্দোলন অজ্ঞতা-প্রসূত

ভারত মাতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রণালীর ফল

করিতে হয়, তবে সেই শিক্ষা-পদ্ধতিকেই পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে যাহার জন্য রাজা রামমোহন রায় নিজে আপনার সমগ্র সাধনা নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ চেষ্টা পাইয়াছিলেন, যাহার মধ্যে পরা-ও অপরা-বিদ্যা সমন্বয়ীভূত হইয়া রহিয়াছে, এবং যাহার বলে এই প্রাচ্য ভূখণ্ড কোনরূপ সাম্রাজ্যপিপাসাদ্বারা পরিচালিত না হইয়াও সেই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যাহাতে পূর্ব্ব উপদ্বীপ হইতে পূর্ব্ব আফ্রিকা ও দক্ষিণ য়ুরোপ পর্য্যন্ত এক বিশ্ব-জোড়া বৈদেশিক বাণিজ্য তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছিল।

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনে রামমোহনের উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা ছিল ভারতকে "Enlightener of Asia" করিয়া তোলা। নবভারতের পিতা ও প্রবর্ত্তকের দৃষ্টি যে সত্যে প্রতিষ্ঠিত, বোলপুরের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন-মন্দির **বিশ্বভারতী** সম্বন্ধে পাশ্চাত্য—মনীষীদিগের সাক্ষ্যই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রাচ্য প্রাচ্য, পাশ্চাত্য পাশ্চাত্য—সুতরাং এ দুই কখনও মিশিবে না বলিয়া কোন কোন পাশ্চাত্য পাশ্চাত্যের গুণাবলি হইতে প্রাচ্যকে বঞ্চিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর; অন্যদিকে, প্রাচ্যান্ধ অনেকে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে আপনার ঘরের দরজা বন্ধ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। বিশ্ব-ভারতী ইঁহাদের অন্ধতার জ্বলন্ত প্রতিবাদ। ইঁহাদের প্রতিবাদ করিয়াই ইতালীয় পণ্ডিত অধ্যাপক Carlo Formichi (শুনা কথা নহে, কেন না, "যারে কভু দেখি নাই সে বড় রূপসী, যার হাতে খাই নাই সে বড় রান্ধুনী", কিন্তু জীবনে প্রত্যক্ষকরা জীবন্ত সত্য কথা) বলিতেছেন:—Visvabharati's motto is rather "East is East and West is West, and therefore, they *must* meet." Since last November I have been in Santiniketan living the life of the people of the Asram, and experiencing that, indeed, no national prejudice, no religious intolerance, no barriers of customs ever make an European feel far from home. European visitors are constantly flocking to the place, and I think there is not in the whole world more truly international resort for men of good will and common ideals to meet for an exchange of mutual spiritual help and sympathy." প্রাচীন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আদান প্রদানের কথা বলিয়াছি, ইহা তাহারই পুনরাবির্ভাব। বিশ্বভারতীর

ধর্ম্মশিক্ষার সম্বন্ধে বলিতেছেন, যে উহা কতকগুলি প্রাচীন মতামত শিখাইয়া দেওয়া নহে, কিন্তু অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক ধর্ম্ম-বৃত্তিকে প্রকৃতির সাহচর্য্যে পারিপার্শ্বিক অবস্থানিচয়ের সাহায্যে নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ করিয়া তোলা। স্বাধীনতাই ধর্ম্মবিকাশের ভিত্তি। শিক্ষা বিষয়ে আমরা ইতিপূর্ব্বে এই কথাই বলিয়াছি। "Will not a Christian, a Mahomedan, a Parsi or a Buddhist readily admit this truth that is one of the bases of religious life? It is hardly possible being a man, to disagree with the Poet's religious tenets that are those of humanity freed from the bonds of onesidedness and superstition."

বিশ্বভারতীই জাতীয় শিক্ষা-মন্দির

এই সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মবিদ্বেষের দিনে জাতীয় জীবনের সকল রোগের ভেষজ স্বরূপ রামমোহন রোপিত বৃক্ষের এই অমৃত ফল ছাড়িয়া মানুষকে নিম্নতর আদর্শ লইয়া মাতিয়া উঠিতে দেখিলে কেবল দীর্ঘ নিশ্বাসই পরিত্যাগ করিতে হয়। রামমোহনের আদর্শ কেবল প্রতিষ্ঠানে নহে কিন্তু ব্যক্তিতেও কেমন সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে উক্ত পণ্ডিত শেষে তাহাও বলিতেছেন—"To understand what Viswabharati, his institution, is, one has first to understand the man, and the man, you all know, is a poet of world-wide reputation and the greatest and best living specimen of the blending of all Western and Eastern qualifications and virtues" (Lecture at Dacca, Feb. 9th, 1926). আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, এই মিলনের আদর্শ ভারতের স্বকীয়। কবিও বলিয়াছেন, "এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে" মিলনই স্বাভাবিক। ইহার বিরুদ্ধাচরণ সম্পূর্ণরূপে জাতীয়তাবিরোধী। কেন না,

"হেথায় আর্য্য হেথা অনার্য্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন
শক হুন-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হ'ল লীন।

আবার "পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার"—মিলনই ভারতের চিরন্তন সত্য, বিশ্বভারতীতে যে সেই সত্যেরই পুনরুদ্বোধন তাহা আরও একজন পাশ্চাত্য বিশ্বপণ্ডিত Dr. Sten Konowও স্বীকার করিতেছেন: "Respect for his

fellow beings [কেহ যেন বাইবেলের "neighbours মনে না করেন] and sympathy with their highest longings is the necessary condition of the Indian conception of divinity. Visvabha'rati therefore tries to extend the mentality which meets us in Indian *bhakti* so as to comprise the whole human world. It invites men from all parts of the globe to come together in mutual respect and good will in order to learn to know each other as human beings whose ideals may differ, but who all belong to one higher Unity." জাতীয় জীবনের চরম সার্থকতা ইহারই সিদ্ধিতে। কিন্তু সাধনা কোথায়? দেশ যে আজ ক্ষুদ্র লইয়া ব্যস্ত। তবে সিদ্ধি আসিতে বাধ্য, সুপরিচালিত সত্যপ্রতিষ্ঠ প্রারম্ভ স্বল্পাকারে হইলেও তাহা ব্যর্থ হইবার নহে। তাই পণ্ডিতপ্রবর বলিতেছেন:—"It is a small beginning which has been made—we who have worked in the Viswabharati know that only too well. But we also know that spiritual ideas can not die, if they are filled with truth. They will live and sprout, and when the powerful political constellations of the present day have crumbled to pieces, they will survive and shape the future. We confidently hope and we firmly believe that Rabindranath Tagore's ideal is an eternal truth and not only a dream, that the day will come when the world will speak of him, not only as a poet, but still more as a prophet, and above all as a healer, who has laid the world under deep obligation in showing the way towards good will, towards harmony, towards peace." (*The Viswabharati Quarterly*, 1926.) দেশ ইহা যত শীঘ্র বুঝিতে পারে ততই মঙ্গল। বাঁচিতে হইলে একদিন বুঝিতে হইবেই।

বিজ্ঞান ও অহিংসা

যাহা হউক, যে শিক্ষা বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যাকে অহিংসার সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিতে সমর্থ নয়, বিজ্ঞানের একটা বিকৃতির সঙ্গে হিংসার যোগ দেখিয়া বিজ্ঞানকেই পরিত্যাগ করিতে উদ্যত—যে শিক্ষা পার্থিব লাভালাভের সঙ্গে আধ্যাত্মিক মুক্তির পথও

দেখাইবে না, তাহা ভারতের জাতীয় শিক্ষা বলিয়া কখনও সুধীজনকর্ত্তৃক গৃহীত হইতে পারে না। সত্য বটে ভারতই প্রথমে বিজ্ঞানের সাহায্যে ধ্বংসের মন্ত্র "Damascus blade"এর রহস্য জগৎকে শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া তিনি বিশ্বমৈত্রী ও পরাশান্তির পথও জগৎকে দেখাইয়াছেন। যে শিক্ষায় এই শান্তি, এই মৈত্রী, এই মুক্তির দ্বার খোলে, যদি সেই শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত করিতে পার, তবে জাতীয় শিক্ষার কথা বল। নতুবা যা করিতেছিলে তাই কর, পাপের বোঝা বাড়াইও না।

ঘ। লোকশিক্ষা

সর্ব্ব-সাধারণের জন্য শিক্ষার যে প্রস্তাব হয় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল তাহার বিরোধী হইয়াছিলেন। সকলে যাহা চায়, কেন বিপিনবাবু তাহার বিরোধী হইলেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার স্পষ্ট বাণী আমরা ১৩১৯ সাল, পৌষ মাসের 'বঙ্গদর্শনে' প্রাপ্ত হই। তিনি সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার বিরোধী নহেন। তবে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইবে, তিনি সেই প্রণালীর বিরোধী। তাঁহার কথাটা এই,—আমাদের সমাজ শাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত, পাশ্চাত্য সমাজ ব্যক্তিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমাদের এই বিশেষভাবটা নষ্ট হইয়া যাইবে এবং আমরাও আমাদের বিশেষত্বভ্রষ্ট হইয়া কাফ্রি বা জাপানীদের মত কিম্ভূতকিমাকার জীব হইয়া দাঁড়াইব! ব্যক্তিত্ব ছাড়া মানুষ মনুষ্যপদবাচ্য নহে, বিপিনবাবু তাহা জানেন বলিয়াই খোলাসা রাখিবার জন্য বলিয়াছেন, হিন্দুশাস্ত্রও ব্যক্তিত্বের চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়াছেন এই, যে সমাজে শাসন আর সন্ন্যাসে ব্যক্তিত্ব। যতদিন মানুষ সমাজে থাকিবে ততদিন তাহার জন্য কেবলই শাসন, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সে ব্যক্তিত্ব ভোগ করিবে। হিন্দুর এই সমাধান হিন্দু পরে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন; কেন না, ইহার বিষময় ফলেই সমাজ-জীবন মৃতপ্রায় হইয়াছে। মানুষ সামাজিক জীবনে যে অভিজ্ঞতা লাভ করে পঞ্চাশোর্দ্ধে তাহা লইয়া জঙ্গলে চলিয়া গেলে মানব-সমাজের সমূহ ক্ষতি অর্থাৎ সামাজিক জীব মানুষের জীবনের সর্ব্ব প্রধান সমস্যার মীমাংসা

সমাজে শাসন
সন্ন্যাসে ব্যক্তিত্ব

যে অতি-সামাজিক হইতে পারে না, বিপিনবাবু ভাল করিয়া এই কথাটা তলাইয়া দেখেন নাই বলিয়াই ইহা লইয়া এত হাঙ্গামা করিয়াছেন। মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে যতই বিবাদ থাকুক্ না কেন, উভয়কে একত্রিত থাকিতে হইবে। মানব-সমাজ জীবদেহেরই ন্যায় জৈবযন্ত্র (Organism), শাসন ও ব্যক্তিত্ব অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত। উভয়কে পৃথক্ করা যায় না। শাসনবিহীন ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিত্বই নয়; আবার যেখানে ব্যক্তিত্ব নাই সেখানে শাসন অর্থহীন। উভয়কে মিলিত করা শক্ত বলিয়া এক অবস্থায় শাসন ও এক অবস্থায় ব্যক্তিত্বের ব্যবস্থা শুনিলেই প্রাচীন ছোটলাট্ ইলিয়ট্ সাহেবের 'এক বেলা ডাল আর এক বেলা ভাতে'র কথা মনে পড়িয়া যায়। চিরজীবন ব্যক্তিত্বলোপী শাসনের মধ্যে থাকিয়া কখনও ব্যক্তিত্ব লাভ হইতে পারে না। পাখীকে সর্ব্বদা খাঁচার মধ্যে বদ্ধ রাখিয়া একদিন হঠাৎ তাহাকে ছাড়িয়া দিলে, সে উড়িতে পারে না, আবার খাঁচার মধ্যে আসে। তাই "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" ব্যবস্থা থাকিলেও শতবর্ষেও কেহ ঘরের বাহির হয় না। আর সন্ন্যাসী নামধারী দলের মধ্যে জটাধারী বিভূতিমণ্ডিত দশ বছরের বালকের অসদ্ভাব নাই! জীবন্ত দেহকে ধড় ও মস্তক এই দুই ভাগে বিভক্ত করিলে কি হয়? এইরূপে বিভক্ত হইয়া আমাদের সমাজ ও সন্ন্যাস দুই-ই অকর্ম্মণ্য হইয়াছে।

সমাজেই ব্যক্তিত্বের স্থান করিতে হইবে

মূল আপত্তি এই, যে, শিক্ষার ব্যবস্থা যখন আমাদের হাতে থাকিবে না, * তখন সে শিক্ষাদ্বারা আমরা জাতীয় চরিত্র ধ্বংস করিতে চাই না। এই আশঙ্কার মূলে জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় শিক্ষার আদর্শ বিষয়ে একটা ভ্রান্ত সংস্কারের প্রভাব লক্ষিত হইতেছে। জাতীয় চরিত্র বলিতে বৈদিক, বৈদান্তিক, বৌদ্ধ অথবা পৌরাণিক বা তান্ত্রিক, কোন্ কালের চরিত্র বুঝিব, তাহা কেহই স্পষ্ট করিয়া বলেন না। তার পর খৃষ্টান ও মুসলমান লইয়া আমাদের জাতীয় চরিত্র আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। এই সকলের মধ্যে সাধারণ কিছু ধরিয়া লইয়া, তাহাই যদি উদ্দিষ্ট হয় তবে **জাতীয় শিক্ষা** আলোচনায় দেখান হইয়াছে—বর্ত্তমান শিক্ষার সঙ্গে আরও কিছু যোগ করিয়া দিয়া ইহাকে জাতীয় শিক্ষায় পরিণত করা দুরূহ ব্যাপার নয়। নূতন একটা কিছু করিতে

* Calcutta University Commission এর report হইতে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হয় যে কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এ দেশের শিক্ষা-প্রণালী আমাদের Unconscious Willএর দ্বারাই গড়িয়া উঠিয়াছে। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জাতীয় শিক্ষার চেষ্টা ঐ জন্যই ব্যর্থ হইয়াছিল।

যাওয়া অসম্ভব। এখন প্রশ্ন এই, আমরা কি কখনও একটি তথা-কথিত উদ্ভট জাতীয় শিক্ষার উদ্ভাবন করিয়া আমাদের এই অধঃপতিত জাতীয় বিশেষত্বের রক্ষণ আকাঙ্ক্ষা করিতে পারি? পারিও না, উচিতও নয়। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল, যে এই বিশেষত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যথেষ্ট মত-বিরোধ রহিয়াছে। জাতীয় অধঃপতনের সময়ের আদর্শকে আকৃড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চাহি না। একান্ত ব্যক্তিত্ব-বিহীন সামাজিক চরিত্র রক্ষা করার চেষ্টায় আমরা আমাদের জাতীয় জীবনকে বিনাশের দিকে লইয়া যাইব। আমরা এখন আর ভিতর হইতে গড়িয়া উঠিতেছি না। বাহিরের চাপ আমাদিগকে গড়িতেছে। এই চাপের সঙ্গে মিলাইয়া জাতীয় জীবনকে গড়িয়া অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের জাতীয় জীবন চিরদিন এক জায়গায় বসিয়া নাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থানিচয় আমাদের নিরপেক্ষ হইয়াই গড়িয়া উঠিতেছে, এক দিকে সে গুলির উপর যেমন আমাদের হাত নাই, অন্য দিকে সেগুলির হস্ত এড়াইবারও শক্তি নাই। তখন রাগ করিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিলে মৃত্যুকেই ডাকিয়া আনা হয় না কি? আর, যে বিপথে পরিচালিত বিশেষত্ব বজায় রাখিবার কথা বলা হইতেছে, তাহা আমাদিগকে কল্যাণের পথে লইয়া যায় নাই। তাহার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইয়াছে। সার্ব্বজনীন শিক্ষা প্রচলনের দ্বারাই এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। আমরা উদ্যোগী হইয়া এখন সে শিক্ষা প্রচলিত করিলে, ইহার উপর আমাদের কিছু হাত থাকিবেই এবং এই পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত বিশেষত্বের স্থানও ইহার মধ্যে করিয়া লওয়া যাইতে পারে। পরে সে সুযোগও থাকিবে না। জগতে সর্ব্বত্র ধীরে ধীরে বাধ্যতামূলক সার্ব্বজনীন শিক্ষা প্রচলিত হইতেছে। জগতের সঙ্গে যে আমাদের যোগ তাহা আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। সুতরাং জগতের সঙ্গে যোগ কাটিবার আমাদের শক্তি নাই। জগতে যাহা হইতেছে তাহা আমাদেরও হইবে। সে দিন তো স্রোত থামাইতে পারিব না। সুতরাং স্রোতে ভাসিয়া যাইবার পূর্ব্বে ঘর সাম্‌লাইয়া লইলে ভাল হয় না কি? আমরা নিজেরা রাষ্ট্রনিরপেক্ষভাবে যে নিজেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিব তাহার সম্ভাবনা নাই, এবং ব্যক্তিত্ববিহীন শিক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজনও নাই। যাহা কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তির (Practical politicsএর) বাহিরে তাহা লইয়া আন্দোলন নিষ্ফল এবং বিড়ালের সঙ্গে বাদ করিয়া নিরামিষ ভক্ষণের ন্যায় হাস্যকর।

অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা

অনেকে যে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে একেবারে নিরঙ্কুশ, ব্যক্তিত্বপ্রধান ও শাসন-বিহীন মনে করেন, সেটা ঠিক নহে। তাঁহারা দেখেন না যে পাশ্চাত্যে প্রতিযোগিতার মধ্য হইতেই সহযোগিতা ফুটিয়া বাহির হইতেছে? আর আমাদের ব্যক্তিত্ববিহীন সহযোগিতা বিরাট্ অমনোযোগিতায় পরিণত হইয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক। ব্যক্তিগণই শাসনাধীন হইতে পারে। শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা আগে চাই। তাহা না হইলে যে শাসনের প্রতিষ্ঠা, তাহা জড় পরমাণুর উপরে প্রতিষ্ঠিত শাসন। তাই আমাদের দেশের যত সামাজিক সহযোগিতা অকর্ম্মণ্যতার জন্মদিয়া সমগ্র জাতীয় জীবনকে তমো-প্রধান করিয়া তুলিয়াছে। বিপিন বাবু কি দেখিতে পাইতেছেন না, কেন হিন্দুর এত সাধের একান্নবর্ত্তী পরিবারপ্রথা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইতেছে? উহা ব্যক্তির সমষ্টি না হইয়া ইট্ পাট্‌খেলের সমষ্টি ছিল বলিয়া এত সহজে ভূমিসাৎ হইয়া গেল। এ বিপদ হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায় ব্যক্তিত্বকে জাগাইয়া তোলা। ব্যক্তিগণ যখন শাসন স্বীকার করিয়া একত্রিত হয়, তখনই বাস্তবিক ব্যক্তিত্ব ও শাসনের সমস্যা মিটিয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে যে মিল, তাহা গোঁজা মিল। আমরা গোঁজা মিল দিয়াছিলাম বলিয়া আজ আমাদের জাতীয় জীবনের খাতায় শূন্য দেখিতেছি। আমরা যদি সত্যই মনে করি, যে, ব্যক্তিত্ব একটা অতি খাঁটি ও উচ্চ বস্তু, তবে তাহার প্রতি সন্ন্যাসের ব্যবস্থা না করিয়া আমাদের সমাজ ও পরিবারে তাহার জন্য একটু স্থান করিয়া দেওয়া চাই। তাহা হইলেই এই খাঁটি বস্তুর সংস্পর্শে আমাদেরও সমাজ এবং পরিবার খাঁটি হইয়া উঠিবে, তমোগুণ পরিহার করিয়া রজোগুণের মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিবে। নতুবা এই ব্যক্তিত্ববিহীন শাসন চিরদিনই তমোগুণের আকর হইয়া আমাদের উপর রাজত্ব করিবে। আমাদের সমাজপ্রকৃতির পরিবর্ত্তন এই দিক্ দিয়া বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সমাজের উপরের দিক্ যে শিক্ষা লাভ করিতেছে তাহা হইতে সর্ব্বসাধারণকে বঞ্চিত রাখিলে অন্য নানা রকমের জটিলতা আসিয়া সমাজদেহকে আক্রমণ করিবে। সমাজদেহকে এরূপভাবে দ্বিখণ্ডিত হইতে দেওয়া ভবিষ্যতের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে না। এইটাই পরিণামে একটা গুরুতর সমস্যায় পরিণত হইবে। তাহার সমাধানের জন্য তখন হয়তো আজ যে শিক্ষা পায়ে

পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিষয়ে ভ্রান্তি

ব্যক্তিত্ব জাগাও

ঠেলিতেছি, সর্ব্বসাধারণের জন্য তাহাই বরণ করিয়া লইতে হইবে। বিশেষতঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিত্বের সাধনা অবশ্য গ্রহণীয় বলিয়া মনে করিতেছি, সমাজে তাহার উপেক্ষা করিবার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এরূপ চেষ্টা কখনও ফলবতী হইতে পারে না। যাঁহারা মানব মন ও মানব সমাজকে এখন Organism বলিয়া ধরিতে না পারিয়া অন্ধকারে ঘুরিতেছেন, এরূপ বিফল প্রয়াস তাহাদের মধ্যেই সম্ভব। যাঁহারা মনে করেন, শাসন যেখানে উদ্যত বজ্রের ন্যায় ব্যক্তিত্বকে নিয়মিত করিতেছে—সেই কঠোর রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আমরা ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া গৃহে আসিয়া মেষশাবকের ন্যায় শুইয়া থাকিব এবং আমাদের সমাজপ্রকৃতি অক্ষুন্নই থাকিবে, তাহারা যে মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে নিতান্ত ভ্রান্ত মত পোষণ করেন সে কথা আমরা বলিতে বাধ্য। সকলেই উহা বলিবেন।

উহাই শিক্ষার উদ্দেশ্য

এক্ষেত্রে বিপিন বাবু একটা ভ্রান্ত আদর্শের পক্ষে ওকালতি করিয়াছেন মাত্র। তাঁহার দোষ, তিনি যখন যে দিক্‌টা দেখেন, তখন অপর পক্ষের সে সম্বন্ধে কি বলিবার আছে, সে দিকটা তিনি আদৌ দৃষ্টিপথে রাখেন না। ইহাতে একটা দিক্ বেশ স্পষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। তবে বিপদ এই, যে, তিনি যদি ঘটনাক্রমে দুই দিকেরই কথা বলিতে বাধ্য হন, তবে এই দুই দিকই সমান পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া পরস্পরকে আঘাত করে। আমার মনে হয় পৌষের 'বঙ্গদর্শনে' এইরূপ বিপদ্ ঘটিয়া গিয়াছে। সার্ব্বজনীন শিক্ষার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া তিনি যে ব্যক্তিত্বের প্রসার অত্যন্ত হানিজনক মনে করিয়াছেন, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের প্রশংসা করিতে যাইয়া সেই ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠাকেই জাতীয় তামসিকতা দূরীকরণের একমাত্র অস্ত্র বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানুষ যে ক্ষেত্রেই কার্য্য করুক না কেন, মনটি তাহার সামাজিক আবেষ্টনকে অতিক্রম করিতে পারে না। রাষ্ট্রকে হিন্দুর সন্ন্যাসের ন্যায় মানুষের সামাজিক জীবনের বাহিরে স্থাপন করিলে একটা মারাত্মক ভ্রম করা হইবে। অখণ্ড মানবজীবনকে এমন করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে মানব-প্রকৃতিকে একেবারেই বুঝা হইবে না। রাষ্ট্র ক্ষেত্রে যদি ব্যক্তিত্বাভিমানকে জাগাইয়া তোলাই জাতীয় জীবনের পক্ষে অবশ্য করণীয় কাজ হয়, তবে সমাজক্ষেত্রেও গত্যন্তর নাই। বাহিরে সিংহ, ঘরে মেষ—এ অভিনয় বেশী দিন চলে না। বিপিনবাবুও এখন ঠিক ঐ কথাই বলেন (১০৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

রাষ্ট্রে ও সামাজিক জীবনে দুই আদর্শ চলে না

ফলে অল্প দিনের অভিনয়ের পর আবার মূষিকই হইতে হয়। ব্যক্তিত্ব জাগাইবার চেষ্টায়ই যদি ব্রহ্মবান্ধবের প্রশংসা নিহিত থাকে, তবে সে প্রশংসা সমাজসংস্কারক ও শিক্ষা-সংস্কারক সকলেরই প্রাপ্য। বিপিনবাবু যে এ সকলের মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন, তাহার কারণ এই, যে উহার পশ্চাতে ফিলসফির অসদ্ভাব এবং অতিরিক্ত ওকালতি-প্রিয়তা।

বিপিনবাবুর আর একটা কথার উল্লেখ করিব। তিনি বলেন, সংস্কারকেরা সমগ্র প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতে পারে না। তাহা হইলে না কি তাহাদের ব্যবসায়ই মাটি। এই উপলক্ষে তিনি স্বীয় জীবনের যৌবনকালের অভিজ্ঞতার হাঁড়িটা হাটের মাঝখানে ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন।

সংশোধন ও প্রীতি

বিপিনবাবু তো সন্তানের পিতা—জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, তিনি যখন পুত্রের দোষ দেখিয়া তাহার সংশোধনের জন্য, মৌখিক নহে, কিন্তু কার্য্যতঃ চেষ্টা করিয়াছেন, তখন কি কখনও মনেও সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে তিনি পুত্রকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসেন না? না চেষ্টার তীব্রতাটা ভালবাসার তীব্রতারই পরিচায়ক বলিয়া মনে হইয়াছে। যেখানে সংশোধনের সে তীব্র চেষ্টা দেখি না, সেখানে ভালবাসাটা ভালবাসার বিকার বলিয়াই মনে করি। যে পিতা পুত্রের দোষ দেখিয়াও দেখেন না, ভাবেন আমার পুত্রের অনেক গুণ আছে দোষটা মায়া, উহা চলিয়া যাইবে—তাহার জন্য সমাজের হস্তে বেত্র রহিয়াছে। চীনদেশে না কি পুলিশেরও ঐ রকম একটা কি ব্যবস্থা আছে। ইহা ভালবাসা হইতে পারে, কিন্তু উহা তামসিক ভালবাসা। সেইটাই কি সর্ব্বোচ্চ আদর্শ? স্বজাতিকে ভালবাসার অর্থ স্বজাতির যাহা মূলধন স্বজাতির যাহা শ্রেষ্ঠ আদর্শ তাহার প্রতিষ্ঠায় প্রাণপণ যত্ন। স্বজাতির যে সমস্ত দোষ ত্রুটী সেই আদর্শকে বাধা প্রদান করে, তাহার দূরীকরণ চেষ্টা সেই ভালবাসার বাহ্য প্রকাশ মাত্র। হিব্রু প্রফেট্‌গণের ন্যায় স্বজাতি-বৎসল একদল লোক বিরল। কিন্তু স্বজাতির দোষ ত্রুটী দেখিয়া তাঁহারা যেমন তীব্র জ্বালাময়ী ভাষায় তাহার তিরস্কার করিয়াছেন, তাহাও জগতে বিরল। স্বামী বিবেকানন্দও ঐরূপ করিয়াছেন (১৯শ অঃ দ্রষ্টব্য)। যাহাকে ভাল দেখিতে চাই তাহাকে মন্দ দেখিলে যে জ্বালা উপস্থিত হয়, এ তিরস্কার তাহারই বহিঃপ্রকাশ। ইহা ভালবাসার গভীরতাকেই প্রকাশ করে। মানুষ নিজের জনের দোষ দেখিয়াই ব্যথা পায় এবং সে ব্যথা তিরস্কার রূপে বাহির হয়। রাস্তার লোকের সম্বন্ধে কথা স্বতন্ত্র।

৬। ধর্ম্ম-শিক্ষা

মানব মনকে তিন দিক্ হইতে সাধারণতঃ দেখা হয়—জ্ঞানের দিক্, ভাবের দিক্ ও ইচ্ছার দিক্। ইহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন—একটা ছাড়িয়া অন্যটা থাকিতে পারে, তা নয়। কেবল বিষয়টি বিশদরূপে বুঝিবার জন্য এই ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি। নতুবা, বস্তুতঃ ইহারা এক অখণ্ড আত্মবস্তুর বিভিন্ন ধারণা মাত্র। শিক্ষাকে লৌকিক শিক্ষা ও ধর্ম্ম-শিক্ষা এই দুইভাগে বিভক্ত করিলে লৌকিক শিক্ষার কাজ হইবে অন্তর্দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করিয়া বিষয় সকলকে বিভিন্ন দিক্ হইতে দেখিয়া তাহাদের যথোপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ ও মূল্য নির্দ্ধারণ। এক কথায়, জ্ঞানের গভীরতা ও বিস্তৃতি সম্পাদন লৌকিক শিক্ষার অন্তর্ভূত। ধর্ম্ম-শিক্ষাকে বিশেষ অর্থে লৌকিক শিক্ষা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে তাহার কার্য্য—আত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করা এবং পরার্থ প্রবৃত্তির উদ্বোধন দ্বারা উচ্চ নৈতিক আদর্শের বিকাশ করা। যে শিক্ষা মানুষকে আপনা ভুলাইয়া জগতের মধ্যে আনিয়া ফেলিতে না পারে তাকে ধর্ম্ম-শিক্ষা বলা যায় না। সব দেশেই এক "মেডিভ্যাল্" বা পৌরাণিক যুগ দেখা যায় এবং বিংশ শতাব্দীতে বাস করিতেছি বলিয়া আমরা সকলেই যে ঐ যুগের কু-প্রভাব হইতে মুক্ত, ইহা ভাবিবার কোনই কারণ নাই—সে যুগে মানুষ জগতের সুখ-দুঃখকে ভুলিয়া আপনার "ভাব-ভক্তি" লইয়া মনোরাজ্যে বাস করাটাকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়াছিল এবং আজও মানুষ হাততালি দিয়া সে ভাবের পশ্চাতে ছুটিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। প্রকৃত ধর্ম্ম-শিক্ষা মানুষকে এই বিকৃত পথে লইবে না। ধর্ম্ম মানুষের মধ্যে এমনভাবে প্রবেশ করিবে, যে তার ব্যক্তিত্বকে সর্ব্বাঙ্গীনভাবে ফুটাইয়া বিরাট্ বিশ্বে তার আত্মবোধকে জাগাইয়া তুলিবে। ভাব ও ইচ্ছা—ভক্তি ও নীতি, ধর্ম্ম-শিক্ষার বিশেষ দিক্। সকল ধর্ম্ম-শিক্ষকের ন্যায় রাজা রামমোহন রায়ও এই শিক্ষাই দিয়াছেন, যে ভগবানে প্রীতি ও পরস্পরের প্রতি সদ্ব্যবহার—মানব-সমাজ এই দুই মূলকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং প্রেমে বিশালতা ও ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা বিধানে ধর্ম্ম-শিক্ষার সার্থকতা। ভগবদ্ভক্তি ও মানব-প্রীতি কর্ম্মের ভিতর দিয়া যতক্ষণ না আত্ম-প্রকাশ করিতেছে, ততক্ষণ ধর্ম্ম-শিক্ষার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইতেছি না—শাস্ত্রে তাহা যতই পুষ্পিত বাক্যে ছন্দোবদ্ধ হইয়া থাকুক্ না,

লৌকিক শিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষা

আর আচার্য্যগণ তাহা যতই দার্শনিক তত্ত্বযোগে ব্যাখ্যা করুন না। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" আমাদের উপনিষদের গণ্ডীতেই রহিয়া গেল, আমরা ষষ্ঠী-মাকালের সীমাতেই বদ্ধ। কেননা, "ভাত-কাপড়ে"র টানের মত টানেও আমাদের "অস্পৃশ্যতা"র বন্ধন ছিঁড়িল না। "অপরকে নিজেরই মত ভালবাসিও" বাইবলের এই উক্তি দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া আওড়াইলাম ও বড় গলায় দেশ বিদেশে গিয়া প্রচার করিলাম, জীবনে ফলিল না, তাহা বিগত যুদ্ধ বিশেষভাবে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়া গেল। ভাববৃত্তিকে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করা চাই, যাহাতে সহানুভূতি আত্মানুভূতিতে পরিণত হইয়া যায়। এমন সাধুর কথা শুনা যায়, অপরিচিত আগন্তুক দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার গায়ে শীতবস্ত্র নাই দেখিয়া নিজে শীতে কাঁপিয়া উঠিলেন। কিন্তু বাহির দেখিয়া ভুলিলে চলিবে না। ইহা কিন্তু কর্ত্তার অজ্ঞাতসারে একটা শারীরিক ব্যাপারও হইতে পারে। যুদ্ধের সংবাদে শুনা গিয়াছে—একজন ভারতীয় সৈনিক নির্ব্বিরোধে বসিয়া ধূম পান করিতেছে। কিন্তু কিছু পূর্ব্বে তার একখানা পা উড়িয়া গিয়াছে। শারীরিক যন্ত্রণাবোধের নিবৃত্তি তিন রকমে হইতে পারে—প্রথম, আমরা লিভিংষ্টোনের আখ্যানে পাঠ করিয়াছি, তাঁহাকে যখন সিংহ কামড়াইয়া ধরিল, তিনি কোন বেদনা বোধ করিলেন না—জ্ঞান রহিয়াছে, বেদনা নাই, যেমন ক্লোরোফরমে হয়। এক জন্তু অন্য জন্তুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে এই বেদনানুভূতির বিরাম, প্রকৃতির একটা সদয় নিয়ম। দ্বিতীয়, হিষ্টিরিয়ারোগে অঙ্গবিশেষ নাই বলিয়া মনে হয়, এই অবস্থায় সেই অঙ্গ কাটিয়া ফেলিলে বেদনা উৎপন্ন হয় না। প্রাচীনকালের অনেক "ধর্ম্মবীর" হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত ছিলেন। ক্যাটালেপ্সি রোগে মানব দেহ মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ সব আকারই ধারণ করিতে পারে—সে যে রোগগ্রস্ত এই ধারণা যে রোগীর থাকিতেই হইবে ইহার কোন কথা নাই। সুতরাং হাততালিতে তার মাথা বিগড়াইয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। তৃতীয়, যাকে বলে আমাদের যোগবল—ইচ্ছাশক্তিকে এমন দৃঢ় করা, যে, সকল ভুলিয়া মনকে যা কিছুর মধ্যে একেবারে ডুবাইয়া দিতে পারি, অথবা যা কিছুর মধ্য হইতে অবলীলায় উঠাইয়া লইতে পারি। অভ্যাসবশতঃ পরে অজ্ঞাতসারেই এ কার্য্য সাধিত হইয়া যাইবে। পৃষ্ঠ-ব্রণের অস্ত্রচিকিৎসায় ক্লোরোফরমের প্রস্তাব বিদ্যাসাগর হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। ডাক্তার কাটিয়া ছিঁড়িয়া ধুইয়া বাঁধিয়া চলিয়া গেলেন, বিদ্যাসাগর বসিয়াই আছেন—হুঁটুকুও করিলেন না। এই ইচ্ছা-শক্তির দৃঢ়তা সম্পাদন ধর্ম্ম-শিক্ষার

এক প্রধান কাজ। পরস্পরের সঙ্গে সদ্ব্যবহারে বা-অর্থাৎ আপনার প্রতি প্রযুক্ত হইলে যাহা ভালবাসি না অন্যের প্রতি তাহা করিব না—ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা ছাড়া এই ভাব কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। "সর্ব্বভূত আত্মময়" জানিয়াও আমরা সে অনুসারে কার্য্য করি না—তার কারণ জ্ঞানের অভাব নয়—সহানুভূতি জাগে নাই, ইচ্ছাশক্তির পরিচালনাও শিখি নাই। *

কার্য্যগত জীবনের শিক্ষা

ধর্ম্ম-শিক্ষায় শিক্ষকের কার্য্যগত জীবনের প্রভাবের স্থান অতি উচ্চ, সন্দেহ নাই। কিন্তু সে জীবন যে এক জনের উপর কার্য্যকরী হয়, তার পার্শ্ববর্তীর উপরে হয় না, তার অর্থ আছে। বিশ্বাসের মধ্যে জ্ঞান ভাব ইচ্ছা তিনই বর্ত্তমান। এক মানুষ প্রধানতঃ জ্ঞানের মধ্য দিয়াই অন্য মানুষের সঙ্গে আদান প্রদান করে। আমি যাহাকে সত্য বলিয়া ধরিয়াছি, তাহাকে জ্ঞান ভাব ইচ্ছা দিয়া না ধরিয়া থাকিলে, উহা আমার কাছেই প্রকৃত সত্য হয় নাই—আত্মার অন্ন পান হইতে হইলে সমগ্র আত্মা দিয়া ধরিতে হইবে। তারপর, আমি যাকে দিতে চাই, তার যদি ভাব ও ইচ্ছা জাগ্রত না থাকে বা জাগ্রত না হয়, তবে উহা তার কাছে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে না। সে তাহা গ্রহণ করিবে কেন? আবার একজনের দেখা দেখি যে আর একজনের ভাব জাগে, তার মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই স্নায়বিক ক্রিয়া বেশী, আত্মার ক্রিয়া কম। যেমন হিপ্‌নটিজম্‌ প্রভৃতিতে উত্তেজক কারণটি (Exciting cause) দূরে গেলে বা পুরাতন হইলে সে আকর্ষণ আর থাকে

* রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কথা বলিলে তো বিপদ ডাকিয়া আনিবে। ধর্ম্ম-সমাজে "রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাদামনোঃ বর্ত্মনঃ পরম্", সরিয়া যাইবার অধিকার নাই। গৃহে পরিবারে বাপ দাদার কাছে উচু মুখে কথা বলা বেয়াদবি। বিদ্যালয়ে পাঠাগারে টেক্সট্‌ বুকের চাপনে নাভিশ্বাসের উপক্রম। বাকী একটু খেলার সময়, যে সময়েই ছেলে মেয়ের উদ্ভাবনী শক্তির ক্রিয়া, ইচ্ছাশক্তির বিকাশ। নতুবা আর সব সময়ে তো ইচ্ছা 'ভীতির কবলে' মরেই আছে। বিজ্ঞেরা সে সময়েও চোখে চোখ রাখিতে উপদেশ দেন। অনেক অভিভাবক আছেন, ছেলেদের অবসর দেখ্‌লেই বলেন"—"পড়্‌তে বস্‌লি নে" অন্ততঃ জিওগ্র্যাফিখানা নিয়ে; সুতরাং ইচ্ছাশক্তি নামক পদার্থটা যে এ দেশ হইতে উঠিয়া যাইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। জাপানী শ্রমণ কোয়াগুচী অষ্টাদশ বৎসরের অভিজ্ঞতা লইয়া দেশে ফিরিবার সময় যে বলিয়া গিয়াছেন, এ জাতটারই ইচ্ছাশক্তি দুর্ব্বল, তাহাতে অতিরঞ্জন আশঙ্কা করিবার কিছু নাই। মানুষের জন্য ধর্ম্ম কি গড়ে আকাশে? ইচ্ছাশক্তির বিনাশে নৈতিক জীবন ভিত্তি পাইতেছে না; সুতরাং গড়িতেছেও না। গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিয়া লাভ নাই।

না। কেন বহু আসে কিন্তু অল্পই থাকে, তার কারণ এইখানে। আবার মানসিক ব্যাধি (Neurosis) বশতঃ বস্তু বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি মানুষের স্বতঃপ্রবৃত্ত অনুরাগ ও বিরাগ জন্মে, সে ব্যাধির প্রশমন ছাড়া অন্য দিকে মনকে লওয়া যায় না। এ কথা মনে থাকা চাই, যে, লোকশিক্ষককে কেবল ধার্ম্মিক হইলেই চলিবে না, বুদ্ধিমানও হওয়া চাই। মানব-চরিত্রের অভিজ্ঞতা সর্ব্বোপরি প্রয়োজন।

শাস্ত্রের শিক্ষা

শাস্ত্রদ্বারা ধর্ম্ম শিক্ষা যতটা হউক বা না হউক, মানুষ শাস্ত্রকে যুগ যুগান্ত ধরিয়া আশ্রয় করিয়া আছে। যদি ভুলিয়া যাই, শাস্ত্রে প্রতীক আছে, রূপক আছে, ইতিহাস আছে—কদর্য্য ইতিহাসও আছে; যদি ভুলিয়া যাই, বিশেষ অবস্থায় বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমূহের জন্য বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব আবির্ভূত হইয়াছিল, অবস্থার পরিবর্ত্তনে সে সকলের পরিবর্ত্তন আবশ্যক—তাহা হইলে শাস্ত্রের দ্বারা উপকার হইবে না। যে বিষয়ের জন্য যে প্রস্তুত নয়, তার কাছে তাহা বলিলে অপকার হয়—অধিকার-ভেদের এ তত্ত্বও বিস্মৃত হইলে চলিবে না। শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করাই ধর্ম্ম-শিক্ষার প্রধান কাজ। অসভ্যেরা যেমন আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ফল লাভ করিবার জন্য মাদুলী ব্যবহার করে, অর্দ্ধ শিক্ষিতেরা সভ্যসমাজেও করে—সেইরূপ গীতা বাইবেল ঘরে রাখিয়া, বা এক আধ অধ্যায় মাঝে মাঝে পাঠ করিয়া—বিশেষ ফলের আকাঙ্ক্ষায় সমগ্রটাই পাঠ করা এই রূপ—যে ধর্ম্ম-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাহার হস্ত হইতে লোকমণ্ডলীকে উদ্ধার করিতে হইবে। লেখাগুলির মধ্যে এমন কোন শক্তি নাই যাহা মানুষের উপকারে আসিতে পারে—তোতাপাখীর মত পড়িয়া গেলে আত্মার কোন উপকার নাই। কেবল শুনিলেই বা কি উপকার? "অমুক স্থানে ভাগবত পাঠ হচ্ছে, শুনে আসি" বলে' তাস খেলা ফেলিয়া উঠিয়া গিয়া খানিকক্ষণ তাম্বূল চর্ব্বণ ও ধূম্রপানের মধ্যে ভাগবত শ্রবণরূপ শাস্ত্র চর্চ্চারও একটা প্রণালী আছে। দেশের লোক তাকেও ধর্ম্ম-শিক্ষাই বলে। কিন্তু ইহাতে হইবে না। কোন্ শাস্ত্রে কি আছে, কোন্‌টা কাহাদের জন্য কি ভাবে লিখিত, তাহা নির্ণয় না করিয়া শাস্ত্রে হাত দেওয়া অতীব গর্হিত কর্ম্ম। মিশ্রিত শ্রোতৃ-বর্গের নিকট রাসলীলা যে ভাবে পঠিত ও ব্যাখ্যাত হয় এবং তথাকথিত শিক্ষিতেরাও মেয়েদের মধ্যে বসিয়া তাহা অনুমোদন করেন, তাহাতে শিক্ষাকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া আর কি করা যায়। ইঁহারা কি মোহন-মন্ত্রে মুগ্ধ তা জানি

না। অধিকার-ভেদের কথাটা কেবল কথাতে নিঃশেষিত হইয়া যায়। কথকতা

অধিকারী-ভেদ

এ দেশের ধর্ম্ম-শিক্ষার একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান—ইহাদ্বারা ইষ্টানিষ্ট দুই ফলই উৎপন্ন হইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজও ইহা ধীরে ধীরে গ্রহণ করিতেছেন। এই জাতীয় ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্ম-প্রচার প্রণালী অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে 'যাত্রা' ইত্যাদিও গ্রহণ করা যায় কিনা তাহাও ভাবিবার বিষয়। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া ইহাদিগকে সুমার্জ্জিত করিয়া গ্রহণ করিতে না পারিলে গ্রহণ না করাই ভাল। শুনিয়া আনন্দ হইল, প্রাচীন পন্থার একজন কথক রুক্মিণীর বিবাহ বর্ণনা করিতে যাইয়া প্রাচীনকালে বাল্য-বিবাহ ছিল না, যৌবন বিবাহ ছিল, নারীদিগের স্বাধীনভাবে স্বামী নির্ব্বাচনের অধিকার ছিল ইত্যাদি বিষয় লইয়া বহুক্ষণ ক্ষেপণ করিলেন। এ সব বিষয়ের কথকতায় হয়-তো ধর্ম্ম প্রচারকদের রুচি হইবে না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কথকেরা ইঁহাদের পশ্চাতে পড়িয়া যান, তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। একটী আখ্যায়িকার সব অঙ্গ সব সময়ের উপযোগী নহে। দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া অঙ্গ বিশেষে জোর দিতে হইবে বা অঙ্গ বিশেষ ছাড়িয়া দিতে হইবে। প্রাচীনকালে কোন অঙ্গ হয় তো বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, কোন অঙ্গের উল্লেখ মাত্র আছে। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-যাত্রার পথে মার যে সমস্ত নারীদিগের দ্বারা তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল তাহাদের বেশভূষার বর্ণনায় আমরা থামিয়া পড়িব না। আবার, প্রহ্লাদ-চরিত্রের ব্যাখ্যায় প্রহ্লাদ যে পিতা, শিক্ষাগুরু ও কৌলিক শিক্ষার বিরুদ্ধে "শাস্তা বিষ্ণুরশেষস্য জগতো যো হৃদি স্থিতঃ" বলিয়া অন্তরস্থ বিবেকের শিক্ষাকেই উচ্চ করিয়া ধরিলেন, এবং এই চৈত্ত্য-গুরুকে মানিয়া আর সব পরিত্যাগ করিয়াও সকলের মাননীয় রহিলেন—এই কথাটার উপরেই আমাদিগকে জোর দিতে হইবে। নতুবা "আহা, পাঁচ বছরের শিশুর কি হরিভক্তি" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া আসর জম্‌কাইলে হইবে না। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" এর অর্থ—সাকারে নিরাকারে, গাছে পাথরে যে যে রকমে ভজনা করে তাতেই তাকে পায়, তাহা নহে; কিন্তু সকামে হউক, নিষ্কামে হউক "আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী" যে ভাবেই হউক, সকলে তার ভজনা করিবার অধিকারী। সত্য বস্তুটাকেই ধরিতে হইবে, তার নকল লইয়া আরম্ভ করিতে হইবে না। ধ্রুব সকামে আরম্ভ করিয়া "স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে" বলিয়া নিষ্কামে শেষ করিলেন। ইহাই

বর্ণনীয় বিষয়। তিনি কোন্ প্রণালীতে তপশ্চরণ করিলেন, সেই পৌরাণিক আখ্যান বর্ত্তমান যুগের উপযোগী নহে। যাহা হউক, দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় শিক্ষার ব্যবস্থা। সর্ব্বোপরি শিক্ষকের উপযুক্ততা ধর্ম্ম-শিক্ষার তথা ধর্ম্ম-প্রচারের আদি-অন্ত-মধ্য কথা। নতুবা ধর্ম্ম কেন লোকে গ্রহণ করিল না বলিয়া চক্ষের জলে মেদিনী প্লাবিত করিয়া কোন লাভ নাই।

ধর্ম্ম তিন দিকে আত্ম প্রকাশ করে। প্রথম আদর্শে, দ্বিতীয় ব্যক্তিগত জীবনে, তৃতীয় মানব মণ্ডলীতে অর্থাৎ মানুষের সমষ্টিগত জীবনে। যুগধর্ম্ম যতক্ষণ ছোটবড় সকলকে আপনার মণ্ডলীভুক্ত করিতে না পারেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার সার্থকতা হয় না। এই সার্থকতার জন্য অধিকারী-ভেদে শিক্ষা-প্রণালীর বহুবিধ প্রকার-ভেদ অনিবার্য্য। যাঁহারা ভাবেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল মাত্র শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে, তাঁহারা আদর্শের খর্ব্বতা সাধন করেন। যে আদর্শ এই মুহূর্ত্তেই সকলকে আপনার ক্রোড়ে টানিয়া লইতে না পারে, তাহা সার্ব্বভৌমিক আদর্শ নহে। কিন্তু সকলকে আকর্ষণ করিবার প্রণালী এক হইতে পারে না। "সত্যং ব্রহ্ম"—সে বিষয়ে সন্দেহ কি? তবে সত্যের প্রকাশ একই রূপে হইবে না। উন্নত অনুন্নত, সবল ও দুর্ব্বল অধিকারীভেদে সত্য গ্রহণের প্রণালীও বিভিন্ন হইবে। 'পৃথিবী গোল' এ কথা শিশুকে বুঝাইতে হইলে গণিত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির প্রণালী লইয়া উপস্থিত হইলে কোন ফল হইবে না। অধিকারীভেদ মানিতেই হইবে এবং আপামর সাধারণ সকলের মধ্যে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থানুসারে যুগধর্ম্মকে আত্মপ্রকাশ করিবার অধিকার দিতে হইবে। তাহাকে কোন একটা বিশেষ আকারের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহার বিশ্বজনীনত্ব বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সকলেই যে উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য 'সত্যং জ্ঞানম্' মন্ত্রের ধারণা করিতে পারিবে, তাহা নহে। যুগধর্ম্মকে বর্ত্তমান সময়ে এমন অনেক মণ্ডলীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে যেখানে উদ্বোধন ছাড়া আর কিছু দেওয়া চলিবে না। 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার আগেও 'অথাতঃ' রহিয়াছে। যাহারা উহা পায় নাই, তাহাদিগকে উহা দিয়াই ব্রাহ্মোপাসনার দিকে টানিতে হইবে। আবার যাঁহারা ব্রহ্মোপাসনা পাইয়াছেন তাঁহাদেরও মধ্যে বাল বৃদ্ধ যুবা আছেন। তাঁহারা সকলে যে একই ভাবে সমান পরিমাণে ব্রহ্মসম্ভোগে সমর্থ, তাহাও নহে। সকলের জন্য এক ব্যবস্থা সমীচীন হইবে না। দেশে কত পূজা পার্ব্বণ রহিয়াছে। এ সকলের মধ্যে

পূজা অপেক্ষা পার্ব্বণের অংশই পোণের আনা। পার্ব্বণ পূজার অঙ্গ বলিয়া তাহার মধ্যে একটা নিষ্ঠা ও সংযমের ভাব আছে, অন্যথা তাহা থাকিত না।

ভাবের বিকাশে বাহিরের প্রভাব

অবিকশিত আত্মা এই পার্ব্বণকে ধরিয়াই পূজার দিকে অগ্রসর হয়। প্রচলিত পূজার স্থানে উন্নততর পূজার প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে। কিন্তু পূজার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির স্থান অধিকার করিবার মত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে পূজা তো টিঁকিবেই না, তাহার স্থানে নানা প্রকার অনর্থ উপস্থিত হইবে। কেন না, উৎসবপ্রিয়তা মানবের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি—শরীর ও মন উভয়ের স্বাস্থ্যের জন্যই ইহার প্রয়োজন। পৌত্তলিকতা সর্ব্বথা পরিহার্য্য। কিন্তু Idolatryর স্থানে Monolatry কেন গ্রহণ করা হইবে না? এ বিষয়ে খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাস যে শিক্ষা দিয়াছে, যুগধর্ম্ম তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, খৃষ্টধর্ম্ম রোমসাম্রাজ্যের সকল উৎসবকে আপনার করিয়া লইয়া আপনার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। বাল্যকালে পূজা কি বুঝিতাম না, কিন্তু পূজার জন্য পুষ্প-চয়নে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতাম! কেন না, জীবনের প্রারম্ভ শক্তিবিকাশের ক্ষেত্র পাইলেই আনন্দ লাভ করে। পুষ্পচয়নে যে আনন্দ পাইতাম তাহা, পূজার উপলক্ষে বলিয়া, পূজার প্রতি একটা শ্রদ্ধা জন্মাইয়া দিয়াছিল। সেই নিষ্ঠা ব্রহ্মপূজার বিশেষ সহায়তা করিতেছে—কৃতজ্ঞহৃদয়ে আজ তাহা স্বীকার করিতেছি। "লেখা পড়া যেই করে, গাড়ী ঘোড়া সেই চড়ে" ইহা বলিয়াই শিশুদিগকে লেখা পড়ার দিকে আকর্ষণ করিতে হইবে। তারপর একবার আকৃষ্ট হইলেই লেখা পড়ার মধু তাহাকে জড়াইয়া ধরিবে, সে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। ব্রাহ্মসমাজেরও উৎসব আছে। এ উৎসব আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার প্রেমোৎসব। সে স্থানে যিনি পৌঁছিয়াছেন, বাহিরের কোলাহলে তাঁহার যোগ ভাঙ্গিবে না, তাঁহার আনন্দের ব্যাঘাত উৎপন্ন করিবে না। ভিতর বাহির তাঁহার এক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যিনি এমন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না, উৎসবের আনন্দ কি তাহার জন্য নাই? নিশ্চয়ই আছে। এই আধ্যাত্মিক পূজাকে অবলম্বন করিয়া এমন অনেক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান আসিবে, অনুন্নত ও অবিকশিত আত্মা যেখানে আপনার কর্ম্মক্ষেত্র পাইয়া উৎসবের সঙ্গে যোগদান করিবে এবং ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবে। ব্রহ্ম আনন্দময়। ব্রহ্মের উৎসবও আনন্দময় হইবে। 'সত্যং

ব্রহ্মে'র বেলায় যাহা বলা হইয়াছে, 'আনন্দং ব্রহ্মে'র বেলায়ও তাহা খাটে। যাহার যেমন আয়োজন, তিনি তেমনই আনন্দময়কে সম্ভোগ করিবেন। সকল আনন্দই সেই আনন্দময়ের অভিব্যক্তি। তিনি রসস্বরূপ। তাই তাঁর প্রকাশ মধুময়। সকলই আনন্দের খেলা। "আনন্দং ব্রহ্ম"। ধীরে ধীরে এই আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য সকলে যাহাতে অধিকারী হইতে পারেন, সেজন্য শিক্ষার ব্যবস্থা চাই।

পরিপূরক (জ)

১১ই মাঘের উৎসব।

অনেকের বিশ্বাস ১১ই মাঘ যে ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্ব প্রধান উৎসব হয়, তাহা একটি আকস্মিক ঘটনা (accident), বাস্তবিক উৎসব ৬ই ভাদ্রই হওয়া উচিত। ঐ দিনই সর্ব্ব প্রথম এই পৌত্তলিকতা-প্রপীড়িত তেত্রিশ কোটী দেবতার দেশে একমাত্র নিরাকার সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনায় বিজয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছিল, সেই দিনই সর্ব্ব প্রথম গীত হইয়াছিল—

শুভদিন ক্ষণ শুভ এই মাসে,
পূজে ভারত আজি অনাদি মহেশে।

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ও গৃহীর ধর্ম্ম

সুতরাং সেই শুভদিনকে স্মরণ করিয়াই সর্ব্ব প্রধান উৎসবের প্রতিষ্ঠা করা যুক্তিসিদ্ধ ছিল। অন্য কোনও দিনের দাবী ইহা অপেক্ষা প্রবলতর হইতে পারে না। আমার মনে হয়, এই ধারণার মূলে কিঞ্চিৎ ভ্রান্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। ব্রহ্মোপাসনা এ দেশে নূতন নহে। ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে এ দেশের ধর্ম্ম-ভাবের অভিব্যক্তি অতি প্রাচীনকালেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানের আকার ধারণ করিয়াছিল। সুতরাং এক অর্থে ব্রাহ্মধর্ম্ম এ দেশের সনাতন ধর্ম্ম। আর যাহা কিছু ধর্ম্ম এ দেশে, সে সমস্তই এই সনাতন ধর্ম্মেরই বিকার মাত্র। যদিও উপধর্ম্মের উপদ্রবে এই সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব সময়ে সময়ে ম্লান হইয়াছে বটে, কিন্তু কখনও ব্রহ্মোপাসনা এ দেশ হইতে তিরোহিত হয় নাই। সুতরাং ব্রাহ্মোপাসনার প্রবর্ত্তনায় বিশেষ কিছু নূতনত্ব নাই। বড় জোর, অন্তরাল হইতে ইহাকে লোক চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত

করা হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্ম বিধানের বিশেষত্ব অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত। এ দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম চিরদিনই সন্ন্যাসকে অবলম্বন করিয়া প্রচলিত ছিল। সমাজের সঙ্গে তাহার কোনই প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল না। গৃহ পরিবারে তাহা কখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। গৃহীর আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হইবার কখনও অধিকার ছিল না। গৃহস্থাশ্রমে যে সমস্ত নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যবস্থা আছে, তাহার সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানানুমোদিত অনুষ্ঠানাদির অহি-নকুল সম্বন্ধ। তাহারা পরস্পর এমন বিরোধী, যে, কখনও তাহারা এক সঙ্গে বাস করিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞানী গৃহীমাত্রকেই বর্ত্তমান কালের অনানুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের অসঙ্গত (inconsistent) জীবন যাপন করিতে হইত। সন্ন্যাসী না হইলে ব্রাহ্ম ভাব জীবনে পরিণত করিবার উপায় ছিল না। জনক যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রাচীনকালের গৃহী ব্রহ্মজ্ঞানিগণ আপনাদের ধর্ম্মমণ্ডলীর মধ্যে বসিয়া "প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা" অথবা "পশুরেব সঃ দেবানাং" বলিয়া যজ্ঞ ও যাজ্ঞিকগণকে যতই কেন উপহাস বিদ্রূপ করুন না, যখন গৃহাস্থাশ্রমের অবশ্য নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইত, তখন যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া পারিতেন না! তখন যেমন অনানুষ্ঠানিক ব্রাহ্মগণ মুখে যতই পৌত্তলিকতাকে অনাদর করুন না, বিবাহ শ্রাদ্ধাদিতে পৌত্তলিকতাকে পরিহার করিতে সমর্থ হন না, নাক মুখ বুজিয়া তাহাতে যোগ দিয়া থাকেন। কিন্তু বিশেষ এক জায়গায় এমন আট্‌কাইত যে সামঞ্জস্য একেবারে অসম্ভব। ব্রহ্মজ্ঞানীর জাতিভেদ নাই, ইহা অতি প্রাচীন সিদ্ধান্ত (সংস্কার ও সংরক্ষণ) দ্রষ্টব্য। অথচ গৃহস্থের পক্ষে জাতিভেদ অবশ্য প্রতিপাল্য। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানীর অনুষ্ঠান গৃহীর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইত। তাই, সন্ন্যাসই প্রাচীন ব্রাহ্মধর্ম্মের একমাত্র আশ্রয় স্থল ছিল। জ্ঞানে যাহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল, সংসারে থাকিয়া সেই অনুসারে জীবনকে নিয়মিত করিবার অধিকার ছিল না। হয় সংসার ছাড়িয়া অরণ্যে চলিয়া যাও, না হয় বিবেককে পদ-দলিত করিয়া ধর্ম্মবুদ্ধিকে সংসারের চরণে বিকাইয়া দাও। ইহার ফল সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ভীষণ হইয়াছে। যাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি প্রবল, যাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মাগ্নি এমন উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়াছে, যে তিনি তাহার বেগে আপনার সকল বাসনা কামনাকে পুড়াইয়া ফেলিতে পারেন, তিনি সংসার ছাড়িয়া অরণ্যে চলিলেন। বর্ত্তমান সমাজ তাঁহার উন্নত চরিত্রের প্রভাব হইতে বঞ্চিত হইল; বংশানুক্রমের

গৃহীর ব্রহ্মসাধনই বর্ত্তমান বিশেষত্ব

নিয়মানুসারে তাঁহার উন্নত চরিত্রের ছাপ যে সমাজে থাকিয়া যাইবে, যাহার দ্বারা ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা লাভবান্ হইবে, তাহার পথও বন্ধ হইল। আর যাহারা সমাজে রহিল, তাহারা তো নিজেদেরই কাছে পতিত—তাহারা জানে যে তাহারা আদর্শ হইতে বহুদূরে। প্রকৃত ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার শক্তি নাই বলিয়াই তাহারা সংসারে আছে। সংসারের সঙ্গে ধর্ম্মের এই বিরোধ সামাজিক জীবনে নানা মারাত্মক কুফলের জন্ম দিয়াছে! সাংসারিক লোককে কোনও উচ্চ আদর্শের কথা বলিবার যো নাই। উত্তর—সংসারে থাকিয়া ওসব হইতে পারে না; সত্য পথে চলা, ন্যায় পথে চলা—ওসব সাংসারিক লোকের জন্য নহে। এরূপ হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। সমাজে যাহারা ধর্ম্মে, চরিত্রে, জ্ঞানে উন্নত ও বলবান্ তাহারা যদি ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সমাজ ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হন, তবে যাহারা রহিল, তাহারা কিসের জোরে উন্নত হইবে? Spanish Inquisition রাজার শক্তিতে যে সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, ভারতের সন্ন্যাসও আদর্শের ভ্রান্তিতে ধীরে ধীরে দেশের সেই অনিষ্ট করিয়াছে—এমন নিঃশব্দে ধীরপদে করিয়াছে যে লোকে তাহা বুঝিতেই পারে নাই। মানবজাতি-তত্ত্বজ্ঞ মহামতী Galton বলিয়াছেন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অত্যাচারে "The Spanish nation was drained of free thinkers at the rate of thousand persons annually for the three centuries between 1471 and 1781. It is impossible that any nation could stand policy like this without paying a penalty in the deterioration of its breed as has notably been the result in the formation of the superstitious unintelligent Spanish race of the present day". অনেক সময়ে আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে—যে স্পেন একদিন ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি ছিল, যে স্পেন একদিন ইংলণ্ড বিজয়ের স্পর্দ্ধা করিয়াছিল, সে স্পেন আজ নাম-মাত্রে পর্য্যবসিত হইল কেন? পণ্ডিতপ্রবর Galton তাহার উত্তর দিয়াছেন। যাহার হৃদয়ে স্বাধীন চিন্তা আছে, যিনি আত্মার স্বাধীনতার জন্য অবলীলাক্রমে জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারেন, যিনি আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সকল প্রকার নির্য্যাতন আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত অর্থাৎ যাঁহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব-ধনে ধনী, এরূপ লোক সব সমাজেই কম। এরূপ সহস্র লোক সমাজ হইতে প্রতি বৎসর অপসারিত হইলে সমাজ যে হেয় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে, তাহাতে

সন্ন্যাসের অনিষ্ট ফল

কি আর কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে? স্পেনের দুর্দ্দশার ইহাই কারণ। স্পেনে তিন শত বৎসর যে প্রক্রিয়া চলিয়াছিল, যাহার ফলে স্পেনের এই অধঃপতন, ভারতের সন্ন্যাস যুগ যুগান্ত ধরিয়া তাহাই সম্পাদন করিয়াছে। বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিধান এই অনিষ্টকর সন্ন্যাস হইতে ভারতসমাজকে রক্ষা করিয়াছে।

ইহাই ভারতের চির কল্যাণের সূচনা

১১ই মাঘ এই সমাজ প্রতিষ্ঠার দিন, এক মহা মঙ্গল-কর্ম্মের সূচনার দিন। **এইখানেই মাঘোৎসবের গৌরব**। ঐ দিন, বিশ্বমানবের এক মহা কল্যাণের সূত্রপাত হইয়াছিল। কেন না, বিশ্ব-মানবের পূর্ণতার জন্য যে ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞান একান্ত প্রয়োজন তাহা আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এই যে বর্ত্তমান সভ্যতা-রাক্ষসী মুখব্যাদান করিয়া উধাও হইয়া চলিয়াছে, যাহা সম্মুখে পাইতেছে তাহাই গ্রাস করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই তাহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইতেছে না, এই দুষ্ট-ক্ষুধার একমাত্র ভেষজ ভারতেই বর্ত্তমান। এই ঔষধ সময়ে প্রয়োগ করিতে না পারিলে সমগ্র মানবজাতি এক মহাবিনাশের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। কিন্তু ব্রহ্মোপাসনারূপ মহৌষধি প্রয়োগ করিতে হইলে প্রয়োগকর্ত্তাকে উপযুক্ততা লাভ করিতে হইবে। কঠিন রোগে কঠিন ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হয়, কিন্তু তাহা যে সে বৈদ্যের দ্বারা সম্পাদিত হয় না। বৈদ্যের যোগ্যতা সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করিতে হয়। ভারত যদি আজ এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে যায়, জগৎ কেবল হাসিবে। জগৎ জিজ্ঞাসা করিবে, এ ঔষধে তোমার কি উপকার হইয়াছে? এ প্রশ্নের উত্তর নাই। বিশেষতঃ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লইয়া জগৎ কি করিবে? তাই ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞানকে সন্ন্যাসের আবরণ হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে গৃহ পরিবারে প্রতিষ্ঠিত করার নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। ইহাকে গৃহপরিবার ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জাতীয় জীবনকে দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। নতুবা ইহা জগতের গ্রহণ-যোগ্য হইবে না। অথচ জগৎকে ইহা দিতেই হইবে, না দিলে বিশ্বমানবের কল্যাণ নাই। যে দিনে এই কল্যাণের সূচনা হইয়াছিল, আমরা কি তাহার যথেষ্ট আদর করিতে শিখিয়াছি? এই **১১ই মাঘেই** ইহা বজ্র-নিনাদে ঘোষিত হইয়াছিল, যে, ব্রহ্মজ্ঞান আর সন্ন্যাসীর সম্পত্তি নহে। এ উৎসব কেবল একা ভারতের জন্যও নয়, ইহা সমগ্র জগতের, সমগ্র মানব-জাতির উৎসব। ইহার মধ্যে মানবজাতির, বিশ্ব মানবের কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। ইহাই মাঘোৎসবের অর্থ, এই জন্যই মাঘোৎসবের এত আদর করি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ধর্ম্ম-প্রচার

শ্রবণয়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ।

আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধাশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥ কঠ, ১।২।৭

প্রচার বলিলে অনেকগুলি বিষয় মনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, এক এক করিয়া সবগুলিই কিছু কিছু বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব।

১। প্রথম প্রশ্ন এই মনের মধ্যে আসে, কেন প্রচার করিব? ইহার এক উত্তর ভাবের দিক্ হইতে। যাঁহার হৃদয়ে মানব প্রীতি আছে তিনি সত্য লাভ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। প্রেমের প্রকৃতিই এই যে ভাল জিনিষ নিজে ভোগ করিয়া তৃপ্তি নাই, প্রেমপাত্রদিগকে বিলাইতে হয়। আমার মাতৃদেবী বহু সন্তানের মা ছিলেন। সকল সন্তান সর্ব্বদা গৃহে থাকিবে, ইহার সম্ভাবনা ছিল না। বাড়ীতে কোন সুখাদ্য প্রস্তুত হইল 'অমুকে' খাইল না বলিয়া কাঁদিতে বসিতেন। রামমোহনের এই মাতৃভাব ছিল। একেশ্বরবাদিগণের ভজনালয়ে প্রবেশ করিয়া অজস্র অশ্রুপাত করিতেন, যে তাঁহার দেশবাসী কোটী কোটী নরনারী সত্য ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক উপাসনার আস্বাদ হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। তাই প্রচারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অর্থকষ্টে বিদেশে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। কিন্তু যাঁহার ভাব জাগে নাই তাহাকে প্রাপ্তবস্তু রক্ষণের জন্যই প্রচার ব্রতে ব্রতী হইতে হইবে। আমি যদি আমার আবেষ্টনকে আমার পথে না আনিতে পারি তবে সত্য আমার কাছে বহুদিন স্থায়ী হইবে না। সকলকে ব্রাহ্মণত্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া ব্রাহ্মণ যখন ব্রাহ্মণত্ব নিজস্ব করিয়া রাখিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল সেই দিন তাহার পতনের বীজ নিহিত হয়। আজ তাই, ব্রাহ্মণেও শূদ্রত্ব দেখা যাইতেছে। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের ভেদ নাই। পার্শ্ববর্ত্তীদিগের শূদ্রত্বই তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। নিজের ঘরখানি পরিষ্কার রাখিলেই কেহ রোগের আক্রমন হইতে নিষ্কৃতি পায় না। প্রতিবাসীদিগের গৃহও পরিষ্কার করিয়া তুলিতে হইবে। তারপর, প্রচারে প্রত্যেকের কর্ত্তব্যের অনুরোধ রহিয়াছে। প্রত্যেক ব্রাহ্মই প্রচারক,

ইহার মধ্যে এক গূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে। ঋষিগণের কথা সকলেই জানেন। পূর্ব্বপুরুষগণের সঞ্চিত যে জ্ঞান আমরা অর্জ্জন করি তাহা অন্যের নিকটে লইয়া যাইতে আমরা বাধ্য। এইরূপেই ঋণ শোধ হইতে পারে। ঋণ-শোধ করা মানুষের এক গুরুতর কর্ত্তব্য। তাহা হইতে অব্যাহতি নাই। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া—

বাস্যৈকং তক্ষতো বাহুং চন্দনেনৈকমুক্ষতম্।
নাকল্যাণং ন কল্যাণং তরোরপি হি চিন্তয়েৎ॥

বলিয়া সমাজের সুখদুঃখে উদাসীন হইয়া অরণ্যে চলিয়া যাইবার জন্য প্রাচীন বিধানে যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা একটা গুরুতর অপরাধ। ব্রাহ্মধর্ম্মবিধান এইখানে এক মৌলিক পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছেন। সেই জন্যই মনে করি, ব্রহ্মোপাসনা প্রচলন অপেক্ষা ব্রহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বেশী। ১১ই মাঘের উৎসবের বিশেষত্বের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এ দেশে ব্রহ্মোপাসনা ছিল, ব্রাহ্মসমাজ ছিল না। জাতীয় জীবনের পরিত্রাণের বীজ নিহিত হইয়াছে ব্রাহ্মসমাজে। যতক্ষণ ধমনীতে একবিন্দু রক্ত প্রবাহিত রহিয়াছে ততক্ষণ সমাজের সেবা ছাড়িয়া অরণ্যে চলিয়া যাইবার অধিকার নাই, ততক্ষণ ঋণ শোধ হইবে না। স্বাধীনতা-বাদীর দাবীর কোন মূল্য নাই। সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিলাম, এক দিন এক বক্তা গুরুগম্ভীরস্বরে আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিলেন "আমি—স্বাধীনতার ভূমিতে দাঁড়াইয়া বলিতেছি"—কথা শেষ না হইতেই এক মুচী উঠিয়া বলিল, "আজ্ঞে, কর্ত্তা, যে বুটের উপর দাঁড়াইয়া আপনি বক্তৃতা করিতেছেন, উহার দাম এখনও আমার পাওনা আছে, স্বাধীনতার ভূমি আপনার কোথায়"? আমাদের সমাজ ছাড়িয়া স্বাধীন হইয়া চলিয়া যাইবার দাবীর মধ্যেও এই ভ্রান্তি রহিয়াছে। আমাদের কেবল স্বাধীনতা নয়, সমগ্র মনুষ্যত্বটার জন্যই আমরা ঋণী কার কাছে? একটী ভালুক পালিতা মেয়েকে দেখিয়াছিলাম। সে মনুষ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও মানব সমাজে প্রতিপালিত না হওয়ায় পশুই হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং মানবসমাজের মঙ্গলামঙ্গল নিরপেক্ষ যে স্বাধীনতা আমরা দাবী করিতে পারি সেটুকু আমাদের পশুত্ব। সুতরাং মানবসমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান "ব্রহ্মজ্ঞান" লইয়া একাকী সম্ভোগ করিবার জন্য দূরে চলিয়া যাইবার মত অকৃতজ্ঞতা আর কিছু হইতে পারিবে না। যাহা পাইয়াছি তাহা আর সকলকে দিয়া ঋণ

পরিশোধের চেষ্টা দেখিতে হইবে। এইখানে প্রত্যেক মানুষের প্রচারের দায়িত্ব। যাহার যতটুকু আছে তাহা দিয়াই পার্শ্ববর্ত্তিগণের সেবা করিতে হইবে। *

২। দ্বিতীয় কথা, **প্রচারক** কে? মানুষকে মনুষ্যত্বের দিকে তুলিয়া ধরিবার পথে পিতামাতা সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান প্রচারক। আর প্রচারক তিনি যিনি সত্য জীবনে আয়ত্ত করিয়াছেন। জীবনই জীবন গড়ে—কথাটা সত্য কিন্তু অৰ্দ্ধ সত্য। কথাটা যদি নিছক্ (Unqualified) সত্য হইত, তবে যাঁহারা মহাপুরুষ বা সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া খ্যাত তাঁহাদের সংস্পর্শে যাঁহারা আসিল তাঁহারাই মানুষ হইল না কেন? অথচ রাস্তায় চলিতে চলিতে একটা আকস্মিক কথাতে অথবা পশুপক্ষীর আচরণ দেখিয়া কত হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। ভিজা কাঠে আগুন ধরে না, কিন্তু আগুন যে আগুন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং প্রচারে যে ফল প্রত্যাশা করি তাহা হইতেছে না দেখিয়া প্রচারকের যোগ্যতায় সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই। হয় বা প্রত্যাশাটার মধ্যেই কিঞ্চিৎ ভ্রান্তি রহিয়াছে। আবার সত্যকে জীবনে আয়ত্ত করা কথাটাও নানা অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার মধ্যে পরিমাণগত বিভিন্নতা মানুষে মানুষে বিদ্যমান থাকিবেই। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। উপনিষদের একটী তত্ত্ব আমার সত্য বলিয়া মনে হইল। আমি কি এ তত্ত্ব প্রচারে অনধিকারী? অথবা তত্ত্বটী এক জনের জীবনে **ফলবান** দেখিয়া যদি ঐ দৃষ্টান্তে উহা প্রচার করি, তবে উহা জীবনে আয়ত্ত না অনায়ত্ত মনে করিব? মানুষের ব্যক্তিগত জীবন যে নিতান্ত ব্যক্তিগত নয়, সে কথা ভুলিলে একেবারেই চলিবে না। পরন্তু কেবল জীবনই জীবন গড়ে, ইহাকে একটা উপাস্য (fetish) করিয়া তুলিলে সংবাদ-পত্র ও পুস্তকের দ্বারা প্রচার একেবারে উঠাইয়া দিতে হয়। অথচ প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমান যুগে, যদি সত্য মানুষের কাছে পৌছাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়, তবে ইহারাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। আসল কথা, প্রচারকের যোগ্যতা কেবল তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নয়, কিন্তু নিজেরই হউক কি অন্যেরই হউক, সেই অভিজ্ঞতার পশ্চাতে যে সার্ব্বভৌমিক ভিত্তি

* এ কথা **সংস্কার ও সংরক্ষণ** গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

আছে তাহার সঙ্গে মানুষকে পরিচিত করিয়া দেওয়া। কেন না, এই সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বের সাহায্যেই কেবল সর্ব্বসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতে পারে। পরে এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিব।

৩। তৃতীয় কথা, প্রচারের **ক্ষেত্র**। ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় প্রচারশীল ধর্ম্মের প্রচার ক্ষেত্র, ভিতর ও বাহির দুই-ই। সাধারণ অর্থে যাহাকে প্রচার বলে, সে প্রচার যে ভিতরে প্রয়োজন নাই, তাহা নহে। কিন্তু ইহার প্রধান ভার পড়িবে পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানাদির উপর যাহারা কোন এক আদর্শের দিকে নীরবে মানুষকে গড়িয়া তুলিবে। মানুষ পর-জীবনে ধার্ম্মিক হইবে কি না হইবে, তাহা নির্ভর করিবে বাল্যে অন্তরে ধর্ম্ম-ভাবের বীজ নিহিত হইল কি না তাহার উপর। মানুষ প্রথম জীবনে যে গতি লাভ করে সেই গতিকে অনুসরণ করিয়াই তাহার ভবিষ্যৎ জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আপাত দৃষ্টিতে ভাল মন্দ লইয়া এই জগৎগ্রন্থ সকলেরই সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে। ভালটা সংগ্রহ করিবার মত গতি যদি মনে দিয়া দেওয়া যায় তবে আর কিছুরই জন্য ভাবিতে হইবে না। দৃশ্যের অন্তরালে যে অদৃশ্য জগৎ রহিয়াছে, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানাদি যদি সেই ভাবটা জাগাইয়া দিতে পারে তবে ভবিষ্যতের জন্য ভাবিতে হইবে না। স্বাধীনতাবাদী বলিবেন, যে এইরূপে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে পঙ্গু করিয়া দিবার অধিকার কাহার বা কিছুর আছে কি? ইহার উত্তর কিঞ্চিৎ ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। আরও একটা কথা বলি। মানুষ হইতে হইলেই যখন আমাদিগকে এই সামাজিক আবেষ্টনের ভিতর দিয়াই হইতে হয়, তখন উপায়ান্তর পশুত্বেই পড়িয়া থাকা। মনো-বিশ্লেষণবাদীরা (Psycho-analysts) বলেন, আমরা যাহা স্বাধীন ইচ্ছা প্রসূত কার্য্য বলি তাহার দশ ভাগের নয় সংখ্যা নিয়মিত হয় মনের উপরে সমাজ জীব-নের সেই সকল প্রভাবের দ্বারা যারা এখন আমার ব্যক্তিগতমনের মগ্ন চৈতন্যে (Unconscious এ) যাইয়া অবস্থিত রহিয়াছে, সুতরাং আমি যদি সজ্ঞানে নিজেকে তাহাদের দ্বারা পরিচালিত করি তাহা হইলে স্বাধীনতা বাধিত না হইয়া অধীনতাই খর্ব্ব হয় না কি? যাহা হউক, যাঁহারা ব্রহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই সাক্ষ্য দিবেন, যে ধর্ম্মভাব বস্তুটি তাঁহারা পৌত্তলিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়াই পাইয়াছিলেন। তারপর, যখন সত্যধর্ম্মের খবর পাইলেন, তখন ঐ ধর্ম্মভাবই তাঁহাদিগকে উহা গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করিল। যার ভিতরে ধর্ম্মভাবই গজায় নাই, সে সত্যধর্ম্মের খবর পাইলেই যে তাহা গ্রহণ

করিবে এরূপ আশা করা যায় না। ভাব ও ইচ্ছা জ্ঞানের সহায় না হইলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। এখন, কিরূপে বাহিরে সত্যের প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে সেই আলোচনায় মনোনিবেশ করা যাক্। সুতরাং কি প্রচার করিতে হইবে তাহাই এখন বিচার্য্য।

৪।৫। কাজেই, চতুর্থ কথা প্রচারের **বিষয়** এবং পঞ্চম কথা প্রচার-পথের **বাধা**। অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির কথাতেই বুঝিয়াছি এরূপ সকল যে আমাদের মধ্যে প্রচারের বিষয় সম্বন্ধে অস্পষ্ট ও ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে যাহা প্রচারের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। আমাদের প্রচারের বিষয় যে ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং তাহা প্রাচীন ঋষিদিগের ব্রহ্মবিদ্যা-প্রতিপাদিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মই, এ কথা ভুলিলে একেবারেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইতে পারে না। এ কথা ভুলিলে, আমরা যে উপনিষদের দোহাই দেই এবং ঋষিদের উত্তরাধিকারী বলিয়া গর্ব্ব করি—প্রচারক মাত্রই করেন—তাহা মিথ্যা কথায় পরিণত হয়। ব্রহ্মবিদ্যা ছাড়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইতে পারে না। এই কথার একটী প্রতিবাদ শুনিয়াছি এই—কেবল শিক্ষিত লোকেরাই যে ব্রাহ্মধর্ম্মের কথায় সায় দেন তা নয়, নিরক্ষর অজ্ঞ চাষারও এ কথায় মন আর্দ্র হয়। ইহার উত্তরে (৪ক) বলা যায়, যে সুগঠিত ব্রহ্মবিদ্যার আশ্রয় না লইলেও প্রত্যেক ব্রাহ্মই অল্পাধিক ব্রহ্মবিদ্—যেমন, Every man is a philosopher without knowiug it. কিন্তু এই অনিয়ন্ত্রিত (unsystematised) ব্রহ্মবিদ্যায় সব জায়গায় কাজ হইবে না, এবং এমন সময় আসিতেছে যখন এই ভ্রান্ত পথে চলিলে প্রচার আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যাইবে। (৪খ) দ্বিতীয় উত্তর এই, যে ধর্ম্মকথা মাত্রই ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই ধর্ম্মভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহাতেই সে পশু নয়, মানুষ। মানুষ, যতই পতিত হউক না, এই ধর্ম্মভাবকে হারায় না। হারাইলে সে পশু হইয়া যায়। অতিবড় যে স্বার্থপর সেও নিস্বার্থতার দৃষ্টান্ত দেখিলে, নিস্বার্থতার কথা শুনিলে গলিয়া যায়। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ ভাব যেটি সেইটিই তো প্রচারের বিষয়। তাহা না বিবেচনা করিয়া সাধারণ ধর্ম্মভাবে লোকে সায় দিতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইল ভাবায় সত্যধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ ব্যাঘাত হইতেছে বলিয়া মনে করি। কালীদুর্গার নামেও মানুষ 'আহা-হা' করে। কয়জন লোক ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত হইল তাহা দ্বারা নহে কিন্তু কয়জন প্রকৃত ব্রহ্মোপাসক হইল তাহা দ্বারাই প্রচারের সফলতা বিচার করিতে হইবে। যে কয়জন লোক আমার

কথায় 'আহা-হা' করিল তাহারা ব্রহ্মোপাসনাকে মুক্তির উপায় বলিয়া গ্রহণ করিল কি? এমন কি আসল জায়গায় পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা না করিয়া, জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতা মানে না বলিয়া ব্রাহ্ম খাতায় নাম লেখাইয়া ব্রাহ্ম হওয়াও যা, কালিদুর্গার নাম উঠাইয়া দিয়া একটী সঙ্গীতকে সঙ্গীত পুস্তকে তুলিয়া লইয়া উহাকে ব্রহ্মসঙ্গীত মনে করাও তা। অথচ ঘরে বাইরে অনেকে কতজন ব্রাহ্ম খাতায় নাম লেখাইল, তাহা দ্বারাই বিচার শেষ করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে বিশেষত্বটা প্রচার করিতে আসিয়াছেন, সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না থাকাতেই যত বিপত্তি। (৫াক) দৃষ্টি যে আদৌ নাই তার প্রমাণ এই, যে ভক্তি-বিষয়ে পৌরাণিক ভক্তিবাদের গল্পগাছা আমরা অবিচারে গলাধঃকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এই ভক্তিবাদের উপজীব্য হইতেছে অতিমানুষিক ঘটনা-বলি। সে গুলি বাদ দিলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যদি "মদ্‌গুণং শ্রুতিমাগত্য ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোহম্বুধৌ। লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্" হয়, তবে ইহার মধ্যে যে সকল তত্ত্ব আছে তাহার কোনটীই কি ঐ সকল গল্পে পাওয়া যায়? অথচ, এই সকল গল্পের উল্লেখে যে সাধারণের কাছে 'আহা-হা' মিলিবে অনেক, তাহা নিশ্চিত। ব্রাহ্মসমাজেরই একখানি মাসিকে জয়দেবের "শ্রবণ-সুখদ ও পরম পবিত্র চরিত্র" প্রকাশিত হইয়াছিল; কয়মাস চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই, কোন্ ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য এ আজগুবি গল্প ব্রাহ্ম কাগজে প্রকাশিত হইল। তবে আমার না বুঝিবার কারণ ঐ মাসিকের অন্য স্তম্ভে আছে— "মানুষ জ্ঞানে ভগবান্‌কে পায় না।" রহস্য থাক্। শ্রীকৃষ্ণ মানুষের রূপ ধরিয়া আসিয়া জয়দেবের হইয়া তাঁহার গ্রন্থের খানিকটা লিখিয়া গিয়াছিলেন, অথবা তাঁর ঘরের ছাপ্পর বাঁধিবার সহায়তা করিয়াছিলেন, ইহাই তো ঐ গল্পের ভক্তি বিষয়ক চরম সিদ্ধান্ত দেখিতে পাই। অপর পক্ষে, অতি মারাত্মক ভক্তিবিরোধী ভাব ইহার মধ্যে রহিয়াছে। বিবাহ করিতে বলায় "তাঁহার এই আদেশ পালন আমার পক্ষে অসম্ভব" বলিয়া জয়দেব জগন্নাথের যে আদেশ লঙ্ঘন করিলেন—ভক্তের চূড়ান্ত লক্ষণ বটে—মেয়ে মানুষের অনুনয় বিনয়ে কিন্তু সেই কাজ করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর যদি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিত, তবে এই সকল তত্ত্ব ব্রাহ্মসমাজের কাগজে স্থান পাইত না। এ সকল অবিবেচনার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পথে বাধা উৎপন্ন হইতেছে। হিন্দুজাতির অপবাদ আছে, যে সে ইতিহাস লেখে নাই।

ব্রাহ্মগণ কি গল্পকে ইতিহাস বলিয়া চালাইয়া দিয়া এই অপবাদকে পূর্ণতা প্রদান করিবেন? মনে রাখিতে হইবে, এই সকল গল্প কোন এক সময়ে কোন এক বিশেষ পৌরাণিক ধর্ম্মের সমর্থনার্থ পরিকল্পিত হইয়াছিল। এই সকল হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য রস সঞ্চয়ের চেষ্টা বৃথা।

(৫।খ) আর এক বাধা ব্রাহ্মসমাজের খৃষ্ট-প্রীতি। দেশের যে অবতারবাদ আমরা হেলায় পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলাম, এখানে সেটাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জবরদস্তি রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। ফলস্বরূপ, এক জন (তিনি এখন পরলোকে) অতিশ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মের মুখে শুনিয়াছিলাম— যখন তাঁহার এক পুত্র খৃষ্টান হইল তখন সে বলিয়াছিল, যে ব্রাহ্মসমাজ হাতে ধরিয়া তাহাকে খৃষ্টান করিয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্মরা যে খৃষ্টান হয় না, এ তাঁহাদের কপটতা। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। খৃষ্ট বিষয়েও যে ইতিহাসকে জলাঞ্জলি দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখান হইয়াছে। পূর্ব্বে যাহাই হউক, এখন এ বিষয়ের শিথিলতা অমার্জ্জনীয় মনে করি। বাইবেলকে ধর্ম্মোপদেশের জন্য কল্পিত পৌরাণিক গ্রন্থমধ্যে গণ্য করিতে হইবে।

(৫। গ) প্রচারের আর একটা বাধার কথা এইখানেই বলিয়া রাখি। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, যে Rationalism এর কাজ পূর্ণমাত্রায় না হইতে পারায় দেশে সত্যধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ বাধা উৎপন্ন হইতেছে। অনেকের ধারণা Rationalism নাস্তিকতা আনয়ন করে। তাঁহারা ভুলিয়া যান, অকপট নাস্তিক 'ন ঘরকা ন ঘাটকা' জাতীয় বিশ্বাসী অপেক্ষা অধ্যাত্মরাজ্যের অধিকতর নিকটবর্ত্তী। সত্যান্বেষী সরলহৃদয় নাস্তিকের আস্তিক হইবার যতটা সম্ভাবনা রহিয়াছে, অর্দ্ধবিশ্বাসীর জীবনে ধর্ম্মলাভ করিবার ততটা সম্ভাবনা নাই। তার জীবন অর্দ্ধই থাকিয়া যাইবে। সমালোচনা ও প্রতিবাদ দেখিয়া কেহ কেহ একে বারে অস্থির হইয়া উঠেন। Criticism নাকি ভক্তিবিরোধী। কিন্তু অকালে ভক্তির বোধনে যে পৌরাণিক উপধর্ম্মের সত্বর আগমনের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা বুঝিলে এত বিচলিত ও অসহিষ্ণু হইবার কারণ থাকিত না। Protestant movement, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে প্রতিবাদ ও সমালোচনা-ভীতি তাহার অকাল-বার্দ্ধক্যের সূচনা করিতেছে না, সময়ে রোগের প্রতিকার না হইলে জীবনী-শক্তির অপচয় হইবার সম্ভাবনা। বাদ প্রতিবাদ বা বিবাদ দেখিয়া ভয় পাইলে চলিবে কেন? ভিতরে ও বাহিরে ভাঙ্গন-কর্ম্মের প্রয়োজন যে

অনেক রহিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ পণ্ডিত অয়কেন বলেন, Without earnestness of renunciation the new life sinks back to the old and lose its power to stimulate to new endeavour. As human beings are, this negation must always be a sharp one.

আর এক বিষম বাধা, ধর্ম্মজীবনে জ্ঞানের স্থানকে লঘু করিয়া দেখা। প্রচারের বেলায় তো ইহা বৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া আগায় জল ঢালা। প্রচার করিব ব্রহ্মজ্ঞান, অথচ বলিব মানুষ জ্ঞানে ভগবান্‌কে পায় না। কিন্তু যত দূর জোর সম্ভব তত দূর জোর দিয়াই বলিতে হইবে—প্রচারের বিষয় জ্ঞান ছাড়া আর কিছু হইতেই পারে না। তবে যারা বলেন জ্ঞানে পাওয়া যায় না, তাঁরাও যে ও কথাটা নিজেরাই বিশ্বাস করেন না তার হাতে হাতেই একটা প্রমাণ দিতেছি, কিন্তু কথাটা বলিয়া ভিতরে ও বাহিরে বিশেষ অনিষ্ট করা হইয়াছে ও হইতেছে। উল্লিখিত মাসিকে ঐ কথাটা বলিয়াই আবার মানব ইতিবৃত্তে ভগবানের লীলা বিচার করিয়া লেখক বলিয়া উঠিলেন, "এই তত্ত্ব জানিয়া মানুষ বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছে"। জানি না, সে ভগবত্তত্ত্ব জানা কেমন যেখানে "জ্ঞান" নাই। এইরূপ এলোমেলো ভাবে প্রচার করিলে যদি প্রচার না হয়, তবে দোষ কাহার তাই একবার নিবিষ্ট মনে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মও ভক্তিধর্ম্ম, এ বিষয়ে দ্বিমত নাই। কিন্তু ব্রাহ্ম ভক্তিবাদ যে উচ্চ ব্রহ্মজ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইবে? তাহা না হওয়ায় পৌরাণিক আবিলতা আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিবার সূচনা দেখিয়া শঙ্কিত হইতে হইতেছে। যাহা হউক, প্রচারের দ্বারা মানুষকে ভক্তি বা কর্ম্ম দেওয়া যায় না; কেবল জ্ঞানই দেওয়া যায় যদি দিবার প্রণালীটা জানা থাকে। সুতরাং

৮। ষষ্ঠ কথা, **প্রচার-প্রণালীর** প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব। মৌখিক প্রচার হয় ভাষার সাহায্যে। এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন, যে, যে ভাষা বুঝে না তার কাছে সেই ভাষায় প্রচার করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। কিন্তু আমরা কেবল ভাষার সাহায্যেই আদান প্রদান করি না। অন্তরের ভাব, পরস্পরকে বুঝিবার প্রধান যন্ত্র। রামায়ণের কৌশল্যা-বিলাপ একটী উপাদেয় বস্তু। শাস্ত্রী মহাশয় বেদী হইতে এই দৃষ্টান্তটি কতবার দিয়াছেন, যে একটী দশ বৎসরের বালিকা এই বিলাপের কিছুই বুঝিতে পারে না। শত টীকা টিপ্পনি নিতেও সে ইহার অর্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু তাহাকে মা হইতে দাও, এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি সে পুত্র হারায় তবে আর টীকা

টিপ্পুনি লাগিবে না, উহার প্রত্যেক কথা তার হৃদয়ে বসিয়া যাইবে। যেমন ব্যক্তির তেমনই জাতিরও একটা বিশেষ ভাব আছে যার ভিতর দিয়াই সে বাহিরাগত বিষয় সকলকে ধারণা করিতে চেষ্টা করে। তাই যে জাতির মধ্যে কোন নূতন তত্ত্ব প্রচার করিতে হইবে, তার জাতীয় শাস্ত্রভাণ্ডারের সাহায্যেই সে কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা। হিন্দুর কাছে ধ্রুব প্রহ্লাদের দৃষ্টান্ত যেমন সুফলপ্রদ হইবে, যিশুর দৃষ্টান্ত তেমন নয়। সকলই যখন লোক-শিক্ষার্থ কল্পিত আখ্যান, তখন অবস্থা দৃষ্টে যেটা অধিকতর কার্য্যকরী তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে। খৃষ্টানেরা স্বর্গরাজ্য স্থাপনের জন্য, হিন্দুরা ভূভার-হরণের জন্য ভগবানের অবতরণ বিশ্বাস করেন। আমরা খৃষ্টানের অর্থে স্বর্গরাজ্য স্থাপন বা হিন্দু পৌরাণিকের অর্থে ভূভার হরণ মানি না। কিন্তু আমাদের আদর্শটা খৃষ্টানকে "স্বর্গরাজ্যের" এবং হিন্দুকে "ভূভার হরণে"র আদর্শের মধ্য দিয়াই দিতে হইবে। নতুবা সাধারণে আমাদের ভাব ধারণা করিতে সমর্থ হইবে না। আমরা যেন মনে না করি যে ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ আমরা সাহারা মরুভূমিতে প্রচার করিতেছি। প্রচার করিতেছি মানব সমাজে যেখানে ঐ আদর্শ ঐ আকারে বা ভিন্নাকারে অল্পাধিক বিকশিতই রহিয়াছে। উহাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া তুলিতে হইবে, না হয় ভিন্ন পথে লইয়া যাইতে হইবে। যে আবরণের মধ্যে উহা রহিয়াছে সেই আবরণের সাহায্যেই কার্য্য সুসম্পন্ন করা চাই। নতুবা কার্য্য সিদ্ধি হইবে না। নূতন ভাব (spirit) পুরাতন ভাষার (form) মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে, ভাবের যদি সঞ্জীবনী শক্তি থাকে তবে সে ভাষাকেও আপনার দিকে টানিয়া লইবে। ব্রাহ্মসমাজ এইরূপেই 'প্রেম' শব্দটীর উন্নয়ন সাধন করিয়াছেন। শঙ্কর বৌদ্ধ দর্শনের উপর দাঁড়াইয়াই শূন্যের স্থানে **এককে** স্থাপিত করিয়াছিলেন, যদিও "প্রচ্ছন্নং বুদ্ধমেব তৎ" বলিয়া শাঙ্কর দর্শন প্রথমে ধিকৃত হইয়াছিল। রামমোহন আবার শঙ্করের মায়াবাদীয় ভাষাপদ্ধতিই গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শঙ্করীয় মায়াবাদের অপবাদ তাহাকে সহ্য করিতে হয় নাই তাহা নহে। কিন্তু তাঁহার ভাব ছিল শঙ্কর হইতে বিভিন্ন। একটা ছাড়িয়া আর একটা গ্রহণের সময়ে (Transition periodএ) ইহা প্রয়োজন। যে, সময়ে দর্শন বলিলে শঙ্কর-দর্শন ছাড়া লোকে আর কিছু বুঝিত না, সে সময়ে এ প্রণালী ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। পুরাতন ভাষার মধ্য দিয়া নূতন ভাব আসিয়াছে। সে আর এখন পুরাতন কথা বলে না। সে-ই যেন পরিবর্ত্তিত

হইয়া গিয়াছে ধর্ম্মজগতের ইতিহাস ইহা নূতনও নহে। Tertullian, Anathasius, Basil প্রভৃতি যাঁহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মের প্রথম আচার্য্য বলিয়া গণনা করা হয়, তাঁহারা তদানীন্তন প্রচলিত দার্শনিক ভাষার মধ্য দিয়াই খৃষ্টিয় ধর্ম্মতত্ত্বকে প্রচার করিয়াছিলেন। নতুবা সে তত্ত্ব কখনও গৃহীত হইত না। পুরাতন ভাষার মধ্য দিয়াই নূতন ভাবের প্রবর্ত্তন আমাদের মধ্যেই এখন সংঘটিত হইতেছে। **"স্বরাজ্য"-বাদিগণ** অসহযোগের ভাষা (statements dressed up in the mask of orthodox non-co-operation phrases) ব্যবহার পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু উহার মধ্যে নূতন ভাব প্রবেশ করাইয়া দিয়া সমস্ত আন্দোলনটাকেই এক নূতন পথে টানিয়া লইতে সম্পূর্ণ সফলকাম হইয়াছেন। সাঙ্গোপাঙ্গ ভাষাই ব্যবহার করে ও বুঝে! উহার মধ্য দিয়াই তাহাদিগকে নূতন পথে আকর্ষণ করা হইতেছে। তাহারা পুরাতন যাহা ভাল বাসে তাহা ছাড়িতেছে না, এই সংস্কারের মধ্যে থাকিয়াই নূতন গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে। পরিবর্ত্তন ভাবের মধ্যে, ভাষার মধ্যে নয়। "ব্রহ্ম" শব্দ আমরা আজ যে ভাবের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেখি, প্রাচীনেরা সে ভাবে সব সময়ে দেখেন নাই। এই একটী মাত্র শব্দের মধ্য দিয়া যে ভাবের বিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা একান্তই বিস্ময়জনক। অন্যদিকে, একই ভাব বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন পরিচ্ছদ ধারণ করিতে পারে। কেহ যেন মনে না করেন যে আমরা বলিতেছি, হিন্দু মুসলমানের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিবেন না, বা মুসলমান খৃষ্টানের নিকট হইতে তার ভালটা লইবেন না। আদান প্রদানের কি প্রণালী হইবে তাহারই বিচার হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ হিন্দুর কাছে "ভূভারহরণ" আর খৃষ্টানের কাছে "স্বর্গরাজ্য স্থাপন" এই দুই বিভিন্ন সূত্রের (categories) মধ্য দিয়া প্রচার করিতে হইবে, নতুবা প্রচার হইবে না। সম্প্রতি একজন ভারতীয় খৃষ্টান বলিয়াছেন—If Christian doctrines could be interpreted in the light of Vedantic thought, there should arise in India a type of Christianity purged of all foreign ideas and traditions paving the way for a great national church." (R. Palit. *Statesman* 25. 7. 3)। ইহার মধ্যে ব্রাহ্ম প্রচারকদিগের চিন্তা করিবার অনেক মালমসলা রহিয়াছে। যে ভাষা যে বুঝে না তাহার কাছে সে ভাষায় কথা বলিয়া লাভ নাই। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমরা প্রচার করি হিন্দু ও

খৃষ্টানের ভাষায়। কাজেই আমরা মুসলমানদিগকে আকর্ষণ করিতে পারিতেছি না। জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতা ব্রাহ্মসমাজের এই দুই "রণ-রব" বিষয়ে একমত হইলেও কেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিবেশী ইস্‌লাম সমাজকে স্পর্শ করিতেছে না, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে বুঝা যাইবে, যে তাঁহারা আমাদের "ভাষা" বুঝেন না। মানুষ কোন এক ভাবে অভ্যস্ত হইলে, সে যে তাহার বাহিরে যাইয়া বস্তু ধারণা করিতে পারে না, অন্ততঃ খুব অসুবিধা হয় তাহার একটি সুন্দর কৌতুককর দৃষ্টান্ত ব্রাহ্মসমাজেই আছে। ব্রহ্মসঙ্গীতেই আছে, "ইশা মুসা মহম্মদ হে"। একজন অতি শ্রদ্ধেয় নেতৃস্থানীয় স্বর্গগত ব্রাহ্ম প্রচারক বলিয়াছিলেন, যে বড় জোর "ইশা মুসা" পর্য্যন্ত চলে, মহম্মদ বলিতেই কেমন যেন দাড়ি দাড়ি ঠেকে। মানুষ তাহার ছায়াকে অতিক্রম করিতে পারে না। অন্যদিকে, একজন নিষ্ঠাবান্ মুসলমান ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগ দিয়া বলিয়াছিলেন, যে আপনাদের সবই ভাল, কিন্তু "ঐ যে কথাটা" বলেন, উহাতে মন খারাপ হইয়া যায়। তিনি 'প্রেম" কথাটা মুখে আনিতেই নারাজ, ভগবানের সম্বন্ধে বলা তো দূরের কথা। তাই এখন

৭। সপ্তম কথা, প্রচারের **পাত্র** অর্থাৎ যাহাদের নিকট সুসমাচার পৌছাইয়া দিতে হইবে। এইখানে অধিকারী ভেদের কথা সহজেই আসিয়া পড়ে। কিন্তু আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে আর স্বতন্ত্রভাবে এ বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন নাই। যে বিষয় যে গ্রহণ করিতে পারিবে না সে বিষয় তাহাকে দেওয়া উচিত নয়। কেন না, দেওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র।

কোন কিছু প্রচার করিতে হইলে তার উপর প্রচারকের পূর্ণ বিশ্বাস চাই। কোন সত্যের উপরে বিশ্বাসের অর্থ তাহাকে জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছার দ্বারা গ্রহণ। এই গ্রহণের ঐকান্তিকতায় পরিমাণগত বিভিন্নতা থাকিতে পারে, কিন্তু বিশ্বাসের মধ্যে এই তিন উপাদান বর্ত্তমান থাকিবেই। আমি যখন এই সত্যটা আর একজনের কাছে উপস্থিত করি, তখন উহা তাহার জ্ঞানের সম্মুখেই মাত্র উপন্যস্ত করিতে পারি। তার ভাব ও ইচ্ছার উপর আমার কোন হাত নাই। তার ভাব ও ইচ্ছা ইহার অনুকূল না হইলে উহা তাহার কাছে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে না। সুতরাং সে উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবে না। মনোবিজ্ঞানের এই সহজ তত্ত্বটির উপর নজর থাকে না বলিয়াই অসহিষ্ণু প্রচারকদিগকে বলিতে শুনা যায় যে এমন সত্য লোকে

বিশ্বাস জন্মে জ্ঞান ভাব ও ইচ্ছার সমন্বয়ে

গ্রহণ করিল না কেন? তিনি কেবল জ্ঞানগত (Logical) সিদ্ধান্তই উপস্থিত করেন, অন্য দুই উপাদানের উপর তিনি কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন না, অথচ সত্যকে জীবনে বাস্তব (concreted) হইতে হইলে ভাব ও ইচ্ছার অনুকূলতা চাই, নতুবা বিভিন্ন মানুষ এক জিনিষ অন্যভাবে দেখে। এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বেরই লৌকিক ভাষ্য—"যারে যে দেখ্‌তে পারে না হাট্‌তে দেখে ব্যাকা"। এক সময়ে যে যুক্তিটা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপেক্ষা করি, ভাব ও ইচ্ছার পরিবর্ত্তনে অন্য সময়ে তাহাই আবার মূল্যবান হইয়া উঠে। কথাটা কয়েকটি দৃষ্টান্তের দ্বারা পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিব। প্রথম একটা ঘরাও দৃষ্টান্ত দেই—শয়ন করিবার সময় মনে করিয়া শুইলাম যে ভোর ৫টায় শয্যা ত্যাগ করিব। ৫টা বাজিল। উঠিবার ইচ্ছা নাই, কাজেই না উঠিবার পক্ষে নানা যুক্তি মনে আসিতে লাগিল—৫½ টায় উঠিলেও কাজ হইবে। উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া যখন ঘুমের ঘোর কাটিয়া গেল, তখন না উঠিবার পক্ষের যুক্তিগুলি এমন হাস্যকর বলিয়া মনে হইল—কেননা, সে যুক্তির আর এখন কোনই প্রয়োজন নাই (জ্ঞানের pragmatic view)—যে নিজে নিজেই না হাসিয়া পারা গেল না। দুই পক্ষের যখন বিচার হয়, তখন উভয় পক্ষের দলভুক্তগণই আপনাদিগকে অনেক সময়ে জয়ী মনে করে। সকলেই যে কপটতা করে তা নয়। বিষয়ী যা চায়, বিষয়টাকে সেইপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া লয়—আপনার অজ্ঞাতসারে, কপটতা করিয়া নহে। যুদ্ধের সময় দেখিয়াছি, একই তারের খবর কেহ বা ইংরাজের, কেহ বা জার্ম্মাণের জয়ের পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া লইয়াছেন। মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ যাহাকে বলেন, personal equation—নিজের ছায়ার ন্যায় তার হস্ত হইতে মানুষের নিস্তার নাই। তিন বৎসর পূর্ব্বে অসহযোগীরা যে সব যুক্তিকে নিতান্ত অসার বলিয়া পরিহার করিয়াছিলেন, ভাব ও ইচ্ছার পবির্ত্তনে অনেক বড় বড় পাণ্ডারাও আজ তাহা মাথায় তুলিয়া লইতেছেন। দেশের লোকের আত্মবোধ জাগিয়াছে। আমরা যে একটা উচ্চ সভ্যতার দাবীদার এ কথা মনে পড়িয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় দাসত্ব এই দাবীকে লজ্জা দিতেছে সুতরাং মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়িত হইতেছি। অন্যদিকে পেটের দায়—অর্থনৈতিক অবস্থা কি ভীষণ শোচনীয়? সুতরাং ইংরাজকে দেশ হইতে তাড়াইতে পারিলেই এ দুই দায় হইতেই নিস্তার পাইব, এইরূপ একটা ভাব ফল্গুস্রোতের মত লোকের মনের মধ্যে প্রবাহিত হইতেছিল এমন সময় মহাত্মা গান্ধী বলিলেন,

"পহেলা জানুয়ারী স্বরাজ" ! সে কথা আমরা অবিচারে বিশ্বাস করিয়া ফেলিলাম এবং সে জন্য সহস্র সহস্র জেলে চলিয়া গেলাম। কেন না, আর ভয় কি ১লা জানুয়ারী স্বরাজে বাহির হইয়া আসিব। অথচ এই মহাত্মাই যখন বলিলেন, "অস্পৃশ্যতা দোষ পরিহার না করিলে শত বৎসরেও স্বরাজ মিলিবে না", সে কথাটা শরতের মেঘের মত মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল, এ কথাটায় বিশ্বাস করিবার মত একজন লোকও দেশে মিলিল না। অথচ অন্য ক্ষেত্রে গান্ধীর আদেশ অমান্য হইল বলিয়া প্রতিদিন কত কালি ও কাগজের শ্রাদ্ধ হইতেছে। মহাত্মা না বলিয়া 'গান্ধিজী' বলিলে হাতাহাতি পর্য্যন্ত হইতেছে। একই জনের একই সময়ের দুই আদেশের এই বিভিন্ন পরিণাম কেন? ভাব ও ইচ্ছা একটীর অনুকূল এবং অন্যটীর প্রতিকূল। একটা শাস্ত্রীয় (১) দৃষ্টান্ত না দিয়া শেষ করিলে বোধ হয় পাঠকবর্গের মনস্তুষ্টি হইবে না। জয়দেবের গল্প ইতিপূর্ব্বেই করা হইয়াছে। জয়দেব জগন্নাথের আদেশে বিবাহ করিতে রাজী হইলেন না। তিনি সন্ন্যাসের সঙ্কল্প লইয়া বাহির হইয়াছেন। সুতরাং তদানীন্তন মনের ভাব ও ইচ্ছা ইহার প্রতিকূল। কিন্তু মেয়েটি অনুনয় বিনয় করিয়া তাহাকে বিবাহে সম্মত করাইল। বিবাহ করিতে যখন রাজী হইলেন, তখন এ বিষয়ে তাঁর ভাবেরও পরিবর্ত্তন হইল। সুতরাং জয়দেব তখন জগন্নাথের আদেশের এক সুন্দর ভাষ্য করিয়া বসিলেন যাহা বিবাহের সম্পূর্ণ অনুকূল—তাঁর মনের তদানীন্তন ভাব ও ইচ্ছার প্রতিবিম্বমাত্র—"জগন্নাথ জগতের প্রভু, হৃদয়বিহারী ও অন্তর্য্যামী, তিনি যাহা করিবেন, তাহাই হইবে।" এ ভাষ্যের টীকা নিষ্প্রয়োজন।

যাহা হউক, মানুষ সত্যগ্রহণ করে ভাব ও ইচ্ছাদ্বারা প্রেরিত হইয়া, কিন্তু আমাকে যদি তাহার নিকট কোন সত্য উপস্থাপিত করিতে হয়, তবে তাহার বুদ্ধিবৃত্তিকে উদ্বোধিত করা ছাড়া আমার গত্যন্তর নাই। প্রচার যদি করিতেই হয়, তবে জ্ঞানের মধ্য দিয়াই করিতে হইবে। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা প্রচুর নহে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সার্ব্বভৌমিক ভিত্তি যতক্ষণ আমি না পাই ততক্ষণ আমার অভিজ্ঞতা আমি অন্যের উপর চাপাইতে পারি না। কেন না, তার অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইতে পারে। যে সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বের মধ্যে আমাতে ও তাহাতে একত্ব, সেই তত্ত্বে দাঁড়াইয়া উভয়ের মধ্যে আদান প্রদান চলিতে পারে, নতুবা নহে। অনেককে

বলিতে শুনি, জগত্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে হইবে প্রেমের দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা নহে। তাঁহারা বলেন জগৎটা প্রেমে বিধৃত। প্রেম দিয়া জগৎ বুঝিতে হইবে, জ্ঞান দিয়া নহে। ইহারাও প্রায় ঐ দলের, যাঁরা মুখে বলেন—মানুষ জ্ঞানে ভগবান্‌কে পায় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জ্ঞান ভাব ও ইচ্ছা—মানব মনের এই তিন দিক্। প্রেম ভাব-বর্গের অন্তর্গত। সুতরাং আমরা ইতিপূর্ব্বে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে এই সত্যের মধ্যে যতটুকু সত্য আছে তা স্বীকৃত হইয়াছে এবং ইহা যে পূর্ণ সত্য নয় তাহাও বুঝা গিয়াছে। যে বিষয়ে যার সহানুভূতি নাই, সে বিষয় সে বুঝিতে পারে না। যে প্রেম পাইয়াছে সে জগতে প্রেম দেখিতে পাইবে। কিন্তু কাহারও যদি এমন দুর্ভাগ্য হয়, যে সে জগতে প্রেমের পরিচয় পায় নাই, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় তার কোনই লাভ হইবে না। তাহাকে বুঝাইতে হইলে প্রেমেরও সার্ব্বভৌমিক ভিত্তি বাহির * করিতে হইরে, অর্থাৎ আমার অভিজ্ঞতার দার্শনিক ভিত্তি চাই। যে জ্ঞান-বস্তু (Reason) আমার তোমার সকলের মধ্যে বর্ত্তমান, তাহাই প্রচারের একমাত্র ভিত্তি। নতুবা আমার অভিজ্ঞতা লইয়া আমাকে ঘরের কোণে বসিয়া থাকিতে হইবে।

দর্শন ও প্রচার

দর্শনের নাম শুনিয়া অনেকে চমকিয়া উঠেন। অথচ এই দর্শন-প্লাবিত দেশে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের দাবীটাও ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন। যতগুলি ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, তাহাদের সাধনের ভিত্তিরূপে ততগুলি দর্শনশাস্ত্র আছে, ওল্‌ডেনবার্গ ইহাকে ভারতের একটা মস্ত আশ্চর্য্যজনক বিশেষত্ব বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সেই দেশে দর্শন ছাড়া ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মপ্রচারের আকাঙ্ক্ষা যে অত্যাশ্চর্য্যজনক, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। ব্রাহ্মরা যাহা বলেন, যাহা করেন, তার প্রত্যেক কথা ও প্রত্যেক কার্য্যের প্রতিবাদস্বরূপ শাঙ্কর দর্শন পথ জুড়িয়া বসিয়া রহিয়াছে—বিরক্তস্য হি সংসারাৎ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারো নান্যস্য—এই দর্শন নিরসন ব্যতীত এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার হইতে পারে না। ও দর্শন দেশের অস্থিমজ্জাগত, উহা মৃত পদার্থ নহে। দু'চার জন অনভিজ্ঞ লোক আমাদের কথা শুনিয়া 'আহা বেশ' বলিল বলিয়া আত্মতুষ্টিরূপ ভ্রান্তিজালে

* এ বিষয়ে পণ্ডিত তত্ত্বভূষণ-প্রণীত *Brahma Sadhan* এবং *Theism of the Upanishads* বিশেষভাবে পঠিতব্য।

জড়িত হইলে চলিবে না। এমন সকল অভিজ্ঞলোকের কথা জানি, যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মবাদকে একরূপ নিম্নশ্রেণীর ঈশ্বরবাদ বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিতে না পারিলে সাধারণের কাছে এ বার্ত্তা লইয়া যাওয়া বৃথা। কেন না—যৎযদাচরতি প্রাজ্ঞস্তত্তদেবেতরে জনাঃ। না জানিয়া যাহারা আসে, জানিয়া যে পালাইয়া যায় ইহার বহু দৃষ্টান্ত মিলিবে। নির্গুণ ব্রহ্মবাদ যে শূন্যবাদ, একটা abstraction মাত্র—জাতীয় ইতিহাস ইহার সাক্ষী। কিন্তু "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতি" ইহাই দর্শনতত্ত্বের সর্ব্বোচ্চ কথা। প্রণালীবদ্ধভাবে সুব্যবস্থিত দর্শনশাস্ত্রের সাহায্যে এই মতকে বলবত্তর করিয়া শঙ্করের মঠ আক্রমণ করিতে হইবে। অস্ত্র-শস্ত্রের যে অভাব আছে তা নয়, ব্যবহার করিবার স্পৃহা নাই, তাই এই দুর্গতি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, (২৬০ পৃঃ) চৈতন্যদেবও বলিয়া গিয়াছেন—

জীব-নিস্তারের তরে সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ ॥

রাজর্ষি রামমোহন শাঙ্কর দর্শনের উপর দাঁড়াইয়াই শঙ্করীয় মায়াবাদের নিরসন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্ম-দর্শনের যে সূত্রপাত ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন এবং তাহার পরিবর্দ্ধন ও পরিপোষণের যে প্রয়াস হইতেছে, তাহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মের রক্ষণ ও প্রচারের একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধন ও প্রচার একটা অলীক আকাঙ্ক্ষাতেই আবদ্ধ থাকিয়া যাইবে। তবে শঙ্করের নামের দোহাইএর একটা মস্ত ভয় আছে। এত বড় উচ্চ নামই বা জগতে কয়টি আছে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ভরসাও আছে। একথা বলিলে একটুও অত্যুক্তি হইতেছে বলিয়া মনে করি না, যে কয়টি নাম জানা গিয়াছে যাঁহারা ভগবানের খাস্ দরবারে যাইয়া উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন—রাজর্ষি রামমোহন তাঁহাদেরই একজন। চাই সাহস ও আত্মপরিচয়। জানি, Apostolic যুগে যখন মনে হয় ধর্ম্ম আপনা হইতেই উথলিয়া উঠিতেছে, তখন দর্শনের কথা মনে না পড়িতে পারে, বরং সেটাকে একটু অবজ্ঞার চক্ষে দেখাই স্বাভাবিক। কিন্তু স্রোত চিরদিন থাকে না, ভাটা আসেই। তখন দর্শনের ভিত্তি ছাড়া ধর্ম্ম টিঁকিতেই পারে না। ধর্ম্মোন্মত্ততায় মার্টিন লুথর বলিয়াছিলেন, যদি এরিস্ততল্‌কে রক্তমাংসের দেহধারী মানুষ বলিয়া না জানিতাম, তবে তাঁহাকে বলিতাম ডেভিল্ (Devil)। কিন্তু তদীয় শিষ্য মেলাংটন

ধর্ম্মমণ্ডলীকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে যাইয়া ঠেকিলেন, শিখিলেন। তাই বলিলেন, এরিস্ততল্‌কে ছাড়িতে পারি না—তাঁহার দর্শনই ধর্ম্মমণ্ডলীর ভিত্তি (**সংস্কার সংরক্ষণ** দ্রষ্টব্য)। ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে সাধকসম্প্রদায়ের একতা-সাধনের জন্য দর্শনের ভিত্তি কত বেশী প্রয়োজন। যাহারা অভ্রান্ত শাস্ত্রগুরু মানেন না, দর্শনের ভিত্তি ব্যতীত তাহাদের ধর্ম্ম সাধিত ও প্রচারিত হইতেই পারে না। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে একতা-সম্পাদনের জন্য উহাই একমাত্র সহায়। ব্রাহ্মসমাজের তো কথাই নাই, সমবেত সাধন যাঁহাদের সাধনের এক বিশেষ অঙ্গ—"একাকী যাইলে পথে নাহি পরিত্রাণ রে"। অথচ সাধন তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ, আত্মিক (Spiritual), বাহিরের (Ceremonial or sacramental) নয়। কে দিবে এই আত্মিক একতা?

আরাধনা সাধনে দর্শনের স্থান

আরাধনা-সাধন জগৎকে ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। কিন্তু আমরা যে কথা বা ভাবের সাহায্যে আরাধনা করি তার প্রত্যেক-টির পশ্চাতে চাই একটী ফিলজফি, নিজস্ব ফিলজফি। এই ফিলজফির সাহায্যেই সাধকগণের একতা আসিতে পারে। ধর্ম্মমণ্ডলী এই দর্শন গড়িবেন। এবং ইহাই হইবে তাঁহাদের একত্ব-সাধনের ভিত্তিভূমি। "সত্যং" বলিতে শঙ্করের সকল বিশেষত্ববিহীন সত্তামাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের "সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং" পর্য্যন্ত "সত্য"মের বহু ঘর মানুষ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। আচার্য্য বলিলেন "সত্যম্" আর আমরা শত উপাসক যদি শত জগতে বেড়াইতে থাকি এবং সঙ্গীতের দ্বারা একটু ভাবোদ্রেক হইল দেখিয়া যদি মনে করি উপাসনা সফল হইল, তবে সামাজিক উপাসনার দুর্দ্দশা কখনও ঘুচিবে না। রোগ নির্ণয় করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে কেবল ক্রন্দনে রোগ সারে না। জ্ঞাতসারে হউক অজ্ঞাতসারে হউক, শাঙ্কর দর্শন আমাদের আত্মাকে অধিকার করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। কথায় কথায় ইহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা শঙ্করের সেই পথ হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত মার্গে যাইয়া ব্রহ্মকে সকল বিশেষত্ব যুক্ত করিয়া বলিতেছি—"ব্রহ্মের স্বভাবে দেখ ব্রাহ্মধর্ম্ম বর্ত্তমান"। অথচ এই তত্ত্বের পশ্চাতে যে দর্শন চাই সে দিকে একেবারেই মনোযোগ নাই। ইহাতে এক দিকে প্রচারের, অন্য দিকে সাধকমণ্ডলী-গঠনের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিতেছে। সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্র সিদ্ধ হয় না, ইহা এ দেশের সাধকদিগের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। মন্ত্রের পশ্চাতে যে অর্থ আছে তাহার একতা ছাড়া

সাধকমণ্ডলীর একতা হয় না। সুতরাং সম্প্রদায়ও হয় না, মন্ত্রও সিদ্ধ হয় না। আমরাই যদি সিদ্ধ না হই, অন্যকে সে মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা। এক মন্ত্রে দশ জনকে সিদ্ধ হইতে হইবে, তার পর প্রচার। আরাধনা-মন্ত্রে যদি দশজন সিদ্ধ হন তবে তাঁদের অভিজ্ঞতা হইতে আরাধনার সার্ব্বভৌমিক ভিত্তি পাওয়া যাইবে (Inductive Method).

সত্যের প্রতিষ্ঠা কোথায়

আমাদের দেশের ধর্ম্মাচার্য্যগণ উপনিষদ্‌কে ঋষিগণের ব্রহ্মাভিজ্ঞতা ধরিয়া লইয়া তাহা হইতেই ব্রহ্মবিদ্যার আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সেই জন্য ইহার এত মূল্য। উপনিষদ্‌কে সকলেই অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য বলিয়া ধরিয়া লইবেন—তা বলিতেছি না, কেবল প্রণালীটার কথাই বলিতেছি। যাঁরা আরাধনায় সিদ্ধ, তাঁদের অভিজ্ঞতা হবে আরাধনার শ্রুতি—তাহারই উপর দর্শন প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রচারকের নিজের অভিজ্ঞতা যতক্ষণ দর্শনের দ্বারা সমর্থিত না হইতেছে (Deductive Method) ততক্ষণ সেটা কেবল তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা—তাহা লইয়া তিনি কাহারও দ্বারে উপস্থিত হইতে পারেন না। আবার বলি প্রচারক ও প্রচারের পাত্র উভয়ের মধ্যে যে সার্ব্বভৌমিক তত্ত্ব বর্ত্তমান, তাহারই সাহায্যে প্রচার, কেবল মাত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রচারের ভিত্তি হইবে না।

আবার ব্যক্তিসকলের শিক্ষা দীক্ষা অভিজ্ঞতা আবেষ্টন ও মানসিকভাব-প্রবণতার পার্থক্য হেতু সমাজের সকলেই যে এক সাধন-মণ্ডলীভুক্ত হইবেন, এরূপ আশা করা যায় না। ব্রহ্ম বেদান্তেরও বিভিন্নমার্গ (School) থাকিবে। সমভাবাপন্ন সাধনার্থিগণ বিভিন্ন বিদ্বৎগোষ্ঠিতে সম্মিলিত হইয়া সাধন-পথে অগ্রসর হইবেন। সকলকেই বিশেষ সাধনতন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, নহিলে হইবে না, ইহাই বক্তব্য। কেহ হয়তো বলিবেন, 'অমুকে' দর্শন-শাস্ত্র পাঠ না করিয়াই সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তখন ধর্ম্মসাধনে দর্শনকে এত উচ্চ স্থান দিবার প্রয়োজন কি? দর্শনশাস্ত্র পাঠের কথা উঠিতেছে না। এ দেশে দার্শনিক তত্ত্ব গুরুপরম্পরায় মুখে সূত্রাকারে কতকাল ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। পাশ্চাত্যে প্রথম যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়, তখন মুখে মুখেই অধ্যয়ন অধ্যাপনা চলিত। গ্রন্থপাঠ, গুরূপদেশ বা মণ্ডলীর সকলের কথাবার্ত্তায় "বোধয়ন্তঃ পরস্পরং"এর মধ্য দিয়াই তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া সকলকে সাধনপথে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে। তার পর, দু এক জন স্বয়ংসিদ্ধ মানুষ আছেন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও সর্ব্ব-

সাধারণের জন্য দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তার মূল্য একটুও হ্রাস হয় না। স্কুল পালানো ছেলে রবীন্দ্রনাথ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়াছেন বলিয়া সব ছেলেই যদি স্কুল পালাতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে দেশের শিক্ষার যে অবস্থা হয়, একজন স্বয়ংসিদ্ধ বলিয়া সকলে সাধনের সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্মজগতের ততোধিক শোচনীয় অবস্থা হইবে। কেহ যেন মনে না করেন, আমরা দর্শনকে একটা উপাস্য (fetish) করিয়া তুলিতেছি। জ্ঞান-প্রেম-পুণ্য-সমন্বিত "ধর্ম্মজীবন'ই সকলের সাধ্য। দর্শনকে আমরা অনতিক্রমণীয় উপায় বলিয়াই মনে করি। আসল কথা, বুদ্ধিজীবী জীব মানুষের দর্শনকে ছাড়িয়া চলে না। সে দর্শন ছাড়িলেও দর্শন তাহাকে ছাড়ে না। একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন, "To say that we have nothing to do with philosophy ends in one having to do with a bad philosophy. In that case we have a philosophy with which we operate without having investigated it instead of having one with which we operate because we have investigated it. The philosophy of which we are aware we have. The philosophy of which we are not aware has us. No doubt, we may have religion without philosophy, but we can not formulate it even in the rudest way to ourselves, *we can not communicate it in any way whatsoever to others except in the terms of a philosophy*. শেষ ছত্রটি প্রচারকদিগকে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া মটোরূপে ব্যবহার করিতে হয়। যাহা হউক, আমরা জ্ঞাতসারে দর্শনের সাহায্য না লইলে দর্শন অজ্ঞাতসারে দানায় পাওয়ার ন্যায় আমাদিগকে পাইয়া বসিবে। সময়ে সুশাস্ত্র গ্রহণ না করিলে কুশাস্ত্র যে মানুষকে নানা দুর্গতিতে পাতিত করে, ধর্ম্মজগতে ইহার সাক্ষ্যের অভাব নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে সে বিপদের অতীত তাহা মনে করিবার কি কারণ আছে? তবে এখনও ভয় পাইবার কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই। করণ উপকরণের কোন অভাব নাই। সজাগ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলে পরপারে যাইবার তরণী সহজেই নির্ম্মিত হইতে পারে। কাণ্ডারী স্বয়ং ভগবান্।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ব্রহ্মোপাসনা

উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য।

(১)

ঋষি বলিয়াছেন, "আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি"—আনন্দ হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, আনন্দেতেই বিচরণ করিতেছে এবং বিনাশ কালে আনন্দেতেই প্রবেশ করিতেছে। তাই যাঁহার চক্ষু খুলিয়াছে তিনি চারিদিক্ আনন্দপূর্ণ দেখিতে পান। জড় চেতন সকলই আনন্দে পরিপূর্ণ। বৃক্ষ লতায় আনন্দ মাখান। পবন হিল্লোলে তাহারা যেন আনন্দে নৃত্য করিতেছে। পশু পক্ষী আনন্দেই খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। সূর্য্যদেব পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া আনন্দকিরণ বিতরণ করিতে করিতে নাচিতে নাচিতেই যেন পশ্চিম আকাশে অন্তর্হিত হইতেছেন। নৈশ আকাশে কি আনন্দ-লহরী না ছুটাছুটি করিতেছে! সুধাকর চন্দ্র সুধার আনন্দে জগতের প্রাণ মন হরণ করিতেছেন। সকলই আনন্দপূর্ণ। ইহা কবি-কল্পনা নহে। কেবল বস্তু থাকিলেই হয় না, বস্তু গ্রহণের ইন্দ্রিয় চাই। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়, এই সকল ইন্দ্রিয়-সাহায্যে আমরা রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ—জগতের এই পাঁচটি ভাব গ্রহণ করিয়া থাকি। এতদতিরিক্ত অন্য কিছুর বাহ্য জ্ঞান আমাদের নাই। ইহাতে এমন কিছু বুঝায় না, যে, বাহ্য জগতের সকল ভাবই আমাদের আয়ত্ত হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক কথা এই, যে, আমাদের আর ইন্দ্রিয় নাই বলিয়া আমাদের জগৎজ্ঞান এই পঞ্চ ভাবেই নিবদ্ধ। বিবর্ত্তনে মানুষের যদি কোন ইন্দ্রিয় খুলিয়া যায়, তবে তাহার কাছে সৃষ্টিরও ঐশ্বর্য্য বাড়িয়া যাইবে। এমন জীব হয়তো আছে, যাহার কাছে এই জগৎ মানুষের অপেক্ষা অধিক সম্পদশালী। এমন জীবের কথা শুনা যায়, যাদের দিঙ নিরূপণ ইন্দ্রিয় আছে, মানুষের তাহা নাই। আমা-

আধ্যাত্মিক বস্তু গ্রহণে আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয় চাই

দের কাছে বস্তু দীর্ঘ প্রস্থ বেধ এই তিন আয়তন বিশিষ্ট। চতুর্থ আয়তন থাকিতে পারে না, তা নয়, তবে আমাদের "fourth dimension" গ্রহণ করিবার আয়োজন নাই। বস্তু গ্রহণের ইন্দ্রিয় না থাকিলে বস্তু থাকিয়াও নাই। আবার ইন্দ্রিয় বিকৃত হইলে এক বস্তু আর এক বস্তু বলিয়া মনে হইতে পারে। যার পাণ্ডুরোগ (Jaundice) হইয়াছে সাদাকে সে হরিদ্রা বর্ণ দেখিতে পায়। সাধুগণ যেখানে আনন্দ দেখেন আমরা দেখি দুঃখ। কুরুক্ষেত্র সমরে কর্ণ কর্ত্তৃক ঘটোৎকচ নিহত হইলে কৌরবগণ উল্লসিত ও পাণ্ডবগণ শোকে ম্রিয়মাণ হইল। কিন্তু পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে হাততালি দিয়া নাচিতে লাগিলেন। কেন না, তিনি স্পষ্ট দেখিলেন, আর কৌরবের নিস্তার নাই, পাণ্ডবের জয় অনিবার্য্য। আবার এক ইন্দ্রিয়ের কাছে যাহা নাই, অন্য ইন্দ্রিয়ের কাছে তাহা ধরা পড়ে। জলের মধ্যে লবণ মিশ্রিত হইয়া থাকিলে চক্ষু তাহা ধরিতে পারে না। লবণ তো রহিয়াছে তাহা ঠিক—রসনা তাহা ধরিয়া দিবে। অনুশীলনে ইন্দ্রিয়ের শক্তি তীক্ষ্ণ হয়। একই স্থানে বসিয়া একজন দুর্গন্ধে তিষ্ঠিতে পারে না, তাহা অন্যের হয়তো অনুভূতির বাহিরে। অসভ্যদের ঘ্রাণ-শক্তির, দৃষ্টি-শক্তির, শ্রবণ-শক্তির অদ্ভুত অদ্ভুত কথা শুনা যায়, যাহা আপাততঃ কাহিনী বলিয়াই মনে হয়। মাটিতে কাণ পাতিয়া বহুদূরস্থিত শত্রুর গতিবিধি তাহারা অনুধাবন করে, আমি কাণ পাতিয়া কিছুই বুঝিব না। পদচিহ্নের আঘ্রাণ লইয়া তাহারা বুঝিবে উহা কাহার পদচিহ্ন। অনুশীলনে শক্তি এমনই বাড়ে। অনু-শীলনের অভাবে আবার শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। স্যাণ্ডোর ব্যায়ামে যে বাহুতে ভীমের বল আসে, অনুশীলনের অভাবে ঊর্দ্ধবাহুদিগের তাহা অসার হইয়া যায়। কেণ্টুকী-গহ্বরে যে সকল জীব বাস করে তাহাদের দৃষ্টিশক্তি নাই, কিন্তু সুগঠিত দর্শনেন্দ্রিয় রহিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, ঐ গহ্বরে প্রবেশের পূর্ব্বে তাহাদের দৃষ্টিশক্তি ছিল, নতুবা ইন্দ্রিয় গঠনের কোন সার্থকতা থাকে না। উক্ত গহ্বরে সূর্য্যালোক প্রবেশ করে না। সুতরাং যুগ যুগান্ত ধরিয়া দৃষ্টিশক্তি অব্যবহৃত থাকায় উহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন আলোকে আনিয়া ছাড়িয়া দিলে উহারা দৃষ্টিহীনের ন্যায় ব্যবহার করে।

আত্মারও চক্ষু আছে, তাহা খোলা চাই। বাহিরের দেখা আর অন্তর্দৃষ্টি দুই স্বতন্ত্র পদার্থ। যে চক্ষুতে জগৎ দেখি সে চক্ষুতে ব্রহ্ম-দর্শন হয় না। Eckhart বলিয়াছেন "Some people hope to see God as one sees an ox." আচার্য্য শঙ্করও ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছেন "ন দর্শয়িতুং শক্যতে

গবাদিবৎ।” অন্তর্দৃষ্টি খুলিলে, যেখানে বহির্দৃষ্টিতে কিছুই দেখিনা, সেখানেও সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে। বৃক্ষের একটি পত্র হাতে করিয়া উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ্ তাহার মধ্যে যে সৌন্দর্য্য দেখেন, যে তত্ত্বের আভাস পান, আমরা তাহার শতাংশের একাংশও দেখি না বা পাই না। লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে মৃত জন্তুর এক খানি অস্থি দেখিয়া জন্তুটির পূর্ণাবয়ব জীবতত্ত্ববিদের মানস নেত্রের নিকটে প্রকটিত হয়। আমি তুমি তাহা নরাস্থি কি পশুকঙ্কাল তাহাই নির্ণয় করিতে অসমর্থ। কেন না, আমাদের সে চক্ষু খুলে নাই। চৈতন্যদেব কদম্ব-ফুল দেখিয়া ভাবে বিভোর হইতেন, তমালের সৌন্দর্য্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিত, সমুদ্রের নীলগাম্ভীর্য্য তাঁহার হৃদয়ে উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া দিত। আমরাও কত সুন্দর সুন্দর বস্তু দেখিতেছি, কিন্তু আমরা তো তাহাতে সেই অরূপের রূপমাধুরী দর্শন করি না? আনন্দস্বরূপের আনন্দ-লহরী অনুভব করি না? আগরার তাজমহল দেখিয়া কেহ যদি তাঁহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারে, তবে বুঝিতে হইবে, যে, সে সৌন্দর্য্য-বোধ হইতে বঞ্চিত। কিন্তু ইহা বুঝিব না, যে তাজমহলে কোন সৌন্দর্য্য নাই। তাই বলিয়াছি, বস্তু থাকিলেই হইবে না, তাহা গ্রহণ করিবার ইন্দ্রিয়ও থাকা চাই। যার চক্ষু নাই সে আলোক-সাগরে নিমজ্জিত থাকিয়াও ইহার অপার সৌন্দর্য্য-সুখ হইতে বঞ্চিত। সহস্র-কিরণের একটী কিরণও তাহার উপভোগ্য নহে। অন্ধ দেখে না বলিয়া চক্ষুষ্মানের কাছেও সূর্য্যের অস্তিত্ব লোপ পায় না। তিনি অন্ধগোষ্ঠীর মধ্যে দাঁড়াইয়াই বলেন, সূর্য্য রহিয়াছে। “দেবপ্রসাদাৎ তপঃপ্রভাবাৎ” ভগবৎ-কৃপায় সাধনবলে সেই চক্ষু লাভ করিতে হইবে, যাহার দ্বারা ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মপ্রেম ব্রহ্মসৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা যায়। বিজ্ঞান-সম্মত সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিলে সকলেরই এ চক্ষু খুলিতে পারে। যাঁহারা বলিবেন, বাহ্যতঃ কোনও বৈজ্ঞানিক-প্রণালী অবলম্বন না করিয়াও মানুষের মধ্যে এ দৃষ্টি খুলিয়াছে এরূপ দেখা যায়, তাহাদের সঙ্গে আমার কোন বিবাদ নাই। অধ্যাত্ম চক্ষু, জ্ঞান ভাব ইচ্ছা তিন দিক দিয়া খুলে—জ্ঞানীর খুলে, কবির খুলে, কর্ম্মীরও খুলে। কোন কোন জায়গায় জ্ঞাতসারে কোন প্রণালী অবলম্বন না করিয়া সহজ ভাবেই খুলে। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের জন্য বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী চাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কেহ কেহ রোগতত্ত্ব ও ভৈষজ্য-বিদ্যা না জানিয়াও সুস্থ থাকিতে পারে। অনেক গ্রাম্য লোক আছে যাহারা তর্ক-বিজ্ঞানের এক কথাও

বস্তু-গ্রহণ ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ

জানে না, অথচ নির্ভুল আলোচনা করিতে সমর্থ। কিন্তু সাধারণের পক্ষে এ নিয়ম খাটে না। সাধারণতঃ মানুষ সুস্থ থাকিবার জন্য শরীর-বিজ্ঞানের আলোচনা করে, এবং চিন্তাকে সত্য পথে পরিচালিত করিবার জন্য তর্কবিজ্ঞানের সূত্রগুলি, জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, আয়ত্ত করে। দুই চার জন লোক, যেমন—রবীন্দ্রনাথ, স্কুল কলেজে অধ্যয়ন না করিয়াই,—স্কুল হইতে পলাইয়াও বিদ্বান্ হইয়াছেন বলিয়া সকলেই যদি শিক্ষার বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী পরিত্যাগ করেন, তবে দেশের অজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইবেই। যেই স্কুল কলেজে পড়ে সেই দিগ্‌গজ পণ্ডিত হয়, তা নয়; কিন্তু যারা স্কুল কলেজে পড়ে তারা যে অন্যদের অপেক্ষা অনেকটা বেশী অগ্রসর, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেইরূপ এলোমেলো পথে না চলিয়া সকলেই যদি সাধনের বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অবলম্বন করে, তবে যে সমাজ সমগ্রভাবে বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা আধ্যাত্মিকতার পথে অধিকতর অগ্রসর হইবে এবং অধ্যাত্ম জগতেও ব্রজেন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র আবির্ভূত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিলে তাঁহার প্রকাশ ধরা পড়িবেই। তিনি যে অপার প্রেমে ইহারই মধ্যে রহিয়াছেন। প্রেমের তুলিকা না ধরিলে আকাশ কি এমন সুন্দর হইত? এ জগৎ তাঁর প্রেমের উচ্ছ্বাস, করুণার ধারা, আনন্দের প্রবাহ। বিশ্বসংসার যেন সে স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। স্রোত যখন বহিয়া যায়; সে স্রোতে যে পড়ে সেই নৃত্য করিতে করিতে ছুটিয়া যায়। যে স্রোতবিচ্ছিন্ন হয়, তার গতি রুদ্ধ হয়। সে শুষ্ক হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই আনন্দ-স্রোতে সকলেই গা ঢালিয়া চলিয়াছে। কেবল কি মানুষই স্রোতবিচ্যুত তৃণখণ্ডের ন্যায় শুকাইয়া মরিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে? না, তা নয়। মানুষের জন্য তিনি উচ্চতর নিয়তি রাখিয়াছেন। বহির্জ্জগতে কেবল আনন্দের প্রকাশ দেখি, আনন্দ দেখি না। যে আনন্দ তাঁহাতে, সে আনন্দ কেবল মানুষই পায়। মানুষকেই তিনি আপনার সহযোগী সহভোগী করিয়াছেন। তিনি মানুষকে যে আনন্দ দিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা এই বাহিরের আনন্দ নহে। তাহা ভিতরের আনন্দ—আত্মানন্দ! মানুষ যখন সজ্ঞানে তাঁহাতে অর্থাৎ সেই আনন্দস্বরূপে আত্মসমর্পণ করে, তখনই এই আনন্দ তাহার মধ্যে সংক্রামিত হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ অহঙ্কারের প্রাচীর তুলিয়া এই স্রোত হইতে সে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে,

বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী অবলম্বনীয়

তাই সে ত্রিতাপে দগ্ধ হইয়া কত কষ্ট পায়, তাই তো সে শোক-দুঃখে মুহ্যমান। তাই তো সে এই আনন্দের আস্বাদ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। আনন্দ তাহার কাছে ধরা পড়ে না। কিন্তু তিনি তো মানুষকে পরিত্যাগ করেন নাই। মানুষ অজ্ঞানে সজ্ঞানে তাঁহারই দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া চলিয়াছে। মানুষ যে ইতর প্রাণীর ন্যায় বাহ্যসুখে তৃপ্ত থাকিতে পারে না, তাহার কি কোন কারণ নাই? ক্ষুদ্র লইয়া সে সুখী হইতে পারে না কেন? কে তাহাতে বাধা উৎপন্ন করে? তাহার মধ্যে যে অনন্ত রহিয়াছেন—"যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি" ইহাই আত্মার অন্তর্নিহিত বাণী। ইহাই আবার মানবাত্মায় পরমাত্মার সাক্ষী। নদীর স্রোত আপন মনে চলিয়াছে সাগরপানে—বায়ুর আঘাতে তাহার উপরের স্রোত কখনও উত্তর কখনও দক্ষিণ দিকে যায় বটে, কিন্তু তাহার আভ্যন্তরীণ গতি অবিরাম সমুদ্রের মুখে চলিয়াছে, সাগরসঙ্গম ছাড়া তার আর বিশ্রাম নাই। মানুষেরও বাসনার স্রোত সেই অনন্তকেই খুঁজিতেছে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সেই অনন্তের দিকেই ছুটিয়াছে। দু'দিনের জন্য সে ধন জন মানের আতিথ্য স্বীকার করিতে পারে, কিন্তু তাতে তার পরিতৃপ্তি নাই। সে বাসনা কেবল "পরং প্রাপ্য নিবর্ত্ততে", কেবল পরমাত্মাকে লাভ করিয়াই নিবৃত্ত হয়। বাহির দেখিয়া মনে হইতে পারে একজন মানুষ সুখী, কিন্তু অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখ, সেখানে কি জ্বালা! নূতন স্থানে যাইয়া একবার এক নূতন বন্ধুকে সুখী বলিয়াই মনে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি অসুস্থ হইলে তাঁহার শয়নকক্ষে যাইয়া দেখিলাম, শয়ন করিলে যেখানে চক্ষু পতিত হয়, সেই স্থানে ফ্রেমে বাঁধান একটী **motto** রহিয়াছে—

মানুষ অনন্তকেই চায়

"এ বিপুল বিশ্বমাঝে পাঠাইলে যদি
চিরদিন কাঁদাতে আমারে,
তবে কেন এই ক্ষুদ্র এই তুচ্ছ হৃদি
গড়িলে না পাষাণের স্তরে?"

ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেল। হায়! যতদিন মানুষ তাঁকে না পায়, তার মত নিরাশ্রয় কে? যে অন্ধকারে থাকে তার কেবল আলোর জ্ঞান নাই তাহা নহে, অন্ধকারেরও জ্ঞান নাই। তাই, ক্ষুদ্র লইয়া ইতর প্রাণী সুখ পাইতে পারে; কেন না, অনন্ত তাহার নিকট আত্ম-প্রকাশ করেন নাই; সুতরাং ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রতাও তার নিকট প্রকটিত নহে। কিন্তু মানুষ অনন্তের খবর

পাইয়াছে বলিয়া তার কাছে ক্ষুদ্র সুখ তিক্ততা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্রে তার সুখ নাই। কিছুতে তার তৃপ্তি নাই, বিশ্রামের স্থান নাই। পশু-পক্ষীরও আশ্রয় আছে, মানব-সন্তানের মাথা রাখিবার জায়গা নাই। ভগবান্‌ই মানুষের একমাত্র বিশ্রামভূমি। তাঁকে আশ্রয় কর্‌তেই হবে। নতুবা নিস্তার নাই। যাঁহারা শক্তির অহঙ্কারে দূরে সরিয়া রহিয়াছেন তাঁরা থাকুন, কিন্তু যিনি 'নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ" বলিয়া এই মুহূর্ত্তেই তাঁহার শরণাপন্ন হইবেন, তিনি দেখিবেন, তাঁহার এই দুর্ব্বলতাই তাঁহার মহা-শক্তিতে পরিণত হইবে। শিশুর মত অসহায় কে? কিন্তু মাতৃক্রোড়ে সে এক অজেয় শক্তি অনুভব করে। ইহা বিশ্বাসের শক্তি। এই বিশ্বাসে মানুষও অজেয় শক্তি লাভ করে। এমন শক্তিমান্ কে আছেন, এই সংসার-সংগ্রামে আপনাকে কখনও অসহায় মনে করেন নাই? আজ যিনি দুর্জ্জয় বলে ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাকেই কি কা'ল হতাশার অশ্রুপাতে ধরাতল সিক্ত করিতে দেখিতেছি না? কিন্তু যিনি তাঁর আশ্রয় পাইয়াছেন বলিয়া অনুভব করিয়াছেন, তিনি ঐ মাতৃক্রোড়ে শিশুর ন্যায় নিশ্চিন্ত, নির্ভয়। যে সমস্ত দেবতা হইতে মানুষের ত্রিতাপ জন্মে, সে সকলকেই তিনি মায়ের ঘরের দাস দাসী বলিয়া জানিয়াছেন। এ সকল তাঁহারই পরিচর্য্যায় নিযুক্ত,—

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"

যিনি ইহা জানেন, তাঁর কি শান্ত সমাহিত ভাব। এরূপ কথিত আছে, এক সিপাহী সপরিবারে সমুদ্রপথে চলিয়াছেন, মধ্যসমুদ্রে মহা ঝড় তুফান উপস্থিত হইল। সিপাহী শান্তভাবে বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার পত্নী অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সিপাহীর এই শান্ত ভাব তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি ইহার মধ্যে স্বামীর মমতার অভাবই দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে অনুযোগ দিলেন। সিপাহী তখন তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া স্ত্রীর বক্ষে স্থাপন করতঃ বলিলেন, "তুমি কি ভয় পাইতেছ?" স্ত্রী বলিলেন "না"। "এই তীক্ষ্নধার অসি এখনই তোমার প্রাণ বিনাশ করিতে পারে—তবুও ভয় পাইতেছ না, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নয়"? স্ত্রী বলিলেন—"এই অসি যাঁহার হস্তে তিনি আমাকে ভালবাসেন, সুতরাং তাঁর হস্তে অমঙ্গল আশঙ্কা না করায় আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।" তখন ধার্ম্মিক সিপাহী গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"বিশ্বাস কর—এই ঝড়রূপ অসি যিনি উত্তোলন করিয়াছেন, আমাদের প্রতি তাঁহার

প্রেম অসীম—তাঁহার হস্তেও আমাদের কোনও অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই। মৃত্যুর দ্বার দিয়া আমরা যদি এই মুহূর্ত্তে পরলোকে যাইয়া উপনীত হই, তাহা হইলেও তাঁহার প্রেম আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছে। ভয় পাইও না।" তাঁহারই আশ্রয়ে অভয়-প্রতিষ্ঠা লাভ হয়, অচ্যুতপদ প্রাপ্তি ঘটে। সেখান হইতে আর বিচ্যুতি নাই। মা কখনও সন্তানকে ক্রোড় হইতে ফেলিয়া দেন না, তাঁহার বাহিরেও কোন শক্তি নাই, যে, আমাদিগকে তাঁহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইবে। এই বিশ্বাস ও নির্ভরই আনন্দের উৎস। এই আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হইতে হইবে।

২

নূতন ও পুরাতন

প্রাচীন ও নবীনের বিবাদ চিরন্তন। নূতন যে পুরাতনের গর্ভ হইতেই আসে পুরাতন তাহা বুঝিতে পারে না বলিয়াই মনে করে নূতন তাহার ঘরে অনধিকার প্রবেশ করে। পুরাতনের একটা দাবী আছে, তাহা নিঃসন্দেহ—কেন না, সে আছে! নূতনকে ঐ দাবী বসাইতে হইবে। কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না, যে নূতনও তো আসিয়াছে, তাহাকেও স্থান দিতে হইবে। সে যখন ঢুকিতে পাইয়াছে, তখন মনে করিতে হইবে তাহার ছাড়পত্র (ticket) আছেই। সুতরাং যতই অপ্রীতিকর হউক না কেন, তাহাকে এই চলন্ত গাড়ীতে স্থান দিতেই হইবে। ইহা না বুঝিয়াই প্রাচীন ও নবীনের বিবাদ আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। যাহা আজ নূতন, দু'দিন পরে সে পুরাতন হইতেছে, তখন আর কেহ তাহা লইয়া বিবাদ করিতেছে না। ইহাই তো সংসারের নিয়ম। যখন নূতন কিছু আসে বা কিছু নূতন বলিয়া মনে হয়, তখন ধীরভাবে দুই দিক্ বিচার করিয়া দেখিলেই সকল বিবাদের অবসান হয়। কিন্তু মানুষ প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ বিচারের দ্বারা পরিচালিত হয় না, সে ভাবের অনুসরণ করে। বিচার আসে পরে। কিন্তু যখন বিচার অবশ্যম্ভাবী রূপে আসে তখন নূতন অপেক্ষাকৃত পুরাতন হইয়া গিয়াছে, তখন আপনা হইতেই তাহার দাবী বসিয়া গিয়াছে, সুতরাং আর তাহাকে কে নাড়ে। রাশিচক্র (পৃঃ ৬০) যখন আসিল তখন সে নূতন। কিন্তু সে তো আসিয়াছে, তাহার তো স্থান করিতেই হইবে। স্থান করিতে যাইয়া সতী-নক্ষত্র (অভিজিৎ-Vega) কক্ষচ্যুত হইল। বিবাদ কিন্তু শেষ হইল না। নূতনকে প্রাণ দিতে হইল। সে কি একেবারে

মরিল? না। আসিয়াছে যখন তখন তো সে থাকিবেই। মাথা দিল বটে, কিন্তু থাকিল। নূতন আসিয়া পুরাতনকে বদ্‌লাইয়া দিয়া উভয়ে একত্র বাস করে, ইহা প্রকৃতির নিয়ম। এই নিয়ম যাঁহারা মানেন না, তাঁহারা পদে পদেই বিড়ম্বিত হন। যাঁহারা অতিমাত্র প্রাচীনতার পক্ষপাতী, নূতনের মধ্যে কোন সত্য থাকিতে পারে, এ কথা তাহারা বিশ্বাস করেন না বলিয়াই সর্ব্বদা লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া থাকেন। যদি কোন নূতন সত্যের কথা তাঁহারা শুনিতে পান, যতক্ষণ তাহার ব্যাখ্যা তাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে না পাইতেছেন, ততক্ষণ তাঁহাদের স্বস্তি নাই। এজন্য সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে অতিশয় হাস্যজনক অবস্থার মধ্যে পতিত হইতে হয়।

একবার একটী বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম। দেখি লোকে লোকারণ্য। পণ্ডিত মহাশয় একটী সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া যেই বলিলেন, যে হিন্দুরা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তির কথা অবগত ছিলেন, অমনি চারি দিক্ হইতে তুমুল করতালি-ধ্বনি উত্থিত হইল। আমি মূর্খতাবশতঃ প্রথমে এই হাততালির কোনই অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। অনেক ক্ষণ পরে হাততালি থামিল। এখন তাহার কারণ বুঝিতে পারিলাম, যে, প্রথমে হাততালির মধ্যেই বক্তা মহাশয় ব্যাখ্যা স্বরূপ বলিয়া দিয়াছেন, নিউটনকে যে মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কর্ত্তা বলা হয়, তাহা একটা মস্ত ভুল। সুতরাং শ্রোতৃবর্গ বহুক্ষণ করতালি থামাইবার সুযোগ পান নাই। সংস্কৃতে একটা কথা নিবদ্ধ থাকিলেই তাহা সহস্র সহস্র বৎসরেরও পুরাতন হয় না, তাহা যে নিউটনেরও পরে হইতে পারে, এ কথাও এই সুধীবর্গের মনেই আসে নাই। কাব্যে কোনও তত্ত্ব সম্বন্ধে একটা কল্পনামূলক ইঙ্গিত (Hypothesis) থাকিলেই যে তাহা বৈজ্ঞানিক সত্যের সমান সমাদর পাইতে পারে না, এ কথা যতদিন পুরাতনের প্রতি অন্ধভক্তি থাকিবে ততদিন বুঝিতে পারা যাইবে না। যাহা হউক, যেখানে এইরূপ গভীর গবেষণা সেখানে আমার মত মূর্খের থাকিয়া লাভ নাই ভাবিয়া চলিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু একটা চিন্তা আমাকে ছাড়িল না। প্রাচীন হিন্দুজাতি ছোটই হউন আর বড়ই হউন, একটা সভ্যতা যে বিকশিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পৃথিবী যে আকর্ষণ করে, এই তত্ত্ব তাঁহারা জানিতেন—এইটুকুর জন্য এত বড় একটা উচ্চ করতালি-ধ্বনি করিয়া আমরা সে সভ্যতার গৌরব বাড়াইলাম কি খর্ব্ব করিলাম, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

পুরাতনে আসক্তি

যদি প্রাচীন গ্রীক্‌দের কথা ভাবি, দেখিতে পাই তাঁহাদের গবেষণা এ বিষয়ে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল। তাঁহারা এতদূর পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়াছিলেন, যে কেন্দ্র ভেদ করিয়া পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যদি একটা ছিদ্র করিয়া তাহার মধ্যে একটী ধাতুগোলক নিক্ষিপ্ত হয়, তবে উহা একেবারেই কেন্দ্রে যাইয়া স্থির হইবে, না ঘড়ীর দোলকের মত দুলিতে দুলিতে ক্রমে দোলন-পরিধি কমাইয়া পরে স্থির হইবে। কিন্তু নিউটনের মহিমা ইহাতে একটুও খর্ব্ব হইতেছে কি? নিউটনের আবিষ্কার—পৃথিবীর যে মাধ্যাকর্ষণী শক্তি আছে তাহা নহে, কিন্তু পরমাণুতে পরমাণুতে যে আকর্ষণ কার্য্য চলিতেছে তাহা যে নিয়মে নির্ব্বাহিত হয়, সেই যে তিনটী নিয়ম— ইহার একটীও প্রাচীন কালে কোথায়ও আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রাচীনতার পক্ষপাতিগণ তারকেশ্বরে হত্যা দিয়াও প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে ইহার কোন ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইবেন না। সুতরাং দেখিয়া শুনিয়া বলিতে হয়, এই পুরাণ পাঠ যত দিন চলিবে, নূতন শিক্ষা কেবল উদরান্নের সংস্থান মাত্র করিবে। আর কিছু করিতে সমর্থ হইবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে লেক্‌চার বাড়াইয়া কোনই লাভ নাই, যদি প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে যে এই চিরন্তন বিবাদ তাহার কোন মীমাংসা না হয়। যাহা কিছু নূতন আসিবে তাহাতে জ্ঞান বাড়িবে না, পুরাতনের চস্‌মার ভিতর দিয়া যাইতে হয় বলিয়া সব ভেস্তে যায়।

কিছুদিন পূর্ব্বে লর্ড লিষ্টারের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র-চিকিৎসক; আজ সকলের নমস্য। পরে তাঁহার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া একজন মনস্বী বলিয়াছেন, যে, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে তাঁহার নব আবিষ্কারের জন্য তিনি যে ভীষণভাবে নিগৃহীত হইয়াছিলেন, এই সকল সম্মানের দ্বারা তাহার কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। তাঁহার এই নব আবিষ্কারের ফল গণনা করিয়া পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, যে, এক ঊনবিংশ শতাব্দীতে যত লোক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা অধিক লোক তাঁহার এই নূতন আবিষ্কারের জন্য বাঁচিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ

লর্ড লিষ্টার

সৈনিকেরা পরস্পরকে শত্রু মনে করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দুক কামান তরবারি বেয়নেটের সাহায্যে যত লোকের প্রাণনাশ করে, ডাক্তার মহাশয়েরা বন্ধুভাবে আমাদের ঘরে প্রবেশ করিয়া এক ক্ষুদ্র ছুরিকার সাহায্যেই তাহার দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিক লোককে যমরাজার প্রজা করিয়া ছাড়িয়া দিতেন। যে সত্য গ্রহণ করা মাত্রই

এমন প্রত্যক্ষ সুফল প্রসব করিল তাহাও নূতন বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল। সত্যটীও এমন কিছু শক্ত নয়, যে, বুঝা যায় না। লিষ্টার বলিয়াছিলেন—অস্ত্রপ্রয়োগের পূর্ব্বে অস্ত্রখানা বিশেষভাবে পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। কোনও বিদ্বান্ ব্যক্তি বলিয়াছেন, কেন যে আমাদের বাপ পিতামহ এমন সোজা কথাটা বুঝিলেন না, আমরা তাহাই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। না বুঝিবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। জ্ঞানভাণ্ডারের দরজা প্রাচীন-কালে খুলিয়া প্রাচীন কালেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে—সুতরাং নূতন জ্ঞান, নূতন সত্য এ সব স্ববিরোধী কথা! যদি অস্ত্র-চিকিৎসায় ধোয়াপুছাটা এতই ভাল হইবে, তবে উহা প্রাচীনেরা বলিয়া যান নাই কেন? তাঁহারা যখন বলিয়া যান নাই, তখন বুঝিতে হইবে উহা ভাল নয়। যাহা কিছু ভাল তাহা প্রাচীন কালেই হইয়া গিয়াছে।

এখন মিউনিসিপ্যালিটীর প্রসাদে সহরে সহরে রাস্তায় আলোর বন্দোবস্ত হইয়াছে, আবর্জ্জনা দূরীকরণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহার কিঞ্চিন্মাত্র ইতর বিশেষ হইলে এখন আমরা কত কালি ও কাগজ এক মুহূর্ত্তে খরচ করিয়া ফেলি। আমরা ভাবিতে পারি না, ইহা না হইলে আবার মানুষের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে। কিন্তু সহরের সেরা লণ্ডনে যাঁহারা প্রথম বাতি দেওয়ার কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন, কেবল পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যফলেই তাঁহাদের মস্তক তৎক্ষণাৎ স্কন্ধ-বিচ্যুত হয় নাই। এই রাস্তায় এই সনাতন অন্ধকারের মধ্যে প্রাচীনেরা মনের সুখে চলাফেরা করিতেন, তোমরা এমনই "বাবু" হইয়াছ, যে, আলো না হইলে চলিতে পারিবে না! এই মঙ্গলকর পুরাতন প্রথা পরিত্যাগ করিয়া তোমরা রাস্তায় আলো জ্বালিবে, তাহা হইতেই পারে না। 'চাই না তোমাদের আলো, তোমাদের আলো তোমাদের থাক্' বলিয়া প্রাচীনেরা নবীনকে উপহাস করিয়াই মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন। বাক্ল বলেন, কোন সময়ে স্পেনের রাস্তায় পুরুষানুক্রমে বহু আবর্জ্জনা জমিয়া গিয়াছিল। দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ নব্যদল এই সনাতন ময়লা অপসারণের প্রস্তাব উপস্থিত করেন! আর যায় কোথায়? প্রাচীনের দল গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। কি এত বড় আস্পর্দ্ধা! বাপ-পিতামহের আমল হইতে এই আবর্জ্জনা সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, ইহা যদি ভাল না হইবে, তবে তাঁহারা ইহা পরিষ্কার করিলেন না কেন? ইহা কিছুতেই সরাইতে দেওয়া হইবে না। এই রাস্তা পরিষ্কার লইয়া স্পেনে

রাস্তার আলো ও আবর্জ্জনা

কত মাথা ভাঙ্গিল, কত রক্তারক্তি হইল! ইহার অন্তর্নিহিত যুক্তি এই, যে সত্য নূতনে নাই, সত্য পুরাতনে।

তাই নূতনে বিরাগ

সর্ব্বদাই শুনিতে পাই, ব্রাহ্মেরা আগে যেমন ভাল ছিল, এখন আর তেমন নাই। সে দিন এই কথা হইতেছিল—একজন প্রৌঢ় ব্রাহ্ম বলিলেন, যে, তিনি ২৫ বৎসর ঐ কথা শুনিতেছেন। পক্ককেশ কোন অতি বৃদ্ধের মুখেও শুনিয়াছি, তাঁহারাও চিরদিন ঐ আক্ষেপই শুনিয়া আসিয়াছেন। কাগজপত্রে কিন্তু অন্যভাব দেখিতে পাই। এখনও যে সমস্ত গণনীয় ব্রাহ্মের মৃত্যু হইতেছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে যে প্রশংসাবাদ পত্রস্থ হয়, ৫০ বৎসর পূর্ব্বেকার ব্রাহ্মদিগের মৃত্যু সময়ে যে প্রশংসা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহা একই। ইহার অর্থ কি এই, যে মানুষ মরিলেই পুরাতনের দলে যায়, সুতরাং ভাল। যাহা হউক, এই আক্ষেপের মূলেও ঐ একই যুক্তি। পুরাতনই সব ভাল, তাই হালের ব্রাহ্মদের অপেক্ষা সাবেক ব্রাহ্মেরা ভাল ছিল। এখন সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়—আগের মানুষ ছিল ভাল, ২৫ বৎসর পূর্ব্বেও ঐ কথাই ছিল, ৫০ বছর পূর্ব্বেও তাই। এইরূপে আর একটু এগিয়ে গিয়ে দেখিব, ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বেকার ব্রাহ্মেরা আরও ভাল—রাজা রামমোহন রায় নিজেই যখন তাঁহার সমসাময়িকদিগের নিকট 'ভাল'র সার্টিফিকেট পান নাই—* কেন না, যত পুরাতন তত ভাল!

৩

ব্রহ্মোপাসনা ও কার্য্যগত জীবন

এই যে তুলনায় আধ্যাত্মিকতার অভাবের কথা শুনা যায়, ইহার মধ্যে কি কিছু সত্য আছে? ইতিপূর্ব্বে কোন সময়ে ব্রাহ্মসমাজে বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা আধ্যাত্মিকতা বেশী ছিল কি না সে বিষয়ের সাক্ষ্য দিতে আমি অসমর্থ। তবে আধ্যাত্মিক জীবনসম্পন্ন ব্যক্তি-বিশেষ ছিলেন তাহা বুঝা যায়। কিন্তু তাহা সমাজের আধ্যাত্মিক জীবন নহে। সেরূপ জীবনসম্পন্ন মানুষ যে ব্রাহ্মসমাজে এখনও নাই, তাহা বলিতে পারি না। কেন না, মৃতদিগের গুণগ্রাম যেমন চোখে

* "He (Rammohun) is said to be very moral; but is pronounced to be a most wicked man by the strict Hindoos", Baptist Missionary Periodical Acount for the year 1816.

পড়ে, জীবিতদিগের কথা তেমন ভাবে আমরা বিচার করিতে সমর্থ হই না। পুরাতনকে মানুষ নেক্‌নজরে দেখে, তা পূর্ব্বেই বলেছি। পরবর্ত্তী বংশীয়েরা যাঁহাদিগকে আধ্যাত্মিক জীবন-সম্পন্ন সাধক বলিয়া পূজা করিবে, আমরা, হয় তো তাঁহাদিগকে গ্রাহ্যই করিতেছি না। কেন না, দোষ গুণ লইয়া তাঁহারা সর্ব্বদা আমাদের চোখের সম্মুখে রহিয়াছেন। একটা কথা ভুলিলে চলিবে না। Apostolic যুগে যাঁহারা মহাপুরুষ-সংসর্গে ভাবের স্রোতে ভাসিলেন, ব্রহ্মসাধনের দিক্ হইতে তাঁহাদের মধ্যে খাঁটি আধ্যাত্মিকতা কতটুকু তাহা অবিচারে নির্ণীত হইতে পারে না। যাহা হউক, আমাদের উপাসনা-বিহীনতাই এই অনাধ্যাত্মিকতার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে। আমার মনে হয়, অনাধ্যাত্মিকতা আমাদের উপাসনা-বিহীনতার কারণ, এই কথা বলিলে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার পক্ষে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হয়। এই উভয়ের মধ্যে যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া রহিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। উপাসনা বলিতে প্রকৃত উপাসনা বুঝিতে হইবে -- যে উপাসনা ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মসংস্পর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। অথবা যাহার আয়োজন ব্রহ্মসহবাসের ঐকান্তিক কামনা হইতে উদ্ভূত, অথবা ব্রহ্মবিরহের তীব্র যাতনা হইতে সঞ্জাত। নতুবা ব্রাহ্মসমাজে 'মামুলি' উপাসনার কোনও অভাব হইয়াছে, এ কথা আমি স্বীকার করি না। কোনও নূতন তত্ত্ব, কোনও নূতন ভাবের আবির্ভাব ছাড়াই ব্রহ্মসঙ্গীতের কলেবর যেরূপ অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতেই বুঝা যায় যে আবৃত্তির উপাসনার কোনও অভাব নাই। মানুষ আধ্যাত্মিক জীব, তাহার পক্ষে সম্যক্ আত্মদৃষ্টির অভাব, জীবব্রহ্মের প্রকৃত সম্বন্ধের সুস্পষ্ট ধারণার অভাবই তাহার পক্ষে অনাধ্যাত্মিকতা। এই ধারণার, এই আত্মজ্ঞানের অভাবেই উপাসনা প্রকৃত উপাসনা হয় না। বাহির হইতে ফুলচন্দনের পূজা, আর আধ্যাত্মিকতা-বিহীন মামুলি উপাসনায় পার্থক্য খুব কম। সেই জন্যই ব্রহ্মোপাসক সমাজে ব্রহ্ম স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন না। নতুবা দশ বিশ বছরের উপাসনার পরেও জীবন তেমন পরিণত হইতেছে না, ইহার অর্থ কি? জল-সংযোগে চাউল অগ্নির সমীপবর্ত্তী হইল অথচ চাউল চাউলই রহিল ভাত হইল না, ইহা যেমন অসম্ভব, উপাসনা-যোগে জীব ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী হইল অথচ ব্রহ্মতেজ জীবনে প্রবেশ করিল না, ইহাও তেমনি অসম্ভব, অথবা বেশী অসম্ভব। আমাদের অধিকাংশ উপাসনা উপাসনাই নয়, অথবা আমাদের অনেকের উপাসনা উপাসনার বিদ্রূপ মাত্র। তাই এই দুর্দ্দশা। আমাদের উপাসনা

ব্রহ্মের সমীপবর্ত্তী হওয়া নয়, কতকগুলি শ্রুতকথার পুনরাবৃত্তি মাত্র। বড় জোর, কতকগুলি বহিরাগত ভাবের মানসিক ব্যায়াম, অথবা অন্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত কতকগুলি চিন্তার অনুশীলন এবং ভাবযোগে তজ্জনিত আনন্দের উপভোগ। আত্মদৃষ্টি ও ব্রহ্মদৃষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত যে উপাসনা, তাহা আমরা কি পরিমাণে অনুশীলন করিতেছি, তাহা যদি ফলের দ্বারা বিচার করিতে যাই তবে নিশ্চয়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইবে, যে সে উপাসনার একান্ত অসদ্ভাব আমাদের মধ্যে রহিয়াছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর উপাসনা চলিতেছে, কত উৎসব আসিতেছে, কত উৎসব যাইতেছে, কিন্তু দাঁড়াইতেছে কি? আমাদের উপাসনায় যে কপটতা আছে তাহা আমি কখনও স্বীকার করি না, বরং অকপট নিষ্ঠাই আমাদের বিফলতার অন্যতম কারণ, তাহাই আমার ধারণা। বিশ বছর যে বস্তুটির অনুসরণ করিতেছি, ফল লাভ হইতেছে না দেখিয়াও নিষ্ঠা বিচলিত হইতেছে না, বিচার উপস্থিত হইতেছে না, আত্মপরীক্ষার দ্বারা আবার গোড়াটা পরীক্ষা করিবার আকাঙ্ক্ষা হইতেছে না, ইহাই কি আমাদের নিষ্ফলতার কারণ নহে? আধ্যাত্মিক দৃষ্টি-হীনতা বশতঃ আমরা নিষ্ফল উপাসনার দাস হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের আত্মপরীক্ষার বল নাই, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" এ কথা ভুলিয়া গিয়াছি। এই নিষ্ফলতার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি খুলিবার আয়োজন আমাদের সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য। এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা বলিবেন, ও সব কচ্ কচি ছাড়িয়া দিয়া নিষ্ঠার সঙ্গে উপাসনা কর, সাধন ভজন কর, তাহা হইলে সব দুর্দ্দশা ঘুচিয়া যাইবে। তাঁহারা দেখিয়াও দেখিতেছেন না, যে একজন লোক বিশ বছর নিষ্ঠার সঙ্গে উপাসনা করিয়াও পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করিলেন না কেন? যেখান হইতে উপাসনা আরম্ভ করিতে হইবে, সেখানে যে উপাসনার আগেই পৌছিতে হইবে, এ কথাটা ভুলিলে চলিবে কেন? নৌকার দড়ী না খুলিয়া সমস্ত রাত্রি নৌকা বাহিলে কখনও এক পদও অগ্রসর হওয়া যায় না, নাবিকগণের যতই নিষ্ঠা থাকুক্ না, ও পারে যাইবার যতই ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ কর না কেন, তোমার সাধন ভজনে যতই নিষ্ঠা থাকুক্ না, ভ্রান্ত পথে চলিলে ফল হইবে না। আমাদের উপাসনা-নৌকা যে কিয়ৎ

বিফলতার কারণ

পরিমাণে ঐ কল্পিত নৌকার অবস্থা প্রাপ্ত, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রাচীন ব্রহ্মবাদিগণ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার পূর্ব্বে সাধন-চতুষ্টয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন, তাহা না হইলে ফল হইবে অজ্ঞেয়তা, নাস্তিকতা, সন্দেহ প্রভৃতি কুসংস্কার। আধুনিক ব্রহ্মবাদিগণের জানা উচিত, উপাসনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কতকগুলি সাধন চাই, নতুবা উপাসনার নিষ্ফলতা অবশ্যম্ভাবী এবং এই নিষ্ফলতা হইতে উপাসনায় অমনোযোগ, তার পর উপাসনায় অবিশ্বাস এবং পরিণামে নাস্তিকতা আসিবে। প্রথম হইতে জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ-বিষয়ক সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ না করিলে উপাসনায় প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে না। দুই একটী বিশেষানুগৃহীত জীবনের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের মত অল্পধী সাধারণ ব্যক্তিদিগের কথা চিন্তা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, যে ব্রহ্মজ্ঞানের পথ ধরিয়া না গেলে ব্রহ্মোপাসনায় ফল হইবে না। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে দু'চার দিনের জন্য চটক্ দেখাইয়া সরিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্তের দ্বারা এ কথাটা বেশ উপলব্ধি করা যাইতে পারিবে। যত দিন ভাব ছিল, তত দিন সাধন ভজন ছিল। যেই ভাব চলিয়া গেল, ধরিবার ছুঁইবার কিছু রহিল না। চোক বুজিলে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন সরিয়া পড়া ছাড়া আর কি গতি আছে? যাঁহাদের সরিয়া পড়িবার উপায় নাই তাঁহাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। প্রথম স্রোতের সঙ্গে একটা ভাবের বন্যা আসে, কিন্তু সে ভাব কখনও চিরস্থায়ী হয় না। এই ভাবের উপরেই যাঁহাদের নির্ভর তাঁহারা অবশ্য কৃপাপাত্র। তাই পূর্ব্ব হইতেই ভিত্তি দৃঢ় করিতে হইবে, নতুবা উপাসনা টিঁকিবে না।

ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা

বাইবেল্ বলেন, পবিত্রাত্মারাই ধন্য, কেন না, তাঁহারা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিবে। কিন্তু এই পবিত্রতা কোন্ শ্রেণীর পবিত্রতা? বর্ত্তমান সময়ে সভ্য জীবন যাপন করিতে হইলেই, পবিত্র জীবন যাপন করিতে হয়। এ পবিত্রতা বহির্ম্মুখীন, ইহার দৃষ্টি বাহিরের দিকে—লোকে কি বলিবে? এ পবিত্রতা আবেষ্টনের সৃষ্ট। আমি যে অন্যায় কাজ করিয়া অনুতপ্ত হইলাম, ইহার মধ্যে কতটুকু পার্শ্ববর্ত্তী-দিগের নিকট হীন হইলাম বলিয়া মনোকষ্ট, আর কতটুকু প্রকৃত অনুতাপ—আধ্যাত্মিকতা হইতে বিচ্যুত হইলাম বলিয়া অনুতাপ, তাহা আত্ম-পরীক্ষার বিচারের বিষয়। দুইটিরই বাহ্য প্রকাশ এক হইতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক

বিশুদ্ধতার প্রকারভেদ

জীবন দানে উভয়ের উপযোগিতা এক নহে। "জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধ-সত্বস্তুতস্তুতং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" মু, ৩।১।৮—বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে পায়—কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের বলে যে হৃদয় বিশুদ্ধ সেই দেখিতে পায়, অন্যে নহে। এই ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মপরীক্ষার অভাবে আমাদের উপাসনা সফল হইতেছে না। আমাদের ত্রুটি কোথায় তাহাই এখন আলোচনা করা যাইবে।

(৪)

"মোক্ষসাধন-সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরিয়সী", এই শ্লোকার্দ্ধ যখন আচার্য্য-শঙ্কর প্রণীত বলিয়া শুনিয়াছিলাম, তখন মনে হঠাৎ একটা খট্‌কা লাগিয়াছিল। কেন না, প্রতিপক্ষ বৈষ্ণবও তো বলিতেছেন, "জগতের সার ভক্তি মুক্তি তার দাসী।" তবে উভয়ের পার্থক্য কোথায়? অনুসন্ধানে পার্থক্য আপনা হইতেই বাহির হইয়া পড়িল। শ্লোকের অপরার্দ্ধ পাঠ করিয়া বুঝিলাম, এ ভক্তির কপালে 'রসকলি' কাটা নাই; ইনি গৈরিকবসনা, ভস্মাচ্ছাদিতা। বৈষ্ণবী ভক্তি—ভগবানের প্রতি মনের অবিচ্ছিন্ন গতি, নদীর যেমন সমুদ্রের দিকে—মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ। কিন্তু এ শঙ্করী ভক্তি "স্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে।" সুতরাং নাম সাদৃশ্য থাকিলেও রূপ সাদৃশ্য নাই, বিষম বস্তুগত বৈসাদৃশ্যই রহিয়াছে। একজন—উদাস, উদাস গম্ভীর স্বভাব, উদাস, উদাস নয়নের ভাব। আর একজন—স্বচ্ছ রূপশোভা উদারপ্রকৃতি, প্রসন্ন কপালে আনন্দের জ্যোতি! নাম-সাদৃশ্য থাকিলেও যেমন বস্তুগত বিভিন্নতা থাকিতে পারে, অপর পক্ষে আবার, বিভিন্ন নাম একই বস্তুকে লক্ষ্য করিতে পারে। ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে বিচার করিতে যাইয়া আমরা যেন এ কথাটা ভুলিয়া না যাই। ব্রহ্মের উপাসনা ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী হওয়া; ব্রহ্ম বাহিরের বস্তু নহেন, তিনি আমার মনের একটা বিশেষ ভাবও নহেন, সুতরাং ব্রহ্মোপাসনা উজ্জ্বল অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া হইতেই পারে না। "তুমি আর আমি মাঝে কিছু নাই;" ব্রহ্মসম্বন্ধে এ কথার সার্থকতা লাভ করিতে হইলে, আত্ম-সাক্ষাৎকার ভিন্ন ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভই হইতে পারে না। পৌত্তলিক আপনার ইষ্টদেবকে বাহিরে দেখিয়া অর্চ্চনা করেন, কিন্তু **দেখিয়া** অর্চ্চনা করেন। ব্রহ্মদর্শন না হইলে ব্রাহ্মের পক্ষে তাহার ইষ্টদেবের অর্চ্চনা বাহিরের দেবতার অর্চ্চনা তো হইলই, বেশীর ভাগ না

প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা কিসে হয়

দেখিয়া উদ্দেশ্যে অর্চ্চনা হইল ; সুতরাং পৌত্তলিকের উপাসনারও এক কাঠি নীচে পড়িয়া গেল। এরূপ উপাসনাতেও ভাব ভক্তির উচ্ছ্বাস হয়, অনুতাপের আগুন জ্বলে, কৃতজ্ঞতার অশ্রুজলে বক্ষ ভাসিয়া যায় ; ইহা পৌত্তলিক ও ব্রহ্মবাদী উভয়েরই হইতে পারে—বরং পৌত্তলিকের বেশী হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু উহা ব্রহ্মোপাসনা নহে ; কেন না, ব্রহ্মদর্শন ব্রহ্মোপাসনার ভিত্তি। সেই জন্যই উপাসনার প্রারম্ভে উদ্বোধন প্রয়োজন। যখন দেখি উপাসক আরাধনা আরম্ভ করিয়াও বলিতেছেন, "তুমি কোথায়, তোমাকে কে জান্‌তে পারে," ইত্যাদি, তখন বুঝি যে উদ্বোধন হয় নাই, অসময়ে আরাধনা আরম্ভ হইয়াছে। আর যখন আরাধনার পরে সঙ্গীত হয় "সংশয় তিমির মাঝে না হেরি গতি হে" তখন মনে হয় এত বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া এতক্ষণ কি করিলাম ! এ সকল অনর্থের কারণ এই, যে আমাদের উদ্বোধনের যে অতি উচ্চ স্থান, তা আমরা এখনও সম্যক্ ধারণা করিয়া উঠিতে পারি নাই। 'যেন তেন প্রকারেণ' উদ্বোধন শেষ করিয়া আমরা আমাদিগকে আরাধনার যোগ্য মনে করি। সেই জন্যই আমাদের আরাধনা পাকা হয় না। প্রবুদ্ধ আত্মাই উপাসনার অধিকারী। যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান আছে, তিনিই প্রবুদ্ধ। উদ্বোধনের উদ্দেশ্য প্রবুদ্ধ করা নহে, কিন্ত প্রবুদ্ধ আত্মার উপর যে সংসারের আবরণ পড়ে তাহা অপসারিত করা। যাঁহার ধর্ম্ম ও সংসার এক হইয়াছে, যাঁহার "উত্তমা সহজাবস্থা" লাভ হইয়াছে, তিনি সর্ব্ব কার্য্যে, সকল ঘটনায় ব্রহ্ম দর্শন করিতেছেন ; তাঁহার উপাসনার আড়ম্বর প্রয়োজন নাই ; উপাসনা তাঁহার জীবনগত হইয়াছে, তাঁহার উপাসনা সর্ব্বকাল-স্থায়ী, সাময়িক ব্যাপার নহে, জীবনের সাময়িক অবস্থা নহে। তাঁহার সকল চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যে উপাসনা সাধিত হইতেছে। তিনি সর্ব্বদাই প্রবুদ্ধ এবং সর্ব্বদাই উদ্বুদ্ধ।

এরূপ কথিত আছে, যে রূপগোস্বামী একবার নবদ্বীপে আসিলে, সকলে তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। কিন্তু মানুষের যেমন স্বভাব, যাঁহাকে ভালবাসি তাঁহাকে সর্ব্ব বিষয়ে নিজের মতন দেখিতে ইচ্ছা করে। নতুবা ভালবাসা টেঁকে না। রূপগোস্বামী সাধারণ লোকের ন্যায় 'সন্ধ্যা' করিতেন না দেখিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে অনুযোগ দিলে, তিনি উত্তর দিলেন— "হৃদাকাশে চিদানন্দং সদা বিরাজিতং হি মে। উদয়াস্তে ন পশ্যামি কথং সন্ধ্যাং চরিষ্যেঽহম্"। তোমরা সূর্য্যের উদয়াস্তে সন্ধ্যা কর। কিন্তু আমার সূর্য্যের উদয়ও নাই অস্তও নাই, সন্ধ্যা করিবার অবসর আমার কোথায় ?

ব্রহ্মানন্দও বলিয়াছেন, "যোগীর পক্ষে একটা উপাসনার অবস্থা, একটা পৃথিবীর ব্যাপার তাহা নহে, সকলই ব্রহ্মস্থ ব্যাপার।" আচার্য্য শিবনাথও ঐ সাক্ষ্যই দিয়াছেন---"আরাধনাকে কোনও বিশেষ মুহূর্ত্তের বা বিশেষ শব্দের ব্যাপার মনে না করিয়া সমগ্র জীবনকেই আরাধনা করিতে হইবে (১ম খণ্ড, ধর্ম্মজীবন)। কিন্তু আমাদের যখন সংসার ও ধর্ম্ম এক হয় নাই, তখন আমাদের এই সাময়িক নির্দ্দিষ্ট উপাসনা নিতান্ত প্রয়োজন। আমরা যখন সংসারে যাইয়া ধর্ম্মকে ভুলি, তখন কাজেই মনকে রান্না ঘর হইতে ছিনাইয়া লইয়া ঠাকুর ঘরে আনিতে হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই, যদি রান্নাঘরে কখনও ঠাকুরকে না দেখিয়া থাকি তবে ঠাকুর-ঘরে আসিয়া অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখিব না। বিদ্যুতের আলো জ্বালিলে কি হইবে? যদি সংসারের নানা কার্য্যের মধ্যে ঠাকুরকে না দেখিয়া থাকি, তবে উপাসনা বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই হইবে না, তোতা পাখীর মত শুনা কথার আবৃত্তি মাত্র হইবে। জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে যদি ব্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে তবেই শ্রবণ মনন দ্বারা দৃষ্টি দৃঢ়তর করাই হইবে প্রথম প্রথম ব্রহ্মোপাসনার সার্থকতা। অবশ্য, এ কথাও স্বীকার্য্য যে জীবনের ঘটনাবলির মধ্যে ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য গুরূপদিষ্ট ও শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পন্থার অনুসরণ এবং স্বোপার্জ্জিত জ্ঞান ও স্বানুভূতির সাহায্য অপরিহার্য্য। লব্ধ জ্ঞান সংসারে সফলতা লাভ করিয়া স্মৃতিতে পরিণত হইবে এবং উপাসনাকালে এই স্মৃতিই ব্রহ্মকে ধরিয়া দিবে এবং সংসারে ব্রহ্মোপলব্ধির শক্তিকে বর্দ্ধিত করিবে। সুতরাং উভয়ে উভয়কে সাহায্য করিবে; ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াতে উভয়েই বলশালী হইবে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ রান্নাঘর হইতে ঠাকুর ঘরে এবং ঠাকুর ঘর হইতে রান্না ঘরে যাতায়াতের পর রান্নাঘর ও ঠাকুরঘরের পার্থক্য দূরীভূত হইবে, ধর্ম্ম ও সংসার এক হইয়া যাইবে। (১১শ অঃ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু যাঁহাদের তাহা হয় নাই, যাঁহাদের আত্মা সংসারে যাইয়া ধর্ম্মকে হারায়, তাঁহাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট উপাসনা অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং সেই জন্যই উদ্বোধন। উদ্বোধনের উদ্দেশ্য বিক্ষিপ্ত মনকে সংক্ষিপ্ত করা, ঈশ্বর-চরণে উপনীত হওয়া, তাঁহার সত্যতা উপলব্ধি করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, উদ্বোধনের এই মহদুদ্দেশ্য ভুলিয়া আমরা সে স্থানে এমন অনেক বিষয়ের অবতারণা করি যাহাতে বিক্ষিপ্ত মন আরও বিক্ষিপ্ত হয়। অনেক সময় আচার্য্য শেষে উপদেশ না দিয়া উদ্বোধনকে উপদেশে পরিণত করেন। মনে রাখিতে হইবে, ভাল কথা হইলেই সব সময়ে ভাল নয়।

উদ্বোধনের যাহা উদ্দেশ্য তাহা যে কোন ভাল উপদেশে সিদ্ধ হইতে পারে না। আম ও নারিকেল উভয়েই অতি পুষ্টিকর ফল, কিন্তু নারিকেল-সন্দেশ প্রস্তুত করিবার জন্য আম বাগানে গেলে চলিবে কেন? স্বস্থানচ্যুত হইলে অমৃতও বিষবৎ প্রতীয়মান হয়; আবার দেশ কাল পাত্র ভেদে প্রয়োগ করিতে পারিলে বিষও অমৃতের কার্য্য করে। যাহাতে মন ব্রহ্ম-সত্তায় নিমগ্ন হয় তাহাই উদ্বোধন। প্রাচীন ব্রহ্মোপাসনায় শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন উদ্বোধনের স্থানীয় ছিল। ব্রহ্মসত্তা-বিষয়ক শ্রুতি পাঠ বা শ্রবণ, তার পর মনন—তদর্থের পুনঃ পুনঃ আলোচনা এবং এই মননের ফলে ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি। রাজা রামমোহন রায় বলিয়াছেন, যে এইরূপ শ্রবণ মননের দ্বারা যখন প্রপঞ্চময় বিশ্বের প্রতীতির নাশ হইয়া ব্রহ্মসত্তামাত্রের স্ফূর্ত্তি থাকে তাহাই আত্ম-সাক্ষাৎকার। এই আত্ম-সাক্ষাৎকার যতক্ষণ না হইবে ততক্ষণ আরাধনা আরম্ভ হইতে পারে না। কেন না, আরাধনার ভাষা অপরোক্ষভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যাহাকে দেখিতেছি না, স্পর্শ করিতেছি না,, উপলব্ধি করিতেছি না, তাহার আরাধনা, হয় না। এই বৈদান্তিক উদ্বোধনের সঙ্গে নবপ্লেতনিক সাধকগণের সাধনার ক্রমের এক সুন্দর সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

উপাসনার ক্রম

মন প্রথমে বাহ্য জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকে, ইন্দ্রিয়ের অধীন থাকে। পরে জোর করিয়া সংযম বলে তাহাকে আত্মিক জগতে আনিতে হয়। সেখানে আসিলেও হইল না। সেখানেও বিষয়-প্রপঞ্চের মধ্যে ভেদ বুদ্ধি রহিল—জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের ভেদ, সুতরাং ব্রহ্মদর্শন হইল না। আমি জ্ঞাত, ব্রহ্ম জ্ঞেয়, যতক্ষণ এই জ্ঞান রহিল, ততক্ষণ আমি ব্রহ্মসাগরে ডুবি নাই, কেন না, জ্ঞেয় জ্ঞাতা অপেক্ষা ছোট। সুতরাং আমাকে এমন জায়গায় যাইতে হইবে যেখানে সকল ভেদ রহিত হইয়া ব্রহ্মসত্তা মাত্রের স্ফূর্ত্তি থাকে। ইহাই নিদিধ্যাসন বা ধ্যানের ঘর। শ্রবণে বাহ্য জগতের সঙ্গে সংস্পর্শ থাকে, মননে বাহ্য জগৎ অতিক্রম করি বটে কিন্তু সেখানেও বহুত্বের সংস্পর্শে মন বিক্ষিপ্ত হয়। তাই আরও উপরে ধ্যানের ঘরে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মসত্তা সাগরে আপনাকে ছাড়িয়া দেই, আত্ম-সাক্ষাৎকারের ভূমি লাভ করি। এই পর্য্যন্ত উদ্বোধন। আরও একটি কথা বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিতে হইবে—এই জগতের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে, ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্ব

জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। সত্তা মাত্রই আত্মাসাপেক্ষ। অনাত্ম-বস্তুর স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। যাঁহার উপর এই বস্তু সকল স্বীয় অস্তিত্বের জন্য নির্ভর করে, সেই জ্ঞান-বস্তুই, সেই আত্ম-বস্তুই ব্রহ্ম। আর সকলের বিলোপ কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু এই জ্ঞানবস্তুর বিলোপ কল্পনা করিতে পারি না। সেই জন্যই ব্রহ্মবস্তুর সম্বন্ধেই "সৎ" এই আখ্যা প্রযুক্ত হইতে পারে, তিনি "সত্যম্"। তাঁহাকে 'সত্যং' বলিয়া জ্ঞানে ধারণা করা, ইহাই ব্রহ্মোপলব্ধির আদ্যক্ষর; কিন্তু ইহাই শেষ নহে। অভিব্যক্তির নিয়মানুসারে ব্রহ্মোপলব্ধির আরও উচ্চতর অবস্থা সকল মানবাত্মার নিকট প্রকাশিত হয়। সৃষ্টির অস্তিত্বে যেমন জ্ঞান দেখিতে পাই, ইহার মূলে তেমনিই প্রেম প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞান তো সুন্দর অসুন্দর সকল বস্তুতেই আপনাকে সমানভাবে প্রাপ্ত হয়। একটী সুন্দর বস্তু পর্য্যালোচনা করিয়াও জ্ঞান যেমন পরিতৃপ্ত, অসুন্দর বস্তুতেও তেমনই। জ্ঞানের নিকটে ইহাদের উভয়েরই মূল্য সমান। কিন্তু জগৎ দেখিয়া মনে হয়, উহা সৌন্দর্য্যের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই সৃষ্টির যে দিকেই দেখি, দেখিতে পাই—সর্ব্ববিভাগেই অসুন্দরের স্থানে সুন্দর ফুটিয়া উঠিতেছে। এই সৃষ্টির আদর্শে সৌন্দর্য্য বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখিতে পাই। সৌন্দর্য্যের দিকে আত্মার নিরবিচ্ছন্ন গতিই যখন প্রেম এবং এই সৃষ্টিতে যখন সেই গতি অতি সুস্পষ্টভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সৃষ্টির প্রেরণায়, সৃষ্টির আদিতে প্রেম বর্ত্তমান, এবং যে অদ্বিতীয় মহান্ পুরুষ বিধাতারূপে এই সৃষ্টিকে পরিচালিত করিতেছেন, সৃষ্টির আদির এই প্রেম এবং অন্তের এই সৌন্দর্য্য তাহা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে। সুতরাং তিনি "শিবং সুন্দরম্।" এই যে "শিব সুন্দর" এর উপলব্ধি, ইহা সত্য স্বরূপের উপলব্ধি অপেক্ষা ব্রহ্মোপলব্ধির উচ্চতর সোপানে অবস্থিত। কিন্তু যাহার সত্য স্বরূপের উপলব্ধি হয় নাই, তাহার পক্ষে এই উচ্চতর অবস্থা লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানে যাঁহার ব্রহ্মোপলব্ধি হয় নাই, প্রেম ও সৌন্দর্য্যে ব্রহ্মোপলব্ধি তাঁহার পক্ষে অসম্ভব; অর্থাৎ ব্রহ্ম সম্বন্ধে Philosophic consciousness ব্যতীত Art consciousness সম্ভব নহে। এই জন্যই মনে হয়, ধ্যান ব্যতীত আরাধনা হইতে পারে না। আমাদের যে আরাধনা অনেক সময়ে কেবল বাগাড়ম্বরে পরিণত হয়, তাহার কারণ এই, যে আমরা সত্যস্বরূপের উপলব্ধি না করিয়াই আরাধনায় প্রবৃত্ত হই।

সৃষ্টির মূলে জ্ঞান ও প্রেম

যতক্ষণ "সকল ব্রহ্মময়" ধ্যানে এই ধারণা না হইতেছে, ততক্ষণ আরাধনা কথার কথা মাত্র। ব্রহ্মসত্তার অপরোক্ষানুভূতি ব্যতীত ব্রহ্মস্বরূপের আবির্ভাব হয় না। সুতরাং শিবসুন্দরের উপলব্ধি উচ্চতর অবস্থা হইলেও সত্য স্বরূপের উপলব্ধিই মূল ও আদি।

আত্মসাক্ষাৎকারই উদ্বোধন

সত্য-স্বরূপের উপলব্ধিই আত্মসাক্ষাৎকার।

যাহা হউক, এই আত্মসাক্ষাৎকারই উদ্বোধন। এইখানে আসিয়া সাধন প্রণালী জ্ঞান-মার্গে ও ভক্তি-মার্গে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। জ্ঞান-মার্গের সাধক ধ্যান হইতে সমাধিতে উপনীত হইবেন। কিন্তু ভক্ত সে পথে না যাইয়া আরাধনাযোগে ব্রহ্মের বহুমুখ সৌন্দর্য্যের দিকে ছুটিবেন। ইষ্টদেবের বিচিত্র স্বরূপ তাঁহার হৃদয়ে ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। তিনি ঈশ্বরের জ্ঞান প্রেম পুণ্যের উজ্জ্বল ছবি সাক্ষাৎভাবে দর্শন করিবেন এবং চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রজল যেমন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তেমনি ভক্তের ভাব সাগর আপনা হইতেই উথলিয়া উঠিবে। সে জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে না। এখন অনেক সময় শুনিতে পাওয়া যায়, যে আরাধনা সরস হইল না। আমার মনে হয়—আরাধনা সরস না হওয়ার অর্থ আরাধনা না হওয়া। সকল সৌন্দর্য্যের আদর্শকে উপলব্ধি করিলাম, অথচ আমার হৃদয়ে ভাবের সঞ্চার হইল না, ইহা বলাও যা, আর আগুনের কাছে গেলাম শরীর উত্তপ্ত হইল না, বারি পান করিলাম তৃষ্ণার নিবারণ হইল না, সূর্য্যোদয় হইল পৃথিবী আলোকিত হইল না, বলাও তাই। আমাদের যে আক্ষেপ—আরাধনায় ভাব হইল না, ইহার মধ্যে একটা ভ্রান্তি আছে। আমরা চাই ভাব, ভাবেই আমাদের হৃদয় তৃপ্ত হয়। ভাবটা যে প্রকৃত আরাধনার অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। সুতরাং আরাধনায় ভাব হইল না দেখিয়া আরাধনা ছাড়িয়া ভাবোদ্রেকের যে সকল সহজ পন্থা আছে—যথা, নাম জপ, সঙ্গীত সংকীর্ত্তন প্রভৃতি তাহারই অনুসরণ করি, আরাধনা পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। ব্রহ্ম-দর্শন ব্রহ্ম-সম্ভোগ উদ্দেশ্য না হইয়া ভাব উদ্দেশ্য হওয়ায় আমাদের ধর্ম্ম-জীবনের গোড়া আল্গা হইয়া পড়িতেছে। যেরূপ দাঁড়াইতেছে, তাহাতে শীঘ্র সাবধান না হইলে ব্রহ্মোপাসনার বিশেষত্ব বিলুপ্ত হইবে, এবং ইহার সঙ্গে বিকৃত ও পথভ্রষ্ট বৈষ্ণব-সাধনের কোনও পার্থক্য থাকিবে না। (৩০৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

বলিয়াছি শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন উদ্বোধনের অঙ্গ—ব্রহ্মসত্তার প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত উদ্বোধন শেষ হইতে পারে না। যতক্ষণ তাহা না হইতেছে, ততক্ষণ উদ্বোধনই চলিবে।

আরাধনা

তার পর ব্রহ্মসত্তা-সাগরে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া আরাধনা আরম্ভ হইবে। মনে রাখিতে হইবে—আরাধনা ক্ষুধা নয়, আহার ; তৃষ্ণা নয়, জলপান ; আকাঙ্ক্ষা নয়, লাভ , ব্যাকুলতা নয়, সম্ভোগ (**সাধনবিন্দু** দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ব্রহ্মদর্শনে আরাধনার আরম্ভ। কাজেই, ধ্যানের দরজা দিয়া দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে হইবে। আরাধনার যে বীজ মন্ত্র তাহাও সেই পথই প্রদর্শন করিতেছে। "সত্যং" আগে ; তার পর স্বরূপ। সত্য স্বরূপের উপলব্ধি—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই ধারণাই ধ্যান। ইহাতে অমনোযোগী বলিয়াই আমাদের আরাধনা হয় না, আমাদের বাক্যলহরী সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে ছুটে, কোন বাধা মানে না। এমন কি একজন জ্ঞানী বা ভক্তের সম্মুখীন হইলে আমাদের ভাষা যতটা সংযত হয়, ভগবানের সম্মুখে তাহাও হয় না। ইহার অর্থ এই, যে আমাদের আরাধনা অকালে আরম্ভ হয়, ঈশ্বরের বিদ্যমানতা অনুভূত হইবার পূর্ব্বেই আরম্ভ হয়। তাই ভাষায় মধ্যম পুরুষ থাকিলেও পরম পুরুষ আমাদের জ্ঞানের মধ্যে থাকেন না। কাজেই, আমরা আরাধনার নামে কখনও বা তাঁহাকে দুটি ঐতিহাসিক তত্ত্বই শুনাইয়া দি, কখনও বা দুটি শ্লোক আওড়াই, কখনও বা অতএব, সুতরাং যেহেতু যোগে যুক্তি তর্ক উপস্থিত করি, কখন কখনও বা ঈশ্বরের অস্তিত্বই প্রমাণ করিতে বসিয়া যাই। অনেক সময় এমন হয়, যে আরাধনার নামে প্রশ্ন করিয়া, ধমকাইয়া ঈশ্বর-নামক কোনও অদৃশ্য অজ্ঞাতকুলশীল পদার্থটীকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলি। তার পর সময়ে সময়ে এমন আত্মহারা হই এবং যা তা বকিতে থাকি, যে উদ্বোধন কি আরাধনা, প্রার্থনা কি উপদেশ তাহা আগন্তুকের পক্ষে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। আরাধনার মধ্যে 'তুমি অজ্ঞেয়' 'তোমায় জানা যায় না' ইত্যাদি কথার অবতারণা হয়। মানব জ্ঞান সসীম, সে ক্ষুদ্র বস্তুই পূর্ণরূপে জানে না, ব্রহ্মকে পূর্ণরূপে জানার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কিন্তু যখন কোন বস্তুর সম্মুখীন হই, তার কি জানি না সে কথা মনে আসে না, যেটুকু জানি তাই ভাবি, তাতেই মজি। পদ্মটির কাছে গিয়া তার যেটুকু ধরিয়াছি তাহাতেই প্রাণ ভরপূর হইয়া উঠে, তার অজ্ঞেয় দিকের কথা মনেই থাকে না। পরিচিত মানুষের বেলাও তাই। কেবল ব্রহ্মের নিকটে আসিয়াই

অজ্ঞেয়তার কথা মনে পড়ে কেন? জ্ঞানের মধ্যে কিছু না থাকাই কারণ—আমরা বস্তুর সম্মুখীন হই না। এ সব গোলযোগের কারণ একটী মারাত্মক ভ্রম,—আরাধনা স্বরূপ দর্শন না হইয়া স্বরূপ বর্ণনাতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু যদি ধ্যানের ঘরে উপাসনা আরম্ভ হইত, যদি ব্রহ্মদর্শন লক্ষ্য স্থলে থাকিত, তবে আরাধনা আপনিই হইয়া যাইত। ভক্তিপন্থীর পক্ষে আরাধনা অপেক্ষা স্বাভাবিক আর কিছুই নাই। আমরা গোড়ায় ভুল করি তাই এই বিপদ উপস্থিত হয়। ঐ ভ্রম সংশোধিত না হইলে আরাধনা সরস ও স্বাভাবিক হইবে না। ব্রহ্মে নিমগ্ন না হইলে আরাধনা হইবে কেন? শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে, যে রাসক্ষেত্রে প্রধানা গোপী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অন্তর্হিত হইলে অন্যান্য গোপীরা তাঁহাকে খুঁজিয়া না পাইয়া বলিয়াছিলেন "অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ"। রাসের লৌকিক অর্থ অধর্ত্তব্য। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় যে অর্থ করিয়াছেন তাহার সঙ্গে ধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই। উহার কোনও আধ্যাত্মিক অর্থ আছে কি না, তাহা এস্থলে বিচার্য্য নয়। তবে এ কথা বুঝিতে পারি, যিনি "ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ" এর আরাধনা করিতেছেন, তাঁহাকে যে বাহিরের লোকে খুঁজিয়া পাইবে না, তাহা নিশ্চিত। উপাসক যখন বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তখন যে তিনি আরাধনা করিতেছেন না, ইহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং আরাধনার পূর্ব্বে ধ্যান চাই, ব্রহ্মে নিমগ্ন হওয়া চাই। ধ্যানের পর যেমন আরাধনা সহজেই আসিবে, আরাধনা প্রকৃত হইলে প্রার্থনাও তেমনি স্বাভাবিক ভাবেই আসিবে, কোনও নিয়মের বাধা মানিবে না। আরাধনায় ব্রহ্মের বহুমুখ সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া সাধক আত্মহারা হন, ভাবোচ্ছ্বাসে ভাসিয়া যান, তিনি আপনাকে সে সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডুবাইয়া দেন। কিন্তু এ ভাব সর্ব্বক্ষণ থাকে না। ভাবের উচ্ছ্বাস কমিয়া আসে, সাধক আপনাতে ফিরিয়া আসেন। এতক্ষণ তিনি যে প্রেম-পুণ্যের সংস্পর্শে ছিলেন, এখন সেই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের সঙ্গে তাঁহার প্রকৃত জীবনের তুলনা আসিয়া পড়ে, তিনি আপনার মলিনতা দেখিয়া একেবারে অধীর হইয়া উঠেন। তখন কে প্রার্থনাকে আট্‌কাইয়া রাখিবে। তখন সাধক হৃদয়ের আবেগে ইষ্টদেবের নিকট হইতে প্রেম পবিত্রতা ভিক্ষা করিয়া লন। আরাধনার পরে ভক্তের কাছে প্রার্থনার মত স্বাভাবিক আর কিছুই নাই। যদিও বর্ত্তমান প্রণালীতে আরাধনার পর ধ্যান রহিয়াছে, কিন্তু তাহা মরুভূমিতে রোপিত বৃক্ষের ন্যায় দিন দিন শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে। ধ্যান যে স্থানভ্রষ্ট তাহা আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি। যখন

আরাধনা গভীর হয় তখন সর্ব্বদাই দেখা যায় যে, উপাসক প্রার্থনার দ্বারা আরাধনা শেষ করিতেছেন। এমন অনেকে আছেন, প্রত্যেক স্বরূপ আরাধনার পর প্রার্থনা করেন। অনেকে প্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘনের ভয়ে আরাধনার পর প্রার্থনা আসিয়া পড়ে কি করিবেন, ধ্যানের জন্য প্রার্থনা করিয়া আরাধনা শেষ করেন। সুতরাং আরাধনা ও সমবেত প্রার্থনার মধ্যখানে ধ্যান কোন কাজেই লাগিতেছে না। ধ্যানের স্থানচ্যুতির জন্য এক দিকে যেমন আরাধনার বিপত্তি ঘটিতেছে, অন্যদিকে ব্রহ্মোপাসনা হইতে ধ্যান ক্রমে ক্রমে বিদায় লইতেছে এবং ধ্যানের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মোপাসনার বিশেষত্ব লোপ পাইতেছে। উপাসনার স্থান ভাবুকতায় অধিকার করিতেছে। ধ্যান বাদ দিয়া ব্রহ্মোপাসনা চিনি ছাড়া মিষ্টান্ন রন্ধনের ন্যায় একটা কিছু দাঁড়াইতেছে। সত্বর ইহার প্রতিকার আবশ্যক। নতুবা ব্রহ্মোপাসনা দাঁড়াইবে না। আমাদের সংসারাসক্তি বা ঈশ্বর-প্রেমের অভাবই ধ্যানের সর্ব্বপ্রধান পরিপন্থী। আমরা যদি ঈশ্বরকে ভাল বাসিতাম তবে তাঁহার কাছে বসিতে না বসিতে অস্থির হইয়া ছুটিয়া বাহিরে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইতাম না। আমাদের প্রাণ সংসারে রহিয়াছে, তাই কোনও রকমে নিয়মিত কার্য্য সমাধা করিয়া সংসারে ফিরিয়া যাইবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠে। এই খানেই আমাদের গলদ্‌। আর একটা গলদ্‌ আমাদের ক্ষণিক সুখস্পৃহা, সুতরাং নিত্যবস্তু লাভে ধৈর্য্যের অভাব। উপাসনা করিতে বসিলাম, কিন্তু বসিতে না বসিতেই যদি ভাব না আসিল, সুখ না হইল, তবে কিসে তাহা হয় সেই জন্য ব্যস্ততা। এই জন্য আমাদের ধ্যান হয় না, সুতরাং বস্তু ছাড়িয়া ছায়ার পশ্চাতে ছুটিতেছি। এই সংসারাসক্তির ঔষধ সংসার-বৈরাগ্য। সেই জন্যই উপাসনার প্রারম্ভে প্রপঞ্চময় বিশ্বের প্রতীতির নাশ উপদিষ্ট হইয়াছে। এই খানেই থাকিতে হইবে তাহা নহে, কিন্তু ইহা সংসারাসক্তির প্রতিক্রিয়া—Antithesis. আরাধনায় লীলাময়কে সর্ব্বময় দেখিবার জন্য এই খানে আসন প্রস্তুত করিতে হইবে।

প্রার্থনা

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আরাধনার পরে প্রার্থনা সহজ, প্রকৃত অরাধনারই ফল। তৃষ্ণার্ত্ত যেমন জল দেখিলে সে দিকে সহজেই ছুটিয়া যায়, ক্ষুধার্ত্ত যেমন অন্নের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকায়, মলিন মানবাত্মাও প্রেম-পুণ্যের আধার "শুদ্ধমপাপবিদ্ধমের" দিকে তেমনই ব্যগ্রতার সঙ্গে তাকায়, ইহাই প্রার্থনা। ঐ প্রেম পুণ্যের এক কণিকা যে

সে প্রার্থনা করে, ইহার মত স্বাভাবিক আর কি হইতে পারে? কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে ঐ প্রেম-পুণ্যের সম্মুখীন হয় এবং তাঁহার আকাঙ্ক্ষা সেই দিকে যায়, তখন যদি তাহার হৃদয়ের এই উচ্ছ্বাসকে ধ্যানের বেলা ভূমিতে সংযত করিয়া দিতে যাই, তখন যে তাহার প্রার্থনা স্বাভাবিকতা বর্জ্জিত হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। সেই জন্যই আমাদের প্রার্থনা বাক্য-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, সেই জন্যই এ বেলার প্রার্থনা ও বেলা মনে থাকে না। এমন কি, প্রার্থনার এরূপ দুর্দ্দৈবও ঘটিতে দেখিয়াছি, যে উপাসক ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে 'ভাই ভগিনী'দিগকে সম্বোধন করিয়া ফেলিলেন। অস্বাভাবিকতা ইহার বেশী আর চলিতে পারে না! তার পর, উপদেশের পরে যে প্রার্থনা করা হয়, তার সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট যে সেটা প্রার্থনাই নয়। উপদেশে উপাসক-মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলা হইতেছিল, ভগবানকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহারই একটা চুম্বক বলামাত্র, অধিকাংশ স্থলে ইহাই ব্যবস্থা। উপদেশ যেমন উপাসনার অঙ্গ নহে, এ প্রার্থনাটিও তাই। সমবেত প্রার্থনা সম্বন্ধে এই কথা বলা যায়, যে উপনিষদের ভাষা পরিবর্ত্তনটা সমীচীন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে ভাবের উন্নতি না হইয়া বরং অবনতিই ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এই স্থানে ধ্যান সম্বন্ধে আরও একটা কথা বলা প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে। উপাসনার মধ্যে যদি কোথায়ও সামাজি-কত্বের কিঞ্চিৎ আভাস থাকে, তবে তাহা প্রধানতঃ এই মিলিত প্রার্থনা-টিতেই আছে। কিন্তু মিলিত হইবার অন্তরায় ঐ ধ্যান। সকলের ধ্যান একই সময়ে ভাঙ্গিয়া যাইবে ইহা আশা করা যায় না; কেন না, উহা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। সুতরাং হয় আরাধনার পর মিলিত প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, না হয় প্রার্থনার আশা ছাড়িতে হইবে, দু'টিই হইতে পারে না। যদি কোনও ঐন্দ্রজালিক মায়া প্রভাবে আচার্য্যের যখন ধ্যান ভাঙ্গিয়া প্রার্থনার জন্য মুখ নড়িবে, সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই ধ্যান ভাঙ্গিয়া মুখ খুলিবে এরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে, তবে কোনও কথা নাই! বাস্তবিক ধ্যান স্থানভ্রষ্ট হইয়া বড়ই গোলযোগ বাঁধাইয়াছে।

এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহার দুই একটী বিষয় ছাড়া সবগুলিই ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় উপাসনা সম্বন্ধে খাটে। এখন সামাজিক উপাসনা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। ব্রাহ্মধর্ম্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে, সামাজিক ধর্ম্ম। সন্ন্যাসীরও যখন সমাজ আছে, তখন সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম বলিতে

এখানে যে ধর্ম্মের সাধন ব্যক্তিগত তাহাই বুঝিতে হইবে। জ্ঞান-প্রধান ধর্ম্মই সাধারণতঃ সমাজ-বিমুখ হইয়া থাকে। আমরা ইতিপূর্ব্বে জ্ঞান-পথের যে সাধন-প্রণালীর কথা বলিয়াছি, তাহার পরিণতি সমাধিতে, সুতরাং জ্ঞান-পন্থী ভগবানের সত্তা লইয়াই সন্তুষ্ট, তিনি প্রথমে জগৎকে ব্রহ্মসত্তায় ডুবাইয়া দিয়া পরে আপনিও তাহাতে ডুবিয়া যান, আর জগতে ফিরিয়া আসিবার আকাঙ্ক্ষা তিনি রাখেন না। সুতরাং তাঁহার সাধনে সমাজের প্রয়োজন নাই। তিনি একাকীই স্বীয় মোক্ষ-সাধনে সক্ষম। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ ভগবানের নিত্যত্ব, নির্গুণত্বও যেমন স্বীকার করিয়াছেন, লীলার দিক্‌ও তেমনই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি নিত্য ও লীলাময়—তুইই। যিনি লীলাময়কে দেখিবেন তিনি কেবল আপনাতে আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। আমার ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহার লীলা কতটুকু? তাঁহার অনন্ত লীলার এক কণিকা মাত্র, অনন্ত সিন্ধুর এক বিন্দু মাত্র। এ বিন্দুতে ভক্তের পিপাসা নিবৃত্তি হওয়া দূরে থাকুক্, তাহার রসনাও সিক্ত হইবে না। তাই তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে আপনার মধ্যে লইয়া লীলাময়ের লীলা সম্ভোগ করেন। তাই তিনি গান করেন, "একাকী যাইলে পথে নাহি পরিত্রাণ রে।" সুতরাং পূর্ণ ধর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তিকে সমান ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই ব্রাহ্মধর্ম্মের উপাসনা ব্যক্তিগত ও সামাজিক তুই আকারে প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু ব্যক্তিগত উপাসনা অপেক্ষা সামাজিক উপাসনার কাঠিন্য অনেক বেশী। ব্যক্তিগত উপাসনায় আমি একা, সামাজিক উপাসনায় আমাকে দশ জনের সঙ্গে মিলিয়া এক হইতে হইবে। দশ জন একত্র হইলেই সমাজ হইল না। বহু লোক হাটে বাজারে একত্রিত হয়, কিন্তু তাহা সমাজ নহে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টিই যেমন শরীর নহে, জনসমূহের কেবল মাত্র সমষ্টিই তেমনি জনসমাজ নহে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলিকে একত্রিত করিবার জন্য একটা বন্ধন-রজ্জু চাই যাহা সকলের অতীত কিন্তু সকলেরই মধ্যে বিদ্যমান এবং সকলেরই পক্ষে এক—যাহাকে বলা হয় প্রাণনী শক্তি বা Vital principle. এই প্রাণনী শক্তি সকল অংশের মধ্যে বর্ত্তমান বলিয়াই শরীরের যে কোন অংশে আঘাত লাগুক্ না কেন তাহা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়, শরীরের এক প্রান্তে কিছু প্রবিষ্ট হইলে তাহা অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছায়। সমাজ-শরীরেও তেমনই জন-সমষ্টি একত্রিত করিবার জন্য একটা Vital principle আছে যাহা আমা-

সামাজিক উপাসনার কাঠিন্য

দিগকে এক করিয়া রাখিয়াছে। উপাসকমণ্ডলী জনসমাজেরই অংশ। স্থতরাং মণ্ডলীর জনসমূহকে উপাসক-সমাজে পরিণত করিবার জন্যও এইরূপ একটী Vital principle চাই যাহা সকলেরই মধ্যে বর্ত্তমান থাকিবে। জনকতক উপাসক একত্রিত হইলেই উপাসক-সমাজ হইল না। তাঁহাদের দেহ একত্রিত হইতে পারে, কিন্তু মন পরস্পর হইতে এত দূরে থাকিতে পারে যে সত্যের অপলাপ না করিয়া তাঁহাদিগকে এক শরীরের অঙ্গীভূত বলা যাইতে পারে না। পরস্পরের মনকে একত্রিত করিবার জন্য ধর্ম্ম-মণ্ডলীর পক্ষে যে বন্ধন রজ্জু চাই তাহা আধ্যাত্মিক সমপ্রাণতা—Spiritual Sympathy, যেখানে এই বন্ধন-রজ্জু নাই সেখানে সকলে একত্রিত হইলেও, এক মন্দিরে মিলিলেও, পরস্পর পৃথিবীর বিপরীত পার্শ্বে বাস করিতেছেন। এক বাক্য উচ্চারিত হইলে যদি পরস্পরের মনে এক ভাব উপস্থিত না হয়, তবে সামাজিক উপাসনা বিড়ম্বনা মাত্র। আমরা এক বিছানায় বসিয়া সকলে বিভিন্ন দেবতার উপাসনা করিতেছি মাত্র। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই, যে এক জন ব্রাহ্মের সঙ্গে একজন তথাকথিত পৌত্তলিকের যে বিভিন্নতা, এক ব্রাহ্মের সঙ্গে আর জন ব্রাহ্মের তাহা অপেক্ষাও গুরুতর বিভিন্নতা বর্ত্তমান থাকিতে পারে। তবে কিরূপে তাঁহারা এক উপাসকমণ্ডলীভুক্ত হইতে পারেন? পারেন না বলিয়াই সামাজিক উপাসনায় নানা গোলযোগ হয়। আমরা অনেক সময় সামাজিক উপাসনার বিফলতার দোষ আচার্য্যের ঘাড়ে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত মনে গৃহে ফিরিয়া যাই। কেহ বা উপাসকগণ বাড়ী হইতে উপাসনার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসেন না বলিয়া সামাজিক উপাসনা ফলপ্রদ হয় না বলিয়া আক্ষেপ করেন। আমার মনে হয় সামাজিক উপাসনার বিফলতার কারণ ইহা নহে। (১৩শ অঃ দ্রষ্টব্য)। আচার্য্য একজন খুব বড় সাধক হইতে পারেন, এবং উপাসকগণও খুব উপাসনাশীল হইতে পারেন, অথচ যদি মণ্ডলীর সভ্যগণের পরস্পরের মধ্যে এবং সকলের আচার্য্যের সঙ্গে সাধনের যোগ না থাকে, তবে সামাজিক উপাসনা বিফল হওয়া অনিবার্য্য। আচার্য্য এক দিক্ হইতে আসিয়া বেদিতে উঠিলেন, আর আমরা নানা পক্ষী দশ দিক্ হইতে আসিয়া এক বৃক্ষে আশ্রয় লইলাম, তারপর আচার্য্য কতকগুলি বাক্য উচ্চারণ করিলেন আর আমাদের সমবেত উপাসনা হইল, এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। **পূর্ব্ব মীমাংসার** ন্যায় শব্দের কোনও অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করিতে না পারিলে এ অসাধ্য সাধন হইবে না। এই

আধ্যাত্মিক সমপ্রাণতা না জন্মিলে, এই বন্ধন-রজ্জু না পাকাইলে সামাজিক উপাসনার সফলতা অসম্ভব। সেই জন্যই দেশে সামাজিক উপাসনা বিস্তৃত আকারে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সফল করিবার বিস্তৃত আয়োজনও কখন হয় নাই। আমরা কাগজ পত্রে উপাসকমণ্ডলী গঠন করিয়াছি, আচার্য্য নিযুক্ত করিয়াছি, তারপর মনে করিয়াছি কর্ত্তব্য শেষ হইল। কিন্তু এখানে যে অতি গুরুতর কর্ত্তব্যভার ব্রাহ্মসমাজের স্কন্ধে রহিয়াছে, যে সাধনায় অসিদ্ধ হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের এক দিক্ যে অসার্থক হইয়া যায়, তাহা বিশেষ করিয়া ভাবিতে হইবে। এ দেশের ধর্ম্মসাধন, বিশেষভাবে ব্রহ্ম-সাধন ব্যক্তিগত ছিল, ইহাকে সমাজগত করিবার জন্য বর্ত্তমান যুগের ব্রহ্মোপাসনার আবির্ভাব। এই কর্ত্তব্য সাধনে যতটা মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন তাহা দেখা যাইতেছে না। ফলে, সাধন ব্যক্তিগত দাঁড়াইয়া যাইতেছে।

মণ্ডলীর সমপ্রাণতা

সমপ্রাণতা মতের ও ভাবের একতার উপর নির্ভর করে। ব্রাহ্ম হইলেই ভাব ও মত এক হইবে, তাহা বলা যায় না। কতকগুলি সাধারণ মত এক, কিন্তু উপাসনা ক্ষেত্রে সে গুলির মূল্য এক কড়া কাণা কড়িও না। "সত্যং" শব্দটি কি ভাব প্রকাশ করে, তাহার সম্বন্ধে একজন ব্রাহ্ম ও একজন হিন্দু বা খৃষ্টান যতটা একমত হইতে পারেন, দুইজন ব্রাহ্মের মধ্যে ততটা মতের ঐক্য নাও থাকিতে পারে। তার পর ব্রাহ্মের কোনও অভ্রান্ত শাস্ত্র বা গুরু নাই। যাঁহাদের আছে তাঁহারা বরং সহজে একটা একতার ভূমি লাভ করিতে পারেন, আমরা পাইব কোথায়? অথচ না পাইলে একত্র উপাসনা অসম্ভব। কেন না, দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী ব্রাহ্ম কখনও একত্র উপাসনা করিতে পারেন না। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" বলিতে দ্বৈতবাদী যাহা বুঝেন, অদ্বৈতবাদী তাহা বুঝেন না। অনেক সময় দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর মতানৈক্য এমন গুরুতর যে এক জনের যাহা উপাসনা, অন্যের পক্ষে তাহা ঈশ্বরের অবমাননা (blasphemy)। অথচ এমন কোনও নিয়ম করা একেবারেই অসম্ভব যে ব্রাহ্মদের মধ্যে মতভেদ থাকিবে না। যাহা-দিগকে অভ্রান্ত শাস্ত্রের খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ করা হইয়াছিল তাহারাও যখন ব্যাখ্যার দন্তাঘাতে খাঁচা ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসিয়াছে এবং একই বাক্যের শত অর্থ করিয়া শত সম্প্রদায়ের সৃজন করিয়াছে, তখন আমাদের আর কথা কি? আমরা তো এক এক জনই এক এক শাস্ত্র ও সম্প্রদায়। তারপর, এই দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদই একমাত্র কথা নয়। ইহাদের মাঝখানে আরও কত

বাদ রহিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই, এবং ইহাদের প্রত্যেকেরই বিভিন্ন সাধন-প্রণালী রহিয়াছে। সাধনের বিশেষত্ব ভুলিয়া সকলকে এক সাধারণ ভূমিতে আনিবার চেষ্টাও বৃথা। কেন না, দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীকে তাহাদের বিশেষত্ব ভুলিয়া একাসনে বসিতে বলাও যা, ব্রহ্মবাদী ও পৌত্তলিককে তাঁহাদের বিশেষত্ব ভুলিয়া একত্র উপাসনা করিতে বলাও তা—উভয়ই সমান হাস্যকর। আবার দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদেই বিবাদের শেষ হইল না। দ্বৈতবাদীই হউন আর অদ্বৈতবাদীই হউন সকলেরই জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের বিভিন্ন-স্তর রহিয়াছে। আমরা সব সময়ে তাহা জ্ঞাত না থাকিতে পারি। তাই উচ্চ স্তরের কথা আমাদের বোধগম্য হয় না বলিয়া আচার্য্যকে দোষী করি। কাহারও জ্ঞান বা অন্নময় কোষেই আবদ্ধ, আবার কেহ বা প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় কোষ ভেদ করিয়া আনন্দময়ে যাইয়া উঠিয়াছেন। কাহারও ভাব বা শান্ত রসেই তুষ্ট, আবার কেহ বা দাস্য বাৎসল্য সখ্য ছাড়াইয়া মাধুর্য্যে রমণ করিতেছে। তবে যাঁহারা সবগুলি জড়াইয়া একদম সাধন করিতেছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; তাঁহারা অতি উচ্চ সাধক, তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিবার আমার অধিকার নাই। তবে সাধারণতঃ এই রূপই দেখা যায় যে উচ্চ গ্রামের কথাগুলি অজানিত ভাষার শ্রুতিমধুর শব্দের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, আর নিম্ন গ্রামের কথা শুনিলে "ইহ বাহ্য" বলিয়া স্থানত্যাগের ইচ্ছার সঞ্চার হয়। ধর্ম্মসাধনমার্গের এ জটিলতা সত্ত্বেও আমরা কাগজ পত্রের মণ্ডলী গঠন করিয়াই সামাজিক উপাসনার সফলতা আকাঙ্ক্ষা করি, এটা বিস্ময়জনক স ন্দহ নাই। ইহা অপেক্ষা আরও বিস্ময়জনক এই, যে সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছি, আচার্য্যের যে উপাসনা এক জনের অতি মধুর লাগিল, সেই উপাসনাতেই আর এক জন হৃদয়ে বিষম যাতনা ভোগ করিলেন। আমরা কিন্তু এই গুরুতর ঘটনাটিকেও শরতের মেঘের ন্যায় মাথার উপর দিয়া যাইতে দেখিয়া নিশ্চিন্ত মনে গৃহে ফিরিলাম। অথচ সামাজিক উপাসনাই ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব, এবং সে কথা আমরা স্থানে অস্থানে উচ্চ কণ্ঠে প্রচার করিতে ত্রুটি করি না।

আচার্য্যদের মধ্যে একপ্রাণতা

যেখানে একাধিক আচার্য্য আছেন সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়, যে এক দল লোক এক জনের উপাসনায় তৃপ্ত হয়, অন্য এক দল আর এক জনের। হয় তো তৃতীয় দল কাহারও উপাসনায় তৃপ্ত নহেন। তাঁহারা দিন দিন সামাজিক উপাসনায় বীতরাগ ও উদাসীন হইয়া পড়েন। এইখানেই প্রশ্নের মীমাংসা রহিয়াছে।

একদল লোক যে এক জনের উপাসনা ভাল বাসেন, তাহার কারণ এই যে উঁহাদের সঙ্গে আচার্য্যের একটা স্বাভাবিক সমপ্রাণতা আছে, কিন্তু ইহা কিয়ৎ পরিমাণে আকস্মিক ; কেন না, সব দিন আবার ভাল লাগে না। এই সমপ্রাণতাকে স্থায়ী ভিত্তিভূমির উপর স্থাপিত করিতে হইলে আচার্য্যকে কেবল আচার্য্য থাকিলে চলিবে না, গুরু হইতে হইবে। সমপ্রাণ লোকদিগকে লইয়া মণ্ডলী গঠন করিতে হইবে। সুতরাং বৃহৎ উপাসক সমাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীতে বিভক্ত হইয়া পড়িবে, ইহা অনিবার্য্য। ইহা না করিলে সামাজিক সাধন কখন ফলপ্রসূ হইবে না। এ সামাজিক উপাসনা চিরদিনই হট্টগোলময় থাকিবে। এখানে বক্তৃতা থাকিবে, উপদেশ থাকিবে, কিন্তু গম্ভীর ধর্ম্মসাধন থাকিবে না, থাকিতে পারে না। যাহা হউক, এতক্ষণ সামাজিক উপাসনার সাধারণ দিকের কথাই কেবল বলা হইল, ইহার অনুষ্ঠানের দিক্ সম্বন্ধেও দু'চার কথা সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন। নহিলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তাই সেই বিষয়ের অবতারণা করা গেল।

অনুষ্ঠানের মধ্যে কেবল বিবাহ ছাড়া আর সবগুলিই যেন কিয়ৎ পরিমাণে কেন্দ্রভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিবাহ ও শ্রাদ্ধের উপাসনায় সাধারণের জন্য যতটা পার্থক্য থাকা প্রয়োজন, তাহা আছে বলিয়া মনে হয় না। মতে মধ্যবর্ত্তিতা, intercession প্রভৃতিকে দূষণীয় বলিয়া মনে করিলেও শ্রাদ্ধের উপাসনায় যেন সেগুলি ক্রমে ক্রমে স্থান পাইতেছে। জাতকর্ম্ম, নাম-করণ পুত্র-কন্যাগণের জন্মদিনে অনেক সময়ে মনে হয় যে আচার্য্য যেন ভগবান্‌কে কোন মতে বুঝাইয়া কর্ত্তব্যপথে আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। ভগবান্ যেন আমাদের ঘরে পুত্র কন্যা প্রেরণ করিয়া দিয়া সে কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে তাঁহাব কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই অনুষ্ঠান করিতেছি।

এখানে আর একটি কথা না বলিলে প্রসঙ্গের অঙ্গহানির সম্ভাবনা। সঙ্গীত ব্রহ্মোপাসনার অঙ্গীভূত অংশ (integral part) হইয়া গিয়াছে। সঙ্গীতগুলিই ব্রাহ্মধর্ম্মকে সাধারণের কাছে প্রচারিত করিয়াছে ও করিতেছে। অনেক স্থলে ব্রহ্মসংগীতই মন্দিরের দরজা অর্গলবদ্ধ হইতে দেয় নাই। এখন যে সময়ে সময়ে ভিড় হয় তাহাও অধিকাংশ স্থলে ঐ সংগীতেরই জন্য। রুচির পবিত্রতায়, জ্ঞানের গভীরতায়, ভাবের উচ্চতায়, ভাষার মধুরতায় এবং হৃদয়ের সরল ভাবের অভিব্যক্তিতে ব্রহ্মসংগীত সংগীত জগতে কেন সাহিত্য জগতেও অতি উচ্চ

ব্রহ্মসঙ্গীতের অপূর্ণতা কেন ?

স্থান অধিকার করিয়াছে। এমন অনেক সঙ্গীত আছে যাহার অর্থ বুঝিলে তাহাতে সায় দিবে না এমন মানব হৃদয় নাই। ইহা ব্রহ্মসংগীতের বিশ্বজনীনতার প্রমাণ। কিন্তু ব্রহ্মসংগীত অসম্পূর্ণতা-বর্জ্জিত নহে। ভগবানের রুদ্রভাব-প্রকাশক সংগীত নাই বলিলেও চলে। রৌদ্রভাবের প্রতি যে ব্রাহ্মসমাজ বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই উপেক্ষা ও অনাদর প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন "রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং নাহি নিত্যম্" এই প্রার্থনাটিকে অর্থান্তরিত করিয়া গ্রহণ করাই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। কিন্তু যাহা আছে তাহা অগ্রাহ্য করিলে চলিবে কেন? এই যে শিলাবৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাত জলপ্লাবন অশনিপাত ভূমিকম্প মারিভয় ও যুদ্ধবিগ্রহে প্রকৃতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করেন, ইহা সয়তানের খেলা নহে, উহা "ভীষণং ভীষণানামে"রই "মহৎ ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" রূপ। আমাদিগকে তাঁহার সম্মুখীন হইতে হইবে। এই ভীষণ তাণ্ডব নৃত্যের সময়ে দয়াময় প্রেমময় (মঙ্গলময় ?) কিছুই খাটে না। এ কেবল (by way of courtesy) ভদ্রতার খাতির—দৃশ্যের অন্তরালে চলিয়া যাওয়া, দৃশ্যকে পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্যের কোলে মস্তক স্থাপন ! এই রুদ্র ভাবকে বরণ করিয়া লইবার আয়োজন ব্রাহ্মসমাজের আরাধনায় নাই। সুতরাং ঐ ভাব সংগীতেও ফুটে নাই। ভীষণকে যে ভীষণ বলিয়াই আলিঙ্গন করিতে হইবে, সে ব্যবস্থা কোথায়? এইখানেই একদিকে মনুষ্যত্ব বিনাশী Pax Britannica, অন্যদিকে সকল শক্তি-লোপকারী ভীষণ পরাধীনতার ছাপ পরাধীন জাতির ধর্ম্মেও অক্ষরে অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। অবস্থার পরিবর্ত্তনে ও নির্য্যাতনে মানব অন্তরে, জাতীয় জীবনেই হউক আর ব্যক্তিগত জীবনেই হউক, সেই অনন্ত অসীমের কোলে মস্তক রাখিবার জন্য যখন যে ভাবের উদয় হয় তাহার পরিতৃপ্তির জন্য ভগবানের তদনুযায়ী স্বরূপ প্রকাশিত হয়। বিগত দেড় শত বৎসর ব্রিটিশ রাজশক্তির আশ্রয়ে শান্তির ক্রোড়ে বাস করিয়া আমরা ভগবানের রুদ্র মূর্ত্তির কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। তাই উপনিষদের "রুদ্র" আজ ব্রাহ্মসমাজে "দয়াময়" আখ্যা পাইয়াছেন। কিন্তু যেই আজ ব্রিটিশ রাজের চিরাভ্যস্ত পালনী মূর্ত্তি ভীষণ সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, অমনি জাতীয় জীবনে সেই "ভীষণং ভীষণানাং"এর রুদ্রমূর্ত্তির আশ্রয় গ্রহণ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। ব্রহ্মোপাসনায় যদি এ ভাবের পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা না থাকে, তবে ভবানী-পূজার বিরুদ্ধে চিৎকার অরণ্যে রোদন মাত্র হইবে। বুভুক্ষিত সুখাদ্য না পাইলে কুখাদ্যই গ্রহণ করে—স্বাস্থ্যরক্ষার শত উপদেশ তাহাকে বারণ

করিয়া রাখিতে পারে না। অভিনীত হইবার জন্য জাতীয় জীবনের যে অধ্যায় আজ উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহাতে দেশ ভগবানের রুদ্রমূর্ত্তির পূজার জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজ ত্বরান্বিত না হইলে দেশের ভাব ব্রাহ্মসমাজকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইবে। দেশের যে ভাবের খোরাক্ ব্রাহ্মধর্ম্ম যোগাইতে পারিবেন না; তাহা যে সুপথে পরিচালিত হইবে না, তাহা নিশ্চয়। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ অগ্রসর না হইলে দেশ যে বসিয়া থাকিবে না, তাহাও ঠিক। এইখানেই ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্ব। ঢাকার ঘূর্ণীবায়ুর সংবাদ পাইয়া সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মসংগীতের এই অভাব নেত্রপথে পতিত হয়। বহু বৎসর পরে দেশের চতুর্দ্দিকেই সেই বিরাট্ পুরুষের "মহৎ ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" মূর্ত্তির সম্মুখীন হইতেছি, আজও ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার পূজার উপকরণ ভাল মিলিতেছে না। তাই ঋষির সঙ্গে বলি "রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্"।

আর একটি কথা বলিয়াই আমি ব্রহ্মোপাসনার ভূমিকা শেষ করিতেছি। উপাসনাক্ষেত্র ও উৎসবাদি সম্বন্ধে আমাদের মনে কিরূপ ভাব থাকা কর্ত্তব্য? উপধর্ম্মে দেবমন্দির বা তীর্থক্ষেত্রকে যে ভাবে দেখে আমরা সে ভাবে দেখিতে পারি না। ইহার মধ্যে কোনও অলৌকিক ভাব যুক্ত হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের বার্ত্তা ব্যর্থ হইবে। আমরাও কি উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত থাকাটাকেই একটা পুণ্য কর্ম্ম মনে করিব? আমরা কি উপাসনা শ্রবণে স্বর্গের দ্বার খুলিয়া যাইবে বলিয়া মনে করিব! সময়ে সময়ে এরূপ দেখিয়া মনে ক্লেশ হইয়াছে, যে সন্তানগণের স্নানাহার নিয়ম মত হইতেছে না, অথচ মাতা তিন চার বার উৎসব-মন্দিরে ছুটাছুটি করিতেছেন। এরূপ পৌরাণিক ভাব যে কেবল মাতাদেরই আছে, কোন পিতার নাই, তাহা বলিতেছি না। হায়! ভগবান্ স্বয়ং গৃহে পূজা লইবার জন্য পশ্চাতে ফিরিতেছেন, তাহা না বুঝিয়া আমরা পূজার জন্য ছুটিতেছি। (৩২১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ভগবান্ আমাদের পূজার দিব্য দৃষ্টি খুলিয়া দিন, এই প্রার্থনা।

তৃতীয় স্কন্ধ

কর্ম্মজীবন

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চাপি বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥ গীতা, ৪।১৭

পঞ্চদশ অধ্যায়

নীতি ও ধর্ম্ম

বা

অধ্যাত্ম সংগ্রাম

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাৎ য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥

কঠ, ১।২।১

আচার্য্য শঙ্করকৃত বা তন্নামে প্রচলিত **হস্তামলক** গ্রন্থে আত্মার যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহা—"নিজ-বোধরূপ" (My being is self-consciousness)। এই আত্মবোধে আর যাহাই থাকুক্ না কেন, ইহাতে অনিত্যের মধ্যে নিত্যবোধ বর্ত্তমান। সকল অবস্থাবিপর্য্যয়ের মধ্যে, সকল অবস্থার সাক্ষীস্বরূপ এক অপরিবর্ত্তনীয় নিত্যবুদ্ধ আত্মজ্ঞান বর্ত্তমান। কত পরিবর্ত্তন আসিতেছে, কত পরিবর্ত্তন চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু এই 'আমি'র কোন পরিবর্ত্তন হইতেছে না, যাহাকে অবলম্বন করিয়া সকল পরিবর্ত্তন সম্ভাবিত হইতেছে তাহার পরিবর্ত্তন অসম্ভব। আমরা এই আত্মবোধের সঙ্গে আর একটু যোগ করিয়া আত্মার সংজ্ঞা পূরণ করিতে চাই। সে টুকু আত্মপরিচালন ক্ষমতা বা আত্মকর্তৃত্ব (self-determination)। আত্মা কেবল জ্ঞাতা নহেন, কেবল সাক্ষী নহেন, নিয়ন্তা ও অন্তর্য্যামীও * বটেন।

---

* এখানে 'অন্তর্যামী' শব্দ উপনিষদের অর্থে ব্যবহৃত হইল, বাঙ্গলায় শব্দটীর বিশেষ অর্থান্তর ঘটিয়াছে।

আত্ম কর্তৃত্ব

এই আত্মবোধ ও আত্মপরিচালন-ক্ষমতাই মানুষকে প্রাকৃত জীব হইতে ভিন্ন করিয়া আধ্যাত্মিক জীবে পরিণত করিয়াছে। আমি যাহা আছি বা আমাকে যাহা পাইতেছি, অথবা বাহিরের শক্তিসমূহ আমাকে যাহা বানাইতেছে, তাহা আমার মনুষ্যত্ব নহে, তাহা আমার আধ্যাত্মিক জীবন নহে; কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি পরিচালনের দ্বারা আমি সজ্ঞানে আমাকে যাহা গড়িয়া তুলি, তাহাই আমার প্রকৃত মনুষ্যত্ব। এ কথার অর্থ ইহা নয়, যে মানবের অধ্যাত্ম জীবনটা একান্ত স্বপ্রসূত, ইহার উপর কোন বাধা নাই, কোন সীমা নাই, ইহার বিকাশের কোন নিয়ম নাই, যেন ইচ্ছার খামখেয়ালির উপরই সব নির্ভর করিতেছে; কিন্তু ইহার অর্থ এই, যে আধ্যাত্মিক জীবনের যাহা কিছু মালমসলা, তাহা ভিতর হইতেই আসুক, আর বাহির হইতেই আসুক—যাহা কেবল প্রকৃতির নিকট প্রাপ্ত, কিন্তু আমি আমার স্বাধীন ইচ্ছার পরিচালনের দ্বারা সজ্ঞানে সে গুলিকে আমার আত্মবিকাশের উপকরণ বলিয়া গ্রহণ করি নাই, অথবা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সে গুলিকে আমার বিকাশের অনুরূপ করিয়া লই নাই—যতক্ষণ আমি ইহা করি নাই, ততক্ষণ এবং সেই পরিমাণে আমি অধ্যাত্ম জীবন হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি, ততক্ষণ আমার অধ্যাত্ম জীবন সফলতা হইতে দূরে রহিয়াছে। একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্। শত্রুকর্তৃক দেশ আক্রান্ত হইলে স্বদেশ-প্রেমিক দেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন, অন্যদিকে দেশের রাজ-শক্তি-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আর কত লোক প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। উভয়ত্রই প্রাণ-বিসর্জ্জন, কিন্তু শেষোক্তেরা কলের পুতুলের ন্যায় অন্য-পরিচালিত হইয়া আত্মবিসর্জ্জন করিল; আর স্বদেশপ্রেমিক আত্মপরিচালিত হইয়া সজ্ঞানে স্বীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আত্ম-ত্যাগ করিয়া অধ্যাত্মজীবনের সফলতা লাভ করিলেন। স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া মনুষ্যত্ব নহে, কিন্তু স্রোতকে নিয়মিত করিয়া উহাকে স্বীয় অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যে ও স্বকার্য্যে নিয়োজিত করাই মনুষ্যত্ব। স্রোতে ভাসিতে পারি, তাহাতে হানি নাই; কিন্তু যখন ভাসিব তখনও জ্ঞাতসারে স্বইচ্ছায় স্বকার্য্যসাধনেই ভাসিব, অন্যথা আত্মা স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে। সুতরাং বাহিরেরই হউক, আর ভিতরেরই হউক, আমি আমার আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রসারের জন্য সে গুলিকে স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা গ্রহণ করিয়া জ্ঞাতসারে স্বকার্য্যে নিয়োজিত করিব, কিন্তু বাহিরের শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া অন্য কাহারও উদ্দেশ্যসাধনে অজ্ঞাতসারে নিয়োজিত হইব না।

ক। এই যে প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানবেচ্ছার আত্ম প্রকাশ (free self-assertion of the rational will) ইহাই মানবকে সমগ্র প্রাকৃত জগৎ হইতে ভিন্ন করিয়া 'যে অনন্তজ্ঞানে বিশ্ব সৃজিত বিধৃত' তাহারই অঙ্গীভূত করিয়াছে। এইখানে সৃষ্টির মধ্যে এমন এক নূতন তত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে, যাহা ইতি-পূর্ব্বে সৃষ্টিতে দৃষ্টিগোচর হয় নাই, যাহা মানবেতর জগতের কল্পনারও অতীত। এখানে এমন এক অধ্যায়ের সূত্রপাত হইয়াছে, যাহা অধ্যায়টি পাঠ না করিয়া কিছুতেই ধারণা করা যায় না, যাহার জ্ঞান অন্য কোথা হইতেই সংগৃহীত হইতে পারে না। এইখানে সৃষ্টির এক অংশ হইতে অপর অংশ ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, এইখানেই স্রষ্টা ও সৃষ্টির জ্ঞাতসারে কোলাকুলি আরম্ভ হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয়, যে, এইখানে বিশ্বস্রষ্টা সৃষ্টির মধ্যে স্বীয় প্রতিরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহারই অর্থ 'Man was made out of the image of God.' ইহাই মানবাত্মার বিশেষত্ব, ইহাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব। এবং এই খানেই পশুজীবন ও মানবজীবনের পার্থক্য। এই যে পার্থক্য, ইহা প্রকৃতিগত, বস্তুগত মৌলিক পার্থক্য, কেবল পরিমাণগত নহে। পশুকে বড় করিয়া মানব সৃষ্ট হয় নাই। এ কথায় কোনও সন্দেহ না থাকিতে পারে যে মানবদেহ নিম্ন হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু মানবাত্মা নীচ হইতে উঠিয়া আইসে নাই, উপর হইতে নামিয়া আসিয়াছে। যাহার মধ্যে প্রথম হইতেই আত্মজ্ঞান নাই তাহাকে গড়িয়া পিটিয়া আত্মজ্ঞানে পরিণত করা অসম্ভব। যাহার মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই স্বাধীন ইচ্ছা (Self-determination) নাই, তাহাকে যতই বড় করি না কেন, কল্পনা পরাস্ত হইবে, স্বাধীন ইচ্ছার উদ্ভব হইবে না। তাই বলিতেছিলাম, মানবের যাহা মানবত্ব, মানবের যাহা মহত্ত্ব তাহা স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছে, তাহা স্বর্গের জিনিষ, পাতাল হইতে উঠিয়া আইসে নাই। উঠিয়া আইসে নাই বলিয়াই, স্বর্গের দান বলিয়াই তাহার সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ। এই যে দারিদ্র্যের সঙ্গে মহাসংগ্রাম করিতেছি, তাহা কি অন্ন সংগ্রহ করিয়া দু'দশ জনের প্রাণ-রক্ষার জন্য? তাহা নহে। জানি, মৃত্যুর হস্ত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। কিন্তু দরিদ্রতা-রাক্ষসী যে নরনারীর মুখ হইতে ঐ স্বর্গের ছবি মুছিয়া ফেলিতেছে, এ সংগ্রাম তাহারই জন্যে। ঐ যে বাহিরের শত রাজনৈতিক ও সামাজিক

পশু জীবন ও মানব-জীবন

আত্মজ্ঞান ব্রহ্মের প্রকাশ

অত্যাচার নরনারীর মুখে আমার ইষ্টদেবের মুখ দেখিতে দিতেছে না, সেই জন্যই অহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিতেছি। এ সংগ্রাম যে আমার ইষ্টদেবের পূজা, তাই তো সংগ্রামে বল পাই। নতুবা 'Survival of the fittest' এর নিয়ম অনুসারে যদি একটা জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যায়, তাহাতে তোমার আমার কি? মানবের মহত্ত্ব স্বর্গের জিনিষ, তাহার পৈতৃক সম্পত্তি তাই ইহা রক্ষার জন্য এত যত্ন। নতুবা 'Natural selection' রূপ হ'লে হ'তে পারে, না-হলে না-হতে পারে যন্ত্রটিই যদি মানবের মহত্ত্বের ভিত্তিভূমি হইত, তবে এই সন্দিহমান বস্তুটির জন্য এত সংগ্রাম না করিলেও চলিতে পারিত। মহত্ত্ব অবধারিতরূপে স্বর্গ হইতে আসিতেছে, তাই আশা-নেত্রে উর্দ্ধদিকে চাহিয়া মানব এই সংগ্রামে বল লাভ করিতেছে।

যাহা হউক, এই যে মানবেচ্ছার অভ্যুত্থান (Free self-assertion of the rational will) ইহাতে মানব-মনের মধ্যে এক তুমুল দ্বন্দ্ব উপস্থিত করিয়াছে, যাহা উর্দ্ধ বা অধঃ কোথায়ও নাই। ইহা প্রবৃত্তি (Impulse) এবং প্রজ্ঞার (Reason) সংগ্রাম। এই সংগ্রাম আত্মার অন্তর্নিহিত সংগ্রাম—ভিতর ও বাহিরের সংগ্রাম নয়। মানবেতর জগতের কোথায়ও এ সংগ্রাম নাই।

আত্মকর্ত্তৃত্ব ও অধ্যাত্ম সংগ্রাম

প্রথমতঃ, জড়ের কথা বিচার করিতে গেলে দেখিতে পাই, সেখানে সংগ্রাম আছে বটে, কিন্তু তাহা বাহিরের বিভিন্ন শক্তির সংঘর্ষ। জড় আপনাকে জানে না, নিজের সৃষ্টি ও স্থিতিতে নিজের কোনই হাত নাই। যে কেন্দ্রাভিসারিণী ও কেন্দ্রাপসারিণী শক্তির দ্বন্দ্বে জড়ের উৎপত্তি ও স্থিতি, তাহাদের পরিচালনে জড়ের নিজের কোনই কর্ত্তৃত্ব নাই। শক্তিদ্বয় বাহির হইতে জড়কে নিয়মিত করিতেছে।

জড়

দ্বিতীয়তঃ, উদ্ভিদে ভিতরে ও বাহিরে সংগ্রাম আছে বটে, কিন্তু উদ্ভিদ্ তাহা জ্ঞাত নহে। এ কথা ঠিক যে উদ্ভিদের জীবন একান্তভাবে বাহিরের শক্তিদ্বারা নিয়মিত হয় না, সে অন্তর্নিহিত শক্তিদ্বারা পরিচালিত হইয়া বাহির হইতে উৎপাদন সংগ্রহ করতঃ স্বীয় জীবন পোষণ করে। কিন্তু যে উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য তাহার জন্ম, সে তাহার কোন খবরই রাখে না; সুতরাং এই উপাদান-সংগ্রহে কোনও দ্বিধা নাই। এখানে ভিতরের অন্ধশক্তি বাহিরের অন্ধশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছে।

উদ্ভিদ

তৃতীয়তঃ, নিম্ন জীব শারীরিক সুখ-দুঃখাদির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে - যখন তাহার আহার বিহার প্রতিহত হইতেছে, তখন সে ভিতরের সঙ্গে বাহিরের একটা সংগ্রাম অনুভব করিতেছে, কিন্তু সে সংগ্রামের অর্থ কি, তাহা সে জানে না। কেন না, তাহার জীবনের সার্থকতা কোথায় তাহা তাহার নিকট প্রকাশিত নাই। তাহারও জীবনে যে একটা পরিণতি আছে, তাহারও জীবনের যে একটা উদ্দেশ্য আছে—এই সংগ্রামের ভিতর দিয়াই যাহা সিদ্ধ হইতেছে, তাহা তাহার অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত নহে। এরিস্ততল্ বলেন, 'Nature in it wills an end, of which he knows nothing'—প্রকৃতি উহার সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইতেছেন, যাহা সে জানে না। তাহার জীবন সম্পূর্ণরূপে সুখ-দুঃখের সঙ্গে একীভূত হইয়া রহিয়াছে, ইহার অতীত সে কিছু জানে না। সুতরাং তাহার ভিতরে কোন সংগ্রাম নাই, তাহার আপনার প্রকৃতির মধ্যে কোনও বিসম্বাদ নাই। ঐ যে গাভী স্বীয় ক্ষণিকের উদরপূর্ত্তির জন্য মানুষের বহুমূল্য উদ্যান ধ্বংস করিল, ইহাতে পূর্ব্বেও তাহার কোনও সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই, পরেও কোন দ্বিধা উপস্থিত হইবে না। কেন না, তাহার নিকট কেবল একটি মাত্র পথ উন্মুক্ত, সেটি তাহার উদরপূর্ত্তি; সুতরাং ঔচিত্যানৌচিত্যের কোনই প্রশ্ন উঠিল না, কাজেই কোনও আভ্যন্তরীণ সংগ্রামের অবসর হইল না।

পশু

মানুষেই কেবল নিম্ন আমি ও উচ্চ আমি

এই আভ্যন্তরীণ সংগ্রামের প্রশ্ন উঠিতেছে কেবল মানুষের বেলায়। মানব-প্রকৃতির মধ্যে এমন দুইটি উপাদান রহিয়াছে যাহা পরস্পর-বিরুদ্ধ, তাহা প্রকৃতি ও প্রজ্ঞা—Life of impulse ও Life of reason. উপনিষদ্ বলেন—শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। এই যে কোন কাজ করিতে যাইয়া শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের মধ্যে বিচার উপস্থিত হয়, এইখানেই মানব-প্রকৃতি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া এক মহাসংগ্রামের অবতারণা করিয়াছে। বাসনা ও কামনার জীবনের অতীত এক উচ্চ আদর্শের যখন আবির্ভাব হয়—সে আদর্শের পূর্ণতা ছাড়া জীবনের পরিতৃপ্তি নাই তাহা বুঝিতেছি, অথচ প্রবৃত্তির হাতও এড়াইতে পারিতেছি না, তখনই এই মহাসংগ্রামের আরম্ভ। এই প্রবৃত্তি ও আদর্শ, এই শ্রেয়ঃ ও প্রেয় এমন একটা শত্রুতা-সূত্রে আবদ্ধ, যে, উহারা পরস্পরকে ছাড়িয়াও থাকিতে পারে না এবং

উভয়ের মধ্যে সন্ধিও অসম্ভব। ইহাদের মধ্যে ছাড়া-ছাড়ি সম্ভব নয়; কেন না, ইহারা দুই বস্তু নহে। যে আমি আমার বাসনা-কামনার মধ্যে, সেই আমিই আমার আদর্শের মধ্যে। প্রেয়ের প্রলোভনের মধ্যেও আমি, শ্রেয়ের আহ্বানধ্বনির মধ্যেও আমি; প্রেয়চিন্তার মধ্যেও আমি, শ্রেয়োলাভের আকাঙ্ক্ষার মধ্যেও আমি। এক অবিভাজ্য আমিই উভয়ত্র। এক আমিই উচ্চ ও নীচ দৃষ্টিতে বিভক্ত হইয়া এই সংগ্রামের অবতারণা করিয়াছে। এই সংগ্রামই কিন্তু মানুষকে প্রাকৃত জীব হইতে তুলিয়া মানুষ করিয়াছে। এবং এই সংগ্রামের অবসানেই সে দেবত্ব লাভ করিবে। ইতিপূর্ব্বে যে অধ্যাত্ম জীবনের কথা বলা হইয়াছে, তাহা প্রকৃতি-দত্ত নহে, স্বশক্তি-পরিচালনের দ্বারা এই সংগ্রামের মধ্য দিয়াই তাহা লাভ করিতে হইবে। এই যে মানবাত্মার ভিতরের সংগ্রাম তাহা যে কি ভীষণ তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যের বোধগম্য হইবে না। বাহিরের কোনও সংগ্রাম বা তপস্যার সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না।

খ। আমরা দেখিলাম মানবাত্মার মধ্যে এক ভীষণ সংগ্রাম বর্ত্তমান রহিয়াছে।

সুখবাদীর মীমাংসা অগ্রাহ্য।

কিসে এই সংগ্রামের অবসান হইতে পারে। এক শ্রেণীর মীমাংসক আছেন, তাঁহারা বলিবেন সুখই পরম পুরুষার্থ, তাহার উপর আর কিছু নাই, সুখ লইয়া সংসারে সুখী হও, সুখ অন্বেষণ কর, সুখ লাভ কর, ইহাতেই তোমার জীবনের চরিতার্থতা। এতদতিরিক্ত আর যা কিছু, সে কেবল তোমার মনের কল্পনা। তুমি স্বকল্পিত ভূতের সঙ্গে বিবাদ করিয়া মরিতেছ, সুখের অতীত শ্রেয়ঃ বলিয়া আর কিছুই নাই। এই মীমাংসার প্রথম ভ্রান্তি এই, যে, যাহা আছে তাহার দিকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন। কিন্তু তাহা করিলে চলিবে কেন? যদি আমার মধ্যে সুখবাসনা ছাড়া আর কিছু না থাকিত, তবে তো কোন মীমাংসার প্রয়োজনই হইত না, আমাতে পশুতে কোন বিভিন্নতাই থাকিত না। এখন যখন সুখবাসনার অতীত শ্রেয়ের আবির্ভাব হইয়াছে, তখন তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব। এ যুক্তিটি কুকুর-তাড়িত শশকের যুক্তির অনুরূপ। খরগোস যখন দেখে যে আর কুকুরের হস্ত হইতে নিস্তার নাই, তখন সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মাটিতে মুখ লুকায়, যেন সে দেখিতেছে না বলিয়া কুকুরও দেখিতে পাইবে না। শ্রেয়ঃ যখন আমাকে ধরিয়াছে, তখন তাহার হস্ত হইতে আমার নিস্তার নাই। তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া বিবাদের মীমাংসা হইবে

না। শ্রেয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করা আর মানুষকে পশুতে পরিণত করা একই কথা।

দ্বিতীয়তঃ, দেখিতে পাওয়া যায়, যে প্রাচীন কালেরই হউক আর বর্ত্তমান কালেরই হউক, সুখবাদিগণ সঙ্গতভাবে আপনাদের মত প্রচার করিতে পারেন নাই। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাহারা প্রেয়কে শ্রেয়ঃ করিয়া তুলিয়াছেন। নানা অবস্থার ভিতর দিয়া আসিয়া শেষে তাঁহারা বলিয়াছেন, যে, সুখই লক্ষ্য, কিন্তু প্রকৃত সুখ শ্রেয়ের অনুসরণে। যাহাকে পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, পরিণামে তাহারই দোহাই। বাস্তবিক মানব কখনও শ্রেয়কে পরিত্যাগ করিতে পারে না, সুতরাং শ্রেয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া যে মীমাংসা তাহা সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। যে দুয়ের মধ্যে বিবাদ তাহাদের একজনের দাবী অগ্রাহ্য করিলে বিবাদের অবসান হয় বটে, কিন্তু সুবিচার হয় না।

সন্ন্যাসের ভ্রান্তি

আর এক শ্রেণীর মীমাংসক বিপরীত দিক্ হইতে বলেন—সন্ন্যাসী হও, বাসনা কামনাগুলিকে বিনাশ কর, শ্রেয়ঃ লাভ হইবে। এই বাসনা কামনার বন্ধনই যখন তোমাকে উপরে উঠিয়া যাইতে দিতেছে না, ইহারাই যখন তোমার উন্নত জীবনপথের বাধা তখন ইহাদিগকে দূর কর, পথের কণ্টক নির্ম্মূল কর, বিবাদের অবসান হইবে, সংগ্রাম চলিয়া যাইবে, শান্তি লাভ করিবে। এ চেষ্টাও ভ্রান্ত চেষ্টা। কিন্তু এ ভ্রান্তির কারণ সহজেই অনুমেয়। আমার আধ্যাত্মিক জীবনের সম্ভাবনার মধ্যেই এই জ্ঞান নিহিত রহিয়াছে, যে আমি নীচ ও ক্ষুদ্র বাসনাগুলিকে অতিক্রম করিতে পারি। বাসনা-কামনাগুলিই যখন আমাকে টানিয়া নামাইতেছে, তখন যদি এ গুলিকে বিনাশ করিতে পারি, তবেই তো আমার আধ্যাত্মিক জীবন আপনা হইতেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। এইখানেই আমরা এক মহা ভ্রান্তিতে পতিত হই। কেন না, বাসনা-কামনার জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবন দুই পদার্থ নহে। আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি—যে আমি বাসনা-কামনার জীবনে, সেই আমিই আধ্যাত্মিক জীবনে। সুতরাং একটীর বিনাশে আর একটীর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। পাখায় বাতাস আট্‌কাইয়া ঊর্দ্ধগমনের বাধা জন্মায় বলিয়া পাখীর পক্ষে নির্ব্বাত স্থলে উড়িবার চেষ্টা যেমন বিড়ম্বনা, কামনাগুলিকে বিনাশ করিয়া মানুষের পক্ষে অধ্যাত্ম জীবনলাভের চেষ্টা—শ্রেয়োপথে গমনের চেষ্টাও তেমনি বিড়ম্বনা। সুতরাং মীমাংসা একটীর বিনাশে নয়, নিম্নকে

উচ্চের অনুগামী করায়। কেন না, আদর্শ যদি নিজেকে প্রকাশ করিতে চায়, তবে সে নিজেকে আকাশে প্রকাশ করিবে না, আমার ব্যক্তিগত জীবনের কার্য্যাবলির ভিতর দিয়া তাহা অভিব্যক্ত হইবে। শ্রেয়ঃ যদি সার্থকতা লাভ করিতে চায়, তবে তাহা বাসনা-কামনার ভিতর দিয়াই সার্থকতা লাভ করিবে। মানবের উচ্চ জীবনের চরিতার্থতা তাহার প্রাকৃত জীবনের মধ্য দিয়াই লাভ হইবে, আধ্যাত্মিক জীবনকে প্রাকৃত জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে হইবে না। ব্রাহ্ম কবি অতি সহজ কিন্তু পরিষ্কার ভাবে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতেছেন, তিনি রিপুর বিনাশ ব্যবস্থা করিতেছেন না, কিন্তু বলিতেছেন, "আমার রিপু-পরিচারিকাদল, আনন্দে মিলে সকল, অনুদিন করিবে সব পূজার আয়োজন।" ইহাই প্রকৃত মীমাংসা। এক এক করিয়া বাসনা-কামনাগুলিকে শ্রেয়ের অনুবর্ত্তী করিয়া দিতে হইবে। আমার আহার-বিহার সব থাকিবে, অথচ আমি প্রাকৃত জীব থাকিব না। আমার ধনার্জ্জন, সংসারপালন সকলই থাকিবে, অথচ ইহাদের সকলেরই প্রকৃতি ভিতর হইতে বদলিয়া যাইবে। আমিও আহার করি, পশুও আহার করে। তবে বিভিন্নতা কোথায়? পশু আহার করে অন্ধভাবে, ক্ষুধার তাড়নায়, আমিও যদি তাই করি, তবে আমাতে পশুতে বিভিন্নতা কোথায়? কিন্তু যদি কোন উচ্চতর গ্রামে (উচ্চতর গ্রামের কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পৃঃ ৩১০-৩১৮) নাও উঠিতে পারি, তবুও তো ভাবিতে পারি, যে, আমি আহার করি শক্তিলাভের জন্য, যে শক্তি ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হইবে—তবে এই সামান্য আহারযোগেই আমি দেবত্বে উন্নীত হইলাম। আমি যদি ধনোপার্জ্জন করি ভগবানের প্রিয়-কার্য্যসাধনের জন্য, দরিদ্রকে অন্নদান ও অজ্ঞানকে জ্ঞানদানের জন্য, তবে আমার কর্ম্মক্ষেত্রে ধনার্জ্জনের শ্রম আর বেদীর উপরে ব্রহ্মোপাসনার শ্রম, এ দুয়েতে কোনও বিভিন্নতা থাকিবে না। "জন্মৈব পরমা পূজা অবতার হরের্হি সঃ" বলিয়া যদি আমি সন্তানপালনে প্রবৃত্ত হই, যদি ভাবি ভগবান্ আমাকে প্রেম, সহিষ্ণুতা, সেবা, ত্যাগ শিক্ষা দিবার জন্য আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তবে আর আমাকে স্বর্গরাজ্যের জন্য ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে না, স্বগৃহেই স্বর্গ-রাজ্য দেখিতে পাইব, সংসারে ধর্ম্ম হয় না বলিয়া সন্ন্যাসী হইতে হইবে না, সংসার ও ধর্ম্ম এক হইয়া যাইবে। এইরূপে যখন আমার সকল

সুখ ও ত্যাগের সামঞ্জস্য

কামনা, সকলবৃত্তি, সকল কার্য্য শ্রেয়ের অনুবর্ত্তন করিবে, তখনই সংগ্রামের অবসান হইবে।

কিন্তু পথে অনেক বিপদ আছে। হে সাধক, সাবধান! প্রেয় যেন শ্রেয়ের রূপ ধরিয়া না আসে। প্রেয়ের সঙ্গে সংগ্রাম বরং সহজ, কিন্তু প্রেয় যখন শ্রেয়ের রূপ ধরিয়া প্রতারণা করে, তখন সাধকের সর্ব্বনাশ হয়। এই আত্ম-প্রবঞ্চনার হস্ত হইতে নিস্তার না পাইলে. সকল পরিশ্রমই বৃথা। অধর্ম্ম যখন ধর্ম্মের বেশে মানুষকে প্রতারণা করে, তখন কঠোর আত্ম-পরীক্ষার অস্ত্রপ্রয়োগে সে সংগ্রামে জয়ী হইতে হইবে। এই মহাসংগ্রামে ইহা একটী পরীক্ষিত সত্য যে প্রেয় পরাজিত হইয়াও সে পরাজয় স্বীকার করে না; অবশেষে মহীরাবণ মিত্র বিভীষণের বেশে আসিয়া শ্রীরামের বিনাশ সাধনে উদ্যত হয়। মনে রাখিতে হইবে, যে বেশেই আসুক, মহীরাবণ শ্রীরামের মহাশত্রু। শ্রেয়ঃ এক, প্রেয় বহু। প্রেয় প্রত্যেকেই শ্রেয়ের রূপ ধরিয়া সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে। কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে অর্জ্জুনের রথে শ্রেয়োরূপী নারায়ণ, কিন্তু তাঁহাকে অগণ্য নারায়ণী সেনা ঘিরিয়াছে, সকলেরই নারায়ণের রূপ। কিন্তু সকলকেই রণে পরাস্ত করিতে হইবে। আমিত্বের এই শেষ প্রকাশকে বিনাশ করিতে না পারিলে, আর নিস্তার নাই। জানি, ইহা করিতে হইলে হৃদ্‌পিণ্ড বিদীর্ণ হইবে, নারায়ণী সেনা বিনাশের জন্য অর্জ্জুনকেও হৃদয়ের রক্ত অভিমন্যুকে বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল। আমাদেরও প্রত্যেককেই এই আমিত্বের শেষ দাগ মুছিয়া ফেলিয়া সংগ্রামে জয়ী হইতে হইবে। তাই বলি ভাই স্বদেশসেবক, স্বদেশসেবার নামে তোমার সহিদ (martyr) হইবার বাসনা তোমাকে প্রতারিত করিতেছে না তো? ভাই পরোপকারি, পার্শ্ববর্ত্তিগণের প্রশংসা তোমার চালক নয় তো? হে সাধক, ঐ যে নাম করিতে করিতে তোমার নয়ন হইতে দরবিগলিত ধারে অশ্রু বহিতেছে, ইহাতে ভক্তের গৌরব-মুকুট মস্তকে ধারণ করিবার আকাঙ্ক্ষা অজ্ঞাতসারে তোমার অন্তরে কার্য্য করিতেছে না তো? যদি হয়, ভাই, সাবধান! এই শেষ শত্রুকে বিনাশ করিয়া সংগ্রামে জয়ী হও, শান্তি তোমারই জন্য।

সামঞ্জস্যের বিপদ

গ। এই যে মানব অন্তরে উচ্চ আমি ও নিম্ন আমির সংগ্রাম ইহাই দেবাসুরের সংগ্রাম। এই সংগ্রামেই মানবের মানবত্ব নিহিত রহিয়াছে। এই সংগ্রাম যেখানে আরম্ভ হয় নাই, সেখানে মনুষ্যত্বেরও জন্ম হয়

নাই, এবং যেখানে নিম্ন আমিকে সম্পূর্ণরূপে উচ্চ আমির অধীন না করিয়া দিয়াই সংগ্রামের অবসান হইয়াছে, সেখানে মনুষ্যত্বেরও বিনাশ হইয়াছে। মানব-অন্তরে এ দুয়ের সমাবেশ চিরদিনই থাকিবে। ঋগ্বেদের সময় হইতে ঋষিগণ মানবের মধ্যে এই দুই তত্ত্ব স্পষ্ট অনুভব করিয়া আসিতেছেন। তাই তাঁহারা সর্ব্বকালে গাহিয়াছেন, "দ্বা সপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।" এই দুইয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে যাইয়াই যত দর্শনের আবির্ভাব হইয়াছে। কেহ বলেন এ দুই এক, বিভিন্নতা ভ্রান্তি। কেহ বা সিদ্ধান্ত করিলেন—এই দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেহ সিদ্ধান্ত করিতে যাইয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদী হইলেন, কেহ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হইলেন। অবশেষে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অনির্ব্বচনীয় ভেদাভেদ প্রতিষ্ঠা করিলেন। কবিগণ বা পৌরাণিকগণ কখনও বা ইহাকে 'নরনারায়ণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, কখনও বা মানব অন্তরে 'নরহরি'র যোগ দেখিতেছেন। এখনও যে এ সম্বন্ধে শেষ কথায় মানব-জ্ঞান উপনীত হইয়াছে তাহা নহে, তবে ইহা বুঝা যাইতেছে, যে, যদি মানবাত্মা এই উচ্চ আমির সঙ্গে কার্য্যগত জীবনে (actually) এক হইত তবে যেমন এই সংগ্রাম নিতান্তই অর্থহীন হইত, তেমনি আবার যদি বস্তুতঃ (really) এ উভয় এক না হইত তবে এ সংগ্রাম, এ চেষ্টা প্রহেলিকায় পরিণত হইত। যে আদর্শ (Ideal) বস্তুত্বের (Reality) ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা তো আলেয়া, তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া লাভ কি? আবার আমার আমিত্ব যদি ঐ বস্তুর সঙ্গে এক না হয়, তবে ঐ আদর্শের সঙ্গে আমার মূলতঃ কোনই যোগ নাই, সুতরাং আমার পক্ষে ঐ আদর্শ আয়ত্ত করিবার আকাঙ্ক্ষাও নিতান্ত ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। এরূপ স্থলে মানব ভাষার অগম্য এই ভেদাভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। অপর পক্ষে, মানব অন্তরে যে আদর্শ, যে উচ্চ আমি বিদ্যমান, তাহা পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ ব্যতীত আর কেহ নহেন। কেন না, সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ ব্যতীত অন্য কোনও নিম্নভূমিতে বস্তু ও আদর্শের একত্ব সম্ভব নহে এবং বস্তুত্বের ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত না হইলে আদর্শ আদর্শ ই নহে, মরীচিকা মাত্র। হে মানব, তুমি কি একবারও চিন্তা করিয়া দেখ, কি মহান্ বস্তু সর্ব্বদা হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছ এবং কি মহান্ বস্তু হৃদয়ে ধারণ করিয়াছ বলিয়া তুমি মানব হইয়াছ? তুমি বুদ্ধ যিশুর দেবত্ব (Divinity) খুঁজিয়া হয়রান্ হইলে, একবার তোমার নিজের দেবত্বের দিকে দৃষ্টি করিলে না? তুমি অন্যের দেবত্ব প্রমাণ

মানবে দেবাসুর

আদর্শ ও প্রকৃত

করিবার জন্য আকাশ পাতাল তন্ন তন্ন করিতেছ, কিন্তু নিজের মধ্যে যে দেব-শিশু বাস করিতেছেন, তাঁহার উপযুক্ত যত্ন করিলে না? পৌরাণিক মানুষে দেবত্ব অনুসন্ধান করিতেছ, আর ঐ তোমার পার্শ্ববর্ত্তী ভ্রাতার মধ্যে যে দেব-শিশু রহিয়াছেন, তাঁহাকে হয় তো কত প্রকারে অবজ্ঞা করিতেছ, অপমানিত করিতেছ! সকল মানুষ Divine, তাই বুদ্ধযিশু Divine। মহাপুরুষদিগের Divinity কোনও অতিমানবীয় শক্তির লীলা নহে, উহাও বিশ্বজনীন মানবত্বের অটল ভিত্তিমূলে দণ্ডায়মান। তাহা না হইলে বুদ্ধ যিশুর সঙ্গে মানবের কোনও সম্বন্ধ থাকিত না। যে Divinity প্রত্যেক মানবের সাধারণ সম্পত্তি, বুদ্ধ যিশুতে যদি সেই Divinityরই আবির্ভাব না হইত, তবে তাঁহারা মানব-সমাজে 'একঘরে' হইয়া থাকিতেন, মানব সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিতেন না।

প্রতি মানবে দেব

মানব জীবনের প্রতি এই ঐশী দৃষ্টি স্থির রাখিতে পারি না বলিয়াই আমরা গৃহে বা কার্য্যক্ষেত্রে, উপাসনালয়ে বা ক্রীড়াভূমিতে সর্ব্বদা সাধু ব্যবহারে সমর্থ হই না। যে মুহূর্ত্তে নিজের সম্বন্ধে এই দৃষ্টি খুলিয়া যায়, সে মুহূর্ত্তে সাধক গাহিয়া উঠেন—

শ্রীহরিদর্পণে রূপ নরহরি, নিরখি আনন্দে দুনয়ন ভরি,
নিজ পদধূলি নিজ মাথে তুলি লইব ভকতি করি।

আবার ভ্রাতার সম্বন্ধে এই দৃষ্টি লাভ হইতে না হইতেই তাঁহার পদ ধারণ করিয়া আত্মার অন্তস্তল হইতে ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হয়। তখন সাধক বলেন—

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহার শয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথ বাপ্যচ্যুত তৎ সমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥

"যে তোমারি আত্মারূপে প্রকাশ সেই ব্যাপ্ত চরাচরে" এই তত্ত্ব যখন মানব-অন্তরে প্রকাশিত হয় এবং ইহা বুঝিয়া মানব যখন ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র আমিত্বকে ঐ উচ্চ আমির নিয়মাধীন করিয়া দেয়, তখনই মানবে প্রকৃত মহত্ত্বের আবির্ভাব হয়। জগতে যাঁহারা মহাজন বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবনে অল্পাধিক পরিমাণে ইহার দৃষ্টান্ত লক্ষিত হইয়া থাকে। নহিলে তাঁহারা মহাজন হন না।

মহাপুরুষগণের জীবনে যে একটা অতিমানুষিক সাহস দেখিতে পাওয়া যায়, নিম্ন আমির দিক্ হইতে তাহার কোনই ব্যখ্যা হইতে পারে না।

মানুষের দিক্ হইতে বিচার করিতে গেলে, তাহা 'গোঁয়ার তুমি'র নামান্তর হইয়া দাঁড়ায়। যে সাহস-বলে সহস্র সহস্র আততায়ীর সম্মুখীন হইয়া পার্কার বলিলেন, "তোমরা আমাকে মারবে? তা কখনই পারিবে না", সে সাহসের জন্মস্থান কি দশ জনের মধ্যে এক জন এই ক্ষুদ্র আমি? যখন দেশ শুদ্ধ সকল লোক, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় বিপক্ষে, যখন আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ সাবধানতা না লইয়া ঘরের বাহির হওয়া নিরাপদ মনে করিতেছেন না, তখনও হাসিয়া রামমোহন বলিলেন, "আমাকে মারবে, ওরা কি খায়?" এ সাহস ক্ষুদ্র আমিত্বের ঐ নিম্নভূমি হইতে উৎপন্ন হয় না। আপনার মধ্যে এমন বস্তুর সাক্ষ্য লাভ করিয়া মানুষের এ সাহস হয়, যে বস্তুকে অস্ত্রে ছেদন করে না, অগ্নি দাহন করে না—'নৈনং শস্ত্রাণি ছিন্দন্তি নৈনং দহতি পাবকঃ'। ঐ অজর অমর নিত্য শাশ্বত বস্তুর হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেই মানুষ অচ্যুত স্থান লাভ করে, ভাগবতী তনুর অধিকারী হয়, আর মৃত্যু ভয় দেখাইতে পারে না—'অজো নিত্যো শাশ্বতোহয়ং পুরাণঃ ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'। আবার যখন মহাপুরুষগণের অমানুষী আশার কথা ভাবি তখনও অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। যুগধর্ম্মের অভিব্যক্তি চারিদিকে দেখিয়াও তো আমরা আমাদের আশাকে সম্পূর্ণ সন্দেহ মুক্ত রাখিতে পারিতেছি না। আর যে সময়ে রামমোহনের হৃদয়ে ছাড়া যুগধর্ম্ম আর কোথায়ও বাহিরে প্রকাশিত হয় নাই, তখনই তিনি ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া বলিতেছেন—"আজ যাহারা আমাকে উৎপীড়ন করিতেছে, তাহাদেরই বংশধরগণ কৃতজ্ঞচিত্তে আমার কার্য্য স্মরণ করিবে"। এ বিভিন্নতা কেন? আমাদের দৃষ্টি এই ক্ষুদ্র আমির উপর, আর রামমোহনের দৃষ্টি ছিল দেশকালের অতীত সেই নিত্যবস্তুর উপর। সংগ্রামের অবসানে আমিত্ব যে কিরূপে ঐ আদর্শে একেবারে লীন হইয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত রাজর্ষি রামমোহনের জীবনে কেমন সুস্পষ্ট! কে না জানে, এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য রাজা কেমন প্রাণপাত করিয়া খাটিয়াছিলেন? কিন্তু যখন শিক্ষা কমিটি গঠিত হইল, তখন আপত্তি হইল, যে, রামমোহনের নাম কমিটিতে থাকিলে অনেকে আপনাদের নাম তুলিয়া লইবেন। রামমোহন দ্বিরুক্তি করিলেন না, আপনার নাম তুলিয়া লইলেন। তিনি বলিলেন—"শিক্ষাদানই উদ্দেশ্য, আমার নাম কমিটিতে না থাকিলেই যদি সে কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, তবে তো আমার নাম না থাকাটাই কর্ত্তব্য"। আশে পাশে ত্রিসীমায় কোথায়ও "আমি"

আত্মায় পরমাত্মার উপলব্ধিতেই মহাপুরুষত্ব

জিনিষটার নাম গন্ধ নাই, যে আমির জন্য জগতের যত বিবাদ বিসম্বাদ! কেন না, সংগ্রামের অবসানে কর্ম্মক্ষেত্রের মটো (motto) "কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব।" এই সংগ্রামের অন্তেই শান্তি। কিন্তু চিরশান্তি কি সম্ভব?

চিরশান্তি সম্ভব

মানুষ অপূর্ণ জীব, তাহার পক্ষে কি সংগ্রামের একান্ত অবসান আশা করা যাইতে পারে? আমরা আশা করি ইহা সম্ভব, নইলে সংগ্রাম নিতান্ত অর্থহীন হইয়া পড়ে। মানুষ যত অগ্রসর হয়, আদর্শ যত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর আকার ধারণ করে, সংগ্রামের তীব্রতাও তত বাড়িয়া যায়। যেখানে আগে সংগ্রাম দেখি নাই, সেখানে সংগ্রাম উপস্থিত হয়, সুতরাং আমি যত অগ্রবর্ত্তী হই, নরক-যন্ত্রণাও তত বৃদ্ধি পায়। এরূপ স্থলে, যদি আমি এমন কোন অচ্যুত স্থান লাভ না করি যেখান হইতে "ন পুনরাবৃত্তিঃ," যেখানে সংগ্রামের চির অবসান! তবে আমি অগ্রসর হইয়া নরক-যন্ত্রণার বৃদ্ধি করিব কেন? আমার অগ্রসর হইবার প্রবৃত্তি হইবে কেন? সুতরাং আশা করি, আমি এক দিন "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" হইব। পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ পবিত্রতা, পূর্ণ শান্তি লাভ করিব। এ কথা ঠিক, যে, ভগবানের দার্শনিক স্বরূপগুলি, যথা—জ্ঞান, শক্তি, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি আমার ব্যক্তিগত জীবনে কখনও পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হইবে না, সে গুলির দিকে আমি অনন্তকাল অগ্রসর হইব। দুই কখনও সম্পূর্ণ এক হইয়া যাইবে না। 'এক শাখি'পরে দু বিহগবরে' চিরদিনই থাকিবে। কিন্তু তাঁহার নৈতিক স্বরূপগুলি—প্রেম, মঙ্গল, পবিত্রতা, শান্তি প্রভৃতি এক দিন আমার মধ্যে পূর্ণতা লাভ করিবে, আমি আমার নৈতিক জীবনে ভগবানের সারূপ্য লাভ করিব। ঐশ্বর্য্যে আমি তাঁর সঙ্গে এক হইব না, মাধুর্য্যে তাঁর সঙ্গে একীভূত হইব। ইহাই পরম শান্তি, এইখানেই সংগ্রামের অবসান।

ষোড়শ অধ্যায়

ব্রাহ্মী স্থিতি

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ গীতা, ৭।১৪
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ঐ, ১০।১১

প্রতিদিনই নূতন সমস্যা উপস্থিত হইয়া মানব মনকে আলোড়িত করিতেছে। এই সকলের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্ম-সমস্যা। প্রাচীনকালে যে সমস্যা উপস্থিত হইত তাহা আংশিক—কোন কোন অঙ্গ লইয়া বিচার হইত। এখন মূল লইয়া টানাটানি পড়িয়া গিয়াছে। ধর্ম্মের কোনই প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, ইহা লইয়াই বিচার চলিয়াছে। যদি কোন মীমাংসা পাওয়া সম্ভব হয়, তবে তাহা জীবনের সাক্ষ্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইবে। অন্য কোন মীমাংসা এ যুগে গ্রাহ্য হইবে না। কেবল যুক্তিতর্কের মীমাংসা নয়, শাস্ত্র বা গুরুবাক্যের উপরোধ নয়, কিন্তু জীবনের অপরোক্ষানুভূতি-গোচর সাক্ষ্য চাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এক দিন বলিয়াছিলেন, আমি ইহলোকেও নাই, পরলোকেও নাই, আমি পরমেশ্বরের মহিমা-লোকে আনন্দে বিহার করিতেছি। এইরূপ সাক্ষ্য চাই। তাহা হইতে হইলে, জীবন এবং ধর্ম্ম এই দুইটী বিষয়ই বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। জীবন বলিতে আমরা আমাদের কার্য্যগত প্রকট জীবনই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু তাহা হইলে চলিবে না—আমাদের জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা—সকল লইয়া এই সমগ্র বস্তুটাকেই বুঝিতে হইবে। অন্যদিকে আবার ধর্ম্ম বলিতে কোনও অতিমানুষিক শক্তিতে বিশ্বাস, অথবা এই শক্তির সঙ্গে কেবল মাত্র আমাদের কোনও বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন বুঝিতে হইবে না। এই শক্তির সঙ্গে আভ্যন্তরীণ একত্ব স্থাপন করিতে হইবে এবং ইহার সাহচর্য্যে নূতন করিয়া জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে। সুতরাং সমস্যাটা দাঁড়াইতেছে এই—মানুষ কি স্বীয় জীবনের সমগ্রটার সাক্ষ্যে আপনারই মধ্যে কোনও অতিমানুষিক তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার জন্য প্রেরণা অনুভব করে? যদি করে,

ধর্ম্ম কি?

তবে কি সে আপনার প্রাকৃত জীবনকে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত না করিয়া ইহার হস্তে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে এবং এই উচ্চ ভূমিতে উপবেশন করিতে সমর্থ ?

অধ্যাত্ম ও প্রাকৃত জীবন

মানব জীবনকে একটু মনোযোগের সঙ্গে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, যে কথা পূর্ব্বাধ্যায়েই আলোচিত হইয়াছে, যে অধ্যাত্ম ও প্রাকৃত ভেদে মানব জীবনের উচ্চ ও নীচ দুই অবস্থা রহিয়াছে। এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না, যে, মানুষের একটা ধর্ম্মবিহীন প্রাকৃত জীবন আছে। কেবল যে আমাদের দেহটাই এজন্য দায়ী, তাহা নহে। ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া ও প্রবৃত্তিকুলের কার্য্যের মধ্য দিয়া এই বহির্জ্জীবন আমাদের আত্মার উপর আধিপত্য করিতেছে ও আমাদের আভ্যন্তরীণ জীবনকে নিয়মিত করিতেছে। মানুষ যখন এই অবস্থার অধীন থাকে, তখন তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি সুপ্ত থাকে। ভিতর হইতে কোনও একটা আদর্শের আলোকে সমগ্র জীবনকে নিয়মিত করিয়া ইহাকে একত্ব প্রদান করিবার দিকে কোনই উত্তেজনা দৃষ্ট হয় না। পশু যেমন আহার নিদ্রা প্রভৃতি কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমষ্টি, মানুষও তখন তাহাই থাকে। বলা বাহুল্য, মানুষের প্রকৃত জীবন ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী, মানবজীবন বলিতে আমরা অনেকটা বেশী বুঝি। আমরা এই ব্যষ্টির সীমাকে অতিক্রম করতঃ অনেক উপরে উঠিয়া সমষ্টিগত জীবনের ধারণা করিতে পারি। মানব মন বিশ্বমানব, এমন কি অনন্ত বিশ্বকেই স্বীয় চিন্তার বিষয় করিতে পারে। জীবনসংগ্রামে মানব কেবল মাত্র আত্মরক্ষায় আবদ্ধ না থাকিয়া উপরকার অনেক বিষয় লইয়া নাড়াচাড়া করে। সে সকল মানবের সঙ্গে, এমন কি সকল বস্তুর সঙ্গেই যোগ স্থাপন করিতে সমর্থ। স্বীয় সীমা অতিক্রম করিয়া আপনাকে ইহাদের স্থানে স্থাপন করিতে পারে। ক্ষুদ্র আমিকে ছাড়িয়া দিয়া সে এই বিপুল বিশ্বেই আত্মলাভ করে। ফলে এই হয়, যে, মানুষ ক্ষুদ্রতা হইতে মহত্ত্বে, সসীম হইতে অসীমে, সম্প্রসারিত হয়, তাহার জীবন ব্যষ্টির বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে।

এই যে ব্যক্তিগত জীবনের উপরে উঠা, ইহাতে মানব জীবনের সকল প্রশ্নই নূতন আকার ধারণ করে। প্রাকৃত অবস্থায় তাহার আত্মিক জীবন ক্ষুদ্র আমির সেবায় নিযুক্ত ছিল—কেবল মাত্র উহারই রক্ষার উপায় ও যন্ত্র

মাত্র ছিল। পশুজীবনের সকল নৈপুণ্য ও তৎপরতা শরীর রক্ষায়, বড় জোর বংশরক্ষায় মুখ্যভাবে নিযুক্ত, আত্মিক জীবন নিতান্তই গৌণ ব্যাপার। কিন্তু ক্রমবিকাশের ইতিহাসে দেখা যায়, আধ্যাত্মিকতায় মানব সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জীবন লাভ করে। সে "সত্যং শিবং সুন্দরমের" যে নূতন আদর্শ লাভ করে, তাহা তাহার সম্পূর্ণ নিজস্ব। ইহা আপনার নূতন অর্থ, নূতন তত্ত্ব, নূতন তাৎপর্য্য লইয়া আত্মার মধ্যে নূতন রাজ্য খুলিয়া দেয়। এই রাজ্যে কিছুই স্বতন্ত্র, কিছুই বিচ্ছিন্ন থাকে না; প্রত্যেক অংশ সমগ্রের শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া উঠে, জীবনের অতি ক্ষুদ্র কর্ম্মও সমগ্রের স্পর্শে মহৎ হইয়া যায়।

প্রাকৃত জীবন পর-চালিত

এইখানে আরও একটী বিশেষত্ব উপস্থিত হয়। প্রাকৃত অবস্থায় মানুষ আপনার আবেষ্টনের ক্রীড়ণক মাত্র থাকে—তাহার সমগ্র জীবন তখন আবেষ্টনের ঘাত প্রতিঘাতেই গঠিত। এই উচ্চ-স্তরেই সর্ব্বপ্রথম বিষয় ও বিষয়ীর ভেদজ্ঞান আরম্ভ হয়, এবং পরিশেষে এই ভেদকে অতিক্রম করিয়া সে বিশ্বাত্মার সঙ্গে একীভূত হয়। কিন্তু এই যে উচ্চাবস্থার দৃষ্টি, এই দৃষ্টি লাভের সঙ্গে সঙ্গেই আধ্যাত্মিক জীবনের প্রকৃত সংগ্রাম আরম্ভ হয়, যাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। দেবত্বের পথ, মহত্ত্বের পথ সুগম নয়; আধ্যাত্মিক জীবন পুষ্পাস্তৃত নহে। উহা কঠোর সংগ্রামের পথ। সে এই উচ্চতর জীবন আপনার মধ্যেই দেখিতে পায়, অথচ ইহার সঙ্গে আপনাকে একীভূত অনুভব করে না। ইহার সঙ্গে আপনার বাস্তব বিরোধই দেখিতে পায়। আমি অথচ আমি নই, কিন্তু আমাকে ইহা হইতেই হইবে, উহা আমাকে গড়িয়া লইতে হইবে—মুক্তি স্বর্গ হইতে আমার জন্য নামিয়া আসিবে না। আমি চাই, আমাকে পাইতেই হইবে, অথচ পাই না; পাইতেই হইবে, অথচ আমার শক্তিতে কুলায় না। ধর্ম্ম-জীবনের প্রারম্ভে এই যে ভীষণ সংগ্রাম ইহা কে না অনুভব করিয়াছেন? 'আর হ'ল না' বলিয়া কত জন না আবার সেই পুরাতন প্রাকৃত জীবনেই ফিরিয়া যায়! কিন্তু সেখানেও সোয়াস্তি নাই। যে একবার এ মদিরার আস্বাদন পাইয়াছে, সে আর ইহা ছাড়িয়া সুখে নিদ্রা যাইতে পারে না। হয় তো প্রকৃত পথ ছাড়িয়া ভ্রান্তপথে, কল্পিত সহজ পথে অগ্রসর হইতে যায়, মনকে প্রবোধ দিতে যায়। নিজে হারিয়া গিয়া বাহিরের শাস্ত্র-গুরুর আশ্রয় লয়, কিন্তু সকলই বৃথা। গুরু বা শাস্ত্র, অবতার বা মহাপুরুষের সাহায্যে এই তত্ত্বের সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়া মানুষ সেই দেশকালাতীত

বস্তুকে কেবল দেশ কালের অধীন করতঃ তাঁহার বিশেষত্বের বিনাশ সাধন করিয়াছে। অন্তরে যে অধ্যাত্ম রাজ্যের অনুপ্রকাশে এই সংগ্রাম, বাহিরের কোন অস্ত্রশস্ত্রে সে রাজ্য জয় হইবে না। কিন্তু হায়! আত্মশক্তি যে পরাস্ত হইয়া গেল, দেবপ্রসাদ ভিন্ন আর উপায় কি? কোন উচ্চতর শক্তি আমার আত্মশক্তিরূপে আমার মধ্যে আত্মপ্রকাশ না করিলে আর এই বিবাদের মীমাংসা নাই। বাহির হইতে কোন শক্তি শান্তি আনয়ন করিতে অসমর্থ। এই বিরোধ, এই দ্বৈতবুদ্ধি, ভেদবুদ্ধি আমারই আত্মার মধ্যে। যে শক্তি এই বিরোধের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া সমন্বয় সংসাধন করিবে সে শক্তিকে আমার আমির সঙ্গে এক হইতে হইবে। বাহিরের অভ্রান্ত শাস্ত্র ও গুরুর সে সাধ্য নাই। জীবনের অভিজ্ঞতায় প্রতিমুহূর্ত্তে আমাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হইবে, যে, সেই আধ্যাত্মিক শক্তি আমাকে ধরিয়া তুলিয়া আপনার সঙ্গে এক করিয়া ফেলিতেছে, আমিও তাঁহাকে প্রতিমুহূর্ত্তে নিজের জীবনের রক্ত মাংসরূপে গ্রহণ করিয়া আত্মসাৎ করিয়া ফেলিতেছি। ইহাই **ব্রাহ্মী-স্থিতি**। ব্রহ্মশক্তির কার্য্য জীবনের কোন অংশ বিশেষে আবদ্ধ করিলে চলিবে না। সমগ্র জীবনে ইঁহার সঙ্গে যোগ অনুভব করিতে হইবে—সকল কার্য্যে সকল ঘটনায় ইঁহার প্রেরণা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে হইবে। এই উপলব্ধি কেবল ধ্যানের বিষয় থাকিবে না, তিনি যে চালাইতেছেন তাহা কার্য্যগত জীবনে কর্ম্মের মধ্যে স্পষ্ট ধরা-ছোঁয়ার মত অনুভূত হইবে। কৃষক জমি আবাদ করে—যে বারিধারায় জমিতে সোণা ফলিবে, তার জন্য তাহাকে অপেক্ষা করিতেই হইবে। কিন্তু বারিধারা যখন নামিয়া আইসে, তখন যদি সে চক্ষু মেলিয়া তাহা দেখিতে না পায়, তাহা যদি জীবনের পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া কেবল চিরদিন অনুমান করিয়াই লইতে হয়, তবে আধ্যাত্মিক জীবনের সার্থকতা হইল না। জীবনে জীবনে যোগ অনুভব করা চাই। জগতে যাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, আস্তিকই হউন আর নাস্তিকই হউন, কর্ম্মক্ষেত্রে এক উচ্চতর শক্তির প্রেরণা ও আশ্রয়ের সাক্ষ্য তাঁহারা দিয়াছেন। একজন মনস্বী রাষ্ট্রনায়ক বলিয়াছেন—যখন যুক্তি-তর্ক করিতে বসি, তখন ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে যদি তিনি তাঁহার সঙ্গে যোগ অনুভব না করিতেন, তবে রাষ্ট্রীয় গুরুভার বহন তাঁহার মনুষ্য-শক্তির পক্ষে অসম্ভব হইত।

ব্রহ্মাবির্ভাবে অধ্যাত্ম জীবন

যাহা হউক, যখন মানুষ আপনার মধ্যে এই অধ্যাত্ম শক্তির প্রকাশ দেখিতে

পায় এবং ভগবৎ-কৃপায় এই নূতন রাজ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করে, তখন তাহার জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠে। যদিও উন্নতিমার্গে এই প্রথম পাদক্ষেপে আমরা জীবন-নদীর বেলা-ভূমিতে দাঁড়াইয়াছি মাত্র, তবুও এই-খানেই আমরা নূতন জীবনের—প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবনের সংস্পর্শ লাভ করিতেছি। ইতিপূর্ব্বে আত্মার মধ্যে যে বিরোধ দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা এই-খানেই দূরীভূত হইয়া যায়। এইখানে আসিয়া মানুষ জগতের সঙ্গে একত্ব অনুভব করে। বিশ্বাত্মার সঙ্গে

বিশ্বাত্মাই আমার আত্মা

যোগেই প্রকৃত প্রেমের আবির্ভাব এবং এই প্রেম হইতেই আনন্দের জন্ম। জগৎ হইতে আপনাকে পৃথক ভাবিয়াই মানুষ শোক প্রাপ্ত হয়, মোহগ্রস্ত হয়। কিন্তু এখন সর্ব্বভূতান্তরাত্মাকে আপনার আত্মারূপে অনুভব করিয়া মানুষ শোক ও মোহ হইতে মুক্তি লাভ করে—"তত্র কঃ মোহঃ কঃ শোকো একত্বমনুপশ্যতঃ।" মানবজীবনে প্রাকৃত জীবনের অতীত এই যে এক অধ্যাত্ম রাজ্যের আবির্ভাব, ইহা অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার; কিন্তু ইহাই আবার ধর্ম্মেরও খাঁটি প্রমাণ। এই ধর্ম্ম ছাড়া প্রকৃত সভ্যতা সম্ভব নয়। যে সভ্যতা প্রাকৃত জীবনের অতীত এই অধ্যাত্ম জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ অস্বীকার করে, তাহা বর্ব্বরতার নামান্তর মাত্র। অন্য-দিকে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ধর্ম্মসমস্যা বর্ত্তমান। এমন কোন দৃঢ় মনীষা-সম্পন্ন লোকচরিত্র কল্পনা করা যায় না, যিনি প্রাকৃত জীবনের উপরে উঠিয়াছেন, অথচ এই অপ্রাকৃত শক্তির পরিচয় লাভ করেন নাই। আমরা যে পরিমাণে এই প্রাকৃত জীবনকে প্রতিহত করিয়া উন্নততর আধ্যাত্মিক রাজ্যের দিকে অগ্রসর হই, সেই পরিমাণে "সত্যং শিবং সুন্দরম্" আমাদের মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠেন। কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম-জীবনের বিপদও বিশেষভাবে ঘনীভূত হইয়া উঠে।

তবে অপূর্ণতা কেন?

আমরা তো ধর্ম্মের দিক্ হইতে আশা করি, ঈশ্বর যখন সর্ব্ব-শক্তিমান্ তখন এই অধ্যাত্ম রাজ্যের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অসত্যের স্থানে সত্য, অন্যায়ের স্থানে ন্যায়, অজ্ঞানের স্থানে জ্ঞান আপনা হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু অভিজ্ঞতা তো তাহা বলে না, জগতের দুঃখ কষ্ট, পাপ দুর্ব্বলতা যেমন তেমনই তো থাকিয়া যায়। বহির্জ্জগৎকে কি মানবের জীবন-মরণ সুখ-দুঃখের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন দেখিতে পাই না? ভূকম্পন, ঝঞ্ঝাবাত, জলপ্লাবন সর্ব্বদাই মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে; ইহা অপেক্ষাও গুরুতর বিপদ মানবাত্মার অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্য। কই, মঙ্গলস্বরূপ তো মানবাত্মার মধ্যে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইতেছেন না! মানুষ কেন স্বীয় আধ্যা-

ত্মিক শক্তিকে প্রাকৃত জীবনের সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিতেছে? ইহার মীমাংসা কি? আমরা যে অধ্যাত্ম রাজ্যের কথা বলিতেছি, মানবাত্মার উপর যাহার প্রভুত্বের কথা স্বীকার করিয়াছি তাহার সঙ্গে ইহার সঙ্গতি কোথায়?

মানবজ্ঞান এখন যতদূর উঠিয়াছে তাহাতে যে মানুষ এখনই এই প্রশ্নের সম্যগ্ উত্তর দিতে পারিবে, তাহা মনে হয় না। আবার কার্য্যগত জীবনে যে যে ভাবে প্রশ্নটি বুঝিবে তাহার নিকট মীমাংসাও সেই আকার ধারণ করিবে। বাস্তবিক, মানুষ সাধারণতঃ বুদ্ধিবিচারের দ্বারায় মীমাংসায় উপনীত হয় না, কিন্তু জীবন যে মীমাংসায় উপনীত করে, মানুষ তাহাকেই একটা বুদ্ধি-বিচারগত ভিত্তি দেয়। মঙ্গলবাদী মঙ্গলকে ধরিয়া ফেলিয়াছেন, সুতরাং জরা মরণ ব্যাধির সঙ্গে উচ্চতর জীবনের কোন অসামঞ্জস্য তিনি দেখিতে পান না। সন্ন্যাসী এগুলি গ্রাহ্যই করেন না। বরং তিনি ভাবেন, এই গুলির সঙ্গে সংগ্রাম করা, ইহাদের উপর জয়লাভ করার জন্যই তো জন্ম। এই গুলিকে পিষিয়া মারিয়াই তিনি আনন্দ লাভ করিতে শিখিয়াছেন। আধ্যাত্মিক শক্তিবলে তিনি দুঃখ কষ্ট মৃত্যুকে আপনার মুক্তি-সাধনে নিয়োজিত করিতে সমর্থ। ধার্ম্মিক ভাবেন, যাহা আমাকে প্রাকৃত জীবন হইতে সরাইয়া ভগবানের দিকে আনিয়া দিয়াছে তাহা কি অমঙ্গল? যিনি মৃত্যু বা ব্যাধি বা শোকরূপ ভেলায় সংসারের এ পারে আসিয়াছেন, কোন যুক্তিই এগুলিকে তাঁহার নিকট স্বর্গরাজ্যের পরিপন্থী বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিবে না। একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের কথা শুনিয়াছিলাম, স্ত্রীর উল্লেখ করিতে যাইয়া দুই হস্ত তুলিয়া প্রণাম করিতেন—কেন না, তাঁর 'কৃপা'য় তাঁহার সংসারাসক্তি সাড়ে পোনের আনা কমিয়া গিয়াছিল! জীবনের অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য কোন যুক্তি টলাইতে সমর্থ নয়। জগতে পাপ তাপ অজ্ঞানতা আছে, ইহাদের সঙ্গে সংগ্রামেই তো মানুষ স্বর্গরাজ্যে বাস করিবার শক্তি লাভ করে, নবজীবন প্রাপ্ত হয়, আধ্যাত্মিকতায় জন্ম গ্রহণ করে! বিশেষতঃ যে দুঃখের আস্বাদন পায় নাই, সুখ কি তাহা সে বুঝিবে কিরূপে? যে কখনও সংগ্রাম করে নাই, শান্তি কি তাহার কাছে অর্থহীন নয়? এগুলি যদি না থাকিত, সংসারের হিসাবে সুখী হইয়া মানুষ যদি উচ্চ জীবনের কথা ভুলিয়া থাকিত, তবেই কি সে বেশী লাভবান্ হইত? তুমি যদি তোমার আত্মার বিনিময়ে সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হও তবে তোমার কি লাভ হইল? যাঁহার মধ্যে অধ্যাত্ম

কার্য্যগত জীবনের মীমাংসা

রাজ্য খুলিয়াছে, যিনি ধর্ম্ম-জীবনের আস্বাদন লাভ করিয়াছেন, তিনি প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন; অন্যের পক্ষে উহা অবোধ্য; কেন না, দেখিবার শক্তিই তাহার নাই। ভগবৎ কৃপায় নবজীবন লাভ না হইলে, নূতন দৃষ্টি না খুলিলে, আর উপায় নাই।

মুক্তিতে মানুষের সহকারিতা

এই নবজীবন যখন আসে, সঙ্গে সঙ্গেই ইহার এক নূতন সামাজিক আবেষ্টন গঠিত হইয়া উঠে। ইহা যখন স্বর্গের দান, ইহা কিছুতেই মানবীয় কিছুর সঙ্গে রফা করিয়া চলিতে পারে না। করিলেই উহার মৃত্যু। অনন্তের করুণায় অনন্ত-জীবন যখন তাহার মধ্যে প্রবেশ করে, তখন মানবের সকল ক্ষুদ্রতা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, সে নিজেই নবীভূত হইয়া উঠিবে, অনন্তকে ক্ষুদ্রে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিবে না। ইহা ভগবানের কৃপায় সম্পাদিত হইবে সত্য, কিন্তু মানুষের সাহচর্য্য ছাড়া ইহা হইবে না; অনন্তকে গ্রহণ করিবার জন্য সকল দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়া দাঁড়াইতে হইবে। ঐ যে সংগ্রামের কথা বলা হইয়াছে, ঐ সংগ্রামে মানুষ সংসারের সঙ্গে আপোষ করিতে চায় না, বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায় প্রাণ দিয়াও বিশ্বাস রক্ষা করিতে চায়—মনের এই ভাবের উপরই দ্বার খুলিবে কি না খুলিবে তাহা নির্ভর করে। এ কথা সত্য, মানুষ যত বড়ই হউক না কেন, সে ভগবৎ-বিষয়ে শিশুর ন্যায় আধ আধ কথাই বলিবে—উপমা রূপক সাহায্যেই সে অগ্রসর হইবে—"যত জানি, তত জানি নে" ইহা ভগবানের সম্বন্ধে মানুষের পক্ষে নিত্য কালের সত্য। ইহাও আবার তেমনই সত্য, যে আমাদের ধর্ম্মভাবকে যুগোপযোগী জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্মত সর্ব্বোচ্চ আকারে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব। আমাদের উপমা ও রূপক দিন দিন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর আকার ধারণ করিবে। তিনিই যে যুগে যুগে আপনাকে নব নব ভাবে যুগধর্ম্মরূপে প্রকাশিত করিতেছেন, তাহা ভুলিলে ধর্ম্ম টিঁকিবে না। জগতে এই পরিবর্ত্তন নিয়তই চলিতেছে। প্রাচীন কালের ধর্ম্মবিধান সকলকে আমরা সম্মান করিয়া থাকি। সব বিধানই এক রূপের বা এক সময়ের নয়। পূর্ব্বের বিধানের পরিবর্ত্তিত রূপ পরের বিধান, অথচ পরেরটীকে আমরা পরিত্যাগ করিতেছি না। কিন্তু নূতনের বেলায় আমরা এই সম্মান প্রদান করিতে নারাজ। (৩৮৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা যখন দেখিতেছি, যে পূর্ব্বে পূর্ব্বে ধর্ম্মের যে সকল রূপ ও রূপক যথেষ্ট বলিয়া মনে হইয়াছে, পরে পরে তাহা নিতান্ত অসার বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে, তখন

বর্ত্তমান সময়ে যদি ধর্ম্মের স্বরূপের সঙ্গে রূপের একটা গুরুতর অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়, তাহা দূরীভূত করা কি প্রত্যেক মানুষের জীবনের একটা অতি বড় ধর্ম্ম্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না? প্রাচীন কালের মানুষের তুলনায় বর্ত্তমানের মানুষকে এত ক্ষুদ্র বলিয়া বিবেচনা করিবার কি যুক্তিযুক্ত কারণ বিদ্যমান আছে? বিচার করিয়া দেখিলে সম্মানের দাবী বিপরীত মার্গ অবলম্বন করে। মানুষের মধ্যে তো ভগবৎ-শক্তি অবতীর্ণ হইয়া জগৎকে উন্নততর মার্গে প্রধাবিত করে। অতীতের নিগড়ে বর্ত্তমানের মানুষের হাত পা বাঁধিয়া দিলে কি ইহাই বলা হয় না, ভগবান্ জগৎ হইতে স্বীয় শক্তি প্রত্যাহার করিয়াছেন—আর তিনি মানুষের মধ্যে নূতন তত্ত্ব প্রকাশিত করিবেন না, নূতন শক্তি প্রবাহিত করিবেন না। বাস্তবিক পক্ষে এক এক জন মানুষকে কি অতীতেরও নিয়ামক বলিয়া মনে হয় না? তাঁহারা অতীতের সম্বন্ধে ধারণা এমন ভাবে বদ্‌লাইয়া দেন, মনে হয় নূতন জগৎই যেন গড়িয়া দিলেন, যেন একটা নূতন স্রোতই প্রবাহিত হইল। তার পর, এই গঠন কার্য্য, মানুষের এই সৃজনী শক্তি যে অতীতের ধারণাকে বদ্‌লাইয়া দিয়াই শেষ হইয়া গেল, তাহা নহে। এই নূতন ধারণার স্রোত আসিয়া বর্ত্তমানকে আঘাত করে—অনেক সময়ে বর্ত্তমানের গতিকে ফিরাইয়া ইতিহাসকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলে ও ভবিষ্যতের গোড়া পত্তন করে। যে মানুষ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানকে এমনই ভাবে নিয়মিত করিবার সামর্থ্য ধারণ করে, অতীতের দোহাই দিয়া তাহাকে অনেকে সাক্ষী-গোপাল মাত্রে পর্য্যবসিত করিতে উদ্যত। ইতিহাস সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞানের অভাবই এই অনর্থের নিদান।

প্রাচীনে প্রত্যাবর্ত্তন ভ্রান্ত পথ

বহির্জ্জগৎ ও ইতিহাসের ধারণা লইয়া বিচার করিলে বর্ত্তমান কাল প্রাচীন কাল অপেক্ষা কত বৃহৎ! দুই বা তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মানুষ যাহাকে সত্য বলিয়া বুকে ধরিয়া সন্তুষ্ট ছিল, আজ তাহা সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে মানবের অজ্ঞানতা-প্রসূত কল্পনা বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। মানুষ আগে যাহাকে ঐশ্বরিক ক্রিয়া মনে করিত, আজ তাহা নিতান্ত কল্পিত পৌরাণিক আখ্যান বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন কালের শীর্ষস্থানীয় যাঁহারা তাঁহারাও এমন সব বিষয়ে বিশ্বাস করিতেন, যাহাতে বর্ত্তমান কালের স্কুলের বালকেরও হাস্যোদ্রেক হয়। সামাজিক ও ব্যাবহারিক এমন শত শত আচার-পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা যায়, প্রাচীন কালের যাঁহারা ঋষি বলিয়া আখ্যাত তাঁহারাও তাহার মধ্যে

দোষ তো দেখেনই নাই, বরং তাহা প্রাণপণে সমর্থন করিয়াছেন; কিন্তু তাহার নাম্ শুনিয়া এখন কেবল সংস্কারকগণ নয়, যাঁহারা পরিবর্ত্তন-বিরোধী তাঁহারাও শিহরিয়া উঠেন। প্রাচীন শাস্ত্রকে বর্ত্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করিলেই হইল না, বরং "গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডক" সঞ্জাত হইল। ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে যাইয়া মিথ্যার প্রশ্রয়ের ন্যায় অপকর্ম্ম আর কিছুই হইতে পারে না। আর প্রাচীনে চলিয়া গিয়াই বা লাভ কি? সাগরসঙ্গমে গঙ্গা কর্দ্দমাক্ত বলিয়া গোমুখীতে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রস্তাব আমাদের কোনই উপকার করিতে সমর্থ হইবে না। ঐ স্রোতে ভাসিয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার তো ঐ কর্দ্দমেই আট্‌কিয়া পড়িতে হইবে না কি? ও স্রোতের অন্য কোথায়ও আমাকে নামাইয়া দিবার শক্তি ও অধিকার নাই। প্রাচীন কালের সত্য মিথ্যা শত গৌরবকাহিনী সত্ত্বেও যখন আমরা এই দশায় উপনীত হইয়াছি, তখন একটু পশ্চাদ্গামী হইয়া ঐ ইতিহাসের প্রাচীন ধারাতেই যদি গা ভাসান দেই, তখন এই বর্ত্তমান দশাই আবার আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আগ্‌ বাড়াইয়া বসিয়া থাকিবে। লাভের মধ্যে কয়েক শতাব্দী বৃথা নষ্ট হইবে। এ রোগের ঐ ঔষধ নহে। যে আলোকে বর্ত্তমানের দুইটী ত্রুটি দেখিয়া অসহিষ্ণু হইয়া অতীতের দিকে তাকাইতেছি, সে আলোক প্রাচীনের নহে। সে আলোক যে প্রাচীনেরও শত ছিদ্র উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইতেছে, তাহা প্রাচীনের প্রতি অন্ধ পক্ষপাতিত্ব বশতঃই আমাদের চক্ষে পড়ে না। এ বিপদে ভগবানে দৃষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করিয়া নূতনকে আলিঙ্গন করতঃ অনন্ত উন্নতিপথে চলিয়া যাওয়াই একমাত্র পথ, অন্য পথ নাই।

অনেকের এই ধারণা যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তি বহিরিন্দ্রিয়ের অনুভূতি, অন্তরিন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য নহে। এই ধারণা অতীব ভ্রান্ত। ইহা সত্য যে প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়ঘটিত জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া মনে হয়। অনুন্নত মনকে ইহা বুঝান সহজ নয়, যে, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহা প্রত্যক্ষ সত্য না হইতে পারে। মনোবিজ্ঞানের যে সকল জটিল তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিলে ইহা অধিগত হইবে, এই অনুন্নত মনের পক্ষে তাহার ধারণা অসম্ভব। কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই দেখা যায়, যে, ইন্দ্রিয়ঘটিত জ্ঞান যাহার উপর সাধারণ মানুষ এত বিশ্বাস করে, তাহা নিতান্ত পরোক্ষ। ইন্দ্রিয় মনে, মন বিজ্ঞানে, বিজ্ঞান সর্ব্বভূতান্তরাত্মা আনন্দে একীভূত না হইলে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভূমি পাওয়া যায় না। ইহা যে কেবল জ্ঞানের মীমাংসা, তাহাও নহে।

জীবনের সর্ব্ব বিভাগে মানুষ আজ বুঝিতেছে, যে এই একত্বের ভূমিতে না দাঁড়াইলে অপরোক্ষানুভূতি হয় না। সমগ্রের দিক্ হইতে অংশের দিকে দৃষ্টি পড়ে, না পড়িলে অংশের সত্যতা নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। ইন্দ্রিয় খণ্ড খণ্ড করিয়া গ্রহণ করে, সুতরাং সম্যগ্ দৃষ্টি ইন্দ্রিয়ের নাই। সত্য বাহির হইতে ভিতরে যায় না, ভিতর হইতেই বাহিরে আসে। এই যে আত্মদৃষ্টি, এই যে সমগ্রের সঙ্গে অংশের একত্বানুভূতি ইহাই অধ্যাত্ম জীবন। (১৩শ অঃ দ্রষ্টব্য)। এই যে জীব-ব্রহ্মের সমাবেশ ইহা মানব জীবনের একটা আকস্মিক বা সাময়িক ঘটনা নহে। বরং এই সমাবেশ অনাদি ও অনন্ত বলিয়াই মানবের পক্ষে ব্রাহ্মী-স্থিতি সম্ভব হইয়াছে। যে পরিমাণে ব্রহ্মত্বের বিকাশ ও জীবত্বের তিরোধান সেই পরিমাণেই অধ্যাত্ম জীবনের পূর্ণতা। মানবের মধ্যে এমন কি আছে, যাহা তাঁহার দান নয়—তাঁহার প্রকাশ নয়? যিনিই ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হইয়াছেন, তিনিই অন্তরে অনুভব করিয়াছেন, এবং বাহিরে প্রকাশ করিয়াছেন, যে মানুষ কিছু নয়, ভগবান্ই সব। মানব জীবনের যাহা সর্ব্বোচ্চ পরিণতি তাহা ব্রহ্মের বিকাশ ছাড়া মানুষ আর কিছু ভাবিতে পারে নাই বলিয়াই তো অবতারবাদের ভ্রান্তি জগতে আসিয়াছিল। ইতিহাসে যাহা প্রকাশিত, তাহা নিত্য সত্যের একটী রূপ মাত্র, উহাকে নিত্য সত্যের স্থানে উঠাইয়া দিয়া বসিয়া পড়িলে—উহাকেই সনাতনত্ব দান করিলে, অধ্যাত্ম জীবনের বিনাশ হয়। অধ্যাত্ম জীবন তিল তিল করিয়া গড়িতে হয়, তৈরী পাওয়া যায় না। ইতিহাস আমাদিগকে ততটুকুই সাহায্য করিতে পারে, যতটুকু শক্তি আমরা ইহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারি। ইতিহাস ধর্ম্মজীবনের উৎস নয়, ক্রীড়াক্ষেত্র মাত্র। ইতিহাসের মধ্যে আমরা যে সকল কিছু উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করি, তাহা উহাদের তত্তৎ ঐতিহাসিক রূপটীর জন্য নহে; কিন্তু উহাদের মধ্যে নিত্য সত্যের প্রকাশ দেখি বলিয়াই উহাদের সম্মান করি। তাহা না হইলে ঈশ্বরের স্থানে মানুষের পূজাই প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কেহই ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুর পূজা করেন বলিয়া স্বীকার করেন না। ইহাতে যে কিছু কপটতা আছে, তাহা নহে; কেন না, এখানে কপটতা ও নাস্তিকতা এক পর্য্যায়ভুক্ত। সকলেই ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তবে দুঃখের বিষয় এই, যে, অনেকে অজ্ঞানতাবশতঃ "অবিধিপূর্ব্বকং" ("মোক্ষপ্রাপকং বিধিং বিনা"—শ্রীধর স্বামী) তাঁহার ভজনা করিয়া থাকেন।

সত্য অন্তরে

এ কথা কেহই বলিতে পারিবে না, যাঁহারা এ যুগে ধর্ম্মের নূতন আকার

চাহিতেছেন, তাঁহারা প্রাচীনদিগের অপেক্ষা ধর্ম্ম কম প্রার্থনা করেন। এরূপ উক্তিকে পক্ষপাত-দোষশূন্য বলা যায় না। যখন ধর্ম্মের মূল ভিত্তি লইয়া টানাটানি পড়িয়াছে, তখন সংস্কারার্থীকে বিধর্ম্মী ও নাস্তিক বলিয়া তিরস্কার করিলেই বিপদ কাটিয়া গেল না। সময়ের অনুপযোগী আবরণের মধ্যে আবদ্ধ বলিয়া খোসার অপরাধে শাঁসকেও পরিত্যাগ করিবার যে আয়োজন হইয়াছে, তাহার প্রতি অন্ধ হইলেই ধর্ম্ম রক্ষা পাইবে না। এই দোষে যাঁহারা ধর্ম্মকেই অপ্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেছেন, তাঁহাদের কথার উত্তর দিতে হইবে। প্রাচীনের মধ্যে যে সার বস্তু আছে, তাহাকে সময়োপযোগী আকারে উপস্থিত করাই সেই উত্তর। ইহার মধ্যে 'সে কেলে' কিছু থাকিতে পারিবে না। বর্ত্তমান যুগসম্মত আধ্যাত্মিকতায় ইহার অন্তর বাহির পূর্ণ হইবে, বর্ত্তমান যুগের আশা ও আকাঙ্ক্ষার স্তম্ভোপরি ইহা প্রতিষ্ঠিত হইবে। জগতের উন্নতিমুখী গতি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ভয়ে ভয়ে এক কোণে ধর্ম্মকে স্থাপন করিলে চলিবে না। কেন না, নবালোকে যাঁহাদের ধর্ম্মবৃত্তি সকল সজাগ হইয়াছে, তাঁহারা এই জাগ্রত ভাবটি লইয়া প্রাচীন আবরণের মধ্যেও যদিচ কতকটা তৃপ্তি লাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিলেও থাকিতে পারেন, কিন্তু পরবর্ত্তী বংশের পক্ষে এই সুযোগ থাকিবে না, তাহারা ধর্ম্মস্রোত হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। ইহার একমাত্র সমাধান নব শিক্ষা দীক্ষার সঙ্গে নব যুগোপযোগী ধর্ম্মের আন্তরিক যোগ সংস্থাপন। মহাবিনাশ হইতে রক্ষা পাইবার অন্য উপায় নাই। এই শিক্ষা দীক্ষা ধর্ম্মবিরোধী হইয়া উঠিতেছে সত্য, ইহা ভয়ের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা যে মানবপ্রাণে শান্তি দিতে পারিতেছে না, মানুষ যে আরও কিছু চাহিতেছে, তাহাও যে সত্য। ইহারই মধ্যে মঙ্গলের বীজ নিহিত আছে—মানবাত্মায় অতি-মানব শক্তির কার্য্যের ইহাই সাক্ষ্য। মানুষ উপরের কিছু দেখিয়াছে, তাই এই বাহিরের সভ্যতার চাকচিক্য সত্ত্বেও সে ইহাতে ভুলিতে পারিতেছে না—তাহার অতৃপ্তি যাইতেছে না। যদি কিছু না দেখিত তবে তাহা চাহিত না। ইহা আকাঙ্ক্ষা মাত্র, সফলতা নহে। কিন্তু ইহা আমাদের মনোকল্পিতও নহে, ইহা আলোক-বর্ত্তিকা স্বরূপ স্বর্গ হইতে আমাদের সম্মুখে স্থাপিত হইয়াছে, ইহার স্বপক্ষতা করিতে না পার, বিপক্ষে যাইও না। বিপক্ষে গেলে বিপদে পতিত হইবে। যদি ইহা মিথ্যা হয়, আপনিই বিনষ্ট

বর্ত্তমানের শ্রেষ্ঠতা

সত্য অনিবার্য্য

হইয়া যাইবে। যদি সত্য হয়, তবে ঈশ্বরের বিপক্ষে সংগ্রাম করিয়া নিজেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু যাঁহারা ইহার সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন—নবযুগে নবভাবে ঐশ্বরিক শক্তির লীলায় নিঃসন্দেহ হইয়াছেন, তাঁহারা আনন্দ-মনে প্রত্যেকে আপন আপন শক্তি ও সুযোগানুসারে এই লীলার সহচর হউন। কিন্তু একটী কথা বিশেষভাবে হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া রাখিতে হইবে, যে ব্যক্তিগত জীবন যত কেন উন্নত হউক না, তাহা যদি যুগস্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কার্য্য করিতে যায়, তবে তাহা দ্বারা কোনই উপকার হইবে না। হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন, যে তাঁহারা এই মহাযুগবিবর্ত্তন-লীলায় ভগবানের সহকর্ম্মী, তাঁহাদের কোন চেষ্টাই বৃথা হইবে না। পরিণামে সত্যের জয় অনিবার্য্য। এ কথার মধ্যে অবশ্যই সত্য আছে—সাধু যাঁহার সঙ্কল্প ঈশ্বর তাঁহার সহায়। মনে রাখিতে হইবে, **ব্রাহ্মী-স্থিতি** অলস (statical) ভাব নহে, ক্রিয়াশীল (dynamic) অবস্থা।

সপ্তদশ অধ্যায়

রামমোহনের সেবাধর্ম্ম

যেনোপায়েন দেবেশি ! লোকঃ শ্রেয়ো সমশ্নুতে।
তদেব কর্ত্তব্যং ব্রহ্মস্বৈরেষো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ মহানির্ব্বাণতন্ত্র

আমরা স্থানান্তরে (মহাপুরুষ প্রসঙ্গে) বলিয়াছি রামমোহনের কর্ম্মযোগ কোন সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল না। কেবল দুঃখ নিবারণের চেষ্টাটা পণ্ডশ্রম মাত্র। মানুষ যাহাতে দুঃখে না পড়ে, মিলিত ভাবে সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এক দিকে দুঃখের প্রকৃতি ও তাহার কারণ নির্ণয় করিতে হইবে, অন্য দিকে দুঃখ-নিরাকরণ অপেক্ষা দুঃখ-নিবারণের (prevention) উপায় চিন্তনে বেশী মনোনিবেশ করিতে হইবে। যেমন রোগীর সেবা অপেক্ষা রোগ নিবারণের উপায় উদ্ভাবন মানব সমাজের পক্ষে অধিকতর মঙ্গলজনক। প্রাচীনেরা দুঃখ-নিবারণের দার্শনিক উপায় নির্ণয়ের জন্য বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। বর্ত্তমান যুগের প্রণালী কেবলমাত্র মানসিক নয়, শারীরিকও বটে। বিশেষভাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা-নিচয়কে এমন ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহাতে তাহারা দুঃখের কারণ না হইয়া মানবের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের নিদান হইয়া উঠে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমাদের দেশের বিধবাদের দুঃখের কথা ধরা যাইতে পারে। বিধবাশ্রম স্থাপন করতঃ তাঁহাদের দুঃখের উপশম করিবার চেষ্টা বর্ত্তমান যুগের সেবাধর্ম্ম-নীতির অতি নিম্নতম সোপানের কাজ। সে কাজ করিতে হইবে না তাহা নহে, তাহাও মহৎ কাজ, তাহাও সেবাধর্ম্ম। কিন্তু এই টুকু করিয়াই বসিয়া থাকা যুগোচিত সেবাধর্ম্ম-নীতির কাছে নিন্দনীয়। আমাদের দেশের নারীজাতির একাংশ যে কেন এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন, তাহার কারণ নির্ণয় করিয়া সেই কারণ অপসারণের দিকে মনোনিবেশ করিতে হইবে। তখন দেখিতে পাইব, যে সাধারণ ভাবে নারীজাতির অবস্থার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি এবং বিশেষ ভাবে বিবাহ বিষয়ক নিয়ম গুলির পরিবর্ত্তন ছাড়া এ রোগের ঔষধ নাই। সেই জন্য, যে সমস্ত রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, বিধি ব্যবস্থা, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত ও সমবেত জীবন পরিচালিত সেই গুলির সংশোধন ও পরিবর্দ্ধনের দিকেই রামমোহন মনো-

সেবা প্রণালী

নিবেশ করিয়াছিলেন। নবযুগে তিনি এই সেবাধর্ম্মের প্রবর্ত্তন ও যাজন করিয়া গিয়াছেন।

রামমোহনের সেবাধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গ। ইহা ব্রহ্মজ্ঞানীর সনাতন অর্থাৎ সহজাত ধর্ম্ম। সহজাত যাহা, instinctive যাহা, তাহা করিতে মানুষ বাধ্য। কেন বাধ্য তা সে নাও জানতে পারে—প্রাণের টানে তা সে করেই। তার পশ্চাতে ইতিহাস থাকিতে পারে, কিন্তু মানুষ সে কথা সব সময় জানে না। সেবা ব্রহ্মজ্ঞানীর সনাতন ধর্ম্ম; কেন না, ব্রহ্ম সর্ব্বভূতে অবস্থিত, সর্ব্বসাধারণ জনের সেবাই ব্রহ্মসেবা। ইহাই সেবাধর্ম্মের পারমার্থিক দিক্। প্রত্যেক মানুষ ব্রহ্মের মন্দির—আমার ইষ্টদেবতার আসন। দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবন প্রভৃতি আধিদৈবিক উৎপাত, আন্তর্জ্জাতিক, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, পারিবারিক অত্যাচার অবিচার যা নরনারীর মুখে আমার ইষ্টদেবতার মুখ প্রকাশিত হইতে দেয় না, পরমেশ্বরের কৃপাদৃষ্টিকে লুকায়িত করে—তাদের বিপক্ষে যে সংগ্রাম তা আমার ইষ্টদেবতার মন্দির সম্মার্জ্জন, তাঁহার আসন পরিষ্করণ, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। (পৃঃ ৪১৬) রামমোহনের সেবাধর্ম্ম কেন সর্ব্বগত, কেন তাহা মানবজীবনের কোন বিভাগই পরিত্যাগ করে নাই, আমরা এইখানে তাহার আভাস পাইতেছি। মন্দির কিঞ্চিন্মাত্রও অপবিত্র থাকিলে দেবতার আবাহন হয় না। ইহাই সেবাধর্ম্মের পারমার্থিক তত্ত্ব, কেবল ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট প্রকাশিত। নিজের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখিয়া সকলের মধ্যে তাঁহাকে অভিব্যক্ত করিবার আকাঙ্ক্ষাই ব্রহ্মজ্ঞানীর কর্ম্মজীবনের উৎস। সেইজন্যই লোকশ্রেয়ঃ-সাধনকে রাজা ব্রহ্মজ্ঞের সনাতন ধর্ম্ম বলিয়াছেন। তবে সকলে ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে বাধ্যও নয়, সমর্থও নয়। সেই জন্য সেবাধর্ম্মের একটা ব্যাবহারিক দিকও তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা প্রতিবাসীর সুখদুঃখকে নিজের সুখদুঃখের মত জানিয়া তার সেবা করা। ইহারই উপর মানুষের সকল সুখশান্তি নির্ভর করিতেছে। রাজা বলিয়াছেন, যে মানবের সকল ধর্ম্ম দুইটি মূল আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠা ও পরস্পর সৌজন্যে ও সাধু ব্যবহারে কালহরণ। পরস্পর সাধু ব্যবহারের নিয়ম এই, যে অপরে আমাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলে তুষ্টির কারণ হয়, সেইরূপ ব্যবহার আমরা অপরের সহিত করিব, আর অন্যে যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের অতুষ্টি হয় সেইরূপ ব্যবহার আমরা অন্যের সহিত কদাপি করিব না—সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথাপরে।

সেবার নূতন ভাব

এরূপ অজ্ঞ লোকের অভাব নাই যারা প্রশ্ন করিতে পারে যে **প্রতিবাসীকে এই চক্ষে দেখিব কেন?** আমি কেবল আমারই সুখদুঃখের খবর লইতে বাধ্য। আমিই সব আমার প্রতিবাসী আমিই, সুতরাং তার দুঃখ আমার; ইহাই সেবাধর্ম্মের ভিত্তি। এক দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে এ তত্ত্বটা আমরা অস্বীকার করিব না। কিন্তু ইহা সেবাধর্ম্মের ভিত্তি হইতে পারে না এবং কোথায়ও ইহা হয়ও নাই। কথাটা এই, প্রতিবাসীর বাড়ীতে আগুন লাগিলে দৌড়াইয়া সে আগুন নিভাইতে যাই কেন? একটা সাধারণ উত্তর দেওয়া যায়, যে পরোপকারে মানুষ ঈশ্বরের কৃপাপাত্র হয়। কেহ বলিতে পারেন—আমি ঈশ্বর মানি না, মানি কেবল নিজেকে এবং নিজের সুখদুঃখকে। আমার প্রতিবাসী তো আমিই, তার ঘর তো আমারই ঘর, সুতরাং আমার ঘরের আগুন আমি নিভাইব না কেন? এই যুক্তি শুনিয়া সকলে ঐ তার্কিকের জন্য সর্‌কারের বিষ্ণুতৈলসেবী অতিথিদের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ঘরের দরজা খুলিয়া ধরিবেন, সন্দেহ নাই। কেননা, এই যুক্তি মানুষকে সকল দুষ্কর্ম্মেও প্রবৃত্তি দিবে। আমার প্রতিবাসী তো আমিই, তার টাকাও আমারই টাকা, সুতরাং সে টাকা আমি না লইব কেন, ইত্যাদি। যাহা হউক, প্রতিবাসী ও আমি এক না হইলেও তার বাড়ীর আগুন নিভাইবার জন্য ত্বরা করিবার কারণ আমার পক্ষে যথেষ্টই আছে। তার ও আমার ঘরের মধ্যে এক যোগসূত্র আছে—**ঈশ্বরই যেন না মান, ব্রহ্মজ্ঞানীই যেন হও নাই, ঈশ্বরের কৃপাপাত্র হইতেই যেন চাও না**—কিন্তু ঐ সূত্র ধরিয়া প্রতিবাসীর ঘরের আগুন যে তোমার ঘরে আসে, কত যুগ ধরিয়া পুড়িয়া পুড়িয়া তো অঙ্গার হইতেছ, তবুও কি তা মান না? প্রতিবাসীর কলেরা বসন্ত প্লেগ হইলে তুমি ভয়ে সারা হও কেন? তুমিই সব, সুতরাং প্রতিবাসী মরিলে তুমিই মর বলিয়া কি? না, প্রতিবাসীর সঙ্গে তোমার এমন অঙ্গাঙ্গী যোগ যে তার ব্যাধি নিবারণ না করিলে ও-ব্যাধি তোমাকেও আক্রমণ করিবে। একবার এক আইরিশ্ রমণী দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া আশ্রয় না পাইয়া শেষে পুত্রকন্যাসহ টাইফয়েড রোগে গাছতলায় মরে। সে রোগ গ্রাম ছাইয়া ফেলায় স্থানীয় কাগজের সম্পাদক দুঃখ করিয়া লিখিলেন, যে মহিলাটি যদিও জীবদ্দশায় আপনার ভগিনীত্ব সাব্যস্ত করিতে সমর্থ হন নাই, মৃত্যুদ্বার

সেবার সামাজিক দিক্

দিয়া কিন্তু তিনি তাহা প্রমাণ করিয়া গেলেন; তিনি আমাদের ভগিনী না হইলে তাঁর রোগের উত্তরাধিকারী আমরা হইলাম কেন? আশা করি, আমিই আমার প্রতিবাসী এই মত স্বীকার না করিয়াও আমার ভাই ভগিনী পুত্র কন্যারই ন্যায় প্রতিবাসীরও দুঃখ দারিদ্র্য মূর্খতা দুর্নীতি দূর করিবার জন্য কেন আমি সচেষ্ট হইতে বাধ্য, তাহা আর বুঝাইতে হইবে না। প্রতিবাসীকে জ্ঞানধর্ম্মে অনধিকারী অস্পৃশ্য শূদ্র করিয়া রাখিলে দেশের ব্রাহ্মণগুলিও যে শেষে শূদ্র হইয়া দাঁড়ায়, তাহা আমাদিগকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে হইবে না। আমি ও আমার প্রতিবাসী এক নই, একই দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। হাতের এক বিন্দু রক্ত ক্ষয় হইলে সে বিন্দু পায়েরও ক্ষতি—অথচ হাত পা নয়, পা হাত নয়। সেই জন্য আমিই আমার প্রতিবাসী না হইয়াও প্রতিবাসীর মঙ্গল-চিন্তা আমারই মঙ্গল-চিন্তার ন্যায় করিব, তাহার অনিষ্ট নিবারণে প্রাণপণ করিব। সমাজ-স্থিতির জন্যই পরস্পরের সাহায্য করিব—যে ব্যবহারে আমার অতুষ্টি, প্রতিবাসীর প্রতি সে ব্যবহার করিব না। ইহাই সেবা ধর্ম্মের ব্যাবহারিক্ দিক্। কিন্তু এই সমাজতত্ত্ব আলোচনা করিয়া সকলে সেবাধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে—আলোচনা না করিলে কেহ সেবাব্রত গ্রহণ করিবে না, তাহা নহে। সেবাব্রত সহানুভূতির (Fellow-feelingএর) উপর প্রতিষ্ঠিত। পিতা-মাতা সেবায় আত্মোৎসর্গ, স্ত্রীপুত্রের প্রতিপালন, ভ্রাতাভগিনীর মনস্তুষ্টি, সন্তানগণের মঙ্গলচিন্তা—কোন সমাজতত্ত্ব বা বৈদান্তিক ফিলজফির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আমিই আমার পিতামাতা, সুতরাং তাঁহাদের সেবা করা কর্ত্তব্য, এই হাস্যোদ্দীপক যুক্তি অবলম্বন করিয়া কোন পুত্র পিতামাতার সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। সহজেই মানুষ সেবাব্রত গ্রহণ করে। ইহা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম (Instinct)। মানুষ যেমন স্বার্থ খোঁজে, তেমনই পরার্থেও প্রাণ দেয়—তাহা এইরূপ কোন হাস্যকর যুক্তির তাড়নায় নয়। একজন কাশিলে অন্যের গলা সড়সড় করে, একজন হাই তুলিলে পার্শ্ববর্ত্তী হাই তুলে, একজনকে কাঁদিতে দেখিয়া যে তার প্রতিবাসীর চক্ষে জল আসে, তাহা আমিই আমার প্রতিবাসী 'এই তর্কের খাতিরেও নয় বা এই জ্ঞানলাভের জন্য তাহা বসিয়াও থাকে না। কেননা, উহা মানুষের সহানুভূতি নামক এক মূল বৃত্তির প্রভাব। উহা আটকাইয়া রাখা যায় না।

সহানুভূতির স্বাভাবিকতা

আমি আমার নিজের সুখ কেন চাই তাহার যেমন যুক্তি নাই, না চাহিলেও পারি; তেমনি সর্ব্বদা যে দেখিতেছি, মানুষ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া অন্যের জন্য প্রাণ দেয়, তাহার পশ্চাতেও কোন যুক্তির প্রেরণা থাকে না। পশুপক্ষীও যে সন্তানের অনিষ্টের আশঙ্কা দেখিলে নিজের প্রাণের মায়া ছাড়িয়া সন্তানকে রক্ষা করিতে যায়, তাহার পশ্চাতে কোন বেদান্ত ফিলজফি আছে বলিয়া শুনা যায় নাই। জীবের মধ্যে যে-সকল সহজাত বৃত্তি (Instinct) দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হয় তো ইতিহাসের দিক হইতে আত্মরক্ষা (self-preservation), বংশরক্ষা (preservation of the species) প্রভৃতি আদিকারণে পরিপুষ্ট। মানুষ সামাজিক জীব। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ছাড়া সমাজস্থিতি অসম্ভব। মানুষের মধ্যে পরার্থপ্রবৃত্তি বদ্ধমূল হইবার ইহাই কারণ। রাজা রামমোহন রায় বলিয়াছেন, স্বার্থ ও পরার্থ দুই-ই মানবের স্বাভাবিক বৃত্তি। এই উভয়ের সামঞ্জস্যের উপর ব্যক্তিগত ও সামাজিক মঙ্গল নির্ভর করে। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে এরূপে নিয়োগ করিবে যাহাতে আপনার বিঘ্ন ও পরের অনিষ্ট না হইয়া স্বীয় ও পরের অভীষ্ট জন্মে—ইহাই রাজার নির্দ্দেশ। এখানে স্বার্থ ও পরার্থ একসূত্রে গ্রথিত হইয়া সেবাধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

একান্ত অদ্বৈতে সেবাধর্ম্ম টেঁকে না

প্রতিবাসীকে কেন ভালবাসি তাহার উত্তর আমরা পাইয়াছি; এখন দেখি আমিই আমার প্রতিবাসী, সুতরাং প্রতিবাসীর দুঃখ-নিবারণ আমারই দুঃখ-নিবারণ, এই ফিলজফিতে সেবাধর্ম্ম কূলে উঠে না অকূলে ভাসে। আমার প্রতিবাসী দুর্ভিক্ষপীড়িত, সুতরাং আমিই দুর্ভিক্ষপীড়িত। দুর্ভিক্ষপীড়িতের সেবা করিতে গেলে কষ্ট পাইতে হয়। আমি আমার প্রতিবাসীরূপে দুর্ভিক্ষেও পীড়া পাইলাম, আবার তাহা নিবারণ করিতে যাইয়া দ্বিতীয়বার কষ্ট উপার্জ্জন করি কেন? কষ্টটা এক আধারেই থাকুক্ না। অপরপক্ষে, আমিই যখন আমার প্রতিবাসী তখন আমি পেট পুরিয়া খাইতে পাইলে অন্য কাহারও ক্ষুধার কষ্ট হইতেছে ভাবটা কি মোহ নয়? বিশেষতঃ আমি আমার প্রতিবাসীরূপে উপবাস করিয়া মরি তাহাতে তোমার মাথাব্যথা কেন? আমি শতমুখে খাইতেছি, না হয় দুটা মুখে না-ই খাইলাম—এই উত্তরে যদি সেবাধর্ম্মের অন্ত্যেষ্টি না হয়, আর ফিলজফারের চক্ষু কপালে না উঠে, তবে তিনি যে প্রকৃতিস্থ সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ ঘটিবে। যদি

বল, তুমি কি তোমার নিজের দুঃখ নিবারণ করিবে না? উত্তরে বলি, না! বরং **অপরের কষ্ট নিবারণ করিতে যাইয়া নিজের কষ্টকে বরণ করিয়া লইব, ইহাই সেবা-ধর্ম্ম**। সেবাধর্ম্ম নিজের সেবা নয়, পরের সেবা। Egoism যত বড়ই হউক না কেন—বিশ্ব-জোড়া হইলেও সেবাধর্ম্মের আসনের পক্ষে অতি ক্ষুদ্র। **রামমোহন যদি বামমার্গীয় বেদান্তের এই অহং সর্ব্বস্ববাদের উপর সেবাধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না চাহিয়া থাকেন তবে তাহার কারণ এই, এবং সে কারণ তিনি আমহার্ষ্টকে জানাইয়াছিলেন,** যে বেদান্তের **একান্ত অদ্বৈতের উপর,** সেবাধর্ম্ম কেন, কোন কর্ম্মই প্রতিষ্ঠিত হয় না। বেদান্তের দ্বারা যদি সেবাধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইত তবে সেবাধর্ম্মে দেশ ইতিপূর্ব্বে ছাইয়া যাইত। লক্ষ লক্ষ বৈদান্তিক দেশে অকর্ম্মা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সুখদুঃখটা অনুভূতি। আমি ছাড়া কিছু নাই, আমিই তো তোমার প্রতিবাসী, কিন্তু প্রতিবাসীর সুখদুঃখের অনুভূতি আমার মধ্যে কোথায়? সুতরাং ও সুখদুঃখ মিথ্যা। তত্ত্বের দিক হইতে **এ বেদান্তের পরিণতি মায়াবাদে,** ও জীবনের দিকে ইহার পরিণতি সন্ন্যাসে। কর্ম্মত্যাগে সুতরাং সেবাধর্ম্মের গঙ্গাপ্রাপ্তি। যদি কোন বেদান্তী জীবনে সেবাধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে তাহা তাঁহার পূর্ব্বাভ্যাস, আবেষ্টনের প্রভাব বা পাশ্চাত্যের অনুকরণ প্রমাণ করিবে, বেদান্তের মহিমা ঘোষণা করিবে না। কেননা, বিষবৃক্ষে অমৃত ফলে না। আমার তোমার কাছে যতই উচ্চ হউক না কেন, বৈদান্তিকের কাছে সেবাধর্ম্মও শৃঙ্খল। সোনার শিকলে পা আটকাইলেও তাহা বন্ধন। বৈদান্তিকের হস্তে সেবাধর্ম্মের পরিণতি—

বাস্যৈকং তক্ষতো বাহুং চন্দনেনৈকমুক্ষতঃ।
নাকল্যাণং ন কল্যাণং তয়োরপি চ চিন্তয়েৎ ॥

হাত কাটুক বা চন্দন চর্চ্চিত করুক, কাহারও কল্যাণ অকল্যাণ চিন্তা করিবে না। কাজির কাছে দুর্গোৎসবের পাঁতি আর বেদান্তের উপর সেবাধর্ম্মের ভিত্তি—একই। উভয়েরই স্বর্গলাভ! **একান্ত অদ্বৈতে সকল ধর্ম্মের ন্যায় সেবাধর্ম্মের বিনাশ**। আমিই আমার প্রতিবাসী, এই ফিলজফিতে সেবাধর্ম্ম টিকিবে না। আমি ও আমার প্রতিবাসী এক নই, স্বতন্ত্র। কিন্তু স্বতন্ত্র হইয়াও **একসূত্রে গ্রথিত**—এই দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্ব—

স্বতন্ত্র হইয়াই এক—এই তত্ত্বের উপর সকল ধর্ম্মের ন্যায় সেবাধর্ম্মও প্রতিষ্ঠিত। তবে এই সূত্রটি যে কি তাহা বিভিন্ন অধিকারীর নিকট ও বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হইবে। সাধনায় সিদ্ধ রামমোহনের জ্ঞান ও অনুভূতির নিকট এই সূত্রটি যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে, আমি সেটি আশা করিতে পারি না, কিন্তু তাহাতে সেবাধর্ম্মের কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু তত্ত্বের দিকে এই **দ্বৈতাদ্বৈত** চাই।

পরিপূরক (ঞ)

বেদান্ত ও সেবাধর্ম্ম।

শ্রীযুক্ত (ডাঃ) নরেশচন্দ্র সেন মহাশয় প্রবাসীর ১৩২৬ পৌষের সংখ্যায় **সেবাধর্ম্মের** সমালোচনা করিয়াছেন। আলোচনাটিতে জ্ঞান আছে, গবেষণা আছে। স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইলে সাধারণ পাঠকেরও মনস্তুষ্টি করিতে পারিত। কিন্তু আমার সঙ্গে ইহার কি সম্বন্ধ—এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে যাইয়া আধা ঘণ্টা কেবল মাথা চুল্‌কাইয়াছি, কোন সদুত্তর পাই নাই। শেষে উভয় প্রবন্ধ একত্র করিয়া যে সমাধান করিয়াছি, তাহা এই। নরেশবাবু আমার প্রবন্ধ ভাল করিয়া পাঠ করেন নাই। তাই ফল হইয়াছে বিচার-বিভ্রাট। দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমি বলিয়াছি, "বামমার্গীয় বেদান্তের এই অহংসর্ব্বস্ববাদ," নরেশবাবু সমাধান করিলেন "ধীরেন্দ্রবাবু অদ্বৈতবাদকে অহংসর্ব্বস্ব বলিয়াছেন।" বেদান্তবাদ মাত্রই অদ্বৈতবাদ নয়—বেদান্তের খাঁটি দ্বৈতবাদপক্ষীয় ব্যাখ্যাও আছে—ইহা নরেশবাবুর জানা না থাকিবার কথা নয়। যদি ভুলিয়া থাকেন, তবে তাহা তর্কের ঝোঁকে। বেদান্ত বলিলেই অদ্বৈতবাদ বুঝিবার কোন সমীচীন কারণ নাই। নরেশ-বাবু ভুলিলেন কেন, যে 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যের "তস্য ত্বমসি" এই ব্যাখ্যা বহু শতাব্দী পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। আমি বেদান্ত কথাটাকেও বিশিষ্ট করিয়া দিয়াছি 'বামমার্গীয়' এই শব্দের দ্বারা। তবুও তিনি ভুল করিলেন। অদ্বৈতবাদও নানা রকমের। সেই জন্য আমি "একান্ত অদ্বৈত" শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। তবুও তিনি fallacy করিলেন

এবং উল্টা চাপ দিয়া বলিলেন,"তিনি (ধীরেন্দ্রবাবু) তর্কের উত্তেজনায় ভুলিয়া গিয়াছেন যে বেদান্ত-মতে অহং একটা মায়াসম্ভূত পদার্থ।" তর্কের উত্তেজনা ছিল না, তাহা বলিতেছি না। কিন্তু ভুল করিতে পারি এমন কিছু ছিল বলিয়া মনে পড়িতেছে না। তিনিই ভুলিয়া গিয়াছেন, আমার কিন্তু বেশ মনে আছে, যে, বেদান্তের নানা মতে 'অহং'এর নানা স্থান আছে। তিনি তো নিজেই বলিয়াছেন যে 'সাঽহং' এর 'অহং' রক্তমাংসের শরীরের স্পর্দ্ধা নয়, কিন্তু আত্মার সারভূত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মার গৌরব। এখন জিজ্ঞাসা করি, এই 'অহং'ও একটা মায়াসম্ভূত পদার্থ কি না? যদি উত্তর হয়, হাঁ, তবে 'মায়া' যাইয়া পরমাত্মাকে স্পর্শ করিবে এবং বেদান্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাবাক্য (ইহার ব্যাখ্যা যিনি যে ভাবেই করুন) মায়াসম্ভূত পদার্থ হইবে, এবং মুক্তিতেও মানুষ মায়ার অতীত হইবে না। (খুঁজিলে এই নিম্নতর অর্থে মায়াস্পৃষ্ট ব্রহ্ম বেদান্তের কোন শাখাপ্রশাখায় পাওয়া যাইবে না, তাহা হলপ্ করিয়া বলিতে পারিব না)। অন্যদিকে যদি উত্তর হয়, এ 'অহং' মায়াসম্ভূত পদার্থ নয়, তবে "বেদান্ত মতে অহং একটা মায়াসম্ভূত পদার্থ" ইহা নির্ব্বিচারে বলা চলিবে না। নরেশবাবু এই বৃষের (Dilemma) যে শৃঙ্গই ধরুন না কেন, অন্য শৃঙ্গের খোঁচা খাইতেই হইবে।

যাহা হউক, বেদান্ত মহাগঙ্গা উপনিষদ্ গঙ্গোত্রী হইতে বাহির হইয়া সাগর-সঙ্গমের পথে নানা নালা জোলায় প্রবেশ করিয়া জঙ্গলাকীর্ণ ও ময়লা-দূষিত হইয়াছেন। আমি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ ইহারই এক নালায় ঢুকিয়া কিঞ্চিৎ আবর্জ্জনা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। নরেশবাবু এক হেঁচ্কা টানে আমার হাত হইতে তাহা কাড়িয়া লইয়া গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়া দেশকে ডাকিয়া বলিতেছেন, ধীরেন্দ্রবাবু গঙ্গা অপবিত্র করিয়াছেন। আমি সুতরাং নাচার। বেদান্তের কত শাখা-প্রশাখা ডাল-পালা। বেদান্তবাদীর এই-সব শাখা-প্রশাখার সঙ্গে বাহ্যতঃ একটা যোগ থাকে। কিন্তু মনুষ্যপদবাচ্য মানুষমাত্রেরই নিজস্ব একটা বেদান্ত আছে। তাহাতে তাহার ব্যক্তিগত ভাবপ্রবণতা (temperament), প্রবাদ (tradition), আবেষ্টনের প্রভাব যত বেশী, তিনি বেদান্তের কোন্ শাখাভুক্ত তার প্রভাব তত নয়। এইটি হইল জীবন দিয়া গড়া বেদান্ত। কড়ায় গণ্ডায় যে ইহার সঙ্গে কোন বেদান্ত-শাখার মিল থাকিতেই হইবে, তাহা নয়। তবে মোটা মোটা কতকগুলি বিষয়ে মিল থাকে, এই পর্য্যন্ত। রামমোহন ঠিক যে সময়ে বেদান্তের নিন্দা করিয়া আমৃহার্ষ্টকে চিঠি

লিখিয়াছিলেন, সেই সময়েই বেদান্তের অধ্যাপনার জন্য পাঠশালা খুলিয়াছিলেন। এই দুই বেদান্ত এক নয়। নরেশবাবু স্বীয় বেদান্তের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। আমার বেদান্ত যে কি, আভাসে ইহার নিদর্শন তিনি ঐ ক্ষুদ্র প্রবন্ধেই পাইতে পারিতেন এবং তাঁহার সঙ্গে আমার মিল কোথায় তাহাও বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সে দিক্ দিয়াই যান নাই। আমি যে একটা নালার বেদান্তের কথা বলিয়াছি, তিনি সেইটাকে স্বীয় বেদান্তের সঙ্গে একীভূত করিয়া আমার সমালোচনা করিয়াছেন। আমি এইরূপ একটী বেদান্তের সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম, 'তত্ত্বের দিকে এ বেদান্তের পরিণতি মায়াবাদে, ও জীবনের দিকে সন্ন্যাসে'। নরেশবাবু 'এ বেদান্তের' 'এ'টা তুলিয়া দিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই মুণ্ডপাত-সাহায্যে আমার দ্বারা বেদান্তের অন্তর্জ্জলির ব্যবস্থা করাইয়া লইয়াছেন। ইহাতে ভুল বুঝিবার ও বুঝাইবার যথেষ্ট অবসর হয় নাই কি? ইহা স্বেচ্ছাকৃত, তা বলিতেছি না। অভিনিবেশের অভাব নিশ্চয়ই। তবে মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির লেখা নরেশবাবু অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিবেন, এরূপ আশা করা আমার ধৃষ্টতা। সেই জন্যই তাঁহার এরূপ আক্ষেপ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে, যে ধীরেন্দ্রনাথ-বাবুর মত প্রাজ্ঞ দর্শনের অধ্যাপকের মুখে এসব কথা শুনিয়া দুঃখ হয়। আমার মনে হয়, এ দুঃখটা 'স্বখাত সলিলে ডুবে মরি, শ্যামা'। আমরা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, যে বেদান্তের কোন কোনও শাখা তত্ত্বের দিকে মায়াবাদে ও জীবনের দিকে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসে যাইয়া পৌছিয়াছে—এ কথা নরেশ-বাবু আমার মুখে শুনিলেন। শঙ্করের মধ্যেই যাহার বীজ ছিল এবং শঙ্করোত্তর বেদান্তে, বিশেষ ভাবে পঞ্চদশী প্রভৃতি বেদান্তশাস্ত্রকারগণ যাহা বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—তাহা যে একরূপ শূন্যবাদে যাইয়া পৌছিয়াছিল একথা নরেশবাবুর মত লোকও জানেন না, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? এই বেদান্ত সম্বন্ধে যে বলা হইয়াছে "মায়াবাদং অসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বুদ্ধমেব তৎ"—ইহার মধ্যে কি একটুও অতিরঞ্জন আছে? কোনও কোনও বেদান্ত যে কত সহজে শূন্যবাদে যাইয়া পৌছায় তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমি যে বেদান্তীর সহিত বিবাদ করিয়াছি, তিনি নিরীশ্বর অহংবাদী, তাঁহার কাছে 'আমি' ছাড়া আর কিছুই নাই, ঈশ্বরও নাই! নরেশবাবু বলিতেছেন, এই 'আমি' কিন্তু মায়াসম্ভূত পদার্থ। এই দুই বৈদান্তিক একত্রিত হইলে 'পদার্থ' থাকে খালি 'শূন্য', ইহা

আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। আচার্য্য শঙ্কর নিজেই গীতার কর্ম্মপক্ষীয় শ্লোকগুলিকে সন্ন্যাসপক্ষে ব্যাখ্যা করিবার জন্য যেরূপ টানা-হিঁচড়া করিয়াছেন তাহাতে আর বুঝিতে বাকি থাকে না যে বেদান্তের গতি কোন্ দিকে। দেশে যে শত শত বৈদান্তিক সন্ন্যাসী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাঁহারা তো সব বাম-মার্গীয়, তাঁহাদের তো কথাই নাই। ইঁহাদের মতবাদ নিংড়াইলে নিষ্ক্রিয়তা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাইবে না। অদ্বৈতবাদ ইঁহাদের হাতে এমন বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে যে বিষ্ঠাচন্দনে সমান জ্ঞান না করিলে অদ্বৈত ব্যাহত হয়। সুতরাং সু কু, পাপ পুণ্য একাকার হইয়া দেশের জাহান্নামে যাইবার পথ পরিষ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। এই-সব 'অহং ব্রহ্ম' সন্ন্যাসীর মতবাদে উপাসনার জন্যই দ্বৈতাভাব, ইঁহারা সেবা করিবেন কাহার? কিন্তু আমি যে বৈদান্তিকের সঙ্গে বিচার করিয়াছিলাম, তিনি ইহাদেরও এক কাঠি উপরে। নরেশবাবু আমার প্রবন্ধটি পড়িবার কষ্ট একটু স্বীকার করিলেই দেখিতেন যে ঐ বৈদান্তিক মানেন শুধু 'আমি,' ঈশ্বরও মানেন না। আমার প্রতিবাসী আমিই, সেইজন্যই তার সেবা এবং ইহারই উপর সেবাধর্ম্মের ভিত্তি। আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলাম, এরূপ বেদান্তী যাহাই হউন সেবাধর্ম্মী নহেন। কেন না, "Egoism যত বড়ই হউক না কেন, —বিশ্বজোড়া হইলেও সেবাধর্ম্মের আসনের পক্ষে ক্ষুদ্র। যে হেতু সেবাধর্ম্ম নিজের সেবা নয়, পরের সেবা"। নিজের সেবা ও পরের সেবা এক বস্তু নয়, অন্ততঃ এই একটি ক্ষুদ্র বিষয়ে নরেশবাবু আমার সঙ্গে একমত হইতে পারিবেন বলিয়া আশা করি। কেন না, তাঁর নিজের মতেই সেবাধর্ম্ম "পরস্পরের সেবা"র উপর প্রতিষ্ঠিত। নরেশবাবু হয় তো বলিবেন, "ধীরেন্দ্রবাবু যাহাকে অদ্বৈতবাদ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন তাহা অদ্বৈতবাদ নহে, বিজ্ঞানবাদ"। Pot-theism" কি "pan-theism" তাহার বিচার হইতেছে না, আমার বেদান্তী কি বলেন তাহারই বিচার করিয়াছি। তাহা বিজ্ঞানবাদ হয় হোক, অদ্বৈত-বাদ না হয় না হোক—নামে কিবা আসে যায়। যিনি ঈশ্বরও মানেন না, মানেন কেবল একমেবাদ্বিতীয়ং "আমি" এবং তিনি যখন নিজেকে বৈদান্তিক বলিতেছেন তখন তিনি বৈদান্তিক ও অদ্বৈতবাদী নহেন কেন? অদ্বৈতবাদও এক কছমের নয়, তার নমুনা পূর্ব্বেই দিয়াছি এবং বেদান্তমতও বহু। নরেশ-বাবু সকলকে আপনার কোঠায় ফেলিতে গিয়া নিজেই solipsism এ পড়িয়া গিয়াছেন। তাঁর solipsismএর আরও পরিচয় আছে। তিনি

বলিতেছেন, তাঁহার প্রতিবেশীরও বাস্তব সত্তা আছে। নরেশবাবুর কাছে আছে, স্বীকার করিতে হইবে। কেন না তিনি বলিতেছেন—আছে। কিন্তু যে বেদান্তী বলেন, আমি ছাড়া বস্তু নাই, ঈশ্বরও নাই, তাঁহার কাছে প্রতি-বাসীর বাস্তব সত্তা আছে কিরূপে ইহার ফিলজফিটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া না দিলে আমার মত মুর্খের পক্ষে ধরিয়া লওয়াটা যে একেবারেই অসম্ভব আমি ত অদ্বৈতবাদী। আমিও স্বীকার করি, আমি ও আমার প্রতিবাসী এক ঈশ্বররূপ সূত্রের সহযোগে 'সূত্রে মণিগণা ইব', আমিই আমার প্রতি-বেশী। সুতরাং একই ব্রহ্ম আমি ও আমার প্রতিবাসীর আত্মারূপে প্রকাশিত বলিয়া আমারই মত আমার প্রতিবাসীরও বাস্তব সত্তা আছে। আমি তো ও-কথা প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম। কিন্তু আমার লক্ষ্যস্থানীয় বেদান্তী এ কথা বলিতে পারেন কি? এই অদ্বৈতবাদকে "একান্ত অদ্বৈত" বলিয়াছি এবং ইহাতে সকল ধর্ম্মের ন্যায় সেবাধর্ম্মেরও বিনাশ বলিয়া কোনই অপরাধ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ বেদান্তের সম্বন্ধেই বলিয়াছিলাম, "কাজির কাছে দুর্গোৎসবের পাঁতি আর বেদান্তের উপর সেবাধর্ম্মের ভিত্তি একই।" নরেশবাবুর মতে "এ কথা বেদান্তবাদীর কাছে একেবারেই অশ্রদ্ধেয়।" সব বেদান্তবাদীর কাছে নয় (অন্ততঃ তাঁহাদের মতবাদের পরিণতিতে), তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। কিন্তু প্রধান বেদান্তবাদী কি বলেন? বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ শঙ্কর ও বেদান্ত একই কথা। নরেশ বাবু শঙ্করকে একাধিক বার প্রমাণ ধরিয়াছেন। বেদান্তের উপর কোন কর্ম্মের ভিত্তি আচার্য্য অনুমোদন করিবেন কি? তিনি অবশ্যই অবগত আছেন, গীতাকে কর্ম্মযোগ পক্ষে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া লোকমান্য তিলক মহাশয়কে শঙ্করপন্থীদিগের হস্তে কিরূপ নাস্তানাবুদ হইতে হইতেছে। তবে অন্য এক অর্থে অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে। অনেক সময়েই মানুষ কর্ম্মক্ষেত্রে আপনার মতবাদের উপর উঠিয়া ব্যক্তিগত ভাবপ্রবণতা প্রভৃতির অনুসরণ করে। সে কথা প্রবন্ধেই বলিয়াছি। ঐরূপ বেদান্তীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলাম, যে যদি কোন বেদান্তী জীবনে সেবাধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তবে তাহা তাহার পূর্ব্বাভ্যাস প্রভৃতির প্রভাব, বেদান্তের মহিমা নয়। ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আচার্য্য শঙ্কর নিজেই কি নহেন? তাঁহার দার্শনিক গ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিলে দেখা যায় না কি যে সর্ব্বকর্ম্ম-ন্যাসের পক্ষে তিনি স্বীয় তীক্ষ্ণ মেধা কত জোরে পরিচালিত করিয়াছেন! অধ্যাপক গ্রীণের একটা উক্তি

পরিবর্ত্তিত করিয়া বলা চলে এবং তাহাতে একটুও অত্যুক্তি হইবে না যে Consistent Sankarism must be speechless, অথচ শঙ্করের মত কর্ম্মবীর জগৎ কয়জন দেখিয়াছে। ৩২ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই সমগ্র ভারতখণ্ডকে তোলপাড় করিয়া গেলেন। শঙ্কর-বেদান্ত নয় কিন্তু আমার বিচার্য্য বেদান্তের সম্বন্ধেই একটা উক্তি করিয়াছিলাম সে জন্য নরেশবাবুর হাতে আমাকে কিরূপ নাকানিচুবানি খাইতে হইয়াছে, এখন সেই কথাই বলি। আমি লিখিয়াছিলাম "বেদান্তের দ্বারা যদি সেবাধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইত তবে সেবাধর্ম্মে দেশ ইতিপূর্ব্বে ছাইয়া যাইত। লক্ষ লক্ষ বৈদান্তিক দেশে অকর্ম্মা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।" নরেশবাবু শেষের টুকু গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু যেটুকু গ্রহণ করিয়াছেন তাহারই ভাষ্যটীকায় প্রবন্ধকলেবর পূর্ণ করিয়াছেন। আমার কথার মধ্যে তিনি তিনটি সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং তাঁহার মতে ঐতিহাসিক হিসাবে তিনটিই সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি আত্মরক্ষা লইয়াই ব্যস্ত, ইতিহাসে প্রবেশের অবসর নাই। দেখি, আমার ঐ তিন সিদ্ধান্ত সত্য কি না। তার পূর্ব্বে "ইতিপূর্ব্বে"র কথা। নরেশবাবু বলেন "ইতিপূর্ব্বে, বোধ হয় রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে"—ইহা নিশ্চয়ই নয়। ইতিপূর্ব্বে অর্থাৎ আমি যে মুহূর্ত্তে প্রবন্ধ লিখিয়াছি তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। কেন না, রামমোহনের আবির্ভাবে সন্ন্যাসীগোষ্ঠী লয়প্রাপ্ত হন নাই, কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইয়াছেন মাত্র। এখন যাহা নরেশবাবুর মতে "অসঙ্কোচে সত্য বলিয়া মানিতে হয়" তাহার কথা। আমি নীচে হইতে উপরের দিকে যাইব। ১। "ইতিপূর্ব্বে সেবাধর্ম্ম বলিয়া কোনও জিনিষ দেশে ছিল না।" নরেশবাবুর এ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে আমার বিশেষ সঙ্কোচ হইতেছে। কেন না, প্লেগে দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে—এ কথা মিথ্যা হইলে দেশে প্লেগ নাই—এ কথা অসঙ্কোচে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল না। লক্ষ লক্ষ বৈদান্তিক সন্ন্যাসী অকর্ম্মা রহিয়াছে সত্য, কিন্তু তা ছাড়া আরও কোটী কোটী কর্ম্মী দেশে আছে—তা তো আর অস্বীকার করি নাই। ইতিহাসের কথা জানি না, আমার লজিক্ বলে—একেবারে না থাকা আর ছাইয়া ফেলা এই দুয়ের মাঝখানে বেশ একটু ফাঁক আছে এবং সে ফাঁকটা একেবারেই একটুখানি নয়, যার মধ্যে বেশ অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া সেবাধর্ম্ম বসিয়া থাকিতে পারে ও রহিয়াছে। সুতরাং নরেশবাবুর এটি একটি অপসিদ্ধান্ত। ২। কোনও ধর্ম্মের আনুসঙ্গিক কোনও আচার

ইতিপূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়া না থাকিলেও অতঃপর আবিষ্কৃত হইতে পারে কি না সে প্রশ্নই উঠে নাই। আমি বিচারের দ্বারা দেখাইতে চাহিয়াছি, যে কোনও এক বৈদান্তিক মতের উপরে সেবাধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সুতরাং ইহকালেই হউক আর পরকালেই হউক সেবাধর্ম্ম তাহার মধ্য হইতে বাহির হইবে না। সুতরাং উভয়ের নিত্য সম্বন্ধ উপলব্ধি করিবার সুযোগ কাহারও কোনকালেই ঘটিবে না। কেননা Reason সর্ব্বকালিক। তবে ওরূপ বেদান্তী কালে সেবাধর্ম্ম যাজন করিতে পারেন কি না সে কথার উত্তর দিয়াই দিয়াছিলাম, নরেশবাবু প্রণিধান করেন নাই। ৩। প্রবন্ধ লিখিবার সময়েই আমি জানিতাম যে বাঙ্গালীর শরীর সেশ্বর ন্যায়ের দ্বারা গঠিত ও পরিপুষ্ট, এবং বেদান্ত তাহার উপর কলম দেওয়া (engrafted)। "বেদান্তের দ্বারাই হিন্দুজাতির সমস্ত জীবন নিয়মিত হইত", আমার কথার ও-অর্থ হয় না এই জন্য যে বাঙ্গালী জীবনের উপর স্মৃতির প্রভাব বিস্মৃত হইবার জিনিষ নয়, এবং আমি স্মৃতি হইতে বচন তুলিয়া দেখাইয়াছি— এক জন যদি এক হস্ত কর্ত্তন করে ও অন্য হস্ত চন্দনচর্চ্চিত করে তবে সন্ন্যাসী তাহা গ্রাহ্য করিবেন না। কেন না তিনি কাহারও কল্যাণ অকল্যাণ চিন্তা করিতে পারেন না। সন্ন্যাসীর সেবাধর্ম্মের ইহাই পরিণতি।

নরেশবাবুর লেখায় এরূপ দুর্দ্দৈব ঘটিয়াছে, যে আমি যাহা বলি নাই তাহা যেন আমি বলিয়াছি এইরূপ ভাবে নিঃসঙ্কোচে আলোচনা করিয়াছেন। আবার যাহা বলিয়াছি, তাহা যেন বলি নাই এইরূপ ভাবে তাহারই একটা পূর্ব্বপক্ষ স্থাপন করিয়াছেন। বিষয়গুলিকে মন্দ বলি না। বরং তাহা অতি সুন্দর, উপাদেয়। কিন্তু আমার নামে জড়িত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত দিতেছি। দয়ার উপর সেবাধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিলে কি দোষ হয় তাহা তিনি প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমি কিন্তু কোথায়ও দয়ার উপর সেবাধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে বলি নাই। আমার ব্যাখ্যায় সহানুভূতি বা মৈত্রী (fellow-feeling) সেবাব্রতের বৈজ্ঞানিক (psychological) ভিত্তি। তবে ইহার একটা ব্যাবহারিক দিক্ নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম—পরোপকার মানুষকে ভগবানের কৃপাপাত্র করে। ইহা গীতার "তদর্থং" অর্থাৎ ভগবানের প্রসন্নতা লাভ কর্ম্মের উদ্দেশ্য উহারই নামান্তর মাত্র। ইহার কোথায়ও উপকৃতের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব নাই। আমি যে সেবাধর্ম্মের সামাজিক (Sociological) দিক্ দেখাইয়াছি তাহাতে উপকারক ও উপকৃত একই জীবনযন্ত্রের

(Organismএর) অঙ্গ—উপকারক উপকার করিয়া উপকৃত; উপকৃত উপকৃত হইয়া উপকারক—সুতরাং এখানেও এক জন অন্য অপেক্ষা বড়, এই আশঙ্কার কারণ নাই। নরেশবাবু যে সেবাধর্ম্মের উচ্চ লক্ষ্যের কথা বলিয়াছেন—"তোমার ব্রহ্মরূপী আত্মা এই সেবার পথ দিয়া মোক্ষের সন্ধান করিতেছে। তাহা ছাড়া জীব ব্রহ্ম এই কথা জানিয়া তুমি কাহাকেও অশ্রদ্ধা করিতে বা তোমা অপেক্ষা হীন ভাবিতে পার না। এইরূপে বেদান্তবাদ নিষ্কাম নিরহঙ্কার ও সশ্রদ্ধ সেবার সহায়তা করে বলিয়া আমি মনে করি।" ইহার সঙ্গে আমার বেদান্ত যাহা বলিয়াছেন তাহার তুলনা করিয়া পাঠকগণই বলুন, উভয়ের বিভিন্নতা কোথায়? আমি বলিয়াছিলাম, "সেবা ব্রহ্মজ্ঞানীর সনাতন ধর্ম্ম। কেন না, ব্রহ্ম সর্ব্বভূতে অবস্থিত, সর্ব্বসাধারণ জনের সেবাই ব্রহ্মসেবা। প্রত্যেক মানুষ ব্রহ্মের মন্দির, আমার ইষ্টদেবতার আসন। দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবন প্রভৃতি আধিদৈবিক উৎপাত আন্তর্জ্জাতীক রাষ্ট্রীয় সামাজিক পারিবারিক অত্যাচার অবিচার বা নরনারীর মুখে আমার ইষ্টদেবতার মুখ প্রকাশিত হইতে দেয় না, পরমেশ্বরের কৃপাদৃষ্টিকে লুক্কায়িত করে—তাহাদের বিপক্ষে যে সংগ্রাম তা আমার ইষ্টদেবতার মন্দির সম্মার্জ্জন, তাঁহার আসন পরিষ্করণ। মন্দির কিঞ্চিন্মাত্রও অপবিত্র থাকিলে দেবতার আবাহন হয় না। নিজের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখিয়া সকলের মধ্যে তাঁহাকে অভিব্যক্ত করিবার আকাঙ্ক্ষাই ব্রহ্মজ্ঞানীর কর্ম্মজীবনের উৎস।" এই উভয়ের মধ্যে যদি কোন বিভিন্নতা থাকে তবে তাহার কারণ নরেশবাবুর মোক্ষতত্ত্বে আমার অনভিজ্ঞতা।

এতক্ষণ গেল বিচার, এখন নজীর আসিতেছে। নরেশবাবু বৌদ্ধযুগের সেবাধর্ম্মের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "শূন্যবাদের উপর যদি সেবাধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে ধীরেন্দ্রবাবুর তথাকথিত বেদান্তধর্ম্মের উপর সেবাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইতে কি গুরুতর আপত্তি আছে বুঝিতে পারিলাম না।" কোন কোন বেদান্তবাদ কেন সেবাধর্ম্মের পরিপন্থী, তাহা বুঝাইয়াছি। তবুও নরেশ-বাবুর এই একটি ছত্রের মধ্যে এক গণ্ডারও অধিক fallacy এক সঙ্গে জড় হইয়া রহিয়া গিয়াছে।

প্রথম, বৌদ্ধের সেবাধর্ম্ম শূন্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত—ইহা প্রমাণিতব্য—যাহা প্রমাণিতব্য তাহাকেই প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করায় অন্য কোন ফল হয় নাই, হইয়াছে কেবল একটি বড় রকমের *petitio principii.*

দ্বিতীয়তঃ, বৌদ্ধের সেবাধর্ম্ম শূন্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে প্রথমতঃ বিচার দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে, যে শূন্যবাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা সেবাধর্ম্মকে জন্ম দিবেই—আমি যেমন আমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বলিয়াছি, "নিজের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখিয়া সকলের মধ্যে তাঁহাকে অভিব্যক্ত করিবার আকাঙ্ক্ষাই ব্রহ্মজ্ঞানীর কর্ম্মজীবনের উৎস।" অন্ততঃ দেখাইতে হইবে উভয়ে বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নহে। কিন্তু আমরা কোন কোন বেদান্তবাদের বিরুদ্ধে যে যুক্তি দিয়াছি যে উহা সেবাধর্ম্মের পরিপন্থী, শূন্যবাদের সম্বন্ধে তাহা আরও বেশী (*a fortiori*) খাটে। যদি কেহ এখানে শূন্যবাদী সেবাধর্ম্মীর প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করেন, তবে কর্ম্মজীবনের বিরোধী স্বীয় মতবাদকে মানুষ কেমন করিয়া অতিক্রম করে তাহার কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিব।

তৃতীয়তঃ, দুইটি জিনিষের একত্র সমাবেশ দেখিলেই একটিকে অন্যটির কারণ বলা যায় না। উভয়ের সমাবেশ আকস্মিক হইতে পারে, বা উভয়ে একই কারণের সহ-কার্য্যও (co-effects) হইতে পারে। আর উভয়ের মধ্যে যদি কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ থাকে তবুও উভয়ের পৌর্ব্বপর্য্যায় নির্ণীত না হওয়া পর্য্যন্ত কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণীত হইবে না। ইতিহাস বলিবে বৌদ্ধের সেবাধর্ম্ম আগে, শূন্যবাদ পরে। সুতরাং শূন্যবাদের উপর সেবাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিলে গুরুতর আপত্তি উপস্থিত হইবে। আপত্তিটি কার্য্যকারণ-বিপর্য্যয় হেত্বাভাস (Hysteron proteron)।

চতুর্থতঃ, যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদিগের সেবাধর্ম্মের সৌরভে বৈদেশিকগণ ভারতের চরণে শত শত নমস্কার করিয়াছেন, তাঁহারা কি শূন্যবাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিলেন? ইতিহাস কি বলিবে না, যখন বৌদ্ধগণ শূন্যবাদে মাতিয়াছিলেন তখন সেবাধর্ম্ম ছিল না, ছিল আত্মসেবা। আর ঐ শূন্য পূর্ণ করিবার জন্য তান্ত্রিক অনাচারে দেশকে ভরিয়া দিয়া বৌদ্ধধর্ম্মই অন্তর্হিত হইয়াছিল।

পঞ্চমতঃ, দুইটি বিভিন্ন কারণ-পরম্পরা হইতে উৎপন্ন কিন্তু একত্র সমাবিষ্ট ফলদ্বয়ের সঙ্গে যুক্ত তৃতীয় কিছুর কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ স্থাপন করা প্রয়োজন হইলে ঐ দুয়ের মধ্যে যেটির দ্বারা সঙ্গত ব্যাখ্যা হয় তাহাকেই কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। বৌদ্ধের সেবাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কোথায়? শূন্যবাদে নয়, মৈত্রী ও করুণায়। শূন্যবাদ তো দূরের কথা ঐ বৌদ্ধধর্ম্মের

স্বপ্নও যখন কাহারও মনে আসে নাই, তখনই কপিলাবাস্তুর রাজগৃহে উহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল। পরে তাহাই ডালপালায় বিস্তার লাভ করে। সেব্রা-ধর্ম্ম বুদ্ধদেবের হৃদয়জলধির উচ্ছ্বাস, শূন্যবাদের মরুভূমি তাহা কোথায় পাইবে। সেই জন্যই বুদ্ধাবতারের গীত নির্ব্বাণতত্ত্ব নয়, শূন্যবাদ নয়, কিন্তু "সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং, জয় জগদীশ হরে"।

এইখানেই শেষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বিষয়ে নরেশবাবু একটা প্রশ্ন তুলিয়াছেন। কিন্তু সমাধানের পথ খোলেন নাই। "দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়" বা "প্রচ্ছন্ন ভাবে দেখিতে পাইতেছি"র উপর বিচার চলে না। আমি সময়ে সময়ে রাজাকে যে ভুল বুঝা হইয়াছে বা রাজার ভুল ব্যাখ্যা হইতেছে ভাবিয়া স্বীয় আলোকে রাজার কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু রাজা বলিয়াছেন বলিয়াই সে কথা সত্য মনে করিতে হইবে বা তাঁহার উপর কলম ধরা চলে না, এরূপ কথা যে কখনও বলি নাই, তা হলপ্ করিয়া বলিতে পারি। শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেই যদি *Argumentum ad verecundium* হয় তবে বলিবার কিছু নাই। বেদান্তের ভুল ব্যাখ্যা হইল ভাবিয়া নরেশবাবু যে অসহিষ্ণু হইয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন, ইহা তবে কি? ইহা কি তবে বেদান্তের ভুল হইতে পারে না, ইহারই অভিব্যক্তি? যাক্, এখন যেখানে নরেশবাবুর সঙ্গে মিল তাই বলিয়া 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করি। রাজা রামমোহন রায় কেবল ভারতের নয়, জগতেরই একজন মহাপুরুষ। কিন্তু এই বেদ বাইবেল্ কোরান পুরাণ শ্যাম শ্যামা সন্ন্যাসী ও শালগ্রাম (তদভাবে শূন্য, অথবা বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোধানের ফলে শূন্যের স্থানে 'শিলা') প্লাবিত দেশে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ রূপে স্থাপিত করিতে গেলে যে তাঁহারই শিক্ষা অনেকটা হজম করিতে হয় ইহা ভুক্তভোগী হইয়াও যদি তিনি স্বীকার না করেন, তবে তাঁহাকে স্বীকার করাইবার শক্তি আমার নাই। সুতরাং "রাজার জীবনের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা স্বাধীনতা এবং সর্ব্বপ্রধান কার্য্য বাঙ্গালীর (!) ও ভারত বাসীর বুদ্ধি, জ্ঞান ও ধর্ম্মের শৃঙ্খল মোচন" আমার উপর কোনই কার্য্য করে নাই, তাহা আমি স্বীকার করিব না। ইহাতে যদি কিছু আত্মম্ভরিতা থাকে, তবে সেজন্য সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিদায় লইতেছি।

অষ্টাদশ অধ্যায়

সিদ্ধি

সত্যে কর প্রীতি পাবে পরিত্রাণ—রামমোহন

প্রথম পরিচ্ছেদ

জাতীয় জীবনে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য

স্থবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতো স্থনির্ম্মলং তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

—উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ

রাজর্ষি রামমোহন যখন প্রচার আরম্ভ করেন, তখন তিনি রাস্তায় বাহির হইলেই একদল বালক তাঁহার গায়ে ধূলি নিক্ষেপ করিত আর -

"স্থরাই মেলের কুল,
বেটার বাড়ী খানাকুল,
বেটা সর্ব্বনাশের মূল,
'ওঁ তৎসৎ' বলে এক বানিয়েছে স্কুল,
ও সে জেতের দফা, করলে রফা,
মজালে তিন কুল"—

এই বলিয়া তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিত। যাহারা বালকদিগকে এই দুষ্কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল, তাহারা কখনও ভাবে নাই, যে কার্য্যের জন্য রাজর্ষির এই লাঞ্ছনা, সেই কার্য্যের জন্যই তাহাদের বংশধরেরা তাঁহার চরণে অর্ঘ্য সমর্পণার্থ উপনীত হইবে। তাঁহার কার্য্য যে তাঁহার ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের দ্বারা এইরূপে আদৃত হইবে, তাহা রাজার নিজের কাছে অবিদিত ছিল না। তাই, শত নিরাশার কারণ বর্ত্তমান সত্ত্বেও তিনি আশা-নেত্রে ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ আজ আসিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের গায়ে ধূলি নিক্ষেপ করিবার

রামমোহনের আশা

লোকের অভাব নাই। ইহাও রামমোহনের গায়ে ধূলি নিক্ষেপ, তবে নিক্ষেপের প্রণালীটা বদ্‌লাইয়াছে মাত্র। রামমোহনের নামে তাঁহার গায়ে ধূলি নিক্ষেপ আর সাহসে কুলাইয়া উঠিতেছে না, তাই বালকবৃন্দকে (!) এইরূপ ঘুর্‌পাক্ খাইতে হইতেছে। রামমোহনের অনুবর্ত্তী ব্রহ্মোপাসক সম্প্রদায়ের উপর গালি-বর্ষণ, আর শ্রাদ্ধবাসরে রামমোহনের স্তুতিগান, এখন ধূলি-নিক্ষেপের এই নূতন প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্তুতি-গানের মধ্যেই যে ধূলি নিহিত থাকে, তাহা একটু নাড়া দিলেই বাহির হইয়া পড়িবে। এই শ্রাদ্ধবাসরে সব কথা আলোচিত হইবে, বাক্যের উপর বাক্যের যোজনা করিয়া হাওয়ার গাড়ীতে তুলিয়া রামমোহনকে সপ্তম-স্বর্গে লইয়া যাইতে হইবে, কিন্তু রামমোহন-জীবনের মেরুদণ্ড যাহা, পৌত্তলিকতা ও ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে রাজার কার্য্য, তাহার উল্লেখ মাত্র হইতে পারিবে না। অর্থাৎ 'কানু' ছাড়া কীর্ত্তন যত পার কর, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। রামমোহন-জীবনের এই বিশেষত্ব ব্রাহ্মসমাজেরও বিশেষত্ব। দেশে অনেক সভা সমিতি সম্প্রদায় আছে, যাঁহারা রাজার কার্য্যসমূহের ভিন্ন ভিন্ন অংশের আলোচনায় কালক্ষেপ করিতেছেন। কিন্তু কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া অংশসমূহকে একত্র রাখিবার প্রয়াস একমাত্র ব্রাহ্মসমাজই করিয়াছেন। যে স্তুতি-গানে এই কেন্দ্রকেই বাহিরে রাখিবার চেষ্টা, তাহাকে ঐ ধূলি-নিক্ষেপের প্রকার ভেদ ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে?

ব্রাহ্মসমাজ রামমোহনের উত্তরাধিকারী

আজ কাল কখনও কখনও শুনা যায়, দেশে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য শেষ হইয়াছে। রামমোহন মূলতঃ পৌত্তলিকতার বিনাশ ও ব্রহ্মোপাসনার প্রতিষ্ঠার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্য-তালিকার অন্যান্য অংশ এই এক মূলকে অবলম্বন করিয়াই বিকশিত হইয়াছিল। অথচ এই বিষয়ে রামমোহনের উত্তরাধিকারিত্বের দাবী করিবার ব্রাহ্মসমাজ ছাড়া আর কেহই নাই। এরূপ স্থলে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য শেষ হইয়া থাকিলে বুঝিতে হইবে, দেশ হইতে পৌত্তলিকতা উন্মূলিত হইয়াছে, তাহার স্থানে ব্রহ্মোপাসনা আসন লাভ করিয়াছে। তদ্বিপরীত যখন দেখিতে পাই, ব্রহ্মোপাসনা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া তো দূরের কথা, পৌত্তলিকতাই দেশের কণ্ঠাভরণ হউক বলিয়া গর্ব্ব করিবার লোকের অভাব নাই, তখন কি করিয়া ভাবিতে পারি, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য শেষ হইয়াছে? তবে এইরূপ প্রস্তাব যে নিতান্তই অকারণ উপস্থিত

করা হইয়াছে, তাহাও বলিতে পারি না। যখন কোন বস্তুর স্থায়িত্ব অন্যের অস্তিত্বের পক্ষে অসুবিধাজনক, তখন এইরূপ প্রস্তাবের উপন্যাস অনিবার্য্য। দেশে অনেক সভা সমিতি, মহাসমিতি আছে—ইহার কোনটা বা সাম্প্রদায়িক, কোনটা বা জাতীয়। সকল গুলির প্রয়োজনীয়তা যে সর্ব্ববাদিসম্মত, তাহা নহে। যাহার যেটা ভাল লাগে না, তাহার সম্বন্ধে তাহার যুক্তিটা প্রায়শঃ ঐ একই আকার ধারণ করে—এখন আর উহার থাকিবার প্রয়োজন নাই। অথচ ইহাদের পুরাতন কাগজপত্র ঘাঁটিয়া দেখিলে দেখা যায়, ইহারা কোন দিনই উহার আবশ্যকতা স্বীকার করেন নাই এবং ইহা যে কোন বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য আবির্ভূত, তাহাও নির্দ্দেশ করেন নাই। ইহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, কি অভিপ্রায়ে ব্রাহ্মসমাজ আসিয়াছিল, তাহার কোন সদুত্তর পাইব বলিয়া আশা বা আশঙ্কা করি না। তবে এখন যে ইহার প্রতি পেন্সন্ ব্যবস্থা করিবার জন্য একটা অস্বাভাবিক করুণার সঞ্চার দেখা যায়, সেটা স্বার্থপরতা সম্ভূত, পরার্থপরতার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ নাই। দেশে এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা স্থিতিশীল হওয়াটাকে, অন্ততঃ লোকে স্থিতিশীল বলে তাহা, অবমাননাজনক মনে করেন। অথচ গতিশীল হইতে হইলে যে অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হয়, তাহার জন্যও তাঁহারা প্রস্তুত নহেন। কেন প্রস্তুত নহেন, সে প্রশ্নের এখানে উত্থাপন করিলাম না। ঘরপরিষ্কার করিতে হইলে ঘরে ঝাঁট দিতে হয়। তখন কিয়ৎপরিমাণে ধূলা নাকে চোখে মুখে যাইয়া শরীরে বিকার উৎপন্ন করেই। এক দল বলেন, ও সনাতন ধূলা আমাদের ঘরে থাকুক (পৃঃ ৩৯২) উহা যখন চিরদিনই আছে, আজ তোমাদের উহা ঘাঁটাঘাঁটী করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। আর এক দল এই ধূলিরাশি বাহিরে ফেলিয়া দিতে নারাজ নহেন। এ প্রস্তাব তাহারা সমর্থন করেন। এমন কি, সময়ে সময়ে সুবিধামত এ কার্য্যের গুণকীর্ত্তনও করেন, ইঁহাদের গতির এইখানেই শেষ। অথচ অপর পক্ষ, কাহারও বারণ না শুনিয়া এক দল সম্মার্জ্জনী হস্তে, কোনই অসুবিধার দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, একেবারে ঘর ঝাঁটাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের বিদ্যমানতা এই মধ্যবর্ত্তী দলের অস্তিত্ব নিতান্তই অপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। সুতরাং স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য ইঁহারা যদি বলেন, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য শেষ হইয়াছে, তবে ইহাদের উক্তিকে আমাদিগকে কৃপার চক্ষেই দেখিতে হইবে। যাহা অতি গুরুতর অপরাধ, আত্মরক্ষার জন্য কৃত হইলে আইনের চক্ষে তাহাও অতি লঘু বলিয়া বিবেচিত হয় না কি? রাজা

রামমোহন রায় যখন ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার আরম্ভ করেন, তখন মহামারী ও জলপ্লাবনরূপ আধিদৈবিক উৎপাতে দেশ কিয়ৎপরিমাণে উৎপীড়িত হইয়াছিল। তাঁহার প্রতিপক্ষগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, উহা ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের ফল। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য যদি শেষ হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, দেশে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারও শেষ হইয়াছে। সুতরাং উক্ত উৎপাতগুলিও পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইবার কথা। কিন্তু আমি যতদূর জানি, মহামারীতে দেশ উৎসন্ন বা জলপ্লাবনে দেশ ভাসিয়া যায় নাই। কাজেই, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য শেষ হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত নিতান্তই অযৌক্তিক নহে কি? সমাজ পারিবারিক ও সামাজিক যে আদর্শের আভাস দেশকে দেখাইয়াছেন, তাঁহার শতাংশও কি দেশ আয়ত্ত করিয়াছেন? আমরা কি আমাদের জাতিভেদরূপ কুষ্ঠ ক্ষত লইয়া বিশ্বমানবের দরবারে যাইতে অভিলাষী? কেহ কেহ বলিবেন, ভেদ কোন্ দেশে না আছে।

ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে মাত্র

ভেদ আছে সত্য, কিন্তু আমাদের জাতিভেদ আর অন্য দেশের শ্রেণীবিভাগ কি একই বস্তু? কোন সমাজই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু দোষ ত্রুটী গুলি অবান্তর হওয়া এক কথা—স্বাভাবিক অপূর্ণতার ফল হওয়া এক কথা, আর সেই দোষত্রুটীর উপর সমাজের ভিত্তিমূল স্থাপিত হওয়া আর এক কথা। শরীরের একটা ক্ষত ঐ অঙ্গবিশেষের দোষ হইতে পারে, তাহাতে বিশেষ ভয়ের কারণ নাই। কিন্তু উহাতে যদি রক্ত দূষিত হইয়া থাকে, তবে ভয়ের কারণ যথেষ্টই। আমাদের জাতিভেদ ঐ শেষোক্ত প্রকারের রোগ, আর কোনও সমাজের ভিত্তিমূলে এই রোগ নাই। সুতরাং আমাদের আমূল সংস্কার চাই। জাতিভেদ না ছাড়িলে কল্যাণ নাই, ইহা বুঝিতে পারিয়াও অনেকে সোজা পথে অগ্রসর হইতে নারাজ। দুই পরিবারের মধ্যে যদি বিবাহে কোন বাধা থাকে, তবে তাহা ভাষা ও আচার ব্যবহারের বিভিন্নতা। এই বিষয়ে দুরতিক্রমণীয় বাধা বর্ত্তমান সত্ত্বেও আমরা প্রস্তাব করি, যে, কলিকাতার ভূপেন্দ্রনাথের পুত্রের সঙ্গে দিল্লীর ভীমশঙ্করের কন্যার বিবাহ হউক, তাহাতে জাতিভেদকে বজায় থাকিতে হইবে। আর যেখানে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও কোন ভেদ দেখা যাইবে না—কলিকাতার ভূপেন্দ্রনাথের পুত্র এবং গুরুদাসের কন্যা, তাহাদের মধ্যে বিবাহ হইতে পারিবে না। যেখানে বাস্তব ভেদ নাই, জাতিভেদ সেইখানেই বাধা দিতেছে। ইহা জাতিভেদের অসারতারই প্রমাণ। তবে

জাতিভেদ

সুখের বিষয় আজ বুদ্ধিমানেরা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের সমর্থন না করিয়া পারিতেছেন না।

নারীজাতির অবস্থা

জাতিভেদ আমাদের সমাজ-দেহের কুষ্ঠব্যাধি। কিন্তু নারীজাতির প্রতি ব্যবহার আমাদের সমাজের পক্ষাঘাত। এক অঙ্গ অবশ হইলে আর এক অঙ্গ কখনও বহুদিন কার্য্যক্ষম থাকিতে পারে না। কুষ্ঠ লইয়া আমরা যেমন মানবজাতির মহাসভায় যাইতে অধিকারী নই, এই পক্ষাঘাত আছে বলিয়া আমরা তথায় যাইতে সমর্থই নহি। এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক কথাই বরোদার মহারাণী সেদিন (জানুয়ারী, ১৯২৭) পুনাতে মহিলা সমিতিতে সমর্থন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিবেন, এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। সতীদাহ উঠিয়া গিয়াছে, বিধবা বিবাহ চলিতেছে, বহু বিবাহ নাই, কন্যার বিবাহের বয়স বাড়িতেছে, শিক্ষার জন্য মহাকালী পাঠশালা আছে, আর কি চাও? অবশ্য যাহা দেখা যাইতেছে, কোন্ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি তাহা অস্বীকার করিবে? কিন্তু যাহা দেখা যাইতেছে তাহাই কি সব? মানুষের কার্য্যের বিচার উপর দেখিয়া হয় না। ফল দেখিয়াও নহে। এই সকল উন্নতির ভিতরে প্রবেশ করিলে কি দেখিতে পাই? এখনও এক শ্রেণীর আত্মহত্যার চেষ্টাকে কাগজ পত্রে যে ভাবে প্রশংসা করা হয়, সে দিনও নিমতলার ঘাটে আত্মহত্যা যেরূপ সগর্ব্বে আপনার পদ মানুষের মাথায় তুলিয়া দিয়াছিল, তাহাতে মনে হয়,

আত্মনিয়ন্তৃত্বেই মনুষ্যত্ব

তোমার হাতে ফেলিয়া রাখিলে তুমি হয় তো সতীদাহরূপ-মহাপাতক হইতে আজিও রক্ষা পাইতে না। জীবন-সংগ্রামে বহুবিবাহ টিকিতেছে না, কিন্তু অবস্থার বিপর্য্যয়ে যে তুমি আবার উহা ধরিবে না, তাহা কে বলিল? কন্যাপণের চাপে বিবাহের বয়স উঠিয়াছে, বাল্যবিবাহ অন্যায়, এই জ্ঞানের টানে নহে। এ সব বিষয়ে যাহাদের Views অত্যন্ত liberal, অল্প বয়সে কন্যার বিবাহের প্রতিবাদ করিতে যাইয়া তাঁহাদের কাছেও শুনিয়াছি—"কি করি মশায়, অন্যায় তো বুঝি, কিন্তু এমন পাত্রটী হাতছাড়া হ'লে কি আর পাওয়া যাবে তাই এ মেয়েটাকে ৭ বছরেই দিলাম।" অর্থাৎ পাত্র পাইলেই ও পণ জুটিলে ৭ বছরেই শেষ, নতুবা ১৫ কি ২০ বছরও থাকিতে পারে! ইহাই কি মানুষের উন্নতি? অবস্থার চাপে গড়িয়া উঠা মনুষ্যত্ব নহে, অবস্থার দাসত্ব। আদর্শানুযায়ী নিজেকে গড়িয়া তোলাই মনুষ্যত্ব, নতুবা ঐ অনন্ত নরক তোমার পশ্চাতে রহিল, তুমি যে কখন উহাতে

পড়িয়া যাইবে, তাহার ঠিকানা নাই। এ উন্নতির কোনও মূল্য নাই। আদর্শের মহাশক্তি কোথায়, যে তোমাকে টানিয়া ধরিয়া রাখিবে? তুমি যে অবস্থার দাস। আদর্শে আত্মসমর্পণ করতঃ সেই আলোকে আপনাকে জোর করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে—ইহাই মানুষের জন্মগত অধিকার—ইহাই স্বায়ত্ব-শাসন—ইহাই স্বরাজ। আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে না দেখিলে—বিবেক-বাণীকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বাণী বলিয়া তাহাতে আত্মসমর্পণ না করিতে পারিলে এ শক্তি জাগে না।

স্বরাজ অন্তরে

সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনে, পরিবারে ও সমাজে এই স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে, বাহিরের স্বরাজের প্রয়াস আমাদের জীবনে কেবল মাত্র অবস্থার আধিপত্যই বাড়াইবে, ইহা আমাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ সত্য। যদি জাতীয় জীবনের মঙ্গল চাই,তবে এই সত্য অগ্রাহ্য করিতে পারি না। আসল কথা এই, ব্রাহ্মসমাজ দেশের জন্য পারিবারিক ও সামাজিক যে আদর্শ দিয়াছেন, তাহা গ্রহণ না করিলে দেশের কল্যাণ নাই, ইহা লোহার কলমে পাষাণের মধ্যে লিখিয়া রাখ, এক দিন ইহা আপনার সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। ব্রাহ্মসমাজ যে বিরাট্ কার্য্য-তালিকা লইয়া দেশের দ্বারে উপস্থিত, তাহার দুই একটীর সঙ্গে কেবলমাত্র বাক্যতঃ সহানু-ভূতি করিতে সমর্থ হইয়াই ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সমাধা হইয়াছে এবং 'আমরাই এখন পারি' বলিলে হাস্যরস ছাড়া আর কোন রসের অবতারণার অবসর থাকে না। আমার তো কেবলই "হাসিখুসি"র কথাই মনে পড়ে "বল ছল হয়েছি আমি ছেলেছি পুতুল খেলা।"

ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুস্থানে কেন আবির্ভূত হইলেন, সে ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যাইবে, এরূপ উক্তি কতই অসার। এখানে যখন দুইটী আপাতঃ-বিভিন্ন-মুখীন সভ্যতা পরস্পরকে আঘাত করিবার জন্য উদ্যত হয়, তখন ব্রাহ্ম-সমাজ উভয়ের বিবাদ মিটাইয়া উভয়কে এক উন্নততর ভূমিতে আনয়ন করতঃ এক উচ্চতর সভ্যতার পত্তনের জন্য পুণ্যভূমি ভারতে আসিয়া অবতীর্ণ হন। রাজর্ষির ইংরাজী জীবনী-লেখক সত্যই বলিয়াছেন,—"If we follow the right line of his development, we shall find that he leads the way from the Orientalism of the past, not to, but through western culture, towards a civilizatin which is neither Western nor Eastern, but something vastly larger and nobler

than both,"এই যে নবতর ও উন্নততর সভ্যতার প্রতিষ্ঠা, ইহাই ব্রাহ্মসমাজের জন্মগত অধিকার। সে অধিকারে ভাগ বসাইবার আর কেহ জন্মে নাই। দেশে জাতীয় বা সাম্প্রদায়িক অন্যান্য নানাবিধ কার্য্যের সূচনা হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের ভার লইবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ ছাড়া আর কেহই নাই। কেহ হিন্দুর গুণগান করেন, কেহ মুসলমান আদর্শের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করেন, কেহ খ্রীষ্টীয় সভ্যতার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা করেন। কিন্তু বিশ্বজনীন আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতে সকলকে লইয়া মহাজাতির পত্তন, ও জগতে বিশ্বমানবের অভ্যর্থনা, করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতেছি না। সে কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি তো অন্ততঃ ব্রাহ্মসমাজকে বিদায় দিতে প্রস্তুত নই। ব্রাহ্মসমাজের উপর এতবড় দাবীটা, এত সহজেই ছাড়িয়া দিব কি? সুদে আসলে হিসাব বুঝিয়া না পাইলে ছাড়াছাড়ি নাই। ছাড়িয়া নিস্তার কোথায়? সে কথা পরে বলিতেছি।

ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ কার্য্য

জাতীয় জীবনের সর্ব্ববিভাগেই একটা অনিশ্চয়তার আভাস পরিলক্ষিত হইতেছে। কি ধর্ম্ম, কি সমাজ, কি রাষ্ট্র, সর্ব্বত্রই সভয়ে পদক্ষেপ করিতে হইতেছে। কি যেন একটা আশঙ্কার ছায়া সকল বিষয়েই আবৃত করিয়াছে। যিনি দিবেন তিনি ভয়ে জড়সড়—কি দিলে কি হয়! যিনি চাহেন তিনিও আড়ষ্ট যে কি লইয়া কিন্ বিপদের সম্মুখীন হইব। এই যে ভারত-খণ্ড ব্যাপিয়া এক মহা অশান্তির তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে, ইহাকে যাহারা কেবল মাত্র রাজনৈতিক অধিকার লাভের প্রয়াসোত্থিত আন্দোলন মনে করেন, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। দেশে রাজনৈতিক সমস্যা নাই, তাহা নহে, কিন্তু উহা আমাদের রোগের এক অংশের অভিব্যক্তি মাত্র। এখানে দুইটী বিভিন্ন শিক্ষা ও সভ্যতার সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। ইহার দুইটীর একটীকেও যেমন পরিহার করিতে পারি না, তেমনই একটীর দ্বারা আর একটিকে পর্য্যুদস্তও হইতে দিতে পারি না। আমরা কি এখন জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ কাটিয়া আমাদের প্রাচীনতার দুর্গে আশ্রয় লইতে পারি? এরূপ পন্থা অবলম্বন করা, আর মৃত্যুকে ডাকিয়া আনা—একই কথা। যাঁহারা মনে করেন, এ অশান্তির মূলে আমাদের নবীনকে পরিহার করিবার চেষ্টা বর্ত্তমান, তাঁহারাও অবস্থা সম্যগ অবধারণ করিতে সক্ষম হন নাই। কিছু পরিহার করিবার চেষ্টা হইলে কার্য্য সহজ হইত। এই নবীনের

জাতীয় জীবনে দৃঢ়তার অভাব

মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা বিশ্ব-মানবের প্রকাশ। আমিও বিশ্ব-মানবের অঙ্গ বলিয়া ইহার সঙ্গে আমি এমনই অবিচ্ছিন্ন যোগে আবদ্ধ, যে, বাহিরের অসামঞ্জস্য দেখিয়া ইহাকে পরিহার করিতে চাহিলেও আমার সঙ্গে উহার একটা টানাটানি পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের সমস্যা এত সহজ নহে। এখানে দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বী সভ্যতার আদর্শ সমঞ্জসীভূত হইয়া আমাদের জীবনে প্রকাশিত হইতে চাহিতেছে। আমাদের অশান্তি এই বিরাট প্রয়াসের ফল। সমন্বয়ই যে আমাদের জাতীয়তার অন্তর্নিহিত সত্য। যাঁহারা ভাবেন, আমরা যুগযুগান্ত বাঁচিয়া রহিয়াছি, সুতরাং এই সংঘাত আমাদের কোন অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারিবে না, তাঁহারা অবস্থার গুরুত্ব একেবারেই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আজ আমাদের দ্বারে যে সভ্যতার স্রোত আসিয়া আঘাত করিতেছে, তাহার প্রকৃতির সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাই আমাদের হৃদয়ে এরূপ ব্যর্থ আশার সঞ্চার করিতে পারে। ইহার সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কোন আঘাতের তুলনাই হইতে পারে না। ইহার অগ্রসর হইবার পথে যাহা কিছু বাধা উৎপন্ন করিয়াছে, কাহাকেও বা বিনাশ কাহাকেও বা উদরসাৎ করিয়া আপনার গৌরবে ইহা অগ্রসর হইয়াছে। এই সভ্যতাটী হিব্রু, মিসর, ব্যাবিলোন, গ্রীক্ ও রোমক শিক্ষা ও সাধনকে আত্মস্থ করিয়া আজ আমাদের নাছোরবন্দ অতিথি। ইহার স্থান করিতেই হইবে। যাঁহারা ভাবেন, আমাদের উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞান আছে, কিন্তু ষষ্ঠী মাকাল ছাড়িও না; গীতায় নিষ্কাম কর্ম্ম আছে, কিন্তু প্রতিদিন "ধনং দেহি জনং দেহি শত্রুং জহি" বলিয়া আকাশকে প্রতিধ্বনিত কর; যোগবাশিষ্ঠে নির্ব্বিকল্প সমাধি আছে, কিন্তু ঢাক ঢোল বাজাও তবেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে; আমরা যেমন আছি, তাহাই ভাল—তাঁহারা আমাদের জাতীয় সমস্যার ধার দিয়াও আসিতেছেন না।

বিপদের কথা

যাঁহারা বেদান্ত প্রচার করিতে চাহেন তাহাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন গ্রহণ করিতে হইবে। নিজে অসিদ্ধ অন্যকে সিদ্ধি দিতে পারে না। বেদান্ত প্রচারের প্রয়োজন নাই, তাহা বলিতেছি না; উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া বিশ্বমানবের সিদ্ধি নাই, বর্ত্তমান সভ্যতার বহির্মুখীনতা-রূপ রোগে উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানই যে একমাত্র ভেষজ, 'যেনাহম্ নামৃতা স্যাম্ কিমহম্ তেন কুর্য্যাম্'—হিন্দুর সাধনার ধন এই মহামন্ত্র যে ইহার অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করাইয়া দিতেই হইবে, তাহাতে

রামমোহনের জোর কোথায়?

সন্দেহ মাত্র নাই। রাজা রামমোহন রায়, যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তখন তিনি ভিক্ষুকের ন্যায় উপস্থিত হন নাই। তিনি রাজার ন্যায় বলিয়াছিলেন, আমার রাজ্য আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে তোমার অস্ত্রাগার পরীক্ষা কর, আমি এমন বর্ম্ম-পরিহিত, তোমার অস্ত্র তাহা ভেদ করিতে অসমর্থ। এই প্রশ্নের গভীরতা বুঝিতে পারিয়াই আক্রমণকারী থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু সে দাঁড়াইয়া থাকিবার জীব নহে। যে সব হজম্ করিয়াছে, সে কি ব্রহ্মজ্ঞান হজম্ করিতে অসমর্থ? আমাদের দিক্ হইতে, মীমাংসা না আসিলে সে আপনার মীমাংসা আপনি করিয়া লইবে, সে আমাদের সার আকর্ষণ করিয়া লইলে, অসার নামের খোসা এক দিন ভারত-মহাসাগরের জলে ভাসিয়া যাইবে। আমরা বর্জ্জন করিতে চাহিলেই বর্জ্জন করা চলিবে না। 'কম্‌লি'কে ছাড়িলে কি হইবে, কম্‌লি ছাড়িবে না। য়ুরোপ জল কাদা ঘাটিয়াই ভারত পরিত্যাগ করিবে না—'মূর্খ তুমি, মাটি কাটি লভি কহিনুর, ফেলিয়া সে রত্ন হায়! কে ঘরে ফিরিয়া যায়, বিনিময়ে অঙ্গে মাটি মাখিয়া প্রচুর'। আমাদের সভ্যতায় যদি কিছু সার বস্তু থাকে তবে উহারা তাহা গ্রহণ না করিয়া ছাড়িবে না। পঞ্চত্রিংশত্যাধিক বর্ষ পূর্ব্বে সুধীবর ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল পাশ্চাত্যের বুকের উপর দাঁড়াইয়াই বলিয়া দিয়া আসিয়াছিলেন, যে গ্রীশের ও রোমের খনি আজ নিঃশেষিত। অথচ য়ুরোপের নূতন অনুপ্রাণন চাই, নতুবা তাহার বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক নিশ্চেষ্টতা দূরীভূত হইবার নয়। ইতিমধ্যে প্রাচ্যের বার্ত্তা রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়া পাশ্চাত্যে হাজির হইল। পাশ্চাত্য তাহা "a new spiritual revelation" (*West Minister Gazettee*) বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়া লইল। বোলপুরে 'বিশ্ব-ভারতী'র পত্তন হইতে না হইতেই, Sylvain Levi প্রভৃতি আসিয়া হাজির। দায়ে পড়িয়াই হউক, আর যে কারণেই হউক, যে সময়ে জাতি সকল সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যে যার স্বার্থ রক্ষায় যত্নবান হইয়াছে, সকল জাতি মিলিয়া এক মহা-মানব জাতিতে পরিণত হইবার আয়োজন করিতেছে সেই সময়ে যাঁহারা ভারতকে নিঃসঙ্গ একাকিত্বের মৃত্যুর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন তাঁহাদের দুষ্কার্য্যের যথেষ্ট নিন্দাবাদ সম্ভব নয়। ব্রাহ্মসমাজ চিরদিনই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। আজ দেশকে সে কথা শুনিতেই হইতেছে। কেন না, আমার শক্তির কেন্দ্র যাহা, তাহা যদি উহারা আয়ত্ত করে, আর উহাদের শক্তি যদি আমরা সংগ্রহ করিতে না পারি, তবে পরিণামে আমাদিগকে

পরাজিত হইতেই হইবে। আমরা পশ্চাৎ ফিরিয়া থাকিলেই জগৎ-বিবর্ত্তনের নিয়ম বসিয়া থাকিবে না। বিদেশে যাইয়া কেবল ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিলেই হইবে না, কিন্তু আমাদের যাহা সার বস্তু, সেই ব্রহ্মোপাসনাকে জাতীয় জীবনের ভিত্তি করিয়া তাহার উপর পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাধনার যাহা আমাদেরই (পৃঃ ৩৪৩) বিস্মৃত শিক্ষা ও সাধনার নবতর ও পুষ্টতর আকার তাহার—সহযোগে পূর্ব্বকথিত নবতর ও উন্নততর সভ্যতারূপ মহা সৌধ গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই সমন্বয়ের মধ্যেই বর্ত্তমান যুগসমস্যার মীমাংসা রহিয়াছে, মীমাংসার অন্য উপায় দেখিতেছি না। এই সমন্বয়ের চেষ্টার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই নাই। সকল জাতীয় ভাবই সার্ব্বভৌমিকের বিকাশ, বিশ্বমানবের এক অংশের আত্মপ্রকাশ। সুতরাং প্রকাশে সভ্যতা সকলের মধ্যে বিভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও, মূলতঃ কোনই বিরোধ থাকিতে পারে না। সকলই বিশ্বমানবের অঙ্গ। আমাদিগকে এই বাহ্যিক বিভিন্নতা পরিহার করতঃ, উভয়কে উচ্চতর সমন্বয়ে একীভূত করিয়া জীবনে প্রতিফলিত করিতে হইবে। নতুবা এ অশান্তির বিরাম নাই। যাহারা কেবলমাত্র দুই চারিটী রাজনৈতিক অধিকার পাইলেই অশান্তি দূর হইবে মনে করিতেছেন, তাঁহারা রোগ নির্ণয়ে অসমর্থ। ব্রাহ্মসমাজ রাজর্ষি রামমোহনের সময় হইতে এই পথেই জাতীয় সমস্যার সমাধান করিবার জন্য দেশকে আহ্বান করিয়াছেন ও করিতেছেন। এতদিন না শুনিলেও আজ কর্ণপাত করিতেই হইতেছে, বিশ্বজনীন আদর্শের আলোকে জাতীয় জীবনকে সংস্কৃত ও পরিপুষ্ট করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়কে গ্রহণ করিতে হইতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে স্বীয় অঙ্গীভূত করিয়া লইতে পারিলেই কেবল এ অশান্তি নিরাকৃত হইতে পারে, নতুবা নহে। কেবলমাত্র রাজনৈতিক ঔষধ প্রয়োগে রোগ দূরীভূত হইবে না। স্থান বিশেষের বাহ্য প্রকাশ মাত্র স্থগিত থাকিতে পারে। সমগ্রকে ভুলিলে পরিণামে বিষম অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা। রোগ বাহির হইতে ভিতরে যাইয়া জীবনী শক্তিকে আক্রমণ করিলে উপায় কি? রোগের মূল উৎপাটন করিতে হইবে, স্থানীয় প্রলেপে কার্য্য-সিদ্ধি হইবে না। আমাদের রোগ প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষণ। ঔষধ, উভয়ের সমন্বয়-জাত উচ্চতর জীবনের প্রতিষ্ঠা। অন্য কোন নিম্নতর ভূমিতে বা ক্ষুদ্রতর ব্যবস্থায় জাতীয় সমস্যার মীমাংসা নাই। ব্রাহ্মসমাজ চিরদিন এই কথাই বলিয়া আসিতেছেন। সেই সমন্বয়ের দিনে জগৎ যে দৃশ্য দেখিবে তাহাই তো ব্রাহ্মসমাজ।

মীমাংসা কোথায়?

ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের ভাল করিয়া গোড়াপত্তনই হয় নাই—সুতরাং যাঁহারা ভাবেন, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য শেষ হইয়াছে, তাহাদিগকে নিতান্ত অজ্ঞ ছাড়া আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। অন্ধের নেতা অন্ধ, যাঁহারা অনবহিত লোকমণ্ডলীকে অনভিজ্ঞতার সুযোগে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহারা সঙ্কটময় জাতীয় জীবনপথকে অধিকতর কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিতেছেন।

সন্ন্যাসীর ব্রহ্মজ্ঞানে নয়

ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মোপাসনাকে জাতীয় জীবনের ভিত্তি করিয়া এই মহা সমস্যার মীমাংসা করিবেন বলিয়াই সন্ন্যাসীর ব্রহ্মজ্ঞান আজ গৃহীর আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছে। সেইজন্যই প্রথম হইতেই ব্রাহ্মসমাজ জাতীয় জীবনের সকল বিভাগেরই সংস্কার-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী সুতরাং ব্রাহ্মের কর্ম্মক্ষেত্রও সর্ব্বগত না হইয়া পারে না। কিন্তু ব্রাহ্মের সঙ্গে অন্যান্য সংস্কারকদলের বিভিন্নতা কেবল পরিমাণগত নহে, গুণগতও বটে। ব্রহ্মজ্ঞান ভিত্তিমূলে নাই বলিয়া দেশের রাজনৈতিক সংস্কার কেবলমাত্র সুবিধাবাদে পরিণত হইয়াছে; সমাজ-সংস্কার সাম্প্রদায়িক গণ্ডিতে আবদ্ধ হইয়া সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদের কেন্দ্রভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে; আর অর্থনীতি "Almighty Dollar"এর উপাসনায় পরিণত হইয়াছে। এই যে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করি, তাহা কিসের জন্য? তাহা কি অন্ন সংগ্রহ করিয়া দু দশ জনের প্রাণ রক্ষা করিব, তাহারই জন্য? না, তাহা নহে। ব্রাহ্মের দৃষ্টি এত ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ নহে। জানি, মৃত্যুর হস্ত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। আর যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের (Survival of the Fittestএর) নিয়ম অনুসারে যদি একটা জাতি ধরা পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যায়, তাহাতে তোমার আমার কি? এরূপ তো কতই গিয়াছে। সংগ্রাম করি এই জন্য, যে, দরিদ্রতা-রাক্ষসী নরনারীর মুখ হইতে স্বর্গের ছবি মুছিয়া ফেলে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পরমপুরুষ আপনাকে প্রকাশ করিবার অবসর খুঁজিতেছেন, মানবাত্মায় যে ব্রহ্মের প্রকাশ, তাহাই শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। যে রীতি নীতি, আচার পদ্ধতি সেই প্রকাশে বাধা উৎপন্ন করে, তাহার বিরুদ্ধে অনন্ত-কালব্যাপী সমর ঘোষণা করিতে হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে, মানুষ এমন অনেক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে, যাহার চাপে অন্তরস্থ ব্রহ্ম নিষ্পেষিত। ইহাই বাস্তবিক ব্রহ্ম-হত্যা। যাহা মানুষের মনুষ্যত্ব হরণ করে, মানুষকে তাহার ব্রহ্ম-সন্তানত্বের দাবী হইতে বঞ্চিত করে, ব্রাহ্ম কখনও তাহার

বিপক্ষে সংগ্রাম হইতে বিরত হইতে পারেন না। এখানে ফলাফলের কোনই চিন্তা আসিবে না। মানুষকে মানুষ হইতে দাও, এই বলিয়া ব্রাহ্মসমাজ যখন দেশের অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি বিধানে সকলকে আহ্বান করিয়াছেন, কেহ তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। অন্তরস্থ ব্রহ্মের সাক্ষাৎ না পাইলে বাহিরের ব্রহ্মকে কে ধরিতে চেষ্টা করিবে? আজ যে অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি কল্পে দেশে একটা সাড়া পাওয়া যায়, তাহার অর্থ কি? অন্তরস্থ ব্রহ্ম যে জাগিয়াছেন, তাহা নহে। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে দেখিলাম, তথা-কথিত উচ্চ-শ্রেণী যাহা চায়, তাহার সঙ্গে সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি না থাকিলে, চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়; এমন কি, রাজদ্বারে ভিক্ষাপাত্র হস্তে দণ্ডায়মান হইতে হইলেও উহাদিগের সহায়তা চাই, তাই আজ অবনত শ্রেণী-সকলের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহা জাতীয় জীবন-স্রোতের একটা সাময়িক তরঙ্গ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমূহের চাপের খেলা; মানবের অন্তর্প্রকৃতি-নিহিত কোনও সত্যের আত্ম-সম্প্রসারণ চেষ্টা নহে। অবস্থার বৈপরীত্যে এ প্রয়াস সঙ্কুচিত বা সম্পূর্ণ বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। কেননা, এই সকল কর্ম্মোদ্যমের পশ্চাতে কোনও নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় সত্য নাই! ইহা ফলাফল গণনার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই ফলাফল গণনার ক্ষেত্রও অতি সংকীর্ণ; সুতরাং ইহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টাও কখন আসে না। এক হাওয়ায় আসে আর এক হাওয়ায় কোথায় উড়িয়া যায়। কেন না, যাহা পাইবার আশা, তাহা মঙ্গল কি অমঙ্গল, ফলাফলবাদী ইহা নিশ্চয় করিতে অসমর্থ। ব্রাহ্মসমাজ সংস্কারগুলিকে কখনই এই নিম্নভূমি হইতে দর্শন করেন নাই; তাই বাহিরের অবস্থার শত প্রকার অননুকূলতার মধ্যেও তিনি আপনার কার্য্যক্ষেত্রে দণ্ডায়মান। তিনি যে কিছু চাহিয়া ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া আছেন, তাহা নহে। তিনি মানবাত্মার মধ্যে মহত্ত্ব দর্শন করিয়াছেন। যাহা আছে, যাহা অবধারিত—ব্রাহ্মের চেষ্টা তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের মনুষ্যত্ব

কর্ম্মক্ষেত্রের আদর্শ

মানবের যাহা মহত্ত্ব, মানব জাতির যাহা নিয়তি, তাহা ভগবানে নিত্যসিদ্ধরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে, কেহ তাহা গড়িবে না। যে আত্মবিদ্ তাহা দর্শন করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত কর্ম্মী-পদবাচ্য। যিনি তাহা দেখেন নাই, সুবিধাবাদ বা ফলাফলবাদই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়। সেই জন্যই বলিয়াছি, ব্রহ্মোপাসনাকে ভিত্তি না করিলে

আদর্শ ব্রহ্মে বর্ত্তমান

জাতীয় জীবন-সংগ্রামে প্রতিষ্ঠা-লাভের সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই ব্রহ্মোপাসনার জন্য রামমোহনের এত প্রচেষ্টা। মানব মানব বলিয়াই সে মহৎ এবং তাহার মহত্ত্ব স্বর্গের দান, পাতাল হইতে উঠিয়া আসে নাই! মহত্ত্ব উপর হইতে আসে তাই আশা-নেত্রে ঊর্দ্ধ দিকে চাহিয়া এই সংগ্রামে মানুষ বল লাভ করিবে। রাজর্ষি রামমোহনের একশত বৎসর পূর্ব্বের কার্য্য-তালিকা দেখিয়া এখনও সকলে বিস্মিত হন। এ কর্ম্মশক্তি তিনি পাইলেন কোথায়? সকল রোগের ভেষজ ব্রহ্মোপাসনাকে তিনি সত্য বলিয়া ধরিয়াছিলেন। 'যায় প্রাণ থাকে প্রাণ' বলিয়া তাহাতেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, কোন দিকে তাকান নাই। তাই শক্তির উৎস খুলিয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজও এই পথে অনেক অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। মুক্তি পাইতে হইলে ইহাই পথ—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

জাতীয় ঋণ

আমাদের জাতীয় জীবনের কতকগুলি ঋণ আছে। সেই ঋণগুলির পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে ব্রাহ্মসমাজের সিদ্ধির কথাই আসিতে পারে না। কি জানি কেন, প্রাচীন সভ্যতার এই এক খনি ভারতের প্রান্তে ও মধ্যে অনেক পার্ব্বত্য জাতি সকল বাস করিতেছে, যাহাদিগকে সভ্যতা যেন কোনও রূপেই স্পর্শ করে নাই। তাহারা সেই আদিম অবস্থাতেই" রহিয়াছে। ইহাদিগকে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার করা একটা জাতীয় ঋণ। মতভেদ থাকিলেও ইহা অধিকাংশের মতে স্বীকৃত, যে আর্য্যগণ ভারতের আদিম অধিবাসী নহেন। তাঁহারা এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং আদিম অধিবাসীদিগের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হন। তাহার প্রমাণ আমাদের সর্ব্বপ্রাচীন সাহিত্যে বর্ত্তমান। এ বিষয়ে মতদ্বৈত হইতে পারে না, যে এখানকার আধিপত্যের জন্য বহুকাল ধরিয়া অন্ততঃ দুই দলে বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়াছিল। বিবাদান্তে যে জাতি গঠিত ও সভ্যতা অভ্যুদিত হইল, তাহার জন্য নিঃসন্দেহে উভয়দলই উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সন্ধিতেও আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে যাহাদের মনের আক্ষেপ মিটিল না, তাহারা সমতল হইতে বিতাড়িত হইয়া পর্ব্বত আশ্রয় করিল, যাহারা এক দিন সভ্যতার উপাদান যোগাইয়াছিল, সভ্যসমাজের সংস্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পশুদিগের সহবাসে তাহারা চরম দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইল? ইহাদের প্রতি কি এ জাতির কোনও কর্ত্তব্য নাই? কর্ত্তব্য যে কি গুরুতর, তাহা বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন আছে

কি? মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যে রত্ন অপহরণ করা হইয়াছে, তাহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। আমরা কি আমাদের এই মহাকর্ত্তব্যের প্রতি উদাসীন নই? এই প্রসঙ্গে পূজনীয় প্রচারক নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুণ্যময় কার্য্যের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তাঁহার ত্যাগের যথোচিত প্রশংসা করা অসম্ভব। আমরা সভ্য সমাজে বাস করি, তাহা হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হই না, সুতরাং ইহার মর্য্যাদা আমাদের অনুভবের বাহিরে। সর্ব্বদা বায়ুমণ্ডলে বাস করি বলিয়া যেমন বায়ুর প্রয়োজনীয়তার কথা ভুলিয়া যাই, অথচ এক মুহূর্ত্ত বায়ু না হইলে প্রাণ বাঁচা ভার। এই জীবনপ্রদ আবেষ্টনের বাহিরে না গেলে, যাহারা শিক্ষা ও সভ্যতাবর্জ্জিত তাহাদিগকে মনুষ্যত্বের পদবীতে আনয়ন করা যায় না। মনুষ্যত্বের বিনিময়েই মনুষ্যত্ব দান করা চলে। নীলমণি বাবু ও তাঁহার সহচরগণ এই ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এক মহাকার্য্যের সূচনা করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের এই জাতীয়ঋণ-শোধ-ব্যাপারে দেশ যদি অম্লানবদনে সাহচর্য্য না করেন, তবে বুঝিতে হইবে আমরা এখনও কত পতিত। আরও বুঝিতে হইবে, ছোট নাগপুর অপেক্ষা বড় নাগপুরেই ব্রাহ্মধর্ম্মের বেশী প্রয়োজন। কেননা, সেখানে মনুষ্যত্ব নাই, মনুষ্যত্বের ভাণ মাত্র আছে।

পার্ব্বত্য জাতির উন্নতি-বিধান

আর এক ঋণ দেশের অনুন্নত শ্রেণীগুলি সম্বন্ধে। এই Depressed Classএর কথা যখন ভাবি, তখন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি—মানুষের বিধিব্যবস্থা মানুষকে কত হীন করিয়া ফেলিতে পারে। ইহারা সভ্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও ইহার সকল সুফল হইতে বঞ্চিত। ইহাদের সেবা ছাড়া সমাজ চলিবে না, অথচ পদাঘাত ব্যতীত ইহাদের অন্য কোনও প্রাপ্তি নাই। মানুষের ঘৃণিত স্বার্থপরতা ইহা অপেক্ষা আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না। ইহাদিগের শিক্ষাদানের বিরুদ্ধে যখন যুক্তি শুনি, 'তাহা হইলে আমাদিগের চাকর মিলিবে না', তখন দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত বলিতে হয়, ছোটনাগপুরে ব্রাহ্মসমাজের মিশন্ পাঠাইতে হইবে কেন, এই 'হাম্‌বড়া'দের মধ্যেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের কত বড় ক্ষেত্র রহিয়াছে। শিক্ষা ও সভ্যতার আবরণের নীচে এ কি অমানুষিক হীনতা! আজ কাল যে ইহাদিগকে তুলিয়া লইবার কথা কিছু জোরের সঙ্গেই হইতে শুনিতেছি, তাহা তো নিতান্ত দায়ে পড়িয়া তুলিয়া না লইলে প্রতিযোগিতায়

নিম্ন শ্রেণীর উন্নয়ন

টেঁকা দায়? ইহারাও মানুষ, ইহাদের মনুষ্যত্বের পথে যে বাধা আছে, তাহারা মানুষ বলিয়াই তাহা অপসারণ করিতে হইবে—ব্রাহ্মসমাজ ছাড়া সে আদর্শের অনুপ্রাণন আর কোথায়ও নাই। বিধবা বিবাহের আন্দোলনের মূলেও ঐ সুবিধাবাদই কার্য্য করিতেছে। অথচ নাকি ব্রাহ্মসমাজের কাজ শেষ হইয়াছে। নির্ব্বুদ্ধিতা ইহা অপেক্ষা বেশীদূর যায় না!

যে নীচে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাকে উপর হইতে তুলিয়া লওয়া কিছু কঠিন কার্য্য নহে। কিন্তু যে কেবল হীন, তাহা নহে, "তুমি হীন তুমি হীন" বলিয়া যাহাদিগের মন হইতে মহত্বের আকাঙ্ক্ষাই দূরীভূত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, হৃদয় হইতে মহত্বের ছবি মুছিয়া ফেলা হইয়াছে, অন্তরস্থ ব্রহ্মকে এমনই ভাবে চাপিয়া দেওয়া হইয়াছে, যে, তাহারা নিজেরাই নিজদিগকে নীচ মনে করে, আপনারাই আপনাদের ব্রহ্মসন্তানত্ব স্বীকার করে না; বিকৃত রীতিনীতির চাপে এমন হইয়াছে, যে, তাহারা নিজেরাই আপনাদিগকে নীচ মনে করে এবং বড় হইবার আকাঙ্ক্ষাও হৃদয়ে স্থান দেয় না—তাহাদিগকে উঠাইয়া লওয়া সহজ নহে। তাহাদিগের উদ্ধারের জন্যও মনুষ্যত্বের দান চাই। এইরূপ একটী অনুন্নত জাতি বোম্বাই অঞ্চলের মহারগণ। ইহারা কুকুর বিড়াল অপেক্ষাও ঘৃণার বস্তু। হিন্দু মুসলমান উভয়েরই অস্পৃশ্য, তবে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর নিকটে বেশী। কোন মহার ঋণের টাকা পরিশোধ করিতে আসিলে কোন হিন্দু—অবশ্য তথা-কথিত উচ্চশ্রেণীর—সে টাকা সাক্ষাৎভাবে গ্রহণ করিবে না। তবে যদি কোন মুসলমান মধ্যবর্ত্তী হইয়া মহারের হাত হইতে লইয়া হিন্দুর হাতে দেন, তবে সে মুদ্রা শুদ্ধ হইয়া যায়। অথচ লোকসংখ্যা গণনায় মহারদিগকে হিন্দুর মধ্যেই গণনা করিতে হইবে।

অন্যকে পতিত রাখিয়া নিজের মুক্তি নাই

তাহা না হইলে জনবল কমিয়া যায়, আর রাজনৈতিক অধিকারের দাবীও হিন্দুর পক্ষে কোন কোন বিষয়ে খর্ব্ব হইয়া পড়ে! পার্শ্ববর্ত্তী ভ্রাতাকে হীন রাখিয়া তু বড় হইতে পার না। তুমি যতই বড় হও না কেন, প্রকৃতির প্রতিশোধের হস্ত হইতে তোমারও নিস্তার নাই। যাক্ সে কথা, যাহা বলিতেছিলাম। ইহারা মনুষ্যত্ব হইতে এমনই স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে, যে অধিকার দিলেও লইতে সাহসী নয়। ইহাদের উদ্ধার কি সহজসাধ্য ব্যাপার? যুগযুগান্তের সঞ্চিত জাতীয় আবর্জ্জনা কি সহজে অপসারিত হইতে পারে। মহারাষ্ট্র-বীর মহাত্মা সিন্ধে এই কঠোর ব্রতসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। হিন্দু ও মুসল-

মানের অস্পৃশ্য এই মহার জাতির উদ্ধারকল্পে যে আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এক যুগল—বিধাতার অপূর্ব্ব সমাবেশ ও বিচিত্র লীলা—সৈয়দ মুসমান ও তৎ-পরিণীতা সারস্বত ব্রাহ্মণকন্যা। সিন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারব্রতে দীক্ষিত হইয়া শিক্ষার্থ Manchester Collegeএ গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া তাহার মনে প্রশ্ন উঠিল—শিক্ষিতদের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইয়া সকল সময় ক্ষেপণ করা অপেক্ষা মানুষ যাহাদিগকে মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহাদিগকে মনুষ্যত্বের সোপানে তুলিয়া লওয়া কি শ্রেষ্ঠতর প্রচার-পন্থা নহে? যতক্ষণ একটী আত্মা অমুক্ত, ততক্ষণ আমার মুক্তি কোথায়? তাই তিনি সভ্যসমাজের সুখের প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া ইহাদের পশ্চাতে ছুটিয়াছিলেন। ইহারাই বাইবেল্-কথিত 'হারান মেষ'। আত্মত্যাগ ছাড়া আত্মা জাগে না, এবং ইহা অপেক্ষা আত্মত্যাগের উচ্চতর প্রকাশও নাই। ত্যাগের ফল হাতে হাতে ফলিয়াছে। আমরা পেরেলে সিন্ধের প্রতিষ্ঠিত অনুন্নত-শ্রেণীর-জন্য বিদ্যালয় দেখিয়াছি। তীর্থ যদি কিছু থাকে, তবে ইহা সেই তীর্থ। বাহিরে যাহাদিগকে দেখিয়া মানুষ বলিয়া চেনা যায় না, বিদ্যালয়ে দেখিলাম, তাহাদের মধ্যে অপহৃত ব্রহ্ম-ছবি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ইহাদের মুখে তানলয়-সমন্বিত উপনিষদের ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্লোকের আবৃত্তি শুনিয়া সত্যই মনে হইল, ধরাতলে স্বর্গরাজ্য অবতীর্ণ হইয়াছে। আমাদেরও তীর্থযাত্রা সার্থক হইল। অন্যদিকে স্বর্গীয় সেবাব্রত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রমজীবীদিগের উন্নয়ন চেষ্টা ও রাজমোহন বাবুর অনুন্নতদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ সকলই জাতীয় ঋণ শোধ। বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজ-সংশ্লিষ্ট এই সকল প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ধর্ম্ম প্রচার করিয়া স্বদলের পুষ্টি-সাধন নহে—এরূপ প্রচারের ভ্রান্তি পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে (পৃঃ ১৭৩)। কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য শিক্ষা ও অনুপ্রাণনাদ্বারা উপরের চাপে যাহারা মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিত হইতে বসিয়াছিল তাহাদিগকে মনুষ্যত্বের পথে আনিয়া দাঁড় করিয়া দেওয়া। যদি কেহ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে একীভূত হইতে চান তাঁহাকে কখনও প্রত্যাখ্যান করা হইবে না। কিন্তু উচ্চ-নীচ নির্ব্বিশেষে সকলকেই প্রীতি ও সহানুভূতির বন্ধনে আবদ্ধ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মসমাজ জাতীয় ঋণশোধের যে পথ খুলিয়া দিয়াছেন, দেশ তাহার অনুসরণ করিবেন কি?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জাতীয় সিদ্ধির পথ

আগে চল্ আগে চল্ ভাই—রবীন্দ্রনাথ।

ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ।

এমন অজ্ঞলোকের অভাব নাই, যাহারা বলে এবং সেটা এই লজিক্ অনুসারে 'Give the dog a bad name and hang him' যে ব্রাহ্মধর্ম্ম 'Christianity without Christ' এবং ব্রাহ্মসমাজ পাশ্চাত্য রীতিনীতির অনুকরণ। এ কথার একটা উত্তর এই, যে খৃষ্টবিহীন খৃষ্টধর্ম্ম একটা হেয় জিনিষ নহে, এবং এরূপ প্রশ্নের মূলে খৃষ্টধর্ম্মের অভিব্যক্তির ইতিহাস-জ্ঞানের অভাব। যাহার আলোচনা ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি (৬ষ্ঠ অঃ, ২য় পরিঃ)। দ্বিতীয়তঃ, শক্তিমানের পক্ষে বিশেষ অবস্থায় বাহির হইতে কিছু গ্রহণ করার স্থান সমাজ-বিবর্ত্তনে যে খুব উচ্চে, তাহার জ্ঞান না থাকাতেই মানুষ অনুকরণকে ভয় পায়। আমরা প্রতিদিনই বাহির হইতে খাদ্য গ্রহণ করিয়া শরীরের অস্থিমজ্জায় পরিণত করিয়া ফেলি। এরূপ করিবার শক্তি আছে তাই করিতে সমর্থ হই। যার সে শক্তি নাই, সে খাদ্য দেখিয়া ভয় পায়। বাহির হইতে কিছু লইয়া আপনার করিয়া লওয়াই জীবপরিবর্ত্তনের নিয়ম, প্রাণনী শক্তির পরিচয়। ভারত যে আজ বিদেশীর সংস্পর্শে আসিতে ভয় পায়, তাহার কারণ এই যে সে তার প্রাণনী শক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান। ভারতের প্রাণনী শক্তি তার **ব্রহ্মজ্ঞান**! সে আজ সেই ব্রহ্মজ্ঞানের চর্চ্চা হইতে অবসর লইয়া প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। তাই তার ভয়। সে ভিত্তিহীন তাই ভয়, পাছে স্রোতে ভাসিয়া যায়। রামমোহন ভয় পান নাই! কেননা, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন। ভারতীয় সভ্যতার উহাই শক্তিকেন্দ্র। স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া বাহির হইতে গ্রহণে শক্তি বাড়ে, কোন অনিষ্ট হয় না। জগতের অনেক চারুশিল্প ও সাহিত্যের নূতন ধারা বৈদেশিক সংঘর্ষে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৩শ শতাব্দীর ইতালির চিত্রশিল্প, যার তুলনা অল্পই পাওয়া যায়, তাহা Byzantine শিল্পের অনুকরণ। ইংলণ্ডের যে এলিজাবেথীয় যুগের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে কোন বিশেষজ্ঞই প্রশ্ন তুলিতে পারেন না, সে সাহিত্যের প্রেরণা আসিয়াছে ইতালীয় ও ফরাসী সাহিত্য হইতে। স্বামী বিবেকানন্দ

উপযুক্ততা-লাভে সিদ্ধি

(পরবর্ত্তী অধ্যায়) মার্কিন নারীদিগের অনুকরণে এদেশের নারী-সমাজ গঠন করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ কিন্তু কোন্ দিকেই—কি ধর্ম্মে, কি সমাজে, বাহিরের অনুকরণ করিতে বলেন নাই। যাঁহারা এরূপ ভাবেন, তাঁহারা ইহাই প্রতিপন্ন করেন যে নিজেরা ঘরের খবরই রাখেন না। ব্রহ্মজ্ঞান বাহিরের বস্তু নয়, ঘরের। অথচ বস্তুটী জগতে দান করিতে হইবে। দান করিতে হইলে দাতার আসন গ্রহণ করিতে হয়। সন্ন্যাসীর ঝুল্লী হইতে জগৎ ইহা গ্রহণ করিবে না। রবীন্দ্রনাথ যখন ভারতীয় সভ্যতার উৎকর্ষের কথা বলিয়াছিলেন, তখন একজন জাপানী লিখিয়াছিল, যে তাঁহার নিজের নিকৃষ্ট সভ্যতাই ভাল। কেন না, তাঁহার সভ্যতা তাহাকে শতশত বৎসর ধরিয়া পর-পদানত করিয়া রাখে নাই। একজন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক বোম্বাই অঞ্চলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। তিনি এক সভায় ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতার কথা বলেন। এক মিশনারীর তাহা অসহ্য হইল। তিনি প্রশ্ন করিলেন, আমার ধর্ম্ম আমাকে বিশাল সাম্রাজ্য দিয়াছে, তোমার ধর্ম্ম, যে ধর্ম্মের বড়াই কর, তোমাকে কি দিয়াছে। বক্তা উত্তর করিলেন, ও সাম্রাজ্য আমার ধর্ম্মের দান—আমার ধর্ম্ম আমাকে পার্থিব সম্পদ্‌কে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে শিখাইয়াছে। তাই ত আমার উপর তোমার আধিপত্য। তাই বলি, এ ধর্ম্ম কেউ আদর করিবে না। ব্রহ্মজ্ঞান ভারতীয় সভ্যতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ। উহাকে জীবন হইতে সরাইয়া সন্ন্যাসীর ঝুলিতে রাখিয়া জগতের নিকট আর বড়াই করা চলিবে না। সন্ন্যাসীর ঝুলি হইতে বাহির করিয়া জীবনে লাগাইতে হইবে। গীতা বলিতেছেন "শ্রী বিজয় ও ভূতি"র জন্য কেবল "যোগেশ্বর কৃষ্ণ" হইলেই হইবে না, "ধনুর্ধর পার্থ"কেও চাই। স্বামী বিবেকানন্দ এক দিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'যে ধর্ম্ম খেতে দিতে পারে না সে মুক্তি দিবে এ কথা লোকে বিশ্বাস করিবে কেন'? নিজের জীবনে লাগাইয়া ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে হইবে, *advice gratis*এর স্থান বর্ত্তমান জগতে নাই। দানরূপে কেউ নিবে না, জোর করে নিয়ে নিজের কাজে লাগাবে। দানরূপে দিতে হইলে আগে দাতার আসনে বসিতে হইবে। কিন্তু যত দিন পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ আছে, যতদিন নারী-জীবনের হীন দশা আছে ততদিন সে আসন সুদূরে পরাহত। ব্রহ্মজ্ঞান আসিলে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ থাকিবে না—ইহা বাহিরের কথা নহে, ধার করা সম্পদ্ নহে, জাতীয়

সামাজিক উন্নতি

জীবনের পরীক্ষিত সত্য। আর, নারীর অধিকার? অবরোধ সকল অনর্থের মুল। বৃদ্ধ ডাক্তার ভাণ্ডারকারকে কথায় কথায় লেখক কর্ত্তৃক বলিতে হইয়াছিল, যে নারীর অবরোধ বঙ্গদেশে হিন্দুয়ানীর ধর্ম্ম-সঙ্গত অঙ্গ হইয়া গিয়াছে। তিনি ঘৃণার ভাবে বলিলেন, যে বাঙ্গালীরা তবে হিন্দুই নয়। অবরোধ আর্য্য প্রথা নহে। যাঁহারা অবরোধ তুলিয়া দিতে চায়, তাঁহারা বিদেশীর অনুকরণ করিতেছে না, কিন্তু যাঁহারা রাখিতে চায় তাঁহারাই একটা বৈদেশিক অনুকরণ বুকে জড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছেন। আমরা কি আর্য্য প্রথা কি, আর্য্য প্রথা না, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। আজ যদি কাহারও ঘরের একটি বয়স্থা মেয়ে বাপকে বলে, "বাবা, বিয়ে দিলে না, আমি বর খুঁজে নিতে চল্লাম"; অথবা, বাপ ভাই বর খুঁজে এনেছে, কিন্তু তাহাকে তাচ্ছিল্য করিয়া নিজের মনোমত বরের সঙ্গে আর একটি মেয়ে চলে গেল; অথবা তৃতীয়টী বাপকে বলিল "আমার দ্বিতীয়বার স্বয়ম্বরের আয়োজন কর"—তাহা হইলে নিশ্চয়ই সকলে মিলে আজ বল্‌বেন, ইহা পাশ্চাত্য রীতির অনুকরণ! আগে জান্‌লে গলায় নূন দিয়ে আঁতুরেই মেয়ে গুলোকে মেরে ফেল্‌তাম, এ মেয়ে হিন্দুর ঘরের নয়। অথচ আপনারা যুগযুগান্ত ধরিয়া সাবিত্রীব্রত সাধন করিতেছেন। লক্ষ্মীকে (রুক্মিণী)? ঘরে আনিবার জন্য আল্‌পনা দিতেছেন, আর "দময়ন্তী যথা নলে" বলিয়া প্রত্যেক নবোঢ়াকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। কিন্তু সশরীরে ঘরে এলে ঝাঁটার ব্যবস্থা। তাঁহাদের স্থান বর্ত্তমান সমাজে নাই। স্বামী বিবেকানন্দ কি মার্কিন মহিলাদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলেন নাই, যে এরূপ সহস্র "মা জগদম্বা" প্রস্তুত করিয়া মরিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হইয়া মরিব! ব্রাহ্মসমাজের কি ইহাই দোষ, যে, তিনি ইঁহাদের জন্য আসন প্রস্তুত করিয়াছেন! দোষ থাকে সংশোধন করুন, কিন্তু গোড়াপত্তন ঐ, অন্য পথ নাই। ভারতীয় জাতি নিতান্ত আত্মভোলা। যাহা চাহিতেছে, কাছে আসিলে তাহাই প্রত্যাখ্যান করিতেছে। রামও চান লবকুশকে, লবকুশও চায় রামকে, কিন্তু যখন দেখা হ'ল তখন হ'ল মারামারি। সোরাব চায় রষ্টেম্‌কে রষ্টম্ খোঁজে সোরাবকে, কিন্তু দর্শনের পরিণতি রক্তারক্তিতে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজই এ জাতির জাতীয় আদর্শের অভিব্যক্তি, কিন্তু চিনিতে না পারিয়া অগ্রাহ্য করা হইতেছে। আজ দেশে একটা কথা শুনা যাইতেছে, যে সর্ব ছাড়িয়া আগে গঠনমূলক কার্য্যে মনোনিবেশ কর। জাতীয় নৈতিক উন্নতি বিধান ছাড়া কোন উদ্যমই সফল হইবে

জাতীয় ভাব-বিষয়ে অনভিজ্ঞতা

না, ইহাও কি ব্রাহ্মসমাজেরই কথা নহে? ব্রাহ্মসমাজই কি এই আদর্শ লইয়া দেশের মধ্যে এত দিন কাজ করিয়া আসিতেছেন না? ইহার মধ্যে নূতনত্ব কোন্ খানে? গলাবাজীতে সত্য চাপা পড়িবে না। এই বিশেষত্বটি ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কার্য্যের আলোচনায় Dr. Sten Konow স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—"On the whole his leadership meant a distinct strengthening of the national base of the Samaj. It is of interest to take note of this, because it is typical of the whole development. Foreign elements may be assimilated, and there may be visible traces of a strong impulse from outside, but the Indian framework is so substantial that it overshadows the whole." তিনি ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দুইটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যাহার কথা আমরা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি। প্রথমতঃ, ব্রাহ্মধর্ম্ম যে জাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার আধ্যাত্মিক আবেষ্টনের বিশেষত্ব উহার গাত্রে ফুটিয়া উঠিবেই। ইহাই স্বাভাবিক। এরূপ না হইলে উহা কখনও জীবন্ত ধর্ম্ম হইতে পারে না। কেন না, জাতীয় ভাবস্রোতের সঙ্গে যুক্ত না থাকিলে ব্যক্তির ভাব-জীবনে রসের সঞ্চার হয় না। কোন কোন ব্রাহ্মও, সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে, ভ্রান্তিবশতঃ মনে করেন, যে সকল ধর্ম্ম হইতে তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া সার্ব্বভৌমিক তত্ত্ব নির্ম্মাণ করা যায় এবং তাহার উপর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা চলে—তাঁহারা ব্যর্থকাম হইবেন। দ্বিতীয়তঃ, এক শ্রেণীর লোক মনে করেন, যে জাতিকে জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র জীবন যাপন করিবেন, তাঁহাদের চেষ্টা আরও অদ্ভুত। ব্যক্তির পক্ষে শারীরিক বা আধ্যাত্মিক ভাবে বাহির হইতে কিছু গ্রহণ না করিবার চেষ্টাও যা, জাতির পক্ষেও তা'ই অর্থাৎ অসম্ভব; অনাহারে মৃত্যু অনিবার্য্য। ভারতে যাঁহারা এই অসঙ্গত প্রস্তাব করেন, তাঁহারা ভারতের সুদীর্ঘ ও সুমহৎ আধ্যাত্মিক ইতিহাস বিষয়ে অনভিজ্ঞ (৩৪০ পৃঃ)। তা'ই তাঁহাদের ভীরুতা। অজীর্ণ রোগগ্রস্তেরই বাহিরের সামগ্রী গ্রহণে আপত্তি! বাহিরের সংঘর্ষ হইতে ভারতকে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। এরূপ চেষ্টায় ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তি কোথায় সে সম্বন্ধে ঘোর অবজ্ঞা প্রকাশ পায়। যাঁহারা পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদকে ভারতের সম্পত্তি বলিয়া আকড়াইয়া

ধরিয়া থাকিতে চান, তাঁহাদের ভয়ের যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু রামমোহন ভারতের আধ্যাত্ম সম্পদ্ আত্মস্থ করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি পাশ্চাত্যের সম্মুখীন হইতে ভয় পান নাই!

প্রাচীনে ফিরিবার সাধ্য নাই

এমন অনেকে আছেন যাঁহারা ভাবেন, আমাদের প্রাচীনে ফিরিয়া গেলেই সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। এক দিকে তাঁহারা ভুলিয়া যান, যে আমাদের সমস্যা কেবল প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সংঘর্ষ নহে, প্রাচীন নবীনের সংঘর্ষও বটে। য়ুরোপ হইতে যাহা আমদানি হইয়াছে, তাহার মধ্যেও অনেক মেডিভ্যাল্ জিনিষ আছে। তাহা পাশ্চাত্য বলিয়া নহে, সেকেলে (medieval) বলিয়াই পরিত্যাজ্য। আমাদের সে'কেলে যাহা তাহাও পরিত্যাগ করিতে হইবে। য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যেও একাল সেকালের বিবাদ কম প্রখর নহে। প্রাচীন, মধ্যযুগ ও আধুনিক (ancient medieval and modern) লইয়া সমস্যা বেশই একটু ঘোরাল রকমের। আর প্রাচীনে ফিরিয়া যাওয়ারও কোন একটা সরল রাস্তা নাই। ভারতের প্রাচীন—কি Physical stock কি Cultural stock উভয় দিকেই বড় জটিল। পশ্চাতে ফিরিয়া যাওয়া সম্বন্ধে মহামতি রানাডে যাহা বলিয়াছেন তাহার উল্লেখেই সমস্যার গুরুত্বটা প্রমাণিত হইবে। তিনি বলিতেছেনঃ—

I have many friends in the camp of extreme orthodoxy and their watchword is that revival and not reform should be our motto. They advocate the return to the old ways, an appeal to the old authorities and the old sanctions. Here people speak without realising the full significance of their own words. When we are asked to revive our old institutions and customs, people seem to me to be very much at sea what it is they seek to revive. What particular period of our history is to be taken as the old—whether the period of the Vedas, of the Smritis, of the Puranas or of the Mahomedan or the modern Hindu times. Our usages have been changed from time to time by a slow process of growth and, in some cases, of decay and corruption, and you can not stop at a particular period without breaking the

continuity of the whole. When my revivalist friend presses his argument upon me, he has to seek recourse in some subterfuge which really furnishes no reply to his own question. What shall we revive ? Shall we revive the habits of our people when the most sacred of our castes indulged in all the abominations, as we now understand them, of animal food and drink, which exhausted every section of our country's zoology and botany ? Then men and gods of these old days ate and drank forbidden things to excess in a way no revivalist will now venture to recommend...The plan of reviving the ancient usages and customs will not work our slavation and is not practicable. If these usages were good and beneficial why were they altered by our wise ancestors ? If they were bad and injurious how can any claim be put forward for their restoration after so many ages ? Besides, it seems to be forgotten that in a living organism, as society is, no rivival is possible. The dead and the buried or burnt are dead buried or burnt once for all and the dead past can not therefore be avived except by a reformation of the old materials into new organised beings. If revival is impossible the re-formation is the only alternative open to sensible people. (Indian Social Conference, 1897)। সুতরাং প্রাচীনত্বের খাতিরে বর্ত্তমানকে নিশ্চল করা কেবল মৃত্যুর সামিল হওয়া ছাড়া আর কিছুই নহে। প্রাচীনকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াও নূতন হয় না। সেটাও একেবারে অসম্ভব। প্রাচীনে ফিরিয়া যাওয়ার ভ্রান্তি আমরা বেশ স্পষ্ট উপলব্ধি করিলাম। জাতীয় জীবন-ধারার কোন এক কোঠায় আবদ্ধ হইতে চাওয়ার অর্থ, জাতীয় বা ব্যক্তিগত বিকাশকে স্থগিত করা। এই চেষ্টার মত মূর্খতা আর কিছুই হইতে পারে না।

ভারতীয় জীবন কোন্ টা

ভারতের প্রাচীন জটিল, সেখানে ফিরিয়া যাওয়ার প্রস্তাব একটা অর্থহীন বাক্য, তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু এই প্রাচীনে

অনেক ভাল জিনিষ ছিল, আমাদের মধ্যযুগ (medieval) যাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকারকে বরণ করিয়াছিল। আমাদের জাতীয় চরিত্র বলিতে অনেকে এই অন্ধকারকে বুঝেন। তাই তো প্রাচীনে নবীনে এত বিরোধ। এই মেডিভ্যালের জায়গায় নবীনকে আনয়ন করিতেই হইবে, গত্যন্তর নাই। নতুবা মৃত্যু। এ বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের পন্থাই, একমাত্র পন্থা। কোথায়ও বা প্রাচীনের সাহায্যে কোথায়ও বা নব-ভাবের সাহায্যে তিনি ভারতের বর্ত্তমান (modern) কে উদ্বোধিত করিয়াছেন। পরিবর্ত্তন আসিবেই। না আসিলে আমাদিগকে তাহা আনিতে হইবে। এই মেডিভ্যালে আবদ্ধ থাকা আর মৃত্যু একই কথা। আমাদের শিক্ষাদীক্ষায় কি পরিবর্ত্তন আসিবেই সে সম্বন্ধে মহামতি রাণাডের আর একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—"The change which we should all seek is a change from constraint to freedom, from credulity to faith, from status to contract, from authority to reason, from unorganised to organised life, from bigotry to toleration, from blind fatalism to sense of human dignity. This is what I understand by social evolution, both for individuals and societies in this country". পরিবর্ত্তনটা যে কেবল বাহ্যিক হইলে চলিবে না, আভ্যন্তরীণ হওয়া চাই, সেই জন্য পুনরায় বলিতেছেন:—It is not the outward form but the inward form, the thought and the idea, which determine the outward form that has to be changed if real reformation is desired." আচার্য্য নগেন্দ্রনাথ রামমোহনের জীবন চরিতে বলিয়াছেন—"শাস্ত্র, জনশ্রুতি, দেশাচার ও কুসংস্কারের নিগড় হইতে মানবের মুক্তি, ইহাই বর্ত্তমান যুগের মূলমন্ত্র।"

সমন্বয় জাতীয়তার ইতিহাস

ভারতীয় আর্য্যগণ, অন্ততঃ উহার এক শাখা, বাহির হইতেই আসিয়াছিলেন। সুতরাং সাধারণ ভাবে সভ্যতার বিবর্ত্তন, বিশেষভাবে ভারতীয় সভ্যতার বিবর্ত্তনের জ্ঞান থাকিলে বিভিন্ন সভ্যতার সমন্বয়ে সন্দিগ্ধ হইবার কিছু থাকে না। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস কি? ভারতের আদি অধিবাসী Negrite অথবা pro Caucasian তারপর কোলেরিয়, দ্রাবিড় মোঙ্গলীয় ও আর্য্য—সকলের

মিশ্রণ হইয়াছে এই ভারতের মহামিলন ক্ষেত্রে। ভারতের Physical stock কি Cultural stock সকলই সমন্বয়ের ফল। ভারতীয় সভ্যতা নামে আর্য্য সভ্যতা হইলেও অন্যান্য আর্য্য সভ্যতা হইতে কেবল ভাষা ছাড়া আর সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন কেন? যে হেতু ইহা মিশ্রণ-সম্ভূত। যে সকল শিক্ষা ও সভ্যতা এখানে আসিয়াছে, অথবা যাহার পরিচয় এদেশে পাইতেছি, তাহাদের সকলেরই নিদর্শন বিষ্ণুবক্ষে ভৃগুপদ-চিহ্নের ন্যায় এখানে রহিয়াছে। পার্শীয়ান ও গ্রীক, সেমেটিক বা সিদিয়ান, তুর্কী বা খৃষ্টান এমন কি আধুনিক ইসলাম লইয়া যে মিশ্রণ তাহা আজও চলিতেছে, ছাড়াইতে চাহিলে ও ছাড়া যায় কই? ভারত কিছুই পরিত্যাগ করেন নাই, গৃহীতব্য সকলই গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতীয় সভ্যতার বিশেষ উপাদান গুলি সংগ্রহের ফল, বিভিন্ন শিক্ষা ও সভ্যতার দান। বর্ণাশ্রম, গোত্রবাদ, জাতিভেদ, পল্লীসজ্ঘ, একান্নবর্ত্তী পরিবার, শ্রমিক ও শিল্পিসংজ্ঘ, ও দাক্ষিণাত্যের নারীর বহু-বহু-বিবাহ; কর্ম্মবাদ, মুক্তি ও সাযুজ্য; মায়াবাদ, জন্মান্তর বাদ; ভক্তিবাদ ও রসতত্ত্ব; ঈশ্বরের মাতৃত্ব প্রভৃতি নানাদিক্ হইতে আসিয়াছে—যাহা এইরূপে সমন্বিত ভাবে অন্য কোন এক বিশেষ আর্য্য সভ্যতায় পাওয়া যায় না। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ যে সমন্বয়ের কথা বলিয়াছেন তার মধ্যে বিজাতীয় কিছুই নাই। বরং সে পথ পরিত্যাগ করাই জাতীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ। পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের দ্বারস্থ! ইহার মধ্যে যাহা কিছু সত্য শিব সুন্দর আছে তাহা আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতের আধ্যাত্মিক ও সার্ব্বভৌমিক (Spiritual ও Universal) ব্রহ্মজ্ঞানকে ভিত্তি করিয়াই আমরা ইহা গ্রহণ করিব। ইহাই জাতীয় জীবনের নির্দ্দিষ্ট পথ। ব্রাহ্মসমাজ যখন আহ্বান করিলেন, দেশ বলিল—সময় হয় নাই। সময় হয় না। সময়কে টানিয়া আনিতে হয়। মহাত্মা গান্ধীকে কারারুদ্ধ করিয়াছে বলিয়া কি আমরা ভাবিব যে আমাদের রাজনৈতিক অধিকারের সময় হয় নাই? যাহা সত্য, ন্যায় ও ধর্ম্ম বলে বুঝেছি তাহা সাধনে এখনই নিযুক্ত হইতে হইবে। যাহা অন্যায়, অধর্ম্ম তাহা এখনই পরিত্যাগ করিব, তাহাতে কালাকালের বিচার নাই। মহাত্মা গান্ধীকে যুগাবতার বলা হইতেছে, তিনি কর্ম্ম-যোগের মূর্ত্তি। "গান্ধী মহারাজের জয়" মুখে ঘোষণা করিলেই মুক্তি আসিবে না, গান্ধী-মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে। তাঁর জীবনের মন্ত্র কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। সে মন্ত্র

অন্যায়ের সঙ্গে অসহযোগ ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বাণী

কি? যাহা সত্য তাহার সঙ্গে সহযোগ, কে আসে কে যায় তাহা দেখিব না। আর যাহা অন্যায় অসত্য তাহার সঙ্গে অসহযোগ। 'প্রাণ থাকে থাক্ যায় যাক্' এই মন্ত্রের সাধনাতেই কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি হইয়াছিল। হাতের কাছে একখানা বাঙ্গালা দৈনিক সংবাদ পত্র রহিয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে—"আমরা অনেকেই আজকাল "জাতি গঠন" "জাতি গঠন" বলিয়া মুখে চীৎকার করি কিন্তু জাতিগঠন যে কিরূপ বিরাট কার্য্য তাহা প্রাণ দিয়া অনুভব করিতে পারি না। যে জাতি সহস্রাধিক বৎসর পরাধীনতার চাপে পিষ্ট হইয়া জীবন্মৃতবৎ রহিয়াছে তাহার মধ্যে প্রাণ কোথায়? জীবনী শক্তি কোথায়? [সমস্যা আরও কঠিন! সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে কেন স্বাধীনতা হারাইলাম তাহার নিদান কি নির্ণয় করিতে হইবে না?] তাহার সমাজ জরা-জীর্ণ, সহস্র কৃত্রিম বন্ধনের নাগপাশে আবষ্ট জীবন প্রবাহ যুগ যুগান্তরে সঞ্চিত আবর্জ্জনা স্তূপে রুদ্ধগতি। যদি জাতিকে বাঁচাইতে হয়, তবে এই সব আবর্জ্জনা সরাইয়া তাহাকে নব বলে বলীয়ান করিয়া তুলিতে হইবে"। ('আনন্দবাজার পত্রিকা' ৭ই পৌষ ১৩৩০) যদি বলা হয়, এই কথাই ত ব্রাহ্ম সমাজ শতাব্দী ধরিয়া দেশের লোকের নিকটে উপস্থিত করিয়াছেন এবং শত লাঞ্ছনার মধ্যেও কার্য্যে পরিণত করিতেছেন! তাহা হইলে লেখক নিজের কথারই একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বাহির করিবেন। কেন না, ব্রাহ্মসমাজের ক্রিড্ গ্রহণ করিলেই "কাজে করার" বালাইয়ের মধ্যে পড়িতে হয়, নতুবা খানিক্টা গলাবাজী করিয়াই নিষ্কৃতি, যেমন "গান্ধীজীকি জয়" বলিলেই একটা মহাধর্ম্ম হইয়া যায়। সমাজপতি আসিয়া লেখকের গলাটিপিয়া ধরিলেই অমনই তিনি বলিবার পথ পাইলেন না—আরে রাম! জাতনাশা হচ্ছে ব্রহ্ম-জ্ঞানীরা, আমরা কি আর জাত তুল্‌তে চাই, "জাতি থাকুক, জাতিভেদটা উঠিয়া যাক্" (ঐ, ১২ই ফাল্গুন)। জাতিভেদটা উঠিয়া গেলে জাতটা কেমন থাকে, সেজন্য লেখককে অবশ্য বৈজ্ঞানিক গবষেণায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।*

* ২৯শে পৌষ (১৩৩১), 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় আছে বাঙ্গালায় সমাজ সংস্কারের চেষ্টা একেবারে নীরব (?) নহে। সমাজের নানা জাতির মধ্যে এই চেষ্টা দেখা যাইতেছে। জাতির শাখা উপশাখার এই যে খণ্ড খণ্ড চেষ্টা এক উৎকট স্বাতন্ত্র্যাভিমান ও কৃত্রিম অভিজাত্য গৌরব লাভের ইচ্ছারূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, ইহা নিশ্চয়ই সংগঠনের পথ নহে। কিন্তু আমরা যদি এই কথাটাই বলিতাম তবে তাহার দলের লোকেরা আমাদিগকে মারিতে আসিত। অথচ আন্দোলনের আদিতেই দেশকে আমরা সতর্ক করিয়াছিলাম—"জাতিভেদের মূল প্রশ্ন পরিত্যাগ

ততদিন জাতিগঠন প্রোগ্রামের মধ্যে বসিয়া থাকিতে বাধ্য। আসল কথা, আদর্শ হাতে-কলমে কার্য্যে পরিণত করা ছাড়া মুক্তির অন্য কোন পথ নাই। জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, এই পথে আসিতেই হইবে। আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি, ব্রাহ্মসমাজই জাতীয় জীবনের সিদ্ধি নাম গ্রহণ করুন আর না করুন।

করিয়া নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নের খণ্ড প্রশ্নে আমাদের জাতীয় জীবনের কোনও প্রয়োজন সাধন হইবে না। ইহাতে দেশের শক্তি সামর্থ্য বৃথা অপব্যয় হইতে থাকিবে, দেশে সামাজিক অশান্তি বৃদ্ধি পাইবে।" [নিম্ন শ্রেণীর উন্নয়ন—সংস্কার ও সংরক্ষণ (১৯) পৃঃ ২২৯]

I regret to say that the present system of of religion adhered to by the Hindu is not well calculated to promote their political interest. The distinction of castes introducing innumerable divisions and subdivitions among them, has entirely deprived them of patriotic feeling, and the multitude of religious rites and ceremonies and the laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprises. In consideration of these evils, it is, I think, necessary that some change should take place in their religion, at least, for the sake of their political advantage and social comfort." Raja Ram Mohan Roy.

"We have been subject to a threefod tyranny—political tyranny, priestly tyranny and social tyranny or the tyranny of caste. Crushed down by this, no man has dared to stand and assert himself. At present, however, though we live under a foreign government we enjoy a freedom of thought and action—such as we never enjoyed before under our own Hindu Princes. But have we shown a capacity to shake ourselves free from priestly and social tyranny ? I am afraid not." Sir Dr. R. G. Chandavarker.

মহাত্মা গান্ধী সর্ব্বপ্রকার অন্যায় অত্যাচারের বিপক্ষেই দণ্ডায়মান হইতে বলিয়াছেন। অস্পৃশ্যতাদোষ বর্জ্জন না করিলে শত বৎসরেও স্বরাজ মিলিবে না, ইহা তাঁহারই বাণী। এই জাতীয় কুষ্ঠব্যাধির হস্ত হইতে নিস্তার না পাইলে যে জগতের সভায় আসন পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাহা দক্ষিণ আফ্রিকার Smuts আমাদের প্রতিনিধিদিগকে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিয়াছেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেন—

Untouchability is the most execrable thing upon earth and it has the curse of God upon it. It is the greatest obstacle in our nation-build-

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বম্বেতে যে ব্রহ্মবাদীদের সম্মিলন হয়, তাহাতে সভাপতিরূপে ডাক্তার নীলরতন সরকার বলিয়াছিলেন—Indian theism in the past had been pan-historic in its sources and inspairations, and will be increasingly so with our modern cultural environment. This makes India in a special sense the religious custodian

---

ing. It is the darkest blot on the present Hindu Social System. (Extracts from a speech during the Cocandada Congress, 1922, as quoted by the *Indian Messenger* of Calcutta). "মানুষ মানুষের ছোঁয়া খায় না, এর চেয়ে পাপ নীচতা জগতে আর কিছু আছে কিনা আমি জানি না" অতি দুঃখেই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কথা ক'টি বলিয়াছেন। (প্রাচী, পৌষ ১৩৩০)।

Sir Sadasiva Iyer, retired High Court Judge, Madras, who presided at the Social Conference held at Cocanada, 1923, বলেন—

The caste system as it exists now is rigid, lacking in flexibility, wooden-mechanical, antediluvian and unadequate to modern conditions of the day. The system as it exists today has to pass away. Surely when the names of leading and successful Hindu teachers of science, religion or morality in modern times have to be mentioned, the names of Keshab Chandra Sen, Vivekananda, Sir J. C. Bose, Sir P. C. Roy, Saint Gandhi, Professor Venkataratnam, Saint Ramalingaswami, Babu Bhagavan Das and others too numerous to mention, all non-Brahmins by birth, come spontaneously to our lips, and to argue that these are rare exceptions shows an utter lack of true perspective and common sense. We are in the Kali Yuga and the forms of our institutions have to be modified as directed in our Sastra themselves in the light of the plan of Iswara, and the goal of human evolution.

যখন মান্দ্রাজের মত গোড়া হিন্দুর দেশে হিন্দু সমাজের এক জন অতি প্রধান ব্যক্তি জাতিভেদ বিনাশকেই হিন্দুর জাতীয় জীবনের পরিণতি বলিয়া স্বীকার করিতেছেন এবং উহা ঐশী ব্যবস্থা বলিয়া সকলকে গ্রহণ করিতে বলিতেছেন, তখন ব্রাহ্মসমাজের আদর্শের সিদ্ধিই যে জাতীয় জীবনেরও সিদ্ধি তাহা বলিতে কোন সঙ্কোচই থাকিতেছে না। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য যে বৃথায় যায় নাই বা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য যে ফুরায় নাই, ইহা তাহারই অন্যতম প্রমাণ। ধীরে ধীরে peaceful pensitrationদ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে।

শ্রীমতী ডাঃ বেসান্তও বলিয়াছেন—"Now in 1913 (ইহার পর পৃথিবী ১৩ বৎসরেরও বেশী অগ্রসর হইয়াছে), it is time to say, that while the caste system has a glorious past, its work is over, and it must pass away. The new form of the Indian nation is ready to be born, the hour of travail is upon us. Let the old form which is dead, the corpse from which the spirit of Dharma has departed, be carried to the *ghat* and burnt." (*The Indian Review*, F.N. October, 1913).

of future humanity. For it is becoming increasingly clear to the best mind of our age that the religion of the future will have the same pan-historic character, and that Buddhism, Christianity, Hinduism, and Islam as four phases or embodiments of Religion, will each have a place in the collective Religin of the Race." জগতের ভবিষ্যৎ সভ্যতা ও ধর্ম্ম এই মহা মিশ্রণের উপর নির্ভর করিতেছে। ভারতবর্ষই সেই মিশ্রণের পীঠ-স্থান। তাই এখানে সকল সভ্যতা মিলন হইয়াছে। ভারতের ভবিষ্যৎ জাতি হইবে এই মিলন সম্ভূত। কিন্তু এ মিলন-মন্দিরের পূজারী কোথায়? যিনি একাধারে হিন্দু পণ্ডিত, জবরদস্ত মৌলবী, ক্রিশ্চিয়ান পাদ্রি—এ কাজ তাহারই। রাজর্ষি রামমোহনের পন্থা অবলম্বন ছাড়া অন্য পথে মীমাংসা নাই। ব্রাহ্মসমাজের সাধনার সিদ্ধিতে জাতীয় জীবনের সিদ্ধি। দেশে জাতিগঠনের সাড়া পড়িয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা হৈ চৈ করেন, কাজের গুরুত্বটা তাঁহারা অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এই যে তিনটি সভ্যতা এখানে মিলিত হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিয়া কেহ কি জাতিগঠন করিতে পারেন? অথচ সমন্বয় করিতে হইলে রামমোহনের পথ ছাড়া আর পথও নাই। পৃথ্বীরাজ একদিন ডাকিয়াছিলেন। সে তো হিন্দু ভারতই ছিল কিন্তু জাতিভেদ বর্ণভেদের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত—কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। আকবর এক দিন চেষ্টা করিলেন, কোন স্থায়ী হইল না। সেটা ছিল একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের উপায়মাত্র, ফল মিলিল না। আজ সমস্যাটা সভ্যতার সমন্বয়, কেবলমাত্র রাজনৈতিক মুষ্টিযোগে কি হইবে? রামমোহনের ন্যায় তিন সভ্যতার গোড়ায় যাইয়া তথ্য খুঁজিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রাহ্মসমাজ যে (fusion of cultures) ধর্ম্মসমন্বয়ের কথা বলেন, তাহা ভারতের এই মিলন-ক্ষেত্রে বৈদেশিক জিনিষ নহে। দেখাইয়াছি যে আদিকাল হইতেই মিলন চলিয়া আসিতেছে। খৃষ্টান ও মুসলমানও ভারতে আজ নূতন আসে নাই। খৃষ্টধর্ম্ম দক্ষিণ-ভারতে প্রথম শতাব্দীতেই আসিয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবেই দক্ষিণভারতের বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও মুসলমানধর্ম্মের প্রভাবে উত্তর-পশ্চিমের বৈষ্ণবধর্ম্ম বঙ্গীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম অপেক্ষা বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ভারতীয় খৃষ্টধর্ম্ম ও ইস্‌লামকে যে অন্যস্থানের তত্তৎ ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন দেখিতেছি,

ব্রাহ্মসমাজের পথ

খৃষ্টান অগ্রসর

তাহাদের উপর ভারতীয় প্রভাবই ইহার কারণ। মিশ্রণ হইবেই। ভারতীয় খৃষ্টসম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে। খৃষ্টধর্ম্ম জাতীয়তায় ভারতীয় হইতে চাহিয়া রামমোহনের স্বপ্ন সফল করিতেছে। একজন দেশীয় খৃষ্টান, তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি, বলেন—Scholastic philosophy once did splendid service for the Faith ; Vedantic thought may be able to do the same service in our own day. If Christian doctrines could be interpreted in the light of Vedantic thought, there should arise in India a type of Christianity purged of all foreign ideas and traditions paving the way for a great national Church. The dream of a united India would then become an accomplished fact. (*Statesman, 25. 9. 23.*)

মুসলমানও আসিতেছেন

মুসলমানদিগের মধ্যে আহম্মদীয় সম্প্রদায় বেদ ও গীতায় ঈশ্বরের হস্ত (revelation) এবং শ্রীকৃষ্ণকে মহাপুরুষ (prophet) স্বীকার করিতে প্রস্তুত। স্থফি, মতাজাল প্রভৃতি মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া আমাদের দেশের ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে ইসলাম ধর্ম্মের মিশ্রণ অতি সহজ। এ বিষয়ে স্বর্গীয় আচার্য্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত হইতে অনেক আলোক পাওয়া যাইতে পারে। এই মিশ্রণ (fusion of cultures) ছাড়া আর কোন টোট্‌কাতে জাতি গড়িবে না। আদান প্রদান এখনও চাই। সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টির কথা হিন্দু যেমন শিখিয়াছিল, তেমন আর কেহ পারে নাই। কার্য্যগত জীবনে হিন্দু যেমন এই সত্য পদদলিত করিয়াছে এমনও আর কেহ করে নাই। মানুষের মধ্যে ব্রহ্মদৃষ্টি তো দূরের কথা, ৮ কোটী লোকের দেবমন্দিরে যাইয়া দেবতার পূজারই অধিকার নাই। আমাদের অধঃপতনের মূল খুঁজিতে বাহিরে যাইতে হইবে না। সমাজ-ব্যবস্থার বৈষম্যই ইহার মূল। কোনও সভ্যতার উচ্চতা নির্ণয় করিতে হইলে, তত্ত্বের দিকে উহা কতদূর উঠিয়াছিল তাহার খবর লইয়াই নিরস্ত হইলে চলিবে না। জীবনে যদি সে তত্ত্ব না সফল হইয়া থাকে,তবে তর্কের খাতিরে এক জন যদি বলিয়া দেয়, যে তোমার গীতা-উপনিষদ্ আর কিছু নহে, অধুনা ভূপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত কোন প্রাচীন জাতির জ্ঞানের গরিমা তুমি সংস্কৃতে নকল করিয়া রাখিয়াছ, তবে বলিবার কি থাকে? যে সত্যজীবনে পরীক্ষিত নয় তাহা সত্য নহে, তাহার উপরে দাবী নাই। 'সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম'—

এই তত্ত্বকে জীবনে লাগাইতে হইলে যে নীতির উপর সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইবে সাম্য ইশ্বর মৈত্রী ও স্বাধীনতা। এ ফলভোগের অধিকার নরনারী-নির্ব্বিশেষে সকলকেই দিতে হইবে! মনুষ্যত্বে বিকশিত হইয়া উঠিবার দাবী যদি সমাজে প্রত্যেক মানুষের না থাকে, তবে সে সমাজ উন্নতির দিকে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে না। মানুষের ভিতরের ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যান। পদ হইলেও শূদ্র সমাজশরীরের অঙ্গ। "ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ" বলিয়া তাহার হৃদয়স্থ ব্রহ্মকে ক্ষুদ্র করিয়া দেওয়ায়, পায়ের সঙ্গে মস্তকের স্বাভাবিক যোগ আছে বলিয়া 'মূর্দ্ধিস্থিত' ব্রাহ্মণের ব্রহ্মও আজ পতিত। প্রকৃতির প্রতিশোধ অনিবার্য্য। সমাজের সকলকে মানুষ হইবার সমান অধিকার দিতে হইবে। তাহা না দিয়া বৈষম্য-দোষ-দুষ্ট হিন্দু সভ্যতা আজ মুমূর্ষ। * ইহার কথঞ্চিৎ প্রতিষেধরূপে সাম্যের দৃষ্টান্ত ইস্‌লাম আনিয়াছেন। মুসলমানের দৃষ্টান্তটা কি? আফগানিস্থানের আমীর সে বার কলিকাতায় যে দৃশ্য দেখাইলেন, তাহা হিন্দু ভুলিতে পারেন না। নমাজের জন্য আসনপাতা হইলে আমীর বলিলেন—যে মুসলমান আছ আমার সঙ্গে নমাজে ব'স। আল্লার দরবারে যে আমীর ফকির সমান। এখানে ইস্‌লামের পদতলে বসিয়া হিন্দুর কি শিখিবার নাই? হিন্দু কি বলিতে পারেন, এস ভাই হিন্দু, তোমাকে হিন্দু বলিয়াই আমি আলিঙ্গন করিতেছি। ডিমক্রোটিক মুসলমানের ন্যায় মানুষকে মানুষ বলিয়া আলিঙ্গন করিবার শক্তি অর্জ্জন না করিতে পারায় হিন্দুর জাতীয় জীবনের শেষ দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। * এ যুগ ডিমক্র্যাসির যুগ। মুসলমানের এই মহাশক্তি যদি হিন্দু আয়ত্ত করিতে না পারেন, হিন্দু জগতে টিকিয়া থাকিতে পারিবেন না। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশে হিন্দু ছিল ৫০ লক্ষ বেশী, আজ মুসলমান ৫০ লক্ষ বেশী হইয়াছে। যে রীতিনীতি বিধিব্যবস্থায় মুসলমানের তুলনায় হিন্দুর এক কোটী লোক লোকসান হইয়া গিয়াছে, তাহাকে "Sanatic" বলিয়া আক্রমণ করিবার কি কেহ নাই? ব্রাহ্মসমাজ প্রথমেই ঘোষণা করিয়াছিলেন "নরনারী সাধারণের সমান অধিকার।" ডিমোক্র্যাসীই যুগবাণী, যুগতত্ত্ব। এই বর্ম্মে মুসলমান আচ্ছাদিত। মুসলমানের কাছে হিন্দুকে ইহা শিখিতে হইবে, বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই শিখিতে হইবে। আজ কাল খুবই 'Slave mentality'র

ছুঁৎমার্গ অবশ্য পরিহার্য্য

ব্রাহ্মসমাজের মূল মন্ত্রই যুগ মন্ত্র

কথা শুনি। অর্থাৎ তুমি যদি আমার শত্রুর গুণের কথা বল, তা হইলেই তুমি ঐ দোষে দোষী। কিন্তু যদি আমার গুরুর আদেশে দেশশুদ্ধ লোকচিন্তাশক্তিকে বিসর্জ্জন দিয়া গড্ডলিকা প্রবাহের মত ছুটিয়া যাও, তবে তা' Slave mentality নহে। চিন্তা-শক্তি কতটা জড়তা প্রাপ্ত হইলে মানুষ এই স্থানে আসিয়া পৌছায় তাহা যখন ভাবি তখন দেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অবসন্ন হইতে হয়। মানুষ যতক্ষণ বাহিরের শক্তি-দ্বারা পরিচালিত হয়, তা, ধর্ম্মমতই হউক আর সামাজিক রীতিনীতিতেই হউক, সে দাস বুদ্ধির হস্ত হইতে মুক্ত নয়। ইংরাজের চাকুরীতেই কি কেবল দাসবুদ্ধি আছে ব্রাহ্মণের গোলামীতে নয় কেন? Democratic Spirit না থাকিলে Slave mentality আসেই। শক্তিমানের আশ্রয় নিয়ে মানুষ নিজেকে বড় করতে যায় ই। বঙ্গদেশের একটা আর্য্যপূর্ব্ব নিজস্ব সভ্যতা ছিল। সে আর্য্যদের গো-সেবী মদ্য-পায়ী সভ্যতাকে প্রতিরোধ করে। ইংলণ্ড যেমন Ulster প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণপ্রাধান্য Slave mentality প্রসূত বাধ্য করিয়াছেন, আর্য্য আয়ার্লণ্ডকে সভ্যতাও ব্রাহ্মণ্যের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া বঙ্গদেশকে জব্দ করিয়াছে, এবং আগন্তুকের পদতলে ফেলিয়া বাংলার আসল অধিবাসীদিগকে নিষ্পেষিত করিয়া রাখিয়াছে। যখন নূতন করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অভ্যুদয় হইল, তখন সমাজ হইল ব্রাহ্মণের একাধিপত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণের দাস অর্থাৎ শূদ্র, মধ্যে কিছুই রইল না। যারা বড় হতে চাইলেন, Slave mentalityর জোরেই বড় হলেন- 'ঘোষ বসু মিত্র কুলের অধিকারী' হ'লেন। যিনি একটু স্বাধীনতা দেখালেন—'দত্ত কারো ভৃত্য নয়' তাকে নীচু করে দেওয়া হইল। আর যাঁরা একেবারে non-co-operation করলেন, যাঁরা স্বাধীনতার বিনিময়ে সুখ চান নাই, দেশের সেই প্রকৃত অধিবাসীদিগকে একেবারে 'depressed' করে দেওয়া হল। এই বঙ্গদেশে কত জাতি আছে, যারা আচার ব্যবহার রীতিনীতিতে কোন অংশেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে—যতটুকু নিকৃষ্ট মনে হয় সে কেবল চেপে রাখার ফল—তাঁহারা নীচ হয়ে রয়েছেন কেবল উচ্চশ্রেণীর অত্যাচারে। তাঁরা ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই, এই তাদের অপরাধ—নূতন ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থা তাঁরা মানেন নাই। তাঁদের উপর যে নিষ্ঠুর অত্যাচার হ'য়েছিল তার ফলে তাঁরা মুসলমান-দিগকে উদ্ধারকর্ত্তা দেবতা রূপে বরণ করে নিয়েছিলেন। শূন্য-পুরাণ (১৪১) (সাহিত পরিষদ্) বলেন, "ধর্ম্ম হৈল্যা জবনরূপি, মাথায়েতে কালটুপি

হাতে শোভে ত্রিরুচ কামান” “যতেক দেবতাগণ সবে হয়্যা এক মন আনন্দেতে পরিলা ইজার।” উচ্চনীচের এইরূপ অস্বাভাবিক ভেদ দূরীভূত না হইলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা হয় না। হ’তে পারে না। অধীন জাতির পক্ষে স্বাধীনতা লাভ এ অবস্থায় অসম্ভব। আমি নিজে যে অধিকার চাই অন্যকে তা’ দিব না—ইহা দৈহিক বল লাভেরও অন্তরায়, নৈতিক বল লাভেরও অন্তরায়। বিধাতা ইহা অনুমোদন করিবেন না। আজ যে স্বাধীনতার সংগ্রামে আমরা হেরে যাচ্ছি, Democratic spiritএর অভাবই তাহার প্রধান কারণ। তথা-কথিত নিম্ন-শ্রেণী ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য আজ স্বীকার করিতেছে না। তারা উচ্চ শ্রেণীর Democratic spiritএ বিশ্বাসবান্ নয়। বিশ্বাস-উৎপাদনের কোন আয়োজনও দেখি না। এখনও যখন ব্রাহ্মণ সভা বলেন, যে নিম্নশ্রেণীকে সমান অধিকার পেতে হ’লে এ জন্মের সুকৃতির ফলে পরজন্মে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মাতে হবে, তখন দেশের রাজনৈতিক আশা সুদূর-পরাহত। আসল কথা ব্রাহ্মসমাজ যে বাণী শুনাইয়াছেন—নরনারী সাধারণের সমান অধিকার—ইহা হাতে কলমে কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলে জাতীয় সমস্যার মীমাংসা নাই। আর ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড়ের সময়ও নাই। মহাত্মা গান্ধীও আর ছাপিয়া রাখিয়া বলেন নাই। পাবনার লোকদিগকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিয়াছেন, যাহা অসত্য তাহা বর্জ্জন করিতেই হইবে। শঙ্করাচার্য্য আসিয়া যদি আজ এই দূষিত মত সমর্থন করেন তবে আমি তাঁহার শিষ্যত্ব পরিত্যাগ করিব এবং আমি আর সনাতনী হিন্দু থাকিব না—“if S'ankara'cha'rya now makes his appearance and lends support to this unwholesome dogma I will not follow him as I do now, and will cease to be a Sanatani Hindu” *Bengalee* 27-52-5. একজন ব্রাহ্মের মনের ভাব ইহা অপেক্ষা স্ফুটতর ভাবে বলা যায় না। রামমোহনের সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজ এই কথাই প্রচার করিয়া আসিতেছেন। ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে চাপিয়া রাখিয়া জাতি বড় হইতে পারে না। শঙ্করাচার্য্যের চাপও ঠেলিয়া ফেলিতে হইবে। ব্যক্তি বড় হইতে পারে না তা’কে সম্পূর্ণ স্বাধীন করিয়া না দিলে। ব্যক্তিগত জীবনে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হইলে জাতীয়জীবনে স্বরাজ কোথা হইতে আসিবে? ব্রাহ্মসমাজের বার্ত্তা পূর্ণরূপে গ্রহণ না করাতে আমাদের স্বরাজের চেষ্টা যে ক্ষণে ক্ষণেই কুপথে পরিচালিত হইয়া জাতীয় জীবনের গতিকে প্রতিপদে প্রতিহত করিতেছে, তাহা দেখিয়াও

কি আমাদের চৈতন্য হইবে না? ব্রাহ্মসমাজের খাতায় নাম লিখিতেই হইবে তাহা বলিতেছি না; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের বাণী গ্রহণ করিতেই হইবে। মহাত্মা গান্ধীর এই উক্তি তাহার পরিচয়।

এখন হয়তো কেহ বলিবেন, আমাদের মত বা আমাদের অপেক্ষাও সামাজিক হীনাবস্থার জাতি কি স্বাধীন নাই? আছে; তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করা ও স্বাধীনতা অর্জ্জন করা এক কথা নহে। ধনীর সন্তান অকর্ম্মণ্য হইতে পারে, কিন্তু যাহাকে নিজে ধন উপার্জ্জন করিতে হইবে তাহাকে অকর্ম্মণ্য হইলে চলিবে না। ইহা অগ্রাহ্য করিয়া কেহ বাঁচিতে পারে না। পাশ্চাত্য জগতে সমসাময়িক ইতিহাস ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। এ তত্ত্ব যাঁহারা কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইংরাজ, ফরাসী ও মার্কিন, তাঁহারা বাঁচিয়া গেলন। যাঁহারা ইহাকে পদতলে চাপিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন, রুশিয়ার জার, জার্ম্মানির কৈজার, অষ্ট্রীয়ার এম্পারার, বা তুর্কীর সুলতান—আজ তাঁহারা ফুৎকারে উড়িয়া গিয়াছেন। এই ডিমক্র্যাসির নামে যে তিন 'স্কুল মাষ্টার' যুদ্ধে বিশাল সাম্রাজ্য সকল ধ্বংস করিলেন, সন্ধির সময়ে সে তত্ত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন না। লাভ হ'ল 'বিনিপাতঃ'। ফরাসী ব্যাঘ্র ক্লেমেন্‌সো the Victor" আজ কোথায়? সভাপতি উইলসন্ তাঁহার চতুর্দ্দশ সর্ত্ত লইয়া যখন বাহির হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে 'খোদা চাইতে উনিশ আর বিশ' বলিয়া য়ুরোপ মানিয়া লইয়াছিল। আজ কি অবস্থায় তার মৃত্যু হইল? প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ "who won the war", তিন দিনের জন্য য়ুরোপের কর্ত্তা হইয়াছিলেন। কিন্তু যেই ডিমোক্র্যাসির পতাকা ছাড়িলেন অমনি "hounded out of his office." হিন্দুকেও এই মূলমন্ত্রে দীক্ষা লইতে হইবে, এই মন্ত্রের আদর্শে তার ধর্ম্ম, সমাজ, পরিবার পুনর্গঠন করিতে হইবে। ধর্ম্মবুদ্ধিতে করিতে হইবে, রাজনৈতিক চাল্‌বাজীর জন্য নহে। আবার মুসলমানকে হিন্দুর কাছে সমন্বয়-তত্ত্বের গ্রহণ করিতে হইবে। কোরানে নাই বলিয়া লাইব্রেরীকে লাইব্রেরী পুড়াইয়া দিবার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে। হিন্দুর ন্যায় যেখানে সত্য, সেখানে শিব, যেখানে সুন্দর পাইবে তাহাই গ্রহণ করিয়া নিজেকে পুষ্ট করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মুসলমানও এ বিষয়ে জাগিতেছেন। অদূর ভবিষ্যতে আরও জাগিবেন। দুই জন একত্র বাস করিলে একজনের প্রভাব অন্যের উপরে হয়ই। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের প্রভাবেই ভারতীয়

মুসলমানগণের তীর্থস্থান (Shrines of Saints) সম্বন্ধে মনের ভাব অন্য দেশবাসী সমবিশ্বাসী মণ্ডলী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। যদিও উচ্চতর হিন্দুধর্ম্মের এতৎ বিষয়ক আদর্শ অন্য প্রকার—যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গো-খরঃ—ভাগবত। তাই উচ্চ ভূমিতে, আধ্যাত্মিক ভূমিতে না উঠিলে ফল ফলিবে না। এরূপ শুনিয়াছি, এক বার পাটনাতে ব্রাহ্ম আচার্য্যের সঙ্গে মৌলবীদিগের বিচারের আয়োজন হইয়াছিল। মৌলবীগণ আসিয়া বলিলেন, যে তাঁহাদের নিয়ম আছে—মুসলমানে মুসলমানে বিবাদ করিতে নাই। তাই, ব্রাহ্মগণ মুসলমান কিনা তাহা পরখ্ করিয়া লইতে হইবে। ইহা তাঁহাদের একটা মামুলী নিয়ম (formal business)। কিন্তু যখন শুনিলেন, প্রতিপক্ষ আপৌত্তলিক, একেশ্বরবাদী এবং মহম্মদকে Prophet বলিয়া মানেন, তখন তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, আপনারা তো মুসলমান—অবান্তর বিষয়ের ভেদে কিছু আসে যায় না। উচ্চস্থানে উদারতা রহিয়াছে, বিবাদ নিম্নভূমিতে। সুতরাং নিম্নভূমিতে মিলনের আকাঙ্ক্ষা বৃথা।

সিদ্ধির আধ্যাত্মিক ভিত্তি

তাহাতে ফল ফলিতেছে না, বরং অনিষ্টই হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ যে পথ ধরাইয়া দিয়াছেন সেই পথ। শ্রদ্ধেয় বাবু বিপিনচন্দ্র পালের কথা অনেকবার বলিয়াছি। তিনি অনেক ঘুরাফিরা করিয়াছেন, অনেক দেখিয়াছেন শুনিয়াছেন, অনেক স্রোতে ভাসিয়াছেন। এমন অনেক কথা বলিয়াছেন যাহার একটা অন্যটাকে সম্পূর্ণ কাটিয়া দেয়। কিন্তু এই পরিণত বয়সে চিন্তারতচিত্তে পুরাতন স্মৃতি জাগাইতে যাইয়া তিনি কতকগুলি সত্যের সম্মুখীন হইয়াছেন যাহা অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। তিনিও আর সেগুলিকে কাটিয়া দিবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই। তাই সেগুলির উপরে আমরাও আস্থা স্থাপন করিতে পারি। সেই সকল সত্যের একটী এই :—"Fifty years ago our love of our country was not inspired by any active hatred of the British rulers, much less of the British people. It was not a negative, but a positive sentiment. It was really part of our religion. Freedom was the soul of that religion.......Both personal freedom and national freedom became parts of the same religion with us. In the liturgy of the Brahma Samaj introduced by Keshubchandra Sen

এবং oligarchyর মধ্য দিয়াই offered to the Throne of the Most পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। ...ation of all mankind,......but Pandit বৎসরের বি...tri was really the first Brahma Minister to ...pose a regular prayer (hymn ?) for the emancipation of his country and people and use it in the public worship of the Brahma Samaj. This was really the first time when patriotism was made an organic element of our new religion......Freedom with us was one whether it sought realisation in personal or domestic or communal or national life, and it was the soul and essence of what we understood as religion. The Political Freedom Movement fifty years ago of which Surendranath was the universally accepted high priest, was, therefore, part of a larger Freedom Movement which was initiated and developed by the three successive states of the evolution of this new Indian Renaissance, represented by the Adi Brahma Samaj, of Maharshi Debendranath, the Bharatbarshya Brahma Samaj of Keshabchandra Sen and the Sadharan Brahma Samaj. This is how patriotism came to be an essential element of our personal religion. This organic connection between our religion and political evolution continued in Bengal up to the Swadeshi and Boycott agitation of the first decade of the present century." (Culled from the *Bengalee*, 19.8.24) সুতরাং আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, যে এই স্বদেশী আন্দোলনের Poet, Prophet এবং Philosopher সকলই ব্রাহ্মসমাজের দান।

যাহা হউক, **ব্রাহ্মসমাজের সাধনায় সিদ্ধিতেই জাতীয় জীবনের সিদ্ধি।** এ সিদ্ধি আধ্যাত্মিক জমির উপরেই স্থাপন করিতে হইবে। ইহাই ভারতের নিয়তি। এ বিষয়ে সুধী শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ বলিয়াছেন—The instinct of Indian mind was that if a reconstruction of ideas and society was to be attempted, it must

start from a spiritual basis and tak[illegible] were more motive and form. The Brahmo Samaj [illegible]ad self-governing large cosmopolitan idea[illegible] constitution choice of the materials for the synthesis it attempted. [illegible]ht combined Vedantic first inspiration, outward forms akin to those of English Unitarianism and something of its temper, a modicum of Christian influence, a strong dose of religious rationalism and intellectualism. It is noteworthy, however, that it did start from an endeavour to restate the Vedanta and it is curiously significant of the way in which even what might be well called a protestant movement follows the course of the national tradition and temper that the three stages of its growth, marked by the three churches or congregations into which it split, correspond to the three eternal motives of the Indian religious mind—Jnan, Bhakti and Karma—the contemplative and philosophical, the emotional and fervently devotional, and the actively and practically dynamic spiritul mentality. (The Renaissance in India, *Arya*).

ব্রহ্মসমাজের অভিব্যক্তিতে জাতীয়তার ছাপ

আইওনিয়াতে গ্রীক্ সভ্যতা গিয়াছিল। গ্রীক্ সভ্যতার পূর্ণ আকারটাই সেখানে গিয়াছিল। Thales হইতে আরম্ভ করিতে নাই। আমেরিকায় য়ুরোপীয় সভ্যতা গিয়াছে য়ুরোপীয় সভ্যতার আদি অন্ত মধ্য যেখানে অভিনীত হয় নাই। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে ভারতীয় জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মের অভিব্যক্তির সামঞ্জস্যের কথা এইমাত্র উল্লিখিত হইল। জাতীয় জীবনের আর এক বিশাল দিকেও—বৈদিক, বৈদান্তিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মভাবও এই কয়বৎসরের মধ্যেই ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়া সুস্পষ্টভাবে বিকশিত ও সমঞ্জসীভূত হইয়াছে। এমন সময় আসে, যখন "The world moves in the track of centuries." ব্রাহ্মসমাজের Constitutionএ দেখিয়া মৃত্তিকায় প্রো[illegible]ত বীজ হইতে উহার বিবর্ত্তন, পর্‌গাছা আনিয়া লাগান নহে। ধার করিয়া আনিলে আগে হইতেই পূর্ণাঙ্গ হইত। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ যে democracy দিয়াছেন তাহা avtocracy

[illegible] হইয়াছে। মানবজাতিব ইতিহাসের [illegible] ছ'মাসে ছ'কোটি [illegible] অতিক্রম করিয়া সুগঠিত নবদেহে পবিণত হয়। কিন্তু [illegible] পূর্ব্ববর্তী সব জীবের মধ্য দিয়াই অ[illegible]তে হয়। জীবন্ত দেহেব ইহাই নযম। ব্রাহ্মসমাজ আপনার বিবর্দ্ধনে এই জীবনেব সাক্ষ্যই দিতেছেন, হাতেই ধাব বা অনুকবণেব কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছে না—জাতীয় বৃক্ষেব স্বাভাবিক পবিণতি চক্ষুষ্মানেব চক্ষে পডিতেছে। মনস্বিনী ভগিনী নিবেদিতা সকল বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজেব সঙ্গে এক মত ছিলেন না। কিন্তু তিনিও ব্রাহ্মসমাজের Constitution সম্বন্ধে বলিয়াছেন—এই যে কযেকটি লোক,একটী জিনিষ লইয়া এক কোণে সাধনায নিযুক্ত, ইহাবই উপব ভাবতেব ভবিষ্যৎ নির্ভব কবিতেছে। যাঁহাবা চিন্তাশীল, দেশেব কল্যাণ চিন্তা কবেন, কেবল হৈ-চৈ-সর্ব্বস্ব নহেন, তাহাবা ব্রাহ্মসমাজেব সিদ্ধিতে জাতীয জীবনেব সিদ্ধি দেখিতেছেন:—"It is this strong perception of law and equity that to this day makes the Sadharan Brahmo Samaj, so valuable to India, as a training school for the civic life and ideals A few honourable men tight-knit amongst themselves in united conceptions of the national need highly educated and acknowledging common standards of work and integrity make a nucleus whose worth is admitted gladly even by those who differ from them (Sister Nivedita in the Preface of the *Life of Ananda Mohan Bose* by Mr Hemchandra Sirkar M. A.)

ভগিনী নিবেদিতাব সূক্ষ্ম অপক্ষপাত ন্যায দৃষ্টি যাহা পবে ধবিতে সমর্থ হইযাছে, আদি হইতেহ ব্রাহ্মসমাজ জাতীয জীবনেব কল্যাণার্থ জ্ঞাতসাবেই সেই ভাব দ্বাবা পবিচালিত হইয়া কাজ কবিয়া আসিতেছেন। ইহা ব্রাহ্মসমাজেব জীবনে একটা আকস্মিক ঘটনা নহে। বিপিনবাবু পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রবন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছেন:—"We all felt this inspiration more or less. We all dreamt this dream with Anandamohan and Sivanath. When the Constitution of the Sadharan Brahma Samaj

ব্রাহ্মসমাজই জাতীয স্বাধীনতার পত্তন

was being drafted all of us, you[illegible] or less moved by this dream of a free a[illegible] India, and we wanted to set up such a [illegible] in our new religious organisation or Church as m[illegible] in course of time present a practical model for those who would be invited to draw up our National Constitution."

ব্রাহ্মসমাজই যে জাতীয় জীবনের সিদ্ধি তাহা আর এখন চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে না।

চতুর্থ স্কন্ধ

(পরিশিষ্ট)

বিবাদ-ভঞ্জন

রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ ঋজুকুটিলপথযুষাং নৃণাং গম্যো একস্ত্বমেব পয়সামর্ণব ইব। মহিম্নস্তোত্র।

ঊনবিংশ অধ্যায়

বিবেকানন্দ ও ব্রাহ্মসমাজ

যখন কোনও নূতন তত্ত্ব প্রাচীনের সংঘর্ষে আসে, কিছুদিন পরে প্রাচীনের স্বপক্ষে একটা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু সাধারণতঃ প্রতিক্রিয়া সমূহের মধ্যে বিশেষ চিন্তাশীলতা দেখিতে পাওয়া যায় না! উহা কদাচিৎ কোন নূতন ভাব প্রসব করে। যাহা ইতিপূর্ব্বে ছিল তাহারই সঙ্গে উহার মিত্রতা—যে ভাবটা পূর্ব্বে রাজত্ব করিতেছিল তাহারই সঙ্গে ইহার বাধ্যবাধকতা। এই জন্যই রক্ষণশীলগণ দেশের তৎকালীন চিন্তা-প্রবাহের মধ্যে বিশেষ কিছু যোগ করিতে পারেন না। অবশ্য এ কথা বলা যাইতেছে না, যে তাদের কথার মধ্যে কোন যুক্তি বা গভীরতা নাই। তাহাদের চিন্তা প্রবাহ পশ্চাৎগামী হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সঙ্গে একীভূত হয়। তথাপিও যখন স্বামী বিবেকানন্দের মত মনস্বী দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া নিজের মনের মত করিয়া সমস্যাটীকে ধরেন, আপাতঃ দৃষ্টিতে তিনি প্রতিক্রিয়াবাদী বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, সমসাময়িক চিন্তাজগতের উপর আপনার ছাপ দিতে সমর্থ হন। এরূপ মানুষ যখন দুই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নিজের কাছে এবং

প্রতিক্রিয়া ও পুনরুত্থান (৩৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

সমসাময়িকগণের নিকটে কৈফিয়ৎ লইয়া উপস্থিত হন,
হইলেও তাহার যুক্তিতর্ক অগ্রাহ্য করা চলে না। তিনি যাহা বলেন তাহা অনুবর্ত্তিগণ অপেক্ষা বিরুদ্ধবাদীদিগকেই বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিতে হয়। প্রতিক্রিয়ার অন্তর্নিহিত যুক্তিটী টানিয়া বাহির করিয়া বিবেকানন্দ সমসাময়িকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি পুনরুত্থানকে চিন্তা-জগতে যে একটা স্থান দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে বিশেষ কোনও স্থায়ী যুক্তি আছে কিনা সে বিষয়ে মতভেদ হওয়া স্বাভাবিক। তথাপি, একদিকে তিনি তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের আকর্ষণীশক্তিপ্রভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের বিশিষ্ট প্রণালীতে ও নূতন মতকে প্রাচীনের ছাপ দিয়া সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করিবার শক্তিতে লোকমণ্ডলীকে এমন অভিভূত করিতে পারিয়াছিলেন, যে তাহারা নূতনের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহার পতাকাতলে দণ্ডায়মান হওয়াটা একান্ত নিরাপদ বলিয়া মনে করিয়াছিল। তাঁহার প্রকাশ্য ব্রাহ্মসমাজ-পরিত্যাগ তথা-কথিত হিন্দু পুনরুত্থানকে যে শক্তিসম্পন্ন করিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ বলা যায় না যে তিনি প্রাচীনতার পক্ষপাতিগণের নিতান্ত সমাদরের পাত্র, অথবা তাঁহারা তাঁহাকে প্রাচীন হিন্দুত্বের পাণ্ডা বলিয়া স্বীকার করেন। কেন না, আচার ব্যবহারে তিনি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বেশী দূরে সরিয়া যান নাই। এরূপ শুনিয়াছি, স্বামীজি আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিলে একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রকে বলিয়াছিলেন, যে বিবেকানন্দ ব্রাহ্মসমাজের মতগুলি যে আর এক আকারে চালাইতে চাহিতেছেন—এখন কি করিবেন? তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—বিবেকানন্দ তো সন্ন্যাসী, তাঁহাকে তো এক তুড়িতে উড়াইয়া দিব। ভয় তো আপনাদিগকে, আপনারা যে ঐ অনাচার গুলির উপরেই সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ব্রাহ্মসমাজে আরম্ভ।

স্বামী বিবেকানন্দ জীবনের প্রারম্ভে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন। পরে ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া দেন। ইহার মধ্যে কর্ম্মক্ষেত্রের কার্য্যপ্রণালীর ও আবেষ্টনের পরিবর্ত্তন যতটা সূচিত হইয়াছে, গুরু মতের পরিবর্ত্তন ততটা সূচিত হয় নাই। তাঁহার গ্রন্থাবলী অপক্ষপাতে অভিনিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিলেই ইহা প্রমাণিত হইবে। স্বামীজির এক দল শিষ্য আছেন, তাঁহারা যে পরিমাণে বাক্যবাগীশ, সেই পরিমাণেই স্বামীজির নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্য

[illegible] তাহাকে ব্রাহ্মবিরোধী বলিয়া চিত্রিত করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত। প্রয়োজন এই, যে, তাহা হইলে লোকমত-বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সাধারণের অপ্রিয় হইবার ঝঞ্ঝাট্ বহন কবিতে হইবে না। লোকপ্রিয় হইবার বাসনায় তাঁহারা ভুলিয়া যান, যে বিবেকানন্দ নিজে লোকমত থোরাই গ্রাহ্য করিতেন। বিবেকানন্দের মতের কোনও পরিবর্ত্তন হইয়াছিল কি না, কোন কোন বিষয়ে তিনি নিতান্তই Reactionary ছিলেন কি না, আমরা এখন সে প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি না। কিন্তু যে সব বিষয়ে তাঁহাকে পুরাপুরি পুনরুত্থানবাদী (Reactionary) সাজান হয়, সেই সব কয়েকটী অতি গুরুতর বিষয়ে যে ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিলেও তিনি ব্রাহ্মসমাজের কথা শেষ পর্য্যন্ত ভুলেন নাই, আমরা তাঁহার উক্তি হইতে তাহাই প্রমাণ করিব। কোন কোন বিষয়ে Emphasisএ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহার যতটা বিভিন্নতা দেখা যায়, মুল মতে ততটা নয়। একটা ভাব প্রকাশ করিবার প্রণালীটা ভিন্ন হইলেই যে বস্তুটাও ভিন্ন হইল, তাহা নহে। কাহারও মত আলোচনার সময়ে ইহা মনে না রাখিলে ভ্রান্ত না হইয়া যায় না।

সমন্বয় ব্রাহ্মসমাজের ভাব

কেহ কেহ দাবী করেন, যে বিবেকানন্দ পূর্ব্ব-পশ্চিমের নিখিল ধর্ম্মসমন্বয়ের ভিত্তি স্থাপনের জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। এই দাবীর মধ্যে তীব্র ব্রাহ্ম ব্রাহ্ম গন্ধ রহিয়াছে, তাঁহারা ইহা জানেন। তাই এই গন্ধ চাপা দিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজকে একচোট গালাগালি দিতে হয়। তাহাতে অসতর্ক পাঠক এই বুঝিবেন, যে ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে বিবেকান্দের কোন সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু দু'চার জন অজ্ঞ লোককে ভ্রান্তিতে ফেলিলেই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রামমোহনের পরে ঐ দাবীর মৌলিকতা সম্বন্ধে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই ভ্রমে পতিত হইবেন না। পূর্ব্ব পশ্চিমের সমন্বয় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যতালিকা ছাড়া আর কোথায়ও নাই। বিশেষতঃ নিছক্-হিন্দুত্বের ভূমি পরিত্যাগ করিয়া, মেডিভ্যাল যেখানে পৌণে ষোল আনা লোক এখনও পড়িয়া আছে, আদর্শেই হউক বা কার্য্যেই হউক, উচ্চতর ও ব্যাপকতর কোন সার্ব্বভৌমিকতার উপর না দাঁড়াইলে যে পূর্ব্ব-পশ্চিমের সমন্বয় হইতে পারে না, তাহা জানিবামাত্র ঐ দাবীর আদিম গন্ধ অতি অজ্ঞের নিকটও আর ঢাকা মানিবে না।

সংস্কার ও নিন্দা

স্বদেশের দোষ দেখিয়া তাহার উল্লেখ ও সংশোধন চেষ্টা দেশের নিন্দা নহে বা তাহা স্বদেশপ্রীতির বিরোধীও নহে। এই

তুচ্ছ কথার আলোচনা করিয়া আর কথা বৃদ্ধি করিতে চাই না। কথাটা একবার উল্লেখ করিয়াছি (পৃঃ ৩৫৩)। জগতে যাঁহারা প্রাতঃস্মরণীয় বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহারাই ইহা অধিক পরিমাণে করিয়াছেন বলিয়াই প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন। ব্রহ্মবাদী উপনিষদের ঋষিগণ যেরূপ কঠোর ভাষায় স্বজাতিকে দোষ ত্রুটি দেখিয়া গালি দিয়াছেন, আর কেহ তেমন করিয়া দিতে সাহস পায় নাই। যাহার হৃদয়ে ব্যথা লাগে, তাহারই মুখ ফুটে। কথিত আছে, রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মোপাসনার মধুরতা উপভোগ করিয়া ইহা ভাবিয়া ক্রন্দন করিতেন—হায়! দেশের কোটী কোটী নরনারী এই মধুর আস্বাদ হইতে বঞ্চিত। তাঁহার মুখ হইতে যদি তীব্র প্রতিবাদ বাহির হয়, তবে তাহা প্রেমপ্রসূত। স্বামী বিবেকানন্দেরই একজন অনুগত শিষ্য যিনি ইহার শতাংশের জন্য হয়তো ব্রাহ্মদিগকে গালি দিতে বসিবেন, হোসেঙ্গাবাদে ঝাড়ুদারদের কূপ হইতে জল তুলিতে না দেওয়ায় 'আনন্দবাজারে'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে (২২শে চৈত্র, ১৩৩১) বলিতেছেনঃ—"এমন পঙ্গু জড়ভরত সমাজের লোকেরা আবার স্বরাজ চায়" ইত্যাদি। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। সম্পাদক, গোঁড়া হিন্দু বলিয়াই নিজেকে পরিচয় দেন, ভীষণ ব্রাহ্ম-বিরোধী, শেষ করিতেছেন—"যতদিন হিন্দুসমাজ এই কলঙ্কের রেখা তাহার দেহ হইতে দূর করিতে না পারিবে ততদিন তাহারা সভ্য মানবের চোখে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নরপশু বলিয়াই গণ্য হইবে।" ভাষা ইহা অপেক্ষা কঠোর হইতে পারে কি? কিন্তু লেখককে দোষ দিব না। তাঁহার প্রাণ আছে, অনুভূতি আছে, তাই মুখ ফুটিয়াছে। কিন্তু বিবেকানন্দের উল্লিখিত শিষ্যগণ—কাজের নয়, মুখের—বুঝাইতে চান যে, স্বামীজি এই প্রকৃতির ছিলেন না। সুতরাং ব্রাহ্মদের সঙ্গে তাঁর কত পার্থক্য! স্বামীজি একস্থানে বলিয়াছেন, "এই সমাজের বিরুদ্ধে একটা কর্কশ কথা বলিও না, আমি ইহার অতীত মহত্ত্বের জন্য ইহাকে ভালবাসি।" ভারতের অতীত মহত্ত্বের জন্য ইহাকে ভালবাসার মধ্যে নূতনত্ব তো নাই-ই, বিশেষত্বও কিছু নাই। কেন না, প্রাচীনকে সকলেই ভালবাসে। কিন্তু এই উক্তিটীর অন্তর্নিহিত ভাব কি এই নয়, যে, বর্ত্তমান ভারতে ভালবাসিবার বড় কিছু নাই। কেন না, 'তার প্রতি কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিও না তার অতীতের খাতিরে।' ইহা বর্ত্তমান ভারতের নিন্দা হইল না অবশ্য! সংস্কারকেরা দোষ দেখায় নিন্দার উদ্দেশ্যে নয়, সংশোধনেরই জন্য।

এক জনের অতীত ভাল বলিয়া তাহার মধ্যে বর্ত্তমানে কিছু নিন্দনীয় থাকিতে পারে না, ইহা কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন না। কোন্ কালে ঘি খাইয়াছিলাম, তাই আজ হাত শুঁকে সুখে নিদ্রা দিব, না বর্ত্তমানের অভাব জানিয়া তাহা দূরীকরণের জন্য ত্যাগ ও লাঞ্ছনার পথে পা বাড়াইব— ইহার মধ্যে কোন্‌টী প্রশংসনীয় উদ্যম, তাহার বিচার নিষ্প্রয়োজন। যে মা সন্তানের পীড়ার উল্লেখ করিতে দেন না, তিনি অজ্ঞাতসারে হইলেও মঙ্গল না চাহিয়া সন্তানের মৃত্যুই চাহিতেছেন। মায়ের ছেলে এক দিন বলবান্ ছিল, আজ রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া যদি কোন আত্মীয় বলে যে ছেলে রোগা হয়েছে, কবিরাজ ডাকিয়া মকরধ্বজ খাওয়াও, তাহাতে যদি মা উপদেষ্টাকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করেন ও ছেলের রুগ্নাপবাদের বিরুদ্ধে নজির দেখান, যে সে ১৮৯৫ সালে একাই এক বাঘ মারিয়াছিল, তাহা হইলে মায়ের হৃদয়ের সঙ্গে সহানুভূতি করিলেও কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহার মস্তিষ্কের প্রশংসা করিতে পারিবে না। মা হইলেই বোকা মা হইতে হইবে, এমন কোন আইন নাই। বিবেকানন্দ এই সামান্য কথাটা বুঝিতেন না, সুতরাং ইহাকেই তিনি একটা মূলগত মত (Principle) দাঁড় করাইয়াছিলেন, বলিলে, তাঁহার বুদ্ধির অবমাননা করা হয়। আর কিছু না হউক, তিনি যে বুদ্ধিমান্ ছিলেন, এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। শিষ্যেরা নিজেদের দুর্ব্বলতা ঢাকিবার জন্য গুরুকে এমনই লাঞ্ছনার মধ্যে ফেলার অভিনয়, জগৎ এই একবার মাত্রই দেখে নাই। কোন একটা বিশেষ অবস্থায়, একটা ভাবের আবেগে, ক্ষণিক উত্তেজনায় যাহা বলা যায়, তাহাকে একটা মূল মতরূপে খাড়া করিবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে, যে, জীবনের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য আছে কি না। বিবেকানন্দ নিজেই কি সার্জ্জনের ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া, যা অনেকের কাছে অতি নির্ম্মম মনে হইবে, সেই ভাবে দেশের ক্ষতের গভীরতা পরখ্ করেন নাই? 'তিষ্ঠ দার্শনিক দিব প্রত্যক্ষ প্রমাণ।' তাঁহার সঙ্গে ব্রাহ্মদের এ বিষয়ে কোনই বিভিন্নতা নাই। স্বামীজি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, অর্থান্তর করিবার উপায় নাই—"ধর্ম্ম কি আর ভারতে আছে দাদা! জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, যোগমার্গ সব পলায়ন, এখন আছেন কেবল ছুঁৎমার্গ।" "এখন ব্রহ্ম হৃদয়কন্দরেও নাই, সর্ব্বভূতেও নাই, এখন ভাতের হাঁড়িতে।" "ভারতে দুই মহাপাপ, মেয়েদের পায়ে দলান, আর জাতি জাতি করে গরীবগুলোকে পিশে ফেলা"। "আমরা

সাময়িক উত্তেজনা ও স্থায়ী মত

মহাপাপী, স্ত্রীলোককে ঘৃণ্যকীট, নরকমার্গ ইত্যাদি বলে বলে অধোগতি হয়েছে।" "৬ বৎসরের মেয়ের গর্ভাধানের যারা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন, তাদের কোন্ দেশী ধর্ম্ম।" "নিরুদ্যম হতভাগার দল, দশ বৎসরের মেয়ে বিয়ে করতে কেবল জানে, আর জানে কি ?" "শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ জগতের অধম কেন ? শক্তির অবমাননা সেখানে বলে।" "আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহাহেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।" ইহা যদি কর্কশ কথাই হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি, কোন্ ব্রাহ্ম কবে ইহা অপেক্ষা কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন? আর যদি না হয়, তবে উহা কি স্বামীজি ব্রাহ্মসমাজের কাছেই শেখেন নাই ?

সংস্কারক বিবেকানন্দ তবে নিষ্ঠুর ?

আসল কথা এই, ব্রাহ্মসমাজের সমাজ-সংস্কার কার্য্যাবলীর যে দুইটী সর্ব্বপ্রধান—জাতিভেদ ও নারীজাতির অবস্থা—তাহা বিবেকানন্দ কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। সে প্রভাব তাঁহার উপর চিরদিনই কাজ করিয়াছে। নারীজাতি সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে, "না জাগিলে যত ভারতললনা, এ ভারত কভু জাগে না জাগে না" এই মতের বিভিন্নতা কোথায় ? একটু যা বিভিন্নতা তা এই—ব্রাহ্মসমাজ বলে এসেছেন, যে বর্ত্তমান ভারতের নারীর অবস্থা শোচনীয়। যে সমস্ত কুপ্রথায় বর্ত্তমান ভারতে গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী জন্মিতে পারে না, তার সংস্কার প্রয়োজন।

পাশ্চাত্যের পক্ষপাতিত্ব

বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়া, সেখানকার মেয়েদের গুণে এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে তিনি "ডায়েনা দেবীর ললাটস্থ তুষার কণিকার ন্যায় নির্ম্মল", "রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী" "আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন" "স্বাপেক্ষ ও দয়াবতী" মার্কীণ মহিলাদিগকে আদর্শ ধরিয়া "আমাদের দেশের দশ বছরের বেটাবিউনী-(স্বামীজির নিজের কথা, ভাষাটা অতি কঠোর মনে হয় না কি ?) দিগকে উন্নীত করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। 'যখন সময় আসবে, হবে' এই বলিয়া কি তিনি আর দশ জনের ন্যায় ব্যবস্থাটাকে চাপা দিবার উপদেশ দিয়াছেন ? না, তিনি হৃদয়ের আবেগের সঙ্গে বলিয়াছেন,—"ঐ রকম মা জগদম্বা যদি এক হাজার আমাদের দেশে তৈরী ক'রে মর্ত্তে পারি, তবে নিশ্চিন্ত হ'য়ে মরব!" স্বামীজির এই আকাঙ্ক্ষা যে, প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই আকাঙ্ক্ষা, তাহা বাতুল ভিন্ন আর সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে

তবুও যদি কেহ বলেন, যে, স্বামীজি কোনদিনই নিজেকে সমাজ-সংস্কারক বলিয়া মনে করেন নাই, তবে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কেন না, মনুষ্য-সমাজে নরাকারে অনেক জীবই বাস করে। যিনি বলিয়াছেন, এদেশে ব্রহ্ম সর্ব্বভূতে নাই, আছেন ভাতের হাঁড়িতে; এদেশে ধর্ম্ম মানব হৃদয় ছাড়িয়া বিরাজ করিতেছেন ঘণ্টা, ভেপু, সিঙ্গায়—তিনি নাকি ধর্ম্মপ্রচারক হইয়াও সংস্কারক ছিলেন না! তিনি জাতিভেদ ও নারীজাতির অবস্থাকে দেশের মহাপাতক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন; জাতিভেদের কঠোরতাকে তিনি পৈশাচিক প্রথা বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন, জগতের কল্যাণ নারীজাতির জাগরণ ছাড়া সম্ভব নয়। তিনি জানিতেন, আমাদের দেশের নারীজাতি যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, সম্যগ পরিবর্ত্তন ছাড়া তাঁহাদের দ্বারা জগতের কল্যাণ সম্ভব নয়। এই জীবনেই দেশে উচ্চতর নারী-আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া যাওয়া ছিল তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। যে সমস্ত সামাজিক আচারব্যবহার, রীতিনীতি "দশ বৎসরে বেটা-বিউনী" ছাড়া দেশে আর কিছু হইতে দেয় না, তাহার আমূল সংস্কার ব্যতীত এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার যে কোন সম্ভাবনাই নাই, তাহা বিবেকানন্দের মত মনস্বী ব্যক্তি বুঝিতেন না, ইহা বলিলে তাঁহার বুদ্ধির সম্মান করা হইবে না। আসল কথা, তিনিও একজন সংস্কারক ছিলেন এবং শিক্ষা ও পরিবর্ত্তনের সাহায্যে ভবিষ্যৎ ভারত যে প্রাচীন ভারত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইতে পারে, এ বিষয়েও সংস্কারকদের সঙ্গে মূলতঃ তাঁহার মতভেদ ছিল না। কিন্তু এই শিক্ষা ও সংস্কার সম্বন্ধে অনেকের একটা ভ্রান্তধারণা আছে। অনেকের মতে হাত পা বন্ধ করিয়া, কেবল মস্তিষ্কের চালনা করিতে থাক, দেখিবে—এক দিন হঠাৎ হাত পা দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। অর্থাৎ এখন আমরা যে কয়দিন জীবিত আছি, আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত করিও না, জনমণ্ডলীকে শিক্ষা দিয়া প্রস্তুত কর, পরে সংস্কার আপনা হইতেই হইয়া যাইবে। এই প্রণালী গ্রহণের তলায় সর্ব্বদাই যে একটা কিন্তু থাকে, এখন আর তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু আগে শিক্ষা দাও, পরে সংস্কার করিও—এই প্রণালীটা, আংশিকভাবে অন্ততঃ, Putting the car before the horse. লজিকের ভাষায় Begging the question. "আমরা গরু খাই" বলিয়া কলিকাতার রাস্তায় চীৎকার করাটা রামগোপাল ঘোষের কেবল

স্বামীজির আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা প্রাচীন ধারায় অসম্ভব

পাগলামি নয়। খাওয়ার আগে, কাণে সহিয়া যাওয়া চাই। কি সংস্কার করিতে হইবে, তাহার প্রচার ও তাহা হাতে কলমে দেখানও যে লোক-শিক্ষার একটা সর্ব্বপ্রধান প্রকরণ, তাহা ভুলিলে চলিবে কেন? আমরা যে তা' একেবারেই ভুলিয়াছি, তা'ও নয়—যদি ভুলি তা' সুবিধার খাতিরে। এই দেনা পাওনার সংসারে দেওয়া ও পাওয়ার যে পার্থক্য-রেখা আছে, সেইটা ভুলিতে পারি না। পাওয়াটা মধুর, দেওয়াটা কষ্টকর। সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে ও সর্ব্ববিভাগে Reactionaryগণের যে প্রথা, তাহা এ ক্ষেত্রে অনুসৃত না হইবে কেন? প্রজাসাধারণের অধিকার সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে, আমাদের ইংরাজ প্রভুরা তো এই যুক্তিটাই দিয়া থাকেন। রাজনৈতিক অধিকার পাইবার বেলায় যে যুক্তিটার অসারতা শতকণ্ঠে বর্ণনা করি। সামাজিক অধিকার পাইবার বেলায় যে যুক্তিটার অসারতা শতকণ্ঠে বর্ণনা করি, সামাজিক অধিকার দিবার বেলায় যে সেই যুক্তিটাই নিমজ্জমান ব্যক্তির তৃণখণ্ড ধারণের ন্যায় আঁকড়াইয়া ধরি, ইহা আমাদের সমাজ-শরীরের সুস্থতার পরিচয় প্রদান করে না—হাতেরও না, হৃদয়েরও না, মস্তিষ্কেরও না। ইহাতে শত্রুগণের অট্টহাস্য, আর বন্ধুগণের মনোকষ্ট—কিন্তু নিরুপায়। এ রোগ সহজে সারিবে না।

রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উন্নতি পৃথক নহে

এদেশে দু'চার জন বিংশশতাব্দীতে পৌঁছিয়াছেন, সে কথা অস্বীকার করি না। তথাকথিত শিক্ষিতদেরও অধিকাংশই যে পঞ্চদশ শতাব্দীর কোঠা ছাড়াইয়া আসিয়াছেন, সে কথা হলপ করিয়া বলিতে পারিব না। কেন না, "আট বছরের মেয়ের সঙ্গে ৩০ বছরের পুরুষের বে' দিয়ে মেয়ের মা বাপ আহ্লাদে আটখানা!" "শত শত যুগব্যাপী মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক অত্যাচারের কথা যাহাতে ভগবানের প্রতিমাস্বরূপ মানুষকে ভারবাহী গর্দ্দভে এবং ভগবতীর প্রতিমাস্বরূপ রমণীকে সন্তানোৎপাদন করিবার দাসীস্বরূপ করিয়া ফেলিয়াছে এবং জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছে, তাহার কথা তাহাদের স্বপ্নেও মনে হয় না।" (বিবেকানন্দ-সার্জ্জনের ছুরিকা নয় কি?) কিন্তু এই বিপুল জনমণ্ডলীর প'নের আনাই যেখানে তন্ত্রমন্ত্র লইয়া অথর্ব্ববেদের যুগে মৌরুসী পাট্টা লইয়া 'বাস করিতেছে—শিক্ষাদ্বারা এই সকলকে এক ভূমিতে আনিয়া যদি সংস্কারে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তবে নিশ্চয়ই সংস্কারের জন্য মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। ঐ এক হাজার

'সময় হ'লে হবে' একটা ভ্রান্ত ধারণা

'মা জগদম্বা' তৈরী করা নিজের জীবিতকালে তো দূরের কথা, জাতির জীবনেও কুলাইবে না। সুতরাং যিনি যে পরিমাণে শিক্ষাপ্রাপ্ত, তিনি সেই পরিমাণ সংস্কার গ্রহণ করুন ও "যৎ যদাচরতি প্রাজ্ঞঃ" এই নীতি অনুসারে পশ্চাদ্বর্ত্তীদিগের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হউন। ইহাই সংস্কারের প্রণালী, ইহাই শিক্ষারও প্রণালী। সমাজের যে সমস্ত রীতিনীতি ভারতনারীকে সন্তানোৎপাদনের দাসীমাত্রে পর্য্যবসিত করিয়াছে, তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়াই, কোন্ মন্ত্রবলে 'দশ বছরের বেটাবিউনীরা' আদর্শনারীতে পরিণত হইবেন? ভারতের অতীত পুণ্যবলে, 'ডায়েনা দেবীর ললাটস্থ তুষার কণিকার ন্যায় নির্ম্মল' আমেরিকার হাজার মেয়ে, আকাশ হইতে ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া পড়িবে না, অথবা জাহাজ ভাড়া করিয়া তাঁহারা আতলান্তিক পার হইয়া আসিবেও না। শত লাঞ্ছনা অগ্রাহ্য করিয়া শত টিট্‌কারী সহ্য করিয়া স্বামীজি যাহাকে বলিয়াছেন, আমাদের দেশের মহাপাতক তাহা দূরীভূত করতঃ বর্ত্তমান ভারতেরই জল মাটির মধ্যে তাঁহাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। যেখানে বাধা তাহা নির্ম্মম ভাবে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। ঐ যাঁহার হৃদ্‌গত আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার সঙ্গে সংস্কারকগণের মৌলিক পার্থক্য কোথায়? ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা স্বামী বিবেকানন্দের হৃদয়ে শেষ পর্য্যন্ত যে বর্ত্তমান ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার পথ নাই। কেন না, Logic of Facts-এর উপরে কোন তর্কই উঠে না।

বিবেকানন্দের মূল মত সংস্কারক দলে

বিংশ অধ্যায়

যে কভু না চলিবেক তারি পথ পরে,
শ্রুতি-স্মৃতি-সংহিতায় চরণ না সরে। রবীন্দ্রনাথ

হিন্দুধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্ম

হিন্দুধর্ম্ম যে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে পৃথক দেখায়, তাহার কারণ কবির ভাষায়—

ধর্ম্মেরে করেছে খর্ব্ব অনর্থ আচারে,
সত্যেরে করেছে পঙ্গু শাস্ত্র-কারাগারে।

হিন্দুনাম

যে নাম লইয়া এত মারামারি, বেদ বেদান্ত স্মৃতি দর্শন রামায়ণাদি কোন প্রাচীন গ্রন্থেই সে হিন্দুনাম নাই। অমরকোষে কোন অর্থ পাওয়া যাইবে না, মৌলবী সাহেবের অভিধানে ইহার অর্থ "গোলাম।" মুসলমানগণ অনুগ্রহ করিয়া পরাজিত ভারতবর্ষের নামকরণ করিয়াছিল, হিন্দুস্থান বা গোলামের দেশ। আমরা এখন এই ঘৃণার বোঝাটাই মাথায় বহন করা একটা মহাগৌরবের বিষয় মনে করিতেছি—ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অজ্ঞতা আর কি হইতে পারে? আর্য্যসমাজ এই জন্যই হিন্দুনাম বর্জ্জন করিয়াছেন। তবে, সরকারী খাতাপত্রে জাতীয়তার হিসাবে যখন ও-নাম স্থায়ী হইয়া গিয়াছে এবং সরকারের উপরে যখন কোন হাত নাই, তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বড় বড় অনুষ্ঠানে নামটি গ্রহণ করিতে হয়, নতুবা গোলমাল হইবার সম্ভাবনা। আদম-সুমারীতে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগ হয়। হিন্দু না বলিলে খ্রীষ্টান মুসলমান প্রভৃতির অন্তর্গত হইতে হইবে, তাই বাধ্য হইয়া আর্য্যসমাজীদের ন্যায় অনেককে হিন্দু বলিতে হয়। নতুবা ইচ্ছা করিয়া কে গোলামীর বোঝা মাথায় বহন করিতে চায়।

শাস্ত্র

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধঃ যত্র বিদ্যতে। তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥" শ্রুতি স্মৃতি পুরাণের মধ্যে বিরোধ দৃষ্ট হইলে সর্ব্বাগ্রে শ্রুতি মান্য, পরে স্মৃতি, তারপর পুরাণ। যাঁহারা ভাবেন, সব শাস্ত্র এক অথবা এক নিশ্বাসে "বেদ

পুরাণ" উচ্চারণ করেন বা উহাদিগকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া উহাদের একতা ও অপরিবর্ত্তনীয়তা ঘোষণা করেন, তাঁহারা যে অজ্ঞ, তাহা না বলিলেও চলে। নূতন সত্য আবিষ্কার করিলেই মানুষ মুনি হয় এবং সেই জন্যই বেদাদি পরস্পর হইতে বিভিন্ন—"বেদাঃ বিভিন্না স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।" যখন ক্রমবিকাশে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, তখন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি, যাঁহারা কালের গতি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের মত রদ করিয়া যুগোপযোগী স্বীয় নূতন মত প্রচার করতঃ মুনি হইয়া গিয়াছেন। একই শাস্ত্র অভ্রান্তরূপে চিরদিন মান্য থাকিবে, এমন ব্যবস্থা উন্নতিবিহীন অধঃপতিত মৃতপ্রায় মানুষ ছাড়া আর কেহ স্বীকার করে নাই। তাই "কৃতে তু মানবা ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ। দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ॥" (পরাশর সংহিতা)। অথবা "অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে। অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ॥" (মনু)। যুগ পরিবর্ত্তনানুসারে নানা যুগে নানা ধর্ম্ম হইয়াছে। তাই এ যুগে "নব-সংহিতা"। আবার যখন নূতন পরিবর্ত্তন আসিবে, তখন নূতন শাস্ত্র না হইবে কেন? মূর্খতা দূর করা অসম্ভব। শাস্ত্রে শ্রুতির যখন এই স্থান, তখন ইহার মত জানা সকলেরই কর্ত্তব্য। শ্রুতি বলেন, "তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদো সামবেদোঽথর্ব্ববেদো শিক্ষা কল্পঃ ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষর-মধিগম্যতে।" (মুণ্ডকশ্রুতিঃ, পৃঃ ৫০)। ঋগ্বেদাদি সব অপরা বিদ্যা, যে বিদ্যাদ্বারা সেই অক্ষর পরব্রহ্মকে জানা যায়, কেবল তাহাই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং শ্রুতির মতে ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনাই একমাত্র সার বস্তু, শাস্ত্র মানিয়া যে ইহার অন্যথা করে, সে ভণ্ড। তাই মহাভারত বলেন, 'যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতি-পদ্যতে। কিং ন তেন কৃতং পাপং চৌরেনাত্মাপহারিনা॥" যে এক রকম হইয়া আর এক রকম ভাণ করে, সেই আত্মপহারী চোরের অকৃত দুষ্কর্ম্ম কিছুই নাই।

"যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি। অন্যতৃণবদগ্রাহ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥"

শাস্ত্রবাদ

যুক্তিযুক্ত কথা বালকের নিকট হইতেও গ্রহণীয়, ব্রহ্মাও যুক্তিহীন কথা বলিলে তাহা অগ্রাহ্য। "কেবলং শাস্ত্র-মাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥" কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া বিচার করিবে না; কেন না, যুক্তিহীন বিচারের দ্বারা ধর্ম্মহানি হয়। কেবল মাত্র শাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া চলার

অর্থ পূর্ব্ববর্ত্তিগণের অনুসরণ। রাজা রামমোহন রায় বলেন, অন্ধভাবে পূর্ব্ববর্ত্তিগণের অনুসরণ করা পশুর ধর্ম্ম, মানুষের নহে।

"অনন্তশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালঃ বহবশ্চ বিঘ্নাঃ। যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্॥" শাস্ত্র অনন্ত, জ্ঞাতব্য বিষয় বহু; কাল অল্প, বিঘ্ন অনেক, সুতরাং সার গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু কোন্‌টা সার কোন্‌টা অসার, তাহা বুঝিব কিরূপে? শাস্ত্রই তাহা বলিয়া দিবেন। "মোক্ষ প্রতিপাদকং শাস্ত্রম্"—যাহাদ্বারা মোক্ষ পথ প্রদর্শিত হয়, তাহাই শাস্ত্র। মোক্ষ কাহাকে বলে? "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"। (শ্রুতিঃ)। ব্রহ্মকে জানিলেই মোক্ষ হয়। মোক্ষ-লাভের অন্য পথ নাই। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক যাহা, তাহাই শাস্ত্র, আর সব অশাস্ত্র। সত্যজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান, তাই "সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।"

"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত" (শ্রুতিঃ)—পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করা বিধেয়। "উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতম্" (যোগী যাজ্ঞবল্ক্য)—আত্মার প্রতিষ্ঠাভূমি একমাত্র পরব্রহ্মই উপাস্য। "তমেবৈকং জানথাত্মানমন্যা বাচঃ বিমুঞ্চথ" (শ্রুতিঃ)—একমাত্র সেই পরমাত্মাকেই জান, আর সকল পরিত্যাগ কর।

ব্রহ্মবাদ

এই যে উপাস্য দেবতা, তিনি কিরূপ? ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্ (শ্রুতিঃ)—তিনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। যাঁহারা আকার কল্পনা করিয়া ঈশ্বর ভাবনা করিতে চায়, তাঁহাদের চক্ষুদানের জন্য আচার্য্য শঙ্কর বলেন, "ন দর্শয়িতুং শক্যতে গবাদিবৎ" (পৃঃ ৩৮৪)—গরু বাছুরের ন্যায় তাঁহাকে পাওয়া যায় না। কেন না, "ন তস্য প্রতিমা অস্তি" (শ্রুতিঃ)—তাঁহার প্রতিমা হয় না। তিনি "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" (শ্রুতিঃ)—অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ ও অব্যয়। তাঁহাকে কিরূপে উপাসনা করিতে হয়? "অধ্যাত্ম যোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি" (শ্রুতিঃ)—অধ্যাত্ম-যোগের দ্বারা তাঁহাকে মনন করিতে হয়। "ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরা প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি" (শ্রুতিঃ)—অধ্যাত্মযোগের দ্বারা সর্ব্বভূতে তাঁহাকে দর্শন করিয়া মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। "য এতদ্বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ" (শ্রুতিঃ)—যিনি তাঁহাকে জানিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। রাজর্ষি রামমোহন বলিয়াছেন, যে ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শ্রুতির অর্থের ধারণা করিবার চেষ্টা দ্বারা উপাসনা করিবে। এইরূপে

ব্রহ্মস্বরূপের ধারণা হইলে ক্রমে ক্রমে আত্মসাক্ষাৎকারের ভূমি লাভ হইবে। ব্রহ্মস্বরূপ কিরূপে জানা যাইবে? সাধকগণের হৃদয়ে সময়ে সময়ে যে ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা উপনিষদাদি ব্রহ্মজ্ঞান-মূলক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সেই সকলের শ্রবণ মননের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা সাধিত হয়। সে সব স্বরূপ কি? "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—তৈত্তিরীয়-শ্রুতিঃ। "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—" মুণ্ডক-শ্রুতিঃ। "শান্তং শিবমদ্বৈতম্—" মাণ্ডুক্য-শ্রুতিঃ। "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্—" ঈশ-শ্রুতিঃ। "ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশম্"—শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিঃ। "প্রাণস্য প্রাণঃ", কেন-শ্রুতিঃ। "অজো নিত্যো শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো"—কঠ-শ্রুতিঃ। "ঈশানো ভূতভব্যস্য—" কঠ-শ্রুতিঃ। "দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ—" মুণ্ডক-শ্রুতিঃ। "রসো বৈ সঃ—" তৈত্তিরীয়-শ্রুতিঃ।

ব্রহ্মোপাসনা ছাড়িয়া দেবোপাসনা করিলে কি হয়? "অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেব স দেবানাম্" —বৃহদারণ্যক-শ্রুতিঃ—যিনি আপনার বাহিরস্থ স্বতন্ত্র দেবতার উপাসনা করেন, তিনি অজ্ঞান, তাঁহাকে দেবতাদের পশু বলিলেই হয়। "যথা হ বৈ বহবঃ পশবো মনুষ্যং ভুঞ্জুরেবমেকৈকঃ পুরুষঃ দেবান্ ভুনক্তি। একস্মিন্নেব পশাবাদীয়মানেঽপ্রিয়ং ভবতি কিম্ বহুষু, তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং যৎ এতন্মনুষ্যা বিদ্যুঃ—(ঐ)—যেমন মানুষের বহু পশু থাকে, তেমনই দেবযাজী মানুষেরা দেবতাদের পশু। একটা পশু কমিয়া গেলে মানুষের তাহা ভাল লাগে না, বহুর তো কথাই নাই। সেই জন্য দেবতারা চায় না যে মানুষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে। যেহেতু, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে আর মানুষ দেবতার আরাধনা করিবে না, সুতরাং দেবতাদের পশুর সংখ্যা কমিয়া যাইবে। শ্রুতির মতে যাহারা দেবতার আরাধনা করে, তাহারা পশুতুল্য। ঝঞ্চাট আরও আছে। "সর্ব্বে দেবা তং বলিমাহরন্তি" (শ্রুতিঃ) —দেবতারা ব্রহ্মোপাসকের পূজা করেন।

দেববাদ

আজকাল রাজা রামমোহন রায়ের খুব সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে, সন্দেহ নাই! কেন না, যদিও তাঁহার সমসাময়িক প্রতিপক্ষগণ সাধনাবস্থা ও সিদ্ধি তো দূরের কথা, তাঁহার যে ব্রহ্মোপাসনার অধিকার আছে, তাহাই স্বীকার করেন নাই। ইদানীন্তন কেহ কেহ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি দ্বেষ ও মৎসরতাবশতঃ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যে, রাজা "পরমহংস" ব্রতধারী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার

সাধনাবস্থা ও সিদ্ধি

ছিল, কিন্তু সর্ব্ব-সাধারণের তাহাতে অধিকার নাই। এই সকল লোকের অজ্ঞতা দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। সর্ব্বসাধারণের যে ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার আছে, ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য রাজর্ষি প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন—এই অতি সামান্য কথাটাও ইঁহারা জানেন না। এই ক্ষুদ্র কথাটাই ইঁহাদের বোধগম্য হয় না, যে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে অধিকার ও সাধনাবস্থার মধ্য দিয়াই যাইতে হইবে। রাজা সর্ব্বদা আপনার সাধনাবস্থার কথাই বলিয়া গিয়াছেন, এবং "সম্যগনুষ্ঠানাক্ষম তজ্জন্য মনস্তাপবিশিষ্ট" বলিয়া নাম স্বাক্ষর করিতেন। তাঁহার আত্মসাক্ষাৎকার হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার আদর্শ উচ্চ ছিল, কাজেই তিনি নিজেকে সম্যগনুষ্ঠানাক্ষম মনে করিতেন। রাজা প্রতিপক্ষদিগকে বলিয়াছিলেন—কি শৈব, কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, সকলেরই একটা একটা আদর্শ আছে, কিন্তু কয়জন এই আদর্শ আয়ত্ব করিয়াছেন? আদর্শানুসারে সম্যগ্ চলিতে অসমর্থ হইয়াও ইঁহারা যদি শৈব শাক্ত বৈষ্ণব নামে অভিহিত হইতে পারেন, তবে ব্রহ্মোপাসকের পক্ষেই তাহা দোষাবহ হইবে কেন? যাঁহারা আজ আবার সেই প্রশ্ন তুলেন, তাঁহারা বর্ত্তমান সময়ের শতবর্ষ-পশ্চাৎগামী। যে যে বিষয়ে সিদ্ধি চায়, তাহাকে সেই পথে চলিতে হয়। কোন কোন অজ্ঞলোক মনে করে, যে আগে পৌত্তলিকতার সাধন, পরে ব্রহ্মোপাসনা। এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে, যে, প্রথমে সাকারোপাসক ছিলেন, পরে নিরাকারবাদী হইয়াছেন। তাহাতে সাকারোপাসনা নিরাকারোপাসনার সোপান বলিয়া প্রমাণ হয় না। যাঁহারা এরূপ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সাকারোপাসনার ভ্রান্তি বুঝিয়া উহা পরিত্যাগ করতঃ নিরাকার ধরিয়াছিলেন। আম্রফল লাভ করিবার আশায় কেহ যেমন ভেরেণ্ডা গাছ পুতে না, তেমনই ব্রহ্মলাভ করিবার আশায় কেহ পুতুল পূজা করে না। ব্রহ্মলাভ করিতে হইলে প্রথম হইতেই ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করিতে হইবে। তবে, ব্রহ্মোপাসনার যে নানা স্তর আছে, তাহা রাজা রামমোহন রায়ই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মোপাসনাই যে মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য, আর সব যে পণ্ডশ্রম, তাহা নিঃসন্দেহ। তাই রাজা প্রতিপক্ষের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন,—"হে পরমেশ্বর, কবিতাকারকে আত্মা ও অনাত্মার বিবেচনার প্রবৃত্তি দাও।" কেবল পণ্ডশ্রম তাহা নহে, কিন্তু বিনাশের পথ। "যো অন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎসীতি" [বৃহদারণ্যক-শ্রুতিঃ]—পরমাত্মাছাড়া আর কিছুকে প্রিয় বলিয়া উপাসনা করিলে

তাহার বিনাশ হয়। অপরঞ্চ, সোপানভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্লভং। যস্তারয়তি নাত্মানং তস্মাৎ পাপতরোঽত্র কঃ॥" মোক্ষের সোপানভূত এই দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়া যে আপনার মোক্ষের চেষ্টা না করিল, তার অপেক্ষা অধিকতর পাপী আর কে? অথচ ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া মোক্ষ হইতেই পারে না। সুতরাং ব্রহ্মোপাসকের যে নিন্দা করে, তার মত পাপিষ্ঠ আর নাই। "যে দ্রুহ্যন্তি খলা পাপা পরব্রহ্মোপদেশিনঃ"—তাহারা নিজেদেরই অনিষ্ট করে—"স্বদ্রোহং তে প্রকুর্ব্বন্তি।" যেহেতু, "তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আত্মা হ্যেষাং স ভবতি।" [শ্রুতি]—দেবতারাও ব্রহ্মোপাসকের অনিষ্ট করিতে পারেন না, কেন না, তিনি দেবতাদেরও পূজ্য।

রাজা বলিতেছেন, "সংসারে আসক্তি, এ অপবাদে দুর্জ্জনের মুখ হইতে নিস্তার নাই। যে হেতু, কি ইদানীন্তন কি পূর্ব্বযুগে, গৃহস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠদের বিষয়-ব্যাপার দেখিয়া কেহ বিষয়াসক্তির দোষ তাহাদিগকে দিলে ইহার অপ্রমাণ করা লোকের নিকট দুষ্কর হয়।" "শাস্ত্রে সাধন-চতুষ্টয়কে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার কারণ কহিয়াছেন। অতএব যখন কোন ব্যক্তিতে ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা উপলব্ধি হয়, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক, যে এরূপ ইচ্ছার কারণ যে সাধন-চতুষ্টয়, তাহা ইহ জন্মে অথবা পূর্ব্বজন্মে এ ব্যক্তির হইয়াছে, নতুবা কারণ না থাকিলে কিরূপে কার্য্যের সম্ভাবনা হয়।" "সাধন কালে শমদমাদি অন্তরঙ্গ কারণ হয়েন, কিন্তু সে কালে সম্পূর্ণরূপে শমদমাদি বিশিষ্ট হওনের সম্ভব হয় না, যে হেতু সম্পূর্ণরূপে শমদমাদি বিশিষ্ট হওয়া সিদ্ধাবস্থার স্বাভাবিক লক্ষণ, তাহা সাধনাবস্থায় কিরূপে হইতে পারে?" "অতএব সাধনাবস্থা ও সিদ্ধাবস্থার প্রভেদ এবং সাধনাবস্থাতে উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ ইত্যাদি ভেদ ভগবদ্গীতাদি তাবৎ মোক্ষশাস্ত্রে করেন, সিদ্ধাবস্থার ধর্ম্ম সাধনাবস্থায় কেন নাই এবং উত্তর-সাধকের লক্ষণ মধ্যম ও কনিষ্ঠাদি সাধকেতে কেন নাই, ছল গ্রহণ করিয়া নিন্দা করা কেবল দ্বেষ ও পৈশূন্য হেতু ব্যতিরেকে কি হইতে পারে?" (পথ্য-প্রদান—১ম ও ২য় অধ্যায়।)

অধিকার ভেদ।

ব্রহ্মজ্ঞানে কি সকলেরই অধিকার? সকলেই কি ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী? যাহা শ্রেষ্ঠ, যাহা মঙ্গল, যাহা লইয়া মানুষের মনুষ্যত্ব, যাহা না হইলে মানুষ পশুতে পরিণত হয়—ইহাই শ্রুতির আদেশ—তাহাতে মানুষ মাত্রেরই অধিকার। উপনয়ন হওয়ামাত্রই সকল বালক "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"

(শ্রুতিঃ)—এই গায়ত্রী-মন্ত্র যোগে ব্রহ্মোপাসনার জন্য আহূত হইয়া থাকে। এই মন্ত্রে কোন সাকার দেবদেবীর কথা নাই, পুতুল-পূজাও নাই—আছে জগৎ-প্রসবিতা পরমেশ্বরের বরণীয় মহিমার মানস-ধ্যান। যে তাহা না বুঝিয়া কেবল আওড়ায় আর ভাবে তাহার ব্রহ্মোপাসনার অধিকার নাই, সে অবশ্য মনুষ্য পদবী হইতে নামিয়া গিয়া তোতা-পাখীর আসন গ্রহণ করে। কেন না, তোতা-পাখীই কেবল না বুঝিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিবার অধিকারী। আর, এরূপ আওড়াইয়াই বা লাভ কি?

"মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যো ন জানাতি সাধকঃ।
শতলক্ষং প্রজপ্তোঽপি তস্য মন্ত্রঃ ন সিদ্ধ্যতি॥

মন্ত্রের অর্থ না জানিয়া লক্ষবার জপ করিয়াও কোন ফল হয় না।

ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার না দিলে চলিবে কেন? "য এতদবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ (শ্রুতিঃ)—যে ব্রহ্মকে না জানিয়া ইহলোক হইতে চলিয়া যায়, সে অতি কৃপাপাত্র। পাগল ভিন্ন আর কেহই যখন কৃপাপাত্র থাকিতে চায় না, তখন সকলকেই ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের চেষ্টা করিতে হইবে।

অনধিকারে প্রত্যবায়

"অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানন্তি যদা তদা। ভ্রান্তা এবাখিলাস্তেষাং ক্ব মুক্তি ক্বেহ বা সুখম্"॥ (পঞ্চদশী চিত্রদীপ, ২১৭, যাঁহারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব জানে না, তাঁহারা ভ্রান্ত, তাঁহাদের মুক্তিই বা কোথায়, সুখই বা কি? 'ইহ চেদবদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ" (শ্রুতিঃ)—ইহলোকেই যদি তাঁহাকে জান, তবেই জীবনের সার্থকতা হইল, যদি ইহজীবনে তাঁহাকে না জানিলে, তবে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

"নেহাভিক্রমঃ নাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"॥ (গীতা)। আরম্ভ করিলে এ ধর্ম্মের নাশ নাই, এ ধর্ম্মে কোন প্রত্যবায় নাই; এ ধর্ম্মের একটুমাত্রও মহাভয় হইতে ত্রাণ করে। যদি এই উচ্চ ধর্ম্ম আরম্ভ করিয়া কেহ ইহা হইতে ভ্রষ্ট হয়, তবে কি তাহার উভয় কুল নষ্ট হইল না? "পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে। নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥ প্রাপ্য পুণ্যকৃতান্ লোকান্ উষিত্বা শাশ্বতী সমা। শুচীনাং শ্রীমতাং গৃহে যোগভ্রষ্টঃ অভিজায়তে॥ অথবা যোগীনামেব কুলে ভবতি ধীমতাং। এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥ তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্ব-

অধিকারীর সুখ

দৈহিকং। যততে চ ততঃ ভূয়ো সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥ পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ। জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে॥ (গীতা)। * ইহলোকে বা পরলোকে তাহার বিনাশ নাই, কল্যাণকারীর কোন দুর্গতি হয় না। যদি এ পথ ধরিয়া কেহ তাহা হইতে ভ্রষ্ট হয়, তবে সে বহুকাল পুণ্যফল ভোগ করিয়া পবিত্রাত্মা ধনবানের গৃহে জন্মগ্রহণ করে, অথবা বুদ্ধিমান্ যোগীর গৃহে জন্মায়—এরূপ জন্ম অতি দুর্ল্লভ। সে তখন পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত জ্ঞানলাভ করিয়া সেখান হইতেই সাধন আরম্ভ করে। তাঁহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার তাঁহাকে জোর করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ করে। এই যে ব্রহ্মযোগ ইহা জানিবার আকাঙ্ক্ষাও যাঁহার হৃদয়ে উপস্থিত হয়, সে বেদকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। সুতরাং এই ধর্ম্মের যে প্রতিবাদ করে, সে যে অতি মূর্খ, তাহা বলাই বাহুল্য।

সকাম ধর্ম্ম তবে কিরূপ? "পণ্ডিতেনাপি মূর্খঃ কাম্যে কর্ম্মাণ ন প্রবর্ত্তয়িতব্যঃ" (রঘুনন্দন)। পণ্ডিত ব্যক্তি মূর্খকেও সকাম কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে না। সুতরাং যাঁহারা "ধনং দেহি শত্রুং জহি" বলিয়া দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহারা কাজেই মূর্খ। তবে কি পৌত্তলিকতার কোন স্থান নাই? একটু আছে। রাজা

সকামোপাসনা

রামমোহন রায় বলিয়াছেন, যে যাহারা এতই অবোধ যে উচ্চ কিছুরই ধারণা করিতে পারিবে না, তাহারা যাহাতে ধর্ম্মহীন হইয়া নানা দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হয় সেই জন্য এই ব্যবস্থা যে তাহারা পুতুলাদি লইয়া আপনাদের মনোরঞ্জন করিবে। ইহা যেন ধর্ম্ম-জগতের রিফর্ম্মেটরী স্কুল। আর যা, তা এই সব পূজা-অর্চ্চনাতে যাদের লাভ, তাদেরই প্ররোচনা। কেন না, কিং স্বল্পতপসাং নৃণাং অর্চ্চায়াং দেবচক্ষুষাম্ (ভাগবত, ১০।৮৪) - যে সকল ব্যক্তি

পৌত্তলিকতা *

প্রতিমাতে দেবতা দর্শন করে, তাদের কি অল্প তপস্যা? "মনসা কল্পিতা মূর্ত্তিঃ নৃণাং চেৎ মোক্ষসাধিনী। স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবস্তদা"। মহানির্ব্বাণ।—মূর্ত্তিকল্পনার দ্বারা যদি মানুষের মোক্ষ সাধিত হইত, তবে স্বপ্নলব্ধ রাজ্যের দ্বারাই মানুষ রাজা হইত। "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ

* বিগত কার্ত্তিক মাসের (১৩২২) শারদীয়া সংখ্যার নারায়ণে পৌত্তলিকতার সপিণ্ডকরণ হইয়া গিয়াছে। পুরোহিতত্রয়, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনচন্দ্র পাল। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "দুর্গোৎসবের প্রতিমাটা নিতান্তই অবান্তর। উহা নিতান্ত আধুনিক। শারদীয়া পূজা আদিতঃ গাছ পালা লইয়া আনন্দোৎসব ছিল। বর্ষাপগমে শরতে নবজাত বৃক্ষলতার শোভায় মুগ্ধ মানুষ লতা পাতা লইয়া আমোদ

কুণপে ত্রিধাতুকে, স্বধীঃ কলত্রাদিষু, ভৌম ইজ্যধীঃ যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলীলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গো-খরঃ” (ভাগবত)—দেহে যার আত্মবুদ্ধি, পুত্রাদিতে আপন বুদ্ধি, মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে উপাস্য বুদ্ধি, জলে যার তীর্থবুদ্ধি, যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমাগমকেই তীর্থ মনে করে না, সে গরুরও গাধা।

“মৃচ্ছিলা ধাতুদার্ব্বাদি মূর্ত্তাবীশ্বর বুদ্ধয়ঃ। ক্লিশ্যন্তি তপসা মূঢ়া পরাং শান্তিং ন যান্তি তে॥” (মহানির্ব্বাণ)—মৃত্তিকা শিলা ধাতু কাষ্ঠ ইত্যাদি দ্বারা নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে যাহারা ঈশ্বর বুদ্ধি করে, তাহারা তাহাদের চেষ্টা দ্বারা কেবল কষ্ট পায়, কখনও শান্তি পায় না। “কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খানাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা” (রঘুনন্দন, আহ্নিক তত্ত্ব)—কাষ্ঠ-লোষ্ট্রে মূর্খদিগের দেবতা-বুদ্ধি হয়। “সাকারং অনৃতং বিদ্ধি নিরাকারঞ্চ নিশ্চলম্” (অষ্টাবক্র-সংহিতা, ১ম প্রকরণ)—সাকার মিথ্যা বলিয়া জান। নিরাকারই ধ্রুব সত্য। “বাল-ক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপনামাদিকল্পনং। বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো য স মুক্তঃ

করিত। তাহা হইতেই নব পত্রিকার পূজা আসিয়াছিল। বসন্ত কালের পূজা শ্রীরাম অকালে করিয়াছিলেন; ইহা মিথ্যা কথা—রামায়ণাদিতে তাহা নাই। নবপত্রিকার পূজা বসন্তকালের সৃষ্টি নহে, তৎকালে ঐ সকল লতা পাতা দুষ্প্রাপ্য।” পণ্ডিত পাঁচকড়ি দুর্গা পূজার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অকাল-বোধনে কুলকুণ্ডলিনী জাগাইয়াছেন, ষট্‌চক্র ভেদ করিয়াছেন। উহাই দুর্গা পূজা। তবে যে পুতুল গড়া, ভোগরাগ দেওয়া—পশুমাংসের ষোড়শোপচার করা, এ সকলই সামাজিক সম্মিলনের জন্য। উহা উৎসব, পূজা নহে। তিনি স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন পুতুল পূজার জন্য নহে, তামাসার জন্য। “প্রতিমা আরাধ্য নহে, উহা ঘর সাজান সামগ্রী”। বিপিনবাবুর মতামত পাঠকবর্গ ইতিপূর্ব্বেই অবগত আছেন। তাঁহার যে সব স্থলে ভ্রান্তি আছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনায় খণ্ডিত হইয়াছে। তবে এবারে প্রচলিত পুতুল পূজার বিনাশসাধনকে পূর্ণতা দিয়াছেন মাত্র। তিনি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার মতে মূর্ত্তিনির্ম্মাণ ব্রহ্মজ্ঞানের পরবর্ত্তী। যাহার ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় নাই, তাঁহার পুতুলে অধিকার নাই। সুতরাং প্রচলিত পুতুল পূজা উঠাইয়া দিতে হইবে। উহা ধর্ম্মজীবনের পক্ষে অনিষ্টকারী। “ইহা লোকের ধর্ম্মকে প্রাণহীন করিয়া তুলিয়াছে।” ধ্যানযোগে সাধক যে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, মূর্ত্তি তাহারই স্মারক চিহ্ন। এই মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি সেই ভাব জাগাইয়া রাখিবেন। ইহাতে বস্তুতঃ কাহারও আপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে বিপিনবাবু যে তাঁহার এই উচ্চ অঙ্গের symbolismকে প্রচলিত মূর্ত্তি পূজার ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেইটাই আপত্তিজনক। যাহা হউক, ‘নারায়ণ’ কার্ত্তিক মাসে পৌত্তলিকতার সৎকার করিয়াছেন।

নাত্র সংশয়ঃ"॥ (মহানির্ব্বাণ)—যে ব্যক্তি রূপ-নামাদি কল্পনাকে বালক্রীড়নবৎ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়, সেই মুক্তিলাভ করে, ইহাতে সংশয় নাই।

"উপেক্ষ্য তৎ তীর্থযাত্রা জপাদীনেব কুর্ব্বতাম্। পিণ্ডং সমুৎসৃজ্য করং লেঢ়ীতি ন্যায় আপতেৎ॥ (পঞ্চদশী, ধ্যানদীপ)—পরব্রহ্মের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া যাহারা তীর্থযাত্রাদিতে রত, তাহারা হস্তস্থিত খাদ্য পরিত্যাগ করিয়া হস্তই লেহন করে। "যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং। হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব যুহোতি সঃ॥ (ভাগবত ৩।২৯)—সকল প্রাণীতে বর্ত্তমান আত্মাকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা না করিয়া মূঢ়তা বশতঃ যে প্রতিমা পূজা করে, সে ভস্মে ঘৃতাহুতি দেয়। যাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যেন চিরদিন পুতুল পূজাই করিবেন, তাঁহাদের হাত চাটা আর ছাইএতে ঘি ঢালাই সার। বৃথা পরিশ্রম। জীবনটা পণ্ড। তাই মনু প্রতিমাপূজক ব্রাহ্মণকে দৈবপিত্র্য কার্য্যে বর্জ্জন করিতে আদেশ দিয়াছেন—মনু, ৩।১৫২।

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ। ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্॥" শান্তি, ১০৮।১০। বর্ণের ইতর

জাতিভেদ

বিশেষ নাই, ব্রহ্মা প্রথমে সব ব্রাহ্মণ করিয়াই সৃজন করিয়াছিলেন, পরে কর্ম্মানুসারে জাতিভেদ ঘটিয়াছে। 'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ। (গীতা)—গুণ ও কর্ম্মভেদে চারি বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছে। কি গুণ থাকিলে ব্রাহ্মণ হয়? সর্ব্ব প্রধান গুণ, "ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ"—কেন না, "য এতৎ বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ"—আর কি বাহ্য লক্ষণ দেখিয়া ব্রাহ্মণ ঠিক করিব? "সত্যং দানং ক্ষমাশীলমানৃশংস্যং তপোঘৃণা। দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥" বন, ১৮০।২১। দান ইত্যাদি যাহার মধ্যে আছে, সেই ব্রাহ্মণ। এখন কি ব্রাহ্মণের ছেলেকে ব্রাহ্মণ, আর আর শূদ্রের ছেলেকে শূদ্র ধরিতে হইবে? না, তাহা নহে। "ন বৈ শূদ্রো ভবেৎ শূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ।" (বন, ১৮০।২৫)। তবে কি? "যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ। যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥ (২৬।) যাহার মধ্যে ঐ সকল গুণ আছে, তিনি ব্রাহ্মণ, যাহার মধ্যে নাই, তিনি শূদ্র। জন্মই কি ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদের নিয়ামক? না। "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ। হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥" ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য যদি ব্রাহ্মণ না করেন? "যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ"॥ মনু

২।১৬৮—বেদপাঠ ছাড়িয়া ব্রাহ্মণ যদি অন্য কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তবে সে ইহজন্মেই সপরিবারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ছেলে যদি ব্রাহ্মণ থাকিতে চান, তবে কেবল বেদপাঠ করিবেন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবেন—না করিলে বড় বিপদ।

উপবীত ‡

"ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেন গর্ব্বিতঃ। তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ"॥ (অত্রি, ৩৭২)। ব্রহ্মজ্ঞান নাই, অথচ উপবীতের জোরেই যিনি ব্রাহ্মণত্বের দাবী করেন, তাহাকে অত্রিমুনি পশুর মধ্যে গণ্য করিতে বলিয়াছেন।

ঋষির প্রার্থনা

"অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়" (বৃহদারণক-শ্রুতিঃ) অসত্য হইতে সত্যতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও মৃত্যু হইতে অমৃতেতে লইয়া যাও।

সগুণ ও নির্গুণ

নির্গুণ ও সগুণ দুই বস্তু নহে, একই বস্তুর দুই দিক্। গুণ—সত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই তিনের সমাবেশ-বিধানে জগতের উৎপত্তি। যিনি ইহার অতীত, তিনি নির্গুণ। তিনি ইহার অতীত হইলেও ইহার সম্বন্ধ-বর্জ্জিত হইতে পারেন না; কেন না, জগতের সহিত যাঁহার সম্বন্ধ নাই, তাঁহাতে জগদতীত (transcendent) এই আখ্যা প্রযুক্ত হইতে পারে না। তবে তিনি নির্গুণ কিরূপে? এই সকলের অধীন নহেন, তাই তিনি নির্গুণ। এই জগৎ দেশ ও কালে প্রকাশিত। দেশ ও কালকে ছাড়িয়া জগৎ কল্পনা করিতে পারি না। 'এখান' ও 'সেখানের' সম্বন্ধই দেশ এবং 'এখন' ও তখনে'র সম্বন্ধই কাল। কিন্তু যিনি এই সম্বন্ধের অতীত নহেন, তিনি এই মিথুনকে একত্রিত করিয়া দেশ ও কাল রচনা করিতে পারেন না। যিনি দেশ ও কাল রচনা করেন, তিনি ত্রিগুণাতীত। আমরা আমাদের আত্মায় যে বস্তুর পরিচয় পাই, তাহাকে যে সগুণ রূপেই

‡ অধিকাংশ গৃহ্য সূত্রেই উপনয়নের সময় উপবীতের উল্লেখ নাই। কোমরে ঘাসের দড়ী জড়াইবার ব্যবস্থা ছিল। তারপর, ধর্ম্মকার্য্যে পৈতা ঝুলাইবার ব্যবস্থা হয়, রাত্রিদিন পরিয়া থাকিবার ব্যবস্থা ছিল না। পরে যখন ব্যবস্থা হয়, স্ত্রীপুরুষ সকলেরই উপবীতে অধিকার ছিল। এখন পার্শীদিগের মধ্যে যেমন প্রথা আছে। নারীকে উপবীতহীন করা, ভারতের নারীজাতির অবনতিমার্গের একটী ধাপ।

ধারণা করিতে হইবে, তাহার কোনও অর্থ নাই। আমরা আমাদের আত্মাতেই ত্রিগুণের অতীত বস্তুরই পরিচয় পাইতেছি। আমরা এখানে যাঁহার পরিচয় পাইলাম, তিনি সত্ত্ব-রজো-তমোগুণের সম্মিলনে উৎপন্ন বিচিত্র বিশ্বের আধার এই দেশ কালেরও অতীত—তিনি নির্গুণ। সগুণও আবার তিনিই।

সগুণ ও সাকার

কেহ কেহ বলেন, সগুণ ও সাকার একই। আকার—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ। সুতরাং গুণ ও সাকারকে এক করিতে হইলে সত্ত্ব প্রভৃতি গুণ গুলিকে দৈর্ঘ্য প্রস্থাদি বিশিষ্ট করিতে হইবে। কবির নিকট গুণ গুলির মূর্ত্তি থাকিলেও থাকিতে পারে, দার্শনিকের নিকট নাই। আকার-বিশিষ্ট বস্তুসকল গুণের প্রকাশ হইলেও গুণের সকল প্রকাশই সাকার নহে। সগুণের উপাসনা কোন কোন স্থলে সাকার উপাসনা হইলেও সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা কখনও সাকারোপাসনা নয়। কেন না, সাকার হইলেই এক ভাবে সীমাবদ্ধ হইতে হয়, কিন্তু ব্রহ্ম অসীম। তিনি গুণগুলিকে পরিচালিত করেন, তাই তিনি সগুণ। গুণের নিয়ন্তাকে সাকার ভাবিতে হয় না। গুণের প্রকাশ অসীম না হইলেও গুণের নিয়ন্তা অসীম। সগুণ ভাবেই দেখি, আর নির্গুণ ভাবেই দেখি, কোন দিক্ দিয়াই তিনি সাকার নহেন। অনেকে মনে করেন, আকার ছাড়া চিন্তা হয় না, ইহা তাঁহাদের একটা ভ্রান্তি। সাংখ্য মতেই সত্ত্বরজোতমো গুণের বৈষম্যে উৎপন্ন যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, তাহারা অবশ্য সগুণ হইলেও মন বুদ্ধি অহংকার পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতি আকারশূন্য—আকার কেবল পঞ্চ স্থূলভূতের। ইহার মধ্যে পূর্ণ আকারের স্থান আরও সংকীর্ণ। যে পশু-জীবন যাপন করে, সে-ই কেবল সর্ব্বদা আকারের মধ্যে থাকে।

সাকার ও নিরাকার

সাকারোপাসনা দ্বারা মানব-জীবনের কোনই উচ্চ প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না! মানবাত্মাকে জ্ঞান প্রেম পুণ্যে উন্নতির দিকে লইয়া যাওয়াই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। জ্ঞান প্রেম পুণ্য আত্মার স্বরূপ। ইহারা সাকার নহে। এমন মূর্খ কে আছে যে বলিবে, জ্ঞানের দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ আছে, প্রেম গোলাকার বা চতুষ্কোণ, পুণ্য হরিৎ বা লোহিত বর্ণ। কোন আকার চিন্তনে ইহাদের হ্রাসবৃদ্ধি হইবে না। ভগবান্ যদি সাকার হইতেনও, তবুও তাঁহার আকারের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ থাকিত না। যাঁহার মধ্যে জ্ঞান প্রেম পুণ্য পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান, সেই পরব্রহ্মের শ্রবণ মনন নিদি-ধ্যাসন, আত্মার আশ্রয় পরমাত্মারূপে তাঁহার সঙ্গে যোগ, অন্তর্য্যামীরূপে তিনি

আত্মায় বর্ত্তমান—এই চিন্তন ও তাঁহাতে আত্মসমর্পণ, ইহাই ধর্ম্ম। কোনরূপ মূর্ত্তি-পূজায় মানবজীবনের সফলতা নাই। যাহারা নিতান্ত মননহীন জীবন যাপন করে, ইন্দ্রিয়-ঘটিত পশুজীবনের উপরে উঠিবার সাধ্য নাই, তাহারাই মাত্র সাকারের পক্ষপাতী হইতে পারে, অন্যেরা নহে। অনেকে কেবল গতানুগতিকতার অনুসরণ করিয়াই ইহার সমর্থন করেন। একটু চিন্তা করিলেই মুহূর্ত্তের মধ্যে এই ভ্রান্তি অপনোদিত হয়।

নিরাকারের উপাসনায় আকারবাচক শব্দের ব্যবহার

মানবের শৈশবাবস্থাতেই ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, তখন জ্ঞান সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। ক্রমে জ্ঞান বাড়িয়াছে, কিন্তু স্থূল ভাষা দ্বারাই অনেক স্থলে সূক্ষ্ম জ্ঞানকে ধরিয়া মানবজাতিকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। ভাষার এই হের ফের বুঝা বড় শক্ত। কেবল স্থূল কেন, জানিয়া শুনিয়া ভাষায় অনেক মিথ্যাই ব্যবহার করিতে হয়। যখন মানুষ অজ্ঞান ছিল, তখন ভাবিত যে পৃথিবী স্থির, সূর্য্যই ঘোরে। এখন সে ভ্রান্তি গিয়াছে, কিন্তু "সূর্য্যাস্ত" "সূর্য্যোদয়" কথাগুলি রহিয়াছে। "সূর্য্যোদয়" কথাটী শুনিয়া মূর্খের মনেই মাত্র পূর্ব্বভাব উদিত হয়, জ্ঞানী ঐ কথাটা ব্যবহার করিয়াও উহার আক্ষরিক অর্থের অনেক উপরে থাকেন। "ধরা" কথাটার যখন প্রথম ব্যবহার হইয়াছিল, তখন উহার অর্থ ছিল, হস্ত দ্বারা কোন জড় বস্তু ধরা। ক্রমে অর্থ সূক্ষ্ম হইয়া উহা আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করিয়াছে। "আমি এ কথার অর্থ ধরিতে পারি নাই" বলিলে যদি কেহ হাত দিয়া জড় বস্তু ধরার কথা মনে আনে, তবে সে তাহার জড়-বুদ্ধিরই পরিচয় প্রদান করে। "এবার চাউল অগ্নিমূল্য" বলিলে কোন মূর্খও ভাবে না যে আগুন দিয়া চাউল কিনিতে হইবে। "তাহার কথা কর্ণে মধু বর্ষণ করে" শুনিয়া যদি কেহ ভাণ্ড হইতে কাণে মধু ঢালার ছবি মনে আনে, তবে তাহার মূর্খতাই প্রকাশ পায়। "আমার হাতে টাকা নাই, এই বাক্যের 'হাত' কথার অর্থ অভিধানে নাই। অথবা 'তাঁহার হাতে অনেক টাকা' শুনিয়া যদি কেহ তাহার হাত টানিয়া দেখিতে যায়, হাতে টাকা আছে কি না, তবে সে নিশ্চয়ই হাস্যাস্পদ হয়। এরূপ ব্যবহার কেবল অপোগণ্ড শিশুরই শোভা পায়। কাণমলা খাওয়া আর সন্দেশ খাওয়ার 'খাওয়া' এক কথা নয়। কোন গুরুতর বিষয়ের কথা শ্রবণ করতঃ তৎবিষয়ের ইতিকর্ত্তব্যতার জন্য জিজ্ঞাসিত হইয়া যখন বলি, "সবুর কর, দেখি কি হয়" তখন এই দেখা, যে, চক্ষুর দৃষ্টি-বিষয়ে প্রযুক্ত নয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

যেখানে রূপ আছে, সেখানেই যখন রূপ শব্দ অরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেখানে আগে হইতেই বলা হইয়াছে রূপ নাই, সেখানে উহা রূপক ও উপমা অর্থে যে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সংস্কারের বিষয় দুইটী—জাতিভেদ ও নারীজাতির অধিকার। জাতিভেদ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি—শাস্ত্র ইহার বিরোধী। আরও দেখাইয়াছি—বহুগণ্যমান্য লোক যাঁহারা হিন্দুসমাজেই আছেন—তাঁহারাও ব্রাহ্মদের মতনই ইহার বিনাশ কামনা করেন। নারীজাতির উন্নতি সম্বন্ধেও আজ ব্রাহ্ম-অব্রাহ্ম সকলেই একমতাবলম্বী। বিধবা-বিবাহের আন্দোলন তো খুব জোরেই চলেছে। তবে, ব্রাহ্মসমাজ চেয়েছিলেন ধর্ম্মবুদ্ধিতে, আর এখন একটা অতি মোটা কথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। নারীজাতির অবস্থা বিষয়ে মহারাণী বরোদার মন্তব্য (পুণা, ৫ই জানু, ১৯২৭) ব্রাহ্মসমাজেরই কথা। ব্রাহ্মসমাজের নাম নাই, এই মাত্র প্রভেদ। রামমোহন-শিষ্য ব্রাহ্মসমাজ কাজই চাহেন, নাম চাহেন না। মহারাণীর কথায় সকলেই "বেশ বেশ" করিয়া উঠিয়াছেন। কেবল "বেশ বেশ" করিলেই কি হইল? কিছু কাজে করিতে হইলেই, নামে না হউক রূপে, হিন্দুসমাজকে ব্রাহ্মসমাজেই পরিণত হইতে হয়। কোন বিভিন্নতা থাকে না। মুলতঃ বিভিন্নতা নাই-ও।

ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার-প্রিয়তা—জাতিভেদ ও নারীর অধিকার

এ কথাটার আলোচনা ইতিপূর্ব্বে একাধিকবার করিয়াছি, যে দোষ দেখিয়া তাহা সংশোধনের জন্য তীব্র ভাষা ব্যবহার করিলে তাহাতে প্রীতির অভাব প্রকাশ পায় না। দেখাইয়াছি, এরূপ স্থলে স্বামী বিবেকানন্দও অতি তীব্র ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী যে (১৬ই জানু, ১৯২৭) গয়ার অস্বাস্থ্যকর অবস্থা দেখিয়া তীব্র তিরস্কারের সঙ্গে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে কি গয়ার উপর মহাত্মাজীর প্রেমের অভাব প্রকাশ পাইয়াছে? হিন্দুশাস্ত্র স্পষ্টই উরগ-ক্ষত হস্তকে কাটিয়া ফেলিবার আদেশ দিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী আজ, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ চিরদিনই "ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" এ দুষ্ট উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছেন—বিশেষতঃ যেখানে জীবন-মরণ সমস্যা। দরকার হইলে যে পাশ্চাত্যের অনুসরণ করিয়া নিজেকে সংশোধন করিতে হইবে, মহাত্মা গান্ধী মিউনিসিপালিটি বিষয়ে গয়াবাসীদিগকে গ্লাসগো ও বার্মিংহামের অনুসরণ করিতে বলিয়া সেই উপদেশ দিয়াছেন।

দোষের জন্য তিরস্কার ও প্রেম

সমাপ্ত